বার্ষিক সূচীপত্র

বৈশাখ ১৩৪৮—চৈত্র ১৩৪৮

[বর্ণানুক্রমিক]

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক
অপদেবতা (গল্প)	শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৬১৬
অভিভাষণ	,, কালিদাস নাগ	১৫৬
অমর দিন (কবিতা)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৫৫৭
আমার ভূত দেখা (গল্প)	,, শিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৭
আমাদের লাইব্রেরী		২২১, ৪৩৯
আমাদের অধিকার (প্রবন্ধ)	,, খগেন্দ্রনাথ সেন	৫৭২
আমি কে (চিত্র)	শ্রীমতী জ্যোৎস্না লাহিড়ী	৫২৯
আরবের সত্য রক্ষা (কাহিনী)	এস, ওয়াজেদ আলি, বার-এ্যাট্-ল	৪৩২
আয়নার ইতিহাস (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়	২৫৪
আশুতোষের জন্ম দিনে (কবিতা)	,, কালীদাস রায়	২৭০
আঁধার রাতে একা পাগল ওকে যায় (চিত্র)	শ্রীমতী তিলোত্তমা মজুমদার	৬৯৮
ইচ্ছা (কবিতা)	শ্রীসুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	২৬৩
ইস্পাতের মানুষ (জীবনী)	,, সময় সরকার	৫৩৪
একটি যুদ্ধের গল্প (গল্প)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫৩
একটি উল্লেখযোগ্য হাউইএর কাহিনী	,, মানসী আচার্য্য	৪৬৩
একজামিনের হল-এ (কবিতা)	,, সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	৪১৫
একরত্তি ফুলের মেয়ে (রূপকথা)	,, মানসী আচার্য্য	১২৩
এক টুকরো ছবি (সচিত্র)	দিদি ভাই	১৮১
কবির একটি অপ্রকাশিত লিখন	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯৫
কবিদাদুর ছেলেবেলা	,, সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৭৬
কবি প্রশান্তি		২১৬
কবি প্রয়াণে (কবিতা	শ্রীসমর সরকার	৩৪০
কম্বলহীনা লোটা দিদি (গল্প)	,, জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	১০
কানামাছি ভোঁ ভোঁ (ছড়া)	,, সুধীর রঞ্জন খাস্তগীর	৬৯৭
ক্যাঙ্গারু শিকার (কাহিনী)	,, সমর সরকার	৩১
কালিপদ সাকার (কবিতা)	,, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়	১০৫
কিশোর বঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ	,, প্রফুল্ল কুমার সরকার	১৫৪
কিশোর কিশোরীর গান	,, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়	৬৯০
খেয়ালী রবীন (গল্প)	,, সুধীর চন্দ্র রায়	৪৭৯
খেলা ভুলানো যাদুকর	মৌমাছি	১৬৩
গম্বুজ সিং (ছড়া)	শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা	২৭৫
গান	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৫
গান	,, প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৫৮
গান্ধী মহারাজ (কবিতা)	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
গাঁট কাটা (গল্প)	,, ধীরেন্দ্র মল্লিক	২৭৮
গুপ্তধন (গল্প)	বন্দে আলি মিয়া	৩৮৭

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক
চল উধাও (কবিতা)	শ্রীবিমল দত্ত	৪০৪
চলন্তিকা (খবরাখবর)		৭২, ১৩৭, ২৩৬, ২৮[illegible], ৩৪৫, ৪৩৭, ৫০৩, ৫৪৩, ৫৯২, ৬[illegible], ৬৭৭, ৭২৩
চিঠির বাক্স	দিদি ভাই	৭৭, ১৪২, ২৯১, ৪৩[illegible], ৪৯৯, ৫৪৬, ৫৯৪, ৬৩৯, ৬[illegible]১, ৬৯৯, ৭২৪
ছবি (সচিত্র)	,, সুধীর রঞ্জন খাস্তগীর	৩৫৯
ছত্রোপাখ্যান (সচিত্র)	,, ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	১৫
ছিন্ন হস্ত (গল্প)	,, কিরণ চন্দ্র সেন	৬৬৭
ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	,, নরেন্দ্র দেব	১৬০
জননী জন্মভূমি (নাটক)	,, রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত	[illegible]৯, ২৭৭, ৩১৯
জন মিলটন (জীবনী)	,, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০৬
জয়ন্তি বাসরে (কবিতা)	,, কালীদাস রায়	১৫৩
জয়ন্তি উৎসব বিবরণী		২১১
জুম (গল্প)	,, বুদ্ধদেব বসু	৩৭৫
ট্যাঙ্কের জন্ম কথা (প্রবন্ধ)	,, ননী গোপাল চক্রবর্ত্তী	২৬১
ঠাকুর দাদার বিয়ে (কবিতা)	,, সমর সরকার	৫৮৬
ড্যালহাউসীর পথে (পথে প্রান্তরে)	,, সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১১১
তাইত (গল্প)	,, ইন্দিরা গুপ্ত	৬৫১
তিন কুড়ে (রূপকথা)	,, অনামি মিত্র	৬৫৩
তিনটি প্রশ্ন (গল্প)	,, বিমল বসু	৫৩৯
দরদী রবীন্দ্রনাথ	,, ইন্দিরা গুপ্ত	১৮৮
দস্যি মেয়ে (কবিতা)	,, সুধীর রঞ্জন খাস্তগীর	৫০৯
দিদিহারা (কবিতা)	,, কালীদাস রায়	৫৩৮
দিব্যজ্ঞান (গল্প)	বন্দে আলি মিয়া	৫৬৭
দীপালী (কবিতা)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৪৪৩
দুপুরিকা (কবিতা)	,, সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়	২৯
দুশ্চিন্তা (কবিতা)	,, বুদ্ধদেব বসু	২৩
দেশ (কবিতা)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২
নব বৈশাখ (কবিতা)	মহবুব	৩৬
নতুন প্রতিযোগিতা		৭৫, ৫৯৭
নূতন ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর		৭৫, ১৪৪, ২৩৮, ২৯৪, ৩৪৯, ৪৪[illegible], [illegible], ৫৫৬, ৫৯৮, ৬[illegible], ৬৮২
পশ্চিম ভারতে পাড়ি (পথে প্রান্তরে)	শ্রীধরণী সেন	৬৫[illegible]
পাগলা গারদ (গল্প)	,, জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬৬
পায়রা সৈন্য (বিচিত্রা)	,, ননী গোপাল চক্রবর্ত্তী	৩৭১
পিওন বুড়ো (কবিতা)	,, নারায়ণ দাস সান্যাল	২৫৯
পিঙ্গল ধরিত্রী (গল্প)	,, মিহির রায়	২৭১
পোল্যাণ্ডের একটি গ্রামের স্মৃতি (পথে প্রান্তরে)	,, অমল শঙ্কর রায়	২৫

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক
পুতুল খেলার বেলা (কবিতা)	শ্রীসতীকান্ত গুহ	৫৬৩
পৃথিবীর ছাদ ও কস্মিক রশ্মি (বিজ্ঞান)	শ্রীধর	৩৯২
পৃথিবীর শেষে (কবিতা)	,, সতীকান্ত গুহ	৪২২
প্রাচীন গৌড় ও রামকেলি উৎসব (পথে প্রান্তরে)	,, সুরুচি বালা সেনগুপ্তা	৩০৩
প্রাচীন যুগের আবিষ্কার (প্রবন্ধ)	,, মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়	৪০১, ৪৬১
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ (প্রবন্ধ)	ঐ	৬৩৩
প্রতিযোগিতায় ফলাফল		৭৫, ৫৫৫
প্রতিশোধ (কবিতা)	,, অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়	৫২৮
ফাদার পিটার গিলিগ্যান (কবিতা)	,, কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৪৮৬
ফুল বৌ (গল্প)	,, শামুক	৬৯১
বলি (গল্প)	,, রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৫৭৬
বসন্ত (কবিতা)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার	৬৮৩
বিভ্রাট (গল্প)	,, সুপ্রিয় দেব	১৮
বিজন ও বনবিলাস পাকড়াশী (গল্প)	,, শামুক	৯৯
বেঁটে ছাতাওয়ালী (কবিতা)	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৮
বৃহৎ ছাগনাদ্য যুদ্ধ (উপন্যাস)	,, শিবরাম চক্রবর্ত্তী	১১৫, ২২৫, ২৬৪, ৩৩৪, ৪১৭, ৪৭২, ৫২৪, ৫৮৭, ৬২৪, ৬৭১, ৭১০
বৈশাখী (কথানাট্য)	,, হেমেন্দ্রকুমার রায়	১
বৈশাখী উৎসব	,, রাধারাণী দেবী	১৭৫
বৌদ্ধযুগের গল্প সাহিত্য (সাহিত্য)	,, কালিদাস রায় কবিশেখর	৩৯৬
ভাগের ভাগ (কবিতা)	,, অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	৬১২
ভাই মণি (কবিতা)	,, কালি কিঙ্কর সেনগুপ্ত	৩০৯
ভাবী গৃহিণীর বৈঠক	,, ইন্দিরা দেবী	১৩৯, ৫০১
ভোমরাকে চেন কি (কবিতা)	,, কমল ঘোষ	৬০২
মরণিং স্কুল (গল্প)	,, ইন্দিরা দেবী	৫১৭
মহাবীরের পুঁথি (কথা)	,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫২, ৪৪৪, ৫১১, ৫৫৯, ৫৯৯, ৬৪৫, ৬৮৪
মানুষে মানুষ খায় (বিচিত্রা)	,, শামুক	৫০
মানুষের শত্রু (গল্প)	,, ঐ	৪৫১
ম্যাজিকের কারসাজি (বিচিত্রা)	যাদুকর শ্রীঅশোক সরকার	৬[illegible]১
মেরু জ্যোতিঃ (বিজ্ঞান)	,, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৬১০
যম ও সৈনিক গল্প)	,, ভাস্কর গুপ্ত	৩১০
যক্ষপতির রত্নপুরী (উপন্যাস)	,, হেমেন্দ্রকুমার রায়	৫৯, ১২৭, ২৩২, ২৮২, ৩৪১, ৪২৬, ৪৮৭, ৪৩৯, ৫৮১, ৬২৯, ৬৬২, ৭১৮
যাদুবিদ্যা (বিচিত্রা)	যাদুকর শ্রীঅশোক সরকার	৫২০
যেমনটি আমি দেখেছি (প্রবন্ধ)	,, বিমল বসু	২৭৬
রবীন্দ্রনাথ	,, জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	১৬৯
রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা	,, প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৫৮
রবীন্দ্রনাথ (কথা নাট্য)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১৪৬
রবীন্দ্রনাথের ছবি (সচিত্র)	,, শৈল চক্রবর্ত্তী	১৬১
রবীন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা)	,, গিরিজা কুমার বসু	১৮৯
রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন	,, আজত কুমার রায়	১৯১
রবীন্দ্র শ্রদ্ধা তর্পণঃ	,, হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৯৬
	দিদি ভাই গ্রাহক গ্রাহিকাবৃন্দ	২৯৮
	ধরণী সেন	

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক
রাজ বংশীয় মেয়ে (কবিতা)	,, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২৩০
রাতের বন (কবিতা)	কুমারী মমতা দাশগুপ্তা	৬৫৯
রিপোর্টার (গল্প)	,, রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩০৬
রেডিও (কবিতা)	,, নরেন্দ্র দেব	৩৯১
রুশীয় রূপকথা (রূপকথা)	,, ইন্দিরা দেবী	৬০৫
রূপনগরের কথা (কবিতা)	,, কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৪৮
রক্ত কমল (রূপকথা)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৮১, [illegible], ২৯৫
রংমশাল (কবিতা)	,, রাধারাণী দেবী	৩৯৫
রংমশাল বৈঠক :		
একজামিন	,, অমিয় কুমার ঘোষাল	৬৭৯
কোথাকার জল কোথায় গড়ায়	,, হরি ভূষণ মৈত্র	৭৬
খাপছাড়া	,, সত্যব্রত বসু	৩৪৭
চিঠি	,, চিন্ময় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৪০
চিঠি	,, রহিম খাতুন	১৪১
পুতুলের বিয়ে	,, কেয়া সেন	৩৪৮
পূজার ছুটী	,, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়	৫৫৪
পূজায় ভ্রমণ	,, দুর্গা সেন	৫৫২
পূজোর ছুটী	,, অমিয় কুমার ঘোষাল	৫৫০
পূজোর দিনগুলো	কুমারী বাসন্তি মুখার্জ্জি	৫৫২
পূজোর ছুটী প্রতিযোগিতার ফলাফল		৫৫৫
লীনু মাসির পুতুল মেয়ের বিয়ে (কবিতা)	শ্রীকমল ঘোষ	১২১
লাল ফৌজের রণসঙ্গীত (কবিতা)	,, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়	৬৬৭
শঙ্করের অসাধ্য নেই (গল্প)	,, শিবরাম চক্রবর্ত্তী	৭০২
শরৎ (কবিতা)	,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৬৫১
শরৎ (কবিতা)	,, কালিদাস রায়, বি, এ,	৩৭৪
শান্তির রাজ্যে অশান্তি	,, নরেন্দ্রনাথ বসু	১৭১
শিল্পী চূড়ামণি আণক (কাহিনী)		৬৮৮
শিশুদের রবীন্দ্রনাথ	,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫১
শিশু রবির প্রতি বাঙ্গালী শিশু-মহল	,, সুনির্ম্মল বসু	১৮৫
শিশুর সওয়াল (কবিতা)	,, পৃথ্বিনাথ রায়	৬৪৩
শীত বোধন (কবিতা)	,, প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়	৫৭১
শুভেচ্ছা (কবিতা)	,, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ	৪৫০
শেষ-প্রার্থনা (ইতিহাসের গল্প)	,, রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৪১৪
সঙ্কলন		১৯৭
সম্পাদকের লিখন	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়	৭০, [illegible], ২২৩, ২৮৯, ৪৩৩, ৪৪৮, ৫৪৮, [illegible], ৬৩৬, ৬৭৬
সম্ভাবনার জগৎ (প্রবন্ধ)	,, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৬৬
সরীসৃপের কথা (বিচিত্রা)	,, বিমল ঘোষ	৪৯৫, ৫১৩
সহরের ছেলে (কবিতা)	,, বিমল দত্ত	২৪৬
স্বর্গ ও মর্ত্ত (সচিত্র)	,, যামিনী কান্ত সেন	৬৮৩
সায়ামী (রূপকথা)	,, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০৬
সংলাপী রবীন্দ্রনাথ (স্মৃতিকথা)	,, হেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৫৫
হেগেনবেকদের এ্যাডভেঞ্চার (কাহিনী)	,, সুবল চন্দ্র ভড়	৫৬৪, ৬৪৮
	কালিদাস রায়	৪৭১

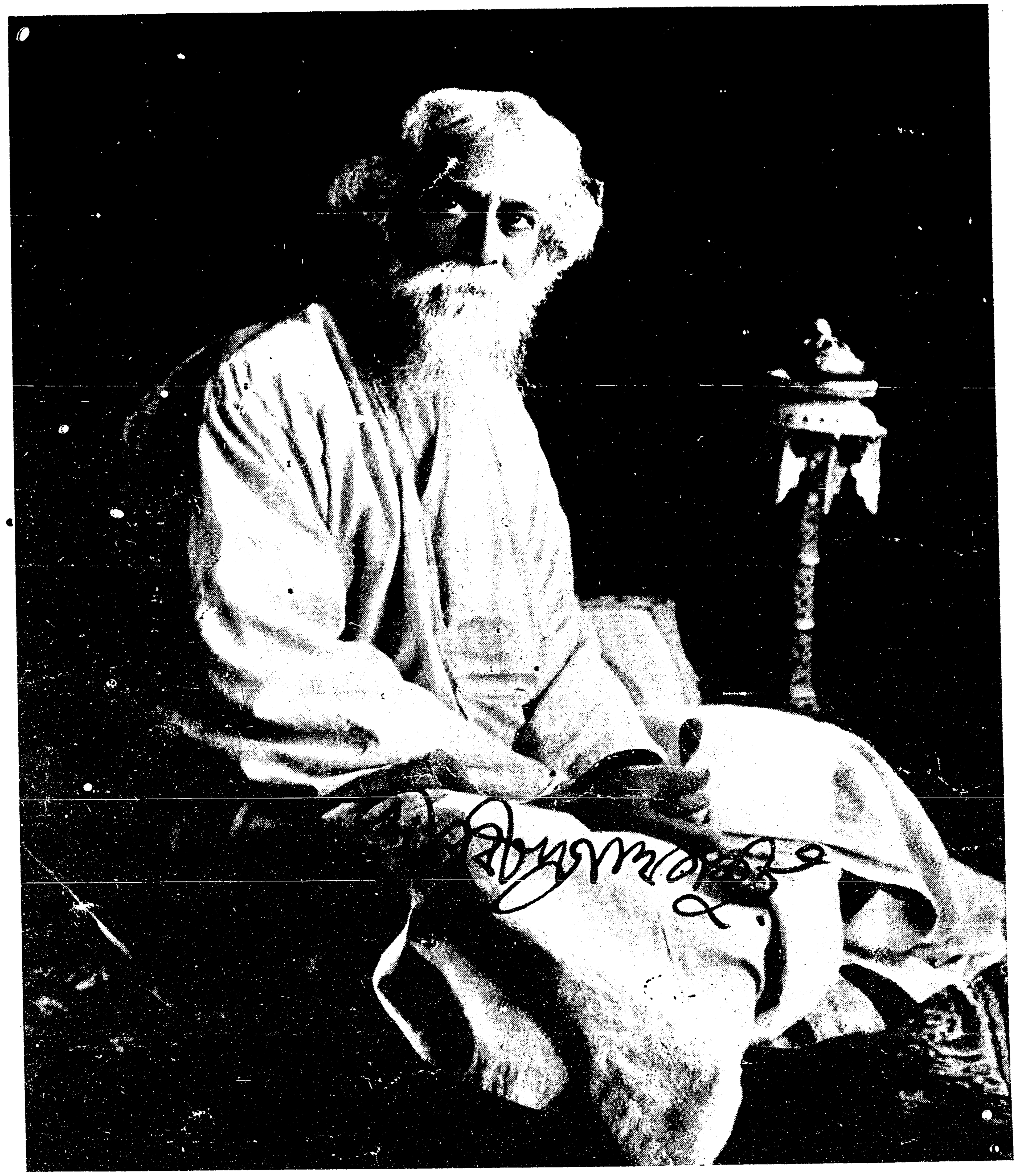

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নবপ্রাতে জাগে নূতন জনম লভি ॥

Engraved & Printed by Bharat Phototype Studio, Calcutta

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৪৮

বৈশাখী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কথানাট্য

(চৈত্রমাসের শেষদিন। বৈকাল। উপবনের ভিতরে ফুলকুমারীরা খেলা করছে।)

ফুলেরা। মঞ্জরী! ও আমের মঞ্জরী! আমরা সবাই খেলছি, তুমি এখনো নেমে এলেনা কেন ভাই?

আমের মঞ্জরী। না ভাই, আমার ভয় করছে!

ফুলেরা। ভয়! কিসের ভয় ভাই?

আমের মঞ্জরী। তোমরা হ'চ্ছ জুঁই বেলা গোলাপকলি, তোমরা সব মাথায় একরত্তি,—আমার মতন উঁচুতে উঠতে পারো না তো! আমি উঁচুতে আছি ব'লেই দেখতে পাচ্ছি, দূরের রোদে-পোড়া ধূ-ধূ বালি-মাঠ পেরিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে একটা থুথ্থুড়ো বুড়ো! আমি খেলা করি একেলে নতুনের আসরে, সেকেলে বুড়ো দেখলে আমার ভারি ভয় হয়!

গোলাপ। ওরে বেলা, আমের মঞ্জরী কি বলে শোন্ রে!

বেলা। মঞ্জরী বোধহয় আমাদের ঠাট্টা ক'রে ভয় দেখাচ্ছে। ঐ যে মৌমাছির গান শোনা যাচ্ছে! ও তো ঐদিক থেকেই আসছে, সত্যি-মিথ্যে ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্ না!

(গাইতে গাইতে মৌমাছির প্রবেশ)

গান

গুণ্-গুণ্ গুণ্-গুণ্ গান গেয়ে গুণ করি!
সুর শুনে নেচে দোলে জুঁই-বেলা-সুন্দরী।
আঁখি যবে ঘুম-ঘুম, গোলাপেরি কুঙ্কুম
মাখি আমি মনে মনে বনে বনে গুঞ্জরি।

কিগো জুঁই, ওদিকপানে অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছ কেন?

জুঁই। মঞ্জরী বললে, ওদিক থেকে একটা বিচ্ছিরি বুড়ো নাকি এদিকে আসছে?

বেলা। বুড়ো দেখলে মঞ্জরীর ভয় হয়।

মৌমাছি। আমি কারুকে ভয় করি না। আর আমি যতক্ষণ এখানে আছি, তোমাদেরও কুছ্ পরোয়া নেই! জানো তো, আমি খালি মধুই খাই না, হুলও ফোটাতে পারি!

ফুলেরা। (তা'হলে আমরা নাচি গাই খেলা করি?)

মৌমাছি। স্বচ্ছন্দে।

(ফুলেদের গান)

আমরা তাজা হাসির কুঁড়ি, জাগাই রঙের ছন্দ
অন্ধকারেও হয় না মোদের মনের দুয়ার বন্ধ।
রামধনুকের গান শিখে ভাই, ধূলোয় প্রাণের রং লিখে যাই,
চৈতী হাওয়ায় দি দুলিয়ে টাটকা সুরের গন্ধ!

আমের মঞ্জরী। ওরে, তোরা সব্বাই পালিয়ে যা রে! ঐ দ্যাখ্ সেই ছন্নছাড়া বুড়ো আসছে!

(এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। আঃ, তোমাদের কাছে এসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল! তোমাদের হাসি-গান শুনে বুঝছি, আমার যৌবনের পরমায়ু এখনো ফুরিয়ে যায় নি!

মৌমাছি। কে তুমি বেআক্কেলে বুড়ো, তুলোর মতন সাদা এক-মাথা পাকা চুল নিয়ে আমাদের এই কাঁচা কচির রাঙা আসর মাটি করতে এসেছ?

ফুলেরা। ও বুড়ো, খড়ের নুড়ো! তুমি এখান থেকে স'রে পড়, তোমাকে আমরা চিনি না!

বৃদ্ধ। সে কি খোকা-খুকীরা, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না? তোমাদের জন্ম যে আমার কোলেই!

মৌমাছি। মিছে কথা কোয়ো না বুড়ো, ধাঁ ক'রে এখুনি হুল ফুটিয়ে দেব! কাকের কোলে কখনো চন্দনা-পাখীর জন্ম হয়? ভালো চাও তো শীগ্‌গির তোমার নাম বল!

বৃদ্ধ। আমার নাম তেরো-শো সাতচল্লিশ।

মৌমাছি। ধেৎ, তেরো-শো সাতচল্লিশ কারুর আবার নাম হয় নাকি? যেমন চেহারা তেমনি নাম! আরে রামচন্দ্র!

বৃদ্ধ। আমি হচ্ছি পুরাতন বৎসর।

মৌমাছি। ও, তাই বল! কিন্তু আমাদের এই নূতনের খেলাঘরে পুরাতনের উৎপাত কেন? জানোনা, আজ বাদে কালই হবে নতুন বছরের পয়লা বৈশাখ?

বৃদ্ধ। জানি ভাই, সব জানি। যুগে যুগে বছরে বছরে দেখলুম কত ঋতুর উৎসব, গাইলুম কত নববর্ষের গান—কত নতুন হ'ল পুরাণো, কত পুরাণো হ'ল আন্‌কোরা নতুন! কত ফুল ফুটল, কত ফুল ঝরল—কত চাঁদ ডুবল, কত সূর্য্য উঠল! আমি সব জানি ভাই, আমি সব জানি।

জুঁই। ও ভাই বেলা, এ কি হ-য-ব-র-ল বলে রে?

বেলা। পাগল!

মৌমাছি। ওগো তেরো-শো সাতচল্লিশ মশাই, প্রলাপ শোনবার সময় আমাদের নেই। তোমার মৎলোবখানা খুলে বল দেখি, নইলে এই বার করলুম হুল!

বৃদ্ধ। বাপু, তুমি হচ্ছ মধু'র ব্যাপারী, কিন্তু তোমার কথাগুলির ভেতরে তো মধু'র ছিটে-ফোঁটাও নেই।

মৌমাছি। মধু আমি যেখানে-সেখানে ছড়াই না।

বৃদ্ধ। কিন্তু আমি যে তোমার কাছে এসেছি মধু চাইতেই!

মৌমাছি। খবর্দ্দার বুড়ো, মুখ সামলে কথা কও!

বৃদ্ধ। আর ওগো ফুলকুমারীরা, তোমাদের কাছে এসেছি, আমি আতর-মাখা রং চাইতে!

আমের মঞ্জরী। ও বেলা, জুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা! ও বুড়ো হচ্ছে ডাকাত, তোরা পালিয়ে আয়রে পালিয়ে আয়!

মৌমাছি। ওহে তেরো-শো সাতচল্লিশ! তুমি কি ভুলে গিয়েছ তেরো-শো আটচল্লিশ

TORN PAGE(S).

সাল এসে এখুনি তোমাকে জোরসে গলাধাক্কা দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শিঙে ফুঁকতে হবে ? মরতে বসেছ, এখনো মধু আর রঙের সখ ?

গোলাপ। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে! ইচ্ছে হচ্ছে দি ওর চোখ ছুটোতে পট্-পট্ ক'রে আমার কাঁটা ফুটিয়ে।

বৃদ্ধ। কাঁটা নয় গোলাপবালা, তোমার কাছে আমি চাই খালি রং আর গন্ধ আর কাঁচা তরুণতা।

মৌমাছি। মরবার আগে ভগবানের নাম কর বুড়ো, আর আমাদের জ্বালিও না।

বৃদ্ধ। কে বলে আমি মরব ? আমি অমর! এ পৃথিবীতে সবাই অমর!

মৌমাছি। সবাই অমর ? ঐ যে গোলাপবালা তোমার পাগলামি দেখে ফিক্-ফিক্ ক'রে হেসেই সারা হচ্ছে, ছুদিন পরে ও যখন ঝ'রে যাবে তখন কি হবে ?

বৃদ্ধ। ঝ'রে আবার নতুন রূপে ফুটে উঠবে। ঝরা ফুলের ভিতরেই যে থাকে নতুন ফুলের বীজ! মরণ হচ্ছে খালি পুরাণো পোষাক ছাড়া। এ পৃথিবীতে কেউ মরে না— পুরাতনই ফিরে আসে এখানে নূতন রূপে।

ফুলেরা। (সাগ্রহে) তাই নাকি—তাই নাকি ?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ গো খোকা-খুকীরা, হ্যাঁ। যার বুকে থাকে শক্তি, প্রাণে থাকে মধু, চোখে থাকে রং আর কাণে থাকে গান, ছুনিয়ায় পুরাণো হ'লেও বুড়ো হ'লেও কেউ তাকে মারতে পারে না।

মৌমাছি। ওহে তেরো-শো সাতচল্লিশ, সেই জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে মধু আর রং ভিক্ষা করতে এসেছ ?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ ভাই। আমার যত মধু আর রং ছিল সব বিলিয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে। তাই তো আজ আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। আর তাই তো এসেছি তোমাদের কাছে! এখন পেয়েছি আমি টাটকা মধু আর আতর-মাখা নতুন রং!

মৌমাছি। কিন্তু রং আর মধু যেন পেয়েছ, তোমাকে শক্তি দেবে কে ? তরুণ করবে কে ?

বৃদ্ধ। শক্তি ? আমাকে শক্তি দেবে, নতুন করবে কালবৈশাখী।

মৌমাছি। (সভয়ে) কালবৈশাখী ? ও বাবা, সে যে ভয়ানক! সে যে ধ্বংস করে!

বৃদ্ধ। না ভাই, সে ভয়ানক নয়। পুরাতনকে মুছে দিয়ে সাজায় সে নূতনের আসর। সে হচ্ছে জীর্ণতার শত্রু, যৌবনের দূত। তোমরা যদি চিরনূতন হ'তে চাও, তবে গাও সবাই কালবৈশাখীর গান!

বেলা। আমরা শিখেছি কেবল হাল্কা বসন্তের সুর, কালবৈশাখীর গান গাইব কেমন ক'রে ?

মৌমাছি। আমি যে মৌমাছি, ফুল-ফোটানোর গান ছাড়া তো আর কোন গান জানি না!

বৃদ্ধ। আচ্ছা, তবে তোমরা সবাই আমার সঙ্গেই গান ধর।

(সকলের গান)

জাগো জাগো কালবৈশাখী!
আর থেকনা সুপ্ত হে!
ঝড়-তুরঙ্গ ক্ষেপিয়ে কর
জীর্ণ জরায় লুপ্ত হে!
বজ্র-আগুন-জালা' পথে
বন্ধু, এস মেঘের রথে,
পুরাতনের শিকল থেকে
চিত্ত কর মুক্ত হে!

আমের মঞ্জরী। (সভয়ে চেঁচিয়ে) ওরে, ওরে, সর্ব্বনাশ হ'ল রে! শীগ্গির ও-গান বন্ধ কর্!

ফুলেরা। কেন মঞ্জরী, কি হয়েছে ?

আমের মঞ্জরী। চেয়ে দেখ আকাশের দিকে।

মৌমাছি। (সভয়ে) তাই তো, আকাশ-ভরা ঘোর আঁধি! ছুটে আসছে কালো মেঘের দল!

আমের মঞ্জরী। (সভয়ে) দূরে ঝোড়ো হাওয়ায় তালগাছগুলো দুলছে টল্‌মল্ ক'রে। আর আমার রক্ষে নেই!

ফুলেরা। (সভয়ে) ওরে, পালিয়ে আয়রে, পালিয়ে আয়!

(দূরে জাগল ঝড়ের কোলাহল)

বৃদ্ধ। (উচ্ছ্বসিত স্বরে) এস তুমি কালবৈশাখী! তোমার পাগল ঝড়ের ঝটকায় জীর্ণ পাতার সঙ্গে উড়ে যাক্ আমার মাথার পাকা চুলগুলো! তোমার বজ্র এনে দিক্ আমার প্রাণে নতুন শক্তি! তোমার বিদ্যুৎ জ্বালুক্ আমার চোখে যৌবনের শিখা! এস বন্ধু, এগিয়ে এস, বদলে দিয়ে নতুন কর পুরাতনকে!

(ঝড় ও বজ্রের গর্জ্জন ক্রমে বেড়ে উঠল—)

... ...

[পরদিনের প্রভাতকাল]

(ঝড় থেমে গেছে। গাছে গাছে পাখীরা গাইছে শান্ত প্রভাতের কলগীতি।)

মৌমাছি এসে ডাকলে ঃ ও মঞ্জরী! ও ফুলকুমারীরা! বলি, খবর কি ?

মঞ্জরী ও ফুলেরা। আর খবর! ঝড়ে উড়ে যাইনি, এই ঢের!

মৌমাছি। যা বলেছ! আজ যে এই নতুন বছরের প্রথম প্রভাতকে দেখব, সে আশাই ছিল না!

মঞ্জরী। কি সুন্দর প্রভাত! কালকের ঝড় পৃথিবীর সব মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। সারা বনে একটিও ঝরা ফুল শুকনো পাতা নেই—কচি সবুজের উপরে খেলা করছে কাঁচা রোদের সোনা!

মৌমাছি। কিন্তু এদিকে ও কে আসছে বল দেখি ?

ফুলেরা। (মুগ্ধ স্বরে) কি চমৎকার ওকে দেখতে!

মৌমাছি। মাথায় তোমার রঙিন-ফুলের মুকুট, কপালে তোমার রক্তচন্দনের লেখা, চোখে তোমার নতুন আশার আলো, মুখে তোমার মিষ্টি হাসির ঝরণা—তুমি কে ভাই, তোমার নাম কি ?

আগন্তুক। আমার নাম তেরো-শো আটচল্লিশ।

মৌমাছি। ও, তাই বুঝি বুড়ো তেরো-শো সাতচল্লিশকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? তুমি এসে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি ?

আগন্তুক। না।

মৌমাছি। তা'হলে সে কালকের ঝড়ে উড়ে গেছে!

আমের মঞ্জরী। বাঁচা গেছে। কি কদাকার তার চেহারা, আর কী তার জাঁক! বলে কিনা—'আমি কখনো মরব না!'

আগন্তুক। না মঞ্জরী, সে তো মরেনি! সে তো রয়েছে তোমাদের সামনেই!

আমের মঞ্জরী। কৈ, দেখতে পাচ্ছি না তো!

আগন্তুক। এই যে, আমি। কাল যে আমারই নাম ছিল তেরো-শো সাতচল্লিশ!

সকলে। (সবিস্ময়ে) তুমি!

আগন্তুক। হ্যাঁ, আমি। কেন ভাই, তোমরা কি এরি-মধ্যে ভুলে গেলে, তোমাদেরই

কাছে এসে পেয়েছি আমি প্রাণের মধু, জীবনের রং ? বজ্র দিয়েছে আমাকে যৌবনের শক্তি আর কালবৈশাখী উড়িয়ে দিয়েছে আমার জরার জীর্ণতা।

মৌমাছি। এ যে অবাক কাণ্ড!

আগন্তুক। আমি যে চির-পুরাতন, আমি যে চির-নূতন! আমি কখনো মরিনি, আমি কখনো মরব না! তাই তো লোকে যখন নববর্ষ ব'লে আমাকে নতুন ভাবে অভ্যর্থনা করে, আমি তখন মনে-মনে হাসতে থাকি! তারা জানেনা আমি হচ্ছি পুরাতনেরই রূপান্তর!

মৌমাছি। এস মঞ্জরী, এস ফুলকুমারীরা! তাহ'লে আমরাও আজ চিরনূতন চিরপুরাতনের গান গাই—

(সকলের গান)

চির-নবীন হে, চির-পুরাতন!
এস হে বন্ধু, এস এস।
বৈশাখে গেয়ে চৈতালী গীতি
সুখে-দুখে বুকে হেসো হেসো।
যে-ফুল ঝরালে গতবসন্ত
তারি কুঁড়ি এনে কর ফুল্লন্ত!
অতীতকে এনে নূতনের কোলে
পুলক-সায়রে ভেসো ভেসো।
মরণে দোলাও জীবনের দোলা—
গৌরীর সাথে খেলে যেন ভোলা!
নৃত্যের তালে নাচিয়ে ধরণী
ভালোবেসো বঁধু, ভালোবেসো।

দেশ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

দেশ চায় তার কিশোর
স্বপ্নে মাখা হবে,
নীল সায়রের পারের
গহন অন্ধকারে
বাঁশী তাহার বাজছে বারে বারে
দুরন্ত গৌরবে !

দেশ চায় তার কিশোর
মাটীর পথে পথে
ধূলিতলের মায়ায়
লুটিয়ে দিবে কায়া
জ্যোৎস্না রোদে যেথায় অমল ছায়া,
চাইবে সবল হতে !

দেশ চায় তার কিশোর
মাঠ পাহাড়ে বনে
ঝর্ণা নদীর ধারায়
হবে আপন হারা
ধূসর ঢেউয়ের সবুজ হার তা'রা
গাঁথবে পরম মনে !

দেশ চায় তার কিশোর
কুটীর অট্টালিকায়
জাগবে শ্রমিক চাষীর
দুঃখদিনের হাসি
ধনীর অমল ইতিহাসের রাশি
সদ্য নূতন শিখা !

দেশ চায় তার কিশোর
অসীম আলো বুকে
জানবে কচি প্রাণের
দারুণ সন্ধানে
সৃষ্টির কি কথাটি কোন্‌খানে
পিছনে সম্মুখে ।

দেশ চায় তার কিশোর
দেশের ছেলেই হবে
লক্ষ অমর বীরের
স্মৃতিরাশি ঘিরে
নিখিল সভাতে
নমবে জননীরে
অরুণ উৎসবে !

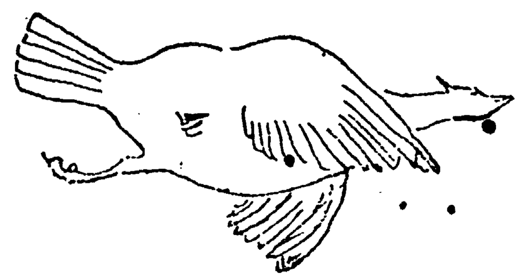

কম্বলহীনা লোটাদিদি

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

স্কুলের উপর ক্লাসে সিঙ্গাপুরের ওদিক থেকে একটি নূতন মেয়ে এসে ভর্ত্তি হ'ল। সে বোর্ডিংএই থাক্‌বে। মস্ত বড় মেয়ে—পায়ে হাই হিল তোলা জুতো। চওড়া সিল্কের রিবন বাঁধা এলোচুলে। সিল্কের ফ্রক পরে ছিপছিপে দেহখানি নিয়ে এসে দাঁড়াল। প্রথম দিনই সে সুবালাদিকে বল্লে, "আপনাডের এই বোর্ডিংটা একটু ঘুরে ডেকটে পারি?" সুবালাদি ভড়্‌কে গিয়ে ধমক না দিয়ে নূতন টীচার অপর্ণাদিকে ডেকে বল্লেন, "এঁকে একটু বোর্ডিংটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস তো।" অপর্ণাদি বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েছিলেন, তিনি ওকে নিয়ে ডর্মিটারী, ড্রেসিংরুম, রান্নাঘর, খাবার ঘর সমস্ত দেখিয়ে স্নানের ঘর ইত্যাদি সবই দেখাতে নিয়ে গেলেন। ও তখন বল্লে, "না-না, থাক—অত খুঁটিনাটি দেখে কি করব?" অপর্ণাদি অতি মিষ্টি করে বল্লেন, "তুমি পড়্‌বে এই স্কুলে, থাকবে এই বোর্ডিং-এ—সব ভাল করে পরখ করে দেখে নেবে তো? অপছন্দ হলে পরের জাহাজে ফিরে যেতেও তো পার?"

মুকুল ওদের পিছু নিয়েছিল; সে-ই সব কথা শোনে আর সাড়ম্বরে সবাইকে বলে, "বাবা! অপর্ণাদির মধুঢালা গলা শুনেই বুঝেছি গতিক ভাল নয়, কিন্তু ওই মেয়েটা, ভাই, কিচ্ছুই বুঝলো না, এমন বোকা! বরং ন্যাকা ন্যাকা মুখ করে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্লে—'তা বটে, কিন্তু আমার তো এখন যাওয়া হবে না—আমার ড্যাডি ডার্লিং তো আমার কাছে টাকা দেন নি—আপনাদের প্রিন্সিপ্যালের কাছে দিয়েছেন—সেই তো মুস্কিল।' অপর্ণাদি বল্লেন, 'তা স্কুল বা বোর্ডিং অপছন্দ হলে কেব্‌ল (cable) করবে—তা পার না?' মেয়েটী এবার ভড়্‌কে গিয়ে বল্‌ল, 'না-না, আমার পছন্দ হয়েছে বৈ কি।' আর তারপরেই একটু সরে পড়ে বল্ল, 'আমি এখন একটু ক্লাশের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করি গিয়ে—কিছু মনে করবেন না।' আমি ভেবেছিলাম অপর্ণাদি বুঝি ওকে খামচে ধরে থাক্‌বেন আর বল্‌বেন, "না-না, তা হবে না, তোমায় চেয়ারে বেঞ্চে বসে, বিছানায় শুয়ে দেখ্‌তে হবে ওসব তোমার পছন্দসই কি না", কিন্তু উনি তা না করে শুধু ওর পিছনে চেয়ে খুব আস্তে বল্লেন, 'ফাজিল মেয়ে

কোথাকার। তোমায় যদি মেয়েরা নাকানি চোবানি না খাওয়ায় তো কি বলেছি!' ও, ভাই, এমন আকাট মুখ্যু যে বল্লে, 'আমায় কিছু বল্‌ছেন কি?' অপর্ণাদি একটু হেসে বল্লেন, 'নাঃ, তুমি যেতে পার।' আমিও অমনি সট্‌কান দিলুম।"

মেয়েটী নাম বল্লে সার্লট্টা বস্‌চ বানান করে বল্লে C-h-a-r-l-o-t-t-a B-o-s-c-h-c. টপ্‌সী বল্লে, 'আপনি কি জাত?' সার্লট্টা নাক তুলে বল্লে, "মানে? আমি জাত মানি না, জান? টপ্‌সী বল্লে, "জানতুম না; এখন জানলুম, তবে আমি জাত মানে 'কাষ্ট' বল্‌ছি না, 'রেস' বল্‌ছি।"

"ওঃ—আমি বেঙ্গলী, দো আই হেট দি বেঙ্গলীজ্‌।" "আহা, কি দুঃখ আপনার। মনে মনে বুঝি বলেন হে মা ধরিত্রী দ্বিধা—" মণিকাদি টপ্‌সীর বেণীটা ধরে জোরসে এক নাড়া দিয়ে বল্লেন, "কি হচ্ছেরে দুষ্টু! নতুন বেচারীকে নিয়ে এর মধ্যেই পড়্‌লি? একটু জিরোতেই দে, টপ্‌সী।" "ওর নাম বুঝি টপ্‌সী—আঙ্কল টম্‌স কেবিনের নাকি!" টপ্‌সী বল্লে, "না-না আঙ্কল টমও নয় শ্যামও নয়—মাদার্‌-বেঙ্গলের টপ্‌সী। ইউ সি, আই সিম্‌প্লি লাভ দি বেঙ্গলীজ্‌।" সার্লট্টা টপ্‌সীর দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল। আর মণিকা বল্‌ল, "তোমার নাম কি?" মণিকাদি বল্ল, "আমরা তোমারই ক্লাশের মেয়ে, আমার নাম মণিকা, এই প্রণতি, এই অনু, এই অণিমা, এই রমা, এই শোভনা। কিরণ, মিনু, জ্যোৎস্না, সুধা, ইভা, বেলা, মাধুরী—এরা আমাদের উপর ক্লাসে পড়ে।"

সার্লট্টা বল্ল, "আমার, ভাই, মুখে বাংলা নাম আসে না, দে সাউণ্ড সো ফানি। তোমার নামটি, ভাই, বেশ মো-নি-কা—একে ভাই আমি নিটা বল্‌ব, তোমাকে অ্যানি, তোমাকে অ্যানিমা, তোমাকে রোমা আর তোমাকে ভ্যান্না।"

মুকুল হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠে সোণার গায়ে গড়িয়ে পড়ে বল্‌ল, "আর একে কি বল্‌বে—এর নাম সোণা, আমার নাম মুকুল, এ হচ্ছে কনু, এ বিনু, এই টুসি, এই পিকো, টুলি, মঞ্জু, শতন।

"আঃ, আঃ একসঙ্গে অত নাম মনে রাখতে পারব না। একে সোণিয়া (So-n-i-a) বল্‌ব আর ওকে বল্‌ব কনি Connie. আর তোমায় মেগ বলে ডাক্‌ব আর ওকে পেগি!"

শতন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্ল, "আমার নাম শতন, তাই বলে তুমি আমায় S-a-t-a-n বলে ডেকো না যেন, আমি নিতান্তই বাংলা শতন, ভাল নাম শতদল বুঝলে?" সার্লট্টা বল্ল, "হ্যাঁ, তোমাকে আমি ডালিয়া বলে ডাকব দুই-ই তো ফুল।"

কে যেন পিছন থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বল্ল, "তবে তোমার মত "ফুল" নয় এই যা ভাগ্যি।"

জ্যোৎস্নাদিকে ও জয়েস বলে ডাকবে বলায় তার হয়েছে রাগ। সে দুষ্টু কটাকে ডেকে নিয়ে বল্ল, "তোরা ওকে সহ্য কর্‌চিস কি করে বুঝছি না। জব্দ করতে পারিস না?"

টপ্‌সী বল্ল, "তুমিই তো পার, জ্যোৎস্নাদি ; ওর চাল্লুস পানা তোমরাই ভাঙতে পার, আমরা তো ছোট মেয়ে। বকুনী খেয়ে মর্‌ব খালি।"

জ্যোস্নাদি বল্লে, "কি কর্‌তে হবে আমাকে তাই শুনি। তোমাদের মত শয়তানী বুদ্ধি তো আমার নেই।"

"এই আর কি! জান তো স্নুবালাদি হ্যাণ্ডসেক ইত্যাদি মোটেই পছন্দ করেন না ; ওকে বল না এখানকার নিয়ম রাত্রে শোবার আগে স্নুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গুড-নাইট উইশ করবার সময় প্রণাম কর্‌তে হয় ; ও নিশ্চয় প্রণাম কর্‌তে রাজী হবে না বল্‌বে ডার্টি নেটিভ হ্যাবিট ; তখন তুমি বোলো তুমি ভাই হ্যাণ্ডশেক কোরো। ও যা বোকা ও তাই-ই কর্‌তে যাবে এবং বুঝতেই পার্‌ছ কি হবে ?"

জ্যোৎস্নাদি বল্ল, "ঠিক! ঠিক।"

সেদিন বিকালবেলা খাবার টেবিলে বসতে গিয়ে টপ্‌সী অত্যন্ত কাঁচুমাচু মুখ করে বল্‌ল, "অপর্ণাদি, আমি কি যায়গা বদ্‌লে ওঁদিকে গিয়ে বস্‌তে পারি ?"

অপর্ণাদি বল্লেন, "কেন ? এ যায়গাটায় কি হোলো ?" টপ্‌সী অনিমাদিকে দেখিয়ে অত্যন্ত কাতর স্নুরে বল্ল, "ওকে সামনে রেখে আমি খেতে বস্‌তে পার্‌ব না, অপর্ণাদি, আমায় মাপ কর্‌তে হবে সবাইকে ?"

অনিমাদি তো চটে লাল হয়ে উঠ্‌লেন, "কেন ? আমি কিসে অচ্ছুৎ, অজাত হলাম শুনি ?"

টপ্‌সী বল্ল, "আহা, না না। আপনি তা হবেন কেন ? কিন্তু আপনাদের নতুন বন্ধুটীকে আজ আপনাকে নতুন নাম দিয়েছেন—ঐ নামটা খেতে বসে আমি বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না। ঐ কথাটা কি খেতে বসে মনে করা যায়,—বড্ড বিশ্রী লাগে যে—আমি কি কর্ব্ব, বলুন ?" অপর্ণাদি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি নাম হয়েছে তোমার অনিমা ?

অনিমাদি রেগে বল্লেন, "ঐ বাঁদরীটাই বলুক !"

টপ্‌সী কাঁদ কাঁদ মুখ করে "এনিমা" বলেই ছুট দিল।

অনিমাদি ওকে ছুটে গিয়ে ধরে এনে বল্লেন, "দেখছেন অপর্ণাদি, কি দুষ্টু ও! বুঝছেন তো কাকে ও জ্বালাচ্ছে। আমার পাশেই ওকে বস্‌তে হবে। আমার নাম কখ্‌খনো ওরকম বিশ্রী হয়নি—বানাচ্ছিস কেন বল্‌তো তুই ?"

পিকো বল্লে, "আহা! তা না হলেও যা বলা হলেছে তাতে বোটকা বোটকা গন্ধ লাগে। তোমায় যেন বাঘ, ভাল্লুক কিম্বা নিতান্ত নিরীহ হলে ছাগল ছানা বলে আদর করা হচ্ছে।"

সার্লট্টা তখন অস্থির হয়ে উঠেছে, সে বল্ল, "আই এ্যাম সরি, অ্যানিমা ইফ—"

অনিমাদি এক ধমক দিয়ে বল্লেন, "আরে রাখ তোমার 'সরি'। বাংলা করে আমায় নাম অনিমা বল্‌তে পার তো বল, নৈলে আমার নাম বেঁকিয়ে তুমি ডেকো না।"

"আমি—আমি বাংলা ভাল উচ্চারণ কর্‌তে পারি না তাই! কিন্তু জন্তু জানোয়ারের ছানা তো আমি তোমায় বলিনি!

"কচি খুকী তুমি বাংলা বল্‌তে পার না, মানেও বোঝো না যাও! A-n-i-m-a-l-এর 'এল'টি ছেড়ে দিয়ে নাম কর্‌ছ আর জন্তু জানোয়ার বানাও নি। ঐ বিচ্ছুদের দলটিকে এখনো চেনো নি তো। তোমার কপালে আছে অনেক কিছু।"

সার্লট্টা বিমর্ষ মুখ করে বল্‌ল, "কিন্তু আমি ভাই তোমাকে ইনসাল্ট করবার জন্য বা ইনসাল্‌টেড হবার জন্য কিছু করিনি।"—"না, না, আমিও তা ভাবি নি। তোমার উপর আমার কোনও রাগ নেই। তোমাকে আমরা বরং পিটি-ই কর্‌ছি।"

"পিটি ?—পিটি! কেন ? কেন ?"

নতিদি বল্লেন, "এখন খাও। ঢের হয়েছে এ আলোচনা। এখ্‌খুনি খাবে বকুনি টিচারদের কাছে। আর ইভাদি বল্লেন, "থাক কিছুদিন, বুঝবে, কেন পিটি কর্‌ছি সবাই।"

রাত্তির বেলা জ্যোৎস্নাদি সার্লট্টাকে ডেকে নিয়ে টপ্‌সীদের পরামর্শ মত খুব তালিম দিল। সে বেচারা গট গট করে স্নুবালাদির দরজায় গিয়ে হাজির, "আস্‌তে পারি ?"

স্নুবালাদি টেবিলের কাছে বসে অপর্ণাদির সঙ্গে কি যেন কাজ কর্‌ছিলেন। সার্লট্টা একেবারে সোজা গিয়েই হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতখানা ধর্‌তে যেই যাবে, অমনি স্নুবালাদি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "ওকি! একি ঢং! হাত বাড়াচ্ছ যে! কি চাও ?"

"আমি গুড্‌ নাইট বল্‌তে এসেছি।"

স্নুবালাদি নরম হয়ে বল্লেন, "ওঃ গুড্‌ নাইট !"

সার্লট্টা আহতভাবে বল্ল, "আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক আপনি কর্‌বেন না তা হলে ?'

"হ্যাণ্ডশেক ? কেন ?"

"ওকি! একি ঢং! হাত বাড়াচ্ছ যে!"

"আমি কি না প্রণাম করতে জানি না, শিখিনি। তা ছাড়া ও জিনিসটা—"

"প্রণামই বা করতে বলেছে কে তোমায়? আমি কি ডেকেছি, সেধে প্রণাম চেয়েছি? তুমি তো অত্যন্ত ডেঁপো হয়েছ দেখ্‌ছি। এ কি আস্পর্দ্ধা!"

সার্লট্টা কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌ল, "কিন্তু সবাই তো প্রণাম করে! তাই আমিও এসেছিলাম, নতুন মেয়ে, জানি না—জীবনে কখনও প্রণাম করিনি"—

সুবালাদি বিরক্ত হয়েই ছিলেন, কাজেই নরম না হয়েই বল্লেন, "তুমি কি একেবারে ন্যাকাবোকা নাকি! সবাই প্রণাম করে!! রোজ রাত্তিরে পঁয়ষট্টিটি মেয়ের প্রণাম নিতে হলে তো গিয়েছিলাম! যাও, এখন শুতে যাও। আর ন্যাকামি করতে হবে না। ঢের দেখ্‌লাম!"

অপর্ণাদি একটু হেসে বল্লেন, "ওর দোষ নেই কিন্তু, ওকে মেয়েরা শক্ত করছে আর কি! এ হ'ল দুষ্টুদের কুস্তীর প্যাঁচ!—তুমি যাও, সার্লট্টা। তোমাকে ওরা বোকা বানাচ্ছে।"

সুবালাদি বল্লেন, "চাল দেখাতে যাও কেন? তাই শায়েস্তা হ'তে হচ্ছে।"

সার্লট্টা আস্তে আস্তে ফিরে এল। শতন, বিলু, মঞ্জু—ওরা সব করাইডরে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে একজন গান জুড়্‌ল—

"কেন মুখ মলিন—"

মুকুল ছুটে এসে বল্ল, "থাম! থাম! শেষকালে কম্বল নিয়ে লোটাদি আমাদের কি বিবাগিনী হয়ে যাবেন তোদের জ্বালায়!"

ইভাদি এসে সার্লট্টার হাত ধরে নিয়ে গেলেন, বল্লেন, "আহা, বেচারী! নতুন মেয়ে! মন খারাপ করছে বাড়ীর জন্য! চল ভাই আমরা গল্প করি গে—যতক্ষণ না বেল্ পড়ে!"

সার্লট্টা কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "তোমরা কি আমায় স্কুলে থাকতে দেবে না? আমি কি বিবাগী হয়ে যাব?"

নানারকম রাগ (Rugs) তার থাকা সত্ত্বেও ছোটদের মহলে সেই থেকে সার্লট্টার নাম হ'ল কম্বলহীনা লোটা। দিদি শুধু টপ্‌সী তাকে জ্বালাতন করবার জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক, "চারুদি" বলে ডাকৃত—যদিও সাড়া খুব কমই পেতো।

মেয়েরা জিজ্ঞাসা করলে টপ্‌সী বলেছিল সার্লট্টা বস্‌চ্ হচ্ছে চারুলতা বসুর ফেরঙ্গ সংস্করণ।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর উপন্যাস
● বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ ●
আগামী মাস থেকে বেরুবে।

ছত্রোপাখ্যান

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

আমি ছত্র—প্রচলিত কথায় তোমরা যাকে 'ছাতি' বল। আমি নিজেই আমার উপাখ্যান বলিব, তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

খোকাবাবুর ছত্র

অমনি তোমরা উপহাস করিতেছ?—কেন, নল রাজার উপাখ্যান হইতে পারে, শ্রীবৎসের উপাখ্যান হইতে পারে—এমন কি গুহক চণ্ডালের পর্য্যন্ত উপাখ্যান হইতে পারে, কেবল আমার উপাখ্যানের বেলাতেই যত উপেক্ষা!

আমি কোনও কথা বলিতাম না; কিন্তু যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে প্রকৃত গুণীর আদর আর নাই! এই জন্য নিজেকেই নিজের ঢাক পিটাইয়া জাহির করিতে হইবে।

কোন কোন ব্যক্তি আমাকে 'ছাতা' বলিয়া থাকে, ইহাতে আমার আপত্তি আছে। পচা কোনও জিনিষেই ছাতা ধরে। আমি কি পচিয়া গিয়াছি?

আমার বংশ পরিচয়? বেশ বলিতেছি। আমি ব্রহ্মাবতংস অর্থাৎ আদি দেবতা ব্রহ্মা হইতেই আমি উদ্ভূত হইয়াছি। ব্রহ্মার এক হাতে 'ছত্র' আছে, দেখিও। আমার রূপ পরিকল্পনা কে করিল তাহাও বলিতেছি। ক্ষুদ্র আদর্শ হইতে আমার জন্ম নয়। অসীম নীলাকাশের আকৃতি হইতেই শিল্পী আমার রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন।

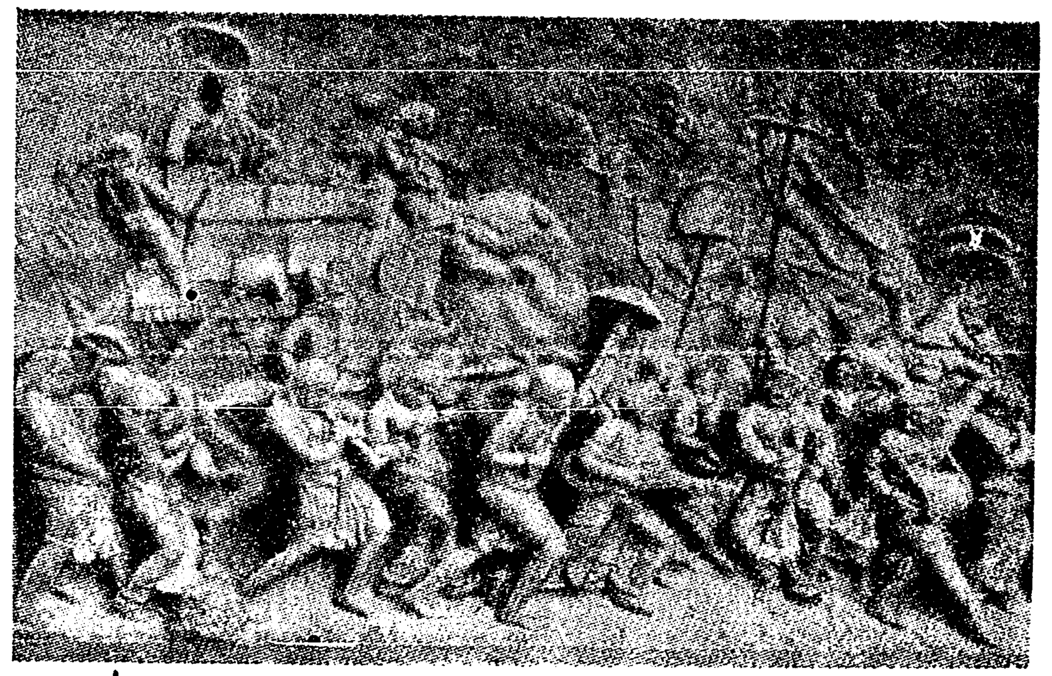

পৌরাণিক শোভাযাত্রা
রাজার মাথায় রাজ-ছত্র

আমার বয়স? তোমাদের মুখে একথা শুনিলেও হাসি পায়। তোমাদের বয়স কত? তোমাদের ইতিহাসের বয়স? সেই ইতিহাসই যখন লেখা হয়নি তখন হইতেই আমার আবির্ভাব। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাথরের গায়ে লোকে আমাকে খুদিয়া রাখিত।

মহাভারতে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু উপলক্ষ্যে বর্ণিত আছে যে, শ্বেত বর্ণের সুরঞ্জিত ছত্র সেই মৃত রাজার শব-দেহের উপর ধরা হইয়াছিল। রামায়ণেও সীতার উক্তিতে ছত্রের কথা বর্ণিত দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রেও রাজা ত্রিবিক্রম সেনের গল্পে আমার কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে। সোমদেব প্রণীত 'কথা সরিৎ সাগরে' আমাকে পাইবে। শকুন্তলায়ও দুষ্মন্তের 'রাজ্যংস্বহস্তধৃত দণ্ডমিব আতপত্রম' কথায় আমাকে দেখা যায়।

বৈদিক ভারতে 'ছত্র'কে খুব সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। তারপর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেও ইহার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সময়কার অনেক মন্দির ও 'বিহার' এর চূড়া ছত্রাকারে তৈরী হইত। এলাহাবাদের ওদিকে এইরূপ মন্দিরের নিদর্শন আজও সুন্দররূপে বর্ত্তমান আছে। বর্ম্মার 'প্যাগোডা' ছত্রাকারেই তৈরী।

এইরূপে দেবতার মাথা হইতে মর্ত্তের দেবতা রাজার মাথায় নামিয়া আসিলাম আমি। 'ছত্রপতি' বলিতে তখন রাজাকেই বুঝাইত এবং রাজার মাথায় 'ছত্র' ধরা হইত। সিংহাসন, মুকুট, তরবারি, দণ্ড প্রভৃতি রাজ-চিহ্নের মধ্যে ছত্রও অন্যতম। কৌটিল্য লিখিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে রাজ-সভার বর্ণনায় রাজার মাথায় ছত্র ধরিবার আড়ম্বরের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে। অশোকের সময়েও ছত্র-চিহ্ন রাজা ও রাজ-শক্তির পরিচায়ক ছিল।

হস্তী-পৃষ্ঠে রাজা—মাথায় রাজ-ছত্র

তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তি হ্রাস এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান। ছত্র কিন্তু তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারায় নাই। উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধন যখন আধিপত্য বিস্তার করিলেন তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল,—সমস্ত খণ্ড রাজ্যগুলিকে 'এক ছত্র তলে' আনা।

তারপর মুসলমান যুগ। ভারতীয় কৃষ্টির বিরুদ্ধে কোন কোন বিষয়ে ইহাদের উল্টো ব্যবস্থা থাকিলেও, ছত্রকে ইঁহারা সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছেন। মোগল যুগের শেষ বিখ্যাত সম্রাট ঔরংজীবের দাক্ষিণাত্য বিজয়কালীন দেখা যায়, পরিচারক তাঁহার মাথায় একটি সবুজ রংএর ছত্র ধরিয়া আছে।

তারপর শিবাজী। 'ছত্রপতি' নামেই ইনি ইতিহাসে সমধিক পরিচিত।

ইংরাজের কাছে আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আগে ইংলণ্ডে অবশ্য সাধারণ এবং ব্যাপকভাবে ছত্র ব্যবহার হয়নি। তবুও রাজা পঞ্চম জর্জ্জের জুবিলী উৎসবের মিছিলে তাঁহার মাথায় শ্বেত বর্ণের ছত্র ধরা হইয়াছিল। কলিকাতায় বড় লাট বাহাদুরের প্রসেসনেও তাঁহার মাথায় ছত্র ধরা হইয়াছিল। সাহেব এবং ততোধিক মেম সাহেবরা আমার যথেষ্ট সমাদর করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, মারাঠা, ইংরাজ সমস্ত জাতির নিকট আমার মত কে এত আদর লইয়াছে ?

যুগভেদে অবশ্য আমার রূপও বদলাইয়াছে। বৈদিক যুগে আমি ছিলাম তালপত্রের তৈরী প্রকাণ্ড ছত্র—ইচ্ছামত তখন আমাকে বন্ধ করা যাইত না। এখনও বারাণসী ধামে দশাশ্বমেধ বা মণিকর্ণিকার ঘাটে আমাকে দেখিতে পাইবে। এই প্রকার ছত্রেরই ছোট সংস্করণ মাথাল বা টোকা। জাপানী ছত্র, বাঙ্গলার ছত্র এবং বিলাতী ছত্র আকার দেখিলেই চেনা যায়।

চৈনিক ছত্র

আমি কোথায় নেই ? ফুটবলের মাঠই বল আর তীর্থ-ক্ষেত্রই বল, রৌদ্র-বৃষ্টি সব অবস্থাতেই আমার সমাদর।

ব্যাকরণে আমি 'আতপায় ছত্রম্'। আমি বৃদ্ধের 'ওয়াকিং ষ্টীক্'। প্রবাদ বাক্যে লোকে বলে, 'ছাতি-ফাটা রোদ'—আবার বদ লোককে হাটে-মাঠে লোকে 'ছাতি-পেটা' করিয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্ম-কার্য্যে ছত্র অপরিহার্য্য। বিবাহে বরকে 'ছাতি' দান করিতে হয়, আবার শ্রাদ্ধে প্রেতাত্মার জন্যও ছত্র দানের ব্যবস্থা আছে।

কোনও যায়গা হইতে অনেক লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, লোকে জুতা বা লাঠী ভঙ্গ না বলিয়া 'ছত্র ভঙ্গ' বলিয়া থাকে। আমার উপর আজকাল অনেকে 'বিজ্ঞাপন'ও প্রচার করিতেছে দেখিতেছি! 'ছত্র' তৈরী বাংলার অন্যতম প্রধান শিল্প। কাঠ, বাঁশ এবং বেত দিয়া ছত্রের 'বাঁট' তৈরী হয়।

আমাকে আড়াল দিয়া অনেকে আবার পাওনাদারকেও ফাঁকি দেন। ছাতি দেখিয়া অনেক সময় লোকের অবস্থাও বুঝা যায়। সাত-তালি দেওয়া ছাতি যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অবস্থা কখনও ভালো নয়।

বিদ্যাসাগরকে আমি বাল্যকালে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছি। তখন তাঁহাকে দেখিলে লোকে ভাবিত 'একটা ছাতি চলিয়া যাইতেছে।'

সম্প্রতি তরুণ ও নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করা যেন একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, বিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাকে নিয়মিত ব্যবহার করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের নাম ছাত্র।

বিভ্রাট

(গল্প)

শ্রীসুপ্রিয় দেব

রাত্তির দশটার পর কোনদিনও আমি জেগে থাকি না। সামনে পরীক্ষা, কাজেই বাধ্য হয়ে রাত বারটা পর্য্যন্ত পড়ে যখন শুতে গেলাম, তখন মেজাজ আমার ভয়ানক গরম। একে শীতকালে লেপের তলায় জিলিপির মতন পাকিয়ে শুয়ে থাকবার মতন আরামকে উপেক্ষা করে রাত বারটা পর্য্যন্ত পড়া, তার ওপর গ্রাহাম বেলের টেলিফোন আবিষ্কারের গল্পটা এত' বিচ্ছিরি যে কিছুতেই মনে থাকে না, আর সব চাইতে বিভীষিকা হ'ল সামনেই পরীক্ষা!

কোন রকমে আলোটা নিবিয়ে মশারি ফেলে শুয়েছি আর অমনি পাশের ঘর থেকে টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রিং. ক্রিং......কি বিভ্রাট বলত?—একবার, দুবার, তিনবার বেজেই চলেছে। ভয়ানক রাগ হ'ল। ঘুমোবার ভাণ ক'রে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম, দুই কানে আঙুল পুরে দিলাম—যাতে শুনতে না পাই; কিন্তু নাছোড়বান্দা টেলিফোনটা তবুও বেজে চলেছে।

বেশীক্ষণ বাজলে বাবার ঘুম ভেঙে যাবে, কাজেই বাধ্য হয়ে উঠতে হ'ল। মনে-মনে টেলিফোনকে, আর যে করছিল তাকে খুব খানিকটা গালাগাল দিয়ে রিসিভারটা তুলে বল্লাম, "হ্যালো"—

ওপাশে টেবিলের তলায় আমাদের পোষা বেড়ালটা বসেছিল। আমার "হ্যালো" শুনে সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

আবার চেঁচিয়ে বললাম, "কাকে চাই?"

ওপাশ থেকে একজন চটেমটে বল্ল, "আপনি কি রাধাচরণবাবুর বাড়ী থেকে কথা বলছেন?"

—"না!"—

"রং নাম্বার,"—বলেই ভদ্রলোক টেলিফোন কেটে দিলেন।

কি রকম রাগ হয় তখন! রাত্তির বারটার সময় কি না রং নাম্বার! মনে মনে টেলিফোন আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলকে খুব খানিকটা গালাগাল দিলাম। আবার শুয়ে পড়লাম।

...কিন্তু একি! এ কোথায়! নতুন নতুন লোক, যেমন অদ্ভুত তাদের দেখতে, তেমনি অদ্ভুত পোষাক পরিচ্ছদ। তবে অনেকটা সাহেবদের মতন। কিন্তু তবু মনে হ'ল এদের যেন কোথাও দেখেছি দেখেছি! অনেকক্ষণ রাস্তার এককোণে দাঁড়িয়ে ভাববার পর মনে পড়ল—ঠিক ত', ইতিহাসের পাতায় কি এদের দেখেছি!

দেশটাও অদ্ভুত! ট্রাম নেই, বাস নেই, ইলেকট্রিক লাইট নেই, রাস্তায় মোড়ে মোড়ে লাল পাগড়িবাঁধা পুলিস নেই। বড় বড় দোকান নেই, বড় বড় সাইনবোর্ড পর্য্যন্ত নেই। সত্যিই, বেশ একটু আশ্চর্য্য লাগল! এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ঘোড়ার গাড়ি আর ঠেলা গাড়ি। ভাবছি কি করি, কোনদিকে যাই, এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল গিয়ে সামনের বড় চায়ের দোকানটায়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম চার আনা পয়সা আছে। সোজা ঢুকে পড়লাম। সেখানে এক বিভ্রাট! দোকানে যে লোকটা চা বিক্রি করছে, সে আমার কথা কিচ্ছু বোঝে না—মহা বিপদ! কোন রকমে হাবভাবে বুঝিয়ে দিলাম আমার চা চাই।

একটা কোণে একটা ছোট্ট টেবিলে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে—যেন আমি আলিপুরের চিড়িয়াখানার একটা বাঘ কি ভাল্লুক! ভয়ানক রাগ হ'ল! কিন্তু কি আর করি, কিছু বলতেও পারিনা।

কোন রকমে গরম চা ঢগ্ ঢগ্ করে খেয়ে গলা পুড়িয়ে পয়সা দিতে গিয়ে আর এক বিভ্রাট!—দোকানদার বললে, পয়সা চলবে না! এমন চক্‌চকে চার আনি, বলে কিনা চলবে না! এমন আজগুবি ব্যাপার কখনও তোমরা শুনেছ? আমি ত' কখনও শুনিনি। রেগেমেগে হিন্দী বাংলা মিশিয়ে দু একটা গালাগালও দিয়ে দিলাম। দোকানে যারা যারা চা খাচ্ছিল সবাই মজা দেখবার জন্যে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। আমি একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ। একজন সাহেব ভদ্রলোক শেষকালে আমার অবস্থা দেখে দয়া ক'রে আমার বদলে পয়সা দিয়ে দিলেন। তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন:—

—"আপনার নাম কি?"

—"প্রতুলকুমার রায়।"

—"কোন্ দেশের লোক আপনি?"

—"কেন কলকাতায়।"

—"সেটা আবার কোথায় ?"

—হায়! হায়! এমন লোকও তাহ'লে আছে, যে কলকাতার নাম শোনেনি। বললাম, "কেন ভারতবর্ষে।"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ, আপনার দেশের নাম শুনেছি বটে।"

আমার তখন বেশ মজা লাগল; আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা এটা কোন্ দেশ ?"—

—"কেন বোস্‌টন!"

জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা আবার কোথায় ?"

—"কেন আমেরিকায়।"

—"আপনার নামটা জানতে পারি ?"

—"আমার নাম আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল। তা আপনি এতদূরে কি করে এসে পড়লেন ?"

কিছুই বলতে পারলাম না। কেমন ক'রেই বা পারব, সে ত' আমি নিজেই জানিনা। আমার বিকৃত মুখ দেখে মিঃ বেল বললেন, "তা আপনি যখন এদেশের কিছুই জানেন না তখন আমাদের বাড়ীতেই চলুন। যে কদিন এখানে থাকবেন আমার বাড়ীতেই থাকবেন। আমার মা, বাবা, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সবাই আপনাকে দেখে কত আশ্চর্য্যই না হয়ে যাবে।"

আমি পড়লাম মহা মুস্কিলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক, তাঁর বাড়ীতে থাকিই বা কি ক'রে, চিনিনা শুনিনা। কিন্তু ভদ্রলোক যা নাছোড়বান্দা, কিছুতেই ছাড়বেন না। অগত্যা রাজি হলাম। রাস্তায় মিঃ বেল আমাদের দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন; আমিও যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আমার কথা ত' আপনি শুনলেন এবার আপনার কথা আমায় কিছু বলুন।"

মিঃ বেল তখন বলতে আরম্ভ করলেন :—

"আমার বাবার নাম আলেকজাণ্ডার মেলিনে বেল্। স্কট্‌ল্যাণ্ড অন্তর্গত এডিনবরায় আমার জন্ম হয়,—১৮৪৭ সালের ৩রা মার্চ।"

তারিখটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। হায়-হায় ভূতের পাল্লায় পড়লাম নাকি ?

জিজ্ঞেস করলাম, "কবে বল্লেন ? '১৮৪৭ সাল ? তাহ'লে এখন আপনার বয়স কত ?"

—"২৮ বছর।"

—"মাত্র ২৮ বছর!"—একটা লোক এত বয়স কমাতে পারে—বাব্বা! তবু ভদ্রতা

করে বল্লাম, "আপনাকে দেখলে কিন্তু মনে হয়, আপনার বয়স অনেক বেশী—২৮এর চার গুণ!"

ভদ্রলোক বল্লেন, "আমার স্বাস্থ্য একটু খারাপ কিনা তাই!—হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম, প্রথমে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়বার পর আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল বলে ১৮৭০ সালে আমার বাবা কানাডায় চলে আসেন। তারপর সেখান থেকে বোস্‌টনে এসে বছর তিনেক হ'ল একটা স্কুল করেছি।"

জিজ্ঞেস করলাম "স্কুল, কিসের স্কুল ?"

—"মূখ বধিরদের। তাদের কি ক'রে লেখাপড়া শেখান উচিত তাই শিক্ষা দিই, আর অবসর সময়ে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে গবেষণা করি।"

—"তাহলে বলুন আপনি একজন বৈজ্ঞানিক।"

—"ঠিক তা নয়, তবে সম্প্রতি বোস্‌টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছি, কাজেই সব রকম জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়।—তবে হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে বিজ্ঞান-চর্চার আমার খুব সখ, তাই সময় পেলেই আমি তাই নিয়েই থাকি! আপাততঃ আমি ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে কি ক'রে গলার শব্দ এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় পাঠান যায় তাই গবেষণা করছি। আপনি হয়ত শুনেছেন একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক মিঃ চাল্‌স্ বর্ডরশে ১৮৫২ সালে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন, তাতে তিনি এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। অ্যানটোনিও মিউজি নামে একজন ইতালীয় ভদ্রলোকও ১৮৫৭ সালে এ বিষয়ে কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছেন, আবার ওদিকে জার্ম্মানীতে ফিলিপস্‌রে নামে একজন বৈজ্ঞানিক নাকি একটি শব্দ পাঠাতেও সক্ষম হয়েছেন। তবে তিনি মানুষের গলার আওয়াজ কি করে পাঠান সম্ভব তা এখনও বের করেননি, আমি সেই চেষ্টাই করছি।"

এমনি নানান রকম গল্প করতে করতে আমরা মিঃ বেলের বাড়ীতে এসে পৌছালাম। সেখানকার আতিথেয়তার কথা আর কি বলব, মামার বাড়ীর আদর পর্য্যন্ত তার কাছে লাগে না! সকাল বিকেল চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়া, আর খালি বেড়িয়ে বেড়ান। বাড়ীর কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেলাম।

এমনি করে একদিন দুদিন ক'রে চারমাস কেটে গেল। একদিন, তারিখটা মনে নেই, বোধ হয় ২রা জুন, সকাল বেলায় উঠে দেখি বেল চায়ের টেবিলে নেই। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে ঘড়ি নিয়ে কি একটা করছে। প্রথমটা খুবই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম; বেলের মতন লোক, যে চা ছাড়া আর কিছু খায় না বলতে গেলে, সে কিনা চা খাবার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছে! তাড়াতাড়ি ছুটলাম বেলের ল্যাবরেটরিতে, গিয়ে যা দেখলাম তাতে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া!

একটা ঘরে টিক্ টিক্ ক'রে একটা ঘড়ি চলছে আর তারের ভেতর দিয়ে অন্য ঘরে সেই শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

তারপর থেকে রোজ সকালে বেল চ'লে যেত তার ল্যাবরেটরিতে, আর ফিরত সেই বাত্তির বেলায়। সে নাকি মানুষের গলার আওয়াজ তারের মধ্যে দিয়ে পাঠাবেই পাঠাবে। আমি প্রায়ই বাড়ীর কথা বলি, কিন্তু বেল কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। এমনি ক'রে ন'মাস কেটে গেল।

সেদিন বুঝি ১০ই মার্চ, ১৮৪৮ সাল। সকাল বেলায় চা খেয়ে সবে রোদ পোহাতে বসেছি, কোথা থেকে পাগলের মতন বেল ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে একেবারে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "বেল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি? আমার ভয়ানক লাগছে,—ছাড়! ছাড়! কি হয়েছে কি?"

বেল চেঁচিয়ে বলে উঠল "হয়েছে! হয়েছে! দেখবে এস—"

তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলাম এক তাজ্জব ব্যাপার। বেলের বাবা যা বলেন পঞ্চাশ গজ দূর থেকে আমি তা স্পষ্ট শুনতে পাই, আর আমি যা বলি বেলের বাবা তা স্পষ্ট শুনতে পান। সবই নাকি ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে!

কোন রকমে ছ'মুঠো খেয়ে বেল ছুটল ওর আবিষ্কারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করাতে বা পেটেন্ট করাতে। আমি আর বেলের বাবা খুব গল্প করছি এমন সময় প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে বেল ফিরে এল—মুখে কোন কথা নেই, চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছে। আমার ত ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"কি হয়েছে, কেন?"

বেল এবার আর থাকতে পারল না—আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করল কিছুক্ষণ পরে বলল, "পেটেন্ট পেলাম না।"

—"কেন?"

"আমার যাবার প্রায় ঘন্টা দুয়েক আগে প্রফেসর এলিশা গ্রে নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই একই জিনিষ পেটেন্ট করবার দাবী জানিয়ে এসেছে।"

বলেই বেল হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল।

—চোখ মেলে চেয়ে দেখি ঘড়িতে আটটা বাজে, আর ওঘরের টেলিফোনটা সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে চলেছে ক্রিং! ক্রিং—

—তবু ভাল, ভারতবর্ষেই আছি! তা না হ'লে বিদেশ বিভুঁইতে কি বিভ্রাটটাই না ঘটতো বল দেখি!

দুশ্চিন্তা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

যাচ্ছে সময় যাচ্ছে চ'লে
ঘন্টা মিনিট দণ্ডে পলে।
বাজলো এগারো বাজলো বারো
আরো কত বাজে ভাবতে পারো?
বারোটার পর একটা না-হ'য়ে
বারোটার পর তেরোটা হ'লে,
চোদ্দ উনিশ একুশ একশো
দেখতে-দেখতে সাতাশ হাজার—
শেষ কি কখনো থাকতো বাজার?

ঘড়ির উপরে বসতো ট্যাক্সো,
নয়া দিল্লিতে পাশ হতো আইন—
তেরো হাজারের বেশি কোনো ঘড়ি
বাজে যদি, তবে প্রতি ঘন্টায়
তিন পাই ক'রে দিতে হবে ফাইন।
অবাধ্য ঘড়ি তবু কি থামতো?
আইনের ফাঁস কখনো মানতো?

বাজতো দু'লাখ, বাজতো কোটি,
সতেরো শূন্যে হ'তো পরার্দ্ধ,
তবুও ঘড়ির আরো বরাদ্দ!

ফুরুতো ঘণ্টা, ফুরুতো নামতা
মন্ত্রী-মহলে আমতা-আমতা—
দেড় কোটি টাকা ট্যাক্সো জমলো,
হতভাগা ঘড়ি তবু কি দমলো !

ক'টা যে বাজলো কে-ই বা শুনতো,
যেই ঘড়ি দেখা ঘুরতো মুণ্ড।
পাহাড়-প্রমাণ জমছে ট্যাক্সো,
হিসেব রাখতে খাটছে একশো
দিগ্‌গজ এম. এ. ম্যাথ্‌মেটিক্সে,
মস্ত আপিস চলছে ঠিক্‌সে।

কিন্তু কে করে ট্যাক্সো আদায় !
রায় বাহাদুর চণ্ডী সাধুর
নামে এক ঘাটে ব্যাঘ্র বাছুর
জল খায়—আর ঘড়ি কি তাঁকেও
পরোয়া না ক'রে কেবলই বাজতো ?
তবে কি সৈন্য যুদ্ধে সাজতো ?
গুলি খেয়ে সব মরতো ঘড়ি ?
তবু কি জুটতো একটা কড়ি ?

তখন হুকুম হতো মন্ত্রীর
ভারতবর্ষে মাথা-গুনতির
প্রত্যেক শিশু মেয়ে পুরুষের
মাসে তিন টাকা বসলো ট্যাক্সো।
হুজুর, রক্ষ, উজোর বাক্স !
ফাটতো বুকের শুকনো পাঁজরা
আয়ের অঙ্ক এমন ঝাঁঝরা
দেখতে পাওয়াই যায় কি না যায়—
হায় হায় তবে কী হ'তো উপায় !

পোল্যাণ্ডের একটী গ্রামের স্মৃতি

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

গ্রামটীর নাম কুলমনা। ছবির মতন সুন্দর গ্রামখানি। কৃত্রিমতার ছাপ সেখানে কম, প্রাকৃতিক দৃশ্যই সে গ্রামের সম্পদ। কাঁচা রাস্তা, শ্যাওলাওয়ালা পুকুর, এখানে সেখানে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী। গ্রামটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে আমার ভারতবর্ষের গ্রামের কথা মনে হ'ল।

ধুলোমাখা লাল রাস্তা দিয়ে আমরা কয়েকজন হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা ঝাউ গাছের মতন একরকম গাছ। আর তার ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট কাঠের বাড়ীগুলি। বাড়ীর সামনে একটী ক'রে ফুলের বাগান। প্রায় প্রতি বাগানেই পাতা ছিল কয়েকটী চেয়ার ও টেবিল। বাড়ীগুলি, শুনতে পেলাম, সপ্তাহভর খালি থাকে, শনিবার বিকেলে ও রবিবারে মালিক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে যান। সেদিন ছিল রবিবার। তাই প্রতি বাড়ীতেই লোক দেখতে পেলাম। বাড়ীর বাইরে বনের ভিতর ইজিচেয়ারে বসে কেউ কেউ বই পড়ছিল। গাছগুলির ভিতর দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো রোদ এসে পড়েছিল শুকনো পাতাঝরা নরম বিছানার উপর। বনের আনাচে কানাচে বহু রংবেরংয়ের জংলা ফুল ফুটে বনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছিল। আর সেই লম্বা লম্বা গাছের পাতার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস শাঁই শাঁই ক'রে কোন্ অসীমের সন্ধানে যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল।

এমনি এক বনানীর মাঝে আমরা বসে গল্প করছিলাম—প্রায় জন আটেক মিলে। কিন্তু গল্প করতে করতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম থেকে উঠেছি তখন দেখি সকলে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে আমরা পৌঁছে গেছি ছোট একটী পুকুরের পাড়ে। পুকুর না বলে সেটাকে একটী ডোবা বললেও চলে। জল হয়তো কোমর পর্য্যন্ত হবে, কিন্তু জলের ভিতরকার লতানো গাছগুলিও পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু অতটুকু জলাশয়,

তাতেও নৌকা চলছে কত! আমাদের সামনে একটী ডিঙ্গি নৌকা উল্‌টে গেল। দুটী প্রাণী তাতে চড়েছিল, তারা ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, হো হো করে হেসে উঠে ডিঙ্গিখানাকে সোজা ক'রে ফেলে আবার ভেসে চললো। প্রতি নৌকা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হচ্ছে, ভাড়াও অতি সামান্য। আমরা এক এক নৌকাতে চড়লাম তিনজন করে। আমাদের নৌকাটী চলছিল বেশ, হঠাৎ কোথা থেকে আর এক নৌকা তার সঙ্গে এসে লাগালো ধাক্কা। নৌকা উল্‌টে যায় আর কি! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উল্‌টালো না;—দুচারবার দোল খেয়ে আবার সে সোজা হয়ে ভাসতে লাগলো।

ইউরোপের লোকদের এইভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করাটা আমার ভারী ভাল লাগে। আনন্দ করাটাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আর একটানা ও একঘেঁয়ে আনন্দ তাদের ভাল লাগে না। প্রকৃতিকেই তারা কত রকম ভাবে উপভোগ করছে! কখনো বসে সূর্য্যাস্ত দেখছে, কখনো এক কাপ পানীয় নিয়ে প্রকৃতির কোলে বসে গল্পসল্প করছে, আবার কখনো খোলা মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করছে। তারা প্রকৃতিকে শুধু কবির চোখ দিয়েই দেখে না, বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়েও দেখে। তাদের মনে সাধ জেগেছে প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করে তাকে নিজের শক্তির বশে আনবে। তাই তাদের অভিযান চলেছে জলে, স্থলে ও হাওয়ায়। এই অদম্য বাসনা তাদের ছুটিয়েছে দূরত্বকে জয় করবে বল্লে,—ডাঙ্গায় কলের ইঞ্জিনে, জলে বাষ্পীয় জাহাজে ও হাওয়ায় এরোপ্লেনে, জেপলিনে। শুধু কি এই? এখন তারা বলছে, এ পৃথিবীতে তো আমরা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়েছি, এখন মঙ্গল গ্রহে যেতে হবে। প্যারিসের একটী মিউজিয়মে মঙ্গলগ্রহের প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। তাতে ঐ গ্রহের কোথায় পাহাড় ও কোথায় খাদ তাও খোদাই করে সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে। দেখে মাথা নত হয়ে আসে মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তার কথা স্মরণ ক'রে। এইতো সেদিন ইংলণ্ডের একটা কাগজে দেখলুম একটা রকেটের ছবি। ঐ রকেট নাকি ছুটবে মঙ্গলগ্রহকে ধরতে। মঙ্গলগ্রহে যদি মানুষ কখন পৌঁছাতে পারে, তখন হয়তো চেষ্টা হবে চাঁদে পৌঁছানোর। এই রকম ধারণা নিয়ে যাঁরা খুব মাথা ঘামিয়েছেন তাঁদের ভেতর সব চাইতে নামকরা হচ্ছে ফরাসী পণ্ডিত জুল্‌ভার্ণে। আজকালকার পণ্ডিতদের ভিতর আমরা ইংরেজ লেখক এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্‌এর নাম খুব শুনতে পাই। শুধু ভার্ণে বা ওয়েল্‌স্‌ই কেন, আমরা সাধারণ লোকেরাও কি উৎসুক হই না আকাশের ঐ টিপ্ টিপ্ ক'রে-জ্বলা-পৃথিবীগুলির ভেতর কি আছে? ঐ সব পৃথিবীর ওজন কত, ওরা আমাদের পৃথিবী থেকে কতদূরে, তা পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা গুণে বের করেছেন। খুব বড়ো দূরবীণ দিয়ে দেখা গেছে ওদের ভেতরে পাহাড় আছে, প্রকাণ্ড গুহা আছে, সুন্দরভাবে কাটা খাল আছে, নানা প্রকার ধাতু আছে ও আরও কত কি! এত সব জিনিস যদি থাকতে

পারে তো নানা প্রকার গাছপালাও সেখানে জন্মাতে পারবে না কেন? মনে কর তো আমাদের পৃথিবীটা আগে কি রকম ছিল? মনে কর তো আমাদের পৃথিবীতেই ঠাণ্ডা বরফময় প্রদেশে আস্তে আস্তে কি ভাবে প্রথম প্রাণের জন্ম হ'ল? তারপর পৃথিবী যখন গরম হতে লাগলো তখন তাতে এক প্রাণী থেকে আর এক প্রাণী ও তার থেকে আর এক প্রাণী এমনি ভাবে শেষকালে মানুষ জন্ম নিল। আমাদের দেশে যদি জড় থেকে প্রাণের জন্ম হ'তে পারে তো অন্য পৃথিবীতেই বা তা হতে পারবে না কেন?

অজানাকে জানবার জন্যে মানুষের চিরদিনই একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা। নিত্য নতুন সব জিনিষ আবিষ্কার করা ও তাকে নিজের দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করা তার চিরদিনের প্রয়াস। তাই সে দিন দিন অলৌকিক সব ব্যাপার মাথা থেকে বের করছে। শুনেছি আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক নিজের ইচ্ছায় আকাশ থেকে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি পড়াচ্ছেন ও নিজের ইচ্ছায় সূর্য্যের আলোয় অনেকটা জায়গা আলোকিতও করতে পারেন। বিজ্ঞানের এই সব অলৌকিক কীর্ত্তি সাধারণের মন জয় করেছে কম নয়, দিন দিন আরও বেশী ক'রে জয় করছে। দেখতে দেখতে ইউরোপ ও আমেরিকার সব লোক বিজ্ঞানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চলেছে। সে সব দেশের বৈজ্ঞানিকেরা মন্ত্রমুগ্ধ অগণিত লোককে নিত্য নতুন বিজ্ঞানের খেলা দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে সম্মান লাভ করছে।

হ্যাঁ,—বলছিলাম পোল্যাণ্ডের একটী গ্রামের স্মৃতিকথা। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে বসল জটলা ক'রে গল্পগুজব করবার জন্যে। একটি স্কুলের ছেলে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললো, "আচ্ছা আপনি তো 'টাগোর' (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)-এর দেশের লোক, বলুন তো দুই এক ছত্র তাঁর কবিতা থেকে আপনার মাতৃভাষায়?" ছেলেটী খুব সাহিত্যানুরাগী। রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ও "সাধনা"র নাম করলো ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের একটী কাগজে পোলিশ ভাষায় লেখা একটা প্রবন্ধ আমাকে এনে দিয়ে বললো, "আপনার কাছে আমার একটা স্মৃতি রইলো—এটী আপনার সঙ্গে দেশে নিয়ে যাবেন।" একটী বার তের বছরের মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল, সে বলে উঠলো, "আমরা তো আপনাদের 'টাগোরে'র কবিতা পড়েছি, আমাদের কোন কবির লেখা আপনি পড়েছেন বলুন!" লজ্জায় জানাতে হ'ল কোন পোল্যাণ্ডদেশীয় কবির লেখাই আমি পড়ি নি। মেয়েটী গর্ব্বের সঙ্গে বল্লো, "আমাদের কবি Mickiewicz ও Stowackiএর কবিতা পড়ে দেখবেন। আপনাদের 'টাগোর', সেকস্‌পিয়র অথবা গ্যেটের চেয়ে কোন অংশে সেগুলো খারাপ নয়। তবে কি জানেন, Mickiewicz ও Stowackiএর কবিতা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করলে তাদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই বোধকরি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁদের লেখার তেমন আদর দেখতে পাওয়া যায় না।" মেয়েটী দেখলুম সাহিত্যের বই বেশ

পড়েছে। তার মতে পোলিশ ও রাশিয়ানদের মত শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা পৃথিবীর আর কোন জাতি করে নাই। রাশিয়ার কবি পুস্‌কিন ও মায়াকোভ্‌স্কির লেখার সে ভূয়সী প্রশংসা করলো। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের ভেতর কেউ কেউ অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতে সুরু করেছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করলো ভারতবর্ষে প্রতি জঙ্গলেই বাঘ থাকে কিনা, কেউ জিজ্ঞাসা করলো হিমালয় পাহাড়ে আমি উঠেছি কিনা, কেউ আবার করলো ভারতবর্ষে সব মানুষই আমার মত কালো কিনা। কেউ কেউ আবার গান্ধী-প্রসঙ্গ তুললো। একটী মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মহাত্মা" মানে কি, আর গান্ধীকে "মহাত্মা" বলা হয় কেন? আর একজন জিজ্ঞাসা করলো, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভারতবর্ষে খুব বিখ্যাত লোক আছে কিনা? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুনতে পেলাম কলুমনা গ্রামে পূর্ব্বে কেউই কোনো ভারতবর্ষীয় অথবা আমার মত কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখে নাই। তাই আমি সেখানে যাওয়াতে গ্রামে একটা সাড়া পড়ে গেল। অনেকে আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তারা ইংরেজী অথবা জার্ম্মান কোনটাই না জানাতে সেটা সম্ভব হ'ল না।

কলুমনা গ্রামে মাত্র একটী বাজার। বাজারে দোকানঘর মাত্র কয়েকটী। গ্রামের সব চাইতে বড় রাস্তা পিচঢালা। গ্রামটীতে গাড়ী চলে না, আর বেশীর ভাগ রাস্তাই লাল মাটির।

সমস্তদিন সে-গ্রামে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আবার লজ্‌ নামক এক সহরের ট্রেন ধরলাম। যাবার সময় সকলে বলেছিল, "আবার আসবেন কিন্তু? এবার আসবেন শীতকালে,—স্কিয়ের সরঞ্জাম নিয়ে, সকলে মিলে খুব স্কি করা যাবে।"

লজ্‌, পোল্যাণ্ড

১৯৩৭

দুপুরিকা

সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়

দুপুর বেলা, পাড়ার মজলিশে জাঁকিয়ে বসেন রায়গিন্নী
মধ্যিখানে ভিড়ে,'
পাড়ার কচি এবং বুড়ী, পাখীর ছানার মত তাঁরে ধরলো
এসে ঘিরে।
আলোচনা সেদিন মুখে সবার—
"বিয়ে করে কি হাল হোল নবার!"
আট বছরের ছোট্ট মেয়ে চুনো,
এরই মধ্যে পেকে হোল ঝুনো,
ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলে—
"নবাদাদার নতুন বৌটা এমনি ক'রে চলে।"
পা বেঁকিয়ে, হাত ঘুরিয়ে, চল্‌লো সে একধাঁচে—
কেউ হাসলো খিলখিলিয়ে, কেউ বল্‌লো, "নাচে"?
মুখের মধ্যে দোক্তা পুরে দিয়ে
বল্‌লে ঘোষালজায়া—"নবার যেদিন বিয়ে,
দিদি, দ্বাদশভুজো হয়ে করনু সকল কাজ—
ভুলেও কি কই নবুবাবু পোছেন আমায় আজ?"
মুখটী টিপে বললে দত্তজায়া—
"বিদুষী বউ, নেইকো মোটে হায়া...
নইলে, নবা যেদিন ফিরলো ওকে নিয়ে
পাল্কী থেকে বউ নামলেন—জুতো পায়ে দিয়ে?"

দত্তজায়ার মেজো মেয়ে শান্তি, গোলাম মেরে
নিলে ওদের নওলাখানি কেড়ে।
খোঁপাটা ঠিক করতে করতে বল্‌লে মুচকি হেসে,
"কি একটা সে বিলিতী তেল—মাখেন উনি কেশে!"

মিত্তিরদের বিধবা এক মেয়ে,
দাঁড়িয়েছিল দোরের পাশে—এদের পানে চেয়ে।
"যাই বলো,"—সে বল্‌লে চোখটী বুঁজে,—
"নবুদাদার বৌয়ের মত পাবেনা আর খুঁজে!

কথায়, কাজে, রূপে, গুণে—সকলদিকেই সমান—
বিশ্বাস না করো যদি, দেখিয়ে দেবো প্রমাণ।”
মিত্রজায়া মুখ ঘোরালো—নথ নেড়ে সে কয়,
“থাম্ বাপু—তোর ক্যাংলাপনা আমার নাহি সয়।”

* * * *

“চুপ! চেয়ে ত্যাখ কে আসছে ওই—
নবার বউ, না?...হাঁটায় তো ওর দোষ নেইকো কই?
শুধু পায়ে, ঘোমটা দিয়ে মাথে
পুঁচকে একটা চাকর নিয়ে সাথে
আসচে বোধহয় এইখানেতেই মেয়ে!”
ঘামে সবাই উঠলো যেন নেয়ে।
মোড় ফেরালো কথার মিত্রজায়া,
“আহা, বেশ বউটী নবুর হোলো, দেখলে রে হয় মায়া!”
—লজ্জানত মুখে বধূ করলো প্রণাম সবে,
আশীর্ব্বাদের মিষ্টি কথা বল্‌লে সব একরবে।
সরিয়ে মাথার ঘোমটাখানি বল্লে,—“জেঠি, মাসি,
রাত্তিরেতে রইল নিমন্ত্রণ”...এইখানেতে হাসি,
বল্‌লে মৃদুস্বরে—“অনেক দিনের তরে ওঁর ইচ্ছা ছিল মনে,
আমি রেঁধে খাইয়ে দেবো গ্রামের সকল-জনে।
সে-ইচ্ছা ওঁর পূর্ণ আজি হবে,
তাই
যান্ যদি সব, ওঁর ও আমার ক্ষোভ কিছু না রবে।’

* * * *

নিন্দে যারা করতেছিল, তারা
ভাবলে—এখন নেইকো কোনো চারা,
বললে সবাই, “হেঁ-হেঁ বটেই তো মা,
তুমি খেটে করবে রান্না—আর আমরা যাবো না?
অটুট্ থাকুক সিঁদূর তোমার, অক্ষয় হোক্ নোয়া।”
রায়গিন্নীর ছোট্ট নাতি উঠলো কেঁদে, “ওঁয়া” ॥

কাহিনী

ক্যাঙ্গারু শিকার

শ্রীসমর সরকার

তোমরা সকলেই পড়েছো অষ্ট্রেলিয়াতে ক্যাঙ্গারুর বাস। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতেই ক্যাঙ্গারুর প্রাচুর্য্য। সেখানে ‘ম্যালেট’ নামে এক প্রকার গাছ আছে—তার ছাল সংগ্রহের জন্য অনেক লোকে যায়, কারণ ‘ম্যালেট’ গাছের ছালের ব্যবসাটা খুব লাভজনক। (‘ম্যালেট’ গাছের ছাল ট্যানিংএর কাজের জন্য প্রয়োজন হয়।) ওখানকার বনে অনেক ক্যাঙ্গারু, ঈমিউ পাখী (অনেকটা উট পাখীর মত দেখতে), ওয়ালেবি (ক্যাঙ্গারু জাতীয় ছোট্ট ছোট প্রাণী) এবং ডিঙ্গো (বুনো কুকুর—নেকড়ের মত দেখতে এবং ভীষণ হিংস্র) পাওয়া যায়। যারাই ‘ম্যালেট’ গাছের ছাল সংগ্রহের জন্য ওখানে যায় তারাই এই সব প্রাণী শিকার করার লোভ সামলাতে পারে না—এতে বেশ আমোদও পাওয়া যায় এবং উপরিও কিছু লাভ হয়, কারণ ক্যাঙ্গারুর চামড়া বেশ চড়া দামে বিক্রী হয় ও এক একটা ডিঙ্গো মেরে তার মাথা ও লেজ দিতে পারলে গবর্ণমেণ্ট থেকে দশ শিলিং করে পুরস্কার মেলে।

বার্ট ফেয়ারহেড নামে এক ভদ্রলোক একবার গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স্ নিয়ে মাস তিনেকের জন্য এই অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করলেনঃ ইচ্ছা—শিকার ক’রে কিছু আমোদ উপভোগ করা ও ‘ম্যালেট’ গাছের ছাল সংগ্রহ করে কিছু অর্থ উপার্জ্জন। সঙ্গে নিলেন তিনি নুন মাখানো শূকরের শুক্‌নো মাংস (বেকন), টিনে-পোরা মাংস, ময়দা, আলু, পেঁয়াজ, জ্যাম, মাখন, কিস্‌মিস্, চা, কফি, চিনি ও জমানো দুধ ইত্যাদি একমাসের উপযোগী খাদ্যের উপকরণ। একটি হাল্‌কা চার চাকার গাড়ীতে জিনিসগুলি ও ছাল সংগ্রহের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম তুলে দিয়ে তিনি গাড়ীর সামনে হেঁটে চল্‌তে লাগলেন। তাঁদের গন্তব্যস্থল সেখান থেকে মাইল ত্রিশ দূরে। গাড়ীটী এত বোঝাই হয়েছিল যে সেটি হেল্‌তে দুল্‌তে আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর মিঃ ফেয়ারহেড ও তাঁর সঙ্গী বুনো ঝোপঝাপের সন্ধান পেলেন। মিঃ ফেয়ারহেড শিকারের সন্ধানে তাঁর উইঞ্চেষ্টার বন্দুকটি নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ক্যাঙ্গারুর মাংস খুব ভাল এবং মোটেই বিস্বাদ নয় এবং টিনে-পোরা সাধারণ মাংস ও শুক্‌নো মাংসের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের বেশী আদরনীয়—তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর ছোটখাট চলন্ত ভাঁড়ার ঘরটির খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ আরো বাড়াবেন।

একদিন খুব জ্বল্‌জ্বলে সকাল বেলায় মিঃ ফেয়ারহেড প্রথম ক্যাঙ্গারু দেখতে পেলেন।

ঋতুটা ছিল শীত—আগের দিন রাত্রি খুব কুয়াসাভরা ছিল, তাই সেদিন সকালে সূর্য্য অত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল (পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতে এমনি হয়)—মিঃ ফেয়ারহেড খুব খুশী মনে তাঁর গাড়ীর চেয়ে অনেকটা এগিয়ে চলেছেন এমন সময়ে তাঁর দূরপাল্লা রাইফেলের নাগালের মধ্যে দুটি ক্যাঙ্গারু দেখতে পেলেন। তিনি লুকিয়ে পা টিপে টিপে খানিকটা এলেন—মাত্র কয়েক শত গজের ব্যবধান—এমন সময়ে তারা তাঁর গন্ধ পেয়ে প্রাণপণশক্তিতে দৌড় দিলে। ফেয়ারহেড তাড়াতাড়ি একটি লম্বা 'শট্' করলেন কিন্তু ফস্কে গেল।

শীতকালে ক্যাঙ্গারুর পদচিহ্ন অনুসরণ করা বেশ সহজ ব'লে তিনি ঠিক করলেন তাই করবেন। মাইল দুয়েক অতিক্রম করার পর তিনি দেখলেন সে দুটো উঁচু হয়ে বসে চারিদিক লক্ষ্য করছে। তিনি খুব ধীরে ধীরে একটা ঝোপের পিছনে এসে উপস্থিত হলেন—সেখান থেকে তাঁকে একদম দেখা যাচ্ছিল না। তারপর সন্তর্পণে তিনি ওদের অলক্ষ্যে আর একটা ঝোপের পেছনে গেলেন—এমনি করে ওদের বেশ কাছে এসে পৌঁছুলেন। তখন তিনি বন্দুকটি তুলে বড় ক্যাঙ্গারুর বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। সেটা মরে গড়িয়ে পড়ল। অপরটি তখন পিছন পায়ের সাহায্যে লাফ দিতে দিতে ভীষণ বেগে ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি সেটাকে যেতে দিলেন, কারণ অনেকটা মাংস তিনি মরা ক্যাঙ্গারুটা থেকে পাবেন। তখন ছুরি দিয়ে তিনি সেটার ছাল ছাড়িয়ে খানিকটা মাংস ও ছালটা নিয়ে গাড়ীর সন্ধানে ফিরলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গীরা দ্বিতীয় গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁরা সকলে টাট্‌কা মাংস খানিকটা 'চেখে' দেখলেন যে মাংসটা বেশ ভালোই, তাই বাকী মাংসটা গাড়ীর পিছন দিকে ঝুলিয়ে রাখলেন।

সেইদিনই বিকালবেলা সকলে Jam Tree Creek নামক একস্থানে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে তাঁবু খাটানো হলো—ঘোড়াগুলোকে সাজশয্যা থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো—আর খুব প্রখর আগুনে কেৎলী চাপানো হলো। রাত্রের প্রথম দিকটায় তাঁবুর আশেপাশে ডিঙ্গোর চীৎকারের জ্বালায় তাঁদের জেগে থাকতে হলো, কিন্তু ঝোপ-জঙ্গলে এটা এতই সাধারণ যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা ও নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না। কাছেরই একটা গাছের ডালে সদ্য শিকার-করা মাংসটা ঝোলান ছিল, কিন্তু খুব বেশী উঁচু করে ঝোলান ছিল না বলে রাত্রিতে ডিঙ্গোগুলি সেটিকে সাবাড় ক'রে ছালের কয়েকটা টুকরা মাত্র তাঁদের জন্য রেখে গিয়েছিল। ওটাকে বেশ উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখার কথা কারোরই আগে খেয়াল ছিল না। এখন তার শেষ অবস্থা দেখে ফেয়ারহেড সাহেবের মনে পড়লো যে একজন চাষা তাঁকে এবিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিল বটে। যাই হোক্, তাঁদের যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী থাকার জন্য এবং আরো ক্যাঙ্গারু মারার ইচ্ছা থাকায় তাঁরা জন্তুগুলোর কর্ম্মক্ষমতা দেখে তাদের বরং তারিফই করলেন।

তারপর তাঁরা ক্যাঙ্গারু শিকার আপাততঃ স্থগিত রেখে ম্যালেটছাল সংগ্রহের দিকে মন দিলেন। রবিবার দিন তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁরা সেদিনটাকে "ক্যাঙ্গারু ডে" ক'রে উপভোগ করবেন।

তাঁদের তাঁবু থেকে মাইল দুয়েক দূরে ঝোপেভরা একটা প্রকাণ্ড সমতলভূমি ছিল। তার অপর দিকে মাইল চারেক পার হয়ে একটা যায়গায় বেশ শিকার মেলে—সেখানে ক্যাঙ্গারুরা খেতে আসে। এ খবরটি ওঁরা জানতেন। রাত্রি প্রভাত হবার আগেই তাঁরা তাঁবু থেকে বেরোলেন ও দিনের আলো ভালো করে ফোট্‌বার আগেই সেইখানে পৌঁছে ক্যাঙ্গারুদের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সেদিন সকালটা ছিল ভারী ঠাণ্ডাঃ এত ঠাণ্ডা যে বোতলের জল পর্য্যন্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কোনরকমে সেখানে খানিকটা আগুন জ্বালিয়ে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করলেন।

স্থির হলো যে, মিঃ ফেয়ারহেডের ভাই জো ক্যাঙ্গারুর সন্ধানে বেরোবে এবং ক্যাঙ্গারু দেখতে পেলে হয় নিজে মারবার চেষ্টা করবে বা সেগুলিকে তাড়িয়ে, ভয় দেখিয়ে তাঁর দিকে নিয়ে আসবে। জো বেশ কাজের লোক, কারণ খানিক পরেই একদল ক্যাঙ্গারু লাফাতে লাফাতে মিঃ ফেয়ারহেডের দিকে এল। তিনি যদিও এক সারি গাছের আড়ালে ছিলেন, তবুও ক্যাঙ্গারুগুলো বোধহয় তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, কারণ তারা দৌড়ে অন্য পথে গিয়ে পড়ল এবং সমতলভূমির মধ্যস্থলে উঁচু ঝোপ লক্ষ্য করে ছুট দিলে। কতকগুলো ক্যাঙ্গারু তখন দূরে খোলা যায়গায় চরছিল—পাছে তারা পালিয়ে যায় এই ভয়ে মিঃ ফেয়ারহেড গুলি ছুঁড়লেন না। তিনি তাদের অনুসরণ করে খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদিকে জো তখন বন্দুক ছুঁড়েছে। তার বন্দুকের শব্দ পেয়ে তিনি উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন—তিনি ক্যাঙ্গারুদের বেশ নাগালের ভিতর পেয়েছেন কি না? আবার জো'র বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। মিঃ ফেয়ারহেড একটা বড় বাব্‌লা গাছে ঠেস্ দিয়ে সোজা হয়ে তাঁর দিকে ক্যাঙ্গারু আসার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিনিট তিনেক দাঁড়ানোর পর তিনি দেখলেন বেশ বড় বড় গোটা ছয়েক ক্যাঙ্গারু তাঁর দিকে লাফাতে লাফাতে আসছে। ক্যাঙ্গারু অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও সতর্ক, সেইজন্য তিনি স্থির করলেন কোনরকম "risk" নেবেন না। তিনি তাড়াতাড়ি গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। তারপর ক্যাঙ্গারুগুলো গজ পঞ্চাশ যাবার পর তিনি বেরিয়ে এসে রাইফেল তুলে নিশানা করে গুলি ছুঁড়লেন। একটা ক্যাঙ্গারু তাঁর কাছাকাছি ছিল—সে বোধহয় তাঁর নড়ার শব্দ পেয়েছিল—সেইটা বাদ অন্যগুলো পিছন দিকে চেয়ে দেখলে। যাই হোক্ বুকের ঠিক মাঝখানে গুলি মেরে তিনি সেটাকে শেষ করলেন। অন্যগুলো এই অভাবনীয় ঘটনায় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে থেমে পড়ল—ইত্যবসরে তিনি আর একটির ভবলীলা সাঙ্গ

করলেন। অন্যগুলো এইবার প্রাণ ভয়ে ঝোপের দিকে চোঁ চোঁ দৌড় দিলে। মিঃ ফেয়ারহেড মরা জন্তুটাকে একটা ছোট গাছের কাছে রেখে দিয়ে প্রায় দেড়শত গজ দূরে গিয়ে আরো শিকারের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও তাঁর দিকে আর ক্যাঙ্গারু এলো না। খানিক পরে তিনি দেখলেন জো আসছে—তার কাঁধের উপর দিয়ে একটা বড় ক্যাঙ্গারুর মৃতদেহ ঝুলানো আর কোলে একটা জ্যান্ত বাচ্চা ক্যাঙ্গারু। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওঁরা ঠিক করলেন উঁচু ঝোপে গিয়ে পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরো গোটাকতক ক্যাঙ্গারু শিকার করবেন।

মিঃ ফেয়ারহেড ভাইকে বল্লেন,—"বাঃ, বেশ জিনিষটি পেয়েছ ত? কি করবে এবার এটাকে নিয়ে?" বাচ্ছাটা তখনও জো'র কোলের মধ্যে থেকে প্রাণপণ শক্তিতে মুক্তির চেষ্টায় নিষ্ফল আক্রোশে ক্রমাগত পেছনের পা ছুটি ছুঁড়ছে।

জো বল্লে—"আমি এটাকে পুষবো। এটা বড় ক্যাঙ্গারুটার পেটের থলির মধ্যে ছিল। ভাগ্যিস্ বড় ক্যাঙ্গারুটাকে মেরেই এটাকে ধরে ফেলেছিলুম, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে এটাও 'লম্বা' 'দিত আর কী! এটাকে টিনে-ভরা তুধ খাইয়ে বড় ক'রে তুলবো, যতদিন না পর্য্যন্ত এটা ঘাস খাবার মত বড় হয়। যাকু, আমার কাছে বেশ থাকবে মনে হয়।" জো ক্যাঙ্গারুটাকে আদর ক'রে একটুখানি হাঁতের চাপ দিলে।

মিঃ ফেয়ারহেড ভাইকে তার সন্ধানকার্য্যের জন্য খুব প্রশংসা করলেন এবং ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁর শিকার-করা ক্যাঙ্গারু তুটো আনতে চল্লেন। ওঁরা ঠিক করলেন ছোটটা থেকে মাংস নেবেন, তাই তার সামনের দিকটা কেটে সেটার ছাল ছাড়িয়ে ছায়া দেখে একটু উঁচু গাছের ডালে টাঙ্গিয়ে রাখলেন—পরে এসে সেটা নিয়ে যাবেন। তারপর একটু ধূমপানের পর তুজনে উঁচু ঝোপের দিকে নিছক শিকারের আনন্দের জন্যই এগোলেন, কারণ মাংসের প্রয়োজন তাঁদের আর ছিল না, প্রচুর মাংসই তাঁরা পেয়েছিলেন। ঝোপের মধ্যে বেশীদূর যেতে না যেতেই তাঁরা কতকগুলো "brush" ক্যাঙ্গারু দেখতে পেলেন: এই ক্যাঙ্গারুগুলো অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির এবং একবার বিপদের গন্ধ পেলেই নয় এরা পরিষ্কারভাবে গা-ঢাকা দেয় আর না-হয় প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দেয়।

ওঁরা তুজনে আলাদা হয়ে শ'-খানেক গজ তফাৎ হয়ে গেলেন—ইচ্ছা যে তাঁরা ছুটন্ত ক্যাঙ্গারুকে গুলি করবেন। যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাঁরা এগোতে লাগলেন। একটু পরেই মিঃ ফেয়ারহেড জো'র কাছ থেকে খুব চাপা একটা 'শিষ্' শুনতে পেলেন—তিনি বুঝলেন যে একটা কিছু তাঁর দিকে আসছে। তিনি সেইদিকে চাইতেই দেখলেন একটা 'ঈমিউ' প্রায় সোজা তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। তিনি রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন, তারপর

'ঈমিউ' তাঁর নাগালের বেশ মধ্যে আসতে গুলি ছুঁড়লেন। ঈমিউটা পড়ে গেল। মিঃ ফেয়ারহেড দৌড়ে তার কাছে গিয়ে দেখলেন সেটা মরে গেছে, কারণ বুলেটটা তার বুকের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে গেছে। জো'ও তাড়াতাড়ি সেটাকে দেখতে এল। কিন্তু ঈমিউর মাংস খেতে খুব লোভনীয় নয় বলে তাঁরা শুধু চামড়া আর পালক ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে সেইখানেই ফেলে রাখলেন। চামড়া আর পালক বিক্রী করে কয়েক শিলিং উপার্জ্জনও হবে আর সেগুলো শিকারীর গৌরবেরও সাক্ষ্য দেবে।

সেইদিন তাঁরা আর একটা ছোট "brush" ক্যাঙ্গারু শিকার করলেন—এবার শিকারের সৌভাগ্য লাভ করলে জো। কিন্তু মাংসের প্রয়োজন না থাকাতে তাঁরা সেটাকে ফেলে রেখে দিলেন। শিকারের শেষে তাঁরা আগেকার শিকার-করা ক্যাঙ্গারুগুলো নিয়ে তাঁবুতে ফিরলেন! তারপর সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা ক'রে তাঁরা গরম গরম চা, কেক, বেকনের সঙ্গে ঝল্‌সানো ক্যাঙ্গারুর মাংস ইত্যাদি দিয়ে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করলেন।

এই সময়ে রাত্রিতে তাঁবুর আশেপাশে ডিঙ্গোর উৎপাত বড় বেড়ে গেল—সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন রাত্রি জেগে বসে ডিঙ্গো মারবেন। তাঁরা তাঁবুতে তুপাশে তুটো ছোট ছোট গর্ত্ত ক'রে তুই ভাইয়ে তু'পাশে বসে রইলেন।

ডিঙ্গো ভীষণ ধূর্ত্ত আর সতর্ক—সামান্য একটু সন্দেহজনক শব্দ হলেই তারা সরে পড়ে। সুতরাং নিস্তব্ধ, নিশুতি রাত্রি ভিন্ন তাদের মারা বড় কঠিন—কারণ সকলে না ঘুমুলে তারা বেরোয় না। তাঁবুর বাইরে গর্ত্ত তুটির একটু দূরে মাংসের টুক্‌রা, হাড় ইত্যাদি ছড়িয়ে রেখে তুজনে গর্ত্তের মধ্যে রাইফেলের মুখ ঢুকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলেন। কেউ কোন কথা কইলেন না, এমন কি কোনরকম শব্দ যাতে না হয় সে-বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে রইলেন। এমনি করে দীর্ঘ তু'ঘণ্টা কেটে গেল।

তাঁরা তুজনে ঠিক করেছিলেন যিনি ডিঙ্গো দেখতে পাবেন তিনি পা দিয়ে অপরের পা ছুঁয়ে ডিঙ্গোর আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেবেন। রাত্রি প্রায় তুটো পর্য্যন্ত কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘট্‌লো না। তারপরে জো গোড়ালি দিয়ে মিঃ ফেয়ারহেডের পা ছুঁয়ে ডিঙ্গোর আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিলে। পরমুহূর্ত্তেই জো'র রাইফেল গর্জ্জন ক'রে উঠলো ও ডিঙ্গোর চীৎকার শোনা গেল। ডিঙ্গোটি পেছনের পায়ে একবার ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো এবং তার পরেই ধপ্ ক'রে মরে পড়ে গেল। তুই ভাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে বাইরে গেলেন।

পুরস্কারের কথা স্মরণ করে জো বল্লে,—"যাক্, আরো দশ শিলিং পাওয়া গেল।"

মিঃ ফেয়ারহেড বল্লেন—"হাঁ, যা কষ্ট করতে হয়েছে তার কাছে দশ শিলিং কিছুই নয়। বাব্বাঃ পুরা চারটি ঘণ্টা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কোথায় লেপের তলায় শুয়ে মজা করে ঘুম দিতুম, তার বদলে এই এতক্ষণ দম বন্ধ করে বসে থাকা—উঃ!"

জো বল্লে—"আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আর কী! হঠাৎ জন্তুটাকে দেখতে পেয়ে সচেতন হয়ে উঠে গুলি ছুঁড়লুম।"

তারপর তাঁরা আগুন জ্বালিয়ে চা তৈরী করে এক কাপ ক'রে চা খেয়ে বেলা পর্য্যন্ত ঘুম দিলেন। দু'জনেই বল্লেন—সারাদিনে ঝোপ-জঙ্গলে ক্যাঙ্গারু শিকার করার চেয়ে নিজের তাঁবুতে বসে ডিঙ্গো শিকার-করাটা ঢের বেশী কষ্টকর।

আবার পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় দুজনে ক্যাঙ্গারু শিকার করতে গেলেন। মিঃ ফেয়ারহেড একটি বড় ক্যাঙ্গারু ও দুটি "brush" ক্যাঙ্গারু মারলেন ও জো মারলে একটা "brush" ক্যাঙ্গারু ও একটা ওয়ালেবি।

ক্যাঙ্গারুর সখ অনেকাংশে মিটবার পর মিঃ ফেয়ারহেড ম্যালেট গাছের ছাল-সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন, কারণ এই অঞ্চলে আসার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। অবশ্য প্রতি রবিবার তাঁরা কাজ থেকে ছুটি নিয়ে শিকার করতে বেরুতেন। বেশ কিছুদিন থাকার পর যখন দেখলেন তাঁদের খাদ্যোপকরণ নিঃশেষ হয়ে এসেছে তখন একদিন তাঁরা স্বগৃহে ফিরে এলেন।

নব-বৈশাখ

মহ্‌বুব

পথের ধূলায় চৈত্র লুটায়
বর্ষের অবসান,
ওই বাজে শাঁখ, আসে বৈশখা,
নবীনের অভিযান।
দাও ক'রে দূর ঘোর তন্দ্রার—
বঞ্চিত আশা ব্যথা দুর্বার,
হৃদি-মৃদঙ্গে তোল ঝঙ্কার—
অভিনব মহীয়ান—
বিগত রাত্রি সমুখে, যাত্রি,
প্রভাত জ্যোতিষ্মান॥

পচা গত দিন পুরাণো প্রাচীন
হোক্ হোক্ সব লয়—
এস ধরাতল জ্বালি' হোমানল,
এস তুমি বিস্ময়!
দাও হে রুদ্র ভরি হৃদিতল
সাহস স্বাস্থ্য শক্তি অটল,
গেল তাণ্ডব নৃত্য চপল
আন্দোলি সারা প্রাণ,—
হোক সার্থক জীবন-পুলক
সবুজের অভিযান॥

আমার ভূত-দেখা

গল্প

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

গোড়াতেই বলে রাখি এটা হাসির গল্প নয়। কেননা, ভূত দেখা আর যাই হোক্, হাস্যকর ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই?

এবং এও বলা দরকার যে এটা গল্পও না। আনকোরা সত্য ঘটনা। ভূত দেখার মতো সত্য ঘটনা, সত্যিকারের দুর্ঘটনা আর কী আছে? যাঁরাই ভূত দেখেছেন, আমাদের মধ্যে অনেকের জীবনেই হয়তো এই দুর্য্যোগ ঘটে থাক্‌বে, তাঁরা সবাই এক বাক্যে আমার সাক্ষ্য দেবেন।

ভূতের গল্প মানেই সত্যিকারের গল্প।

অবশ্যি, এও বল্‌তে চাই, এই জীবনে অদ্ভুত আমি অনেক কিছুই দেখেছি, এবং এখনও দেখ্‌তে হচ্ছে। কিন্তু ভূত আমি সেই একটিই—বা একসঙ্গে সেই দুটিই—যা একবার দেখেছিলাম!

বিনি আর আমি বাড়ীর খোঁজে বেরিয়েছি, পুরনো বাসায় মন টিক্‌ছে না। নতুন একটা আবাস দেখে উঠে যাব এই বাসনা। এক জায়গাতে কতদিন আর মাথা গোঁজা যায়? খাঁচার পোষা জানোয়ারদেরই পোষায় কেবল। চোর ছ্যাঁচোররা ন্যাওটা না হলেও, চাম্‌চিকারা এসে আড্ডা না গাড়লেও, কাঁকড়া-বিছেরা যখন তখন যেখানে সেখানে দেখা না দিলেও আরসোলারা ফর্ ফর্ আর ধেড়ে ইঁদুররা ধর্ ধর্ করে' ঘরময় না ঘুরলেও, তেমন কিছু অনিষ্ট না ঘটলেও, এক জায়গায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকাটা—এম্‌নিতেই কেমন খারাপ লাগে নাকি? ভাড়াটে বাড়ী আঁকড়ে, মাটি কামড়ে-পড়ে-থাকা একটু বাড়াবাড়ি দেখায় না? পৈতৃক ভিটে কিছু নয়, পরকে টাকা গুণে পরের বাড়ীতে তৎপর হয়ে থাকব—অতটা পরার্থপরতা কি ভালো?

সেদিন সকালে বিনি, অকারণেই, কলতলায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এবং উঠেই বল্ল, প্রথম কথাই বল্ল সে:

"এই আস্তাবলটা এবার ছাড়ো তো বাপু!"

"এই আস্তাবলটা এইবার বদ্‌লানো দরকার। বহুদিন তো কাট্‌ল!" আমিও ওর হ্রেষাধ্বনিতে যোগ দিয়েছি। তার একটু আগেই বিছানায় কালির দোয়াতটা উল্টে ছিলাম, কাজেই আমার সহানুভূতির অভাব ছিল না।

এবং তারপরেই আমরা তীরবেগে রাস্তায় নেমে বাড়ী খুঁজ্‌তে বেরিয়ে পড়েছি।

কিন্তু মনের মত বাসা আর পাই কই? 'টু-লেট্' দেখলেই এগিয়ে যাই, খানিকক্ষণ লট্‌কে থাকি, তারপর আরো একটু বেশি দেখে ছিট্‌কে বেরিয়ে আস্‌তে হয়।

"টু-লেট্' তো চার ধারেই ছড়ানো, অনেক বাড়ীতে ভাড়াটে এসে জুট্‌লেও ছাড়ানো হয়নি। নতুন বাসিন্দারাই নড়াতে দ্যায়নি, ভাড়া করার দ্বিতীয় দিনেই, কড়ার্ ক'রে বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিয়ে রেখেছে। কড়া নোটিশ।

পয়সা খসিয়ে, ইঁট কাঠ বসিয়ে এসব কি বানিয়ে রেখেছে এরা? জমির ওপর এসব কী জমিয়ে রেখেচে? দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেল। এদের—এই সব অট্টালিকাদের—ধরাশায়ী করবার জন্যেই অনতিবিলম্বে 'বড় গোছের ভূমিকম্প কিম্বা এয়ার্-রেড্ একটা কিছু হওয়া দরকার।

অবশেষে, বেহালার দিকে একটা ভালো বাড়ীর খোঁজ পেলুম। আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই নাকি বাড়ীটা। অল্প কখানি ঘর নিয়ে, ছোট্ট-খাট্টর মধ্যে, অথচ ভাড়াও বেশি নয়; এমন কি তার একতালার ঘরগুলোও তালাক্ দেবার মতো না! তালা দিয়ে না রেখে ব্যবহার করবার মতোই। সাম্‌নে একটু লনের মতও রয়েছে নাকি!

খবর পেয়েই ছুট্ দিলুম। বিনি আর আমি।

খবরটা উড়ে এলেও, একেবারে উড়ো খবর না। অনির্ব্বচনীয় নাহলেও, পছন্দসই সত্যিই। আশপাশ থেকে, এ-কোণ ও-কোণ—নানান্ কোণ থেকে, নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে, উপাদেয় বলেই বোধ হোলো বাড়ীটাকে। বার থেকে তো ভালোই, এবার ভেতরে পা বাড়িয়ে দেখি।

বাড়ীওলার ছেলে এসে সদরের তালা খুলে দিলে। তালার ওপরে ধূলো জমে রয়েছে। মাথার চৌকাঠে মাকড়সার জাল লাগানো। দেয়ালে দেয়ালে চটা-উঠে-যাওয়া। সারাবাড়ীর আষ্টেপৃষ্টে কী একটা সাবেক কালের ছোপ—কেমন একটা প্রত্নত্ত্বের ছাপ মারা যেন!

"পোড়ো বাড়ী নয় তো দাদা?" বিনি খুঁৎ খুঁৎ করে।

"না না! কী বল্‌ছেন?" ছেলেটি প্রতিবাদ জানায়: "চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পোড়েনি। তাহলে তো আমরা ইন্‌সিওরেন্সের টাকাগুলো পেতাম। বেশ মোটা টাকা।"

"য়্যা, কী বল্লে?" আমি বিচলিত হই।

"দমকলওলাবা এসে পড়্‌ল কিনা!" ছেলেটি অভিযোগ করে।

কি রকম একটা আধপোড়া ধরা ধরা গন্ধ বাড়ীটার গা থেকে এসে আমাদের নাকে ধাক্কা মারে। পুরণো, ফিকে, কি জাতীয় একটা বিজাতীয় কেমন গন্ধ!

"কদ্দিন ভাড়া হয়নি, য়্যাঁ?" আমি জিগ্যেস্ করি: "আগের ভাড়াটেরা উঠে গেছে কদ্দিন?"

"তা বেশ—বেশ অল্প কিছুদিন।" ছেলেটি থেমে থেমে বলে।

"অল্প কিছুদিন? বল কি? দরজায় মাকড়সার ওড়্‌না বসানো দেখছি যে?"

"কী বলছেন?" ছেলেটি চোখ বড় বড় ক'রে তাকায়।

"মাথার ওপর মাকড়সার জালিয়াতি দেখছি কিনা!" আমি সহজ ক'রে বলি এবার। এবং সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজিতে পরিষ্কার ক'রে মানে ক'রে দিই: "দে হ্যাভ্ ফোর্জ্জ্‌ড্ য্যাহেড্!"

যাক্ ভেতরে তো পা বাড়াই।

ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে আসে না। বলে: "আমার ইস্কুলের টাইম হয়ে যাচ্চে।"

"কত আর দেরি হবে? ঘরগুলো একবার ঘুরে ফিরে দেখা বইতো না!" আমি ওকে অভ্যর্থনা করি। "এসো এসো! চলে এসো!"

দরজায় মাকড়সার ওড়্‌না বসানো দেখছি যে

"আমি বাইরেই আছি। বেশ আছি।" ছেলেটি আমাদের প্রেরণা দ্যায়: "যান্ না, ভয় কি? এখানেই তো আছি।"

দরজা খুলে, মাকড়সার জালনা ভেদ ক'রে ভেতরে তো ঢুক্‌লাম। ঢুকে দেখলাম, যে লোকটা খবর দিয়েছিল নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। পাকা সিমেন্ট-করা, নীচের ঘরগুলো পর্য্যন্ত চমৎকার! সামনের লনে দিব্যি ব্যাডমিন্‌টন্ চলবে। ধূলোবালি ঝেড়েঝুড়ে, ধোলাই ক'রে নিতে পারলে—তোফাই হবে। বাড়ীখানি বেশ। ভাড়াও বেশী নয়। কলকাতার বুকে এ যে একেবারে রাজযোটক!

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠা গেল।

এবং উঠেই যা দেখলাম—সে এক দৃশ্য!

সামনের ঘর থেকে দুটি যুবক—হৃষ্টপুষ্ট দুটি যুবক—যদিও সে-সময়ে তারা যে খুব হৃষ্ট ছিল হলপ্ ক'রে একথা বলা যায় না—হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে এল—হুটোপাটি করতে করতেই বেরিয়ে এল। দুজনের মধ্যে সে কী হাঁচোর-পাঁচোর, ধ্বস্তাধ্বস্তি আর আছড়া-পাছড়ি। পরস্পরের ধাক্কা সামলাতেই দুজনে বারান্দায় গিয়ে পড়েছে—একেবারে কাঠের রেলিংটার কাছ ঘেঁষে বারান্দার ধারটায়।

এ ওকে কিলোচ্ছে, সে তাকে কিলোচ্ছে। যে যাকে পাচ্ছে কিলিয়ে নিচ্ছে।

দুজনের মধ্যে সে কী তুমুল সংগ্রাম!

অতখানি বীরত্বের চোট সামান্য কাঠের রেলিং সইতে পারবে কেন?

সেই মুহূর্ত্তেই কাঠের গণ্ডী ভেঙে দুজনেই—দুজনাই তারা—দারুণ তাল ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে—কোথায় আর? কোনো গতিকে কাঠের রেলিংয়ের মায়া একবার কাটাতে পারলে কোথায় আর যাওয়া যায়? সোজা নীচের দিকে অধঃপতনের পথে, সিমেণ্ট দিয়ে শানানো একতলার উদ্দেশ্যেই সটান্ রওনা হয়ে গেছে। ততক্ষণে তাদের চিহ্নমাত্রও নেই—অন্ততঃ বারান্দার ওপরে তো নেই। তাদের তখনকার চোখ মুখের সেই ভীতিবিহ্বল ছবি এ-জীবনে আমি ভুলতে পারব না।

এত কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের সামনেই—আমার আর বিনির চোখের ওপরেই।

এবং একেবারে নিঃশব্দেই ঘটে গেল!

বলা বাহুল্য, ওরকম একটা দৃশ্যের পর ওবাড়ীতে আর ওঠা চলে না। ভূতে ভূত কিলোচ্ছে, এরকম দেখতে পাওয়া সচরাচর দুর্ল্লভ, খুবই বিরল তাতে ভুল নেই, কারণ, শোনা যায় এবং দেখাও গেছে—(নিজের কানে এবং অন্যান্যের চোখেই)—যে, ওরাই অপরদের, যারা ভূত নয় তাদের ধরে পাকড়ে মজা করে' পিটিয়ে নেয়। খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে পড়া যায় না যে তা নয়!

তবু, দর্শনীয় হিসাবে যতই কেন উপভোগ্য আর অভূতপূর্ব্ব হোক না, সেই দুর্ম্মূল্য বিলাসিতা করতে গিয়ে কে ওদের কিলাতিশয্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে? তাছাড়া, বিনি আমাকে বুঝিয়ে দিল, এমনও তো হতে পারে, ওরা ষড়যন্ত্র ক'রে একটা সন্ধিসূত্রে এসে, অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে কিম্বা বেওয়ারিশ বিবেচনায়, আমাদের দুজনকে শতকরা পঞ্চাশের-আধাআধি বখরায় নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা করে নিতে পারে। ভাগাভাগি করে বিনে পয়সায় মারামারি করবার মৎলবেই।

এবং আমিও বিনিকে বুঝিয়ে দিলাম, সেরকমটা হলে 'মারামারি' আর হবে না।

কেননা, ভূতকে মারা, আর যার দ্বারাই হোক, আমায় দিয়ে অন্ততঃ হবার নয়। নিজের ক্ষতির ভয়ে নয়, ভূতের প্রতি মমতায় নয়, এবং কেবল যে আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত তা বলেও না, তবু আমার দুঃসাহসের একটা সীমা আছে তো! অতএব, ওটা কেবল একতরফা, ভূতের জবানি, একচেটে 'মারি' হবে বলেই ধ'রে নেয়া যেতে পারে। এবং স্বচক্ষে যা দেখা গেল, যে রকম এক রোখা চলতে থাকবে, তাতে মহামারী তো বটেই!

অতএব বাড়ী বদলানো আর হলো না! সেই দুর্ঘটনার পর, অপর কোন অচেনা আড্ডতে ওঠা আমাদের সাহসে কুলোলো না। কোথায় গিয়ে ফের কিম্বিধ ভূতের দর্শন পাবো কে জানে! যেখানে আছি সেই ভালো! পুরণো কোটরেই পুনর্মুষিক হয়ে পড়ে থাকলাম। এই সাবেক আড্ডাটার সুবিধা এই, (যেটা নতুন করেই সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়ল) এখানে আশেপাশে যে দুএকজন অবাঞ্ছনীয় রয়েছেন, তাঁরা নিতান্তই জলজ্যান্ত এবং জানাশোনার ভেতরে; এখন পর্য্যন্ত এতদিনেও একটিও মৃত ভূতের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। এবং বিনির বিবেচনায় (আর আমারও ঐ মত) মৃত ভূতরাই বেশি রকম ভয়াবহ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ইতিমধ্যে বিনি একদিন সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছে এবং এক রাত্তিরে আমি—আমি নিজেও—খাট থেকে পিছলে গেছি, আর ছোট খাট হোঁচট তো লেগেই রয়েছে, চলতে ফিরতে ঠোকাঠুক্করও বড় কম খাচ্ছি না, এ-ছাড়া অম্লমধুর আছাড়ের তো কথাই নেই! তবু, অখাদ্যের এত বাড়াবাড়িতেও, বাড়ী বদলানোর নাম কেউ মুখেও আনিনি। এত সব সত্ত্বেও, চমৎকার শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করা যাচ্ছে। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

"আমি, আমি লালায়িত রায়। একজন লেখক।" বল্লেন তিনি। "হাসির গল্প লিখি।"

"ও! তা—তা—" আমি আমতা আমতা করি: "আপনিও একজন হাস্যকর লেখক? বেশ বেশ।"

লোকটিকে, লেখকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হয়।

"আমি আসছি বেহালা থেকে। 'আবছায়া' নামক পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে। আবছায়ার নাম শুনেছেন নিশ্চয়?"

"আবছায়া? শোনা শোনা বলেই মনে হচ্ছে তো। তা, কী দরকার বলুন।"

"আজ্ঞে, আবছায়া সম্পাদক তুষানল ভট্ট—যিনি একাধিক বৈজ্ঞানিক বই লিখেছেন—"

"হ্যাঁ, জানি। ভট্ট মশায়ের নাম শুনেছি। এক আধখানা পড়েও থাকব। খুব অখাদ্য লেখেন না ভদ্রলোক।"

"আজ্ঞে না, ভালই লেখেন। আমার চেয়ে ভাল না, তবু খুব মন্দ নয়। তাঁর

কাছ থেকেই আসছি, এবং আমার নিজের কাছ থেকেও বটে। আমরা তুজনেই আবছায়ার—কামধেনু—কি বলে গিয়ে—সৃষ্টিকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা—একমাত্র আর অদ্বিতীয়।"

"তা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কী কারণে আসা? আমি কি করতে পারি বলুন।" এবং আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিই: "সম্পাদকতা আমি করতে পারিনে।"

"না না না, সেজন্যে নয়। এবং লেখার জন্যেও না। আমরা আপনার কাছে লেখা টেকা চাইনে, ভয় নেই, ছোট্ট একটু কাগজ, আমরা তুজনে লিখেই কুলিয়ে উঠতে পারিনে, তার ওপরে আমাদের পিস্‌শ্বশুর মাস্‌শ্বশুর মামাশ্বশুর এবং কম্পোজিটাররা রয়েছেন। কম্পোজিটাররাও আমাদের কাগজে হাত পাকায়। পাকিয়ে নেয়—বেতন পায়না কি না! সে জন্যে নয়, তবে—তবে কিনা—" বলতে বলতে উনি থেমে যান।

কিছুটা তখন আমি আশ্বস্ত হয়েছি: "তাহলে আর ভয় কি? লিখ্‌তে না হলে আর ভয় কি? বলুন! বলে যান্!" ওঁকেও তখন ভরসা দিই।

"আজ্ঞে, আমরা আপনাকে একটা টী পার্টি দিতে চাই। খুব ছোট্ট একটু টী পার্টি। তার নিমন্ত্রণ করতেই আমি এসেছিলুম। আপনার সুবিধামত একদিন, যেদিন আপনি বলবেন, আমাদের ওখানে গিয়ে, দয়া করে যদি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ—"

জলযোগের আবাহনে কে না কাবার হয়? আমিও একটু কাৎ হলুম।

"তা, আর কে কে থাকবেন, সেই পার্টিতে?" আমি জিগ্যেস করি: "নাম করা লেখকদের আর কেউ?"

"তাঁদের অনেককেই আমাদের করা হয়ে গেছে। তাঁদের খতম করেই আপনার কাছে এসেছি। এদিন কেবল আপনি আর আমরা। আমরা মানে, সম্পাদক তুষানলবাবু আর আমি। আমি হচ্ছি আমাদের আবছায়ার সহকারী সম্পাদক এবং—এবং সহকারী সম্পাদক থেকে ষ্ট্রীট হকার পর্য্যন্ত সব। গুপ্ত কথাটা আপনাকে বলতে আর দোষ কি? আপনি তো আমাদেরই একজন।"

"তা বেশ। আমরাও জন তুই যাব। আমি আর বিনি। ওঃ, বিনি? বিনি আমার ছোট বোন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে, যথাসময়ের কিছু আগেই, বিনি আর আমি বেহালায় গিয়ে পৌঁছলাম। অনেক যুঝে ঠিকানাও খুঁজে বার করা গেল।

য়্যাঁ, এযে সেই বাড়ী! সেই মারাত্মক বাড়াবাড়ি যার রেলিং ভেদ করে একদা নীচে নেমে গেছল সেই প্রাণ-নিয়ে-টানাটানি বাড়ীই যে!

দরজার মাথায় 'আবছায়া কার্য্যালয়'—সাইন্‌বোর্ড লটকানো, এবং তার পাশেই সিনেমার লম্বা চৌড়া বিজ্ঞাপন মেরে গেছে:

দেবদত্ত ফিল্‌মের

পথ ভুলে!

—তৎসহ—

সাবধান!!

একে বিনি সারা রাস্তা পাশাপাশি, 'তুমি ভুল করো না পথিক!'—গুণ গুণ করতে করতে এসেছে, তার ওপরে ভূতপূর্ব্ব সেই বাড়ী আর তার গায় লেপ্‌টানো এই বিজ্ঞাপন—সাবধানাত্মক এই বাণী—দেখেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমি আর আমার মধ্যে তখন নেই!

আগুপিছু করতে করতে কখন কড়া নেড়ে বসেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন।

"এই যে! আপনারা! আপনারাই! আপনাদেরই অপেক্ষা করছি"—অমায়িক ভাবে করমর্দ্দনে তিনি এগিয়ে এলেন: "আমিই তুষানলবাবু। আমার সেই মাসতুত ভাইটি—আমাদের সহকারী সম্পাদক—তিনি একটু বেরিয়েছেন। এই এসে পড়ল বলে। আসুন আপনারা।"

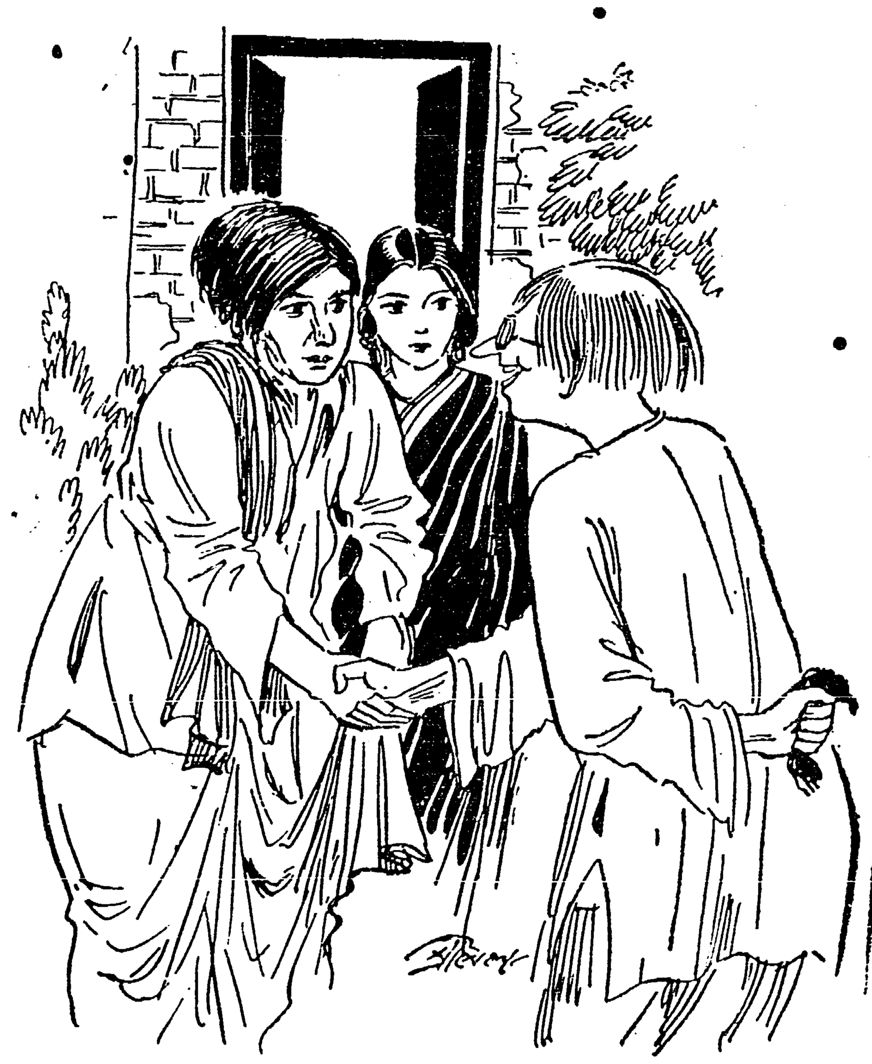

আমিই তুষানল বাবু

এই বলে' আমাদের হস্তগত ক'রে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তুষানলবাবুকেও কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা বলেই সন্দেহ হোলো। কোনো সাহিত্যিকের আসরে বা সাহিত্য-বাসরেই দেখে থাকব হয়ত। আজকাল প্রত্যেক অলি-গলিতেই তো লেখকের বৈঠক বেধে রয়েছে। সাহিত্যের আখড়ার তো অভাব নেই! প্রায় সকলেই কাগজের ওপর কুস্তি করছে।

দোতালায়, সেই কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দার কোণ ঘেঁষে, একটা তেপায়া টেবিল ঘিরে আমরা তিনজনে বসলুম। সেই কাঠের রেলিংটা তেমনি অক্ষত দেহে রয়েছে; এখনো ছিন্নভিন্ন হয়নি। একান্ত অকারণেই তখনো আমাদের বুক মাঝে মাঝে ছম্ ছম্ করে

উঠলেও নিতান্ত অমূলক ভয়েই, এমন চমৎকার বাড়ীটা আমরা হাতছাড়া করেছি তা বুঝতে বাকী ছিল না। কেননা, এই তুষানলবাবুরাই বা এমন কি মন্দ আরামে এখানে বসবাস করছেন? তাঁরা যে সদাসর্ব্বদা বা কালেভদ্রে কখনো এস্থলে কোন বিভীষিকা দেখেছেন বা দেখে আসছেন—তাঁদের চেহারায় কই তার চিহ্নমাত্রও তো নেই!

কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসতে থাকে!

ভেবে দেখলে, ভূত জিনিসটা কী? অতীতের আবছায়া ছাড়া আর কিছু তো নয়? বিগতকালে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আকাশপটে তার পুনর্মুদ্রণ বই তো নয়? পৃথিবীর যত কিছু শব্দের মতো যাবতীয় দৃশ্যও তো আবহাওয়ার ভাঁড়ার-ঘরে জমা হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগতই জমছে। আমাদের কান যদি কখনো রেডিয়োর পর্য্যায়ে ওঠে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওঠে, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই আমরা আকাশবার্ত্তা শুনতে পাই, দৈববাণী যার নাম দিয়েছি। তেমনি এই নশ্বর নেত্র যদি কখনো টেলিভিসনের পর্দ্দায় নামে, তাহলে তার আকস্মিক আভাসেই দৈবাৎ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে যায়—যাকে বলি ভূত! কিন্তু বার-বারই যে সেই একুই দৃশ্য দেখব, বারম্বারই এই চর্ম্মচক্ষু টেলিভিসনে পরিণত হবে তার কি কিছু মানে আছে? হায় হায়, অন্ধতাবশে, ভুলক্রমে এমন যার-পর-নাই বাড়ীটা বেহাত হতে দেয়া বড্ড বোকামি হয়ে গেছে, মনের মধ্যে হাহুতাশ হতে থাকে।

একটু পরেই লালায়িত রায় অকৃত্রিম সম্পাদকের সহযোগী সেই আদিম লেখক, এক রাশ খাবারের মোট নিয়ে ফিরে এলেন। খাবারের সম্পাদনা করতেই তিনি বেরিয়ে-ছিলেন, বোঝা গেল। কিন্তু তাঁকে দেখে আর তাঁর হাতে খাবারের ঝুড়ি দেখে কোথায় আমরা পুলকে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ব, তা না ততক্ষণে আমাদের হয়ে এসেছে!

প্রথম দর্শন থেকেই ওঁদের দু'জনকে আমাদের চিনি চিনি ঠেক্‌ছিল। কিন্তু কেন যে অত মিঠে মনে হচ্ছিল, এখন ওঁদের উভয়কে একসঙ্গে দেখে, একেবারে পাশাপাশি দেখে, যুগপৎ দেখবার পরে বুঝ্‌তে আর বাকী থাকল না।

এঁরা উভয় যে সেই দুটি ভয়—ভয়াবহ সেই দুই অভিব্যক্তি—একদা যাঁদের আমরা এইখানেই, এই বারান্দার ধারেই, ধাক্কাধাক্কি করে' রেলিং ভেঙে সবেগে নেমে যেতে দেখেছি—সেকেলে সেই—দুই অবতারই আজ এই—দুই নব-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেবিষয়ে আর সংশয় মাত্র রইল না।

সেদিন এঁদের—এই মারাত্মক মাসতুত ভাইদের—অশরীরী দেহে দেখেছিলাম, ওঁদের কার্য্যকলাপও ছিল নিঃশব্দ। কিন্তু আজ—আজ একটু আগেও তো ওঁদের একজন করমর্দ্দনের অজুহাতে নিজের অস্থিমজ্জার অস্তিত্ব আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং এতক্ষণ ধরে' কতো খোশ গল্পই তো একত্র বসে করা গেল—এসব কি একান্তই মহাপ্রভুদের ছলনা তাহলে?

এঁরা কি তাহলে—তাহলে তাই ছাড়া আর কিছু নয়? ভাবতে না ভাবতেই আমাদের হৃৎকম্প সুরু হয়।

কিন্তু একটু একটু করে আমাদের ভয় ভাঙে। দুজনের—দুই মাসতুত ভাইয়ের—গলায়-গলায় ভাব দেখেই সন্দেহ দূর হয়। ওঁদের চালচলন অত্যন্তই স্বাভাবিক—সাধারণ মানুষের যেমন হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ব্যত্যয়—কিছুমাত্র মারাত্মকতা নেই—এবং রেলিং চূর্ণ-করার ঘোরালো কোনো যে মৎলব ওঁরা মনে মনে ভজছেন, ওঁদের আচার ব্যবহার থেকে ঘুর্ণাক্ষরেও তা বোঝবার যো নেই।

তবে বোধ হয় এখনও ওঁরা সম্পূর্ণরূপে ভূতান্তরিত হতে পারেন নি। আগের নশ্বর শরীরেই, কষ্টেসৃষ্টে, রয়ে গেছেন তাহলে!

আর তাছাড়া, ভেবে দেখতে গেলে (ভেবে আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে), একজন ভূতের পক্ষে (না হয় দুজনই হোলো) পক্ষের পর পক্ষ, একখানা পত্রিকা বার করা এবং তার সমস্ত কপি লেখা, লেখা যোগাড় করা, তার ওপরে প্রুফ দেখা তারপর সেই সব কচায়ন প্রেস থেকে ছাপিয়ে আনা, (ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে) তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে ষ্টলে গিয়ে কত না কপি জমা দিয়ে আসা, এবং সব শেষে সহরের সব হকারদের কাছ থেকে মারামারি করে' কাড়াকাড়ি করে' তার দাম আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়। একজন ভূতের পক্ষে এত ভূতের খাটুনি খাটা কি সম্ভব? দুজনের পক্ষেও কঠিন। রীতিমত কঠিন। সত্যিকারের ভূত হলে এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে কবে চম্পট দিত।

কিন্তু তবুও সেই অতীতের কথা মনে হলে একটু যেন কেমন লাগেই, একটু আশ্চর্য্যই লাগে কেমন! ভূত যদি না হয় তাহলে সেদিন তবে কি আমরা ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম?

নিছক ভবিষ্যৎ-ই? ভূত নয় তাহলে?

খাবার আসরে সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা দুজনেই পাশের ঘরে ঢুকেছিলেন। জলযোগের গোছগাছ করতেই বোধ হয়।

বিনি আর আমি, মুখোমুখি তাকিয়ে থাকি, এক কথাই ভাবি দুজনে। কী যে ভাবি তা আমরা নিজেরাই জানিনে।

একটু পরেই একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে: "এই এই! তুই খাচ্ছিস্ যে বড়ো?"

"বাঃ, আমি কষ্ট করে' আন্‌লাম! আমি খাব না?"

"তা বলে' এখন খাবি? এখুনই খাবি? অতিথিরা বসে নেই? আগে তাদের দেয়া হোক্!"

"ভারী আমার অতিথি! বস্তিবাটির আস্তিখুড়ো আমার! যতই খাওয়াও চাঁদ,

ভবী ভুলবার নয়! অনেক তো খাইয়েছ, অনেককেই তো খাইয়েছ। খাইয়ে ফল হয়েছে? বিনে পয়সায় লেখা পেয়েছ একটাও? সে-বিষয়ে হুঁসিয়ার, সে পাত্রই নয় ওরা।"

"শুন্‌তে পাবে, চুপ্‌!"

"শুন্‌লো তো বয়েই গেল। আমি থাক্‌তে আব্‌ছায়ায় আর কারুকে লিখতে দিচ্ছি নে। টাকা দিয়েও না। টাকা নিয়েও নয়। কেবল আমি লিখব। আর তুমি,—তুমি সম্পাদক, তুমিও লিখ্‌তে পারো। আর কেউ না।"

"আব্‌দার আর কি! জানিস্‌ আমার কাগজ? তোকে লিখতে দিয়েছি তাই বর্ত্তে গেছিস্‌। তোর লেখা কেউ ছাপে নাকি?" চার ধারে তো কেঁদে বেড়াস্‌!

"আমার লেখার তুমি কি বুঝবে? জান্‌ত তোমার দাদা। লেখার জন্য রোজ ধর্না দিত আমার বাড়ী। ক'জোড়া জুতোই খইয়ে ফেলেছি! হুঃ!"

"দাদা তুলোনা বলছি। ভালো হবে না কিন্তু।"

"তোমার চেয়ে ভালো লিখি কিনা, সেই জন্যেই তোমার রাগ। বুঝেছি। কিন্তু তার জন্যে আর কী করবে? কে আর তোমার মুখ চেয়ে খারাপ লিখতে যাচ্ছে? কালকের ছেলেও তোমার চেয়ে ভালো লিখে তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তোমার চেয়ে নামজাদা হয়ে যাচ্ছে। তা বাপু তুষানল, নিজের অনলে এমন তিলে তিলে আর কত দগ্ধ হবে? তার চেয়ে গলায় দড়ি দাও—সেই তোমার ভালো।"

"ছ্যাখ্‌, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইসা এক থাপ্পড় কসাবো টের্‌ পাবি তখন! সব লম্ফ ঝম্ফ বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি। তোর লেখা ছাপানোও বেরিয়ে যাবে। আর তোর লেখা ছাপ্‌ব না, যাঃ!"

"তোমার লেখাই বা কে ছাপচে? আর কোন্‌ কাগজ ছাপচে? নিজের বই তো নিজের টাকায় ছাপো, আবার কথা কইতে আসো! নিজের দোকানে নিজে দাঁড়িয়ে ব্যাচো! কখনো তার বিক্রি হয়? পরের হিংসেয় জ্বলে মরছ কেবল! সম্পাদক বলে' কিছু বল্‌ছি না, নইলে—"

তর্জ্জনের তোড়জোড় বেড়েই চলে। বিনি ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাকায়।

হঠাৎ ধাঁ করে' একটা রসগোল্লা কক্ষচ্যুত হয়ে ছিট্‌কে আসে, উল্‌কার মতই ছুটে আসে, কিন্তু একটুর জন্যে ফস্‌কে যায়। আমার গালে এসে লাগে,—ওদের গোলমাল শুনে আমি হাঁ করে' ছিলাম, কিন্তু কোনো ফল হয় না। মুখের মধ্যে না ঢুকে রসগোল্লাটা, গালের গায়ে লেগে, আমাকে বাঁয়ে রেখে নিজের আবেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়।

গতিক ভালো নয়। অন্ততঃ রসগোল্লাদের গতি বিধি খুব সুবিধের নয়।

কিন্তু তাছাড়াও—আরেকটা খট্‌কা লাগে। চট্‌ করে' আমার মনে হয়, অতীতকালের

সেই ভবিষ্যৎ—সেই সুদূরপরাহত সম্ভাবনা, অত্যন্ত বর্ত্তমানে, এখনই নিতান্ত আসন্ন হয়ে আস্‌ছে না তো? ঘোরালো হয়ে, আরো জোরালো হয়ে এবং ঐ ক্ষীণকায় রেলিংএর ওপর যতদূর সম্ভব ভারালো হয়ে? য়্যাঁ!

কিন্তু একদা যাদের ভূত বা ভবিষ্যৎ যাই হোক আমরা দর্শন করেছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও যারা ভূত হতে পারেনি, তাদের কি অকৃত্রিম আসল ভূতে পরিণত হতে বেশি আর দেরি নেই?

কাঠের রেলিংটা অটুট রয়েছে, এখনো রয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ আর এমন থাক্‌বে? ভাবতেই আমরা শিউরে উঠি।

আইন্‌ষ্টাইন্‌ নাকি বলেছিলেন, যা অতীত, তাই ভবিষ্যৎ, এবং তারাই আবার বর্ত্তমান; এক কথায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব একাকার। মোটের ওপর এই গোছের কী একটা কথা বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে আমাদের কাছে তিনি গছাতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য আমার বোধগম্য হয়নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে, জাজ্জ্বল্যমান্‌ দৃষ্টান্তের সামনে—আগতপ্রায় ওই দুই উদাহরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিমেষের মধ্যে সেই তত্ত্ব, দুরধিগম্য সেই তথ্য, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার মাথার মধ্যে খেলে যায়।

সমস্ত কাল, ইহকাল ও পরকাল, কালাতীত সব রহস্য, এই কালান্তক আসন্নতার কাছাকাছি আস্‌তেই পলকের মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে—চিচিং ফাঁকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

বুঝতে পারি, ইতিহাস যেমন ঘুরে ফিরে আসে, যে-কারণে আসে, তেম্‌নি সেই কারণেই, অনন্তের অজ্ঞাত-ভাণ্ডারে-জমানো একই সব দৃশ্য, অভিন্ন সব কথা, অনুরূপ সব ভাব, যুগে যুগে, খোলস বদ্‌লে যাতায়াত করে। খবরের কাগজের নিউজ্‌ কলমর মতো, নতুন হুজুগের রূপ নিয়ে, সেই-সব একঘেঁয়ে পুরণো খবর পুনরাবৃত্ত হয়। ঘুরে ফিরে ফের এসে দেখা দ্যায়—আবার আমরা নতুন করে' পড়ি। পড়তে বাধ্য হই।

হারানো অতীত, বাড়ানো বর্ত্তমানে এসে হারিয়ে গিয়ে আবার অনাগত ভবিষ্যতে উদ্‌যাপিত হতে থাকে। যেই উদ্‌যাপনের দায় নিয়ে পুনঃ পুনঃ আমরা জীবন যাপন করি—কিন্তু কার জীবন যাপন করি? আকাশের সংবাদপত্র আগাগোড়া যার পড়া, যার নখদর্পণে, এমন কেউ যদি কোথাও থাকে, সেই কেবল তা বল্‌তে পারে।

এই সব ভাবি আর কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে!

আর কিছুনা, ভূত-ভবিষ্যৎ মাথায় থাক্‌, কেবল বর্ত্তমানের হাত থেকে—আত্মরক্ষা করবার জন্যে, খুনোখুনির সাক্ষী হবার দায়িত্ব থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্যেই, আমি আর বিনি, পরস্পরকে করায়ত্ত করে' সেই যে সেখান থেকে ছুট্‌ মেরেছি—

বেহালার পথে আর পা বাড়াই নি।

কোনোদিন বাড়াবও না।

কবিতা

রূপনগরের কথা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শফর করি বজরা নিয়ে রাজার ছেলে চলে—
মন্ত্রী কোটাল সওদাগরের ছেলেয় নিয়ে দলে।
রূপনগরের রাজকুমারী মায়াপুরীর দেশে
বিজয় ক'রে আনতে হবে দিগ্বিজয়ীর বেশে।
তখন কিনা শীত কমেছে দ'খ্‌নে হাওয়া বয়
শুক্‌নো গাছের প্রথম সবুজ বর্ণ পরিচয়,
অস্ত্র নিয়ে শস্ত্র নিয়ে সঙ্গী সরঞ্জাম
শড়কী ধনুক বর্শা নিয়ে তোরঙ্গ তাঞ্জাম,
এক যে বৃহৎ গহীন বনের চৌমোহানীর মোড়ে
চার জনে এক নৌকা নিয়ে রওনা হলেন ভোরে।
বাঘের ছানা দেখ্‌তে পেয়ে উঁচিয়ে তোলেন তীর—
"হে শিকারী, রক্ষা করো বাঁচাও মোরে বীর।"
লেজটী নেড়ে বাঘের ছানা বললে, "কুমার শোনো,
আমায় প্রাণে বধ কোরো না লাগবো কাজে কোনো ;
একটী নখে গলায় পোরে একটী কোরো তাগা
মায়াপুরীর মন্ত্রে তোমার লাগবে নাকো দাগা।"
একটুখানি এগিয়ে যেতেই ভল্লুকেরি দেখা,
ঘোঁৎ ঘোঁতিয়ে চলেন মিঞা নাইকো চিন্তা রেখা।
মন্ত্রিপুত্র লক্ষ্য করেন এই মারে তো তীর
দেখ্‌তে পেয়ে ডুকুরে কেঁদে বললে, "শোনো বীর,
বাঁচাও প্রাণে জীবনদানে লাগবো কাজে কোনো
আমার লোমে লক্ষ ফণী সখ থাকে তো গোণো।"

এমন সময় হস্তীমশাই হন্ত দন্ত হ'য়ে
আবির্ভূত অরণ্যানীর মল্ল পরিচয়ে।
বৃংহণেরি নিখাদ সুরে শিউরে উঠে বন
লক্ষ্য করেন কোটাল কুমার কৌতূহলী মন।
দফা এবার রফা হ'ল হস্তী বলেন ভেবে—
"কীই বা আমার আছে কুমার কীই বা তুমি নেবে ?
একটী দাঁতে বাঁধাও ধনু আর একটীতে তীর
বজ্রে যেন প'ড়বে হেন মায়াপুরীর বীর।"
মাণিক জোড়ের একটী এল পত্‌পতিয়ে ডানা
সওদাগরের লক্ষ্য হতেই দিলেন তা'রে হানা।
অমনি পাখী ব'ললো ডাকি; "আমায় রাখো প্রাণে
মায়ার পালক দেবো তোমায় তিরস্করণ বাণে,
যেই না তুমি মারবে সে বাণ অমনি যাবে উপে
কেউ পাবে না দেখ্‌তে তোমায় কোথাও কোনো রূপে,
পাখীর মত উড়বে তুমি গরুড় হেন বেগে
তোমার তেজে চূর্ণ পাহাড় বিজ্‌লী হানা মেঘে।"

এই না পেয়ে চার শিকারী মায়াপুরীর দেশে
তুমুল কাণ্ড লণ্ড ভণ্ড করেই হেসে হেসে।
পায় না কেহই দেখ্‌তে তা'দের করতে নারে কিচ্ছু,
লক্ষ ফণী এদের শরে তা'দের শরে বিচ্ছু !
বাঘের নখের কবচ ঠেকে মায়ার যাদু কাটে—
বজ্র বাণে মায়ার তোরণ ফুটির মত ফাটে !
মায়াপুরীর রাজকুমারী হ'লেন স্বয়ম্বরা—
আপনি এসে রাজকুমারে বরণ করেন ত্বরা।
ভগ্নী তাঁহার তিনটী ছিল বয়স কাছাকাছি
(তাঁরা) মন্ত্রী কোটাল সওদাগরের পুত্রে নিলেন বাছি।
মাণিক জোড়ের পালক পেয়ে মাণিক জোড়া জোড়া
(যেন) ঝম্প দিয়ে ফির্‌লো ঘরে পক্ষীরাজের ঘোড়া।

মানুষে মানুষ খায় ?

শ্রীশামুক

ডুম্—ডুম্—ডুম্ !—অবিরাম বাজছে একঘেঁয়ে স্থর, ঘুঘু পাখীর ডাকের মত করুণ অনেকগুলি মানুষ ভাঙ্গা গলায়গাইছে—মালুডগামুলাঙ্গা বুলু বুলু হা হা—বারবার। ঘুমপাওয়া ক্লান্ত গলা, একই কথা একই স্থরে বলছে মন্ত্রের মত। বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠে আশঙ্কায়। ঐ একঘেঁয়ে বাজনা ও গানে যেন একটি সম্মোহনী শক্তি আছে—কাছে টেনে নিয়ে যায়। জঙ্গলের স্তব্ধ গাছপালা সরিয়ে, নির্লজ্জ জলাভূমির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এগিয়ে যেতে হয়—মাথার উপর স্তূপী-ভূত মেঘ, কালো মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে। কাছে আসার সঙ্গে আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠে—স্থরের ভিতর যে নিষ্ঠুরতা লুকানো ছিল—এবার প্রকাশ পায়। ঘন গাছের লতাপাতা দু'হাতে ফাঁক করে দাঁড়াতে চোখে পড়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জঙ্গল সাফ্ করে তৈরী। মাঝখানে জ্বলছে আগুন, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ফুঁড়ে লক্‌লকে শিখা লাফিয়ে উঠছে,—আকাশ ছুঁতে চায়। পাশে একটি মানুষ মড়ার মত সোজা শুয়ে আকাশের দিকে মুখ, আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা। আগুন ও মানুষকে ঘিরে এক বিস্তৃত পরিধিতে অনেকে নাচছে, ডুম্ ডুম্ ডুম্ করে বাজনা বাজাচ্ছে আর স্থরে গাইছে—মালুডগামুলাঙ্গা—বুলু—বুলু—হা—হা। হাতের বর্শার চেয়েও মুখগুলি বেশী ছুঁচোলো, বেশী হিংস্র। হঠাৎ বাজনা দ্রুত লয়ে বাজতে স্থরু হয় সময়ের ফাঁক না রেখে, লোকেরা কথা পালটে তাড়াতাড়ি বলে, বারবার—ওরাওরাডুবু, ওরাওরাডুবু ! বাঁধা লোকটির মুখ ভয়ে কালো হয়ে যায়, চোখ বুজিয়ে ফেলে। সে জানে এবার বর্শার ফলা বিঁধে টুকরো টুকরো করবে, আগুনের তাপে ঝলসাবে—শেষে পরম আরামে চিবিয়ে খাবে তার এই মানুষের দেহটি—ঐ মানুষেরা খাবে যারা নাচছে ঘুরে ঘুরে পাগলের মত।

এ দৃশ্য তোমরা দেখেছ ? নিজের চোখে নয়। দেখেছ সিনেমায় আর কল্পনার চোখে বই পড়তে পড়তে। ভেবেছ নিছক গল্প কাহিনী ; কিন্তু গল্প নয়—সত্যি। মানুষে

মানুষ খায় ! চমকে উঠবার কথাই বটে। খোঁজ নিলে জানতে পারবে মানুষ সর্ব্বভুখ। খায় না এমন জিনিষ নেই। মানুষ সবই খাচ্ছে নানা দেশে নানা অবস্থার ফেরে। গাছ-পালা—ফুল লতাপাতা—জীবজন্তু সরীসৃপ—কীট-পতঙ্গ এবং মানুষও। কারুর নিস্তার নেই, সকলকে মানুষের পেটের ভিতর প্রবেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মেনে নিতেই হবে, সর্ব্বভুখ মানুষ যে। জানি বাঙ্গালীর মাছ খাওয়ার বর্ণনা শুনে এই ভারতবর্ষেই বহু নিরা-মিষাশী মুখ বিকৃত করে থুঃ করে থুতু ফেলবে তোমার সামনে। আবার আমরা সাপ খাওয়া ব্যাঙ খাওয়া, আরসোলা খাওয়া, পাখীর বাসার ঝোল খাওয়ার কথা শুনে ঐভাবেই আপত্তি জানাই যেন পৃথিবীর সব চেয়ে ঘৃণিত কাজ করছে। আর মানুষ খাওয়া ? যারা খায় তারা বাদে সকলেই লাফিয়ে উঠবে, শিউরে উঠবে, চেঁচিয়ে উঠবে—অন্যায় ভারী অন্যায়, জঘন্য নিষ্ঠুর অসভ্য কাজ, ওদের মেরে ফেলা উচিত—ফাঁসী দেওয়া উচিত—লোপ পাওয়া উচিত। বলবে আরো কত কি !

অত গরম না হয়ে পাশাপাশি দুটো জিনিষ দেখা যাক। ধর খেতে বসেছি অনেকে একসঙ্গে। গলদা চিংড়ি চিবুচ্ছি—এইয়া বড় বড়। একটি বেশ নিরীহ গোছের মানুষ শান্ত শিষ্ট, আমাদেরই মত দেখতে শুনতে—ল্যাজ বিশিষ্ট কোন অদ্ভুত জীব নয়—সামনে এসে মিষ্টি গলায় বিনয় করে বললো—মশায় আমি মানুষ খাই। ব্যস্ ! কি হবে তারপর ? চিংড়ির মায়া ত্যাগ করে ন'দিকে ন'জন। দশদিক হবার জো নেই কারণ বাকী দিকে মানুষ-খেকো স্বয়ং স্বশরীরে। সে যাত্রা যদি মাথা ফেটে পঞ্চত্ব লাভ না করি পরে বলবো সেই পুরাণো কথাগুলি—অন্যায় নিষ্ঠুর অসভ্য।

এবার পরের ছবি। প্রকাণ্ড ঝিলে গিয়ে দেখি চিংড়িরা পরম সুখে দিনপাত করছে। জলের উপর ঝুঁকে চিংড়ির ভাষায় বললাম একেবারে কোকিল কণ্ঠে—ওগো চিংড়িরা, মনে কিছু কোরো না ভাই তোমাদের খেতে আমি বড় ভালবাসি। তারপর ? আমরা যা করেছি ওরাও তাই করবে। পরে চিংড়ি-পিসি বিশাল দেহটি জলে ভাসিয়ে দশ দাড়া নেড়ে মন্তব্য করবে আস্পর্দ্ধা দেখেছ এই চিড়িং খেগো মানুষদের ; এতটুকু দয়ামায়া নেইগো।

এই দুনিয়ার নিয়ম। আমরা যা করি না সেইটাই খারাপ কাজ অন্যায় আমাদের কাছে, আবার আমাদের ভাল কাজগুলিও অন্যের কাছে খারাপ বা নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। একথাটি মনে রেখো। খাওয়ার বিষয়ও ঐ এক নিয়ম। মানুষ খাওয়া ছিল অনেক দেশে যেমন চীন-তিব্বত-আফ্রিকা-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড-সুমাত্রা ফিজি প্রভৃতি। আজও আছে আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার মত দু'চারটি দেশে খুব ভিতর দিকে, বর্ত্তমান সভ্যতার অন্তরালে। এদের কেবলমাত্র নিন্দা না করে ভেবে দেখলে

দেখা যায় পৃথিবীর সমস্ত জীব সারা জীবন একটি জিনিষের সঙ্গে লড়াই করে চলে—তাকে মানিয়ে নেবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে। সে হ'ল পারিপার্শ্বিক অবস্থা—পরিবেষ্টন। আমাদের খাওয়া দাওয়া শোওয়া-বসা হাসি-কান্না বেশভূষা আচার ব্যবহার—সমস্তই এই অবস্থার চাপে তৈরী হয়, প্রকাশ পায় এবং এই অবস্থার ফেরে আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর কোন জিনিষেই চমকাবার আশ্চর্য্য হবার নাক সিঁটকাবার কিছু নেই। কোন না কোন নিয়মের আদেশে, সরল বা জটিল অবস্থার নির্দ্দেশে ঐ সমস্ত ঘটে যাচ্ছে।

মানুষ খাওয়ার ইতিহাস পড়ে দেখা যায় নানা কারণে নানাভাবে মানুষ মানুষ খেয়েছে। পেটের জ্বালা অবশ্য আছে কিন্তু কেবলমাত্র খাদ্য হিসাবে মানুষ খাওয়া খুব অল্প। যে সব দেশে খাওয়া পাওয়া যায় না বা হঠাৎ দুর্ভিক্ষ এসে হাজির হয়েছে সেখানে ক্ষুধার তাড়নে মানুষ খেতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া অন্য অনেক কারণে ও ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ খাওয়ার প্রচলন হয়েছে। কতকগুলি উল্লেখযোগ্য।

মরে গেলে আমরা দেহ সৎকার করি। কেউ পুড়িয়ে ফেলে, কেউ মাটিতে পুঁতে দেয় কেউ বা নির্জ্জন স্থানে রেখে আসে। কোন কোন দেশের অধিবাসিরা মৃতদেহ নিজেরাই খেয়ে ফেলেছে। তাদের ধারণা এভাবে সৎকার করলে মৃতব্যক্তিকে খুব সম্মান দেখানো হয় এবং ভবিষ্যতে ভুলে যাওয়া যায় না। কি অদ্ভুত নয় কি! ভালবেসে মানুষ মানুষ খেল তাকে সম্মান দেখিয়ে, তাকে মনে রাখবার সৎ উদ্দেশে!

আবার খুব বুড়ো থুত্থুড়ো লোক বা বহুদিন, কোন ভাল হবার নয়, এমন অসুখে ভুগছে লোককে তার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীরা মিলে খেয়ে ফেললো কষ্ট ও দুর্দ্দশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য। তোমার আমার দয়ার সঙ্গে এদের দয়ার আকাশ পাতাল প্রভেদ। ওরা ভাববে আমরা নিষ্ঠুর, বুড়ো মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে কষ্ট দি—রোগীকে যন্ত্রণায় তিল তিল করে মরতে দি—আর আমরা ভাববো ওরা বর্ব্বর, পশু।

আবার। শক্তির সাধনা কে না করে! দুধ ঘি মাংস ডিম খাই গায়ে জোর হবে বলে। মানুষে মানুষ খেয়েছে ঠিক ঐ একই কারণে। মানুষের রক্ত চুমুক দিলে নিজের রক্তের তেজ বাড়বে—মানুষের মাথা খেলে নিজের মাথায় বুদ্ধি হবে। যুদ্ধে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা মারা গেল—নিজের দলের বা শত্রুদের—তার মাংস খাওয়া চাই—ঐ রকম শক্তিশালী হওয়া যাবে—বিখ্যাত হওয়া যাবে। হৃদপিণ্ডের উপর প্রবল লোভ। ঐটি নাকি খেলেই সমস্ত সদগুণগুলি পাওয়া যায—এই ছিল ধারণা বহু দেশে। আজও অনেক দেশে সিংহের হৃদপিণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি—সিংহের মত বল কে না চায়? অনেকে আবার বীরপুরুষদের মাথার খুলি সযত্নে রেখে দিত। যতবার ওতে করে জল খাবে তত শক্তি।

এ ছাড়া যাদুবিদ্যা লাভের আশায় কত দেশে মানুষ খাওয়া চলেছে। আশ্চয্য শক্তি পেতে গেলে অদ্ভুত কিছু অনুষ্ঠান করতে হবে বৈকি। সত্যি অনেকে এই রহস্যজনক যাদু-বিদ্যা জানতো আর অপরের উপর ইচ্ছামত খাটাতো। অবশ্য আজকাল আমরা বুঝতে পারি যে কেবল মানুষ খেয়ে ঐ শক্তি লাভ করেনি—করেছে নিজের নিজের মনের জোরে।

দেবতার প্রসাদ হিসাবে এবং ভূত প্রেতের হাত থেকে রেহাই পেতে আবার মানুষ মানুষ খেয়েছে। আমাদের মত ঠাকুর দেবতা সবদেশে সকল সময়েই বর্ত্তমান। নানা আয়োজনে পূজা করে তুষ্ট করতে হয়—শেষে প্রসাদ পাওয়া। নানাদেশে নরবলি পূজার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। দু'দিন আগে আমাদের দেশেও ছিল—শোননি?

আর নয়—অনেক ভয়ের কথা সব বলা হ'ল। রাত্রে চেঁচিয়ে উঠলে জানিনা কিন্তু!

একটি যুদ্ধের গল্প

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। বাতাসে যুদ্ধের স্বাদ জড়িয়ে রয়েছে। তবু আজ সব শেষ হল। যারা আহত তাদের সরিয়ে ফেলা এবং যারা মৃত তাদের কবর দেওয়া এখন শুধু বাকী। যুদ্ধক্ষেত্রকে কিছুটা পরিচ্ছন্ন করা এখন প্রয়োজন। এবং এই পরিচ্ছন্ন করার ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়। এর জন্যেও বেশ পরিশ্রমের দরকার। অরণ্যের ভাঙা ডাল-পালা আর গাছের মধ্যে দিয়ে দেখ্‌লে শুধু চোখে পড়ে মানুষ আর ঘোড়ার ভগ্ন স্তূপ। এই ছিন্নভিন্ন মাংস স্তূপের মধ্যে ষ্ট্রেচারবাহকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের মধ্যে জীবনের সামান্য কম্পন তখনো রয়েছে তাদের কুড়িয়ে নিচ্ছে। অবশ্য আহতদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে মারা গেছে। সৈন্যদের মধ্যে নিয়ম এই আহতরা অপেক্ষা করবে, যতদিন না যুদ্ধে জয়লাভ হয়। অধিকাংশ আহত সৈনিকরা এই সময়টুকু অপেক্ষা করে বেঁচে থাকতে পারেনি।

মৃতদেহগুলিকে সারি সারি সাজিয়ে রেখে তাদের জন্যে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। বহু মৃতদেহ এই ট্রেঞ্চ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে বলে তাদের আর সরানো হচ্ছে না। তারা যেখানে পড়ে রয়েছে সেখানেই তাদের কবর দেওয়া হচ্ছে। মৃতদেহগুলিকে সনাক্ত করার

চেষ্টাও বড় একটা নেই। তবে যে পক্ষ জয়লাভ করেছে তাদের মৃত সৈনিকদের নাম আর সংখ্যা যথাসম্ভব খাতায় টুকে নেওয়া হচ্ছে।

যে দল কবর দিতে ব্যস্ত তাদের কিছু দূরে একটি ইউনিফরম পরা 'অফিসার গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার সমস্ত দেহে ক্লান্তির স্পষ্ট ছাপ, তবু বারবার সে নানাদিকে ঘাড় ফেরাচ্ছিলো। তার মন যে অস্বস্তিতে চঞ্চল সহজেই তা বোঝা যায়! কোন দিকে যে যাবে সম্ভবত তা সে ঠিক কর্‌তে পারেনি। সেখানে খুব বেশী সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। কারণ ইতিমধ্যে সূর্য্যের শেষ লাল্‌চে রশ্মি অরণ্যের মধ্যে চুঁইয়ে পড়ে পড়ে ম্লান হয়ে এসেছে আর ক্লান্ত সৈনিকরা সেদিনকার মত কাজ শেষ করে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌ছে। বোধ হয় সে কোনো দলের সঙ্গে পথ চিনে ফির্‌বে।

সবাই চলে গেলে সে পশ্চিমের লাল আকাশকে লক্ষ্য করে চল্‌লো, পশ্চিম আকাশের আলো এক ছোপ লাল রক্তের মত তার মুখে এসে পড়্‌লো। তার ডাইনে বাঁয়ে পড়ে-থাকা মৃতদেহগুলির দিকে সে চেয়েও দেখ্‌লো, না, দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে চল্‌লো, মাঝে মাঝে কোনো কোনো আহত সৈনিকদের ক্ষীণ গোঙানি তার কানে ভেসে আসতে লাগ্‌লো। তাদের কাছ পর্য্যন্ত সাহায্যকারী দল সেদিন পৌঁছয়নি। সমস্ত রাত তাদের সেখানেই পড়ে থাক্‌তে হবে। শুধু শিয়রে বসে থাক্‌বে তৃষ্ণা আর রাত্রির অসংখ্য তারা আর আকাশ। কিন্তু সেদিকে কান দিয়ে সে কর্‌বে কী? যখন নিজে সে ডাক্তার নয় আর যখন নিজের কাছে তার এক-ফোঁটাও জল নেই।

কিছু দূরের একটা গর্ত্তমত জায়গায় অনেকগুলি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কি মনে করে হঠাৎ সে তার পথ ছেড়ে সেখানে নেমে এলো। তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করে অবশেষে সে কিছুদূরের একটি দেহ'র কাছে এসে থামলো। তাকে সে ভালো করে পরীক্ষা করলো। যেন মনে হল দেহটি বুঝি সামান্য নড়্‌ছে। নীচু হয়ে সে তার কপাল স্পর্শ কর্‌লো আর তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠ্‌লো সেই দেহটি।

ওই অফিসার ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইন্‌ফ্যান্ট্রি দলের সেকেণ্ড্ লেফ্‌টানেন্ট। নাম ডাউনিং ম্যাড্‌ওয়েল্। সেই রেজিমেন্টেই দুটি ভাই ছিলো: ক্যাফেল হ্যাল্‌ক্রো আর ক্রীড্ হ্যালক্রো। ক্যাফেল ছিল ম্যাড্‌ওয়েলের দলের ডাক্তার। তারা দুজনেই ছিল বিশিষ্ট বন্ধু। কাজকর্মের মধ্যে যতটুকু অবসর তারা পেতো ততটুকু সময়েই একসঙ্গে থাক্‌তো। ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে তারা বড় হয়ে উঠেছে। ক্যাফেলের এইসব কাজে কখনই খুব বেশী উৎসাহ ছিল না। কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে দূরে থাকার ভয়ে এই কাজে সে যোগ দিয়েছে।

ক্যাফেলের ভাই ক্রীড্ সেই সৈন্যদলের মেজর। তার সঙ্গে নানা কারণে ক্যাপ্‌টেন্ ম্যাড্‌ওয়েলের বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না।

সেইদিন সকালে যুদ্ধ আরম্ভর সময় এই দলকে বিপক্ষ সৈন্যরা প্রায় ঘিরে ফেলেছিলো। তবু তারা ভীষণভাবে যুদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌লো। যুদ্ধ যখন কিছুক্ষণের জন্যে চুপ্‌চাপ্ এমন সময় মেজর ক্রীড্ ক্যাপ্‌টেন ম্যাড্‌ওয়েলের কাছে এলো আর অভিবাদন বিনিময়ের পর বল্‌লো, 'ক্যাপ্‌টেন! কর্ণেল বলে পাঠালেন সৈন্যদের নিয়ে তুমি এগিয়ে গিয়ে সরু পথটা আগ্‌লে দাঁড়াও। কাজটা যে খুবই বিপদ্‌জনক আশাকরি তা বুঝতে পার্‌ছো। ইচ্ছে হলে অবশ্য তোমার নীচের কর্মচারীকে এ কাজে তুমি পাঠাতে পারো—তাতে তোমার বিপদের আশঙ্কা কম।' শেষের দিকের কথাগুলো তার বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

এই অপমানের উত্তরে ক্যাপ্‌টেন ম্যাডওয়েল উত্তর দিলো, 'মশাই! ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সঙ্গে এসে সমস্ত ব্যাপারটা নিজের চোখে আপ্‌নাকে দেখ্‌তে আমি নিমন্ত্রণ কর্‌ছি। শত্রুপক্ষ অনেক দূর থেকেই আপ্‌নাকে দেখ্‌তে পেয়ে ভালো করে গুলি চালাতে পার্‌বে। আর অনেক দিন থেকেই আমি ভেবে দেখেছি যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই আপনার পক্ষে ভালো।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাপ্‌টেন ম্যাডওয়েলের দল বিতাড়িত হল। তাদের তিন ভাগের এক ভাগ হতাহত হল শত্রুদের হাতে। আর সেই হতাহতদের মধ্যে ছিলো সারজেণ্ট ক্যাফেল। কিন্তু শিগ্‌গীরই শত্রুপক্ষ বিতাড়িত হল, আর দিনের শেষে তারা অনেক মাইল দূরে পালিয়ে গেল।

এই সন্ধ্যায় ক্যাপ্‌টেন ম্যাডওয়েল তার পরম বন্ধুর কাছে দাঁড়িয়ে; এখানে ক্যাফেল পড়ে। অতি মারাত্মক ভাবে সে আহত। তার জামা কাপড় কে যেন হিংস্রভাবে ছিঁড়ে দিয়েছে, তার পেট দেখা যাচ্ছে। সেখানে গভীর ক্ষত। চাপ চাপ রক্তে সেখানকার মাটি কাদা হয়ে গিয়েছে। আর তার ওপর আট্‌কে গেছে বাতাসে উড়ে আসা শুক্‌নো পাতা। ক্যাপটেন ম্যাডওয়েল জীবনে এরকম ভীষণ ক্ষত দেখেনি। নতজানু হয়ে বসে সে খানিক পরীক্ষা করলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে সে চাইতে লাগলো, যেন কোনো শত্রুকে সে খুঁজ্‌ছে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে সে দেখলো কতকগুলো কালো কালো শূয়োর মৃতদেহদের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক মৃত সৈনিকের বুকে সাম্‌নের দুটো পা তুলে একটা শূয়োর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ক্যাপটেন ম্যাডওয়েল তার বন্ধুর ছিন্নভিন্ন দেহের দিকে চাইলো।

যে লোকটি এই সাঙ্ঘাতিক ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তখনো সে বেঁচে। মাঝে মাঝে সে হাত পা নাড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে সে গোঙাচ্ছে! ক্যাপ্‌টেন ম্যাড্‌ওয়েলের দিকে ফাঁকা চোখ মেলে সে চেয়ে। কেউ স্পর্শ করতে গেলে সে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ছে। তার অমানুষিক যন্ত্রণায় নোখ দিয়ে মাঝেমাঝে সে মাটি আঁচড়াচ্ছে, যেন পৃথিবীকে ছিঁড়ে টুক্‌রো

টুক্‌রো করে ফেল্‌তে চায়। তার হাতের মুঠোয় মাটি আর রক্ত আর শুকনো পাতা। কোনো রকম ভাষাই তার ঠোঁটে নেই। যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে সে সচেতন কিনা এ কথা জানার উপায় নেই। তার যন্ত্রণায় বীভৎস মুখে মিনতি, তার চোখে প্রার্থনা। কিন্তু কিসের জন্যে?

ক্যাপ্‌টেন ম্যাড্‌ওয়েল তার বন্ধুর নাম ধরে ডাক্‌লো। বার বার সে ডাক্‌তে লাগ্‌লো সে নাম ধরে। অদ্ভুত করুণায় তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। নিজের চোখের জলে নিজেই সে যেন অন্ধ হয়ে গেল। মানুষের রক্তে আর চোখের জলে মাটি কাদা হয়ে উঠ্‌লো। একটা অস্পষ্ট, যন্ত্রণায় কুঁক্‌ড়ে যাওয়া দেহ সে দেখ্‌তে পেলো। কিন্তু আর্ত্তনাদ যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্‌টেন সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো, নিজের ছু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে সেখান থেকে সরে এলো। শূয়োরগুলো তাকে এগিয়ে আস্‌তে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে এক সঙ্গে দৌড়ে পালালো। একটা ঘোড়া তার ক্লান্ত ঘাড় সোজা করে তার দিকে চেয়ে করুণভাবে ডেকে উঠ্‌লো, কামানের গোলায় তার সাম্‌নের পা ছুটো উড়ে গেছে। ম্যাড্‌ওয়েল তার কাছে এগিয়ে এলো, কেস থেকে বার কর্‌লো রিভলভার, তারপর জন্তুটার চোখ ছুটোর মাঝখানে নলটা ঠেকিয়ে গুলি কর্‌লো। সে ভেবেছিলো তখনি বুঝি মরে যাবে জন্তুটা। কিন্তু মর্‌তে তার খানিকটা সময় লাগ্‌লো, একটা তীব্র আক্ষেপ তার সমস্ত শরীরকে যেন ছুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে একাকার করে ফেল্‌লো। তারপর সে মর্‌লো। ঘোড়াটার মুখের শক্তপেশীর মধ্যে দিয়ে বীভৎস ভাবে দাঁতগুলো বেরিয়ে ছিলো। মৃত্যু এসে সেগুলো ঢিলে করে দিলো। একটা অপরূপ মসৃণ শান্তিতে মাটিতে মাথা নামিয়ে মৃত্যুকে সে অভিবাদন কর্‌লো।

পশ্চিম আকাশে সূর্য্যাস্তের আগুন এতোক্ষণে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অরণ্য ফ্যাকাশে ছাইরঙ্‌ থেকে ক্রমে ঘন কালো হয়ে আস্‌ছে। রাত্রি এগিয়ে আস্‌ছে! এখান থেকে তাঁবুর মধ্যে অনেক মাইলে দীর্ঘ বন ছড়িয়ে রয়েছে। তবু সে মৃত জন্তুর কাছে, যেন সবকিছু ভুলে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তার বাঁ হাতটা ঝুলে রয়েছে তার ডান হাতে তখনো রিভলভারটা ধরা। অকস্মাৎ সে মুখ তুলে চাইলো, তারপর দ্রুত পায়ে বন্ধুর কাছে এগিয়ে এলো। নতজানু হয়ে বস্‌লো সে তার পাশে, তারপর নলটা তার কপালে ঠেকিয়ে অন্যদিকে চেয়ে ট্রিগার টান্‌লো। কোনো শব্দ হল না, রিভলভারটা খুট্‌ করে ছোট্ট একটি শব্দ করে চুপ্‌ কর্‌লো।—কাট্রিজ্‌ ফুরিয়ে গেছে, তার শেষ গুলি জন্তুটার ওপর খরচ হয়েছে। আবার তার বন্ধু আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো, বীভৎস আক্ষেপে সমস্ত শরীর তার কুঁক্‌ড়ে উঠ্‌ছে। তার ঠোঁট ছুটো অসহায় ভাবে কাঁপ্‌ছে, তার কশ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়্‌ছে।

ক্যাপ্‌টেন ম্যাড্‌ওয়েল উঠে দাঁড়ালো, খাপ্‌ থেকে বার করলো তার তরোয়াল, আঙুল

দিয়ে পরীক্ষা করলো তার ধার, তারপর দিনের শেষ আশায় নিজের সামনে সেটাকে তুলে ধরলো সে।—না, হাত তার কাঁপছে না। আকাশের পাণ্ডুর আলো বেরায়ালের উপর অকম্পিত হয়ে রয়েছে। নীচু হয়ে, মরনোন্মুখ মানুষটির শার্টটা সে ছিঁড়ে ফেল্‌লো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তরোয়ালের ডগাটা ঠিক তার হৃৎপিণ্ডের ওপর রেখে প্রাণপণে চাপ দিলো। এবারে সে চোখ ফিরিয়ে নিলো না। তরোয়ালটা তার বন্ধুর দেহ ফুঁড়ে, পৃথিবীকে বিঁধ্‌লো। এতো জোর দিয়ে ক্যাপ্‌টেন ম্যাড্‌ওয়েল সেটা টিপেছিলো যে আর একটু হলেই মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে সে পড়তো। আহত লোকটা প্রাণপণে তার হাঁটুছুটো কুঁক্‌ড়ে পেটের কাছে নিয়ে এলো আর ছুটো হাত দিয়ে এমনভাবে তরোয়ালের হাতলটা টিপে ধরলো যে ম্যাড্‌ওয়েল স্পষ্ট দেখতে পেলো লোকটার আঙুলগুলো রক্তশূন্যতায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তরোয়ালটা সে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পার্‌লো না, শুধু ক্ষতটাকে বাড়িয়েই দিলো। গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে পৃথিবীকে কাদা করে দিতে লাগ্‌লো।

সেই সময়ে কাছের অরণ্য থেকে নিঃশব্দে তিনটি লোক বেরিয়ে এলো! বড় বড় গাছ তাদের এতোক্ষণ দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছিলো। তাদের তিনজনের মধ্যে ছু'জন হাসপাতালের লোক: একটা ষ্ট্রেচার বয়ে তারা আস্‌ছে। তৃতীয়জন মেজর ক্রীড হ্যালক্রো।

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্তের

ঐতিহাসিক নাটক

জ্যৈষ্ঠের রংমশালে

সঙ্কলন

গান্ধী মহারাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,
গরীব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।

ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে,
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
ঐ যে তোমার চোখ রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে ?

সিধে ভাষায় বলি কথা
স্বচ্ছ তাহার সরলতা
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে ;
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।

দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ,
চিরকালের হাতকড়ি যে
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ

["প্রবাসী" হইতে

যক্ষপতির রত্নপুরী

—উপন্যাস—

বিমলের একখানি ডায়ারি থেকে আমি এই বিচিত্র ঘটনাগুলি উদ্ধার করছি। অবশ্য বিমলের পরিচয় নতুন ক'রে কারুর কাছে দেবার দরকার আছে ব'লে মনে করি না—কারণ ছেলেমহলে সে হচ্ছে পৈতেহীন চেনা বামুনের মত! কিন্তু ব'লে রাখা ভালো, এই কাহিনীটির মধ্যে আমার নিজস্ব কিছুই নেই — আমি কেবল বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ডায়ারির ঘটনাগুলিকে ভাগ ক'রে সকলের হাতে এই অদ্ভুত গল্পের মালাগাছি তুলে দিলুম। ইতি—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

চীনে-হোটেলে

অনেকে অভিযোগ করেন, আমার জীবন নাকি অস্বাভাবিক।

তাঁদের মতে, স্বাভাবিক মানুষের জীবন এমন ঘটনাবহুল হ'তে পারে না।

যদিও নিজেকে আমি পাগল বা গণ্ডমূর্খের মত নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করছি না, তবে তর্কের খাতিরে এখানে কেবল এই প্রশ্ন বোধ হয় করতে পারি, নেপোলিয়ন কি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না? মাত্র বাহান্নো বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। তার ভিতর থেকেও প্রথম পঁচিশ বৎসর অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি মাত্র সাতাশ বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়নের জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিল যে ঘটনার পর ঘটনার প্রচণ্ড বন্যা, তাদের অবলম্বন ক'রে কি অসংখ্য নাটক ও উপন্যাস রচনা করা চলে না?

না-হয় নেপোলিয়নের মতন মহামানুষ ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কথা ছেড়ে দি, কারণ তাঁর জীবনে ঘটনা ঘটবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল প্রচুর। তাঁর বদলে আমি মধ্য-যুগের এক শিল্পীর কথা উল্লেখ করতে চাই। তাঁর নাম বেন্‌ভেনুতো শেলিনি, তিনি ছিলেন ইতালীর এক বিখ্যাত ভাস্কর ও ওস্তাদ স্বর্ণকার। তিনি একখানি প্রসিদ্ধ আত্মচরিতও লিখে গেছেন। সাধারণত শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র সম্পর্ক থাকেনা বললেই চলে। কিন্তু বেন্‌ভেনুতোর ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনী যোগাতে পারে বহু বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর ও প্রায়-অসম্ভব উপন্যাসের উপকরণ। এজন্যে তাঁর আত্মচরিতকে অস্বাভাবিক ব'লে অভিযোগ করা চলেনা। কারণ তাঁর জীবনের ঘটনাবলি সত্য ব'লেই প্রমাণিত হয়েছে।

এক-একজন মানুষের জীবনই হচ্ছে এমনি বিচিত্র! হয় ঘটনা-প্রবাহ আকর্ষণ করে তাদের জীবনকে, নয় তাদের জীবনই আকর্ষণ করে ঘটনা-প্রবাহকে।

বরাবরই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, আমি স্বেচ্ছায় কোন রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টি করতে না চাইলেও, কোথা থেকে আচম্বিতে আমার জীবনের উপরে এসে ভেঙে পড়েছে অদ্ভুত সব ঘটনার প্রবাহ। আমার বন্ধু কুমার হয়তো এ-সব ঘটনা-চক্রের বাইরেই প'ড়ে থাকত, কিন্তু সে হচ্ছে আমার নিত্যসঙ্গী, তার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কাজেই তাকেও জড়িয়ে পড়তে হয় এই-সব ঘটনার পাকে পাকে। অর্থাৎ প্রবাদে যাকে বলে—'পড়েছ মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

এবারেও কেমন ক'রে আমরা নিজেদের অজান্তেই হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ঘটনা-প্রবাহের দ্বারা আক্রান্ত হলুম, এইখানে সেই কথাই লিখে রাখছিঃ

সেদিন সন্ধ্যায় কুমার এসে বললে, "কী সব বাজে বই নিয়ে মেতে আছ? চল, আজ কোন হোটেলের দিকে যাত্রা করি।"

বই মুড়ে বললুম, "আপত্তি নেই। কিন্তু কোন্ হোটেলে?"

—"সেটা তুমিই স্থির কর।"

—"চৌরঙ্গীর দিশী আর বিলিতী হোটেলে খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। চল আজ ছাতাওয়ালা গলির চীনে-পাড়ায়।"

—"ন্যান্‌কিনে? সেও তো বিলিতীর নকল।"

—"না হে না, আমরা যাব খাঁটি চীনে হোটেলে, খাঁটি চীনে খানা খেতে।"

—"উত্তম প্রস্তাব। রাজি।"

বাইরে বেরুবার জামা-কাপড় পরছি দেখে বাঘাও গাত্রোত্থান ক'রে গৃহত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

কুমার বললে, "ওরে বাঘা, আজ আর তুই সঙ্গে আসিস্ নে। হোটেলঅলারা বদ-রসিক রে, কুকুর-খদ্দের হয়তো পছন্দ করবে না!"

কিন্তু বাঘা মানা মানতে রাজি নয় দেখে রামহরিকে স্মরণ করলুম।

রামহরি এসে বললে, "তুই স্যাঙাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

—"চীনে হোটেলে চীনে খানা খেতে।"

—"সব্বনাশ! চীনেরা তো তেলাপোকা খায়! তোমাদেরও খাবার সখ হয়েছে নাকি?"

—"রামহরি, চীনেম্যানদের নামে ও-অপবাদটা একেবারেই মিথ্যে। তারা তেলাপোকা খায় না, তবে পাখীর বাসার ঝোল খায় বটে!"

—"রাম রাম! পাখীর বাসাও আবার খাবার জিনিষ নাকি?"

—"তবু তুমি তাদের আর-একটা খানার নাম শোনোনি। তারা পঞ্চাশ, ষাট, আশী, একশো বছরের পুরণো ডিম খেতে ভারি ভালোবাসে!"

—"ওয়াক্! ও খোকাবাবু, শুনেই যে আমার নাড়ী-ভুঁড়ি পর্য্যন্ত উঠে আসছে! ওয়াক্!"

—"হাঙরও তাদের কাছে সুখাদ্য!"

—"পায়ে পড়ি খোকাবাবু, আর বোলোনা! ছি ছি, ঐ সব ছিষ্টিছাড়া খাবার তোমরা খেতে চাও?"

—"না রামহরি, হাঙর বা একশো বছরের পচা ডিম খাবার সৎসাহস আজও আমাদের হয়নি। তবে বাঘা বোধহয় হাঙর পেলে ছাড়বে না, ওকে তুমি সাম্‌লাও।"

আমি আর কুমার বেরিয়ে পড়লুম।

চীনে-পাড়ার খাঁটি চীনে-হোটেলে বাঙালীর দেখা পাওয়া যায় না। আর কিছুই নয়, রামহরির মতন অধিকাংশ বাঙালীরই আসল চীনে-হোটেল সম্বন্ধে ভয়াবহ কুসংস্কার আছে—তাই তাদের দৌড় বড়-জোর 'ন্যান্‌কিন' বা 'চাঙ্গুয়া' পর্য্যন্ত।

কিন্তু আমরা যে চীনে-হোটেলে গেলুম সেখানে ভয় পাবার বা বমন ওঠবার মতন কিছুই ছিল না। চারিধার সাজানো-গুছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাবারগুলিও সুস্বাদু—যদিও আমাদের দেশী-বিলাতী খাবারের সঙ্গে তাদের কিছুই মিল নেই। পরিবেশন করছিল একটি চীনে মেয়ে।

সর্ব্বশেষে মেয়েটি নিয়ে এল চীনে চা। এ চা তৈরি করবার পদ্ধতিও অন্য রকম। মেয়েটি দুটি কাঁচের বা পোর্সিলেনের বাটি আনলে। একটি বাটিতে গরম জল ঢেলে তাতে শুক্‌নো ও পাকানো একখণ্ড চায়ের পাতা দিয়ে উপরে দ্বিতীয় বাটিটি চাপা দিয়ে চ'লে গেল। মিনিট তিন-চার পরে সে ফিরে এসে উপুড় করা বাটিটি নামিয়ে দিতেই দেখি, সেই গুটানো চায়ের পাতাখানি সমস্ত বাটি ভ'রে ছড়িয়ে প'ড়ে জলের উপরে ভাসছে। ব্যাস্, চা প্রস্তুত—এখন খালি চিনি মেশাও আর চুমুক দাও! কিন্তু এ চায়ের স্বাদ অধিকাংশ বাঙালীরই ধাতে সইবে না।

কুমার চায়ের পেয়ালা তুলে বললে, "বিমল, এই চীনে-হোটেলের ভেতর ব'সে চীনে খানা খেতে খেতে আর চুং চাং চুং চিং কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে, আমরা যেন আরব্য উপন্যাসের মায়া-গালিচায় চেপে হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চীনদেশেই এসে পড়েছি। ও-পাশের ঘরে ঐ চীনেম্যানদের দেখছ? ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে কথাবার্ত্তা কইছে বটে, কিন্তু ওদের মুখে কোন ভাবের ছাপ নেই—ওরা যেন রহস্যময় মূর্ত্তি!"

কুমারের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই আমার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হ'ল।

ঠিক আমাদের পাশের ঘরেই জাগল হঠাৎ এক ক্রুদ্ধ গর্জ্জন—সঙ্গে সঙ্গে বিষম হুড়োহুড়ি ও চেয়ার-টেবিল উল্টে-পড়ার শব্দ! তারপরেই এক আর্ত্তনাদ!

রাত্রিবেলায় এই চীনে-পাড়া মারামারি হানাহানির জন্যে বিখ্যাত। পাছে অন্যের হাঙ্গামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভয়ে আমরা তুজনেই উঠে দাঁড়ালুম।

পর-মুহূর্ত্তেই একটা মাঝবয়সী রক্তাক্ত চীনেম্যানের মূর্ত্তি টলতে টলতে আমাদের কামরার কাছ-বরাবর এসে হেলে প'ড়ে গেল এবং তার দেহটা এসে পড়ল কামরার ভিতরে একেবারে কুমারের বুকের উপরে।

মারলুম এক ঘুষি ঠিক তার চোয়ালের উপরে

তারপরেই দেখলুম আমাদের কাম্‌রার সামনে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল প্রায় আট-দশ জন চীনেম্যান—তাদের চেহারা দেখলে ভালোমানুষের প্রাণ ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠবে। কিন্তু আমরা তুজনেই ভালোমানুষ নই।

সব-আগে রয়েছে, লম্বায় না হোক চওড়ায় মস্ত-বড় এক মূর্ত্তি, তার ডানহাতে একখানা আধ-হাত লম্বা রক্তমাখা ছোরা। সেইখানা উঁচিয়ে সে আমাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়বার উপক্রম করলে!

মারলুম এক ঘুসি ঠিক তার চোয়ালের উপরে—আমার গায়ের সব শক্তি ছিল সেই মুষ্টির পিছনে। কারণ আমি জানি, মারামারির সময়ে দরদ ক'রে মারলে ঠকতে হয় নিজেকেই।

লোকটা ঠিক্‌রে প'ড়ে গেল ঠিক বজ্রাহতের মতই।

তারপরেই শুন্‌লুম অনেকগুলো ভারি ভারি জুতোর দ্রুত শব্দ! চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আমাদের ঘরের সামনে থেকে সমস্ত জনতা হ'ল অদৃশ্য! কিন্তু পর-

মুহূর্ত্তেই হোটেলের অন্যদিকে আবার নতুন গোলমাল উঠল—কাদের সঙ্গে আবার কাদের মারামারি ঝটাপটি চলছে! খুব সম্ভব পুলিস এসে পড়েছে।

এতক্ষণে কামরার ভিতরে নজর নেবার সময় হ'ল।

কুমার তখন আহত লোকটাকে মাটির উপরে শুইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলুম, আর কোন আশা নেই।

লোকটাও বুঝেছিল। তবু সেই অবস্থাতেও সে চোখ নেড়ে আমাকে তার কাছে যাবার জন্যে ইসারা করলে। আমি তার পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলুম।

নিঃশ্বাস টানতে টানতে অস্ফুট স্বরে ইংরেজীতে সে বললে, "আমি আর বাঁচব না। আমার জামার বোতাম খুলে ফ্যালো।"

তাই করলুম।

—"আমার গলায় ঝুলছে একখানা লকেট। সেটা তাড়াতাড়ি বার ক'রে নাও।"

লকেটখানা বার করতেই সে বললে, "লুকিয়ে রাখো! ছুন্‌-ছিউ দেখতে পেলে তুমিও বাঁচবে না।"

—"ছুন্‌-ছিউ কে?"

সে প্রথমটা উত্তর দিতে পারলে না, কেবল হাঁপাতে লাগল। তারপর অনেক কষ্টে থেমে থেমে বললে, "যে আমাকে মেরেছে।.........কিন্তু আমি যখন মরবই......গুপ্তধন তাকেও ভোগ করতে দেব না......হ্যাঁ, এই আমার প্রতিশোধ......মাটির ভেতরে......গুপ্তধন—" তার কথা বন্ধ হ'ল, সে চোখ মুদলে।

ভাবলুম, লোকটা বোধহয় এ-জন্মের মতন আর কথা কইতে পারবে না।

কুমার বললে, "এ কী বলছে বিমল? কিছুই তো বোঝা গেল না! গুপ্তধন কোথায় আছে?"

লোকটা আবার চোখ খুললে। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে টেনে টেনে বললে, "কি-পিন্‌......কি-পিন্‌......সেখানে যেও......কি-পিন্‌—" হঠাৎ তার বাক্য-রোধ ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ কপালে উঠে স্থির হয়ে গেল!........

বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, তার হৃৎপিণ্ড আর নড়ছে না। ক্রমশঃ

শিশু-সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণারঞ্জনের
রূপকথা
জ্যৈষ্ঠের রংমশালে

প্রবন্ধ

সম্ভাবনার জগৎ

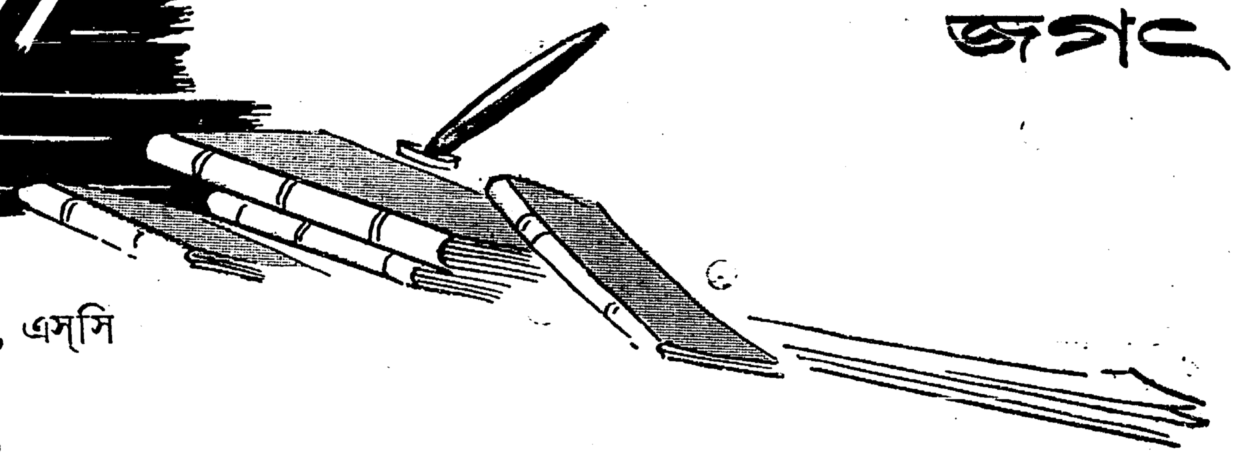

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এস্‌সি

একটা বলকে যদি ছাদ থেকে ফেলে দিই, সেটা শেষ পর্যন্ত নীচে মাটিতে এসে পৌঁছবেই। আকাশের দিকে উঠে সেটা আকাশেই রয়ে গেল—এ-রকম ঘটনা রূপকথায় চলতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে ঘটে না। বলটার মাটিতে পড়া সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। এ-সব নিশ্চিত ঘটনার জন্যে সম্ভাবনাগণিতের কোনও কাজ নেই। কিন্তু বাস্তব জগতেই এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত কোনও মতামত দিতে পারি না। যেমন ধরো, এক তাড়া তাসকে ভাল করে ভেঁজে তার থেকে না দেখে একটা তাস টেনে নিলাম; এখন সে তাসটা যে কী হ'বে তার নানা উত্তর হতে পারে: হয়ত সেটা ইশ্‌কাপন হয়ত বা হরতন, আবার রুইতন কিংবা চিড়িতনও হ'তে পারে; সেটা ছবিওয়ালা তাস হ'তে পারে, বা কেবলই ফোঁটাওয়ালা। তাসের তাড়াটা সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি, তাতে কি জোর ক'রে বলা যায় যে সেটা হরতনের গোলাম হ'বেই? এ-ধরণের সমস্যায় সম্ভাবনা-গণিতের তলব পড়ে। কিন্তু এখানে অঙ্ক আসবে কী ক'রে? কী তাস উঠবে ঠিক নেই, যে কোনটা উঠতে পারে, এর বেশী আর আমরা কী বলতে পারি? বলতে পারি ঠিক ক'রে কোন তাসটা ওঠার কতখানি সম্ভাবনা। একটা সোজা উদাহরণ দিয়ে কথাটা আরও পরিষ্কার করি।

ধরো শ্রীমান হাবুচন্দ্র বসে আছে আর তার পাশে রয়েছে থালায় একটা সন্দেশ। সন্দেশটার গতি কী হ'বে বল তো? হাবুবাবুর মুখেও তার সদ্‌গতি হ'তে পারে, আবার সেটা থালায় পড়ে থাকতেও পারে। কিন্তু হাবুচন্দ্রের পক্ষে সন্দেশটা খাওয়া আর না খাওয়া,—দুয়েরই কি সমান সম্ভাবনা? আমরা হাবুচন্দ্রের সম্বন্ধে আর সন্দেশের সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাতে বলব যে প্রথম ঘটনার অর্থাৎ খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু সম্ভাবনা-গণিত এ উত্তরেও সন্তুষ্ট নয়; আবার প্রশ্ন করবে প্রথমের সম্ভাবনাটা কত বেশী? উত্তর হচ্ছে, খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা ৩/৪ বা শতকরা ৭৫ ভাগ, আর না খাওয়ার সম্ভাবনা

১/৪ বা শতকরা ২৫। এটা জানা গেছে শ্রীমান হাবুর পূর্ব-ইতিহাস থেকে: আগে এক অবস্থাতেই হাবু আর সন্দেশ আরও ১৬০ বার ছিল; তার মধ্যে ১২০ বার দেখেছি খানিক পরে শুধু হাবুবাবুই আছে, সন্দেশের চিহ্নমাত্রও নেই, আর ৪০ বার সন্দেশটাকেও পরে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে; কাজেই হাবুবাবুর পক্ষে সন্দেশটাকে মুখসাৎ করার সম্ভাবনা ১২০/১৬০ বা ৩।৪, আর না করার ৪০।১৬০ বা ১।৪।

এখন বুঝলে কী ধরণের সমস্যায় সম্ভাবনা-গণিত দরকার হয়, আর সম্ভাবনাকে মাপা যায় কী ক'রে। নানা ধরণের "ভাগ্যের খেলার" ধাঁধাঁর সমাধানের জন্যই প্রথমে সম্ভাবনা গণিতের দিকে বড় বড় পণ্ডিতের দৃষ্টি যায়। ভাগ্যের খেলা বলতে বোঝায় যে সব খেলায় খেলোয়াড়ের বাহাদুরী ছাড়াও কতকগুলি অজানা প্রভাব কাজ করে—যাদের উপর খেলোয়াড়ের কোনও হাত নেই; যেমন, তাস, পাশা, লুডো, জুয়া ইত্যাদি। পরে অবশ্য সম্ভাবনা-গণিতের প্রয়োগ নানা দরকারী দিকে ছড়িয়ে গেছে: সমাজ-মিতিতে, পদার্থ-বিজ্ঞানে,—বিশেষতঃ রাশি-বিজ্ঞানে। বর্তমানে সম্ভাবনা-গণিত ব্যবহারিক গণিতের একটা বিশিষ্ট অংশ।

সম্ভাবনা গণিতের অঙ্কগুলি শুনতে যেমন মজার, কষতে তেমনই শক্ত। বেয়াড়া ধরণের ধাঁধাঁ দিলে দিগ্‌গজদেরও মাথা ঘুরে যায়, আর তখন তাঁরা আমাদের চলিত প্রবাদের মর্ম—"কত ধানে কত চাল হয়"—ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করেন। আবার ঘটনাগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্ভাবনার মাপও বদলে যেতে পারে; একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

একটা থলিতে চারটে টাকা রয়েছে; তিনটে সাধারণ টাকা আর একটা কিছু আলাদা ধরণের। সাধারণ টাকায় দেখেছ একদিকে থাকে মাথার ছবি আর তার পিঠের দিকে কতকগুলি লতাপাতার ছবি। এ রকম টাকাকে ঘুরিয়ে মেঝেতে ছেড়ে দিলে, সেটা থামবার পর উপরে মাথার দিকও উঠতে পারে, কিংবা পিঠের দিকও উঠতে পারে। আলাদা ধরণের টাকাটার কিন্তু দু-দিকেই মাথার ছবি: তার আর "পিঠ" বলে কিছু আলাদা করা যায় না। এখন না দেখে থলিটা থেকে একটা টাকা তুলে নিলাম; দু-মাথা টাকাটা তোলার সম্ভাবনা কত? চারটে টাকারই ওঠার সম্ভাবনা সমান, কাজেই দু-মাথাটা ওঠার সম্ভাবনা ১/৪ বা শতকরা ২৫। আচ্ছা, এখন তোলা টাকাটাকে না দেখে, সেটাকে ঘুরিয়ে মেঝেতে ছাড়া হ'ল; থামবার পর দেখলাম উপরে মাথা উঠেছে। আবার সেটাকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলাম এবং আবার মাথা উঠল। এ-রকম বার বার চারবার টাকাটাকে ঘুরিয়ে ছাড়া হ'ল এবং চারবারই মাথা উঠল। টাকাটার উল্টোদিকে যে কী আছে, কোনবারই কিন্তু আমরা দেখিনি। এখন বলতো টাকাটার দু-মাথা হ'বার সম্ভাবনা কত? এখন সম্ভাবনা

হচ্ছে ১৬/১৯ বা প্রায় শতকরা ৮৪। (এই সম্ভাবনা কী ক'রে কষা হ'ল বলতে গেলে অনেক কথা পাড়তে হয়, তাতে সাতকাণ্ড না হোক এক আধ-কাণ্ড রামায়ণ কেন না হবে,—সেজন্য সে-চেষ্টা আপাততঃ মুলতুবী রাখি।) টাকাটা থলি থেকে তোলার ঠিক পরেই সেটা দু-মাথা হ'বার সম্ভাবনা ছিল শতকরা ২৫, আর চারবার ঘোরানর ফলে সম্ভাবনাটা বেড়ে হ'ল শতকরা ৮৪! প্রথম সম্ভাবনাটাকে বলে "গোড়ার বা পূর্ব সম্ভাবনা" আর পরেরটাকে বলে "শেষের বা উত্তর সম্ভাবনা"। উত্তর-সম্ভাবনা কষার সময় আমাদের টাকাটা সম্বন্ধে জ্ঞান কিছু বাড়ল, কেননা সেটাকে চারবার ঘোরানর ফল দেখলাম; আর পূর্ব সম্ভাবনা কষার সময় এই জ্ঞানটুকু ছিলই না। সেজন্যে সম্ভাবনা দুটো আলাদা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। দু-মাথা হওয়ার সম্ভাবনা যে পরে বেশ বাড়বে তা সহজেই বোঝা যায়: কেননা, সাধারণ টাকা হ'লে চার চারবারের মধ্যে একবারও ত পিঠের দিকটা উপরে ওঠার সম্ভাবনা ছিল; আরও মজা এই যে পিঠের দিকটা একবার পড়লেই কিন্তু ওটার দু-মাথা হ'বার সম্ভাবনা কমে একেবারে শূন্য হয়ে যেত, কারণ পিঠটা যখন দেখাই গেল তখন আর ওটার দু-মাথা হ'বার সম্ভাবনা মোটেই থাকতে পারে না। দেখলে ত জ্ঞান বাড়ার ফলে সম্ভাবনাও কেমন কমে বেড়ে যায়! অথচ এটা ভোজবাজীর বিদ্যা নয়, সোজা গণিতের কেরামতী, এর প্রত্যেকটী ধাপে যুক্তি আছে।

খুব অদ্ভূত অদ্ভুত ঘটনারও সম্ভাবনা বার করা যেতে পারে। বাহান্নখানা তাস ভাল করে ভেঁজে চারজনকে সমানভাবে ভাগ করে দিলাম; তাতে প্রত্যেকেই এক এক রঙের ১৩ খানা করে তাস পাবে, এর সম্ভাবনা কত? খুবই কম; একের পিঠে আটাশটা শূন্য বসালে যত বার হয় (আমাদের পরিচিত লক্ষ, নিযুত, কোটী, অর্বুদ অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে—অর্বুদে মাত্র আটটা শূন্য) ততবারের মধ্যে মাত্র চার পাঁচবার ঐ রকম তাসের ভাগ হ'বে আশা করা যায়! আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলি: একটা বাঁদরের সামনে এক টাইপ-রাইটারে কাগজ লাগিয়ে রেখে দিলাম আর সে মনের আনন্দে টাইপ-রাইটারের চাবিগুলোর উপর হাত চালাতে সুরু করল। হঠাৎ ধরো, তার এলোপাতাড়ি হাত চালানোর ফলে কী করে কাগজটায় একটা চমৎকার তিরিশ লাইন কবিতা লেখা হয়ে গেল! এটা অবিশ্বাস্য কথা বটে, কিন্তু এরও একটা সম্ভাবনা আছে—তা যত কমই হোক না কেন। এর সম্ভাবনা অবশ্য একটু আগেরই তাসের উদাহরণের সম্ভাবনাটার চেয়েও অনেক গুণে কম। এইবার কিন্তু একটা আসল "গল্প" বলব। জ্বলন্ত উনুনে বাটীতে ক'রে জল চড়িয়ে দিলে, খানিক পরেই তা টগবগ করে ফুটে বাষ্প হ'তে সুরু করবে। কেউ যদি বলে যে সে দেখেছে, ঐ অবস্থায় জলটা জমে বরফ হয়ে গেল! শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খুব হাসবে, বৈজ্ঞানিকরাও হাসবে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে পাই এরকম বরফ হয়ে যাওয়ার সত্যিই একটা সম্ভাবনা

আছে (কেবল জলের কয়েকটা পরমাণু প্রচণ্ড-গতিতে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে) যদিও সে সম্ভাবনাটা খুউ-বই কম! এর অনেক আগেই বাঁদরে টাইপ-রাইটারে কবিতা লিখে ফেলবে। কাজেই বলতে পারি—"সাতমন তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না", অর্থাৎ বাঁদরেও কোনও দিন আন্দাজে কবিতা লিখবে না আর জ্বলন্ত উনুনে বরফ তৈরী করাও হ'বে না।

অনেক গল্প ত শুনলে, এবার কিছু ন্যায়শাস্ত্রের আলাপ করি। ন্যায়শাস্ত্রে বলে যে যুক্তি দু-রকমের হ'তে পারে, অবরোহী আর আরোহী। অবরোহী মানে সাধারণ থেকে বিশেষে নামা; আর আরোহী মানে বিশেষ থেকে সাধারণে ওঠা, বা নমুনা থেকে পুরোপুরি সবটায় পৌঁছান। যেমন, যদি জানা থাকে যে সব মানুষই খাবার খায়, তাহ'লে বলতে পারি, যেহেতু রাম, শ্যাম এরাও মানুষ, এরাও নিশ্চয়ই খাবার খায়; এটা হ'ল অবরোহী যুক্তি। আর এর উল্টো দিক হ'তে এই ভাবে তর্ক করা যায়: আমরা দেখেছি যে হরি, যদু, মধু—এরা সকলেই খাবার খায় এরা তিনজনই মানুষ: কাজেই আমরা আন্দাজ করছি সব মানুষেই বোধ হয় খাবার খায়; এটা হ'ল আরোহী যুক্তি।

যে-সম্ভাবনা-গণিতের কথা এতক্ষণ শুনেছ—যাকে আমরা সাবেকী বা সনাতনী সম্ভাবনা গণিত বলতে পারি—তার পিছনে আছে অবরোহী যুক্তি। এখন রাশি-বিজ্ঞানে * সনাতনী সম্ভাবনা-গণিতের প্রয়োগ প্রচুর থাকলেও, এই বিজ্ঞানে আরোহী যুক্তির রাজত্বই বেশী; কেননা, রাশিবিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে নমুনা দেখে সবটা আন্দাজ করা। আরোহী যুক্তির ঠেলায় রাশি-বিজ্ঞানে এমন সব গোলমেলে প্রশ্ন উঠছে, যার উত্তর দেবার জন্যে সনাতনী সম্ভাবনা-গণিত আর কূল পাচ্ছে না, নতুন ধরণের সম্ভাবনার কল্পনা করা দরকার হ'চ্ছে। সনাতনী সম্ভাবনার ধারণা থেকে এদের আলাদা বোঝাবার জন্যে এদের নামও আলাদা দেওয়া হয়েছে: যেমন, অনুমান-মাত্রা (likelihood), নির্ভরী সম্ভাবনা (fiducial probability) ইত্যাদি। সম্ভাবনার এই নতুন ধরণের আরোহীগণিতের কল্পনা রাশি-বিজ্ঞানের বিশেষ অবদান।

পদার্থ-বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বগুলির মধ্যে সম্ভাবনাগণিত বেশ আসর জমিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাবা যেতো যে প্রকৃতি বল-বিজ্ঞানের (Mechanics) নিয়মে চলে, আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাবা হতো তড়িৎ-বিজ্ঞানের নিয়মে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাব-গতিকে মনে হলো যে আপেক্ষিক-তত্ত্বের জ্যামিতিই প্রকৃতির সব লীলা খেলা নিয়ন্ত্রণ করে; আর এখন মনে হয় যে বিচিত্রা প্রকৃতি আসলে সম্ভাবনা-গণিত দিয়েই বাঁধা।

---

* পুরাণো রংমশালে (কার্তিক, ১৩৪৭) "রাশি-বিজ্ঞানের গল্প" দেখতে পারো।

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

ভরা দুপুর। বৈশাখের আতপ-তাতল নিরালা দুপুর-বেলাকে দেখলে কবির কলমে আঁকা শব্দছবি মনে প'ড়ে যায়—'রৌদ্রময়ী রাত্রি।' ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! আতুর ধরণী এলিয়ে পড়ছে—ঝিমিয়ে পড়্ছে।

যেদিকে তাকাও—কী নির্জ্জন! আগুনের হল্‌কাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মানুষরা নিয়েছে ঘরের ভিতরে আশ্রয়। সব বাড়ীর দরজা-জান্‌লা বন্ধ। আহা, নিরাশ্রয় কুকুরগুলো খানা-ডোবার ভিজে ঠাণ্ডা মাটির উপরে পেট পেতে শুয়ে জিভ বার ক'রে ধুঁকছে। গন্‌গনে রোদের আগুন-চাদর বিছানো নিস্তব্ধ গাঁয়ের-পথ দিয়ে চলছে না একজনও পথিক। ফর্দ্দায় আছে খালি একটা চিল—একখানা ভাঙাচোরা পোড়ো-বাড়ীর তেতালার টঙে ব'সে তারস্বরে থেকে থেকে কেঁদে উঠছে—সে যেন আকাশের কাছে সূর্য্যের নামে জরুরি নালিস!

পথ নিস্সাড় হয়ে প'ড়ে আছে আঁকাবাঁকা অচেতন সুদীর্ঘ এক অজগরের মত। কিন্তু আগুনের এই রাজত্বে পথের দুই পাশের শান্ত স্নিগ্ধতার অন্তঃপুরের দিকে তাকিয়ে দেখ, চোখ যাবে রঙে-রূপে-রসে জুড়িয়ে। ওখানে বাস করে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ সুন্দরী শ্যামলতা। তারই মিষ্টি ছোঁয়ায় তরু-লতারা পরম সুন্দর। তারই রঙিন আনন্দের বিকাশ হচ্ছে কচি কচি আম আর জহুরী-চাঁপারা আর ফুলকারী ঘাসের গালিচা।

ওখানে গাছের নীচে শীতলপাটি বিছিয়েছে মেদুর ছায়া। ওখানে বাজছে একটানা ঘু-ঘু-ঘু-ঘুর করুণ একতারা। ওখানে ঘুম-জড়ানো ঘু-ঘু সুরের মাঝে মুহুর্মুহু বন-জাগানো ছন্দ তুলছে কোকিলের কুহু-কুহু।—যেন ঘুমে-জাগরণে মেল্লা-মেশা!

সূর্য্যের বিশ্বজোড়া 'সার্চ্চ্‌লাইটে'র দীপ্তি ধীরে ধীরে উঠবে যখন টল্‌মলে তাল-নারিকেলের চূড়ায় চূড়ায়, তখন আচম্বিতে আকাশে জাগবে বৈশাখী, কালবৈশাখী! দেখতে দেখতে বোবা স্তব্ধতা হঠাৎ যেন ভাষা পেয়ে ক'রে উঠবে মহা-কোলাহল! কয়লার মত ঘোরালো কালো আঁধি, বিদ্যুৎ-সাপ-খেলানো মেঘ আর মেঘ আর মেঘ, বজ্র ডমরুর ঘন-ঘন ডিমি-ডিমি, পাগ্‌লা ঝড়ের হা-হা হুঙ্কার, ধূলো ছড়ানো প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়া—ভয়াতুর পৃথিবী হয়ে যাবে ঘোর অন্ধকারের জঠরে অদৃশ্য!

... ... তারপর ধীরে ধীরে আবার দৃশ্য-পরিবর্ত্তন। বিচিত্র এই বৈশাখ্! বারো মাসের মধ্যে সে হচ্ছে বহুরূপী। 'রৌদ্রময়ী রাত্রি' আর নেই—হঠাৎ এসে হঠাৎ বিদায় নিয়েছে ঝঞ্চাচঞ্চল অকাল অন্ধকারও। সাড়া দিচ্ছে ফুরফুরে দখিনা বাতাস। একটি স্বপ্নমাখা নিরিবিলি তরু-কুঞ্জের ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মারছে পূর্ণিমার সবে-ওঠা কৌতূহলী চাঁদ। দূর থেকে সুখী মানুষের গলায় রবীন্দ্রনাথের গান ভেসে আসছে—

আজি তালের বনে করতালি কিসের তালে, তালে তালে—
পূর্ণিমার চাঁদ ওঠার কালে।

সোনার চাঁদ অবাক হয়ে দেখছে, পৃথিবীর দিকে দিকে ধ্বংসস্তূপ। মাটির ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে কত গাছ, কত লতা, কত পাতা, কত ফুল, কত ফল।

বৈশাখ বড় নির্দ্দয় বিচারক। যে গাছ, যে লতা, যে পাতা, যে ফুল, যে ফল আজ তার আঘাতে মারা পড়ল তারা ছিল রুগ্ন ও দুর্ব্বল। বৈশাখ ওদের বাঁচতে দিতে চায় না। কবি তাই তাকে ডেকেছেন—

"হে রুদ্র বৈশাখ!"

বৈশাখের বাণী হচ্ছে, পৃথিবীতে রুগ্ন ও দুর্ব্বলের বাঁচবার অধিকার নেই। ......এ বাণী তোমরাও শুনো, কারণ তোমাদেরও বাঁচতে হবে এই পৃথিবীতেই। ইতি

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গত বছরের রংমশালের

সব চেয়ে ভাল লেখা প্রতিযোগিতা

রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকাদের নিজেদের মতে সব চেয়ে ভাল লেখার লিষ্টগুলি থেকে ভোট নিয়ে নীচের লেখাগুলি নির্ব্বাচিত হয়েছে—

উপন্যাস—জেরিণার কণ্ঠহার
মাকড়সা

নাটক— গবচন্দ্র
নিশীথ রাতের কাহিনী

রূপকথা— { নিদ্রাবতী রাজকন্যা
হংসরূপী রাজপুত্র }
শিউলি

গল্প— রহস্যভেদ ; এয়ার-রেড
রেস্তরাঁয়

প্রবন্ধ—আয়না
গ-রশ্মি

ভ্রমণ— শীতে কাশ্মীর কাশ্মীরে শীত

জীবনী—আশুতোষ

কবিতা—চট্‌জলদী
{ দেবতা কোথায়
আমার দেশ
বহুরূপী }
হাঁদারাম সর্দ্দার

ওপরকার লিষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে সব চেয়ে কাছাকাছি হয়েছে নীচের দু'জন গ্রাহিকার লিষ্ট।

(১) আরতি মিত্র (গ্রাঃ নং ১৪২৪)

(২) গৌরী চ্যাটার্জ্জী (গ্রাঃ নং ১১১৩)

এদের দুজনকেই এই প্রতিযোগিতার প্রাপ্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

চলন্তিকা

২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশী বছর বয়স পূর্ণ হইবে। তাঁর এই আগত জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কয়েক মাস আগে রোগশয্যা থেকে তিনি আরোগ্যলাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু এখনও তিনি খুব অসুস্থ হয়ে আছেন। আমরা প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্র সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়ে উঠুন। রোগশয্যায় শুয়ে তিনি যে একটি কবিতামালা রচনা করেছিলেন—'রোগশয্যা' নাম দিয়ে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আরোগ্যলাভ করে তিনি আর একটি কবিতামালা রচনা করেন—"আরোগ্য"। সম্প্রতি "জন্মদিন" ও ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা একটি গল্পসমষ্টি—"গল্পস্বল্প" শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তাঁর এই আনকোরা লিখনগুলি তোমরা সকলে নিশ্চয় পড়বে। পৃথিবীর মহামানবদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন। তাঁর কাছে সমস্ত দেশ কৃতজ্ঞ। তিনি শুধু কবি নন, তিনি শুধু শিল্পী ন'ন, তিনি মানুষের মধ্যে মস্ত মানুষ। আমাদের দেশের দুর্দ্দিনে তাঁর অমৃতবাণী আমরা আরো বেশী করে শুনতে চাই। আজকের বিপদ আপদ অভাব অনটন পীড়নের মাঝে তাঁর বাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে পৃথিবীর দুঃখ দৈন্য থেকে অনেক ঊর্দ্ধে নিয়ে যাক। দীপ্যমান সূর্য্যের আলো আপনি বেঁচে আজকের ম্রিয়মান সমস্ত পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখুক।

বাঙ্গলার আর একটি কৃতী সন্তান সর্ব্বত্যাগী দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়—তিনিও তাঁর আশী বছর বয়স পূর্ণ করবেন। আজকের এই অশীতিপর চিরকুমার বৃদ্ধটিকে আমরা অভিনন্দন করি, তিনি দীর্ঘ জীবনলাভ করুন। ব্যবসায়ী শিল্পী বাংলাকে বৈজ্ঞানিক বাংলাকে যাঁরা বড় করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর নাম সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য। নিজের সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ বাংলার উন্নতি কল্পে তিনি অকাতরে দান করেছেন। বাঙ্গালী ছাত্রকে তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক করেননি, শিল্পী ব্যবসায়ী করেছেন ও তাদের দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। বাংলার ছাত্রকে তিনি নিজের ছেলের মত ভালবেসেছেন। ছাত্র সমাজ তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী। রাগের ভান করে অথচ অত্যন্ত স্নেহ করে তিনি প্রায়ই বলেছেন,—শুধু কেমিষ্ট হলেই চলবে না। তারপর পিঠে ঘুঁষি মেরে,—শরীর বাগাতে হবে। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ী বাঙ্গালী ছাত্রসমাজ ভারতের মাটিতে গড়ে উঠুক। আমরা তাঁর এই আদর্শের বিশেষভাবে সমর্থন করি।

রংমশালে চলন্তিকায় কয়েক মাস আগে আমরা গন্ধযুক্ত সিনেমা ফিল্মের আবিষ্কারের কথা বলেছিলাম। অর্থাৎ সিনেমা-ছবিতে বিষয়বস্তু কেবল আমরা দেখবই না, বা লোকজনের কথা শব্দ আমরা শুনবই না, হরেক রকমের গন্ধও আমাদের নাকে আসবে। যেমন ফিল্মের পর্দ্দায় গোলাপ বাগানের একটি দৃশ্য আমরা দেখব, তখনই তার মধুর গন্ধও আমরা পাবো। এই গন্ধযুক্ত ফিল্ম বা "স্মেলিং পিক্‌চারস্" সম্বন্ধে আরো অনেক খবর সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই "স্মেলিং" বা গন্ধযুক্ত ফিল্ম-এর আবিষ্কার করেছেন দুজন সুইটজারল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক—হ্যান্স্ লাউবে এবং রবার্ট বার্থ। সাত বছর ধরে নানা গবেষণার পর তাঁরা সম্পুর্ণরূপে সফল হয়েছেন। আমেরিকায় সম্প্রতি তাঁদের একটি ছবি দেখান হয়েছে—ছবিটির নাম Dream. Dream হচ্ছে একটি সুগন্ধী এসেন্সের নাম। পূর্ব্বে যখনই এই "স্মেলিং" ছবি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে তখন একটি দৃশ্যের গন্ধ পরের অন্য দৃশ্য পর্য্যন্ত থেকে গিয়েছে—অর্থাৎ দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গন্ধ পরিবর্ত্তন করা যেতো না। কিন্তু এখন দশ বিশটা দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দশ বিশটা রকম গন্ধও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন গোলাপ বাগানের দৃশ্যে আমরা গোলাপের গন্ধ পেলাম পরের মূহূর্ত্তের দৃশ্যটি হয়ত একটি পেট্রোলের দোকান তখনই আমারা পেট্রলের গন্ধ পেলাম। বুঝতেই পারছ সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, মিষ্টি গন্ধ, তিক্ত গন্ধ সবই দৃশ্যটির গন্ধ অনুযায়ী আমাদের নাকে আসবে। যাঁরা দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারেন না তাঁদের সিনেমা দেখতে দেখতে সময় সময় নাকে কাপড় দিতে হবেই। যাহোক আমরা Dream ছবিটির গন্ধটি কেমন তা দেখবার অপেক্ষায় রইলাম। এটি যে একটি অদ্ভুত আবিষ্কার তা মানতেই হবে।

হকি-লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেল। কলিকাতা হকি-লীগ ইতিহাসে প্রথমবার পুলিশদল হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। এই পুলিশদলটি গোড়া থেকেই খুব ভাল খেলেছে এবং একটা ম্যাচেও তারা হারেনি। এটা একটা দলের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেসদল যারা গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, এবার তারা একেবারে তলিয়ে লীগ টেবলের নীচের দিকে নেমে গেল। কলিকাতা হকিদলগুলির মধ্যে কাষ্টামস্ দলই সব চেয়ে নাম করেছিল। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে, আবার ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তারা লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এর পরে রেঞ্জার্স দলকে নাম করা যেতে পারে। এরাও খুব ভাল একটি হকি দল। মিলিটারী মেডিকেল দলটিও নাম করেছে। এবার কাষ্টামস্ তার পূর্ব্ব গৌরব হারিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও ভাল খেলেছে যে পুলিসদল সে কথা মানতে হবে। কলকাতার মাঠে এবার সুরু হবে ফুটবল লীগ খেলা। এবার ভারতীয় দলগুলির খেলোয়ারদের মধ্যে অনেক অদলবদল হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় খেলাগুলি খুব প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং তিন চারটি ফুটবলদল এবার লীগ পাবার চেষ্টা করবে। কোন্ দল যে এবার লীগ নেবে তা বলা বেশ শক্ত। তবে খেলাগুলি যাতে খুব সুন্দর হয় ও খেলার মাঠে যদি মারপিঠ ও মেজাজ খারাপ না হয়, তা হলেই আমরা সব চেয়ে খুসী হবো।

ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহের দিক বিদিক বদলেছে। অনেকে মনে করেছিল জার্ম্মাণী তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র কেবল ইংলণ্ডের বিপক্ষে চালান করে এক প্রকাণ্ড যুদ্ধ সুরু করে পৃথিবীকে তাক্ লাগিয়ে দেবে। কিন্তু এখন তার পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণ সৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিম

পথে তার মারণ অস্ত্র নিয়ে চলতে সুরু করেছে। উদ্দেশ্য যুগোশ্লাভিয়া অধিকার করে সেখান থেকে গ্রীস আক্রমণ করা। শোনা যাচ্ছে তারা যুগোশ্লাভিয়া পৌঁছে গ্রীসের দিকে অগ্রসর হয়েছে ও গ্রীক বন্দর স্যালোনিকা হস্তগত করেছে। গ্রীক বন্দর স্যালোনিকা দিয়েই যুগোশ্লাভিয়া বাইরের জগতের সঙ্গে তার ব্যবসা বাণিজ্য চালায়। এই জায়গাটায় এখন ভীষণ যুদ্ধ সুরু হয়েছে এবং গ্রীক সৈন্য যুগোশ্লাভ সৈন্য, ইংরেজ জার্ম্মাণ ও ইতালীয় সৈন্য—এই পাঁচ ছয় দেশের সৈন্যরা আজ ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম দিকটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের তীর্থকেন্দ্র করে তুলেছে। সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে না, পাবার কথাও নয়। এই যুদ্ধে শুধু গ্রীসের ভাগ্য পরীক্ষাই হবে না, আরো অন্যান্য দেশের ভাগ্য গণনা হয়ে যাবে। অনেকে মনে করে জার্ম্মাণ এই রকম করে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে ভূমধ্যসাগরে ইংরাজদের বিপক্ষে যুদ্ধের ঘাঁটি বসাবে। সুয়েজ খাল্‌এর দিকেও জার্ম্মাণদের চোখ আছে। কে জানে ভবিষ্যতে পূবদিকেই অর্থাৎ ভারত-বর্ষের রাস্তায় টাগ-অব-ওয়ার সুরু হবে। ইতিমধ্যে পশ্চিমে যতদূরেই যুদ্ধ ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষে আমাদের সকলের সচেতন ও সাবধান থাকতে হবে। আগুনের ফুলকি হাওয়ায় যে কোথায় গিয়ে পড়ে তা জানা নেই, আর যেরকম দমকা হাওয়া বইতে সুরু হয়েছে!

চিঠিলেখা প্রতিযোগিতা

চৈত্রের রংমশালে একটি নতুন প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—**চিঠিলেখা**।—মানে সত্যিকারের একখানা ভালো চিঠি, যা দশজনকে পড়িয়ে শুনিয়ে দিতে পারো। ভালো হলেই কিন্তু আমরা ছেপে প্রকাশ করবো। তোমাদের ভালো লাগে এমন একটি বিষয় নিয়ে চিঠিটি রচনা করতে হবে। রংমশালের এক পাতার বেশী কিছুতেই নয়।—ছোট হলে বরং ভালো। যারা ইতি মধ্যে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের বেলা এ নিয়ম খাটবে না। পুরস্কারের কথা নীচে জানিয়ে দেওয়া হোলো।

প্রথম পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক **দ্বিতীয় পুরস্কার**—নির্ব্বাচিত বই

পুরস্কার-প্রাপ্ত চিঠি ছাড়াও বাছাই কতকগুলো চিঠি রংমশাল বৈঠকে প্রকাশ করা যাবে। নীচের কুপনটি ভর্ত্তি করে চিঠির সঙ্গে পাঠাবে।

নতুন বৈশাখী প্রতিযোগিতা

কুপন

আমি / আমরা ১৩৪৮ সালেও রংমশালের গ্রাহক/গ্রাহিকা আছি। অতএব বৈশাখের নতুন চিঠি-লেখা প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম।

আমার নাম গ্রাঃ নং

ঠিকানা বা এজেণ্টের নাম

বয়স (যারা ছোট)

পিতা মাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর

রংমশাল দল

কলিকাতা রেডিয়োতে রংমশাল দলের বিচিত্র অনুষ্ঠান

রংমশালের রংমশাল দল, দিদিভাই ও সম্পাদক মশাইয়ের পরিচালনায়, কলিকাতা রেডিয়োতে ৫ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল) বিকাল ৫-২৪-এর সময় একটি ছোট বিচিত্র প্রোগ্রামের অনুষ্ঠান করেছে। নীচে সংক্ষেপে তোমাদের সকলের সুবিধার জন্য প্রোগ্রামটি দেওয়া হ'ল ঃ—

ভজন গান—গোপাল দাশগুপ্ত

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের বৈশাখা (নাটকাভিনয়) — লীলা দেবী, যুথিকা ঘোষ, লাবণ্য বসু, শেফালী বসু, মিনতি ঘোষ, সবিতা মুখার্জ্জি, কেয়া, বুনু, বীণা, বুলু (অজন্তা) ও বিমল বসু

সঙ্গীত পরিচালক বিমান ঘোষ

[নাটকটি এ মাসের রংমশালে প্রকাশিত হয়েছে]

যন্ত্রসঙ্গীত

ফাল্গুন মাসের হাসির কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

এই প্রতিযোগিতায় কেবল একটি মাত্র কবিতা প্রশংসাযোগ্য হয়েছে। কবিতার নাম 'কোথাকার জল কোথায় গড়ায়'।—লেখক শ্রীহরিভূষণ মৈত্র—গ্রাঃ নং ১৫৩৫। শ্রীমান হরিভূষণ একটি পুরস্কার পাবে। কবিতাটি এবার বৈঠকে ছাপা হল।

—নূতন ধাঁধাঁ—

—ইঙ্গ-বঙ্গ-চীনে-চিঠি—

ছাগল ডাকে পার। য়েছে এত-e রহস্য রামের শ্বশুর J কৃষ্ণ ৮ ঃ O জানেন না!

উপরের রহস্য চিঠিটা উদ্ধার করে ২৫শে বৈশাখের আগেই রংমশালের ডিটেকটিভ বিভাগে পাঠাও—ঠিকানা ৬১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। আজ মেট্রোতে ভাল বই। ম্যাটিনীর টিকিট করেছি। পালিয়ে আসিস। ২। আরাম।

রংমশাল বৈঠক

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়

(পুরস্কার-প্রাপ্ত হাসির কবিতা)

শ্রীহরিভূষণ মৈত্র

(গ্রাঃ নং ১৫৩৫)

দিনটা ছিল গরম ভারী, কাজেই রাজা খাসা,
আরাম করে নানান স্বরে ডাকাচ্ছিলেন নাসা।
মন্ত্রী বুড়ো চক্ষু মুদে পাশেই ব'সে রাজার,
ঝিম ঝিমিয়ে দেখতে ছিল খেয়াল দুশো হাজার।
সভার মাঝে ছিল বসে অন্য যত সবাই,
কর্চ্ছিল কেউ ফিসির ফিসির, তুলছিল কেউ হাই।
এমন সময় একটা মশা রাজার নাকে ব'সে,
একটু চেয়ে এদিক ওদিক কামড়ে দিল ক'ষে।
গেলুম বলেই হাত পা ছুঁড়ে উঠল রাজা জেগে,
নাকের জ্বালায় ছটফটিয়ে অতি ভীষণ বেগে।
চীৎকারেতে সকল লোকের তন্দ্রা গেল টুটে,
দেখতে রাজায় ব্যস্ত হয়ে সবাই এল ছুটে।
ভয়ে ভয়ে জোড় হাত ক'রে জিজ্ঞাসিল রাজায়,—
হেইগো রাজা বাক্যি বলো হায় কি হলো হায়?
ককিয়ে কেঁদে বললো রাজা, ওসব এখন রাখ,
মরছি জ্বলে বিষের জ্বালায়—বদ্যি ত্বরায় ডাক।
এই না শুনে রাজ্য মাঝে আদেশ হলো জারী:
বদ্যিরা সব শীগ্রি এসো রাজার অসুখ ভারী।
খবর পেয়ে বদ্যি যত তখন দলে দলে,
ধূলোয় আকাশ আঁধার ক'রে পাল্লা দিয়ে চলে।
হাঁপিয়ে এসে থামলো না কেউ, জোর জাবরি করি,
সবাই আপন ব্যবস্থা দেয় রাজায় চেপে ধরি।
কেউবা এসে জামা খুলে কর্ত্তে লাগে বাতাস,
মাথায় আবার জল ঢেলে কেউ দিল ঘড়া সাতাশ।
কেউবা দেখে চিমটি কেটে কেউবা দেখে নাড়ী,
কপালেতে কেউবা লাগায় প্রলেপ তাড়াতাড়ি।
কেউবা বলে নিউমোনিয়া, কেউবা বলে হাম,
কেউবা ব'লে ধাত ছাড়িবে হলে পরেই ঘাম।
যতই রাজা বলছে, 'থামো' ভীষণতরো রাগে:
'আরে বাপু করছো কি সব—রোগটা শোন আগে!'
ততই তারা সবাই মিলে জাপ্টে ধ'রে রাজায়,
যাহার প্রাণে যা চাহিল চললো ক'রে সে তায়।
সবাই ভাবে আমার হাতেই হবেন রাজা আরাম,
আপনমনে দেখছে স্বপন রাজ্যি জোড়া নাম।
কাজে কাজেই লাগলো ভীষণ দ্বন্দ্ব পরস্পরে,
সবাই বলে যাওনা স'রে দেখো ওখন পরে।
কেউবা বলে: জানিস আমি ভীষ্ম দেবের শিষ্য,
আজ অবধি আমার হাতে মরলো রুগী বিশশো।
কেউবা বলে আমার হাতে আরাম না হয় তবে,
স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—রাজার মরাই উচিত হবে।
আর এক জনা এগিয়ে এসে রাজায় ক'রে কাত,
পড়পড়িয়ে উপড়ে দিল দুইটি কাঁচা দাঁত।
অঝোর ধারায় রক্ত ঝরে চোখের জলে মিশে,
ঝনঝনিয়ে উঠল মাথা হারিয়ে গেল দিশে।
ভীষণ তখন চেষ্টা ক'রে ছাড়িয়ে তাদের হাত,
প্রাণ বাঁচাতে পালায় রাজা, চায়নাকো পশ্চাৎ।
তারাও ছুটে পিছু পিছু বলে: রাজায় ধরো,
দেখছো নাকি চেপে গেছে বিকার ভীষণতরো!
রকম দেখে মন্ত্রী তখন সেপাই ডেকে এনে,
জোর করে সব বাড়ী হতে করলো বাহির টেনে।
বেদম রেগে বদ্যিরা সব ফোঁস ফোঁসিয়ে বলে—
দেখছি রাজা মরবে ঠিকই আপন কর্ম্মফলে।
যেমনি রাজা, মন্ত্রী তেমন দোষ বল দিই কাকে,
এই বলে সব ফিরলো ঘরে নস্যি দিয়ে নাকে।

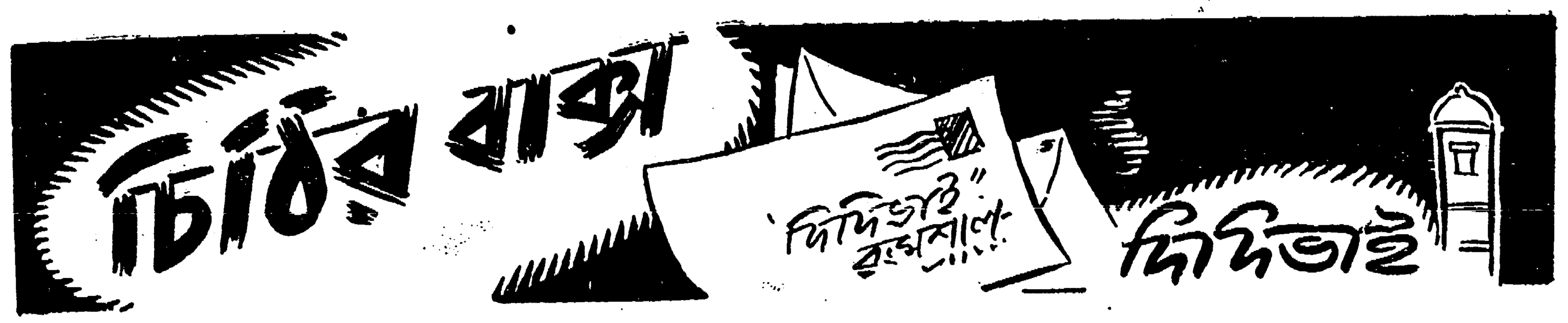

আমার প্রিয় রংমশালের ভাই বোনেরা,

বাংলায় নববর্ষ এলো—এলো একটি নতুন বছর।

রংমশাল তোমাদের সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতির পসরা নিয়ে এলো নতুন বছরে নবরূপে। বিগত বছরের যত অসুবিধা ও বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে তোমাদের এই প্রিয় পত্রিকাখানিকে আসতে হয়েছিল, নববর্ষের প্রারম্ভে এই বিপর্য্যয় ও নানা অসুবিধা কাটিয়ে উঠে রংমশাল তোমাদের সকলের অন্তরে রংমশালের রূপছায়া, আলো ও আনন্দের সঞ্চার করুক। নতুন বছরে এই আমার প্রার্থনা। এ প্রার্থনায় আছে বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখর অন্তরের মূক উপস্থিতি।

পৃথিবীতে যে বিপর্য্যয়, হানাহানি দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় কে জানে! তবু তোমাদের কিশোর আনন্দ উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে এই নব বছরে এ প্রার্থনাই করি, আমাদের পৃথিবীতে নববর্ষ আনুক শান্তির ছায়া। এ দেশের ছেলেমেয়েরা তোমরা—এ দেশের শিল্প সামগ্রী, এ দেশের মাটি তোমাদের প্রিয় হোক। দেশ ও জাতিকে আলো দেখাও তোমরা, হে আগামী যুগের ভাবুক কর্ম্মী ও ত্যাগীর দল!

পুষ্প সিংহ (কাটোয়া) ১৫৩৩, তোমাদের অনেকের পূর্ব্ব পত্রগুলি আমি কোথায় রেখেছি ভাই খুঁজে পাচ্ছি না, সুতরাং প্রশ্নগুলি যদি আর একবার লিখে পাঠাও বড় ভাল হয়। সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলেই 'পরদেশী'র লেখিকার খবর পাবে। ইন্দিরাদিকে তোমাদের কথা বলেছি ভাই। আমায় দেখা যায় অবশ্যই তবে কোথায় যে দেখতে পাবে তাতো ঠিক করে বলা কঠিন। তবে চেষ্টা করলে সবই সফল হয়, এ তো জানো? ভবদেব ভাইয়ের কথায় তুমি মত দিচ্ছ জেনে সুখী হলাম। **কৃষ্ণা ঘোষ** (বালিগঞ্জ) ১৪১৫, ইঁদুর ও আচারের এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী পড়লাম, বেশ খুসী হয়েছি। কিন্তু আচার চুরি হচ্ছিল, না রোদে দেওয়া হচ্ছিল বলতো বোনটী? **নমিতা দত্ত** (সিলেট) ১৪৮১, সব পত্রিকার মধ্যে রংমশাল তোমাদের অনেকেরই ভাল লাগে তা আমি জানি সেজন্যই চেষ্টার অন্ত নেই কিসে তোমাদের ভাল লাগবে। ভবদেবের কথায় তুমিও সম্মতি দিচ্ছ? বাঃ বেশ তো! **প্রফুল্ল**

(গৌহাটী) ১৪৪৭, যে বই সম্বন্ধে লিখেছ তার ঠিকানার কথা আমার জানা নেই ভাই। বই তাড়াতাড়ি যাতে পাও তার জন্য বলে দেবো অফিসে। **বিকাশকুমার পাল** (হাওড়া) ১৫৩০, তোমার ষ্ট্যাম্প সমেত চিঠি পেয়েছি ভাই। তোমাদের লেখা কবিতা গল্প সবই সাদরে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তোমরা তো এখন নতুন লিশছ, তাই একটু বিচার করার দরকার। এই দুর্দ্দিনে ষ্ট্যাম্প পাঠিয়ে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না ভাই। যদি মনোনীত হয়, দেরী হলেও অবশ্য ছাপা হবে, আর লেখা বিচার করা কাজটী আমার নয়, এটী সম্পাদক মহাশয়রা আমায় দেননি (বোধহয় ভয় পেয়েছিলেন পক্ষপাতিত্ব করবো বলে)—কাজেই এ সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারি না তোমাদের। আশা করি তোমরা একথা বুঝবে, ও দুঃখ পাবে না, আর আরো বেশী করে লিখতে আরম্ভ করবে। **সন্ধ্যা সিংহ** (রাজবাড়ী) ২৩২৯, তোমার ঐ ঠিকানা আর নম্বর বদলানর ব্যাপারটা অফিসের ঠিকানায় পরিচালক মশাইকে লিখলে ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হবে। রাগ করিনি তো, ক্ষমার কথা কেন বলছ বোন? **কপোত**—১৫৪৭, আশীর্ব্বাদ তো দেবই ভাই। কিন্তু ধমকাবার অধিকার তো আছে? চিঠি লিখিবার সময় পুরো নাম ঠিকানা গ্রাঃ নম্বর না লিখলে উত্তর দেবার সময় যে বড় অসুবিধা হয়। তোমার দাবী সম্পূর্ণ করে নেবার ভার তো তোমাদেরই, তাড়াতাড়ি বসে পড়ো দলের ভিতর, সবাই ভাই বলে স্বীকার করে নেবে বুঝেছ? **রহিমা খাতুন** (ষোলঘর) ৭৭৩, চিন্তা এতদিনে দূর হয়েছে তো বোন? ভবদেবের কথায় তুমি সম্মতির ঘাড় নাড়ছ? বড় ভাল লাগছে কিন্তু। **রেখা নন্দী** (সিলেট) ১৪২৮, নামগুলো যদি জানাতে বোন তাহলে লেখনীবন্ধু পাঠাতে যে কি সুবিধা হতো। তোমার নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারী আমোদ পাচ্ছি। আমি তোমাদের দিদিভাই—এ ছাড়া অন্য পরিচয়ের কি দরকার ভাই? **সতীনাথ ভট্টাচার্য্য** (নৈহাটী) ১৩০২, অনর্থক ষ্ট্যাম্পের দরুণ খরচ না করাই ভাল ভাই, তবে তাতে এ ভেবোনা যে চিঠি দিতে বারণ করছি। পরীক্ষায় পাশ করেছ, আনন্দের ভাগ তোমার ভাইবোনদের দিচ্ছি, অত পুরস্কার পেয়ে খুব বেশী ভাল লাগছে—নয়? **নীলিমা চক্রবর্ত্তী** (নিউ দিল্লী) খুকুমণি! ছ'মাস পরে অন্য লোকের কথা নিয়ে এলে—না হলে বুঝি আসতে না? আমি বুঝি প্রত্যেকের নাম করবো আর তোমরা ভুলে থাকবে? ভবদেবের মতে তুমিও? বেশ! তোমার নালিশ শুনে আমি এখান থেকেই নাগপুরের খুকু-রাণীর কাণ মুলে দিচ্ছি তাদের দুষ্টুমীর কথা শুনে। রংমশাল দল ১৮ তারিখে (এপ্রিল) All India Radioতে প্লে করবে, সময় ৫—২৪। তোমরা নিশ্চয় শুনো—কলিকাতা ষ্টেশনে হবে। **জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়** (মজঃফরপুর) ৯৩৭, তোমার বাবা স্বর্গলাভ করেছেন শুনে মর্ম্মাহত হলাম ভাই। তুমি সকলের বড় হলেও বয়সে কত ছোট, ভগবান তোমাদের মনে শান্তি দিন। তুমি সত্যিই একদিন যেন 'বড়' হয়ে উঠতে পারো, এই প্রার্থনা

করি। **মায়া ও খুকু** (পাটনা) ১৩৬০, রংমশালের প্রচ্ছদপটের ছবিটা আমার কিনা জানতে চেয়েছ? আরে পাগল অত ভাল ছবি কি আমার হয়? চুপি চুপিই জানালুম তোমাদের। বিচ্ছেদের হিমালয় কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না বোন। তোমরাও তো দেখছি ভবদেবের মতের সমর্থনকারী। **যুগোলকিশোর ভট্টাচার্য্য** (ভবানীপুর) ৭৪৭, এই বইটী ছাড়া ওঁর আর অন্য বই আছে কিনা আমার জানা নেই, পুস্তকালয়ে খোঁজ করো। তোমাদের জন্য তো রেডিওতে প্লে করান হচ্ছে—এ ছাড়া বৈঠক বসানর কথা বলেছ—পরিচালক মশাইকে বলে দেখবো ভাই। **সুধীন রায়** (সৈয়দপুর) ১৪৭৪, চিঠির বোঝা হারিয়ে রাগের বোঝা তোমাদের বাড়িয়েছি। প্রশ্নগুলি আর একবার লিখো ভাই। খুব আনন্দ করছ বুঝি? বেশ তো! **সনাতন প্রামাণিক** (কলিকাতা) ১৫৪৬, স্নেহের দাবী করবার আগেই পেয়ে গেছ ভাই। লেখার বা প্রতিযোগিতার বিচারক আমি থাকি না সেইজন্য সঠিক জানাতে পারি না। **তরুণশঙ্কর ভাদুড়ী** (ভবানীপুর) ৭০৪, নিশ্চয়ই তুমি লেখনীবন্ধু পেতে পারবে ভাই, তবে নাম ধামগুলো জানালে আমার কাজের সুবিধা হয়—বুঝলে? **সুপ্রকাশ সেন** (জামসেদপুর) ১৫৪৪, তোমার লেখা আমি যথাস্থানে পৌছে দেবো ভাই, অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে। **অশোক মুখোপাধ্যায়** (নিউ দিল্লী) তুমি প্রথম লেখো বা দ্বিতীয় লেখো—তুমি তো আমাদের ছোট্ট ভাই—। প্রতিযোগিতার লেখা যথাস্থানে গেছে। **বিমলকুমার দত্ত** (মেদিনীপুর) ১৩৫৬, তোমার অনেক প্রশ্ন, আশাকরি জবাব পেয়ে গেলে? (১) পৃথিবী নিয়ে নানান মানুষের নানান ধরণের মাথা ব্যথা! কেউ ভাবছে এর ওজন কত, কেউ ভাবছে পৃথিবীর প্রথম জন্মের কথা। পৃথিবীর কথা একদিন তোমাদের শোনাবো। পৃথিবীর জন্মের কথা নিয়ে নানা দেশের নানা জাতের ভিতর বহু রকমের গল্প প্রচলিত আছে—সে গল্পের সঙ্গে তোমাদের একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো। বড় বড় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর ওজন নিয়ে বহুদিন ধরে গবেষণা করছেন। ১৭৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে 'হেনরি কেভেণ্ডিস' নামে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর ওজন স্থির করেন। পৃথিবীর ওজন ১২,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। কেভেণ্ডিসের এই মত ও নির্দ্ধারণ বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন করেন। (২) রাশিয়ায় 'লেলিন গ্রেডে' সোভিয়েট ইউনিয়নের যে লাইব্রেরী আছে (যেটা সেণ্ট পিটারবার্গে পুরোনো আমলে ইম্পিরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী নামে অভিহিত হতো) তার নাম হলো The Gosudarstvennaya Publichnya Biblioteka, এটাই সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী, তারপর যে লাইব্রেরী দু'টোর কথা বলা যায় তার ভিতর একটা হলো ফ্রান্সের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম। (৩) টেলিভিশান

অনেকেই গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু ১৮৮১ সালে Shelford Bidwell নামে একজন আমেরিকান প্রথম ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন (বিনা তারে)। জ্যৈষ্ঠ মাসে এ নিয়ে প্রবন্ধ বেরুবে। (৪) লোকগণনা বা আদমসুমারী সুরু হয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। এক সময়ে বে-সামরিক লোকদের গণনা করা হয়েছিল ওল্ড টেষ্টামেণ্টে একথা লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। রোম দেশে প্রথম বেশ ভাল ভাবে লোক গণনা সুরু হয়। সুচারু-রূপে লোক গণনার পরিকল্পনা করেছিলেন 'সার্ভিয়াস টুলিয়াস' বলে এক ভদ্রলোক। সেন্সাস কথাটার উদ্ভব হলো সেখান থেকেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এখানে ওখানে খাপছাড়া ভাবে লোকগণনা হতো। এই সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকেই ভাল ভাবে লোকগণনা সুরু হয়।

তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিও।ইতি—

শুভার্থিনী তোমাদের

দিদিভাই

গতমাসের ধাঁধাঁর

উত্তরদাতাদের নাম

যাদের নির্ভুল হয়েছে ঃ

কুমারী রেখা নন্দী (সিলেট), মায়া ও খুকু (পাটনা), সবিতা ও নমিতা দত্ত (সিলেট), নীলু, পিকু, তারা, ধ্রুব, মেরী, টুনু, শ্যামল, কমল, হাসি, পল্টন, বিবি, গোপাল, মানু ঘোষ (পাটনা), কৃষ্ণা বসু (বালিগঞ্জ), প্রফুল্ল কুমার কর (গৌহাটি), শান্তি, চণ্ডী, হারু, টুকেন (তিলুড়ী), রবীন্দ্র, বেবী, লক্ষ্মী, রেণু ও সতী মৈত্র (রাজসাহী), রহিমা খাতুন (ষোলঘর), গীতা দত্ত, দেবপ্রসাদ দত্ত (কলিকাতা), পান্নালাল, কেশবলাল, মতিলাল, মুক্তালাল, শেফালী, আটা ও কাকাবাবু (হাওড়া) বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (সালিখা, হাওড়া), সমরেশচন্দ্র বসু (কলিকাতা), কমলেশচন্দ্র শীল (বরিশাল), কৃষ্ণা ঘোষ (বালিগঞ্জ), কনকপ্রতিমা দেবী (মজিদপুর), কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (ধানতলী), সতীনাথ ভট্টাচার্য্য (নৈহাটি), অতীন, ইদা, ভুঁদা, উমা, গীতা, মণ্টু, বুল্লা, দীপা, হাবু, বটা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া) পারুল, শঙ্কু, উমা, খোকা (লাহোর), ইলা, সোম, কল্যাণী, শিবু ও খোকন (লাহোর), পুষ্প সিংহ (কাটোয়া) অরুণ কিরণ শীল (বালিগঞ্জ), মীরা সেন (সেনহাটি), হৃষিকেশ ও পারুল (সিলেট), মণিমালা দেবী (ভবানীপুর), মিনু, ময়না, রবি, বাবুল, উষা (কলিকাতা), সুরেখা, রেখা, রমা, প্রতিমা, সমীর, আলোক, দীপা, গোরা (কলিকাতা), বি, এ, ক্লাব (বানিতলা), অশোক, অজয়, অরুণ, নূপুর দাশগুপ্ত (চন্দ্রদ্বীপ), যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর), প্রতিভা, সুপ্রভা, অন্নপূর্ণা ও গৌরী (কলিকাতা), জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায় (মজফরপুর), অনিতা বসু (কলিকাতা), সুধীন রায় (সৈয়দপুর), অমিয়কান্তি ঘোষ (জামসেদপুর), কুমারী অমিয়া, মল্লিকা, নীরা, সতী, ও শিবানী (পুরুলিয়া), রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার (কলিকাতা)।

যাদের একটি ভুল হয়েছে ঃ

বিনীতা ঘোষ (রাঁচী), যশোধন ভট্টাচার্য্য (বিষ্ণুপুর), রেণুবালা চক্রবর্ত্তী (নওগাঁ), চন্দ্রমোহন সিংহ (দলুইগাছা), দীপক ও মীরা সান্যাল (রাজসাহী)।

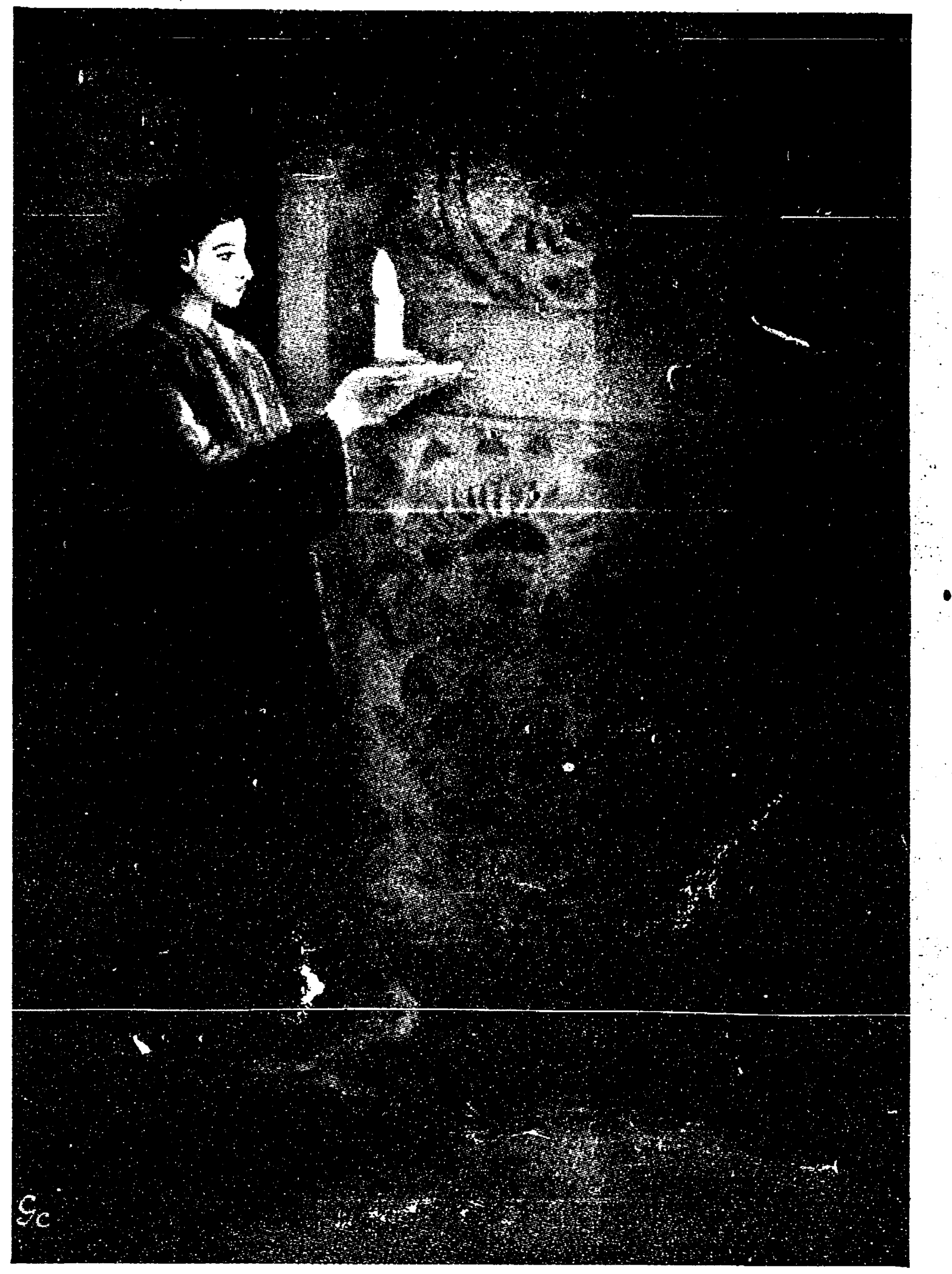

দীপ হাতে

শিল্পী—শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৮

রত্নকমল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এক

এক জেলে।

এক ডুবুরী।

দুই বন্ধু।

জেলে পথ হাঁটে টাকু হাতে। পথে যায় সূতো পাকায়। বলে, শোনে, জাল বোনে আর জাল কাঁধে মাছ ধরে।

দীঘী পুকুর খাল বিলে জেলে জাল ফেলে আর টানে। কাদায় বুক পিঠ চীর-আঁচড়ে শিরশিরিয়ে যায়, শামুক গুগলী পাড়াপড়সী নিয়ে মাছের রাজ্য উঠে আসে।

বক ওড়ে, চিল ওড়ে।

তা'পর জেলে নদীতে জাল বায়, সমুদ্দরে চলে যায়।

ডুবুরী।

জাল টাল বোনে না। আঁটা কানে শোনে না। জল টোপরে মাথা ঢাকে, আঁকে না বাঁকে না, দেয় ডুব আর ঝিনুকপুরীতে গিয়ে নামে।

বাচ্চা কাচ্চা শাঁখ ঝিনুক শেওলার ঘরে খিল দেয়, পাড়াপড়সী হাঙ্গর তিমি সাঁতারে টিল দেয়।

ডুবুরীর...
বল্লম জাগে হাতে,
আর জাগে থলে,
সাগরের মুক্তো
তুলে' শির দোলে।

জেলে সুতো পাকায়, ডুবুরী মাথা ঢাকে

থাকে তার বন্ধু।
জেলে ডিঙিতে জেলে।
মাছ ধরে।
জালের সুতো আরো ছেড়ে দিয়ে, ডুবুরীকে তুলে নেয়।
নদী ভাসে সমুদ্দুরে আর সমুদ্দুর ভাসে নদীতে, সেই মোহানায়।
ঢেউয়ের আছাড়।
জোর পবন :

দুই বন্ধুর সুর,

নদ নদী সমুদ্দুর
মচ্ছেরা ঘুর-সুর্!
কচ্ছপ গুগ্‌লীর
উচ্ছবে মন চুর!
হাঙ্গর কুম্ভীর
কেঁ ডরে সে— কোন্ বীর?
পাঁকে শাঁখে, শেওলায়,
মুক্তোর মণিপুর।

দুই

এক লাফে ধরা কাঁপে। ছিট্‌কে গিয়ে চিংড়ি বললে, "যাও! খাবনা, দাবনা নেই কিচ্ছু ভাবনা, আমি যে, চলে যাচ্ছি!"

আর লাফে জল কাঁপে! "কান নেই চোখ নেই 'প্রমায়ুর' শেষ নেই—শুনছিস বুড়ী? আমি চলে তো যাবই!"

আঁকু পাঁকু করে এগিয়ে গুড়ি সুড়ি পাঁকবুড়ী চিংড়ির গা মাথা বুলিয়ে বলে, "ষাঠ, ষাঠ, দাদুমণি থাকবে দোরে, মাণিক মণি থাকবে ঘরে, ছি, ছি, অমন কথা থা'ক্ শত্তুরের মুখে!" পাঁকের পাকা চুলের নুড়ি খর-জলের সোঁতে ছিন্ ভিন্।

তিনের বার ছিট্‌কে উঠে চিংড়ি বলে—"মাছেরা আবার মাছ! ঠাক্‌মা বুড়ী শোন্! জেলেদের জাল মাছেদের কাল ; আমার ? আমি যাই মাছ—
মারলেম তুড়ি,
উড়লেম ঘুড়ি!"

"কে বা তোমার যুড়ি!!"—
ভেউস এসে বলে, বাউস এসে বলে, রুই কাতল মৃগেল এসে বলে—
"তুমি ছিলে পঙ্কে
তাই হল রক্ষে,
তা জেলেদের জালে মাছের পুরী উজাড়, আমরা যাচ্ছি রাজার কাছে, তুমি যাচ্ছ তো?"
আরেক ছট্‌কা লাফিয়ে চিংড়ি বললে,
"পাগ মুকুট মাথে
খাঁড়া তরোয়াল হাতে
আমি রলেম সাথে,
দেখছ না? তা ঠাকুমাবুড়ী বললে 'ষাঠ, ষাঠ, যাস নে।' যাব আবার—না!"
মাছেরা সুধালে, "ঠাক্‌মা, সত্যি?"
বললে পাঁকবুড়ী, "সত্যি,
রাজা খাচ্ছেন খাজা, রাণী খাচ্ছেন ফেণী,
মন্ত্রী খান ভাজা,
কোটাল খান, তাজা,
শুধু যে,
রাজকন্যে,
তাঁরি দোলে বেণী।

সাতদিন সাতরাত রাজকন্যা দুধসায়রে না'ন্ না, দুধটুকুও খান না, চামর পাখা পড়ে', সিপাই শান্ত্রী দোরে ; শুক শারী মুখ ভারি, না গান না সুর, না মালা না নূপুর !

কার কাছে বা যাবি,
বুড়ো মানুষ, ভাবি।"

মাছেরা বললে—"তাই ত ঠাক্‌মা, তা'হলে ?"

ঠাক্‌মা বললে 'পারিস্ !
সূয্যি মামার
সোনার থালে
রাত পোয়াবার
উদয়শালে
সাত ডঙ্কার ঘা,
পারবি দিতে ?
যা !"

চিংড়ি কুঁকড়ে' থাকে।

শুনে মাছেরা খোলা মুখে খোলা চোখে চেয়ে থাকল। তারপর পাকসাটে ঘুর, লেজের দাপটে ঘন জল দু'ভাগ করে বলল,

"এই ?
আচ্ছা !"

তিন

জেলে বললে, "ডুবু !"

ডুবুরী বললে, "জাল !"

জেলে বললে, "খালে বিলে মাছ নেই, সমুদ্দুরেও মাছ নেই, কেন রে ?"

ডুবুরীর দিকে কান, জালে টান, জেলে চেয়ে থাকল।

উথাল পাথাল হাওয়া। হাঁটু ভেঙ্গে বেঁটে মাথার টোপর এঁটে ডুবুরী বললে, "বটে তো ভাই জাল ! ডুবে গেলাম পাতালে, না দেখলেম হাঙ্গরে', না তিমিটে, না আচ্ছা—তিমিঙ্গিল !"

"নেই কিচ্ছুই ?"

"নাঃ !"

জেলের চোকে জল, মুখ বিকল। নাক কান বোঁচা হাতের আঙ্গুল খোঁচা—বললে, "ও—ই যে মোহানা ? কুমরে' ছানার হা, তাও—ও নেই !"

"নেই ?"

"না তো !"

ডুবুরী বললে,

"তবে ভাই, কথা তো বটেই !"

জেলে খালি জাল টেনে তুলে বললে, "দেখলি ডুবু ? বটেই !"

ডুবুরী ভেবে চিন্তে বললে, "তা ভাই জাল, থেমে তো থাক্। আমি একটুক্ আসি।"

টোপরে দু হাত মাথা দুবার কাৎ, ডুবুরী ঝাঁপিয়ে পড়ল—ঢেউয়ের ডাক দু'ফাঁক করে'।

ডিঙির টাল্ সামলে', জাল পাল সামলে,' বসে জেলে।

হু হু বাতাস।

ঢেউয়ের পিঠে ঢেউ গর্জ্জে, ঢেউয়ের মুখে ফেণা বর্ষে, শাপের ফণার শ্বাস !

চার

দুধসায়র।

হিম কুয়াসা নেমে আছে। শিশির কাঁদে গাছে গাছে। ফোট—অফোট দিন, পাখীর স্বর ক্ষীণ, আস্তে কেবল, রাজহাঁস নামে জলে।

হাঁসেরা চমকে উঠল, পদ্মেরা কাঁদ-কাঁদ, তাদেরো পা বাঁধ বাঁধ, জল কে ঘাঁটে কথা যেন বাঁটে ?— কথা কাদের কানে আসে ?

হাঁসেরা হাসে না, ভাসছে, তবু ভাসে না।

শোনে।

...কই বললে, "রাজকন্যে, মনে কি পড়ল আজ ? তো বলি।"

কাতল বললে, "রাজকন্যে, আজ যদি এসে থাক, তো বলি।"

চিতল বললে—"রাজকন্যে, আমার গায়ের দর্পণে মুখ দেখ, বল, কথা বলব ?"

শোল বললে, "রাজকন্যে, চক্ষে তোমার জল, আঁচলে মোছ ; বলি।"

রাজকন্যার নিঃশ্বাসে তুধসায়রের ঢেউ মাথা নীচু করল। থর থর হাওয়া শ্বেতপদ্মের বনে পাতার আঁড়াল ধরল। রাজহাঁসের ঠোঁট, লুকা'ল পাখায় পিঠে। শুধু, শামুকেরা আস্তে মুখ খুলে বলতে গেল—

তুধসায়রের ঢেউ মাথা নীচু করল

"রাজকন্যে............"

রাজকন্যা একটি আঙুল উঠালেন, তুটি উঠালেন, তিনটি, চারটি, পাঁচটি উঠালেন,

"চু.........প.........

তৃণ লতায় শুনবে, গাছ বৃক্ষে শুনবে, মাটী পাহাড় শুনবে, মেঘ বিত্যুৎ শুনবে, আকাশে তারায় শুনবে——"

রাজকন্যার চক্ষের জল আবার নেমে এল।

হাত নামিয়ে আঁচলে রাখলেন।

হাতের কাঁকন বালা জড়িয়ে আঁচল উঠল। মুছে চোক, রাজকন্যা বললেন,—ফুলের পাঁপড়ি ঘেমে ফোটে, ভাঙা বাঁশী কেঁপে ওঠে—বলে' না বলে' বলেন,

"রাজার ঝি—
আখরটি
তুধসায়রে
ডুবিয়ে দি।
যদি হব রাজকন্যা,
আসব আবার ধরিত্রী।"

তুধসায়র শিউরে উঠে, মাছের মুখে শেল ফুটে, হাঁসেরা অলস, পদ্ম অবশ, হিম হাওয়া শুধু, রাজকন্যার আঁচলখানি এসে ছোঁয়।

রাজ তুয়ারে ডঙ্কা। রাজপুরীতে সাড়া পড়ে, ঘাটে পথে হৈ হৈ, "কোথায় রাজকন্যা কোথায়।" দাসী ছোটে বাঁদী ছোটে, শাস্ত্রী সিপাই পাগ ছিঁড়ে,

এ কি!
গায়ে নাই আভরণ,
নীল আঁচল আবরণ,
পাষাণে গা জলে পা, রাজকন্যে!

মাছেরা ডুব দেয়, হাঁসেরা চুপ করে, শ্বেতপদ্ম নুয়ে পড়ে, তুধসায়র পাথর, রাজকন্যার দোল-চৌদোল এসে থেমে থাকে।

রাজকন্যা চান না, ভার চোক তাকান না, কোন কথায় কান না,

"মিছেই পুরী, মিছেই মোতি,
মিছেই পরিমল,
তুধসায়রের
জল
সত্য
শীতল।"

[আগামী মাসে—

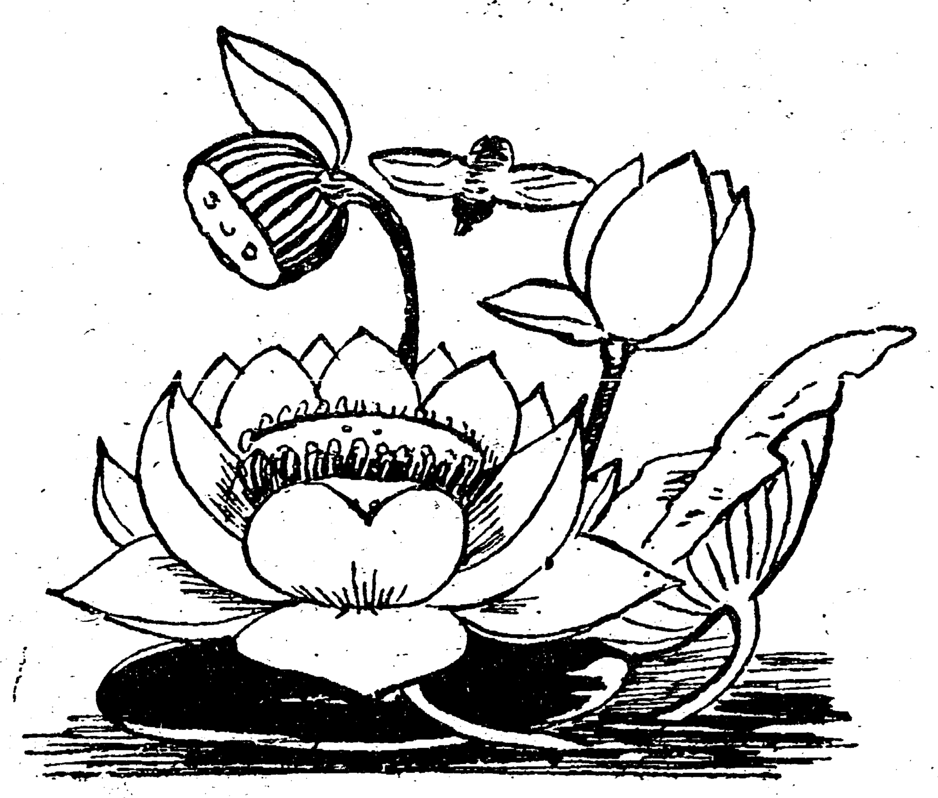

সঙ্কলন

বেঁটে ছাতাওয়ালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও আমার বেঁটে ছাতাওয়ালি
বৃথাই সময় তুই খোয়ালি।
বাদল থামিল যবে
ভাবিনু সুযোগ হবে,
তখন কেন গো বেলা পোয়ালি।

মেঘ করে গুরু গুরু
প্রণয় হইবে সুরু
আকাশ হয়েছে ঘোর ধোঁয়ালি
ও আমার বেঁটে ছাতাওয়ালি।
তুই আসিলি না বলে'
দিন বৃথা গেল চলে,
ধরণী চোখের জলে ধোয়ালি,
ও আমার বেঁটে ছাতাওয়ালি।

ঝড়ের গাছের প্রায়
দুঃখের ঝাপটায়
মনটা মাটির পানে নোয়ালি,
ও তোমার বেঁটে ছাতাওয়ালি।
এতখনে এলো রোদ
আরাম হতেছে বোধ,
আকাশে সোনার কাঠি ছোঁয়ালি॥

দেশ]

জননী জন্মভূমি

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

(নাটক)

ইঙ্গিত

মারাথন যুদ্ধ—এথিনীয়ান সৈন্যেরা মিলতিয়াদিসের নেতৃত্বে পারস্যাধিপতি দারয়বৌসের বিশাল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া গ্রীস হইতে তাড়াইয়া দেয়। স্পার্টান সৈন্যেরা এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই।

থার্ম্মপলি—এই গিরিবর্ত্মে স্পার্টান সৈন্যরা অন্যান্য গ্রীক সৈন্যদের সাহায্যে পারস্যরাজ ক্ষয়ার্শের বিশালবাহিনীকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এক গ্রীক বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে একদল পারসিক সৈন্য অন্য রাস্তা ঘুরিয়া গ্রীক সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করে। তখন স্পার্টান রাজা ও প্রধান সেনাপতি লিওনিদাস অন্যান্য সৈন্যকে সেস্থান হইতে অপসারিত করিয়া তিনশত স্পার্টান সৈন্য লইয়া পারসিকদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সদলে নিহত হ'ন।

সালামিসের জলযুদ্ধ—এই জল যুদ্ধে গ্রীক নৌবাহিনী (প্রধাণতঃ এথিনীয়ান) পারসিক নৌ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধ শেষে অবশিষ্ট পারসিক বাহিনী পলাইয়া যায়।

গ্রীসদেশ এই সময়ে অনেকগুলি নগর রাষ্ট্রে (এক একটী নগর ও আশে পাশের কিছু জমি লইয়া এক একটী রাষ্ট্র হইত) বিভক্ত ছিল। এই সব নগর রাষ্ট্র স্বাধীন ছিল। ইহাদের মধ্যে এথেন্স. স্পার্টা, করিন্থথিবস প্রথান্য ছিল। স্পার্টানরা খুব শক্তিশালী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে অন্যান্য গ্রীকেরা নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এথিনীয়ানরা সভ্যত ও ব্যবসাবাণিজ্যে অনেক উন্নত ছিল বলিয়া স্পার্টানদের প্রাধান্য তাহাদের ভাল লাগিত না। কাজেই এই দুই রাজ্যের মধ্যে খুব রেষারেষি ছিল। অন্যান্য গ্রীক রাজ্যের মধ্যেও খুব রেষারেষি ছিল। তবে পারস্যরাজ ক্ষয়ার্শের বিপুল বাহিনী গ্রীস আক্রমণ করিলে এথেন্স ও দক্ষিণ গ্রীসের রাজ্যগুলি সাময়িকভাবে মিলিত হইয়া স্পার্টান সেনাপতি পসানিয়াসের নেতৃত্বে প্লেটিয়ার রণক্ষেত্রে বাধা দেয়।

প রি চ য়

পসানিয়াস—স্পার্টার রাজপুত্র ও বালকরাজার অভিভাবক এবং প্রতিনিধি
প্লেটিয়ার যুদ্ধে গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি

আমোমফারেতাস—স্পার্টান সৈন্যাধ্যক্ষ

ক্লিওমবোট্রাস— ঐ

ব্রাসিদাস— ঐ

অ্যারিষ্টাইদিস—এথিনীয়ান সেনাপতি; ন্যায়পরায়ণতার জন্য খ্যাত

ক্ষয়ার্শ--পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি

কুবাদ— ঐ পারিষদ

বাজাজ— ঐ সেনাপতি

তিষ্যফার্ণিস—ঐ সেনাপতি

ক্লিওমিনিস—পসানিয়াসের বন্ধু

ইফোর—পাঁচ জন স্পার্টার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা—রাজার উপরেও তাহারা কর্ত্তৃত্ব করিত

পসানিয়াসের মাতা

পসানিয়াসের ভৃত্য

এথিনীয়ান নাগরিকগণ, স্পার্টান নাগরিকগণ, গ্রীক নাবিকগণ, দূত, দৌবারিক, ওস্তাদ, থিবান বন্দীগণ, পারসিক বন্দীগণ, পারস্যরাজের উজীর।

প্রথম অঙ্ক

প্রথন দৃশ্য—প্লেটিয়ার রণক্ষেত্র

পসানিয়াস্ ও গ্রীকসৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ

পসানিয়াস্—বন্ধুগণ, আজ আমাদের এক কঠিন পরীক্ষার দিন। পারস্যরাজ্যের বিপুল বাহিনী মার্দ্দনিয়াসের নেতৃত্বে আমাদের জন্মভূমিকে পদানত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে—আজ স্থির হয়ে যাবে যে গ্রীক জাতি স্বাধীন মানুষের মত সগৌরবে মাথা উঁচু ক'রে বেঁচে থাকবে—না স্বাধীনতা হারিয়ে ঘৃণ্য ক্রীতদাসের জীবন যাপন কর্ব্বে! স্থির হয়ে যাবে যে গ্রীক শৌর্য্য বর্ব্বর পারসিকের আসুরিক শক্তির কাছে হার মানবে কিনা! আমাদের এই দেশ বীর প্রসবিনী—একিলিস্, প্যাট্রক্লাসের মাতৃভূমি, লাইকারগাস্ কোড্রাসের লীলাভূমি—মিলতিয়াদিস্ লিওনিদাসের জননী। এর প্রতি বালুকণাতে—প্রতি শিলাখণ্ডে—বীরের শোণিত—দেশপ্রেমিকের অস্থি মিশে রয়েছে। এই স্বর্গীয় দেশ কি আজ বর্ব্বরের কাছে মাথা নোয়াবে?

সৈন্যগণ (সমস্বরে)—কখনই না।

পসানিয়াস্—শোন, সৈন্যগণ। আমি জানতে চাই তোমাদের মধ্যে এমন কোন কাপুরুষ আছে কি যে দেশের জন্য—জাতির সম্মানের জন্য—স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে ভয় পায়? এমন কেউ আছে কি যে প্রাণ ভয়ে শত্রুর হাতে দেশকে সঁপে দিতে প্রস্তুত আছে? বল—বল—কে এমন দেশদ্রোহী যে জন্মভূমিকে শত্রুর পদানত দেখতে রাজী আছ?

[কিছুক্ষণ থামিয়া]

বেশ—দেখে সুখী হলাম তোমরা সবাই দেশের জন্য মরতে প্রস্তুত আছ। এই ত বীরের মত কাজ। মনে থাকে যেন তোমরা গ্রীক—গ্রীক কখন মরতে ভয় পায় না—তার কাছে মাতৃভূমির সম্মান—স্বাধীনতার মূল্য নিজের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশী। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন—সে ত তাঁর পরম সৌভাগ্য—চরম গৌরব! কি সাধ্য আছে বর্ব্বর পারসিকের যে সে গ্রীকদের জন্মভূমিকে শৃঙ্খলিত কর্ব্বে?

অ্যারিষ্টাইদিস্—মারাথন, সালামিসের কথা কি সে এরই মধ্যে ভুলে গেছে? মিলতিয়াদিসের জাতিকে কি সে আজও চিনতে পারে নি? এথিনীয়ানদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাকতে সে এই দেশকে পরাধীন কর্ত্তে পার্ব্বে না।

আমোম্ফারেতাস্—কখনই না—লিওনিদাসের জন্মভূমিকে পদানত ক'রে কার সাধ্য? স্পার্টান কখনও যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে যায় না। সিংহশিশু আমরা—শৃগালের বৃত্তি আমাদের জন্য নয়। আমাদের মৃত দেহ অতিক্রম না করে পারসিকেরা একপদও অগ্রসর হতে পার্ব্বে না। প্রয়োজন হয় আবার থার্ম্মপলির অভিনয় হবে।

পসানিয়াস্—চমৎকার! এই ত গ্রীকের মত কথা। মনে থাকে যেন সমস্ত জগত

স্তব্ধ বিস্ময়ে আজ তোমাদের কীর্ত্তিকলাপ লক্ষ্য কর্চ্ছে। দেশ জননী কাতর নয়নে তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। আজ—আজ প্লেটিয়ার এই রণপ্রাঙ্গণে গ্রীসের ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যাবে। জাতির এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তোমাদের আজ জিউসের নামে শপথ গ্রহণ কর্ত্তে হবে, যে প্রাণ দিয়েও তোমরা দেশের স্বাধীনতা ও জাতির মর্য্যাদা রক্ষা কর্বে। ইতিহাসে যেন তোমাদের জয়গাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকেভ—বিষ্যৎ বংশধরেরা যেন তোমাদের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে। আর মনে থাকে যেন দেশদ্রোহীর স্থান গ্রীসে কোনদিনই হবে না। বল একবার—জন্মভূমির জয়!

সকলে (সমস্বরে)—জন্মভূমির জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সালামিসের রাজপথ

[এথিনীয়ান্ বৃদ্ধ নাগরিকেরা যাতায়াত করিতেছে]

১ম নাগরিক—বলি ভাই শুনছ? যুদ্ধের খবর কি কিছু জান?

২য় নাগরিক—বেশ লোক ত তুমি! তুমিও যেখানে আমিও সেখানে—আমি কি করে যুদ্ধের খবর জানব? আমার কাণে ত আর হার্মিস দেব এসে যুদ্ধের খবর বলে যান নি। অথবা আমার পায়ে ত এক জোড়া পাঁখাও নেই যে যুদ্ধক্ষেত্রে উড়ে গিয়ে তোমার জন্য টাট্‌কা খবর নিয়ে আসব!

১ম নাগরিক—আরে—আরে চট কেন? আমি কি তাই বলেছি নাকি? আমি জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম প্লেটিয়ার কোন খবর এল কিনা।

২য় নাগরিক—এলে ত আর সে কথা চাপা থাকত না। তুমিও শুনতে পেতে!

১ম নাগরিক—তা বটে—তা বটে। তবে জান কি এই যুদ্ধের খবরের জন্য প্রাণটা বড়ই উচাটন হয়েছে। কে জানে আমাদের ভাগ্যে কি আছে?

২য় নাগরিক—তা ঠিক—মনটা ভাই আমারও বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। কে জানে শেষ রক্ষা হবে কিনা? এ সময় যদি মিলতিয়াদিস্ থাকত তবে কিছু ভাবনা ছিল না। পসানিয়াস্ কি কর্বে বলা যায় না। স্পার্টান ব্যাটারা কি যুদ্ধ কর্ত্তে জানে কোন কালে? পারে শুধু গোঁয়ারের মত মরতে। এই দেখনা সেদিন লিওনিদাসের কাণ্ডটা একবার! থার্ম্মপলিতে নিজেও মরলি—আর সব স্পার্টানদেরও মারলি! কি লাভ হল তাতে? পারলি কি শত্রুর পথ রোধ কর্ত্তে? একেই বলে গোঁয়ার গোবিন্দ। হুঁ—যুদ্ধ করি বটে আমরা। মারাথনের যুদ্ধে পারসিকদের কি ঠ্যাঙ্গানই না ঠেঙ্গিয়েছিলাম! বাছাধনেরা আজও সেই মারের কথা ভুলতে পারে নাই। আর সেনাপতি যদি বলতে হয় সে মিলতিয়াদিস্! হবে না? একি আর স্পার্টান পেয়েছ? তাই বলছিলাম—পসানিয়াস না হয়ে যদি কোন এথিনীয়ান প্রধান সেনাপতি হত তবে আর ভাবনা ছিল না। অন্ততঃপক্ষে থেমিষ্টক্লিসও যদি সঙ্গে থাকত!

১ম নাগরিক—তবে ভরসা এই যে আমাদের অ্যারিষ্টাইদিস্ ও একজন সেনাপতি। আর আট হাজার এথিনীয়ান সৈন্যও যুদ্ধে গেছে।

[৩য় নাগরিকের প্রবেশ]

৩য় নাগরিক—কে ক্লিয়ন না? কিসের আলাপ হ'চ্ছে তোমাদের? হ্যাঁ ভাই, যুদ্ধেব খবর কিছু শুনেছ?

১ম নাগরিক—আ ম'লো! আমরাও ত তাই জিজ্ঞেস কর্চ্ছি। তুমি কি কিছু খবর পেলে?

৩য় নাগরিক—তাহ'লে আর তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন? তোমরাও যে তিমিরে আমিও সেই তিমিরে। আচ্ছা ভাই তোমাদের কি মনে হয় আমরা হারব?

২য় নাগরিক—না—তা—তবে কিনা এই পসানিয়াস্ ব্যাটা প্রধান সেনাপতি—কাজেই কি হবে কিছু বলা যায় না।

৩য় নাগরিক—তা ভাই যা ব'লেছ! পসানিয়াসকে প্রধান সেনাপতি করা বড় ভুল হ'য়ে গেছে। হ'লই বা সে স্পার্টান। তা ব'লে কি আর আমাদের মধ্যে প্রধান সেনাপতি হবার মত কেউ ছিল না? এই ধরনা কেন অ্যারিষ্টাইদিস।

১ম নাগরিক—আমরাও ত তাই ব'ল্‌ছিলাম। কেন বাপু স্পার্টানদের মধ্যে থেকে প্রধান সেনাপতি ক'র্ত্তে হবে এ কোন শাস্ত্রে লেখা? আমরা সবাই লড়ব, মাঝে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে বাহবা নেবেন ওরা! এ কোন দেশী বিচার বাপু! ব্যাটাদের কেরামতি ত ঢের জানা আছে। যত সব কাপুরুষ! বার বার নানা অজুহাতে যুদ্ধ এড়িয়ে এসেছে। নিতান্ত দায় পড়ে না এবার কিছু সৈন্য নিয়ে এসেছে—এইত মুরদ! তাইতেই আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। যত সব—

৩য় নাগরিক—তা যা ব'লেছ। সেই সেবার মারাথনের যুদ্ধে আমরাইত দারিয়ুসের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে একেবারে পগার পার করে দিয়েছিলাম। কোথায় ছিল তখন স্পার্টানরা? তারাত পূর্ণিমার দোহাই দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। আরে ছিঃ ছিঃ!

২য় নাগরিক—ভীরু, কাপুরুষ! আজ এসেছে সর্দ্দারি ফলাতে! কি ব'লব আর—বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি—আজ আর এ বাহুতে বল নেই—না হ'লে এবারও পারসিকদের ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতাম লড়াই ক'রতে এসেছেন কাদের সাথে। আচ্ছা ভাই, ধরত আমার এই দুটো আঙ্গুলের মধ্যে একটা। [ডান হাতের দুটী আঙ্গুল অগ্রসর করিয়া দিল]

৩য় নাগরিক—এই—এটী ধ'রলাম [একটী আঙ্গুল ধরিল]

২য় নাগরিক—না,—হার হ'ল। আচ্ছা আবার ধরত।

[৩য় নাগরিক আবার ধরিল]

২য় নাগরিক—হায়! হায়! এবারও যে হার হ'ল। দোহাই বাবা জিউস, এই-বারটী জিতিয়ে দাও বাবা—জোড়া ছাগল দেব। অ্যাঁ ওকি!

[ভেরী নিনাদ ও একজন গ্রীক হেরাল্ডের দ্রুত প্রবেশ]

আগন্তুক—শোন এথিনীয়ান নরনারী আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন। উৎসব কর, স্ফূর্ত্তি কর। প্লেটিয়ার যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি পারসিকেরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গ্রীস ছেড়ে পলায়ন করেছে। উঃ কী ভীষণ লড়াই! হাঁ বীর বটে!

১ম নাগরিক—(উল্লাসিত হইয়া) হবে না! এ বাপু এথিনীয়ান সৈন্য। তারা জিতবে না ত কে জিতবে? আমিত আগেই ব'লেছিলাম—কেমন না হে?

আগন্তুক—না না এ জয়ের গৌরব স্পার্টানদের আর প্রধান সেনাপতি পসানিয়াসের—ধন্য শিক্ষা ধন্য সাহস!

২য় নাগরিক—না হে না, তুমি ভুল কচ্ছ, আমাদের সৈন্যদের জন্যই যুদ্ধে জয় হ'য়েছে। স্পার্টানরা কি কোন কালে লড়তে জানে?

আগন্তুক—বাঃ, আমি আস্‌ছি সোজা লড়াই থেকে আমি জানি না আর তোমরা এখানে থেকে সবই জেনে বসে আছ!

৩য় নাগরিক—তা বাপু তুমি যাই বলনা কেন এথিনীয়ানরা স্পার্টানদের চাইতে অনেক বেশী বীর। এখনও সাত জন্ম এসে তারা আনাদের কাছে যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে পারে। কেমন হে?

২য় নাগরিক—আলবাৎ। সে কথা কে না জানে?

১ম নাগরিক—আলবাৎ! এ কথা যে না স্বীকার কর্ব্বে সে ঘোর মিথ্যাবাদী।

তৃতীয় দৃশ্য

থিবসের দুর্গ।

[পসানিয়াস, কয়েকজন বন্দী থিবস-নেতা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ।]

প্রাণের
পসানিয়াস্—(ক্রুদ্ধভাবে)—ধিক্! ধিক্ তোমাদের বিশ্বাসঘাতক! না
তোমাদের এত মায়া! মরতে তোমাদের এত ভয়! তোমরা না গ্রীক্—হেলেনের রক্ত তোমরা
তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে—তোমরা না একিলিশের বংশধর? কোন মুখে বাজল
নিজের মাতৃভূমিকে স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে তুলে দিলে? প্রাণে কি তোমাদের একটুও হারিয়ে
না? হাত কি তোমাদের একটুও কাঁপল না? জীবনের এত মায়া! স্বাধীনতা জাতির
ক্রীতদাসের মত বেঁচে না থাকলে কি চলেই না! দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, ছিঃ ছিঃ,
মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপে বেঁচে থাকবার চাইতে কি মৃত্যু সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয় নয়?
কোন লজ্জায় তোমরা নিজেদের গ্রীক বলে পরিচয় দাও? নরাধম, দেশদ্রোহী! আমরা
জনৈক বন্দী—অযথা আমাদের দোষ দিচ্ছেন সেনাপতি। নিরুপায় হয়েই পারসিকদের
শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কোন সাহসে আমরা

বিপুলবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াব? স্রোতমুখে তৃণ খণ্ডের মত ত তারা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত! তাদের বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এ অবস্থায় আর আমাদের কোন পথ ছিল?

পসানিয়াস—আর কোন পথ ছিল? জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছে না? আর কিছু না পার, মর্ত্তে পাল্লে না? লিওনিদাস ও স্পার্টানরা কি থার্ম্মাপলিতে তোমাদের পথ দেখিয়ে যাননি? অম্লানবদনে বলছ কি করতে পারি আমরা!

বন্দী—মিছামিছি শক্তি ক্ষয় করে লাভ কি? পারসিকদের তাতে কি কোন ক্ষতি হত? অযথা নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নয়।

পসানিয়াস্—পাপিষ্ঠ, দেশদ্রোহী—একথা বলবার পুর্ব্বে তোর জিভ খসে পড়ল না! দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ বাতুলতা? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কেন তোমাদের বাপ মা নুন খাইয়ে তোমাদের মেরে ফেলে নি?

বন্দী—ক্রুদ্ধ হবেন না সেনাপতি। আপনি ভুল কচ্ছেন। দেশের মঙ্গলের জন্যই আমরা পারসিকদের সাথে যোগ দিয়েছি। না হলে যে তারা আমাদের সোণার থিবস্‌কে ভূমিসাৎ করে দিত—স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিচারে সবাইকে হত্যা কর্ত্ত।

পসানিয়াস্—তাহ'লে ত তারা জগতের একটা মহা উপকার কর্ত্ত। তোমাদের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নাই। না না তোমাদের মর্ত্তেই হবে। সমস্ত দুনিয়া বিস্ময়ে আতঙ্কে দেখবে দেশদ্রোহিতার শাস্তি কি—ভবিষ্যতে যেন আর কেউ কোনদিন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর্ত্তে সাহস না পায়!

বন্দী—আমাদের ক্ষমা করুন সেনাপতি।

পসানিয়াস্—ক্ষমা! তোমাদের ক্ষমা কর্ব্ব? না সে হতে পারে না। তোমরা বেঁচে থাকলে পৃথিবীর ঘোর অমঙ্গল হবে। দেশদ্রোহীকে পসানিয়াস কোনদিনই ক্ষমা করতে পার্ব্বে না। তার হৃদয়ে দয়া মায়া স্নেহ মমতার কোন স্থান নাই। সে জানে শুধু কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যের জন্য প্রয়োজন হলে সে নিজ পুত্রকেই হত্যা করতে পারে। না-না মৃত্যুই তোমাদের একমাত্র দণ্ড। ক্লিওম্‌ব্রোট্রাস বন্দীদের এখান থেকে নিয়ে যাও।

[বন্দীদের লইয়া ক্লিওম্‌ব্রোট্রাসের প্রস্থান

[কিছুক্ষণ পাদচারণা করিবার পর]

হাঁ, ব্রাসিদাস, বন্দী পারসিকদের নিয়ে এস।

[ব্রাসিদাসের প্রস্থান]

[স্বগত]—এইবার প্রতিশোধ নিতে হবে। দুর্ব্বৃত্ত বর্ব্বরদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যা তাদের চিরদিন মনে থাকে। বার বার তারা আমার দেশকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত কচ্ছে—এর প্রতিফল তাদের পেতেই হবে। বন্দীদের এমন নিষ্ঠুর শাস্তি দেব যা সবার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি কর্ব্বে।

[ব্রাসিদাসের পারসিক বন্দীদের লইয়া প্রবেশ]

—এই যে—এসেছে ব্যাটারা—উত্তম—কেও ? পারসিক সেনাপতি তিষ্যফার্ণিস না ? বন্দেগী, কি খবর জনাব ? মেজাজ শরিফ ত ? ওরে কে আছিস, হুঁজুরকে একটা কুর্শী এনে দে।

তিষ্যফার্ণিস্—গ্রীক সেনাপতি, আমরা আপনার বন্দী—নিতান্ত নিরুপায়। আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা আজ আপনি। যে শাস্তি ইচ্ছা আজ আমাদের আপনি দিতে পারেন। তা বলে পরাজিত নিরস্ত্র বন্দীকে ব্যঙ্গ করা আপনার মত বীরের সাজে না!

পসানিয়াস্—না, ব্যঙ্গ কর্ব্ব কেন! প্রভুদের নিয়ে মাথায় তুলে নাচতে হবে! ওরে, সাহেবকে এক পেয়ালা মিঠা সরাব এনে দেত!

তিষ্যফার্ণিস—বেশ। হাতের মুঠোয় যখন পেয়েছেন তখন সব অপমানই সইতে হবে।

পসানিয়াস—হাঃ হাঃ হাঃ...অপমান! এতেই ঘাবড়ে গেলে পারস্য সেনাপতি। এই শশকের প্রাণ নিয়ে এসেছ গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে!

তিষ্যফার্ণিস—ভুল কচ্ছে'ন সেনাপতি। মর্ত্তে আমরা ভয় পাই না। মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হয়েই যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছি। তবে বীর গ্রীক সেনাপতির কাছে লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

পসানিয়াস—বেশ, তবে তাই হোক। তোমাদের সবার প্রতি আমি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।

[ব্রাসিদাসের প্রতি] ব্রাসিদাস, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিয়ে এদের বধ কর্ব্বে। এদের পরিণাম দেখে যেন আর কেউ কখনও গ্রীস আক্রমণ কর্ত্তে সাহস না পায়।

তিষ্যফার্ণিস—আপনার শাস্তি মাথা পেতে নিলাম সেনাপতি। তবে মর্ব্বার আগে আপনার কাছে আমার একটী নিবেদন আছে। সে কথাটী আপনাকে আমি নিভৃতে বলতে চাই—শুধু এই ভিক্ষা দিন।

পসানিয়াস—নিভৃতে কেন? সবার সামনেই বলতে বাধা কি?

তিষ্যফার্ণিস্—(ঈষৎ হাসিয়া) ভয় নাই গ্রীক সেনাপতি! আমি নিরস্ত্র, শৃঙ্খলিত আমি আপনার কোন অনিষ্ট কর্ব্ব না। আর আপনার দেহরক্ষীরা শিবিরের বাইরে অপেক্ষা কর্ত্তে পারে।

পসানিয়াস্—উত্তম। তোমরা তবে একবার বাইরে যাও ত সব।

[পসানিয়াস ও তিষ্যফার্ণিস ব্যতীত সবার প্রস্থান]

পসানিয়াস—হাঁ—এইবার কি বলবে বল। বেশী সময় আমি তোমাকে দিতে পারব না।

তিষ্যফার্ণিস—আমায় বিদ্রূপ কর্চ্ছিলেন সেনাপতি, আমি আপনার কাছে পরাজিত হয়ে

বন্দী হয়েছি বলে? কিন্তু তাতে আমার কোন লজ্জা কোন অপমান নেই। প্লেটিয়ার যুদ্ধে আপনি যে রণনৈপুণ্য—যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তাতে সমস্ত জগত বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় আপনার কাছে মাথা নত করেছে। আপনার মত অদ্বিতীয় যোদ্ধা ও বীর আজ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে জন্মায় নাই—কোনকালে জন্মাবে না। আমি আজ গর্ব্ব বোধ কচ্ছি এই ভেবে যে, আপনার মত সেনাপতির বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ কর্ব্বার সৌভাগ্য হয়েছিল। আপনার কাছে হেরে গিয়ে আমার গৌরব একটুমাত্র কমে নাই—বরং শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দুঃখ এই যে যার জন্ম হয়েছিল একটা বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হবার জন্য তিনি কিনা স্পার্টার মত একটা ক্ষুদ্র সহরের রাজপ্রতিনিধি। নিয়তির একী পরিহাস!

পসানিয়াস—সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু কি কর্ব্ব সবই অদৃষ্ট!

তিষ্যফার্ণিস—অদৃষ্ট! অবাক কল্লে'ন যে মহারাজ! না না আমি আপনাকে মহারাজ বলেই ডাক্‌ব। আপনি মহারাজ হবার জন্যই জন্মেছেন।

পসানিয়াস—(বিস্মিত হইয়া)—সে কী প্রকারে সম্ভব হবে?

তিষ্যফার্ণিস—(বিস্মিত হইয়া) কী উপায়ে সম্ভব হবে? আপনিও একথা জিজ্ঞাসা কচ্ছে'ন! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্ব্বেন মহারাজ—আপনি বীরশ্রেষ্ঠ—পুরুষসিংহ—পুরুষাকার আপনার করায়ত্ত—আপনি ইচ্ছা কল্লে'ই সমগ্র গ্রীসের অধীশ্বর হতে পারেন।

পসানিয়াস—(চমকিত হইয়া)—সমগ্র গ্রীসের অধীশ্বর? না-না, সে অসম্ভব! আমাকে সবাই মানবে কেন?

তিষ্যফার্ণিস—মানবে কেন? 'নিজের বাহুবলে আপনি সবাইকে আপনার আধিপত্য স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য কর্ব্বেন। হাঁ, তবে আপনার সৈন্য ও অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। তা সে হয়ে যাবে। সৈন্যের ও অর্থের অভাব আপনার কোনদিন হবে না।

পসানিয়াস—তোমার কথা কেমন হেঁয়ালীর মত ঠেকছে তিষ্যফার্ণিস! আমি,ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

তিষ্যফার্ণিস—এ ত খুব সোজা কথা—আপনি যদি গ্রীসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে পারস্যরাজ সানন্দে আপনাকে অর্থ ও সৈন্য সাহায্য কর্ব্বেন।

পসানিয়াস—পারস্যরাজের সাহায্য আমি নেব! আর তাঁরই বা এতে লাভ কি?

তিষ্যফার্ণিস—না, তাঁর এমন কিছু বিশেষ লাভ নাই। তবে তিনি আপনার অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য দেখে মুগ্ধ। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন কর্ত্তে পাল্লে' তিনি নিজেকে ধন্য মনে কর্ব্বেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা আপনার হাতে তাঁর প্রিয়তমা দুহিতাকে অর্পণ করেন। কিন্তু পারস্যরাজকন্যার পরিণয় রাজার সঙ্গেই হতে পারে। তাই আপনি যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন তবে তিনি আপনাকে গ্রীসের সিংহাসন লাভ করতে সাহায্য কর্ত্তে রাজী আছেন।

পসানিয়াস—(ক্রুদ্ধ হইয়া)—ও বুঝেছি—চক্রান্ত—আমায় প্রলোভন দেখাচ্ছ শয়তান? কখনই না—আমি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর্ত্তে পার্ব্ব না—শত সিংহাসনের লোভেও না। পারস্যরাজের জানা উচিত ছিল—পসানিয়াস স্পার্টান—দেশদ্রোহী নয়! মাতৃভূমিকে আমি প্রাণ গেলেও তাঁর হাতে সঁপে দেব না। সাবধান নরাধম কুক্কুর!

তিষ্যফার্ণস—রাগ কর্ব্বেন না সেনাপতি। আপনি ভুল কর্চ্ছেন। পারস্যরাজ অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর—গ্রীসের মত ক্ষুদ্র অনুর্ব্বর দেশ অধিকার কর্ব্বার তার কোন প্রয়োজন নাই। তবে মহানুভব তিনি। তিনি শুনেছেন নগরে নগরে হিংসা ও রেষারেষি ও আভ্যন্তরীন দলাদলির জন্য প্রতিবেশী গ্রীসদেশ জাহান্নামে যেতে বসেছে। এতে তাঁর কোমল হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই তিনি ঠিক করেছেন সমস্ত দেশটাকে তাঁর সুশাসনের তলে আনবেন—যাতে এর সর্ব্বত্র অবাধ শান্তি বিরাজ করে ও নরনারী নিঃশঙ্কচিত্তে দিনযাপন কর্ত্তে পারে। ভাবুন ত দেখি একবার গ্রীসের সে কী সৌভাগ্য! এথেন্স আর স্পার্টাকে হিংসা কর্ব্বে না—মেগারা আর করিন্থে বিবাদ হবে না—থিবস্ ক্ষুদ্র প্লেটিয়ার ঘাড় আক্রমণ কর্ব্বে না—ছোটলোকেরা আর অভিজাতদের অধিকার খর্ব্ব করবে না। আহা—সে সুদিন কবে আসবে, যেদিন পারস্যের সভ্যতা এসে গ্রীসকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যাবে—পারস্যের বণিকেরা এসে গ্রীসের ধনদৌলত শতগুণে বাড়িয়ে তুলবে। ঈশ্বর—দয়াময়—আহুরমাজদা এদের প্রতি দয়া কর প্রভু। (হাত জোড় করিয়া)

পসানিয়াস—তবু—তবু জন্মভূমিকে আমার শত্রুর পদানত কর্ত্তে পার্ব্ব না।

তিষ্যফার্ণস—তার আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আমার প্রস্তাব মত পারস্যরাজের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে রাজী হন তবে ত গ্রীসের অধীশ্বর আপনিই হবেন। দেশ ত আপনার পরাধীন হবে না। আপনি শুধু আমাদের সাহায্যে আপনার দেশেরও জাতির অশেষ উপকার সাধন করে চিরস্মরণীয় থাকবেন।

পসানিয়াস—না—সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাবিয়ে তুল্লে যে। ভেবে দেখি।

ক্রমশঃ

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতন]

—❋❋—

ঠিক জানো তো?—বড় কি কি—

নাটক

অভিনীত সব চাইতে বেশীবার হয়েছে

কো অপটিমিস্ট্	২,৩২৫
চু চিন চো	২,২৩৮
মি অ্যাণ্ড মাই গার্ল	১,৬২৮
চার্লিস আণ্ট	১,৪৬৬
বেগারস্ অপেরা	১,৪৬৩
আওয়ার বয়েজ	১,৩৬২

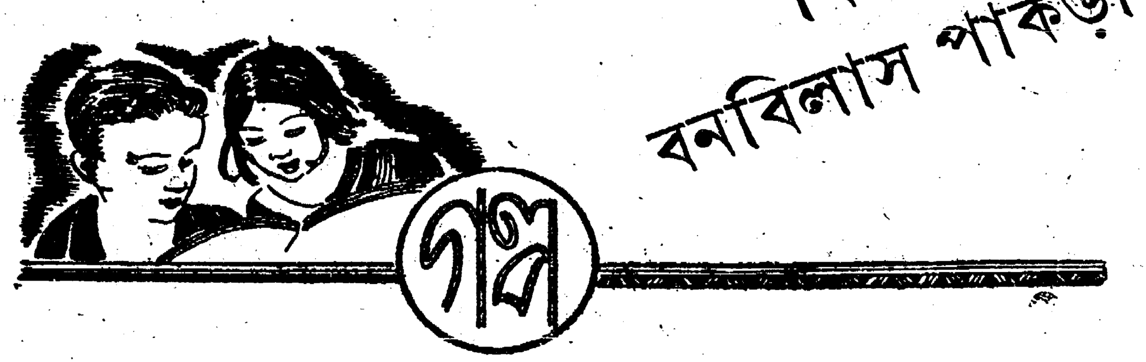

বিজন ও বনবিলাস পাকড়াশী

শ্রীশামুক

গ্যালারীতে বসে বিজন চীনাবাদাম খাচ্ছে। পকেট থেকে বার করে এক একটি ছাড়িয়ে মুখে পুরছে আর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তাকাচ্ছে। মানুষের মাথার কালো সারির ঠাস্ বুনন্, দূর থেকে বেশ দেখায় কিন্তু। খেলা আরম্ভ হতে দেরী আছে। হরেক বেরকমের কথাবার্ত্তা ও কোলাহল কানে এসে পৌঁছায়, ফুটবল খেলার মাঠে যেমন হয়।

পাশের লোকটির উপর নজর পড়ে। ঝাঁকড়া চুল—প্রকাণ্ড রুক্ষ মাথা—দাড়ি কামায়নি দিন চারেক—আধময়লা খদ্দরের কাপড় পাঞ্জাবী—কাঁধের কাছে ছেঁড়া, সেলাই করা। কপালে ভ্রূ দুইটির মাঝখানে কালো টিপ্ পরেছে নাকি? না, না, তিল—বাবা কত বড় তিল ঠিক মাঝখানে! লোকটি প্রবল মনোযোগের সঙ্গে ম্যাগনোলীয়া চুসছে ও মাঝে মাঝে হাতে উল্টে পাল্টে ঘুরিয়ে দেখছে কতটা বাকী। চার পাশের লোকজন বা কোলাহল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। খেলা দেখতে এসেছে না শুধু ম্যাগনোলীয়া খেয়ে উঠে চলে যাবে আন্দাজ করা মুস্কিল! কি রকম যেন একটা উদাস, পাগল পাগল ভাব! বিজন অন্যদিকে চোখ ফিরায়।

কে একজন বিনা টিকিটে তারের বেড়া টপ্‌কে এসেছে। টিপ্ করে নেমেছে ঠিক আরেকজনের মাথার উপর। উত্তর দিকটায় ভীষণ হৈ চৈ। বিজন ঘাড় বাঁকিয়ে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করে এবং অনেক কিছু তর্জ্জন গর্জ্জন শুনতে পায়। দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে বিজন ডান হাতটিকে পকেটে পাঠায় চীনের-বাদামের সন্ধানে। হাতটি পকেটে পৌঁছে মাথা ঠুকে থমকে দাঁড়ায়। পকেট দখল করে অন্য একখানি হাত! 'জাপান' নাকি 'যা-পান' লোভে লোভে এসেছেন, এই সুবর্ণ সুযোগে? চমকে ফিরে তাকায় বিজন—

চোখ দুটো জ্বলে উঠে...নিভে যায়...রাগে ও ভয়ে। দেখে তার নিজের পকেট থেকে সাবধানে চীনাবাদাম-ঠাসা একটি থাবা বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, একটিও পড়ে না যায়। পাশের লোকটির মুখের দিকে তাকাতে একজোড়া কালো মেড়ে ও একত্রিশটি দাঁত দেখিয়ে হাসলো,—নির্লজ্জ দুষ্টামীর হাসি! হ্যাঁ, একত্রিশটি দাঁতই বটে—বাকীটির জায়গা খালি, টু-লেট লাগানো। একটা কুকুর দাঁতই গেছে—ভাগ্যিস্!

অনেক কিছু বলবে ভাবল বিজন, বলতে পারল না, ঘামে জামা ভিজে গেল। চীনাবাদামগুলি পাঞ্জাবীর কোঁচড়ে রেখে থাবা ফিরে এসে বিজনের পিঠে চটাস্ করে তাল-ঠুকে এক রাম চাপড়, পাঁচ আঙ্গুলে ঘাড়টি বাগিয়ে ধরে এক ঝাঁকুনি, তারপর হাতের ঠেলায় দোল-দোল-দোলানি, এপাশ-ওপাশ, সামনে পিছনে। মতলব কি? অনুগ্রহ না নিগ্রহ? এ যে কাবুলি আদর। পকেট সাফ করেও স্বস্তি নেই—গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়? ঘাড়টি যখন মুঠোর ভিতর বিদ্রোহ না করাই মঙ্গল, শেষে বাকী প্রাণটুকুও দম আটকে নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু ব্যাপার কি? জিম্‌ন্যাষ্টিকের তিন নম্বর প্যাঁচ? জলে ডুবে জল খেয়ে ফেললে মানুষকে এরকম করে বটে—কিন্তু শুধু শুধু, খেলার মাঠে, গ্যালারীতে বসে! পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে? ফ্রেঞ্চ লিভ্? তাহলে? না, আর পারা যায় না। চোখে মুখে রক্ত উঠে এসেছে। দোল-দোলানি হঠাৎ থেমে যায়—পিঠে আরেকটি তালঠুকে থাবা স্বস্থানে ফিরে গেল। বিজন ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে সেই এক জোড়া কালো মেড়ে ও একত্রিশটি দাঁত তেমনিই। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। আবার যা খুসী করুক কিন্তু এই অবস্থায় চুপ করে থাকা ভীরুর কাজ। অসম্ভব।

বিজন চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কে আপনি?

—বনবিলাস পাকড়াশী। বন্ধুরা আড়ালে কি বলে জান? বলে, বনবিড়াল পাকড়াল আসি। তার মানে যাকে একবার ধরি তার কাজকর্ম্মের দফা গয়া—সেদিনটি বেবাক মাটী—বুঝলে?—লোকটি তেমনি দাঁত বার করে হাসতে হাসতে গড় গড় করে বলে গেল।

নাম শুনে বিজন চমকে উঠলো তড়াস্ করে। কেউ যদি টুথ্‌ব্রাস গোঁফ নিয়ে প্যারাসুট্ থেকে সুট্ করে সামনে নেমে বলতো—আমি হের হিটলার—বিজন এত বেশী চমকাতো না। বনবিলাস পাকড়াশী; ইনিই সেই—হায় হায় কী সৌভাগ্য আজ! রাগ এক নিমিষে জল হয়ে গেল! শুধু পকেটের বাকী চীনাবাদাম কেন ঐ ফিরিওয়ালার ধামাসুদ্ধ যদি ওঁর কোঁচড়ে ঢেলে দিতে পারে তাহালেও যেন আশ মিটে না। উত্তেজনায় দম আটকে বলে,—আপনি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমিই। তোমাদের জন্য গল্প লিখি, সুড়সুড়ি দেওয়া, কাতুকুতু দেওয়া হাসির গল্প, গল্প ত' নয় যেন চানাচুর ভাজা যত খাও তত মজা! নয় কি? জানো—

আমার 'ভুদেববাবুর ভূগর্ভে গমন' পড়ে একটি মেয়ে সাতদিন হেসেছে একাক্রমে—কিছুতেই থামে না। শেষে ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে থামায়। আর 'বিভীষণ বোসের বলীবর্দ্দ' পড়েছ ত'—একটি ছেলে জোরে হাসতে গিয়ে হাঁ! কাণ্ড দেখ একবার। এই চোয়াল আছে না, এই চোয়ালের খিল আটকে গেল। হাঁ করেই থাকে মুখ বন্ধ হয় না—হাসির এ্যান্‌টি ক্লাইম্যাক্স—তারকেশ্বরে তিনদিন হত্যা দিতে ঠোঁট নড়লো।

বিজন কি একটা বলতে যাচ্ছিল—থামিয়ে বনবিলাস বলে চলে রেডিওর বাংলা খবর বলার মত, একটানা।

—আমার ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসটি পড়ছো ত? 'কানাড়া সুরে কান-নাড়া'? জয়দ্রথ সেন কেমন কীর্ত্তি করছে? যদি শুনতে চাও বাকী অংশ ছাপাবার আগেই বলে দিতে পারি তোমায়। কত ছেলেমেয়ে এসে জিজ্ঞেস করে রোজ—তারপর কি হল? বলুন না পায়ে পড়ি—বলিনি কাউকে। তবে—না না এখন কি করে হয়—এখানে কি বলা যায়, এই এ্যাট্‌মস্‌পেয়ারে! একটা ম্যাগ্‌নোলীয়া খেলুম আবার গলা জ্বালা করছে, কথা কইতে কষ্ট হয়। আরেকদিন দেখা হলে নিশ্চয় বলবো।

বনবিলাস থামে, বোধহয় গলার উপর একটু দয়াপরবশ হয়ে। বিজন ক্ষুণ্ণ হয়, আনন্দ জোয়ারে ভাঁটা লাগে। ক্রমশঃ উপন্যাস আগে থেকে শুনে নেওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। কে না চায়? আজকে বললেই ত হয়। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই শেষে চটাস্ করে এক চাপড় এসে পিঠ বাঁকিয়ে দেবে আর সেই ভীষণ মাথা ঘোরানি দোল দোলানি, এবার হয়তো অল্পে ছাড়বে না। বিজন একটু ভেবে প্রশ্ন করে—আচ্ছা আপনার লেখার কৌশল কি? কি করে এত মজার কথা মাথায় আসে আপনার?

এই নিয়ে সাত লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছ'শ চুয়ান্ন বার এই প্রশ্নটি শুনলাম। আর জবাব দিয়েছি শূন্যবার, তোমাদের একজামিনের রসগোল্লাবার। কাউকে বলিনি। বলতে যাব কেন আমার লেখার কৌশল? শেষে এ, সে, যদু, মধু, ঐ রামধনিয়া গয়লাটা পর্য্যন্ত দুধের বদলে গল্প ফিরি করে বেড়াবে। তবে তোমায় বলতে পারি, কিন্তু দেখো 'রয়টার' হয়ে খবরটি ছড়িয়ে দিও না। খুব সহজ প্রসেস্, কেবল মনটি চাই। চোখ বুজিয়ে মনকে টেনে এই জ্রর মাঝে নিয়ে যাবে। দু'দিন কিচ্ছু না, খালি চুপ করে বসে মনঃসংযোগ। তিনদিনের দিন দেখবে এভাবে কিছুক্ষণ বসবার পর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করবে, একটা টলে টলে পড়া ভাব হবে, পিঠের শিড়দাঁড়ায় কে যেন সুড়সুড়ি দেবে—বাস্ হয়ে গেছে। চোখ খুলে যা মনে আসবে—যা কিছু—আর কিছু না ভেবে হড় হড় করে লিখে যাও, দেখবে চমৎকার হাসির গল্প লিখে ফেলেছ। কি অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি? ওঃ বুঝেছি, তোমাদের বুদ্ধি থাকলেও ভারী বোকা কিন্তু। কপালের উপর আমার তিলভাণ্ডেশ্বরটি দেখে ভাবছো ঐ রকম একটি

তিল বা তাল না হলে মনোনিবেশ হবে না। নারে পাগল না। ঐ তালটি ত আমি নিজে তৈরী করিনি, তালগাছ থেকে টিপ্ করে পড়ে ঢপ্ করে কপালে আটকেও যায় নি, ওটি শ্রীভগবানচন্দ্র দত্ত। যার আছে ভাল, যার নেই তারও মনঃসংযোগ হবে লেখাও হবে। আসল কথা ইচ্ছা থাকা চাই।

হঠাৎ চারিদিকের লোক হাততালি দিয়ে উঠলো। খেলোয়াড়রা মাঠে নেমেছে। বিজন খেলা দেখতে দেখতে ভাবল খেলার শেষে বনবিলাসের সঙ্গ নেবে। জিজ্ঞাসা করবে আরো দু'চারিটি কথা, বাড়ির ঠিকানা নিয়ে নেবে একদিন নিরিবিলি গিয়ে উপন্যাসটি শুনতে হবে। খেলা খুব আপ্ এণ্ড ডাউন চললো, উত্তেজনা ক্রমশঃ সময়ের সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগলো, দর্শকরা চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্গল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউ কারুকে গোল দিতে পারলো না। এক্সট্রা টাইমে একই দশা। এই গোল গোল—হ'ল না হ'ল না। শেষে আধ মিনিট আছে—আধ মিনিটও নয় বোধহয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, একটি গোল হয়ে গেল। বিজনের পিঠে প্রকাণ্ড এক চাপড় ও কানের কাছে মুখ এনে চীৎকার—গো-ও-ও-ল। বনবিলাস ছাড়া আর কে! পাশের লোকটিও রেহাই পেল না; তার পিঠেও এক ভাদ্র মাসের তাল। কিন্তু সে ত বিজন নয় যে গুণমুগ্ধের মত হজম করে নেবে। রেগে বনবিলাসকে মারলো এক ধাক্কা। বনবিলাস খসা তারার মত নিম্নগামী হ'ল। বিজনকেও সঙ্গে নেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিজন পড়ন্ত মানুষের আলিঙ্গনে ধরা দিল না। হুমড়ি খেয়ে গ্যালারী আঁকড়ে ধরে সে যাত্রা রক্ষা পেল। তারপর সে জনসমুদ্রে কোথায় বিজন আর কোথায় বনবিলাস পাকড়াশী! বিজন অনেক খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু টিকিটিও চোখের সামনে মিললো না। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গেল।

দু'দিন পরে। তিনদিনের দিন। সন্ধ্যা হতে কিছু দেরী। আকাশ ও পৃথিবী টক্‌টকে লাল, খুব ফর্সা মানুষ রেগে গেলে যেমন দেখায়। ছাদে পড়বার ঘরে বিজন এসে ঢুকলো শান্তভাবে। পরিষ্কার ধবধবে জামাকাপড়, চুলে চক্‌চকে পালিশ। লেখবার ছোট টেবিল জানলার ধারে রেখে আকাশের দিকে মুখ করে কাগজ কলম নিয়ে বসলো। কাগজের মার্জ্জিনে কালির আঁচড় কাটতে কাটতে এঁকে ফেললো একটি পাখী—কি পাখী চেনা যায় না। কাগজের মাথায় কি একটা লিখতে গিয়ে লিখলো না। বোধ হয় গল্পের নাম—পছন্দ হল না। আবার ভাবতে ভাবতে মার্জ্জিনে হিজিবিজি কাটা চললো। হিজিবিজির ভিতর থেকে প্রকাশ পেল একটি মানুষের মুখ। ছুঁচালো দাড়ি, হাতির শুঁড়ের মত নাক, মাথার চুল ফুলে উঠে লক্ষ ফণা ছড়িয়ে সাপ হয়ে গেছে। ভ্রূ দু'টির মাঝখানে গোল করে কালি বুলাতে লাগলো—টিপ্-না-তিল।

এবারে মনে এসেছে। বিজন কাগজের মাথায় পরিষ্কার ছাড়া ছাড়া অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখলো, গল্পের নাম। পরে কলম কাগজের উপর নামিয়ে রেখে হাতদুটি কোলের উপর জোড়া করে নড়ে চড়ে স্থির হয়ে বসলো এবং চোখ বুজালো। সাড়া নেই শব্দ নেই কোন। ঘড়ি শুধু টিক্ টিক্ করে চলে। বড় কাঁটাটী তিনের ঘর থেকে ছ'এর ঘরে গিয়ে পৌঁছালো। বিজন চোখ খুলে এক লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। চোখ লাল। কলম তুলে নিয়ে ঘস্ ঘস্ করে লিখে গেল খানিকক্ষণ যা মনে এল সব, কিছু বাদ না দিয়ে। আরো লিখতো কিন্তু এয়ার-রেড-সাইরেন হঠাৎ বেজে উঠলো। বাস, কাগজ কলম ফেলে দৌড়ে একেবারে নীচে। একটা দমকা বাতাস এসে লেখা কাগজখানি উড়িয়ে নিয়ে কোথায় চলে গেল। বিজনের সেই প্রথম প্রচেষ্টা হাসির গল্পের টুকরো তোমাদের পড়তে দিলাম। কোথায় হাসতে হবে, কখন হাসতে হবে, ও কেন হাসতে হবে—এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বিজনের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে নিও।—

শশীভূষণের কিষ্কিন্ধ্যা বিজয়

শ্যামবাজারের শশীভূষণ সাইকেল চেপে সাঁ সাঁ করে যাচ্ছে।

—তারপর কি?—

রাস্তার চৌমাথায় এসে বেল বাজালো ক্রীং ক্রীং, হাত দেখালো সোজা যেতে চায়। পুলিশ হাত দেখালো—দাঁড়াও এখন যেতে পাবে না। শশীভূষণ থেমে ব্যালান্স্ করতে লাগলো ব্রেক কসে। পিছনে একটা দোতলা বাস এসে থর থর করে কাঁপছে। হর্ণ বাজালো—একবার, দুবার, তিনবার, চারবার—না, তিনবারই।

—তারপর? আর যে কিছু মনে পড়ছে না। আজ থাক, কাল লিখবো। ওঃ কালকে—কাল স্কুলে বিপিনবাবুর টাস্ক্ করে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যেতেই হবে। তা' না হলে—এ্যাণ্ড আপ অন্ দি বে-বে-বেঞ্চ্—বিপিনবাবু তোৎলা।—

পুলিশ হাত নামিয়েছে। পিছনের বাসটা ঘাড়ে এসে পড়ে, চাপা দেবে নাকি?

—না, এর মধ্যে শশীভূষণের মৃত্যু হলে গল্প শেষ হয়ে যাবে। মরতে দেওয়া হবে না। ওকে কিষ্কিন্ধ্যায়—মানে চিড়িয়াখানায় বানররাজ্যে—নিয়ে গিয়ে গল্প জমাতে হবে তাহালেই সকলে পড়বে আর হাসবে—হো-হো-হো—হি হি হি—হা হা হা। কেষ্ট হাসে হাউমাউখাউ, চোখ দিয়ে জল পড়ে, সামনে যাকে পায় কিলোয় দুমাদুম্! সেদিন যা হেসেছিল কেষ্ট। বিপিনবাবু পড়াচ্ছেন—যখন গিয়াসু-উ-দি-দি-দিন ম-ম-মসনদে উ-উ-প-বি-বিষ্ট—! না, মন উলটো দিকে চলে যাচ্ছে! গল্প লেখা হচ্ছে না। মাথার ভিতর এখনো ঝিমঝিম

করছে! শিরদাঁড়ায় শুধু সুড়সুড়ি কি টন্‌টন্ সুরু হয়েছে। ভাল লাগছে না! মনঃসংযোগ চাই—গল্প লিখতে—হাসির গল্প—তিলভাণ্ডেশ্বর—পাকড়াশী বনবিলাস—বনবিড়াল পাকড়ালো! আসি—পাকড়া—পকৌড়ী ভাঁজা গরমাগরম মশালাদার—কেতনা—দোপয়সা—লেও। না, এবার গল্প লিখি।—

শশীভূষণ সাইকেলে যাচ্ছে সাঁ সাঁ করে। গায়ের পাঞ্জাবী উড়ছে হাওয়ায়। গুণ গুণ করে গান গাইছে—চল্ চল্‌রে নওজুয়ান। ঐ চিড়িয়াখানা দেখা যায়। এবারে পৌঁছাবে। জোরে প্যাডেল চালালো।

—কত ছেলে হাত ছেড়ে সাইকেল চালায়।—

শশীভূষণ হাত ছেড়ে সাইকেলে উড়ে যাচ্ছে, দু' হাত দু'পাশে পাখীর ডানার মত।

—যদি পড়ে যায় লোকেরা হাসবে। কেষ্টর সামনে যদি পড়ে—কেষ্ট হাসবে হাউমাউখাউ! সেদিন সে যা মজা। একজন নতুন ছেলে সবে ভর্ত্তি হয়েছে, নাম ষষ্ঠীচরণ—কেষ্টর পাশে বসে। বিপিনবাবু পড়াচ্ছেন। উ-উ-প-বি-বিষ্ট—বলে থামলেন হঠাৎ। ক্লাস এক্কেবারে চুপ্, বুঝে নিয়েছে। কি রাগী মানুষ রামচিমটি দেন, জুল্‌ফী ধরে হেঁইও। ষষ্ঠিচরণ বাইরের দিকে 'চেয়েছিল। তাইতেই এত গরম।—এ্যাণ্ড আপ্। ষষ্ঠীকে দাঁড়াতে হ'ল। কি পড়ানো হচ্ছিল কথাগুলি অবিকল বলে যেতে হবে, এই নিয়ম। না ঠিক হলে বরাতে বরাদ্দ রামচিমটি এক ডজন, জুল্‌ফীর দফা রফা।

ষষ্ঠী বলে, যখন গিয়াসু-উ-দি-দি-দিন ম-ম-মসনদে উ-উ-প-বি-বিষ্ট—

ক্লাসের মাথায় বজ্রাঘাত! কি দুঃসাহস! এত বড় বুকের পাটা! সিংহের হুঙ্কার বিপিনবাবুর, রাগে মুখ সিঁদুর মাখানো, কথা আরও জড়িয়ে যায়—আ-ম-মাকে ভে-ভে ভেং-চা-চানো—শেষ করতে পারেন না, কপালের শির ফুলে উঠে। ষষ্ঠীর ভয়ে মুখ কালো। থরথর কাঁপে আর বলে, না স্যা-স্যার আমিও আপনার ম-মতই তো-তো-তোৎ-লা—

কেষ্টর হাসি হাউমাউখাউ, ষষ্ঠীচরণের পিঠে কিল চড়—দুমদুমাদুম্!—

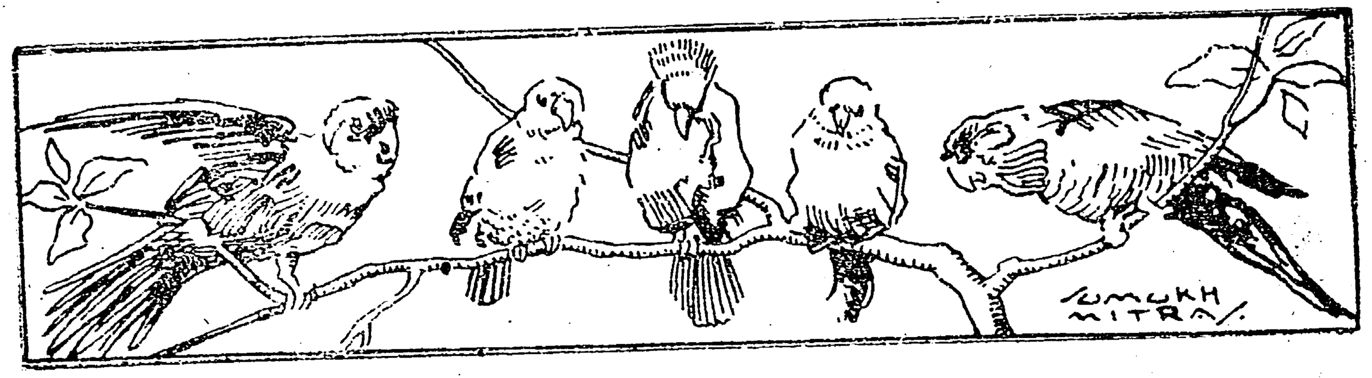

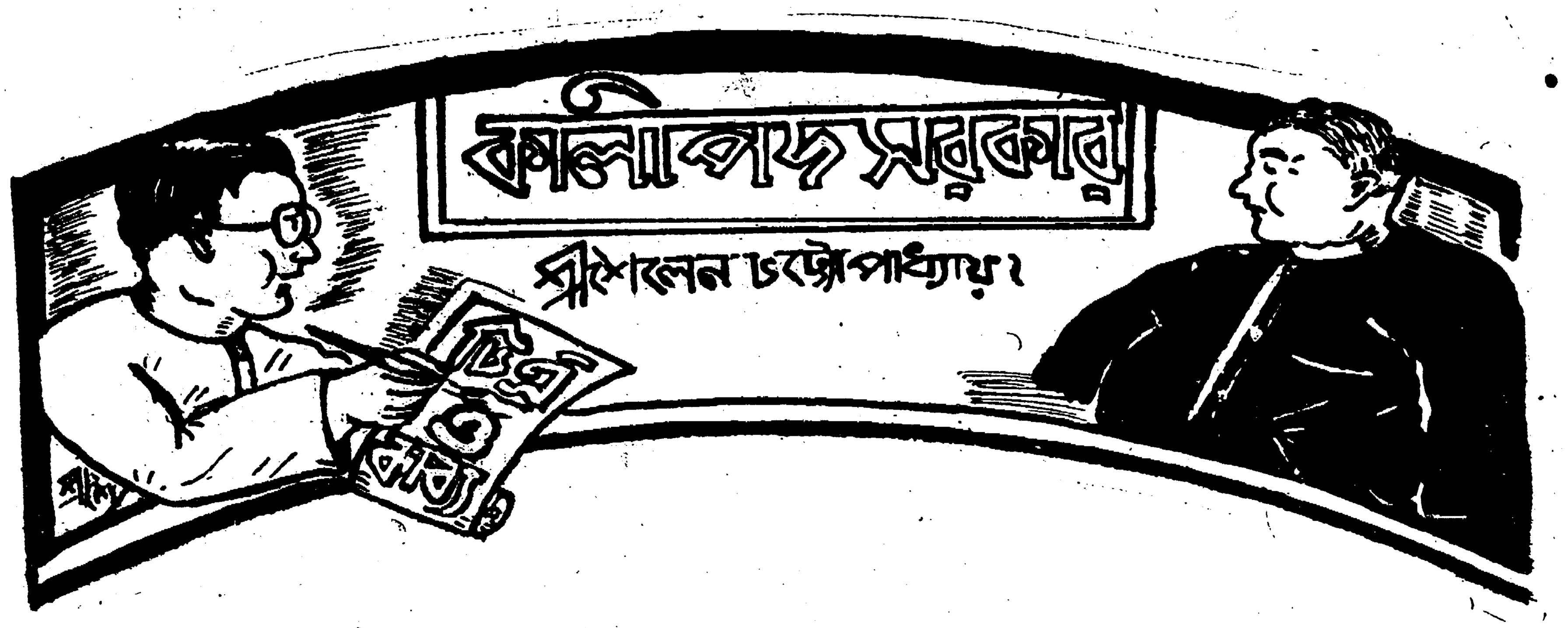

কালীপদ সরকার ভারী নাম ডাক্ তার—
মোটা সোটা গোল গাল চেহারা,
আহারেতে মজবুত্ নহে শুধু ঘৃত দুধ
মেরে দেয় কুড়ি দুই পেয়ারা!

হোটেলেতে গেলে পরে পেট তার নাহি ভরে
শুধু চপ্ কাটলেট্ কারীতে—
খায় সের দুই 'রোষ্ট' খান কুড়ি কড়া টোষ্ট—
ফিরে এসে ভাত খায় বাড়ীতে।

ম্যাচ্ দেখে ফেরে সিধে চার গুণ হয় ক্ষিধে
ঢোকে সোজা একদম 'দ্বারিকে'—
লুচি নেয় খান ত্রিশ সন্দেশ দশ বিশ
খালি করে রাবড়ীর হাঁড়িকে।

শনিবারে শুধু খায় তাও রাত নয়টায়
সেরটাক্ মাটনের কোর্ম্মা,
অম্‌লেট ফ্রাই-ফিস 'কারী' দুটো ফুল ডিস
গোটা ছয় পটলের দোরমা।

'ফাষ্ট' করে রবিবার জানা আছে সবাকার
যাও যদি ঘরে তার গোপনে,
দেখ্‌বে সে চোখ্ মেলে এক কোণে বসে' 'কেলে'
মেতে গেছে ভরপুর ভোজনে।

কিন্তু সে লোক ভালো, যার যাহা ইচ্ছা বলো
আমি জানি এই কথা সার—
হোটেলের শোধে ধার, 'পাশ দেয় 'সিনেমার'
বহে কত অপরের ভার!

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

জন মিল্টন

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজী সাহিত্যকে যে সব লেখক বড় করে তুলেছেন, জন মিল্টন তাঁদের মধ্যে একজন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনে তাঁর জন্ম হয়। লণ্ডন আরও অনেক বিখ্যাত কবির জন্মস্থান। তাঁদের মধ্যে চসার, স্পেনসার, বেন জনসন্, হেরিক, পোপ, গ্রে, ব্লেক, কীট্স্, ব্রাউনিং এঁদের নাম করা যেতে পারে।

মিল্টনের বাবারও নাম ছিল জন মিল্টন, তিনি আইন সম্পর্কীয় কাজ করতেন। তাঁর আগেকার বাসস্থান অক্সফোডশায়ারের এক জায়গায় ছিল। তখন খৃষ্টানদের মধ্যে 'প্রোটেষ্ট্যান্ট' নামে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠ্ছিল। ধর্ম্মের অনেক বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে রোম্যান ক্যাথলিক নামে অপর সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে তফাৎ আছে। মিল্টনের বাবা ক্যাথলিক মত ছেড়ে দিয়ে প্রোটেষ্ট্যান্ট মত নিয়ে ছিলেন বলে, তার পরিবারের অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি লণ্ডনে চলে আসেন। তাঁর ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি হয়। তিনি খুব মার্জ্জিত রুচির লোক ছিলেন। তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন। সাহিত্যে এবং অন্যান্য কলাবিদ্যার প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর বাবার সাহায্যে মিল্টন ছোট বয়স থেকেই অনেক বিষয়ে অনুরাগী হয়ে ছিলেন। তাঁর মার নাম ছিল সারা। তাঁর সম্বন্ধে মিল্টন বিশেষ কিছু লিখে যান নি।

বাপ এবং ছেলের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল। বাবা নিজে তাঁর লেখাপড়া দেখাশুনা করতেন; ফলে মিল্টন বেশ সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। ১৬২০ খৃঃ অব্দে তাঁকে সেণ্ট পল্স্ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বেশ সুশিক্ষা পান। তখন থেকেই তাঁর পড়াশুনায় বেশ অনুরাগ জন্মে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি উৎসুক হন। বার বছর বয়সেই তিনি রাত্রি বারটার আগে পড়াশুনা বন্ধ করতেন না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি খারাপ ছিল। এত বেশী পরিশ্রম করার জন্য তাকে কষ্ট পেতে হোত। এই অল্প বয়সেই গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় লেখা বই তিনি পড়তেন। ইটালিয়ান, ফরাসী এবং হিব্রু

সাহিত্যও তিনি পড়তেন। বলা বাহুল্য ইংরাজী সাহিত্যও বিশেষ করে স্পেনসারের কবিতা তার ভাল লাগত। এই সময় তিনি কতকগুলি কবিতা লেখেন। তবে তার মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের কোন কিছু পাওয়া যায় না।

যখন মিল্টনের বয়স ষোল বছর তখন তাঁকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ক্রাইষ্টস্ কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে তিনি সাত বছর লেখা পড়া করেন এবং ১৬৩২ খৃঃ অব্দে এম, এ ডিগ্রী পান। কেমব্রিজের তখনকার দিনের শাসন ব্যবস্থা তাঁর ভাল লাগেনি। মিল্টন ছোট থেকেই খুব স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। এক জন শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর গোলমাল হয়। পরে অবশ্য সেটা মিটমাট হয়ে যায়। সেখানে অনেকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁর সৌন্দর্য্যের জন্য এবং তাঁর কথাবার্ত্তার ও চালচলনের মিষ্টতার জন্য তাঁকে সকলে ক্রাইষ্টস্ কলেজের লেডি বলত। কেমব্রিজ ছাড়বার আগে তিনি কয়েকটি কবিতা লেখেন। তার মধ্যে যীশু খৃষ্টের জন্ম উপলক্ষে স্তুতিগীত (Ode on the Nativity) নাম করা যেতে পারে। ইংরাজীর সাহিত্য এটি একটি সুন্দর কবিতা।

কেমব্রিজের পর মিল্টন বাকিংহামশায়ারের হর্টন নামে এক জায়গায় পাঁচ বছর কাটান। সেখানে তাঁদের একটী বাড়ী ছিল এবং তাঁর মা তখন সেখানে থাকতেন। যে বয়সে অন্যান্য কবিদের জীবনে অনেক রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটে সে বয়স তিনি খুব শান্ত আবহাওয়ায় কাটালেন। ঘটনা বলতে এ সময় তাঁর জীবনে কিছুই হয় নি। এই সময় তিনি পৃথিবীতে বড় কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ হবার কৃত সঙ্কল্প হলেন। তিনি এমন কিছু লিখবেন ঠিক করলেন যাতে লোকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাবে। এই সঙ্কল্পের বেদিতে নিজেকে তিনি উৎসর্গ করলেন। কবি সম্বন্ধে মিল্টনের অতি পবিত্র ধারনা ছিল। তাঁর মতে বড় কবির অন্তঃকরণও কবিতারই মত সুন্দর হওয়া উচিত। সৎ জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ না হলে কবি হওয়া যায় না। শুধু কবির মন এবং চিন্তা কেন কবির শরীর পর্য্যন্ত সুন্দর হবে। কবিদের সম্বন্ধে মিল্টনের এত উচ্চধারণা ছিল। নিজেকে বড় কবি ভাবে গড়ে তোলবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। আগেকার সাহিত্য বিশেষ করে গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য ও ইতিহাস এবং তার নিজের সময়ের ভাল বই পড়ে তিনি অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করলেন। তিনি যে শুধু পড়ে যেতেন তা মনে করলে ভুল হবে। প্যারাডাইস্ রিগেন্ড্ এর (তাঁর লেখা একটি মহাকাব্য) একটি জায়গায় তিনি না বুঝে এবং না চিন্তা করে পড়ার খুব নিন্দা করেছেন। চিন্তাশীল মনে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি পড়তেন। এই ভাবে তিনি সত্যকার পাণ্ডিত্য পেলেন। হর্টনে থাকবার সময় তিনি Comus, Lycidas, L'Allegro, Il Penseroso প্রভৃতি কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা লেখেন।

১৬৩৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মিলটনেব মা মারা যান। তাঁর পিতার অনুমতি নিয়ে

মিল্‌টন ইটালীতে বেড়াতে গেলেন। ইটালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং তার শিল্প সম্ভার অনেক শিল্পীর এবং কবির প্রেরণার উৎস রূপে কাজ করেছে। ধর্ম্মমতে তিনি ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু ইটালী ক্যাথলিকদের গড়ের মত। তাদের ধর্ম্মগুরু পোপ রোমে থাকেন। মিল্‌টনের বন্ধুরা ভয় করেছিলেন যে মিল্‌টন হয়ত সেখানে কোনরকম গোলযোগ বাঁধিয়ে ফেলবেন। সকলেই জানত মিল্‌টন খুব স্বাধীনচেতা।

ইটালীতে মিল্‌টন পনর মাস অনেক জায়গায় ঘুরলেন। বেশ আনন্দেই কাটল। তিনি যাঁদের আতিথ্য স্বীকার করতেন তাঁদের সম্মানের জন্য লাটিন ভাষায় কবিতা লিখতেন আর মেয়েদের জন্য ইটালিয়ান ভাষায় সনেট (চতুর্দ্দশ পদী কবিতা) রচনা করতেন! ইটালীর শিল্প অপেক্ষা তার সঙ্গীত আরও ভাল লাগত। এক সময় তিনি খবর পেলেন যে কতকগুলি জেস্যুইট (একটি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়) তাঁর বিরুদ্ধে রোমে চক্রান্ত করছে। তাদের বিরুদ্ধে রোম নগরীতেই (ক্যাথলিকদের সব চেয়ে বড় আড্ডা) তিনি প্রোটাষ্ট্যান্ট মতবাদ সমর্থন করেছিলেন। তাঁর অসীম সাহস ছিল।

এই সময় ইংলণ্ডে রাজা এবং প্রজাদের মধ্যে ভীষণ গোলযোগ বাধে। তখনকার রাজা প্রথম চার্লসের স্বৈরচারিতায় প্রজারা বিক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশে ভীষণ আন্দোলন হয়। মিল্‌টন এই খবর পেয়ে দেশে ফিরে এলেন। তিনি লিখেছেন, যখন আমার দেশের লোকেরা স্বাধীনতার জন্য অভিযান সুরু করেছে তখন বিদেশে আমোদ প্রমোদে ডুবে থাকা আমি অসম্মানজনক মনে করি। তবে সত্যই তিনি রাজনীতিতে যোগ দিতে মন ঠিক করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। কেননা ১৬৩৯ অব্দে দেশে ফিরে এসে তিনি রাজা-প্রজার সংগ্রামে মোটেই ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তাঁর একমাত্র বোনের দুইটি ছেলেকে নিজের বাড়ীতে রেখে তিনি তাদের লেখাপড়া শেখানর ভার নিলেন এবং নিজেকে আবার পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়ে ফেললেন।

সে সময় ইংলণ্ডের ধর্ম্মব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক রকম বাদ প্রতিবাদ চলছিল। তিনি এই বিষয়ে পাঁচখানি বই লেখেন। তিনি বিশপতন্ত্রের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন।

১৬৪৩ খৃঃ অব্দে তিনি মেরী নাওলকে বিয়ে করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখী হয়নি। নাওল ক্যাভেলিয়ার (রাজা প্রথম চার্লসের পক্ষাবলম্বী) পরিবারের মেয়ে। তিনি অনেক আত্মীয় স্বজনের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। মিল্‌টনের বয়স পঁয়ত্রিশ এবং মেরীর বয়স সতর! মিল্‌টনের প্রকৃতি খুব গম্ভীর ছিল। তাছাড়া তিনি সব সময় পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতেন। মেরী সেখানে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। একবার নাওল বাপের বাড়ী গিয়ে আর ফিরে এলেন না। এর মধ্যে ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে মিলটন শিক্ষা বিষয়ে একটি পুস্তিকা লেখেন। মেরী ফিরে না আসাতে মিলটন

বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার পক্ষে মত দিয়ে একটী পুস্তিকা লেখেন। খৃষ্টানদের নিয়ম এই যে যতদিন না স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হয় ততদিন অন্যজন বিয়ে করতে পারবে না। বিবাহ সম্বন্ধে মিলটনের অতি উদার মত ছিল, তিনি লেখেন, যদি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী পরস্পর ভাল রকম না বুঝে বিয়ে করে এবং তাদের মিল না হয় তবে সে বন্ধন চিরস্থায়ী করে রেখে তাদের সমস্ত জীবন বিবাদ ও নৈরাশ্যে বিষময় করে তোলার কোন অর্থই হয় না। যাই হোক পরের বছর মেরী ফিরে আসেন। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে বিবাদের ফলে রাজার পক্ষাবলম্বী মেরীর পিতৃ পরিবার খুব দুর্দ্দশায় পড়ে এবং ১৬৪৬ জুন মাসে তাঁরা সকলে মিলটনের আশ্রয়ে বাস করেন। এ থেকে মিলটনের সামাজিক উদারতা বুঝতে পারা যায়। ১৬৫২ সালে মেরী মারা যান।

১৬৪৩ অব্দে রাজসরকার থেকে অবাধ পুস্তক প্রকাশ বন্ধ করা হয়। ২৫শে জুন যাজক নিয়ে একটি সমিতি করা হয়। তার বিনাঅনুমতিতে বই ছাপান চলবে না এই রকম আইন হয়। মিল্‌টন এই সমিতি গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করে একটি পুস্তিকা লেখেন। সকল ব্যাপারেই আমরা তাঁর স্বাধীন মনের পরিচয় পাই। তিনি লেখেন, জাতিকে যদি উন্নত করতে হয় তবে প্রত্যেককে সৎ হতে হবে। মানুষ যদি চিন্তা রাজ্যে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা না পায় তবে তারা সৎ হতে পারবে না। স্বাধীনমত গঠনের জন্য লোকের স্বাধীন ভাবে বই পড়ার সুবিধা থাকা দরকার। ভগবান্‌ মানুষকে বিচার শক্তি দিয়েছেন! যদি তারা স্বাধীনমত পোষণ করতে এবং সেই মত কাজ করতে না পায় তবে তাদের বিচারশক্তির কোন অর্থ হয় না।...লেখকের মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা বই তাঁরই মত প্রভাবশালী হয়ে চিরকাল থাকে। একটা ভাল বই নষ্ট করা আর একজন ভাল লোককে মেরে ফেলা একই রকম অন্যায়। দুঃখের বিষয় তাঁর পুস্তিকা লোকের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নি।

১৬৪৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদন করা হয়। এবং ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র গঠন করা হয়। এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে রাজাদের ভোগসত্ত্ব (The Tenure of kings and magistrates) সম্বন্ধে মিল্‌টন একটি পুস্তিকা লেখেন। তাঁর মত ছিল যদি সাধারণ বিচারকর্ত্তারা দুষ্ট বা অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে এবং যথারীতি বিচারের পর তাঁকে হত্যা করতে পরাঙ্মুখ হন তবে যে কোন শক্তিশালী ব্যক্তিই সে রাজাকে মেরে ফেলবার ক্ষমতা থাকবে। তিনি চার্লসের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেন। এই বই লেখার পর যাঁরা দেশের কর্ত্তা ছিলেন তাঁরা মিল্‌টনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং বৈদেশিক দপ্তরে তিনি একটি চাকুরী পেলেন। তাঁর কাজ ছিল বৈদেশিক দপ্তরে নথীপত্রের ইংরাজী থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ এবং বৈদেশিক ভাষায় লেখা চিঠিপত্রের ইংরাজীতে তর্জ্জমা করা। ১৬৪৯ অব্দ থেকে ১৬৬০ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ প্রজাদের রাজাকে হত্যা সমর্থন করে তিনি

কয়েকখানি পুস্তিকা লেখেন। তাঁর মতে প্রজারাই দেশের প্রকৃত মালিক। তাঁরাই রাজার স্রষ্টা।

তখন অনেকে বিশ্বাস করত যে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর বিপক্ষে মাথা তোলা পাপ। মিল্‌টন এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, যদি রাজা অন্যায় করেন তার প্রজারা তাঁকে মান্‌তে কোন রকমেই বাধ্য থাকবে না কেন, না প্রজারাই রাজাকে রাজত্ব দেন। এই সব পুস্তিকা লেখবার জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। যখন তাঁকে তাঁর চিকিৎসক তাঁর চোখের জন্য লেখা পড়া বেশী করতে মানা করার উপদেশ দিলেন তখন তিনি বলেন, আমি দেশ সেবার জন্য কোন পরিশ্রম করিতেই বিমুখ হব না। ১৬৫৪ অব্দের পূর্ব্বেই তিনি একবারে অন্ধ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি কখনও ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি। বরং তিনি যে দেশ সেবায় তাঁর সবচেয়ে বড় জিনিষ দিতে পেরেছেন তার জন্য তিনি গর্ব্ব অনুভব করতেন। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর মনের এবং চিন্তার শক্তি বাড়িয়ে দেবার জন্যই ভগবান তার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের বিশ্বাস তাঁর জীবনে একটা মস্ত বড় গুণ। অনেক কবিতায় তার পরিচয় আমরা পাই।

তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেলেও তিনি সরকারী চাকুরীতে বাহাল ছিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হোল এবং রাজা দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে বসলেন। তখন মিল্টনের দারুণ দুর্দ্দশার দিন এল। তাঁকে চাকুরী ছেড়ে দিতে হোল। রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্টার ঠিক দুমাস আগেই তিনি প্রজাতন্ত্রের গঠন বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এতকাল যাবৎ মত প্রচার করার জন্য তাঁর জীবন এখন বিপন্ন হোল। তিনি পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচালেন। তাঁকে কিছুদিন কয়েদী অবস্থায় থাকতেও হয়েছিল। সরকারের বিবেচনায় স্থির হয় দেশে তাঁর অল্প মাত্রও প্রতিপত্তি নেই। কাজেই ১৬৬০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর সমস্ত বই সরকারের আদেশে পুড়িয়া ফেলা হয়। তাঁর বিপদ কেটে গেল এবং তিনি আবার স্বাধীন ব্যাক্তি রূপে চলা ফেরা করতে পেলেন।

মিল্টনের শেষ জীবন অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েছিল। যে রাজতন্ত্রের এবং বিশপতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি নিজের দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করেছিলেন তাদেরই আবার জয় হোল। তিনি দুঃখিত মনে তাঁর প্রথম সঙ্কল্প কাজে পরিণত করায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি স্থির করলেন যে এমন একটি কাব্য লিখবেন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সময় তিনি Paradise Lost (স্বর্গচ্যুত) নামে মহাকাব্য রচনা করেন। ১৬৬৪ অব্দে রচনা শেষ হয় এবং ১৬৬৭ অব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। কি করে ভগবানের সৃষ্ট প্রথম

নর ও নারী আদম ও ঈভ ইডেনের স্বর্গ হারালেন এতে তারই বর্ণনা আছে। মিল্টন এই বই লেখার জন্য তাঁর প্রকাশকের কাছ থেকে দুই বারে মাত্র দশ পাউণ্ড পেয়েছিলেন।

তারপর মিল্টন ১৬৭১ খৃঃ অব্দে Paradise Regained (স্বর্গের পুনঃপ্রাপ্তি) নামে আর একটি মহাকাব্য লিখেন। গ্রীক নাটকের অনুসরণ করে Samson Agonistes নামে একটি নাটকও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সামসন ইহুদীদের একজন অধিনেতা ছিলেন। তিনিও অন্ধ হন এবং নিজের প্রাণ দিয়ে ইহুদীদের অনেক শত্রু মারেন। বাইবেলের তাঁর গল্প আছে। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ৮ই নবেম্বর মিল্টনের মৃত্যু হয়।

এ ছাড়া মিল্টন মাঝে মাঝে সনেট লিখেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর উচ্চ আদর্শ স্বাধীন মতবাদ, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং ঈশ্বরের বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। ইংরাজী সাহিত্য, শুধু ইংরাজী সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিত্য অনেক উঁচুতে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিল্টনের আত্মাকে উজ্জ্বল তারকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারার মত তিনি পৃথিবীর মাটি ময়লা থেকে অনেক দূরে ছিলেন আর তারার মতই তিনি উজ্জ্বল কিরণ দিতেন।

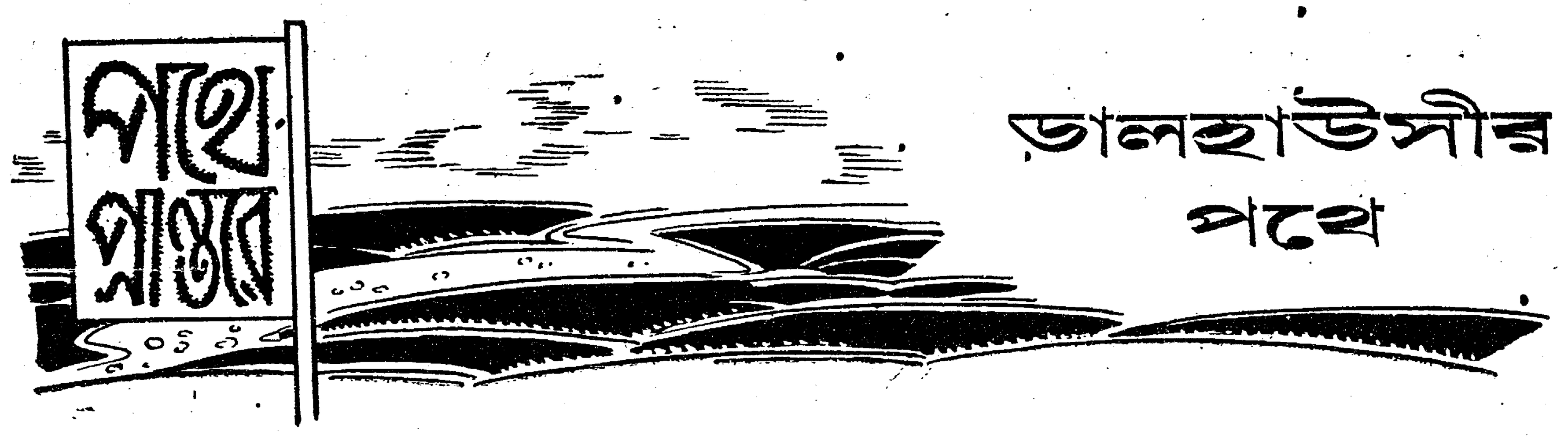

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লাহোরের উত্তরে ডালহাউসী হিমালয় পাহাড়ের উপর একটি শৈলনিবাস। লাহোর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত একশত মাইল রেলে আসিতে হয়। পাঠানকোট হইতে ডালহাউসী পর্য্যন্ত বাহান্ন মাইল পার্ব্বত্য পথ, মোটর বা টমটমে আসিতে হয়। ডালহাউসী গুরুদাসপুর জেলার একটি মহকুমা। ইহার চতুর্দ্দিকে চাম্বারাজ্য। পূর্ব্বে ডালহাউসী পাহাড়টীও চাম্বারাণ্যের অন্তর্গত ছিল। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজ সরকার চাম্বারাজ্য কর্ত্তৃক দেয় রাজকর কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে স্থানটি অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

রাত্রি দশটার সময় লাহোর হইতে আমাদের ট্রেণ ছাড়িল। অমৃতসর পর্য্যন্ত মেন্ লাইন ধরিয়া আসিয়া, অমৃতসর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ট্রেণ শাখালাইনে চলিল। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমরা পাঠানকোট পৌঁছিলাম। এইস্থানে বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীনকালে উডম্বরেরা এইস্থানে বাস করিত। তাহাদের রাজধানী ছিল নূরপুর। নূরপুরের রাজপুত রাণাদের উপাধি ছিল পাঠানিয়া। তাহা হইতেই পাঠানকোট নামের উৎপত্তি। পাঠানকোট হইতে কাঙ্গরা যাইবার পথে প্রাচীন নূরপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঠানকোট হইতে ছয়মাইল দূরে শাপুরের নিকট রাবী নদীর তীরে মুখেশ্বরের মন্দির আছে। প্রবাদ, পাণ্ডবগণ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাঠানকোটের পনের মাইল পূর্ব্বে ডেরানানক নামক স্থানে শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নানক শেষ জীবনে বাস করিতেন। এইস্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পাঠানকোট হইতে আমরা মোটরে উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র নগরটী ছাড়াইয়া গেলাম। পথের দুইধারে সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী। দূরে আকাশের গায়ে পর্ব্বতশ্রেণী। পাঠানকোট হইতে ছয়মাইল দূরে আসিয়া একটি পথ কাঙ্গড়া অভিমুখে, অপরটি ডালহাউসী অভিমুখে গিয়াছে। এইবার সমতলভূমি ছাড়িয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হিমালয়ের পাদদেশে যে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী আছে, তাহাকে বলা হয় শিবালিক পাহাড়। বহু-দূরে পর্ব্বতের ক্রোড়ে রাবী নদীর প্রবাহ দেখিতে পাইলাম।

ঝাঙওয়ালা, ধর প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান অতিক্রম করিয়া বেলা নটার পর আমরা দুযেরায় উপস্থিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত পথ অতিশয় আঁকাবাঁকা! এখনও ডালহাউসী তেইশ মাইল পথ। এইস্থান হইতে ডালহাউসীর পথ এত সঙ্কীর্ণ যে পাশাপাশি দুটী মোটর গাড়ী যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইস্থানে একটি নিয়ম সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়। সকাল আটটা হইতে সকাল এগারটা পর্য্যন্ত ওই পথে মোটরকে নামিয়া যাইতে দেওয়া হয় কিন্তু উঠিতে দেওয়া হয় না। আবার এগারটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত মোটর উঠিতে পারে কিন্তু নামিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগকে একটি ডাকবাংলোয় এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

মোটর পাহাড়ের পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছিল। এক একটি পাহাড়ের শীর্ষে উঠিয়া আবার একটু নামিয়া অপর একটি পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। এইভাবে বাকলো, নাইনিখেত, চাণ্ডিয়ারা ও ভানিখেত অতিক্রম করিলাম। বাকপোতে একটি গোরাপলটনের ছাউনী আছে। ভানিখেতে প্রাচীন নাগদেবতার মন্দির আছে। এখানে আষাঢ়মাসে একটি বড় মেলা বসে। আমরা যে পাহাড়গুলি অতিক্রম করিলাম, সেগুলি প্রস্তরময়, বৃক্ষলতাদি হীন। পাহাড়ের গায়ে সুবিন্যস্ত সোপানশ্রেণীর ন্যায় ছোট ছোট ক্ষেতগুলি এবং তাহার পার্শ্বে দুই চারিটি কৃষকদের কুটীর। পথের মাঝে দুই চারিটী দোকানঘর। বেলা একটার পর আমরা দূর হইতে এই প্রথম নিবিড় বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ডালহাউসী পাহাড় দেখিতে পাইলাম।

মোতিটিব্বায়া টেহ্‌রা, পোট্রেন ও বকরোটা এই তিনটী পাহাড়ের শিরোদেশে ডালহাউসী নগর অবস্থিত। ডালহাউসী প্রায় দার্জ্জিলিংয়ের সমান উচ্চ কিন্তু গ্রীষ্মকালে তত ঠাণ্ডা নহে। ডালহাউসী বেশ নির্জ্জন স্থান। চক্কি ও বিপাশা নামক দুইটী নদী যে স্থানে মিশিয়াছে তাহা এইস্থান হইতে দেখা যায়। শতদ্রু ও চন্দ্রাভাগা নামক পাঞ্জাবের দুইটী নদীও খুব পরিষ্কার দিনে এইস্থান হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থান হইতে তুষার শ্রেণী দেখা যায়। চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতগুলি আকাশের গায়ে পটাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকে বরফগুলি ঝলমল করিতেছে। বরফের পাহাড় এইস্থান হইতে বেশী দূরে নহে। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর গৃহ ও ক্ষেত্র। দূর হইতে গৃহগুলি ক্ষুদ্র খোলার ঘরের ন্যায় মনে হয়।

ডালহাউসীর নিকট ডাইনকুণ্ড নামক একটি শৈলশৃঙ্গ আছে। ইহার উচ্চতা নয় হাজার ফিট। জনশ্রুতি শুনিলাম যে, বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে একটি ঋষির আশ্রম ছিল। এই ঋষি সর্ব্বদা ধ্যান করিতেন বলিয়া পাহাড়ের নাম ধ্যানকুণ্ড বা ডাইনকুণ্ড হইয়াছে।

আমরা একদিন প্রাতঃকালে ডাইনকুণ্ড দেখিতে চলিলাম। পাহাড়ীরা পিঠে ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দুধ, কলা, আপেল, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছিল। কোথাও কোন পাহাড়ী বালক বা বালিকা গরু চরাইতেছিল। কদাচিৎ পথের ধারে দুই একটি দোকান দেখা যাইতেছিল। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, পথের পাশ দিয়া একটী জলস্রোত ঝর্ ঝর্ শব্দ করিতে করিতে নামিয়া গিয়াছে। সেখানে কোন লোকালয় নাই, উপরে আকাশ—নীচে পাহাড় ও অরণ্য। এই স্থানের দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতি দেবী যেন হৃদয় খুলিয়া করুণকাহিনী গাহিতেছেন।

যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে সেদিন ডাইনকুণ্ডের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বাম দিকে—বাক্‌লোর ছাউনি, তাহার পর শিবালিক পাহাড় এবং পাঞ্জাবের উপত্যকা। শিবালিকের মধ্য দিয়া গিয়াছে দুইটী সমান্তরাল নদী। পূর্ব্বদিকে যে নদীটি প্রবাহিত তাহার নাম চাক্ক—ইহা বিপাশায় পড়িয়াছে। পশ্চিমের নদীর নাম রাবী। ইহা ব্যতীত সমতলভূমির উপর দেখা যায়—শতদ্রু, বিপাশা এবং চন্দ্রভাগা। পশ্চিম দিকে দেখা যায়—কুণ্ডকপিলাশ এবং দাগানিধর পাহাড়। তাহাদের পশ্চাতে ভদ্রাওয়া এবং বলেশার নামক দুইটী বরফাবৃত পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চোখে পড়ে—কালাটোপা, বক্‌রোটা, টেহ্‌রা, পোট্রেন, কাটলাগ পর্ব্বতগুলি রাবীর দিকে নামিয়া গিয়াছে।

এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম যে ঐ স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে পঞ্চপুল নামক স্রোত দেখিবার জিনিষ। সুতরাং আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া উহা দেখিতে চলিলাম।

পাহাড়ের ধার দিয়া পথটী ঘুরিয়া চলিয়াছে উপরে ও নীচে ঘন বৃক্ষশ্রেণী। এক প্রকার লাল ফুল পাহাড় আলো করিয়াছিল। ছোট ছোট পাহাড়ী বালিকা দুর্গম পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিয়া গরু, ভেড়া ও ছাগল চরাইতেছিল। পথে একটি পাথরে বাঁধান ঝরণা হইতে ক্ষীণ জলধারা পড়িতেছে। দেখিলাম শুনা যায়, এই জল খুব উপকারী। আরও কিছুদূর যাইয়া আমরা পঞ্চপুলের নিকট উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানে দুইটী পাহাড় মিশিয়াছে এবং সঙ্গমস্থলে দুইটী ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে। নির্ঝরের কলধ্বনি ও পাখীর কাকলীতে মন চলিয়া যায় কোন এক সুদূর রাজ্যে। এইস্থান যেন মর্ত্তবাসীগণের জন্য নহে। ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এক স্বপ্নরাজ্য। এইস্থানে প্রবেশ যেন মানুষের নিষিদ্ধ। আমরা যেন তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিতেছি। চতুর্দ্দিকে এক ভীষণ নিস্তব্ধতা, জটাজুটবিলম্বিত এক ঋষির ন্যায় ধ্যান-মগ্ন। কোন এক অনাদিকাল হইতে ইহা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে এবং এখনও শেষ হয় নাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ইহার স্থিরতার বন্ধন ছিন্ন হইবে না। এই স্থানে কিছুক্ষণ থাকিলে চিত্ত স্থির হয়।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল আমরা ফিরিয়া আসিলাম। পাহাড়ের উপর আলোক ম্লান হইয়া আসিল।

নির্ঝরের অস্পষ্ট কলধ্বনি তখনও ভাসিয়া আসিতেছে। ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্। প্রকৃতি দেবী এখন আঁধারের বন্দী হইলেন।......

———

ঠিক জানো তো?

বড়ো কি কি

লোক সংখ্যা

লণ্ডন	...	...	...	৮,৬৫০,০০০
নিউইয়র্ক	...	...	...	৭,৯৮৬,০০০
টোকিয়ো	...	...	...	৬,৫৮১,০০০
বার্লিন	...	...	...	৪,২৯৯,৩১৮
মস্কো	...	...	...	৩,৬৬৩,০০০

বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ

উপন্যাস

এই উপন্যাসের কয়েক পরিচ্ছেদ এগিয়ে গেলেই, একদল বদ্মাইস লোকের দেখা পাওয়া যাবে! কেন তারা এসে দেখা দেবে, সে কথা তোমাদের বলার দরকার করে না বোধ হয়? কেন না, সব এ্যাডভেঞ্চারের মতো, এর মধ্যেও, গুপ্তধন, লুকোনো নক্সা এবং অকারণ পুলক—এসবের কোনো কিছুরই কিছুমাত্র ঘাটতি নেই। এবং এই সবের জন্যেই, তারা কাড়াকাড়ি মারামারি বাড়াবাড়ি সব কিছুর চূড়ান্ত করে' ছাড়বে। এদের সাথে সাথে, অচিরে, আরেক দল এসে হানা দেবে। এরাও সমস্ত এ্যাডভেঞ্চারে এসে থাকে, তবে ছদ্মবেশে আসে—মানুষের ছদ্মবেশেই। এই গল্পে কিন্তু একেবারে স্বরূপ নিয়ে, বিনা আড়ম্বরে এসে পড়েছে। এরা একদল ছাগল। তারপর—তারপর কি হবে, গল্পের গোড়ায় বলা, এখনই বলা, একটু শক্তই। নয় কি?

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এক

রহস্যময় অট্টালিকা

প্রথম দর্শনেই বাড়ীটাকে ভালো লাগেনি শিশিরের, কিরকম একটা খট্‌কা লেগেছিল। ওর মন বলেছে, উঁহু, এর লক্ষণ ভালো না! এখন ওর আগাপাশতলা লক্ষ্য করে'—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যতটা সুচারুরূপে দেখা সম্ভব, দেখে শুনে ওর সেই সংশয় আরো দৃঢ়ই হোলো।

লিলিকে পাশে ডেকে স্পষ্টই ও জানিয়ে দিয়েছে: "বাড়ীটার হাবভাব ভালো নয়।"

দাদার কথায় লিলিরও মনে খট্‌কা লেগেছে, বাড়ীটার সম্বন্ধে তত নয়, কথাটার সম্বন্ধেই। দাদার কথাটা কেমন যেন হোলো না? বাড়ীর আবার হাবভাব কী? নির্জীব প্রাণীর কখনো হাবভাব হয় নাকি? হতে পারে কখনো? কথাটার কোথায় যেন ব্যাকরণে বেধে গেছে।

লিলিও তার সংশয়টা ব্যক্ত করেছে।

"ঠিকই বলেছি।" শিশির আরো সুদৃঢ় হয়: "বাড়ীটার গতিবিধি সুবিধের নয়।"

"গতিবিধি? তুমি কী বলচ দাদা? বার বার কী বলচ? ভারী বাড়াবাড়ি করচ তুমি।" লিলি ফের আপত্তি জানায়: "বরং বল্‌তে পারো যে গতিক সতিক।"

"ও একই কথা!" শিশির বলে: "দেখ্‌চিস্ না কি রকম জরাজীর্ণ এই বাড়ীটা! আমি নখদর্পণে দেখ্‌তে পাচ্ছি এর মধ্যে হাজার বছর আগেকার গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকানো রয়েছে। কতো মণিমাণিক্য হীরে জহরৎ কোন্ এক অন্ধকার কোণে চাম্‌চিকেদের সঙ্গে নির্ব্বিবাদে বসবাস করছে। তা না হলে বাড়ীর হাল্ চাল্ এমন হয়?"

লিলি চোখ বড়ো বড়ো করে' চেয়ে থাকে, কিছু বলে না। বল্‌তে পারে না। হাঁ করে থাকে।

"আমি তাই বলি! কেন যে মামা অমন সাধের দেশ-ঘর ছেড়ে, এত দূরে এই বিদেশে বর্ম্মা মুলুকে এসে এতদিন ধরে' এই বাড়ী কাম্ড়ে পড়ে আছে, এতক্ষণে বুঝলুম!—"

শিশির আরও কিছুক্ষণ হয়তো গবেষণা চালাত, আরো খানিক, 'তার সদ্যপ্রসূত আবিষ্কার, লিলির হাঁ'র ভেতর দিয়ে চালান দিত, কিন্তু এর মাঝখানে মামার হাঁকডাক এসে বাধা ছায়।

নেপথ্য থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে:

"এই বেলা! বেলা! বেলা না লিলি? লিলি—শিশির, চা খাবি আয়! এই বেলা আয়!"

চায়ের নাম শুনলে শিশির আর দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারে না। চিরকালই তার এই অক্ষমতা। চার গন্ধ পেল তো আর কথাই নেই। এমন কি, লিলি, লিলিও, এখন পর্য্যন্ত যে দাদার বাক্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও আর নিজেকে স্থগিত রাখ্‌তে পারে না। এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে দাদার পিছনে পিছনে দৌড় মারে!

দুম্ দাম্ করে' তারা ছুটে চলে। টপাটপ্ সিঁড়ি টপ্‌কে হুড়্‌মুড়্ করে' উঠ্‌তে থাকে। কাঠের সিঁড়ি, পুরণো সাবেক সিঁড়ি, তাদের পদভারে মচ্ মচ্ কর্‌তে সুরু করে।

সেই মচ্‌মচানি ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার কাণে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি খচ্ খচ্ কর্‌তে থাকেন: "ঘর দোর সব ভাঙ্‌ল দেখ্‌চি! সার্‌ল দেখ্‌চি সব!"

চায়ের পাত্র হাতে আপন মনেই তিনি ঝঙ্কার ছান্।

ছুটতে ছুটতে উঠতে উঠতে, সিঁড়ির মোড় ঘুরবার মুখে, রেলিংয়ের বাঁকের কাছে শিশির ধাক্কা খায়, হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় শিশির। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হয়, ধরণী যেন দ্বিধা হয়ে, তার একখানা পা—যে পা-টা অগ্রণী হয়ে গেছল, সেই পা খানাকেই হঠাৎ গ্রাস করে ফ্যালে।

শিশিরের মনে হোলো, পড়ে যেতেই, তার অধঃপতনের ভারে সিঁড়ির সেই জায়গাটা যেন ফাঁক হ'য়ে গেল, আর তার গর্ত্তের মধ্যে তার একখানা পা বেমালুম সেঁধিয়ে গেল—হঠাৎ শূন্যের ভেতর দিয়ে গলে গেলে যেমন হয় ঠিক তেম্‌নি আর কি!

বিস্মিত শিশির দুহাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে। উঠে আরো বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। কোথায় গর্ত্ত, কোথায় কি! তেম্‌নি জমাট সিঁড়ি, কাঠ মিলানো নিটোল দেহ নিয়ে তেমনি খট্ খট্ কর্‌ছে!

"য়্যাঁ? এ কি হোলো? এ আবার কি হোলো?" অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল শিশির।

"কি হোলো দাদা?" লিলি পিছন থেকে জিগ্যেস করে: "খুব লাগ্‌ল নাকি?"

"ও বাবা! এ বাড়ীর আরো গুণ আছে দেখচি।" শিশির জবাব ছায়: "ভূতুরে বাড়ীও বলা যায়!"

"ভূতুরে—!" ভূতের নামে লিলি ডরিয়ে ওঠে। "—হুঁ, য়্যাঁ!"

"পদচ্যুত হয়ে গিয়াছিলাম আর কি! পাখানা গিলে ফেসেছিল আমার। বল্‌ব কি, এই সিঁড়িখানাই,—বুঝলি লিলি! ভারী আশ্চর্য্যি!" শিশির বলে: তখনো তার কণ্ঠ বিস্ময়াবিষ্ট: "বাব্‌বাঃ, পাখানা হাতিয়ে নিয়েছিল আমার আরেকটু হলে!"

"ভূতে? ভূতে নাকি?" লিলির নিজের পা কাঁপতে থাকে।

"বল্‌ব তোকে এক সময়ে। আগে চা জুড়িয়ে গেল, চ'।"

ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে এই বাড়ীর মিলন আজকের নয়। বছর দশেক আগেকার কথা। এই রাজযোটকের গোড়ায় একটুখানি ইতিহাস আছে—এবং সেই ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের খানিকটা জড়ানো।

বছর দশেক আগে, ব্রজেশ্বরবাবুর হঠাৎ খেয়াল হোলো, তিনি পদব্রজে ভূ-পর্য্যটন করবেন। যেম্‌নি খেয়াল হওয়া, অম্‌নি ঘরবাড়ী ইস্কুল মাষ্টারি সব ফেলে, সমস্ত ছেড়েছুড়ে ব্রজেশ্বর পদব্রজেশ্বর হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আসামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে গিরিবর্ত্ম ভেদ করে' ব্রহ্মপুত্র সাঁৎরে, সীমান্ত প্রদেশ পার হয়ে প্রায় প্রাণান্ত অবস্থায় তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে কতো য়্যাড্‌ভেঞ্চার যে অবলীলায় অতিক্রম করে গেলেন, সে কহতব্যই নয়। বেশ মজাসেই করে গেলেন।

সব ভূপর্য্যটকেরই যা হয়ে থাকে। চল্‌তি বরাতে যা না ঘটলেই নয়—যে সব দুর্ঘটনারা বাঁধাধরা দস্তুর। ভূ-পর্য্যটনের মাঝে ব্রজেশ্বর বাঘের হাতে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর আকার ইঙ্গিতে বাঘ যক্ষুনি তাঁকে ভূ-পর্য্যটক বলে টের পেয়েছে, তক্ষুনি খাবার লালসা পরিত্যাগ করে' লজ্জিত হয়ে চলে গেছে। সিংহরা তো ফিরেই তাকায়নি, হায়নারাও হায় হায় করে ফিরে গেছে। ইয়া ইয়া ভাল্লুক তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাঁর একটা কথাও খসাতে হয় নি। এমন কি বড়ো বড়ো সব অজগর, যাদের ল্যাজের মোচড়ে লম্বা চৌড়া শাল গাছরাও দেশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়—অনিবার্য্যরূপেই হয়ে যায়—ব্রজেশ্বরকে দেখে, দেখবামাত্রই ব্রীড়াবনত হয়ে মাথা নীচু করে চলে গেছে।

পাহাড় প্রমাণ হাতীর পাল তাঁকে তাড়া করে' এসেছিল। কিন্তু যেমন এসেছিল তেম্‌নি তারা চলে গেল—বিনা বাক্যব্যয়ে। পরে দেখা গেল, তাড়া করে' নয়, তাড়া খেয়ে নিজেরাই তাড়িত হয়ে তারা ছুটছিল। এক ঝাঁক বোল্‌তা, কি কারণে তাদের ঝোঁক হোলো বলা যায় না, হাতীদের পিছু নিয়েছিল—হাতাহাতি করবার মৎলবেই হয়ত, কিন্তু কাপুরুষ

হাতীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বেশ হাঁকডাক ছেড়ে, ল্যাজ তুলে, বীরদর্পেই তারা পালিয়েছে ব্রজেশ্বরকে অগ্রাহ্য করেই। এবং বোল্‌তারাও ওঁর প্রতি কোনো বোলচাল ঝাড়েনি, বলাই বাহুল্য।

এমন কি নরখাদকরাও ওঁকে মার্জ্জনা করেছিল। যে দিবসে তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, সেদিন যার ঝলসানোর পালা, যদিও সে নিজেই ব্রজেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছিল, বলেছিল, তার নিজের তুলনায় ব্রজেশ্বরের মাংস আরো বঢ়িয়া হবে, অতএব অত্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ হিসেবে, ওকেই আজ টোস্‌ট করাটা বাঞ্ছনীয়, এই বলে' সুড়ুৎ করে' জিভের ঝোল টেনে নিয়ে অভ্যাগতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কর্‌লে কি হবে, ব্রজেশ্বরের স্বাদ না পেয়েই, একজন আসামজাত বাঙালীর আস্বাদ কেমন না জেনেই, সেই উচ্চাভিলাষ এজন্মের মত মুলতুবি রেখে সে বেচারীকে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেই আর সকলের উদরস্থ হতে হয়েছে। এমন কি, ব্রজেশ্বরেরও।

প্রস্তাবটায় পালের গোদার তরফ থেকেই বাধা পড়েছিল। তিনি বল্লেন, উঁহু, ও কাজটিও নয়। ইনি একজন ভূ-পর্য্যটক। এখন যদি ওঁকে গিলে ফেলি, তাহলে পরে যখন উনি নিজের সভ্য জগতে ফিরে যাবেন, আমাদের সভ্যতার অনেক নিন্দাবাদ রটাবেন—অনেক গালমন্দ দেবেন আমাদের। অতএব ওঁকে হজম করা খুব ভালো হবে না।

অতএব ব্রজেশ্বরকে ওরা ভালো করে' খাইয়ে দাইয়ে, সেই প্রতিবাদকারীকেই, ওঁর পাতে পরিবেশন করে (যদিও সামান্য ভগ্নাংশে), পরিতুষ্ট করে' ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

এবং ব্রজেশ্বরও নিমক্‌হারাম নন্। তিনিও সভ্যজগতে ফিরে এসে, এসম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেন নি। নিন্দাবাদ দূরে থাক্—কোনো উচ্চবাচ্যই করেন নি। একবার যাকে, যাদের একজনকে গালে তুলেছেন, তাদেরকে তিনি গাল দেবেন কোন মুখে?

তবে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, এই যে, দাঙ্গা ফ্যাসাদে যুদ্ধবিগ্রহে এত এত লোক ক্ষয় হয়, নাহক এত মানুষ মারা পড়ে, এদের যদি, মানে, হাঙ্গামা টাঙ্গামা চুকেগেলে, তারপরে এদের রেঁধে বেড়ে সাব্‌ড়ে দেবার কোনো উপায় থাক্‌ত তাহলে হয়তো নেহাৎ মন্দ হোতো না। সমস্ত ব্যাপারটার তাহলে একটা অর্থ হোতো, সদর্থই হোতো, একেবারে নিরর্থক হোতো না, এতখানি রক্তপাত নিতান্তই ব্যর্থ হোতো না, মাংস পাতে সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এখন এ যা হচ্ছে এযে একেবারেই অকেজো, বাজে খরচ, সমস্তটাই বরবাদ; এর কি কোনো মানে হয়? অনর্থক বাজে বৃথা অপচয় বইতো না! ব্রজেশ্বরের সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা অনেক বেশী উপাদেয়, ঢের বেশী সুখাদ্য, এই কথাই ওঁর মনে হয়েচে। মনে হয়েচে আর উনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেচেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেচেন আর নিজের জিভ

চেটেছেন। তবে কেবল মাঝে মাঝেই—এই যা! সেই নরখাদকের তার তিনি ভুলতে পারেন নি! তার কথা চিরদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে।

পথভ্রষ্ট এই সব উপদ্রব উৎপাত তিনি অনায়াসেই এড়াতে পেরেছিলেন, এসব তো ঘটবেই এবং কেটেও যাবে। কেটেকুটে না গেলেই হোলো। এবং ঠিক যেমন যেমনটি ঘটে থাকে, সাধারণতঃ সব পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই দেখতে পাওয়া যায়, তার কিছুতেই—কোনোখানেই তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। একটুও না। সবই তিনি পেরেছিলেন এবং পেরিয়েছিলেন অবলীলাক্রমেই। কেবল এক ডাকাতরাই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

তারা বলেছে, বাপু তুমি একটি ভূপর্য্যটক। বল্‌তে হবে না, দেখেই টের পেয়েছি। তা' বাপু তুমি যেখানেই যাবে বক্তৃতা ঝাড়্‌বে, হস্তাক্ষর ছাড়বে আর টাকা মারবে। তোমার এত টাকা খাবে কে? আমরা তোমাকে প্রাণে মার্‌তে চাইনে, কেন না তোমাদের মারলে আমাদের লোকসান। তোমরাই আমাদের বন্ধু—হিতৈষী বন্ধু—রোজগারের উপায়—তোমরা মলে' টাকার থলে নিয়ে এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এই সব বিপজ্জনক পথে ভূপর্য্যটন করবে কারা? তোমাদের খতম করলে আমাদেরই ক্ষতি। তোমাদেরও দফা রফা আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ব্যবসা মাটি। না বাপু, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে মেরে ফেল্‌ব এ যদি ভেবে থাকো তাহলে ভুল করেছ। যেমন প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়েচ তেম্‌নি প্রাণ হাতে করে' ফিরে যাও। কেবল সম্মিলিত এই যৌথ কারবারের যেটা আমাদের লভ্যাংশ, আমাদের ভাগের লাভ, সেইটা আগে ফ্যালো দিকি! তার জন্যেই তো এত কষ্ট করে' ঘাঁটি গেড়ে এই জঙ্গলের মধ্যে ওৎ পেতে বসে থাকা—কবে কাল্পেভদ্রে তোমাদের এক আধজন ছিট্‌কে ছট্‌কে এই পথ দিয়ে এসে পড়বে। সুবোধ বালকের মতই এসে যাবে। তা নইলে আর কোন্ শিকারের আশায় এত ত্যাগস্বীকার? বল, তুমিই বলো!

ব্রজেশ্বর? ব্রজেশ্বর আর কী বল্‌বে? মুখটি বুজে ওর পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, যা নিয়ে বেরিয়েছিল সবই সেই বনদস্যুদের হাতে গুঁজে দিয়েছে।

এত ফাঁড়া কাটিয়ে এসে অবশেষে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ব্রজেশ্বরকে, পথচারী পদব্রজেশ্বরকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথেই বস্‌তে হয়েচে।

লিলি হাঁ করে' মামার ভোজন-বিলাসিতা দেখ্‌ছিল। প্রাতরাশে বসে বারোখানা টোস্‌ট্ গোগ্রাসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। এবং এও মামার প্রথম কিস্তি না। খুব ভোরে যখন উনি ওদের ষ্টেশন থেকে আন্‌তে গেছলেন, সেই সময়ে রেলোয়ে কেবিনে এক সঙ্গে জড়ো হয়ে আর্লি টী'র মারফতে ইতিমধ্যেই আর একপ্রস্ত ওঁর হয়ে গেছ্‌ল—তারপরে এই

হাতীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বেশ হাঁকডাক ছেড়ে, ল্যাজ তুলে, বীরদর্পেই তারা পালিয়েছে ব্রজেশ্বরকে অগ্রাহ্য করেই। এবং বোল্‌তারাও ওঁর প্রতি কোনো বোলচাল ঝাড়েনি, বলাই বাহুল্য।

এমন কি নরখাদকরাও ওঁকে মার্জ্জনা করেছিল। যে দিবসে তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, সেদিন যার ঝলসানোর পালা, যদিও সে নিজেই ব্রজেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছিল, বলেছিল, তার নিজের তুলনায় ব্রজেশ্বরের মাংস আরো বঢ়িয়া হবে, অতএব অত্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ হিসেবে, ওকেই আজ টোস্‌ট করাটা বাঞ্ছনীয়, এই বলে' সুড়ুৎ করে' জিভের ঝোল টেনে নিয়ে অভ্যাগতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কর্‌লে কি হবে, ব্রজেশ্বরের স্বাদ না পেয়েই, একজন আসামজাত বাঙালীর আস্বাদ কেমন না জেনেই, সেই উচ্চাভিলাষ এজন্মের মত মূলতুবি রেখে সে বেচারীকে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেই আর সকলের উদরস্থ হতে হয়েছে। এমন কি, ব্রজেশ্বরেরও।

প্রস্তাবটায় পালের গোদার তরফ থেকেই বাধা পড়েছিল। তিনি বল্লেন, উঁহু, ও কাজটিও নয়। ইনি একজন ভূ-পর্য্যটক। এখন যদি ওঁকে গিলে ফেলি, তাহলে পরে যখন উনি নিজের সভ্য জগতে ফিরে যাবেন, আমাদের সভ্যতার অনেক নিন্দাবাদ রটাবেন— অনেক গালমন্দ দেবেন আমাদের। অতএব ওঁকে হজম করা খুব ভালো হবে না।

অতএব ব্রজেশ্বরকে ওরা ভালো করে' খাইয়ে দাইয়ে, সেই প্রতিবাদকারীকেই, ওঁর পাতে পরিবেশন করে (যদিও সামান্য ভগ্নাংশে), পরিতুষ্ট করে' ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

এবং ব্রজেশ্বরও নিমক্‌হারাম নন্‌। তিনিও সভ্যজগতে ফিরে এসে, এসম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেন নি। নিন্দাবাদ দূরে থাক্‌—কোনো উচ্চবাচ্যই করেন নি। একবার যাকে, যাদের একজনকে গালে তুলেছেন, তাদেরকে তিনি গাল দেবেন কোন মুখে?

তবে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, এই যে, দাঙ্গা ফ্যাসাদে যুদ্ধবিগ্রহে এত এত লোক ক্ষয় হয়, নাহক এত মানুষ মারা পড়ে, এদের যদি, মানে, হাঙ্গামা টাঙ্গামা চুকেগেলে, তারপরে এদের রেঁধে বেড়ে সাব্‌ড়ে দেবার কোনো উপায় থাক্‌ত তাহলে হয়তো নেহাৎ মন্দ হোতো না। সমস্ত ব্যাপারটার তাহলে একটা অর্থ হোতো, সদর্থই হোতো, একেবারে নিরর্থক হোতো না, এতখানি রক্তপাত নিতান্তই ব্যর্থ হোতো না, মাংস পাতে সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এখন এ যা হচ্ছে এযে একেবারেই অকেজো, বাজে খরচ, সমস্তটাই বরবাদ; এর কি কোনো মানে হয়? অনর্থক বাজে বৃথা অপচয় বইতো না! ব্রজেশ্বরের সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা অনেক বেশী উপাদেয়, ঢের বেশী সুখাদ্য, এই কথাই ওঁর মনে হয়েচে। মনে হয়েচে আর উনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেচেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেচেন আর নিজের জিভ

চেটেছেন। তবে কেবল মাঝে মাঝেই—এই যা! সেই নরখাদকের তার তিনি ভুলতে পারেন নি! তার কথা চিরদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে।

পথভ্রষ্ট এই সব উপদ্রব উৎপাত তিনি অনায়াসেই এড়াতে পেরেছিলেন, এসব তো ঘটবেই এবং কেটেও যাবে। কেটেকুটে না গেলেই হোলো। এবং ঠিক যেমন যেমনটি ঘটে থাকে, সাধারণতঃ সব পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই দেখতে পাওয়া যায়, তার কিছুতেই— কোনোখানেই তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। একটুও না। সবই তিনি পেরেছিলেন এবং পেরিয়ে-ছিলেন অবলীলাক্রমেই। কেবল এক ডাকাতরাই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

তারা বলেছে, বাপু তুমি একটি ভূপর্য্যটক। বল্‌তে হবে না, দেখেই টের পেয়েছি। তা' বাপু তুমি যেখানেই যাবে বক্তৃতা ঝাড়্‌বে, হস্তাক্ষর ছাড়বে আর টাকা মারবে। তোমার এত টাকা খাবে কে? আমরা তোমাকে প্রাণে মার্‌তে চাইনে, কেন না তোমাদের মারলে আমাদের লোকসান। তোমরাই আমাদের বন্ধু—হিতৈষী বন্ধু—রোজগারের উপায়—তোমরা মলে' টাকার থলে নিয়ে এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এই সব বিপজ্জনক পথে ভূপর্য্যটন করবে কারা? তোমাদের খতম করলে আমাদেরই ক্ষতি। তোমাদেরও দফা রফা আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ব্যবসা মাটি। না বাপু, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে মেরে ফেল্‌ব এ যদি ভেবে থাকো তাহলে ভুল করেছ। যেমন প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়েচ তেম্‌নি প্রাণ হাতে করে' ফিরে যাও। কেবল সম্মিলিত এই যৌথ কারবারের যেটা আমাদের লভ্যাংশ, আমাদের ভাগের লাভ, সেইটা আগে ফ্যালো দিকি! তার জন্যেই তো এত কষ্ট করে' ঘাঁটি গেড়ে এই জঙ্গলের মধ্যে ওৎ পেতে বসে থাকা—কবে কালেভদ্রে তোমাদের এক আধজন ছিট্‌কে ছট্‌কে এই পথ দিয়ে এসে পড়বে। সুবোধ বালকের মতই এসে যাবে। তা নইলে আর কোন্‌ শিকারের আশায় এত ত্যাগস্বীকার? বল, তুমিই বলো!

ব্রজেশ্বর? ব্রজেশ্বর আর কী বল্‌বে? মুখটি বুজে ওর পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, যা নিয়ে বেরিয়েছিল সবই সেই বনদস্যুদের হাতে গুঁজে দিয়েছে।

এত ফাঁড়া কাটিয়ে এসে অবশেষে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ব্রজেশ্বরকে, পথচারী পদব্রজেশ্বরকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথেই বস্‌তে হয়েচে।

লিলি হাঁ করে' মামার ভোজন-বিলাসিতা দেখ্‌ছিল। প্রাতরাশে বসে বারোখানা টোস্‌ট্‌ গোগ্রাসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। এবং এও মামার প্রথম কিস্তি না। খুব ভোরে যখন উনি ওদের ষ্টেশন থেকে আন্‌তে গেছলেন, সেই সময়ে রেলোয়ে কেবিনে এক সঙ্গে জড়ো হয়ে আর্লি টী'র মারফতে ইতিমধ্যেই আর একপ্রস্ত ওঁর হয়ে গেছ্‌ল—তারপরে এই

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, নিজের বাড়ীতে বসে বিশেষ তোড় জোড়ের সঙ্গে তাঁর এই দু' নম্বর ব্রেক্‌ফাস্‌ট্‌!

মামার খাবার বাহাদুরি !

লিলি হাঁ করে' মামার খাবার বাহাদুরি দেখ্‌ছিল আর মাঝে মাঝে এক ফাঁকে নিজের হাঁ-এর মধ্যে বিস্কুটের টুক্‌রো ভেঙে ভেঙে রপ্তানি কর্‌ছিল, এমন সময়ে শিশির একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে উঠ্‌ল।

শিশির এতক্ষণ নিজের মনে কি যেন ভাঁজ্‌ছিল, কোনো দিকে তাকায়নি, একটিও কথা বলে নি। যত রাজ্যের ভাবনা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে গরম গরম চাখ্‌ছিল যেন। হঠাৎ যেন চা চল্‌কে, চায়ের পাত্রে তুফান তুলে, একটা প্রশ্নপত্র মাঝখান থেকে তার মর্ম্মস্থল ভেদ করে' ঠেলে উঠ্‌ল।

"আচ্ছা মামা, তুমি কোনো নক্সা পাওনি ?" জিজ্ঞেস্ কর্‌ল শিশির।

"নক্সা ? কিসের নক্সা ?"

"এই বাড়ীর কোনো চোর কুঠ্‌রির ? যেখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকোনো রয়েছে ?"

"এ বাড়ীতে চোর কুঠ্‌রি আছে কে বল্লে তোকে ? তুই কি করে' জান্‌লি যে এখানে ধনভাণ্ডার লুকোনো আছে ?" ব্রজেশ্বর সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান।

"এই আন্দাজ কর্‌ছি। এরকম থাকে নাকি ?" শিশির কৈফিয়ৎ দ্যায়ঃ "য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।"

"উঁহু, বইয়ে পড়া কথা নয়।" মামা খুঁৎ খুঁৎ করেন তবুঃ "খুব খারাপ কথা। ভারী ভীষণ কথা এসব।"

"তুমি তাহলে কোনো নক্সা পাওনি ? তাই বলো!"

"কেন, তুই পেয়েছিস্ নাকি ?" ব্রজেশ্বর শাণিত চোখে শিশিরকে বিদ্ধ করতে থাকেন।

"এখনো পাইনি, তবে পাব পাব মনে হচ্ছে।" শিশির বলে কেবল। ক্রমশ

লীনু মাসির পুতুল মেয়ের বিয়ে

শ্রীকমল ঘোষ

লীনুর বয়েস এমন কি আর বছর ছ'য়েক হবে,
হয়তো মাঘে সাতের কোঠায় পা দিয়েছে সবে!
এর বেশী নয়—কখ্যোনো না—কেমন করে হয়,
মাঁ বলেছেন লীনুর বয়েস ইহার বেশী নয়।

ছোট্টো লীনু, দুষ্টু, লীনুর মিষ্টি মুখের হাসি,
কাঁদুক হাসুক মুক্তো ঝরে,—মানিক রাশি রাশি।
টানা টানা চোখ দুটো তার, মণি কাজল কালো,
চাউনী চপল, স্নিগ্ধ কোমল—স্বচ্ছ চাঁদের আলো।
রাঙা টুক্‌টুক্‌ ঠোঁট তুল্‌তুল্‌—নরম ফুলের মত,
রাঙা ঠোঁটে ঝিলিক মারে লালিম হাসি কত।

তার পুতুলের আজকে বিয়ে জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে
পাশের বাড়ীর ছোট্টো রাণুর পুতুল-ছেলে সাথে।
ঝিলিক দিয়ে ঝালোর কেটে, জ্বলছে বিজ্‌লী আলো
ঘুচিয়ে দিয়ে খেলা ঘরের আঁধার-ঘন-কালো।
বাজছে শানাই, উলুধ্বনি, শঙ্খ বাজার ধূম,
পুতুলের বে—লীনুমাসি তাই ভুলেছে ঘুম।
কাজের তাড়া তাই লেগেছে সকাল থেকে তার
একটু বলতে বসার সময় নেইকো আজি আর।
ডলি, লিলি, মঞ্জু, হেনা, বেলা, বেণুর সাথে
কতই কাজ না করছে লীনু ক্লান্তি নেইকো তাতে।
না কল্লে করবে কে আর তার যে মেয়ের বিয়ে
লাল টুক্‌টুক্‌ বর আসবে টোপর মাথায় দিয়ে।

রাত আট্টা, নটায় বিয়ে, ঘন্টা খানেক বাকী।
ফুড়ুত করে যাবে উড়ে দুষ্টু সময়-পাখী।
তাই ভেবে আর লীনুমাসি নেইকো দেরী দেখে
পুতুল মেয়ের চোখে লীনু দিচ্ছে সুরমা এঁকে।
মনের মত সাজিয়ে তাকে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি,
পরিয়ে দিল জরির জামা, কনক চাঁপা শাড়া;
চুমকি চুরের কল্কা তাতে জরির আঁচড় টানা,
পুতুল মেয়ের রঙ মিলিয়ে আজকে কিনে আনা।

দু'কানেতে দিচ্ছে এঁটে ভুঁই চাঁপারি দুল,
লোটন খোঁপায় দিচ্ছে গুঁজে যুঁই চামেলি ফুল।
পরিয়ে দিল শ্বেত চন্নন—লাল চন্নন টীপ,
ঠিক মনে হয় জ্বলছে ভালে রক্ত শিখা দীপ।
গড়ের মালা, মুক্তোর হার দুলিয়ে দিল গলে,
এমনি সময় লিলি এসে হঠাৎ গেল বলে,—
বর এসেছে লাল টুকটুক্ টোপর মাথায় দিয়ে
এসো না ভাই জল্‌দি করে বিয়ের কনে নিয়ে।

দেশকথা

একরত্তি ফুলের মেয়ে

শ্রীমানসী আচার্য্য

সে অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। এক দেশে একনিঃসন্তান স্ত্রীলোক বাস করতেন। তাঁর ভারী ইচ্ছা একটি সন্তান পেতে। এই জন্য' এক ডাইনির কাছে তিনি গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে ডাইনি তাঁকে একটি শস্যের দানা দিয়ে সেটিকে একটি ফুলদানীতে পুঁতে রাখতে বল্ল। স্ত্রীলোকটি ডাইনির কথামত সেটিকে একটি ফুলদানীতে পুঁতে রাখ্‌লেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তার ভিতর থেকে একটি সুন্দর ফুলের কুঁড়ি বার হয়ে এল। তিনি আনন্দে অধীর হয়ে কুঁড়িটিকে চুমু খেতেই কুঁড়িটি ফুঠে উঠ্‌ল, আর তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে! বুড়ো আঙ্গুলের চেয়েও ছোট। কিন্তু কি সুন্দরই না দেখ্‌তে সেই একরত্তি মেয়েটি, ঠিক যেন ডানা কাটা পরী! স্ত্রীলোকটি তাই তার নাম দিলেন ফুলপরী। তারপর তিনি আখরোটের খোলা দিয়ে ছোট্ট দোলনা তৈরী করে তার ভিতর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে নরম বিছানা পেতে দিলেন। স্ত্রীলোকটির মনে আর কোন অভাব রইল না। তিনি ফুলপরীকে নিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

একদিন ফুলপরী যখন তার সেই নরম বিছানাটিতে ঘুমিয়ে আছে এমন সময় একটা কোলা ব্যাং জানালার ভাঙ্গা কাঁচের ফাঁক দিয়ে ঘরে লাফিয়ে পড়ল।

'কী সুন্দর মেয়েটি!' ব্যাংটি আস্তে আস্তে বল্ল, 'একে যদি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারি, তাহলে কি মজাই না হয়!' তারপর সে বারকয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুলপরী শুদ্ধ সেই আকরোটের খোলাটি মুখে করে পাঁচিল টপ্‌কে বাগানে লাফিয়ে পড়ল। সেই বাগানের ভিতরে একটি ছোট পুকুর ছিল আর সেইখানে ব্যাং তার একমাত্র ছেলে নিয়ে বাস করত। সে খোলাটিকে মুখে করে সাঁতরে পুকুরের ঠিক মাঝখানে এল। সেখানে সে একটা মস্তবড় জলপদ্মের পাতার উপর ফুলপরীকে আস্তে করে শুইয়ে দিয়ে খোলাটিকে মুখে করে ছেলের বিয়ের জন্য ঘর সাজাতে গেল। ভোর বেলা ঘুম ভাঙলে ফুলপরী অবাক হয়ে যায়। চারিদিকে থৈ থৈ জল দেখে তার ভারী ভয় করতে লাগল। নিরুপায় হয়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করল।

কতকগুলি মাছ চুপ করে দেখছিল। তাদের ভারী দুঃখ হল সেই একরত্তি সুন্দর
মেয়েটির জন্য। তারা ব্যাংকে জব্দ করবার জন্য সবাই মিলে সেই পাতার বোঁটাটিকে কামড়ে
ধরে টান্‌তে টান্‌তে অনেক দূর নিয়ে গেল, যেখানে ব্যাংরা কিছুতেই পৌঁছুতে
পারেনা।.........

এমন সময় একটা গোবরে পোকা সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ফুলপরীকে দেখে
তার ভারী ভাল লাগল। সে তাকে কোনমতে আঁকড়ে ধরে তুলে নিয়ে একটা গাছের
উপর রেখে ফুলের মধু এনে খেতে দিল। খানিক বাদে গোবরে পোকার দল তাকে দেখতে
এল। 'কি বিশ্রী দেখতে,' তারা বল্লে, 'ঠিক মানুষের মত।' তারপর তারা সব অবজ্ঞা ভরে
মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। যে গোব্‌রে পোকাটি তাকে নিয়ে এসেছিল সে এতক্ষণ তাকে
সুন্দরই ভেবেছিল কিন্তু প্রতিবেশীদের কথায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে একটা
ফুলের উপর বসিয়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল। সমস্ত গ্রীষ্মটা সে একাই বনের মধ্যে কাটিয়ে
দিল অবশ্য সে সময়ের ভেতর সে লতাপাতা দিয়ে তার নিজের জন্য ছোট্ট একটি বিছানা
তৈরী করে ফেল্‌লে, তারপর সেটিকে সে একটা প্রকাণ্ড পাতার নীচে এমন ভাবে টাঙ্গিয়ে
দিল যাতে করে বৃষ্টি এলে তার ভেতর আশ্রয় নেওয়া যায়। ফুলের মধু আর শিশির খেয়ে
ফুলপরী দিন কাটাতে লাগ্‌ল। এমনি ভাবে শীত এসে গেল। যে পাখিরা তাকে গান
শোনাত তারা তাকে একা ফেলে গরম দেশের সন্ধানে উড়ে গেল।

সমস্ত গাছের পাতা ঝরে গেল, আর সমস্ত ফুল শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল। বেচারী
ফুলপরীর তখন কি অবস্থা! তার সমস্ত পোষাক একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছিল। না খেতে
পেয়ে, থাক্‌বার ভাল জায়গা না পেয়ে, অবশেষে একদিন সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন পার
হয়ে এক মাঠের মধ্যে এসে পড়ল। হঠাৎ সেখানে সে একটা ইঁদুরের গর্ত্ত দেখতে পেয়ে
তার ভেতর তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়্‌ল। ক্ষিদেয়, তেষ্টায় আর দারুণ শীতে সে তখন প্রায়
আধ্‌মরা। ইঁদুররা তাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। এরকম অদ্ভুত প্রাণী তারা
কোন দিন দেখেনি। ফুলপরী যখন সব কথা তাদের খুলে বল্লে, তখন তাদের ভারী দয়া
হল। তারা তাকে কিছু খেতে দিয়ে আশ্রয় দিল। ফুলপরী তাদের সব কাজ করে দিত
আর গল্প শোনাত। তারাও তাকে খুব ভালোবাসত আর যত্ন কর্‌ত। একদিন একটি
ছুঁচো তাকে দেখ্‌তে এল।

'ইনি খুব শিক্ষিত আর অবস্থাপন্ন',—ইঁদুরেরা ফুলপরীকে কানে কানে বল্লে, 'এর মস্ত বড়
বাড়ী আছে, আমাদের বাড়ীর চেয়ে দশগুণ বড়।' তারপর তারা তাকে আদর করে বসালো।
ছুঁচোটি ফুলপরীর গান শুন্‌তে চাইল। ফুলপরী তাকে গান গেয়ে শোনালো। সে একেবারে
মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। ইঁদুরেরা এতটা সৌভাগ্য আশা করেনি, তারা আনন্দে

মত দিল। সেই ছুঁচোটি তাদের একটা গর্ত্ত দেখিয়ে দিয়ে তাদের সেখান দিয়ে যাতায়াত
করবার অনুমতি দিল। তারপর সে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তার
পেছনে ইঁদুরেরা আর সর্ব্বশেষে ফুলপরী তার অনুসরণ করতে লাগল। হঠাৎ ফুলপরীর
পায়ে কি একটা ঠেক্‌তেই সে হেঁট হয়ে দেখলো সেটা একটা সোয়ালো পাখীর মৃতদেহ।
সে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখলে তার সবই ঠিক আছে, খালি প্রাণ নেই। আহা! ফুল-
পরী ভাব্‌লে, ওরাই হয়ত বনের মাঝে তাকে গান শোনাত। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।
সে পাখীটির গায়ে হাত বুলিয়ে সব পালক ঠিক করে দিল, তারপর তার বোজা চোখ দুটির
উপর চুমু খেয়ে বল্ল, 'বন্ধু, একদিন হয়ত তুমিই আমায় গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলে,
আর আজ তোমার এই অবস্থা!' সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। সমস্ত রাত্রি সে একেবারে
ঘুমুতে পারলে না। তার কেবল মনে হতে লাগল সেই হতভাগ্য পাখিটির কথা। সমস্ত
রাত্রি জেগে সে শুক্‌নো ঘাস দিয়ে একটি চাদর বুনে ফেলল। ভোর না হতেই সে সেই
চাদরটি নিয়ে গিয়ে পাখীটির সমস্ত শরীর খুব সাবধানে ঢেকে দিল। 'বন্ধু-বিদায়,' সে চুপি
চুপি বল্ল। তারপর পাখীটির বুকে আস্তে করে সে মাথা রাখ্‌লো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
ফুলপরী স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে তার বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ। সে বুঝতে পার্‌লে পাখীটি মরেনি
শুধু অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেছে। সে তাকে ফুলের পাঁপড়ি করে
জল এনে খেতে দিলে। সমস্ত শীতকালটা সে তাকে সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে তুল্‌লো।
ইঁদুরদের কাছে সে এ বিষয়ে কোন কথাই বলেনি, কেননা সে জানতো তারা পাখীদের ভালো
বাসেনা।

বসন্ত কাল এল। পাখীটি তাকে নিয়ে উড়ে যেতে চাইলে। ফুলপরী কিন্তু রাজি
হ'ল না। ইঁদুররা তাকে অসময়ে আশ্রয় দিয়েছিল বলে সে তাদের এ ভাবে ফাঁকি দিয়ে
চলে যেতে চাইল না। পাখীটি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উড়ে চলে গেল। ইঁদুরেরা
এদিকে তার বিয়ের সব ঠিক্ করে ফেলেছে। একদিন তারা তাকে তার বিয়ের সব পোষাক
তৈরী করতে দিয়ে গেল। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কি করে এ বিপদ থেকে
উদ্ধার পাওয়া যায় দিনরাত ভাবতে লাগল। একটা ছুঁচোকে বিয়ে করতে হবে ভেবে তার
মন কেঁদে উঠল। ক্রমে তার বিয়ের দিন এগিয়ে এল আর পোষাক তৈরীও হয়ে গেল।
বিয়ের পর তাকে মাটির নীচে একেবারে গভীর সুড়ঙ্গের ভেতর থাকতে হবে, আর সূর্য্যের
আলো দেখ্‌তে পাবেনা। একদিন সে মুখ ফুটে বলে ফেল্লে যে, ছুঁচোকে কিছুতেই বিয়ে করতে
পারবে না। তারা তখন তাকে কামড়াবে বলে ভয় দেখালে। সে তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে
একবারটির জন্য গর্ত্তের বাইরে এসে দাঁড়াল। 'বিদায়, বন্ধু, চিরজীবনের মত বিদায়! আলো
বাতাস! তোমরা 'সোয়ালো'দের আমার ভালবাসা জানিয়ে দিও।' তার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল

সেই 'সোয়ালো'টিকে দেখ্‌তে! হঠাৎ সে 'কিচির মিচির' শব্দ শুনে উপর দিকে চাইলো। 'কী আশ্চর্য্য সেই সোয়ালো পাখীটি!' সোয়ালোটি তাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে উড়ে এল। 'বন্ধু! বলেছিলাম আবার আস্‌ব, তাই এসেছি। এবারে কিন্তু তোমায় না নিয়ে যাব না।' ফুলপরী তখন তাকে সব কথা খুলে বল্লে। পরে বিয়ের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেল্‌ল। পাখীটি তখনই তাকে পিঠে করে নিয়ে উড়ে চল্‌ল। কত নদী, কত পাহাড়, কত বন পার হয়ে অবশেষে তারা এক গরম দেশে এল।

শ্বেত পাথরের তৈরী এক প্রকাণ্ড দুর্গের চূড়ায় সোয়ালোদের বাড়ী। সে তাকে একটা ফুলের উপর নামিয়ে দিল। জায়গাটি ফুলপরীর ভারী ভাল লাগ্‌ল। সে আনন্দে হাততালি দিতেই দেখ্‌তে পেল সেই ফুলের মধ্যে ঠিক্ তারই মত একরত্তি একটি মানুষ। সেই একরত্তি মানুষটি প্রথমে পাখীটিকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিল। পাখীটি তার কাছে একটা দৈত্যের মত। ফুলপরী যখন তাকে অভয় দিলে তখন সে নিশ্চিন্ত হল। 'ইনি ফুলদের রাজা,' পাখীটি বল্ল। 'কি সুন্দর' ফুলপরী পাখীটির কানে কানে বল্ল। একরত্তি রাজাটিও তাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এত রূপ সে কোনদিন দেখেনি। সে তাকে বিয়ে করতে চাইলো। ফুলপরী আনন্দে মত দিলে। তারপর সেই রাজাটি তার মাথার মুকুট ফুলপরীকে পরিয়ে দিলে। পাখীরা গান গেয়ে উঠ্‌ল। প্রত্যেক ফুলের ভেতর থেকে তাদের মত ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে এসে তাদের কত কি উপহার দিতে লাগল। তার ভেতর থেকে একজোড়া সাদা পাখ্‌না ফুলপরীর খুব পছন্দ হয়েছিল। সেটা তাকে একটা বড় মাছি উপহার দিয়েছিল। ফুলপরী সেটা তার কাঁধে এঁটে নিয়ে উড়ে উড়ে যেখানে খুসী যেতে পারত। তারপর আর কি—সেই থেকে তারা ফুলেদের রাজারাণী হয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

হ্যান্স এণ্ডারসনের গল্প।

ধারাবাহিক উপন্যাস পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কি-পিন্ কাহিনী

খুনোখুনি,হানাহানি বা কোনরকম রোমাঞ্চকর কাণ্ডের কথা পর্য্যন্ত আমি ভাবি নি, কিন্তু দেখ একবার ব্যাপারখানা! এখানেও ছোরাছুরি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি? আবার গুপ্তধন—আবার দুর্ব্বোধ হেঁয়ালি, 'কি-পিন্'? আবার বুঝি আমার চির-চঞ্চল দুষ্টগ্রহটি সজাগ হয়ে উঠেছেন—কলুর বলদের মত আমাদের নাকে দড়ী দিয়ে ঘুরিয়ে মারবার জন্যে?

কুমার ব্যস্তভাবে বললে, "চট্‌পট্ স'রে পড়ি চল ভায়া। নইলে পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

হোটেলের একদিকে থেকে তখনো আসছিল প্রচণ্ড ছুটোছুটি হুড়োহুড়ির শব্দ, নিশ্চয় গুণ্ডাদের সঙ্গে চলছে পুলিসের দাঙ্গা।

সেই ফাঁকে আমরা স'রে পড়লুম। সদর দরজার কাছেও পুলিসের লোক ছিল, বোধহয় আমাদের বাঙ্গালী দেখেই বাধা দিল না।

একেবারে সিধে বাড়ীতে এসে উঠলুম।

হতভাগা রামহরি বুড়ো হয়েছে, তবু তার চোখের জেল্লা কি কম? আমাদের দেখেই বললে, "কার সঙ্গে মারামারি ক'রে আসা হ'ল শুনি?"

—"কে বললে আমরা মারামারি করেছি?"

—"থামো খোকাবাবু, মিছে কথা বলে আর পাপ বাড়িও না। নিজেদের জামা-কাপড়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি। ও আবার কি? কুমারের জামায় যে রক্তের দাগ।"

কুমার হেসে ফেলে বললে, "ধন্যি তুমি রামহরি! পাহারাওলার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলুম কিন্তু—"

—"কি সব্বনাশ, এর মধ্যে আবার পাহারাওলাও আছে? এই বুঝি তোমাদের খেতে যাওয়া? এমন সব খুনে ডাকাত নিয়ে আর যে পারা যায় না। হাড় যে ভাজা ভাজা হয়ে গেল। জামা-টামা খুলে ফ্যালো, দেখি কোথায় লাগল?"

বাঘাও ঘরের কোণে বসে আমাদের লক্ষ্য করছিল। রামহরির কথাবার্ত্তা শুনে ও হাবভাব দেখে তারও মনে বোধ হয় কেমন সন্দেহ জাগল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমাদের জামা-কাপড় শুঁকতে সুরু ক'রে দিলে।

কোনগতিকে মানুষ রামহরি ও পশু বাঘার কবল ছাড়িয়ে, জামা-কাপড় বদ্‌লে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

কুমার বললে, "এইবার ধুক্‌ধুকিখানা বার কর দেখি।"

কুমারের মুখের কথা বেরুতে-না বেরুতেই হোটেলের সেই হতভাগ্য চীনেম্যানের দেওয়া লকেটখানা আমি বার ক'রে ফেললুম—সেখানাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করবার জন্যে আমারও মনের কৌতুহল রীতিমত অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

সাধারনত ধুক্‌ধুকি বা লকেটের আকার যেরকম হয়, এখানা তার চেয়েও বড়। রূপোয় তৈরি এই ধুক্‌ধুকির উপরকার কারুকার্য্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এ হচ্ছে বিখ্যাত হুনুরী চীনে কারিকরের কীর্ত্তি!

কারিকুরির মাঝখানে একটি মুর্ত্তি আঁকা রয়েছে। মূর্ত্তিটি এত ছোট যে, ভালো ক'রে দেখবার জন্যে অনুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হল।

পাকা শিল্পী এতটুকু জায়গার মধ্যে অতিসূক্ষ্ম রেখায় সম্পূর্ণ-নিখুৎ এক মূর্ত্তি এমন কায়দায় ক্ষুদে ফুটিয়ে তুলেছে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু কি কুৎসিত মূর্ত্তি। মস্ত ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা এক চেহারা, দুইচোখ দিয়ে বেরুচ্ছে যেন ঐশ্বর্য্যের বা ক্ষমতার দর্প, মুখের ফাঁক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বড় বড় আটটা দাঁত এবং পা রয়েছে তিনখানা।

বললুম, "কুমার, এ হচ্ছে কোন খেয়ালী শিল্পীর উদ্ভট কল্পনা, এর মধ্যে কিছু বস্তু নেই। এইবার ধুক্‌ধুকির ভিতরটা দেখা যাক্।"

আঙুলের চাপ দিতেই ধুক্‌ধুকির ডালা খুলে গেল। ভিতরে রয়েছে একখানা ভাঁজ-করা খুব-পুরু কাগজ—প্রায় কার্ড বললেও চলে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। যদিও তার উপরে কোন লেখা নেই, তবু একটা নূতনত্ব আছে বটে।

চাম্‌ড়ার বা ধাতুর চাদরের উপরে যেমন নক্সা emboss করা থাকে, এর উপরেও রয়েছে তেমনি-উঁচু ক'রে-তোলা কতকগুলো 'ডট্' বা বিন্দু। কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাও চারটে বা আরো বেশী বিন্দু।

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, "ও বিমল, এ আবার কি-রকম ধাঁধা হে?"

—"চীনে-ধাঁধা হওয়াই সম্ভব। বাঙালীর মাথায় ঢুকবে না।"

ধুক্‌ধুকির ভিতর থেকে আর কিছুই আবিষ্কার করা গেল না।

কিন্তু বিন্দুগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে, নইলে এত যত্নে কেউ এই কাগজখানাকে ধুক্‌ধুকির ভিতরে পুরে রেখে দিত না। সেই মৃত চীনেম্যানটা মরবার আগে যে দু-তিনটে কথা বলে গিয়েছিল তার দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, ছুন্-ছিউ নামে কোন দুরাত্মা তাকে আক্রমণ করেছিল এই ধুক্‌ধুকি লোভেই। সে এমন ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে, 'কি-পিন্' নামক স্থানে গেলে গুপ্তধন' পাওয়া যাবে, আর তার রহস্য এই ধুক্‌ধুকির মধ্যেই লুকানো আছে।

কুমার বললে, "বিমল, প্রথমে যখন আমরা রূপনাথ গুহায় গুপ্তধন আনতে যাই, * তখন মড়ার মাথায় সাঙ্কেতিক লিপির পাঠ উদ্ধার করেছিলে তুমিই। এ-বিষয়ে তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভালো ক'রে ভেবে দেখ, এবারেও তুমি সফল হবে।"

এক ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেল, বিন্দুগুলো নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করলুম, কিন্তু ব্যর্থ হ'ল আমার সকল চেষ্টাই।

শেষটা সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললুম, "চুলোয় যাক্ ধুক্‌ধুকির রহস্য! তার চেয়ে 'কি-পিন্' কথাটা নিয়ে আলোচনা করি এস। কি-পিন্ কোথায়?"

কুমার বললে, "কি-পিন্ হয়তো চীনে মুল্লুকের কোন জায়গা।"

—"সম্ভব। যাও তো কুমার, আমার লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এস 'এন্‌সাইকোপিডিয়া' আর 'গেজেটিয়ার'!"

কুমার তখনি ছুটে গেল আর বই নিয়ে ফিরে এল। দুজনে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। কোথাও 'কি-পিন্' নামে কোন দেশের কথাই লেখা নেই।

---

* আমার লেখা "যকের ধন" উপন্যাস দ্রষ্টব্য। ইতি—লেখক।

কুমার বললে, "মরবার সময়ে সেই চীনেবুড়ো যে আমাদের সঙ্গে 'প্রাক্টিকাল জোক্' ক'রে গেছে, এ-কথা বিশ্বাস হয় না। 'কি-পিন্' ব'লে কোন জায়গা নিশ্চয়ই আছে।"

আমি বললুম, "থাকতে পারে। কিন্তু হয়তো সেটা একটা তুচ্ছ গণ্ডগ্রাম, বাইরের কেউ তার কথা জানে না।"

সেদিন এই পর্য্যন্ত। কুমার বাড়ী ফিরে গেল। আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের ঘোর এসে মুছে দিলে কি-পিন, ধুক্‌ধুকি আর গুপ্তধনের রহস্য!

পরের দিন সকাল-বেলা। আমি আর কুমার চা পান করছি, বাঘাও এসে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে তার প্রভাতী দুধের বাটির লোভে।

এমন সময়ে কমলকে নিয়ে বিনয়বাবু এলেন। যাঁরা আমাকে চেনেন এ-দুজনেরও সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁদের পরিচয় আছে।

সকাল-বেলায় পরীক্ষা করতে করতে ধুক্‌ধুকিখানা চায়ের টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলুম, বিনয়বাবু এসেই সেখানা দেখতে পেয়ে বললেন, "ওটা কি হে বিমল?"

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল বিনয়বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা। সারা জীবন ধ'রে তিনি জ্ঞান-সমুদ্রের ডুবুরীর কাজ ক'রে আসছেন। আজ বয়সে পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তবু বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়া আর কোন আনন্দই তাঁর নেই। তিনি হচ্ছেন আশ্চর্য্য এক বৃদ্ধ ছাত্র এবং এই বিশ্ব হচ্ছে তাঁর কাছে বিদ্যালয়ের মত। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব—যে কোন বিষয় নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছি, কখনো সঠিক উত্তরের অভাব হয় নি। কুমার তো তাঁর নাম রেখেছে—'জীবন্ত অভিধান'! কাজেই তাঁকে পেয়ে আশান্বিত হয়ে ধুক্‌ধুকিটা তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে তুলে দিলুম।

বিনয়বাবুর দুই চোখ ধুক্‌ধুকির দিকে চেয়েই কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, "আরে, এ-রকম লকেট তো কখনো দেখি নি! এটা তো এদেশে তৈরি নয়! হুঁ, চীনের জিনিষ। কোথায় পেলে?"

—"এক চীনেম্যানের দান। কিন্তু ওপরের ঐ মূর্ত্তিটা কি অদ্ভুত দেখছেন?"

—"অদ্ভুত? হ্যাঁ, মূর্ত্তির মুখখানা চীনে-ছাঁদের বটে, কিন্তু আসলে এ হচ্ছে আমাদেরই পৌরাণিক মূর্ত্তি!"

সবিস্ময়ে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, "এ হচ্ছে হিন্দু যক্ষরাজ কুবেরের চেহারা! অষ্টদন্ত, তিনপদ। উদ্ভট, কুৎসিত চেহারার জন্যেই যক্ষরাজের নাম হয়েছে কুবের। তবে ঐশ্বর্য্যের মহিমায় তাঁর শ্রীহীনতার দুঃখ বোধহয় দূর হয়েছে।"

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, আপনি কুবেরকে তো চিনলেন! কিন্তু বলতে পারেন, 'কি-পিন্' ব'লে কোন জায়গা আছে কিনা?"

বিনয়বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "কি-পিন্? ......কি-পিন্। হুঁ, নামটা শুনেছি বোধহয়। বুড়ো হয়েছি, ফস্ ক'রে সব কথা স্মরণ হয় না। রও ভায়া, মনে করবার জন্যে একটু সময় দাও।"

আগ্রহ-ভরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মিনিট তিনেক পরেই সমুজ্জ্বল মুখে বিনয়বাবু বললেন, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! কিন্তু 'কি-পিন্' নিয়ে তোমাদের এমন আশ্চর্য্য মাথাব্যথা কেন? তোমরা কি আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ?"

আমি বললুম, "রক্ষে করুন, আমাদের ইতিহাসবিদ ব'লে উপহাস করবেন না। আমরা খালি জানতে চাই কি-পিন্ কোন্ দেশ?"

—"কি-পিন্ বা কা-পিন্ হচ্ছে অনেক শতাব্দী আগেকার নাম। নামটি দিশীও নয়, চীনে। সপ্তম শতাব্দীতে কি-পিন্ বলতে বোঝাত উত্তর-পূর্ব্ব আফগানিস্থানের কপিশ নামে জায়গাকে। তার আগে আর এক সময়ে ভারত-সীমান্তের গান্ধার প্রদেশকেও কি-পিন্ ব'লে ডাকা হ'ত। চীনে লেখকরা ভারতের আরো কোন কোন দেশকে কি-পিন্ বা কা-পিন্ নামে জানতেন। তোমরা কোন্ কি-পিনের কথা জানতে চাও বুঝতে পারছি না। তবে সপ্তম শতাব্দীর কি-পিন্ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক একটি অদ্ভুত গল্প বলেছেন, তোমাদের ধুক্‌ধুকির উপরে কুবেরের মূর্ত্তি দেখে সেটা আমার মনে পড়ছে।"

আমি বললুম, "আচ্ছা বিনয়বাবু, আগে গল্পটাই শুনি।"

বিনয়বাবু চেয়ারের উপরে হেলে প'ড়ে বলতে লাগলেন, "এই ঐতিহাসিক গল্প নিয়েও অল্পবিস্তর মতান্তর আছে, ও-সব গোলমালের মধ্যে ঢুকে দরকার নেই। চীনা পর্য্যটক হুয়েন্ সাংয়ের ভ্রমণ আর জীবন কাহিনীতে যে গল্পটি আছে, সেইটিই তোমাদের কাছে বলব। ভিন্‌সেণ্ট এ, স্মিথের "Early History of India" নামে বিখ্যাত ইতিহাসেও (২৭৭ পৃষ্ঠায়) এ গল্পটি পাবে। কিন্তু গল্পটি বলবার আগে আমাকে আরো কয় শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে।

"শক-জাতীয় কণিষ্ক তখন ভারত-সম্রাট। দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। তখন সারা এসিয়ায় চীনাদের বড় প্রভুত্ব। শকরা ভারত দখল ক'রেও চীনাদের কর দিতে বাধ্য ছিল। দু-একবার বিদ্রোহ প্রকাশ ক'রেও চীনাদের কাছে তারা সুবিধা ক'রে উঠতে পারে নি। সম্রাট কণিষ্কই সর্ব্বপ্রথমে চীনাদের জাঁক ভেঙে দিলেন। তিনি কেবল কর দেওয়াই বন্ধ করলেন না, তিব্বত ছাড়িয়ে চীন-সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে প'ড়ে দেশের পর দেশ জিতে তবে ফিরে এলেন এবং আসবার সময়ে জামিন স্বরূপ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন চীনের কয়েক-জন রাজপুত্রকে—কেউ কেউ বলেন, তাঁদের মধ্যে চীন-সম্রাটেরও এক ছেলে ছিলেন।

"আফগানিস্থানকে সে-সময়ে ভারতেরই এক প্রদেশ ব'লে ধরা হ'ত। চীন-রাজপুত্ররা শীতের সময় পাঞ্জাবে থাকতেন; আর গরমের সময়ে থাকতেন আফগানিস্থানে, 'শা-লো-কা' নামে বৌদ্ধ হীনযান-সম্প্রদায়ের এক মঠে। ঐ মঠটি ছিল কপিশ পাহাড়ের এক ঠাণ্ডা উপত্যকায়। এ কথা বোধ হয় না বললেও চলবে যে, তখন পৃথিবীতে মুসলমান-ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়নি। আফগানিস্থানে তখন বাস করত হিন্দু আর বৌদ্ধরাই। আজও আফগানিস্থানের চারিদিকে তখনকার বৌদ্ধ মঠের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

"কিছুকাল পরে চীন-রাজপুত্রদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হ'ল। যাবার সময়ে তাঁরা 'শা-লো-কা' বা কপিশ মঠকে দান ক'রে গেলেন বিপুল বিত্ত, তাল তাল সোনা, কাঁড়ি কাঁড়ি মণি-মুক্তা! সেকালের সেই ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ একালে হয়তো হবে কোটি কোটি টাকা! চীন-রাজপুত্ররা কেবল টাকা দিয়েই গেলেন না, ভারতকে শিখিয়ে গেলেন নাস্‌পাতি ও পীচ্-ফল খেতেও। তাঁরা আসবার আগে এ-অঞ্চলে ও-দুটি ফলের ফসল ফলত না।

"এইবার হুয়েন্ সাংয়ের কথা। তিনি ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। শা-লো-কা বা কপিশ মঠে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে গিয়ে বর্ষাকালটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অত দিন পরেও মঠের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দ্বিতীয় শতাব্দীর সেই চীন-রাজপুত্রদের অসাধারণ দানের কথা নিয়ে হুয়েন্ সাংয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেন নি।

"সন্ন্যাসীরা আর এক বিষয় নিয়ে হুয়েন্ সাংয়ের কাছে ধর্ণা দিলেন। সন্ন্যাসীরা বললেন, কপিশ মঠে যক্ষরাজ কুবেরের প্রকাণ্ড এক পাথরের মূর্ত্তি আছে এবং তাঁরই পায়ের তলায় পোঁতা আছে চীন-রাজপুত্রদের দেওয়া অগাধ ঐশ্বর্য্য।

"সেই ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করবার জন্যে হুয়েন্ সাংকে অনুরোধ করা হ'ল। হুয়েন্ সাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা যখন গুপ্তধনের সন্ধান জানেন, তখন আমাকে অনুরোধ করছেন কেন?' সন্ন্যাসীরা জানালেন, 'ভয়াবহ যকেরা ঐ গুপ্তধনের উপরে পাহারা দেয় দিন-রাত! একবার এক অধার্ম্মিক রাজা গুপ্তধন অধিকার করতে যান। কিন্তু যকেরা এমন উৎপাত সুরু করে যে রাজা প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আমরাও যতবার গুপ্তধন নেবার চেষ্টা করেছি ততবারই ভৌতিক উৎপাত হয়েছে। রাজপুত্ররা অর্থ দিয়েছিলেন মঠের উন্নতির জন্যে। কিন্তু সংস্কার অভাবে মঠের আজ অতি দুর্দ্দশা হ'লেও ধন-ভাণ্ডারে হাত দেবার উপায় নেই। আপনি সাধু ব্যক্তি। আপনার উপরে হয়তো যকেরা অত্যাচার করবে না।'

"হুয়েন্ সাং রাজি হ'য়ে ধূপ-ধুনো জ্বেলে উপাসনা ক'রে যক্ষদের উদ্দেশে বললেন, 'হে যক্ষ, হে গুপ্তধনের রক্ষক! আমার উপরে প্রসন্ন হও! আমি মন্দির-মঠের মেরামতির জন্যে যে-অর্থের দরকার কেবল তাই নিয়ে বাকি সব ঐশ্বর্য্য যথাস্থানে রেখে দেব!'

"যকেরা হুয়েন্ সাংকে বাধা দিলে না। গুপ্তধনের অধিকাংশই হয়তো এখনো মাটির তলায় লুকানো আছে। আমার গল্প ফুরুলো।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমাদের গল্প এইবার সুরু হবে!"

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসু চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "তার মানে?"

—"পরে সব বলছি। আপনার এই ঐতিহাসিক গল্পটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অন্ধকারের মধ্যে একটু-একটু আলো দেখতে পেয়েছি বটে, কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। ধাঁধায় প'ড়ে আছি এই কাগজখানা নিয়ে। এর রহস্য উদ্ধার করতে পারেন কি?" ব'লেই আমি ধুক্‌ধুকির ভিতর থেকে পুরু কাগজখানা বার ক'রে তাঁর হাতে দিলুম।

বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়েই সহজ স্বরে বললেন, "এ তো দেখছি 'ব্রেল্'-পদ্ধতিতে লেখা!"

কুমার লাফিয়ে উঠে বললে, "ব্রেল্-পদ্ধতিতে লেখা? অর্থাৎ যে-পদ্ধতিতে অন্ধেরা লেখাপড়া করে?"

—"হ্যাঁ। এই পদ্ধতিতে এক থেকে ছয়টি মাত্র বিন্দুকে নানাভাবে সাজিয়ে বর্ণমালা প্রভৃতির সমস্ত কাজ সারা যায়। আমি অন্ধ না হ'লেও কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এ পদ্ধতিটা শিখে নিয়েছি!"

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললুম, "তাহ'লে লেখাটা আপনি এখনি পড়তে পারবেন?"

—"নিশ্চয়! খুব সহজেই!"

কুমার আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বলে উঠল, "জয়, বিনয়বাবুর জয়!"

ক্রমশ

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য—?

প্রাচীন যুগের :—

১। মিশরের পিরামিড ২। অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্ত্তি ৩। ব্যাবিলনের ঝুলন উদ্যান ৪। ফ্যারোস বা আলেকজেন্‌ড্রিয়ার লাইটহাউস ৫। ইফেসুস্‌এর ডায়নার মন্দির ৬। রোডস্‌এর সূর্য্য মূর্ত্তি ৭। হালিকার্নেসাস্‌এর মুসোলামএর সমাধি মন্দির।

মধ্য যুগের :—

১। আলেকজেন্‌ড্রিয়ার ক্যাটাকুম্ব ২। রোমের এ্যাম্পিথিয়েটার ৩। চীনের প্রাচীর ৪। স্যালিসবারির পাথরের মন্দির ৫। ন্যানকিনের পোর্সিলিন টাওয়ার ৬। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌এর সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ ৭। পিসার হেলান টাওয়ার।

বর্ত্তমান যুগের :—

১। টেলিস্কোপ ২। মাইক্রস্কোপ ৩। স্পেকট্রোস্কোপ ৪। সেলিনিয়াম সেল্ (যাহা আলোকরশ্মিকে বিদ্যুতে পরিণত করিতে পারে) ৫। বেতার ও টেলিভিসন ৬। টকি ৭। এরোপ্লেন।

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

এবারে কালবৈশাখী ক'রেছিল কলকাতাকে 'বয়কট্'। বরাবরই সে ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যেই দেখা দেয় এবং সঙ্গে আসে তার অল্পবিস্তর বৃষ্টিধারা। আজ পর্য্যন্ত আমি তাকে এই বাৎসরিক কর্ত্তব্যপালনে অমনোযোগী হ'তে দেখিনি।

কিন্তু এবারে সে ছিল অদৃশ্য। এমন কি বৈশাখের তিন-তিনটে দিন গেল, অথচ আকাশ থেকে ঝরল না একটি ফোঁটা জল! রোজই বৈকালে তৃষিত চোখে মুখ তুলে দেখি কাঠ-ফাটা রোদে পুড়ে ঝল্সে যাচ্ছে আকাশের নীলিমা। ধূলোয় ধূসর কল্কাতায় জাগল নাগরিকদের হাহাকার।

ঠিক এই সময়ে আমাদের 'রংমশালের দল' রেডিয়োর আসরে ব'সে একতানে ধরলে যখন গান—

জাগো জাগো কালবৈশাখী!
আর থেকোনা সুপ্ত হে—

আকাশে ছিল না তখন একখানা মেঘ।

কিন্তু 'বৈশাখি'র পালা শেষ হবার পরই রেডিয়ো অফিস থেকে পথে বেরিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, পশ্চিম আকাশ ভ'রে গিয়েছে কালো কালো কালো মেঘে আর মেঘে!

এ যে অবাক কাণ্ড! মনে মনে বল্লুম, ধন্য 'রংমশালের দল', ধন্য! সারা দেশ গোটা ফাগুন, চৈত্র মাস ধ'রে কোটি কোটি কণ্ঠে ডেকেও যার সাড়া পায় নি, 'রংমশালের দলে'র কাতর আরজি বেতারে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে শূন্যে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হ'ল তার অভাবিত আবির্ভাব! উড়ল মেঘের কাজল-কালো পতাকা, বাজল ঘন ঘন বাজের দামামা, ফুটল বিজলীর আলো নিয়ে ছিনিমিনি-খেলা, ঝর্‌ল ঝরো-ঝরো জলের ঝরণা! 'রংমশালের দলে'র বাহাদুরি আছে বৈকি!

এ-রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার আমার জীবনে আরো বার-কয়েক ঘটেছে।

ছেলেবেলায় একদিন আমি ও আমার খুড়্তুতো ভাই শক্তি আমাদের পাথুরে-ঘাটার বাড়ীর ছাদের উপরে খেলা করছি। বাড়ীর সামনেই তখন গলির ওপাশে ছিল ঘোষেদের লম্বা একতালা আস্তাবল-বাড়ী।

ছেলেমানুষির কোন খেয়ালে হঠাৎ বললুম, "ছাখ্ শক্তি, আমি যা বল্‌ব এখুনি তা ফ'লে যাবে!"

শক্তি বললে, "ইস্!"

—"বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখ্‌বি? আমি যদি বলি, তাহ'লে ঐ আস্তাবল-বাড়ীর ছাদ এখুনি ভেঙে পড়বে।"

কেন যে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বিশেষ ক'রে ঐ কথাটাই বেরুলো তা জানিনা, কিন্তু কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই সেই পাকা আস্তাবল-বাড়ীর একাংশের ছাদ ভেঙে পড়ল হুড়মুড় ক'রে।

শক্তি বিপুল বিস্ময়ে হাঁ ক'রে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। আমি নিজেও রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলুম।

আর এক দিনের কথা বলি। বছর উনিশ-বিশ আগেকার কথা।

আমার বাল্যবন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ হালদার ও আরো দুজন সঙ্গীর সঙ্গে পি, সেট কোম্পানীর বাগানে (বোধহয় দমদমায়) যাচ্ছি। সরু একটা পথ, তার একদিকে একটানা ঝোপঝাপ।

হঠাৎ কি মনে হ'ল, বললুম, "দেখ নরেন, এই ঝোপ থেকে এখনি যদি একটা সাপ বেরিয়ে পড়ে?"

নরেন কোন জবাব দেবার আগেই পাশের ঝোপ থেকে ফস্ ক'রে বেরিয়ে পড়ল মাঝারি আকারের একটা কালো সাপ! কি সাপ বুঝতে পারলুম না, কারণ দেখা দিয়েই সে বিদ্যুৎ-বেগে আবার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

অবশ্য, এর মধ্যে আমার নিজের কোন বাহাদুরি নেই। এই ধরণের ঘটনা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই ঘটে। হয়তো পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে আট-দশ বৎসর দেখা নেই, তার কথাও ভাবি নি। হঠাৎ একদিন অকারণেই তাকে মনে পড়ল এবং ঠিক সেইদিনেই হ'ল তার আকস্মিক আবির্ভাব!

উপরে যে দুটি ঘটনার উল্লেখ করলুম, ও-রকম ঘটনা আমার জীবনে আরো ঘটেছে, কিন্তু এখানে আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে 'রংমশালের দলে'র আবাহন-গীতির সঙ্গে সঙ্গেই কালবৈশাখীর বিস্ময়কর উদয় দেখে আর-একটি মজার ঘটনা মনে প'ড়ে গেল।

আমি তখন বালক। মা-বাবার সঙ্গে থাকি সুদূর রাওলপিণ্ডির পে-অফিস লেনে। রাস্তাটির অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, কিন্তু তখন সেখানে বাস করতেন প্রধানত বাঙালীরাই।

সেখানে একটি প্রাচীন ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁর আসল নাম ভুলে গিয়েছি। কিন্তু মনে আছে, সবাই তাঁকে 'খুড়ো' ব'লে ডাকতেন।

খুড়োর ভারি গানের সখ ছিল, নিজেকে তানসেন-জাতীয় ব'লে মনে করতেন।

কিন্তু পাড়ার লোকের ধারণা ছিল অন্যরকম। কারণ প্রতিদিন যখন তানপূরো নিয়ে খুড়ো ভগ্ন-কণ্ঠে দীর্ঘকালব্যাপী আর্ত্তনাদ বা সঙ্গীতসাধনায় নিযুক্ত হতেন, তখন পাড়ার লোকের প্রাণের ও কাণের অবস্থা হয়ে উঠত দস্তুরমত ভয়াবহ।

এক সন্ধ্যায় খুড়ো তানপূরোর 'তব্‌লি'তে চাঁটি মেরে গান ধরেছেন বিকট স্বরে। সে কী গান!

পাড়ার কেউ কেউ আর সইতে না পেরে খুড়োর কাছে গিয়ে করলেন প্রবল প্রতিবাদ।

খুড়ো ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "তোমরা তো আচ্ছা অরসিক হে! জানো, সঙ্গীতের মতন বিদ্যে নেই! জানো, আজ তিনমাস এখানে বৃষ্টি হয় নি?"

—"বৃষ্টি হয় নি তো হয়েছে কি?"

—"হয়েছে কি? বৃষ্টি হয় নি ব'লেই তো আমি 'মেঘমল্লার' ধরেছি!"

—"যাও যাও খুড়ো, বাজে বোকো না। তোমার গান শুনলে বৃষ্টিও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না! ঐ গানে বৃষ্টি আসবে!"

—"কী! আসবে না? জানো তানসেন 'দীপক' গাইলে আগুন জ্বলত, মল্লার ধরলে বৃষ্টি পড়ত?"

—"থো কর খুড়ো, তানসেনের কথা থো কর! আমাদের কথা হচ্ছে, তোমার গান আর সহ্য করা অসম্ভব। আমরা হয় প্রাণে মারা পড়ব, নয় পাগল হয়ে যাব?"

—পাড়ার লোকের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রেই এল ঝম্ ঝম্ ক'রে জল।

শেষ-রাতে আমাদের বাড়ীর সদর-দরজার কড়া এমন বিষম উৎসাহে নড়তে লাগল যে, বিছানা ছেড়ে উঠে বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

দরজা খুলেই দেখা গেল লণ্ঠনধারী খুড়োকে।

—"কি খুড়ো, ব্যাপার কি? কোন বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি?"

—"বলি, আরো চাই নাকি?"

—"কি আরো চাইব?"

—"কি আবার! বৃষ্টি হে, বৃষ্টি! আমার মেঘমল্লারের মাহাত্ম্যটা দেখলে তো? বৃষ্টিকে কাণ ধ'রে টেনে এনেছি—বুঝলে হে?" বলতে বলতে খুড়ো চ'লে গেলেন এবং তার-পরেই পাশের বাড়ীর দরজায় ঘন ঘন বেজে উঠল কড়াজোড়া।

পরদিন সকালে উঠে শুনলুম, সে-পাড়ার কোন বাড়ীর কড়াই সে-রাতে খুড়োর কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করে নি।

এতদিনে খুড়ো নিশ্চয়ই লোকান্তরে গমন করেছেন। পৃথিবীকে বঞ্চিত ক'রে হয়তো তিনি ধন্য করেছেন স্বর্গসভাকে। কিন্তু মাভৈ, চিন্তারও কারণ নেই। খুড়ো নেই, আমাদের 'রংমশালের দল' আছে, অনাবৃষ্টির সময়ে তোমরা এই দলটিকে গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ কোরো। ইতি—

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চলন্তিকা

তোমরা শুনে খুসী হবে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভারতী সাহিত্য সভার উদ্যোগে কলিকাতায় শীঘ্রই কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা, আনন্দবাজারের 'আনন্দ মেলা,' মৌমাছি, দিদিভাই এবং 'রংমশাল' ও 'মৌচাক' প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের পত্রিকা এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবেন। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ অভিনয় ও ভ্যারাইটির আয়োজন করা হবে। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইটিকে নাট্যরূপ দিয়ে "শিশুরবি" নামে একটি চমৎকার নাটক রচনা করা হয়েছে। রচনা করেছেন আনন্দমেলার মৌমাছি। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার ছবি তোমরা দেখতে পাবে। সামান্য দামের টিকিটের * ব্যবস্থা করা হবে যাতে করে তোমরা সকলে যোগ দিতে পার। আমরা আশাকরি রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠকপাঠিকারা সদলবলে হাজির থাকবেন। সমস্ত বিজ্ঞপ্তি, খবরাখবর ও তারিখ খবরের কাগজে বিশেষ করে আনন্দবাজারে সময়মত দেখতে পাবে। এই নাটকটির অভিনয় কলিকাতা রেডিয়োর দ্বারা 'রিলে' করার আয়োজন করা হবে। এই 'রিলে' করার আয়োজন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জন্য। তিনি অসুস্থ, নিজের জায়গা থেকে নিরিবিলিতে নাটকটি বেতারে শুনবেন। তোমরা হয়ত অনেকে জানো না, রবীন্দ্রনাথ নিজে নাটকে অভিনয় করতে খুব ভাল বাসতেন এবং তাঁর চমৎকার অভিনয়ের কথা যাঁরা একবার দেখেছেন তাঁরা আজও ভুলতে পারেন নি। ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে যখন রবীন্দ্রনাথ সহযোগিদের নিয়ে তাঁর প্রিয় ভূমিকায় নামতেন, তখন নাটমন্দিরে লোক ধরত না। আজ তিনি অসুস্থ। প্রার্থনা করি, তিনি আশু নিরোগ হয়ে উঠে আবার গানে কবিতায় ও তাঁর মধুবাণীতে আজকের ভারতবাসীকে পুনঃর্জীবিত করে তুলুন।

দক্ষিণ ভারত-মহাসাগরে; শোনা যায়, কয়েকটি অতি আশ্চর্য্য দ্বীপপুঞ্জ আছে। বৈজ্ঞানিক অভিযান দল এই সব দ্বীপের উদ্দেশ্যে প্রায়ই পাড়ি দিয়ে থাকেন। অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝামাঝি ভারত মহাসমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে সেটির নাম গোল দ্বীপ বা রাউণ্ড আইল্যাণ্ড। শোনা যায়, এই দ্বীপে কোথায় নাকি বিপুল ভাণ্ডার লুকানো আছে। প্রায় পাঁচশ বছর আগে, স্পেনদেশীয় এক জাহাজ এই দ্বীপের কাছে ভীষণ ঝড়ে নাকি জলমগ্ন হয় এবং যে সব যাত্রীরা জীবিত ছিল তারা জাহাজের ধন দৌলত নিয়ে গোল দ্বীপে কোন রকমে সাঁতরে আসে। পরে সাপ ও নানারকম সাংঘাতিক সরিসৃপের আক্রমণে তারা প্রাণ হারায়। এই ছোট দ্বীপটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ ও হিংস্র সরিসৃপের রাজত্ব। এদের ভয়ে এ পর্য্যন্ত কোন অভিযান দল সেই স্প্যানিস জাহাজের ধনরাশি উদ্ধার করতে পারেন নি। এবার নাকি আর একটি এ্যাডভেঞ্চারের দল এই সাপুড়ে দ্বীপটির উদ্দেশ্যে

* রংমশাল কার্য্যালয়ে এবং অন্যত্র সময়মত টিকিট পাওয়া যাবে। যারা ছোট তাদের টিকিটের মূল্য চার আনা আর যারা বড় তাদের টিকিট আট আনার।

পাড়ি দিয়েছে। জুয়ান-দে-নোভা বলে ভারত সমুদ্রে আর একটি আশ্চর্য্য দ্বীপ আছে, সেটা নাকি অসংখ্য কুকুরের একছত্র রাজত্ব। এই দ্বীপে আর কোন প্রাণী নেই—কি খেয়ে যে কুকুরেরা বেঁচে থাকে তা একটা বিস্ময়। সম্ভবতঃ তারা জল থেকে মাছ ধরে খায় বা শাক-সবজী খেয়ে জীবন রক্ষা করে। এই কুকুরগুলো নাকি অত্যন্ত হিংস্র। কারগুয়েলেন বলে আরও একটি আশ্চর্য্য দ্বীপ আছে—সেটিও নাকি এক জাতীয় কুকুরের দেশ। তবে একটু অন্য রকমের কুকুর। পূর্ব্ববর্ণিত দ্বীপের কুকুরের মত হিংস্র নয়, এরা অত্যন্ত ভীরু। জাহাজের নাবিকরা এই দ্বীপের নাম দিয়েছে—ভুতুড়ে দ্বীপ, কারণ এই দ্বীপটীতে কেবল সাদা লোমওলা কুকুরই দেখা যায়—আর যাদের কখনও ডাকতে শোনা যায়নি আর একটু শব্দ পেলেই যাদের আর দেখা যায় না। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এই অদ্ভুত কুকুরগুলো বোধহয় ডাকতে ভুলে গিয়েছে! এরা একেবারে বোবা ও নিঃশব্দচারী। আশাকরি অভিযানকারীর দল ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য্য দ্বীপগুলির অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা আমাদের শোনাবেন।

সত্যি অতি তুচ্ছ কারণে আমরা মারামারি করে মরছি। তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে দেখেছ এবং ভেবে দেখেছ কোথায় কি কারণে দাঙ্গা হয়ে গেল। ঢাকা, আমেদাবাদ, বোম্বাই, কানপুর, বিহার—প্রায় সমস্ত পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব ভারত নিষ্ঠুর দানবের নৃশংসতায় ভরে গেল। আমদের আজ ভেবে লজ্জা আসছে দুঃখ হচ্ছে। নিশ্চয় তোমরাও আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছ। কিন্তু শুধু দুঃখ ও লজ্জা দিয়ে আমাদের এই সঙ্কীর্ণতা দূর করা যাবে না। পরস্পরকে ভালবাসতে হবে ছোট খাটো দোষ সহ্য করে নিতে হবে। তোমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এর জন্য অবসর মত একটু ভেবো, বড় হয়ে মানুষকে মানুষের মত ভালবেসো।

কলিকাতায় 'বাইটন কাপ' খেলা শেষ হয়ে গেল। ফাইনালে ভারত-বিখ্যাত ভোপাল ও ভগবন্ত—এই দুটি দল তাদের ভাগ্য পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ল। ভারতবর্ষে হকি খেলায় এ দুটি দলই খুব নাম কিনেছে। ভোপাল গত বছরের বাইটন কাপ জয়ী—গত বছর ফাইনালেও ভোপাল ও ভগবন্ত ক্লাব একদলে খেলা হয়েছিল। ভগবন্ত ক্লাবের ভাগ্য খারাপ ছিল। এবার এই ক্লাবটি বম্বের আগা খাঁ কাপ ও দিল্লীর যাদবেন্দ্র কাপ জয়ী হয়েছে। সকলে তাই ভেবেছিল ভগবন্ত ক্লাব গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে আর ভোপালও তাদের গৌরব বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাই তুমুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে বাইটন ফাইনাল খেলা সুরু হয়েছিল! কিন্তু হায়, কোনদলই জিততে পারল বা, অতিরিক্ত সময় খেলেও না। উভয় উভয়কে একটি মাত্র গোল দেওয়ায় খেলার ফলাফল সমান সমান হ'ল। বাইটন কাপ নিয়মানুযায়ী স্থির করা হ'ল—উভয় দলই ৬ মাস করে কাপটি তাদের কাছে রাখতে পারবে। 'টস্'এ ভগবন্ত জিতে গেল। ভগবন্ত ক্লাব প্রথম ৬ মাস কাপটি তাদের কাছে রাখবে স্থির হ'ল। বাইটন কাপ খেলার ইতিহাসে এই প্রথম—কাপটি দুই দলে ভাগাভাগি হয়ে গেল। অনেকের মতে সেদিন খেলার পরিদর্শন ও বিচার সন্তোষজনক হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খেলাও সেদিন খুব উঁচুদরের হয়নি। যাহোক ভগবন্ত ক্লাবের ভাগ্য এবার খুবই ভাল বলতে হবে কারণ ভারতবর্ষের তিনটি বিখ্যাত কাপ এখন তাদের হাতে—আগা খাঁ, যাদবেন্দ্র ও বাইটন!

শ্রীইন্দিরা দেবী

ছোট্ট বোনেরা,

তোমাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি—তার মধ্যে কিন্তু সেলাইয়ের ডিজাইন তোমরা বেশী চেয়েছ। আমি দেখি তোমরা অনেকেই, বাংলা দেশের বেশীর ভাগ মায়েরা আর বোনেরা—রান্না আর সেলাই এই দুটো জিনিসই বেশী চাও। কিন্তু এ ভিন্ন যে কত কি জানবার আছে সে কথা তোমরা একটু ভেবো—সব সময় এই গণ্ডীটুকুর ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখোনা। অবশ্য এ দুটো জিনিসও অবহেলিত নয়—কিন্তু এ ছাড়াও অনেক চিন্তার জিনিস, জানবার জিনিস আছে।

পাশে টেবিল ক্লথের দুটী নমুনা দিচ্ছি। ১নং চিত্রটী টেবিল ক্লথের চার কোণের জন্য। এর চারিধার লাল সুতো দিয়ে সেলাই করবে এবং ভিতরে মৃগা সুতো অথবা ফিকে হলদে দিয়ে কাশ্মীর ষ্টীচে ভরাট করবে।

২নং চিত্রটী—টেবিল ক্লথের বর্ডার-এর ডিজাইন। এটার রং মিলিয়ে সেলাইয়ের ভার আমি তোমাদের উপর দিচ্ছি—তোমাদের পছন্দমত রং মিলিয়ে তৈরী করে আমায় জানাবে কেমন হয়েছে। সব যদি ব'লে দেবো তাহলে শিখবে কি? সুতরাং এটার রং নির্ব্বাচন তোমাদের উপর রইল।

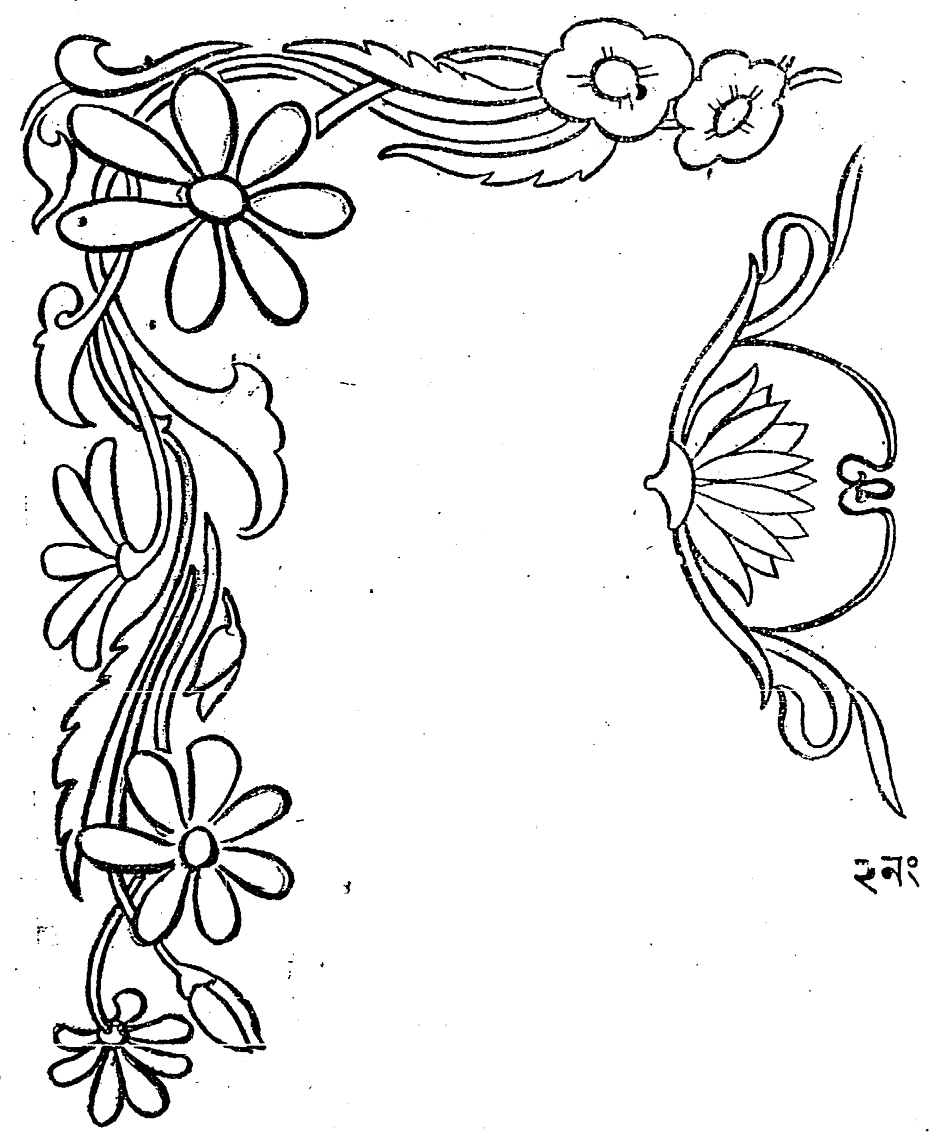

২নং

১নং

নমুনাগুলি ইচ্ছামত বড় ছোট করে নেওয়া যায়।

প্রতিমা গুপ্তা, বালিগঞ্জ থেকে যে চিঠি লিখেছ, তা আমি পেয়েছি। মুখের দাগ সারাবার জন্য কয়েকটী জিনিস ব'লে দিচ্ছি। ১। অনেক সময় দেখা গেছে টাটকা মাখন, একটু হলুদ, অল্প বাদামের তেল এবং তার সঙ্গে কমলালেবুর খোসা বাটা—এই কয়টা জিনিস মিলিয়ে মুখে প্রলেপের মত আধঘণ্টা আন্দাজ লাগিয়ে রেখে—পরে ধুয়ে ফেলতে হয়।

২। কাঁচা দুধের ফেনা দিয়ে মুখ ধোয়া ভাল—চামড়া নরম হয় আর মুখের দাগও নষ্ট হয়। ৩। ডাবের জল দিয়ে মুখ ধোয়া ভাল—এতে অনেক সময় দেখা গেছে বসন্তের দাগও

নির্ম্মূল হয়েছে। ৪। সর, বেসন এবং কাঁচা দুধ মিলিয়ে মুখ ধোয়া ভাল—দুধের মত রঙে উজ্জ্বলতা আর কোন জিনিসে আনা সম্ভব হয় না। ৫। মুশুর ডাল পরিষ্কার শিলে বেটে আধঘণ্টা আন্দাজ রোদে রেখে তারপর পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে একটু জল মিশিয়ে লাগালে মুখের ব্রণ অথবা অন্যান্য দাগ উঠে যায়।

তোমরা সকলে আমার প্রীতি ভালবাসা নিও।

রংমশাল বৈঠক

চিঠি

(পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা)

১

দাদা—

কিছুদিন আগে আমাদের স্কুলে 'প্রাইজ ডিস্‌টিবিউসান্' হয়ে গেল। সেই থেকে আমার মনে অনবরতই একটা কথা বাজছে,—আমি বড় হয়েছি। তোমরা আজ চলে গিয়েছ। তোমাদের স্থানে আজ আমরা আনন্দে মেতেছি। আমাদের পরে আমাদের ছোটরা আবার স্থান পূর্ণ করবে। যুগে যুগে অপরাজিত কালের পূর্ণ করার কেমন ঘটা! মনে একটা নূতন অনুভূতি জাগছে। নবীন কৈশোরের সতেজ পদধ্বনি অন্তরে শুনতে পাচ্ছি।

কালের চাকা ঘুরে ঘুরে চলছে। আমার ছোট বয়েসের ছবি দেখে মনে হয় কত ছোটই না ছিলাম। হয়ত তুমি ভাবছ এটা এমন কি কথা যে আমি জানাচ্ছি। কিন্তু কি মনে হয় জানো? মনে হয়, আমার সব কথাই তোমায় জানাবার কথা। কারণ তুমি যে আমার অগ্রজ, আমার আদর্শের প্রতীক, তুমি যদি না জানলে, তবে আমার এই অনুভূতির আনন্দ অনেকটা কমে গেল যে।

আচ্ছা দাদা,—মানুষের বোঝার আনুপাতে একই পৃথিবী কেন বিভিন্ন রংয়ে প্রতিফলিত হয়? আমি আজ জীবণের নূতনতর প্রকাশ দেখছি। কত আনন্দ, কত আশা, কত জানা অজানা বিস্ময় যেন নিত্য নূতন রূপ নিয়ে আমার সম্মুখে প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় আছে। আশ্চয্য এ অনুভূতি আমার জীবনে প্রথম। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট আশ্চর্য্য এবং প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন একটা নূতন বিস্ময়কে উন্মুক্ত করতে উন্মুখ। আরো শক্তি, আরো বল, আরো সাহস, আরো নির্ভিকতা যেন আমার মধ্যে প্রকাশ হোক, আমি যেন সতেজ নবীনতায় পূর্ণ হয়ে সার্থক হতে পারি।

বড় যখন হলাম তখন তুমি অনেকদিন চলে গেছ। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে ভুলে গিয়েছি, কিন্তু তা যে কত বড় ভুল তা বুঝি, যখন কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করে সেই আনন্দের দিনে মনে মনে তোমাকে স্মরণ করি। তোমাতে আমাতে ব্যবধান আজ জীবন ও মৃত্যুর, আমার এ লিপিতে আমার হৃদয়ের যে ইচ্ছা যে ব্যাকুলতা প্রকাশ হল তা তোমার কাছে পৌঁছবেই। তাই আমি জানাই—দাদা আমি বড় হয়েছি। আমি আর ছোট নই। আমার কছে পৃথিবী অনেক বিস্ময়ের মধ্যে আমিও একটি বিস্ময়।

প্রণাম নাও।

ইতি তোমার—
চাঁদু

শ্রী চিন্ময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
(গ্রাহক নং ১৪১০)

২

রনুদা,

তোমার ২০শে এপ্রিলের চিঠিখানা পেয়ে সুখী হলাম।

কোন্ সুদূর প্রবাসে তুমি রয়েছ, সেখান হ'তে জান্‌তে চেয়েছ—বাংলার এই পাড়াগাঁয়ে ফাগুন আর প্রথম বৃষ্টির দিনটি কেমন করে কাটিয়েছি। সেই অজস্র বৈচিত্র প্রকাশ করা কি আমার মত চুনোপুঁটির কাজ যা হোক যে টুকু পারি জানাতে চেষ্টা করব, ভুল হলে তোমার ছোট বোনটিকে ক্ষমা করো।

............ফাগুনের মাঝামাঝি একটি দিন—বড্ড চমৎকার দিনটি.........ফুরফুরে মিষ্টি বাতাসে চোখে মুখে একটু আদর দিয়ে খু-উ-ব ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। "বৌ কথা কও" "কু-উ' আর দোয়েলের শিষ এক অদ্ভূত গানের সৃষ্টি করল—শুয়ে শুয়ে শুনতে বড় ভাল লাগ ছিল।

গুণ গুণ করে নিজেও গাচ্ছিলাম—বাসন্তীকার গলায় দোলে বিনি সুতার মালা—

বাগানে গোলাপ, যুঁই আর হাস্নাহানারূপে গন্ধে শহুরে মেয়েদের ছাপ নিয়ে ফুটে আছে। পুকুরের ওপাশে হিজল গাছ—তার অজস্র ফুল উড়ে পড়ছে জলে-মাটিতে, দেখে যেন মনে হয় কে যেন লাল টুকটুকে কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। হিজল ফুল,—ওর অতি মৃদুমিষ্টি গন্ধ ভীরু গেঁয়ো মেয়ের সত্যিকারের রূপ ফুটিয়েছে।

....চৈত্রের শেষ দিন—বিকেল বেলা—আকাশের ঝিকি মিকি রোদ্দুকে তাড়িয়ে দিয়ে দৈত্যি হু-হুঙ্কারের মত বিরাট একখানি মেঘ ঈশান কোণে উদয় হয়ে দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে গেল—তারপর সে কী ঝড় আর শীলাবৃষ্টি! সেই ভীষণ দুর্য্যোগেও শীল কুড়িয়েছি, ঝড়ের ঝাপটায় মনে হয়েছে, এই বুঝি উড়ে গেলাম। এখানে তো আর বরফ মেলে না সব সময়—তাই সেদিন শীল দিয়ে সরবত খাওয়ার যোগাড়ও করেছিলাম। তুমি যদি থাকৃতে দাদামনি! কিছু বকুনী খেতে হত বটে, কিন্তু তোমার বকুনীকে ভয় করি নাকি আমি? ইস—

আমার পালা এবার শেষ হ'ল আর বেশী লিখে তোমার হিংসা বাড়াব না, যাক্—

তোমার রাজপুতনার খবর কি? সব আমায় জানাবে।

আশা করি ভাল আছ। আমরাও ভাল আছি, মা, বাবার আশীষ আর ছোটদের প্রণাম নেবে।

তোমার এই অবাধ্য ঝগড়াটী বোনের অজস্র প্রীতি আর ভক্তি নিও। ইতি।

তোমার স্নেহের—
রমি

রহিমা খাতুন।
গ্রাঃ নঃ ৭৭৭

চিঠি-লেখা প্রতিযোগিতা

ফলাফল

প্রথম—চিন্ময় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রাহক নং ১৪১০
দ্বিতীয়—রহিমা খাতুন। গ্রাঃ নং ৭৭৭
প্রশংসাযোগ্য—

মনিরুন্নেছা বেগম।
রঞ্জিত চৌধুরী।
অশোক মুখার্জ্জী
রেবা ধর।

আমরা এবার প্রথম ও দ্বিতীয় চিঠি ছাপালাম। পরে রংমশাল বৈঠকে প্রশংসাযোগ্য কয়েকটি চিঠি আংশিক ভাবে ছাপাবার ইচ্ছা রইল।

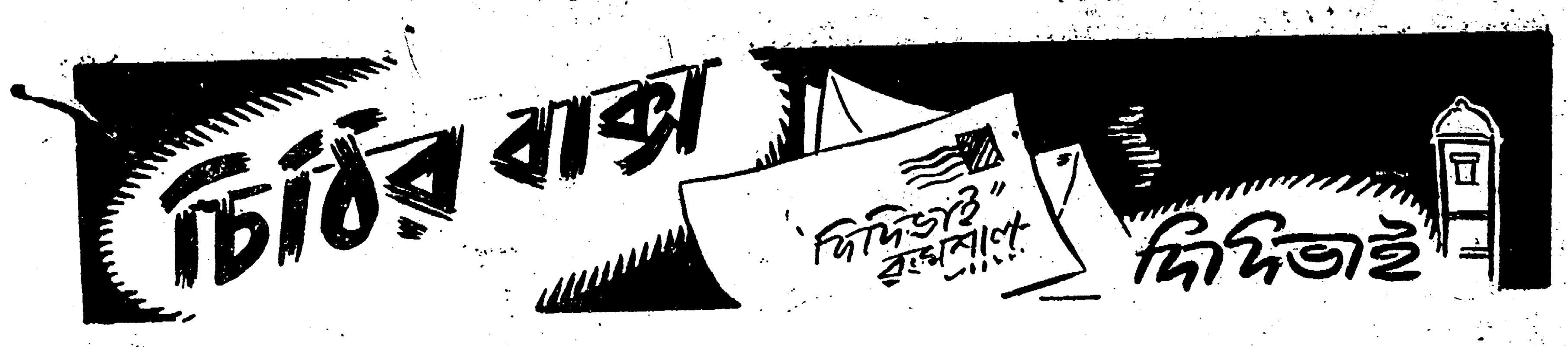

স্নেহের ভাই বোনেরা আমার।

তোমাদের কাছে থেকে এ মাসে যত চিঠি পেয়েছি তার মাঝে নতুন বছরের রংমশালের উচ্ছসিত প্রংশসায় ভরা। যাহোক রংমশাল তোমাদের আনন্দ দিতে পেরেছে একথা জেনে সুখী হয়েছি। তোমাদের জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থার আপ্রান চেষ্টা করা হচ্ছে। গতমাসে All India Radio কলিকাতা মারফৎ যে নাটিকা করে তোমাদের শোনান হয়েছিল সেকথাও তোমরা জানিয়েছ ভাল লেগেছে। এবার রবীন্দ্র জয়ন্তী'র যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার বিষদ বিবরণ চলন্তিকায় পাবে। আচ্ছা এস এবার চিঠির বাক্স খুলি ঃ—

কৃষ্ণা বসু (বালিগঞ্জ) ১৪৭০, যে ব্যাগ সেলাই এর কথা বলেছ তা লিখে শেখান সম্ভব নয়—হাতে করে না দেখালে বোঝান যায় না—এই কথা ইন্দিরাদি তোমায় জানাতে বলেছেন। সকলে আমায় যা বলে ডাকে তুমিও তাই বলবে আর রেখাকে আমার কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবে। ব্যাজের টাকা তোমরা অনেকেই দিয়েছ কিন্তু আমরা বিশেষ অসুবিধায় দিতে পারিনি এখনও—চেষ্টা হচ্ছে খুব। **হীরক ও মীরা সান্যাল** (রাজসাহী) ১২৮৩, তোমাদের নব বর্ষের সুন্দর কার্ড আমি পেয়েছি ভাই **দিবাকর সেন রায়** (ঢাকা) ১৬৪৯, তোমার দুটি চিঠি এসেছে। 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' ডি, এম লাইব্রেরীতে পাবে, আর যে ঠিকানা চেয়েছ তা রংমশালেই আছে খুজে নিও। আঁকা ছবি পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। প্রশ্ন দুটী অত্যন্ত সাধারণ যে কোন বইতে পাবে, যদি না পাও পরে লিখে জানাবো। **হিমানী রায়** (কলিকাতা) ১২৬৪, তোমরাও যেমন ভুলে থাক তেমনি ঠাকুমা, দিদিমা বানীদি, সুজাতাদি সব ভুলে আছেন—সে আমি আর কি করবো বলো? তোমাদের কথা আমি ভুলি না—তোমরাই ভুলে থাক। **রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার** (কলিকাতা) ১২০৮, চিঠি কম অর্থাৎ স্থান সঙ্কুলান করা যায় না ভাই। পরিচালক মশাই সব শেষ করে হিসেব করবেন ক'খানা পাতা চিঠির বাক্সয় দেওয়া যায়—শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়া ঝগড়ি করে ঐ পাতাদু'খানা নিতে হয়, এ সম্বন্ধে তাঁকেই জানিও। শ্রীধর হচ্ছেন সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। নতুন বছরের রংমশাল আশাকরি ভাল লেগেছে। **অরুণ গাঙ্গুলী** (তেজপুর) ১৫৫৩, তরুণ শঙ্কর ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও? কিন্তু রংমশালের পাতায় তো ঠিকানা দেওয়া হয় না, ষ্ট্যাম্প পাঠালে লিখে জানান হয়। **পুষ্প সিংহ**—১৫৩৩, রাঁচীর বিনীতা ঘোষ এখন রাঁচীতে নেই, তবুও ষ্ট্যাম্প

পাঠিয়েছ বলে ঠিকানা পাঠাচ্ছি। **বিমল চক্রবর্ত্তী** (Cowanpore) ১২৫, তোমাদের মাতৃহীন হতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম—কি বলবো তোমাদের—ভগবান শান্তি দিন। প্রশ্নগুলি প্রশ্নোত্তর বিভাগের জন্য রইল। **রণজিৎ কুমার চৌধুরী** (ঢুলি) ১১৬২, তোমার বাঁধা যথাস্থানে গেছে —। কবিতা বা লেখা সম্বন্ধে আমায় জিজ্ঞাসা না করাই ভাল কারণ সে কাজ যে আমার নয় তা পূর্ব্বেই জানিয়েছি। **হৃষীকেশ দে** (সিলেট) ৭৫৩, তোমাদের ভাল লাগবার জন্য রংমশালকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, সুতরাং আনন্দের কথা বই কি। কই আগের চিঠি পাইনি তো? বুদ্ধদেব বাবুর কবিতার কথা, ওটা পূর্ব্বে পাঠশালায় ছাপা তা আমরা জানতাম না। **অমিয়া** (পুরুলিয়া) ১২৯০, এতদিনে নতুন বছরের রংমশাল দেখে খুসী হয়েছ তো? গল্প বিচারক নিজেই জানাবেন সময়ে। **তরুণ শঙ্কর ভাদুড়ী** (ভবানীপুর) ৭০৪, তাহলে তোমায় অপেক্ষা করতে হবে—এবং কবে তোমার বন্ধু পাওয়া যাবে তাও জানি না। প্রশ্ন সব যাবে প্রশ্নোত্তর বিভাগে। **সত্যব্রত বসু** (আমডিড়া) ১৬১৬, তোমার ঐ প্রশ্ন প্রশ্নোত্তর বিভাগে পাঠাবে। 'বৈশাখী' তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে আনন্দ হলো। **মাহনুর বেগম** (বড়তাজপুর) ১১৬৬, কৃষ্ণাবসু সব বলে দিয়েছে, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি সে তোমার মত দুষ্টু মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবে না। ইন্দিরাদির খবর ভাল বলে শুনেছি। **সনাতন প্রামানিক** (কলিকাতা) ১৫৪৬, তুমি যা লেখা দেবে বলেছ পরিচালক মশাইয়ের নামে পাঠিও। **রেখানন্দী** (সিলেট) ১৪২৮, নাম জানালেই বন্ধু পাঠিয়ে দেবো। **বিকাশ কুমার পাল** (হাওড়া). ওসব প্রশ্ন প্রশ্নোত্তর বিভাগে করবে কারণ সেইজন্য ওটা করা হয়েছে। 'দিদিভাই' একটাই,—সুতরাং উত্তর পেয়েছ তো? নিজের নামে বেশ আছ অন্য দিকে যাবার দরকার নেই। **অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়** ১৫৮২, **চিন্ময় কুমার গাঙ্গুলী** (পাটনা,) তোমাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে একই কথার পুনরাবৃত্তি করছি।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা নিও ইতি

শুভার্থিনী—

দিদিভাই

আগামী মাসে

• রংমশাল রবীন্দ্রসংখ্যা •

প্রতীক্ষায় থাক

আগামী মাসে রংমশালের রবীন্দ্রসংখ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা চমৎকার প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সঙ্কলন, চিত্র প্রভৃতি থাকবে ও তোমাদের প্রিয় লেখক লেখিকারা লিখবেন।

নূতন ধাঁধা

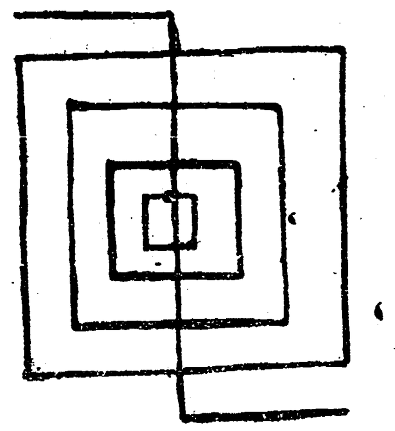
(১)

পাসের তুটি ধাঁধা চিত্র দেওয়া হল। ওপরের স্কোয়ার বা ঘরের মধ্যে ঘর (১নং চিত্রটি) **একবারে** ধরে পেন্সিল না উঠিয়ে কোন লাইন না কেটে বা লাইনের ওপর একবারের বেশী তুবার না গিয়ে একটি কাগজে এঁকে শেষ করতে হবে। অর্থাৎ একটা খোলা দিক দিয়ে বাড়ীতে একবার ঢুকে বাড়ীটি এঁকে রচনা শেষ করতে হবে। তেমনি নীচেকার ফুলের চিত্রটিও (২নং) **একবারে** সুরু করে তুটি ফুলই আঁকা শেষ করতে হবে। এখানেও লাইন কাটা বা তুবার দাগ বোলান চলবে না। **একবারে** ধরে শেষ করতে হবে। এই চিত্রটি কোথায় সুরু করতে হবে তা আমরা বলব না। তোমাদের সেটা ঝার করে নিতে হবে। 'এ্যারো' বা তীর (-->) দিয়ে বা লাইনগুলো যোগ না করে বা অন্য উপায়ে দেখাবে যে তুমি একবারেই পেন্সিল না তুলে কোন লাইনে তুবার না গিয়ে চিত্র তুটি এঁকেছ। উঃ পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

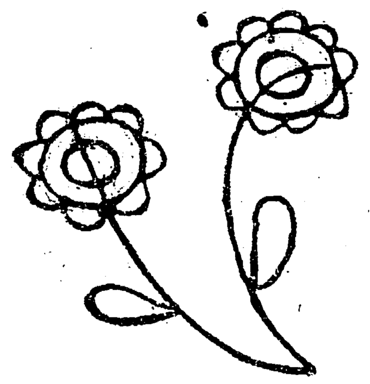
(২)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ব্যাপার দাঁড়িয়েছে এতই রহস্যজনক যে কৃষ্ণচন্দ্র বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

উত্তরদাতাদের নাম

যাদের নির্ভুল হয়েছে ঃ

অতীন, রবি, ফণী, অবনী, অরুণ, উমা, গীতা, দীপালি, অনিন্দা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), কুমারী রেখা নন্দী (সিলেট), সাধনা ও গোপাল (গৌহাটী), গৌরী চ্যাটার্জ্জি (কলিকাতা), সমরেশ বসু (কলিকাতা), শান্তিময় মুখোপাধ্যায় (ফয়জাবাদ), সতীনাথ ভট্টাচার্য্য (নৈহাটি), বরুণ রায় (পাবনা), হরিভূষণ মৈত্র (খাগড়া), শিবদাস বসু (কলিকাতা), কমলেশ চন্দ্র শীল, (বরিশাল), মায়া ও খুকু (পাটনা), জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায় (মজঃফরপুর), কৃষ্ণাঘোষ (কলিকাতা), অশোক, অজয়, অরুণ, নূপুর দাশগুপ্ত (কলিকাতা), দেবপ্রসাদ স্বরাল (পুরুলিয়া), মীরা, খোকা, কেয়া ও বুনু (টালীগঞ্জ)।

যাদের একটি ভুল হয়েছে ঃ

ইন্দিরা ঘোষ (কলিকাতা), বাবু বসু (বালিগঞ্জ)।

কিশোর-কবি

রংমশাল
ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৪৮

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়
ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়।
উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনেরে দিল ডাক্
পঁচিশে বৈশাখ ॥

(কবির একাশীতম জন্মোৎসবের জন্য রচিত।)

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বীণা বাজছে।
কবির বীণা।
বেজে বেজে,
আস্তে থামল।

মেঘ

'জল পড়ে
পাতা নড়ে'
আর একবার লিখবে, কবি ?

বন

লিখতে যেদিন তুমি এসেছিলে
পৃথিবীতে, আমার সবুজ পাতা ফুলগুচ্ছে—
শিউরে উঠেছিল !

ঝঙ্কার উঠল। বেজে চলল।
অবিরাম বেজে যাচ্ছে বীণা। শালবনের
আকাশ ঘন হয়ে উঠল।

ফুল

পাপড়িতে পাপড়িতে আজ
শিউরে উঠছে কার নূপুর ?

দিক

শুধু নূপুর ? ডমরু আর
বিষাণে সুর উথলে যাচ্ছে নটরাজের !

আকাশ

আমার তারা-নক্ষত্রের বুকেও !

ছায়াপথ

আমার আরার ঢেউয়ে
সোনার কাটি ছুঁইয়ে সোনার তরী
চলে যাচ্ছে কোন্ দেশে !

হিমাচল

আকাশ ছোঁয়া দেবদারুর
মাথার উপর দিয়ে বকেদের পাখার
আওয়াজ ছড়িয়ে গেছে সেই খবর
পেয়ে—

বৃষ্টি

আমরা নেয়ে উঠছি সেই সুরে !

তুষার

যাচ্ছি গলে' !

বাতাস

কেন, তা আমি জানি !

ঝরণা

কিসে ?

পাথর

ইস্ !— তুই আবার জানিস্ নে !

সমুদ্র

গানে !

এসিয়া

এপারে !

আফ্রিকা

সে পারে !

ইয়োরোপ

ও পারে !

অষ্ট্রেলেশিয়া

অ-পারে !

আমেরিকা

ঐ পারে !

সাত রঙ

আমাদের রাজ্যে,

ইতিহাস

আমার অনন্ত পুরীতে,

বিজ্ঞান

আমার সুদূরন্ত দেশে !

অক্ষর

আমার সকল ভাষার ঢেউয়ে !

শিল্প

আমার খুশিতে !

পৃথিবী

আমার কুটীরে, মাঠে, নদীতে, নগরে,
রাজশালে, মাঠে, আশ্রমে—

ছাত্র

আমাদের—

যুবক

আমাদের—

বধূ

আমাদের—

মা

আমার...

বাংলার মাটী

আমার—

স্বদেশ

প্রাণে !

বয়স

দাঁড়াও, গণে' বলি—

বন

একি !

আকাশ

একি ! কী গণছ তুমি ?

বয়স

কেন ?

বন

ফুল তো নেই !

আকাশ

তারা নেই তো !

কলম

(হাসতে হাসতে)

চুরি হয়ে গেছে বুঝি ?

শিশু ভোলানাথ

খবর- আমি জানি !

গীতাঞ্জলি

জানি আমিও !

কিশোরী-কিশোর দল

সব ফুল লুটেছি,
রেখেছি বুকে,
কবিকে অঞ্জলি
দেব বলে'!

পৃথিবীর মানুষ

নর ও নারী

তারাগুলি আমাদেরি বুকে লুকানো,
অঞ্জলি দেব বলে'
কবিকে।

বয়স

বন! আকাশ!

বন

আকাশ

উজ্জ্বল হচ্ছি!

বয়স

হবে আরো! বাজছে বীণ।
কালের সোনার ঘড়ি গর্ণে চলব
আমি আর কবির আশীর্ব্বাদ
বেজেই চলবে গহন দিন রাত্রি!

আলো জ্বলল।
অসীম পথের।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত,
আলোর
অঞ্জলি
নিয়ে
চলল।

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা সবাই তখন খুব ছোট। তখন সব ছেলে মিলে মাথা খাটিয়ে একটা ইস্কুল-ইস্কুল খেলা বার করা গেল। তাতে আমরা সকলে ভর্ত্তি হলুম।

সেই ইস্কুল বসত, দেউড়ী থেকে দরোয়ানদের বেঞ্চিগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীর পূবের রাস্তাতে। সে ইস্কুল-খেলায় দ্বীপুদা মাঝে মাঝে মাষ্টার হয়ে এসে বসতেন।

নীচে খেলা হয়। রবিকাকা থাকেন তাঁর বাড়ীর উপরের বারান্দায়। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে খেলা দেখেন।

মাঝে মাঝে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিয়ে জল খাওয়া হ'ত। খেলা ভাঙলেই ফিরিওলার কাছ থেকে ছোলা-ভাজা কিনে খাওয়ার ধূম প'ড়ে যেত। এইরকম রোজই চলে।

তারপর পরীক্ষার সময় এসে পড়ল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হ'লে প্রাইজ দেবে কে? ভেবে-চিন্তে রবিকাকাকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল, প্রাইজ দেবার জন্যে। সেই প্রথম আমাদের রবিকাকার সঙ্গে শিক্ষানিয়ে যোগ।

তারপর বড় হলুম। তখন আর রবিকাকার সঙ্গে ছোট-বড় ভাব নেই। উনি লেখক, আমি আর্টিষ্ট, এস্রাজ বাজাই। সেই সময় উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এসে জুটলেন, তিনি মেতে থাকতেন হাফটোন ব্লক নিয়ে। ছবি ছাপা নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ হ'ত।

কথা উঠল, শিশুদের জন্যে কিছু করা যাক্। রবিকাকার মাথায় প্রথম এল, একটা সিরিজ বার করা যাক্। নাম দেওয়া হ'ল বাল্য-গ্রন্থাবলী সিরিজ। তখন শিশুদের পড়বার মত বই ছিল না। তিনি বললেন, "তুমি গল্প লেখো।"

আমি ভয় পেলুম। কারণ ও-সব আমার আসে না। সে কথা অন্য লেখায় আগেই বলেছি। কিন্তু আপত্তি টিক্‌লো না। আমার ওপরে ভার পড়ল শকুন্তলা লেখবার। আমি লিখলুম "শকুন্তলা", "ক্ষীরের পুতুল" আর রবিকাকা লিখলেন একখানি ছোট কবিতার বই "নদী"—ওখানা যে ছোটদের জন্যে, ওতে লেখা নেই বটে, কিন্তু ওটা বালকদের জন্যেই লেখা।

ছেলেদের জন্যে ওঁর ভাবনা বরাবরই ছিল—তাঁর বাল্যকাল থেকেই। আমাদের ইস্কুল খেলাতেও বালকবালিকাদের কথা ভেবে লেক্‌চার দিয়েছিলেন। আজও শান্তি-নিকেতনে ব'সে সে ভাবনা ছাড়তে পারেন নি। তিনি কাকীমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কাকীমা সেই রূপকথাগুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার "ক্ষীরের পুতুল" গল্পটি নেওয়া।

এইখানেই রবিকাকার বিশেষত্ব। ছেলেদের নিয়েই তিনি আছেন, শিশুদের ওপরে তাঁর অগাধ টান। এমন-কি যারা কিছু বোঝে না, সেই খুব-কচি শিশুদেরও জন্যে কি লেখা যেতে পারে তাও তিনি ভাবেন। এদেশের আগেকার আর কোন কবির সম্বন্ধে এ-কথা বোধহয় বলা যায় না। কিন্তু কবিদের জীবন এইরকম হওয়া উচিত—রামধনুর সাতটি রঙের ভিতর দিয়ে তার গতি। সব-বয়সের মানুষ নিয়েই কবিদের থাকতে হবে। সকলের সহিত যে চলতে পারে তাই হচ্ছে সাহিত্য, আমার এই মত। আর্টিষ্টদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। আমি তাই নন্দলালকে মাঝে মাঝে বলি, "ছেলেদের জন্যে তুমি কি করলে?" ছেলেদের ছেড়ে কবি হওয়া যায় না। এখনো এদেশে ছেলেমেয়েদের মনোমত নাটক কি অপেরা কেউ লিখলে না। এক রবিকাকার "ডাকঘর", "বাল্মীকি-প্রতিভা", আর "হেঁয়ালী-নাট্য", "তাসের দেশ" ইত্যাদি ছাড়া আর কই কে লিখেছে বল ?

মনে রেখো দৈনিক
চা খাইবে চৈনিক
গায়ে যদি জোর পাও
হবে তবে সৈনিক।
জাপানীরা যদি আসে
চিঁড়ে নিক দই নিক,
আধুনিক কবিদের
যত পারে বই নিক॥

—রবীন্দ্রনাথ

জয়ন্তী বাসরে

কবিশেখর
শ্রীকালিদাস রায়

আজিকার জয়ন্তী বাসরে

হে কবি, একটি কথা বারবার জাগিছে অন্তরে।
ভারতের চিরন্তনী শান্তি-বাণী করিয়া বহন
নব তথাগত তুমি অবতীর্ণ। সমগ্র জীবন
তপস্যা করিলে তুমি সারস্বত তপোবন তলে
লোকোত্তর বোধিমন্ত্র লভি ধ্যান-সমাধির বলে,
এজগতে প্রচারিলে সেই তব তপোলব্ধ বাণী
মহামানবের শিরে প্রসারিলে তব স্বস্তি-পাণি,
কহিলে উদাত্ত কণ্ঠে—"সর্ব্বভূতে আত্মার বিস্তার
বিশ্বনরে উপলব্ধি ব্রহ্মময় সত্তা আপনার
ইহাই পরম সত্য —মনুষ্যত্ব-সাধনা পরম,
ইহাই আত্মার শ্রেয়ঃ, সভ্যতার এ লক্ষ্য চরম।"
দাঁড়াইয়া এই মহামানবের মহাসিন্ধু-তীরে
নমি নর-দেবতারে,—জীবমাতা শ্যামা ধরিত্রীরে
প্রণমি গাহিলে তুমি সাম্যমৈত্রী অহিংসার গীতি।
মহামিলনের স্বপ্ন হেরেছিলে। তব বিশ্বপ্রীতি
সর্ব্বজাতি, সর্ব্বধর্ম্মে বেঁধেছিল অদ্বৈত বন্ধনে।
আজিকার এ দুর্দ্দিনে স্মরি কবি তাই ক্ষণে ক্ষণে,
কি বেদনা পাইতেছ জীবনের সন্ধ্যার সৈকতে,
সকল জয়ন্তী ভেদি আজি কবি তব যাত্রাপথে
দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ, প্রবলের দৃপ্ত আস্ফালন
তোমার ও ঋষি-চিত্ত কতইনা করিছে পীড়ন!
জরার যন্ত্রণা তীব্র, দেহজাত ব্যাধির লাঞ্ছনা
অতিতুচ্ছ তার কাছে। জীবনের চরম সাধনা
হবে সে কি সহমৃতা? আজিকার জয়ন্তী বাসরে
তোমার সে ব্যথা স্মরি এ নয়নে শুধু অশ্রু ঝরে।

কিশোর-বঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা

কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবার ভার দিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা—গুণী, জ্ঞানী মনীষীরা সেই সব অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাঁর সর্ব্বতোমুখী বিরাট প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণ করে দেশ ও জগতের প্রতি তাঁর অতুলনীয় দানের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তৎসত্ত্বেও আজকার এই অনুষ্ঠানের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলা দেশের কিশোর সাহিত্যের লেখক এবং কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকেরা মিলে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। আর প্রধানতঃ বালক ও কিশোরেরাই তাতে দলে দলে যোগদান করেছে। সুতরাং এই 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' যে বাঙ্গলা দেশের কিশোরদের পক্ষ থেকে হচ্ছে, বাঙ্গলার তরুণ মন এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিগুরুর প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছে, একথা বললে অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন হবে না। আর এই দিক দিয়ে জ্ঞানী, গুণী, মনীষী সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের চেয়ে আজকার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

বাঙ্গলার কিশোর ও তরুণদের উপর রবীন্দ্রনাথের একটা বড় দাবী আছে। রবীন্দ্রনাথ গত ৬০ বৎসর ধরে অজস্র ধারায় তাঁর প্রতিভার যে দান বর্ষণ করেছেন, জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে, ভাব ও সংস্কৃতির মণিকোঠায় তা জমা হয়েছে। যদি তরুণেরা সেই ঐশ্বর্য্যের দানকে গ্রহণ করতে পারে, তবেই হবে তার যথার্থ সার্থকতা। পূর্ব্বপুরুষ অপরিমিত ঐশ্বর্য্য রেখে গেলেও অনেক সময় অযোগ্য বংশধরেরা তার দ্বারা লাভবান হয় না, তার সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট প্রতিভাশালী মহাকবি জাতিকে গত অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল ধরে যা দিয়ে গেলেন, তরুণ ও কিশোরেরা যদি তার যোগ্য উত্তরাধিকারী না হতে পারে, তবে জাতির পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কেন না এই সব তরুণ আর কিশোরেরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সেই জন্য আজ এই জয়ন্তী উপলক্ষে সমবেত তরুণ ও কিশোরদের লক্ষ্য করে আমি নিবেদন করি, তোমরা কেবল রবীন্দ্রনাথের জয়গান করেই কর্ত্তব্য শেষ করো না, রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্ব সাহিত্য তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ কর। রবীন্দ্রনাথ সব দেশে জন্মান না, এরূপ লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব শতাব্দীতে কচিৎ দু' একবার হয়ে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে এসেছেন। তাঁর দানকে যদি তোমরা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পার, তবেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক হবে, তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করবেন।

শুনতে পাই আধুনিক তরুণদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নাকি কতকটা বাতিল হয়ে গিয়েছেন, তারা এতই বেশী প্রতিবাদী হয়ে পড়েছে যে, রবীন্দ্রনাথও তাদের মনের খোরাক যোগাতে পারছেন না। কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। রবীন্দ্রনাথ চিরতরুণ, দেহ জরাগ্রস্ত হলেও তার মনে এখনও চিরতারুণ্যের দীপ্তি। এ যুগের তরুণেরা যদি তাঁর মনের সংস্পর্শে আসে, তবে তার সঞ্জীবনী শক্তিতে তারাও যে অনুপ্রাণিত হবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

এই তরুণ ও কিশোরদের অনুষ্ঠিত জয়ন্তী সভায় নিজেদের কিশোর-জীবনের স্মৃতি স্বভাবতঃই মনে পড়ছে। আমরা যখন কিশোর—অর্থাৎ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে—তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যাহ্ন গগনে সবেমাত্র আরোহণ করেছে। তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গ্রন্থাবলী, বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। তাঁর সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই বুঝতে পারলাম, এ অপূর্ব্ব জিনিষ এর মধ্যে অশেষ প্রাণশক্তি নিহিত আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাব ও রসের সম্যক বিচার করতে না পারলেও তার ঐশ্বর্য্য অনুভব করবার মত ক্ষমতা তখন আমাদের হয়েছিল। সেই থেকে রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে পড়লাম এবং আজ এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত সে অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বেড়েই চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি এখনও ম্লান হয় নাই। নূতন নূতন দৃষ্টিতে তিনি আমাদের ভাব ও রসের ভাণ্ডার পূর্ণ করছেন। আমাদের জীবনে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছি, তার তুলনা নাই। প্রার্থনা করি, কবি শতায়ু হৌন এবং তাঁর ভাব ও রসের সম্পদে আমাদের দেশ ও জাতি তথা বিশ্ব মানবের কল্যাণ করুন।*

---

* কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রদত্ত অভিভাষণ।

অভিভাষণ

শ্রীকালিদাস নাগ

কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ আভাষ দিয়েছেন তিনি কবি, তিনি স্রষ্টা, সেই জন্য কিশোর বাঙ্‌লার একটি বড় দাবী আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও রচনাকে ভাল করে বুঝ্‌বার। বিজ্ঞ যাঁরা প্রবীন্‌ যাঁরা তাঁরা ত কবিকে বড় করে দেখ্‌ছেন ও দেখাচ্ছেন, কিন্তু সেইখানেই তাঁদের দায়ীত্ব শেষ হয় না; তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে দেশের তরুণদের কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, চিনিয়ে দিতে হবে কবির সেই সৃষ্টি প্রেরণার বিচিত্র প্রবাহ; ছবি ও গান, রূপ ও রূপকথা কী অপূর্ব্ব ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছে সেই অনবদ্য কৈশোরের সৃষ্টি প্রবাহে।

কবির জীবনের ও রচনার এই বয়ঃসন্ধি ভাল করে বুঝান হয়নি আজও। অথচ ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত ছেলে ভুলান ছড়া থেকে আরম্ভ করে' জীবনস্মৃতি, শিশু ভোলানাথ ও ছেলেবেলা পর্য্যন্ত কত বইয়ের ভিতর দিয়ে তিনি যেন নিজেই রচনা করে গেছেন কৈশোরের এক "শারীরক ভাষ্য"। ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রতি কি গভীর তাঁর দরদ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কি নিবিড় তাঁর সহানুভূতি! তাঁর ছোট গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার অমূল্য উপাদান রয়েছে অথচ এখনও তার সদ্ব্যবহার করা হয় নি। এ ত্রুটি যতশীঘ্র আমরা শুধ্‌রে নিতে পারব ততই মঙ্গল।

তাই আজ বিশেষ করে এই তরুণদের সভায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন এদেশে শিশুশিক্ষার নামে অভিনয় চল্‌ত "শিশুপাল বধে"র পালা, তখন রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছেন আনন্দের উপর গড়ে উঠবে এক অভিনব শিক্ষায়তন। তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান শান্তিনিকেতনে তাই গড়ে ওঠে (১৯০১) যে অঙ্কুরটি তাকে আজ আমরা বাঙালী ও সমগ্র ভারতবাসী সগৌরবে দেখ্‌ছি বিশ্বভারতীরূপ বনস্পতির কল্যাণমূর্ত্তিতে। এই বনস্পতির মূলে রয়েছে শিশুদেবতার পূজা। সে পূজায় কবি শুধু তাঁর আজীবনের উপার্জ্জন উৎসর্গ করেই তৃপ্ত হননি, তিনি ঢেলেছেন তাঁর কবি-প্রাণের অমৃত নির্ঝর, নব নব রচনা, আদর্শ ও প্রেরণা। এই সঙ্গে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি কবিগুরুর সহধর্ম্মিণী পুণ্যব্রতা মৃণালিনী দেবীকে। তিনি স্বামীর সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর একান্ত সেবা। চালা ঘরের মধ্যে যে কয়টি শিশু নিয়ে সুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনের শিক্ষা তার অভাব ও সঙ্কটের দিনে তিনি তাঁর অলঙ্কারগুলিও দান করে জননীর স্নেহে রক্ষা করেছিলেন সেই শিশুকল্যাণতীর্থটিকে। তাঁর স্বর্গপ্রয়াণের (১৯০২)

পর থেকেই যেন কবির মাথার উপর ভেঙে পড়ল "দুঃখের বরষা"। দ্বিতীয়া কন্যা রেনুকার মৃত্যু হয় ১৯০৩ সালে; তার রোগ শয্যায় রচনা কবির অপূর্ব্ব কাব্য "শিশু"। ১৯০৫ সালে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহন করেন এবং তার ছ'বছরের মধ্যেই আবার ডাক এল মাতৃহীন কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের; সেও ছেড়ে গেল ১৯০৭ সালে। কিন্তু কবির অপত্য স্নেহ তাঁর শিশুপ্রীতি চিরকালের জন্য বাঙলা সাহিত্যে আর বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হয়ে রইল তাঁর "ডাকঘর" নাটকে। আজ যখন তোমরা হাজার হাজার ছেলে মেয়ে অমল ও সুধার কথা শুনে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হচ্ছ, তখন মনে রেখো কবি শুধু তোমাদের জন্যই কাব্য রচনা করেননি, তিনি ঢেলে দিয়েছেন তাঁর মহাপ্রাণের নিবিড় বেদনা। সেই বেদনার মূল্য দিতে তোমরা প্রস্তুত হও, তাহলে তিনি শান্তি পাবেন, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে তোমরা বড় হয়ে ওঠ, দেশের মুখোজ্জ্বল কর, আজ এই প্রার্থনা করি কিশোর-বঙ্গ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর প্রথম উৎসবে।

* * *

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুতে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ॥
চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি॥

শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।
যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট্ স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥*

—বর্ষশেষ: রবীন্দ্রনাথ

* কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতির অভিভাষণ।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক অনেক আগের, অনেক অনেক দূরের এক আশ্চর্য্য দেশ আছে যেখানে আকাশ সব সময়ে স্বপ্নের মত নীল, যেখানে অন্ধকার আদরের মত নরম, যেখানে পলকে পলকে বুকদোলান উত্তেজনা, পথে পথে আচম্‌কা খুশী।

‘এই আশ্চর্য্য অনেক আগের দেশের নাম আমাদের ছেলেবেলা।

এই ছেলেবেলার স্বর্গে একদিন আমরা সবাই থাকতে পাই, কিন্তু এমনি সে দেশের কড়া আইন যে একবার বড় হয়েছ কি সেখান থেকে জন্মের মত বিদায়।

এ নির্ব্বাসনের সাজা যে কত বড় তা আমরা কেউ কেউ সারা জীবনেও টের পাই না। আমরা বড় হওয়ায় বুড়ো হওয়ার অহঙ্কারেই খুশী হয়ে নাকি ফাঁকা একটু নাম করে তুচ্ছ দুটো পয়সা জমিয়ে মনে করি কি না যেন হয়েছি। জানতেও পারি না যে যত বড় আর যত বুড়ো হই। নাম আর ঐশ্বর্য্যের চূড়ো যত উঁচু হয়ে ওঠে ততই আকাশ আর ছবিটী আমাদের ছোট হয়ে আসে, জীবনের সব রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কিন্তু সবাই ত তেমন নয়। এমন অনেকে আছেন যে বয়স বাড়লেও বুড়ো হতে যাঁরা জানেন না, চুলে পাক ধরলেও ছেলেবেলার দেশের আইন যাঁদের ঘাড় ধরে বিদেয় করবার ফাঁক পায় না। তাঁদের বয়সটা শুধু হিসেবের খাতায় জমা হতে থাকে, মনটা থাকে নদীর স্রোতে চাঁদের আলোর মত সব টানের বাইরে, আলগায় আলগোছে। কালের স্রোত সবই বয়ে নিয়ে যায়, পারে না শুধু তাঁদের মনের অফুরন্ত ঝলমলানি।

সময়ের শাসন-ছাড়ান এই যে সমস্ত আশ্চর্য্য মানুষ, তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য বুঝি আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমস্ত জীবনটাই একটা বিশাল ছেলেবেলা, সেখানে আকাশের আলো কখন ম্লান হয়না, অজানা তেপান্তর কখন ফুরোয় না। কীর্ত্তি ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য কোন কিছুর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাঁকে বাঁধতে পারেনি। সব ডিঙিয়ে তাঁর মন সেই প্রথম অপরূপ বিস্ময়, সেই আদিম উত্তেজনার রোমাঞ্চ এখনও সজাগ রেখেছে।

আমাদের সকলের সমবয়সী এই যে চিরকালের ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথ মোটা অঙ্কের হিসেবে এঁর একটা ছেলেবেলা অবশ্য ছিল। তারিখ সাল ধরে বিচার করলে সেটা প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা।

সেই সত্তর বছর আগে কি রকম ভাবে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল তার কথা জানতে নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা লিখেছেন। তোমরা তাঁর

কাছ থেকেই যে কথা শুনতে চাইবে এই আশায় ইসারায় তোমাদের মনকে একটু হাতছানি এখানে দিয়ে যাচ্ছি।

সত্তর বছর আগে! তখনকার কলকাতা শহরের চেহারা তোমরা ভাবতে পারো! পারো না বোধহয়! মোটর, ট্রাম, বাস! কেউ তখন কল্পনাও করেনি। জলের কল, গ্যাসের আলো, বিজলী বাতী:—স্বপ্নেরও অগোচর!

ছিল শুধু শ্যাকরা গাড়ি আর পাল্কি। রাস্তার ধারে বাঁধানো নল দিয়ে গঙ্গা থেকে আসতো বড় লোকের বাড়ির পুকুরে জল। আর কেরোসিন তখন পাতালপুরী থেকে উদ্ধার হয়নি বলে গরীব বড়মানুষ সবার ঘরে জ্বলতো রেড়ীর তেলের আলো।

সেই আশ্চর্য্য কলকাতা সহরের একটি বিরাট বনেদী বাড়িতে একটি সাত আট বছরের ছেলের মন সবে তখন কল্পনার পাখা মেলতে সুরু করেছে। নবাবী আমলের একটা পুরোণ ভাঙা বরখাস্ত করা পাল্কী থাকে অবহেলায় বাড়ির উঠোনে পড়ে। তারই ভেতর সবার অগোচরে সেই ছেলেটির প্রথম কল্পনা প্রয়াণ সুরু হয়।

‘একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরী বেয়ারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে, সেইপথে চলছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, যে সব দেশের বইপড়া নাম আমারি লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভেতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বলজ্বল করছে, গা করছে ছম্‌ছম্‌। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম, ব্যস, সব চুপ। তারপর এক সময়ে পালকির চেহারা বদলে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায়না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌ছপ্‌ ছপ্‌ছপ্‌; ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে সামাল, সামাল। ঝড় উঠল। হালের কাছে আবদুল মাঝি। ছুঁচল তার দাড়ি; গোঁফ তার কামানো, মাথা নেড়া।’

যাঁর কল্পনা একদিন সমস্ত পৃথিবীকে দুলিয়ে দেবে তাঁর ছেলেবেলার এই স্বপ্নদেখা খেলা আমার তোমার কারুর চেয়ে খুব অন্যরকম কি? এরকম খেলা তোমরাও খেলো, আমরাও হয়ত খেলেছি।

কিন্তু আমাদের পুরোণ পাল্কী একদিনের খেলায় সাগরের ঢেউএর নোনা ফেনার স্বাদ পেয়েও শেষ পর্য্যন্ত সেই পুরোণ পাল্কীই থেকে যায়। আমাদের নিজেদের মাপেই তার মাপ ঠিক হয়ে যায় এবং একদিন হঠাৎ বড় ও পরম বিজ্ঞ হয়ে আমরা আবিষ্কার করে ফেলি যে সেটা নেহাৎই পুরোণ পাল্কী, অবহেলার চোরকুঠুরী বা ভাঙা আসবাবের বাজারে তার স্থান।

কিন্তু ছেলেবেলা তাঁর কোন দিন ফুরোবার নয়, তাঁর ছেলেখেলার পাল্কী তাঁরই সঙ্গে নব নব রূপে আশ্চর্য্য থেকে আরো আশ্চর্য্য মেঘছোঁয়া কল্পনায় পাল তুলে অজানা সাগরে সাগরে নীল দিগন্ত সন্ধান করে ফেরে।

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বর্ণমালা চেনার আগে তোমায় চিনি ছড়ার গুরু,
তোমার লেখায় ছন্দ রেখায় প্রথম যে গো পড়ার শুরু !
তোমার 'শিশু' সকল শিশুর মুগ্ধ মনের আয়না যেন !
কেউ তো শিশু ভোলানাথের জুড়িটি আর পায়না হেন ।

শিশুর কি সুর বেড়ায় ভেসে কল্পলোকে নিত্য ঘুরে,
সে কোন্ ভাষায় ভাবের কুসুম স্বপ্নে ফোটে চিত্তপুরে !
ছোট্ট কচি কাঁচার বুকে ছন্দ বাজে সে কোন্ তালে—
মর্ম বুঝে মাণিক মণি কুড়িয়ে নেছ' এ' জঞ্জালে !

সোনার তরী সোনার ভারে যখন লাগে ওদের ঘাটে,
ছড়াও তুমি 'ছড়ায় ছবি' 'খাপ্ছাড়া' 'সে' মোদের হাটে !
তোমার লেখায় লাগুক লোকের যতই কেন চক্ষে ধাঁধাঁ,
আমরা জানি তোমার বাণী দেশের কিশোর বক্ষে বাঁধা ।

বুঁদির কেল্লা রাখতে কে সে করলে ভীষণ মরণ-পণ,
বন্দীবীরের বান্দা-শিশুর 'জয় গুরুজী' স্মরণ-ক্ষণ,
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির ছেলের দিব্যমুখে করুণ বাণী
সামান্য সে ক্ষতির মানে বুঝল কাশীর তরুণ রাণী !

দুই বিঘা সে মাত্র জমি, করলে তুমি বিরাট তারে,
অমর হল কেষ্টাবেটা, কাব্লিওলা হিরাট পারে ।
গল্প গাথায় ছন্দ ছড়ায় ভরিয়ে দেছ মোদের দিন,
মায়ের স্নেহের মতই জানি যায়না শোধা ওদের ঋণ ।

কোথায় যেন তোমার সাথে মোদের মনের সুরটি মেলে,
হাত ধরেছি সেই সাহসেই ব্যবধানের দূরটি ঠেলে !
সবার সম বয়সী তুমি, খেলছ আজও দিনের শেষে,
মিলিয়ে গেছে শূন্য আশীর, কিশোর অপ্রাচীনের দেশে ।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথকে তোমরা ছোটবেলা থেকেই জান। তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়েই তোমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি আমাদের দেশের একজন বড় কবি। আমাদের দেশের শুধু কেন, পৃথিবীর মধ্যে তিনি বড়—তিনি বিশ্বকবি। ছোট বড় নারী-পুরুষ এদেশে সেদেশে সকলেই তাঁর কবিতা ও লেখা পড়ে আনন্দ পায় আর অন্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়।

কবিতা ও লেখা ছাড়া ছবি আঁকার দিক থেকে তোমরা বোধহয় তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু জান না। তিনি সুন্দর সুন্দর ছবিও আঁকতে পারেন এবং অনেক ছবি এঁকেছেন। যাঁরা বড়, যাঁদের প্রতিভা থাকে তাঁদের অনেক দিকেই প্রকাশ করার ক্ষমতাও থাকে। কালি কলম দিয়ে কথার মালা গাঁথতে তিনি যেমন ওস্তাদ, কালি দিয়ে আর রং দিয়ে বিচিত্র রকমের ছবি আঁকতেও তিনি তেমনি ওস্তাদ। তাঁর মনের যা বলবার থাকে, হয় লিখে নয় ছবি এঁকে তা প্রকাশ করেন।

কাগজে ছাপা রঙীন কিম্বা এক রংয়ের ছবি তোমরা রাশি রাশি দেখ। দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে আঁটা ছবিও অনেক দেখেছো। এগুলি সাধারণতঃ যেমন হয় রবীন্দ্রনাথের ছবি ঠিক তেমনি নয়। বেশীর ভাগ শিল্পী ও চিত্রকর যেভাবে তাঁদের কল্পনাকে চিত্রে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেভাবে করেন না। তাই এই পার্থক্য। তোমরাও জান সাহিত্যের দিকে লেখার প্রেরণা বিচিত্র রকমে আসে ব'লে লেখার ভঙ্গী বা রচনার ষ্টাইল কত রকমের হয়। ছবির দিকেও তাই। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর নিজের মত করে তাঁর ছবিটী রচনা করেন। যেমন ধরো তোমাদের মধ্যে দশজনকে যদি বলা যায় একটী গাছের ছবি মন থেকে আঁকতে, তাহলে দেখা যাবে দশজন দশ রকমভাবে গাছ এঁকেছে। যার চোখে যেটী ভাল লেগেছে সে গাছকে সেইভাবে আঁকবে। প্রত্যেকে যে ভাবেই আঁক না কেন, সেটীকে দেখে যদি গাছ ব'লে চেনা যায় তাহলে তাকে গাছের ছবি বলতে হবে। এখন গাছ ত আমরা সত্যিকার প্রায়ই দেখি—গাছের ফটো দেখেও ছবি আঁকা যায়। কিন্তু তাহলেও দেখা যাবে একজনের ছবি আর আর একজনের সঙ্গে মিলবে না। এখন মনে কর যে জিনিষ দেখা যায় না, তার ছবি যদি আঁকতে হয় তখন কত বৈচিত্র্য এসে পড়বে। শুধু

কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া যেখানে উপায় নেই—এই যেমন ধরো ইন্দ্রজিতের ছবি
যদি আঁকতে হয় তখন আরো কত রকমারি ষ্টাইলের সৃষ্টি হবে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি এই রকম যে জিনিষকে দেখা যায় না এমনতর মনের একটী একটী
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের ছবি। অবশ্য শুধু কল্পনার বা সূক্ষ্ম জিনিষের ছবি হয় না কেন না তার
রূপ নেই—চোখে দেখা যায় না। যেমন ধরো যদি বলি 'আনন্দ' বা 'দুঃখ' এদের ছবি
আঁকতে পার? সেই জন্যে ছবির মধ্যে বাস্তব জগতের রূপ আছে এমন জিনিষ থাকবেই।
কেউ কেউ এই জিনিষগুলিকে বেশী স্পষ্ট করেন কেউ বা কম প্রাধান্য দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে বাস্তব জিনিষকে বেশী স্পষ্ট করেন না। সেগুলি থাকে ঝাপসা অস্পষ্ট এবং অস্বাভাবিক, শুধু তাদের মধ্যে দিয়ে অন্য একটা সুর অন্য একটী ভাব ফুটে উঠতে থাকে।

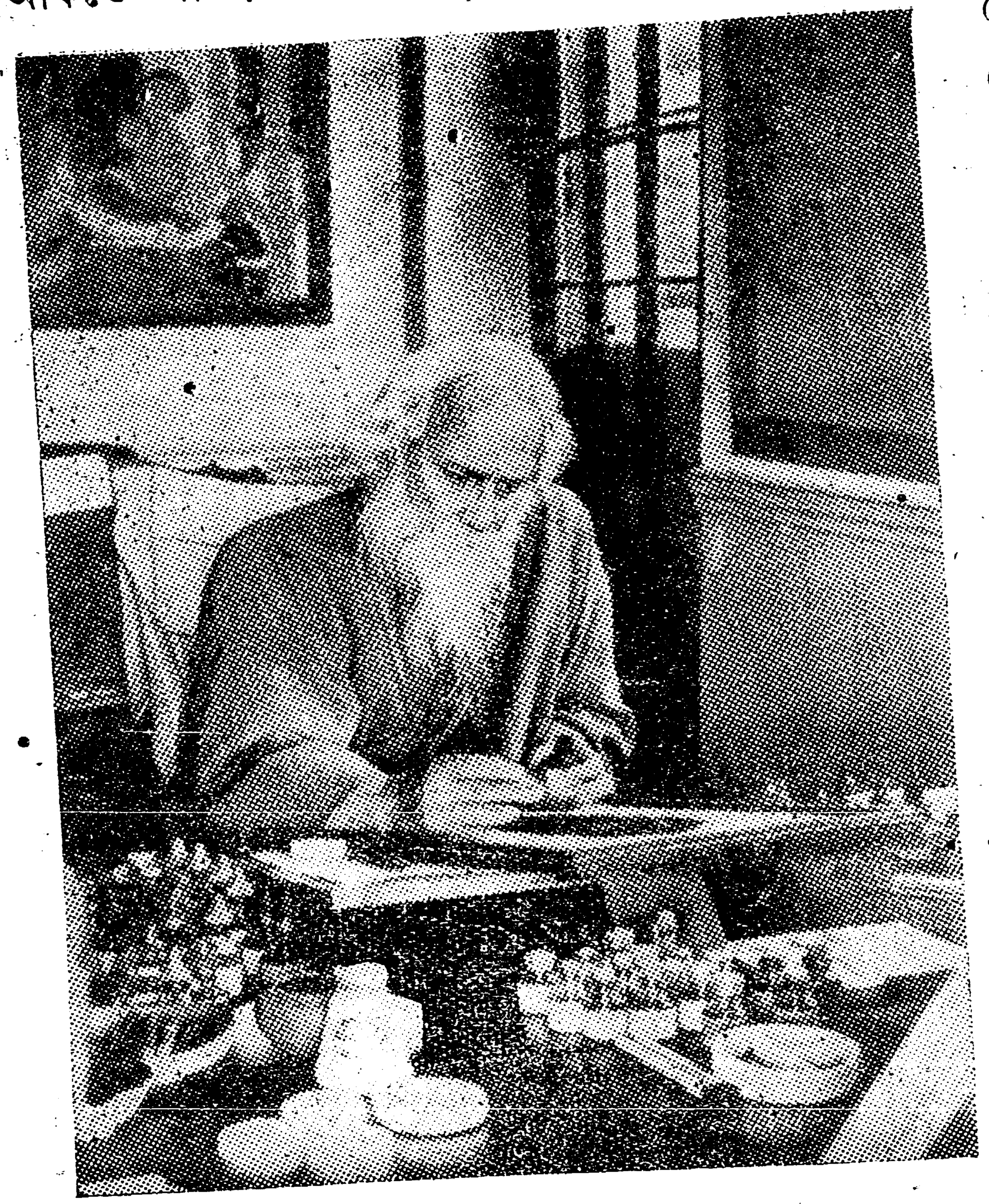

চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ

এই জন্যই অনেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির অনেক নিন্দা করে। অনেক সময় তারা ঠিক বুঝতে পারে না। ধরা ছোঁয়ার বাইরে যা তাকে নিয়েইত মুস্কিল। ঠিক মত বোঝবারও ত উপায় নেই। আমাদের চোখের সবটাই যদি বাস্তব পৃথিবীর বাইরের দিকটার ওপরই খোলা থাকে তাহলে ভেতরের রূপ দেখবো কি দিয়ে?
শিবের তৃতীয় চক্ষুর মত আর একটা চোখ যদি আমাদের থাকতো যা দিয়ে বাহ্যরূপের
আড়ালের জিনিষ দেখা যেত তাহলে হয়ত এবিষয়ে গোল বাধতো না। অবশ্য সাধনা করে
শিল্পীদের কপালে না হোক মনের মধ্যে এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী জন্মায়।

তোমরা বড় হলে যখন আরও অনেক ছবি দেখবে আর এ সম্বন্ধে আরও
অনেক জানবে তখন বুঝতে পারবে রবীন্দ্রনাথ একজন বড়দরের শিল্পী। সহজ হয়ে

পেলারা

ধরা দেওয়াটাই ত বড়ত্বের লক্ষণ নয়—ধরবার শক্তি অর্জ্জন যে করেছে তার কাছেই বড়
সার্থক হয়।

রবীন্দ্রনাথের আঁকার পদ্ধতির সম্বন্ধে একটা কথা বলি। শ্রদ্ধেয় শিল্পী নন্দলাল
বসুর কাছ থেকেই আমরা জেনেছি রবীন্দ্রনাথ কী রীতিতে ছবি আঁকেন। সাধারণতঃ শিল্পীরা

ছবি আরম্ভের আগে কল্পনায় একটী বিশিষ্ট রূপ ঠিক করে নেন, তারপরে তাঁদের হাত আর তুলি চলতে থাকে যতক্ষণ না ছবির রূপ কল্পনার আদর্শের কাছাকাছি যায়। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনেকটা এর বিপরীত। তিনি রং তুলি নিয়ে খেলা করতে থাকেন, হিজিবিজি খেলার মত হাত অক্লান্তভাবে চলতে থাকে। তারপরে এমন কোন এক সময় আসে যখন কোন কল্পনার রূপ মিলে যায় সেটীর সঙ্গে। তখনই তাঁর আঁকার শেষ হয়। এই ভাবেই তাঁর এক একটী ছবিতে এমন এক একটী ভাব ফুটেছে যা অন্যের হাতে ফুটতো কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে হলে নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখতে হয়। তাতে ড্রইং কিম্বা রংকরার কোন ত্রুটী থাকতে পারে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত একটী রূপ আছে সেটীকে বুঝতে পারলে তবেই ছবিটী সুন্দর হয়ে ওঠে। ছবি আঁকা যখন থেকে চলে আসছে তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে কতভাবে ছবি আঁকার ধারা (style) বেরিয়েছে তার আর সংখ্যা নেই। আধুনিক যুগে ছবি সম্বন্ধে য়ুরোপে বিশেষতঃ ফরাসী দেশে বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা বড় হলে যখন সেগুলি পড়বে ও সেসব ছবি দেখবে তখন রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে সত্যই আনন্দ পাবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা বা গান লেখেন মাঝে মাঝে কোন কোন শব্দ হয়ত ভুল কিম্বা উপযুক্ত না হওয়ার জন্যে কাটবার প্রয়োজন হয়। তোমরা যদি দু'এক লাইন মন থেকে লিখতে চেষ্টা কর তাহলেই বুঝবে কোন কোন জায়গায় কাটাকুটির কিরকম দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের হস্তলিপিতে ঐ ধরণের কাটাকুটিগুলি এক একটী ছবির আকার নেয়। কোনটীকে কাটাস্থলে হয়ত ফুল কিম্বা পাখী বানিয়ে ফেললেন। কোথাও বা মন্দির বা গাছ এই রকম একটা কিছু হয়ে গেল। আসলে সেগুলি সমেত কবিতা লিপিটি বেশ সুন্দর দেখায়। অনেকে বলেন এই থেকেই তাঁর ছবি আঁকার ধারা গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে কত কি নতুন জিনিষ আবিষ্কার করতে পারবে। কোনটীর মধ্যে দেখবে রেখা ও পোচগুলি কেমন একটা ছন্দ নিয়ে লীলায়িত হয়েছে। কোনটীতে দেখবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আঁচড় টানার সমন্বয়ে একটা বিশেষ কিছু রূপ পেয়েছে। কোনটীতে দেখবে বিভিন্ন রংয়ের এলোমেলো সন্নিবেশে কেমন একটা বহুদূরস্থ কল্পরাজ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। এই সকল গুণের জন্যই রবীন্দ্রনাথের ছবিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিল্পীরা অজস্র প্রশংসা করেছেন। অবশ্য অপরের প্রশংসার দোহাই দিয়েই তোমাদের তা করতে হবে না, কেন না শিল্প-সাহিত্যের সত্যিকার দান ত মনের কাছে; ভাল লাগার কাছে অন্যের প্রশংসাপত্রে নয়।

'খেলা-ভুলানো' যাদুকর

'মৌমাছি'

আনন্দ-মেলা

রবীন্দ্রনাথ বিরাট পুরুষ, অসামান্য প্রতিভা, পৃথিবীর সবসেরা কবি, সবচেয়ে বড় দার্শনিক—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক; এ সব কথা তোমরা বহু লেখায় পড়েছ, বহুবার জেনেছ, সে সব কথা নতুন করে বলবার দরকারও নেই, আর তাছাড়া সে সব কথা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাবার মত শক্তি আমার নেই। কারণ আমার মনে হয়, তাঁর জ্ঞান সমুদ্রের গভীরতায় আমরা শুধু তলিয়ে যেতে পারি, কিন্তু মাপবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাঁর সর্ব্বমুখী বিরাটত্বের আলোচনা করতে যাওয়া আমাদের পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই সে সব কথা আর বলবো না। বলবো সেইটুকুই যেটুকু আমি নিজে বুঝতে না পারলেও আনন্দ পাই—আর আমার ছোট বন্ধুরা যেটুকুকে 'না বোঝার' মধ্যে রেখে পাবে অফুরন্ত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ আনন্দময় পুরুষ, তাঁর হাসি,

রবীন্দ্রনাথ

রসিকতা, তোমার আমার মতই যে তা নয়, সময় সময় তা ছেলেমানুষী সরলতায় তোমাকে আমাকে সকলকে হার মানায়। জীবনে বহুবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভ করেছি একথা জোর করে বলতে না পারলেও তোমাদের কাছে চুপি চুপি বলতে দোষ নেই, বহুবার তাঁকে কাছে পেয়েছি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। ছোটবেলা থেকে তাঁর রকমারী লেখা পড়েছি, পড়ার আনন্দে সবটার রস হয়তো গ্রহণ করতে পারিনি কিন্তু যতটুকু পেরেছি, ততটুকু হয়ে রয়েছে জীবনের একটা মস্ত সঞ্চয়।

খেলতে কার না ভালো লাগে বল? কিন্তু সব সময় কি খেলতে ভালো লাগে? মাটির হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে, লাটু ঘুরিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, সবসময়ে কি আশ মিটিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়? আমি ত পেতাম না সব সময়ে ঐ খেলার মধ্যে ষোল আনা আনন্দ। মাঝে মাঝে খেলা-ভোলার পাগলা নেশা পেয়ে বসতো আমাকে। ভাবছো খেলা ভুলে পড়ায় মন দিতুম

তা নয়! তা নয়! অতটা ভালছেলে আমি ছিলুম না কোনও দিনই। কিন্তু খেলা ভুলে যে থাকবো কি নিয়ে তাই হয়ে দাঁড়াত একটা সমস্যা। এ সমস্যা তোমাদের সামনেও মাঝে মাঝে যে দেখা দেয়, তার খবর আর কজন রাখে বল? খেলার সঙ্গী অনেক মেলে, কিন্তু 'খেলা-ভোলা'র যখন ইচ্ছে হয়, যখন মন ছুটে যায় তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে, জানলার গরাদ ডিঙিয়ে সামনের ঘরবাড়ী গাছপালার বাধা পার হয়ে অনেক দূরে,—অনে-ক দূরে। তখন কেউ আসেনা সঙ্গে, কেউ জিগ্যেস করে না কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? কেউ জানতে চায় না তোমার উড়ো-মনের বড় খবর! এমনি ধারা মনের অবস্থা যখন হয়, তখন কেউ যদি বলে দেয় তোমার মনের লুকানো কথাগুলো, তখন কত আনন্দ হয় বলতো?

আমার ছোটবেলায় অমনি ধারা 'খেলা-ভোলা'র অবসর যখন আসতো তখন দেখা পেতুম এক মজার মানুষের, তিনি আসতেন তাঁর খেলা বইয়ের ছাপা অক্ষরে গা ঢাকা দিয়ে মিষ্টি কথা শোনাতে শোনাতে। চোখে দেখতে পেতুম না সে যাদুকরের চেহারা, কল্পনায় আঁকতুম দাড়িওয়ালা মজার মানুষের ছবি, ঘরের নিরালা একটি কোন বেছে নিয়ে বইয়ের অক্ষরে চোখ বুলিয়ে শুনতাম তার মুখে আমার মনের কথাগুলো।

কত বড় মজা বলতো! এ মজা তোমরাও সবাই লুটতে পারো যদি জেনে রাখো কোথায় কোন বইতে আছে এই মজার মানুষটি লুকিয়ে।

এই 'মজার মানুষটি' কে জান? ইনিই তো আমাদের 'রবীন্দ্রনাথ'। খেলা-ভোলানোর মস্ত যাদুকর।

'খেলা-ভোলা'র দিনে যখন মন মুষড়ে চুপটি করে বসে থাকো—তখন তিনি তোমার কানে কানে এসে বলেন ঃ

"খেলা ভোলার দিন, মা, আমার আসে মাঝে মাঝে
সেদিন আমার মনের ভেতর কেমনতর বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে দূরে কাদের ছাতের 'পরে,
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়, বেগনি রঙের সাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপকরে রই, তেপান্তরের পার বুঝি ঐ
মনে ভাবি ঐখানেতেই আছে রাজার বাড়ি॥
থাক্‌তো যদি মেঘে ওড়া, পক্ষীরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্ষুনি যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে কষে
যেতে যেতে নদীর তীরে, ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছ তলাতে বসে।"

সত্যি করে বলতো ঠিক এই কথাগুলিই কি তোমাদের অনেকবার মনে হয়নি, ঐ 'খেলা-ভোলা'র অবসর সময়ে? খেলা-ভোলার অবসর সময়ে যখন উড়ো-মনকে কোনও মতেই আর ধরে রাখতে পারে না ঘরের কোনে, তখন তোমাদের ঘরের কোনে বসিয়ে রেখেই

তেপান্তরের মাঠ বেড়িয়ে, কত কী রকমারী মজার জিনিষ দেখিয়ে আনতে পারেন এই মজার মানুষ রবীন্দ্রনাথ—যদি তোমরা তাঁর 'শিশু ভোলানাথ' বইটা জোগাড় করে নিয়ে বসতে পারো। এমনি ধারা অনেক কথাই আছে তাতে যার সবটুকু বুঝতে না পারলেও পাবে অতুলনীয় আনন্দ।

কল্পনার রঙীন রংমশাল জ্বলছে দিনেরাতে তোমাদের মনের মণিকোঠায়, রকমারী রঙের রকমারী আলো, কোনটা নীল, কোনটা লাল, কোনটা মন্দ, কোনটা ভালো। তোমাদের মনের এ রঙীন আলোর রঙের শোভা বড়রা কখন চোখ মেলে দেখে? তারা বড় বড় পুঁথি পড়ে, বিদ্যের পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে বসে থাকে—একবারও ভাবেনা যে তোমাদের মনের মণিকোঠায় জ্বলছে কল্পনার রংমশাল। সে আলোর সন্ধান যে সংসারে বড়রা পেয়েছে সে সংসারে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে চলেছে নিত্য দীপালি উৎসব। ছোটরা ছোটই, তারাতো খবর রাখে না রংমশালের রঙীন আলোর মশলা কি? তাই তারা রংমশাল নিভে গেলে নতুন করে মশলা যোগাড় করে জ্বালাতে পারে না নিত্যি নতুন রংমশাল, তাই তারা তখন ভীড় করে দাঁড়ায় বুড়োদের চোখ ঝলসানো পেট্রোম্যাক্সের চারধারে। তাতে চোখ তাদের খারাপ হয়ে যায়, মন হয়ে যায় অন্ধকার। তারা ছেলেমানুষ না থেকে হয়ে পড়ে বুড়ো। এ কথাটা 'রবীন্দ্রনাথ' মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে তাই, তিনি শিশুমনের কল্পনার রংমশালের রঙীন আলোর মশলা যুগিয়েছেন তাঁর 'শিশু' বইটিতে। পড়তে পড়তে মনে হবে যে তাইতো আমিও ঠিক এই কথাগুলোই ভাবতে পারতুম; কল্পনা করতে পারি—

"আমি যদি দুষ্টুমী ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুঠি
ভোরের বেলায় মাগো, ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো!
তুমি ডাকো "খোকা কোথায় ওরে।"
আমি শুধু হাসি চুপটি করে॥"

বল তো এতে কি ঢের বেশী আনন্দ নয়, ঐ সব আজেবাজে আজগুবি ভূতুড়ে গল্প পড়ার চেয়ে। তোমরা বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে এমন সব বই পড়ো, যা পড়ার পর কল্পনা করবার বা ভাববার কিছুই থাকে না, গল্পের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার শেষ, কল্পনার কবর হয়ে যায়। তোমাদের মনের চিন্তাশক্তি বাড়াতে পারে এমন বই এদেশে তোমাদের জন্য

খুব কমই লেখা হয়েছে। যে দু' একখানি বই লেখা হয়েছে, তা তোমরা খুব কমই পড়ে থাকো। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের জন্য যা লিখেছেন, তা নাকি বড়রা বুঝতে পারে না, এমন কথা বড়দের মুখে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু গোড়াতেই রয়ে গেছে একটা মস্ত ভুল, তাঁরা যখন সে সব পড়েছেন তখন বড় হয়ে পড়েছেন, বড় বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছেন তার মাল মশলা—তাই তাঁরা পেয়েছেন শুধু সেই রঙীন রংমশালের বারুদের গন্ধ, রাসায়নিক পদার্থগুলোর পরিচয়। কিন্তু ছোটরা যারা 'রংমশাল' হাতে পেয়ে গোড়াতেই তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে জানে, তারাই দেখতে পায় তার রঙীন আলো, ঠিক কিনা বল তো আমার কথাটা। বারুদের গন্ধ, সোরা গন্ধকের নাম, ওজন, মাপ, সব তাদের জানার বাইরে থেকে যায়। রঙীন আলোয় মন তাদের রঙীন হয়ে ওঠে।

বড়রা সব সময়ে নিজের মনের মাপকাঠিতে ছোটদের মনের মাপ করতে চায় তাই তাদের পদে পদে ভুল ঘটে, ছোটরা ছোট হয়ে বাড়তে না পেরে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যায়। আজ তাই এ দেশের ছেলেরা প্রজাপতির পেছনে না ছুটে, ছোটে সিনেমার ফটকে। পাতাবাহার গাছের রঙের বাহার না দেখে, দেখে রঙীন চক্‌চকে সিনেমার মাসিকে অভিনেত্রীর ছবি, চটকদার রঙচঙে বইয়ের মলাট দেখে বই কেনে।

রবীন্দ্রনাথকে জগৎ চিনেছে, সারা বিশ্ব উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে তাদের সব সেরা সম্মান আর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যত বংশধর যারা, তোমরা তাঁকে কতটুকু চেনবার চেষ্টা করেছো—তোমাদের মা বাবা তোমাদের চোখের সামনে কতবার হাজির করেছেন এই মজার মানুষ রবীন্দ্রনাথকে, সেই কথাটাই আমার বারে বারে জানতে ইচ্ছে করে। তাঁর লেখা বই খাপছাড়ার হাসির ছড়া আর তাঁর আঁকা মজার ছবি তোমাদের শরীর মনের পক্ষে কতবড় টনিক, সে খবর তোমাদের অভিভাবকরা কেউ রাখেন না। সে বইটা পড়ে হাসতে হাসতে পেট ছিঁড়ে যায়, কিন্তু তা পড়ে তোমরা হাসবে না, শুধু মুখ গোমরা করে পড়বে যত রাজ্যের ভুতুড়ে বই, আর রাত্তির বেলা ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। তাঁর 'গল্পসল্প' 'ছেলেবেলা'র হাল্কা গল্প না পড়ে পড়বে, মাসিক পত্রের ক্রমশঃ উপন্যাস। ছোটবেলা থেকে তোমাদের মনকে সহজ ভাবে বাড়তে না দিয়ে তোমরা ক্রমশঃ'র ঢেউয়ে ঢেউ খেয়ে বাড়ছো, এতে জীবনটা হচ্ছে হাজার দোষ, ত্রুটি, ভয়ের গাঁটে গাঁটে ভর্ত্তি। মজার মানুষ 'রবীন্দ্রনাথ' তা কোন দিন চান নি, এখনও চান না তিনি সহজ সরল শিশুদের, 'শিশু ভোলানাথ' রূপে দেখেছেন। এখন থেকে সেই 'শিশু ভোলানাথে'র মত সজীব প্রাণবন্ত নির্ভীক হয়ে ওঠো, তবেই রবীন্দ্রনাথ খুশী হবেন, সার্থক হবে বাঙ্গালীর ঘরে রবীন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণ করা।

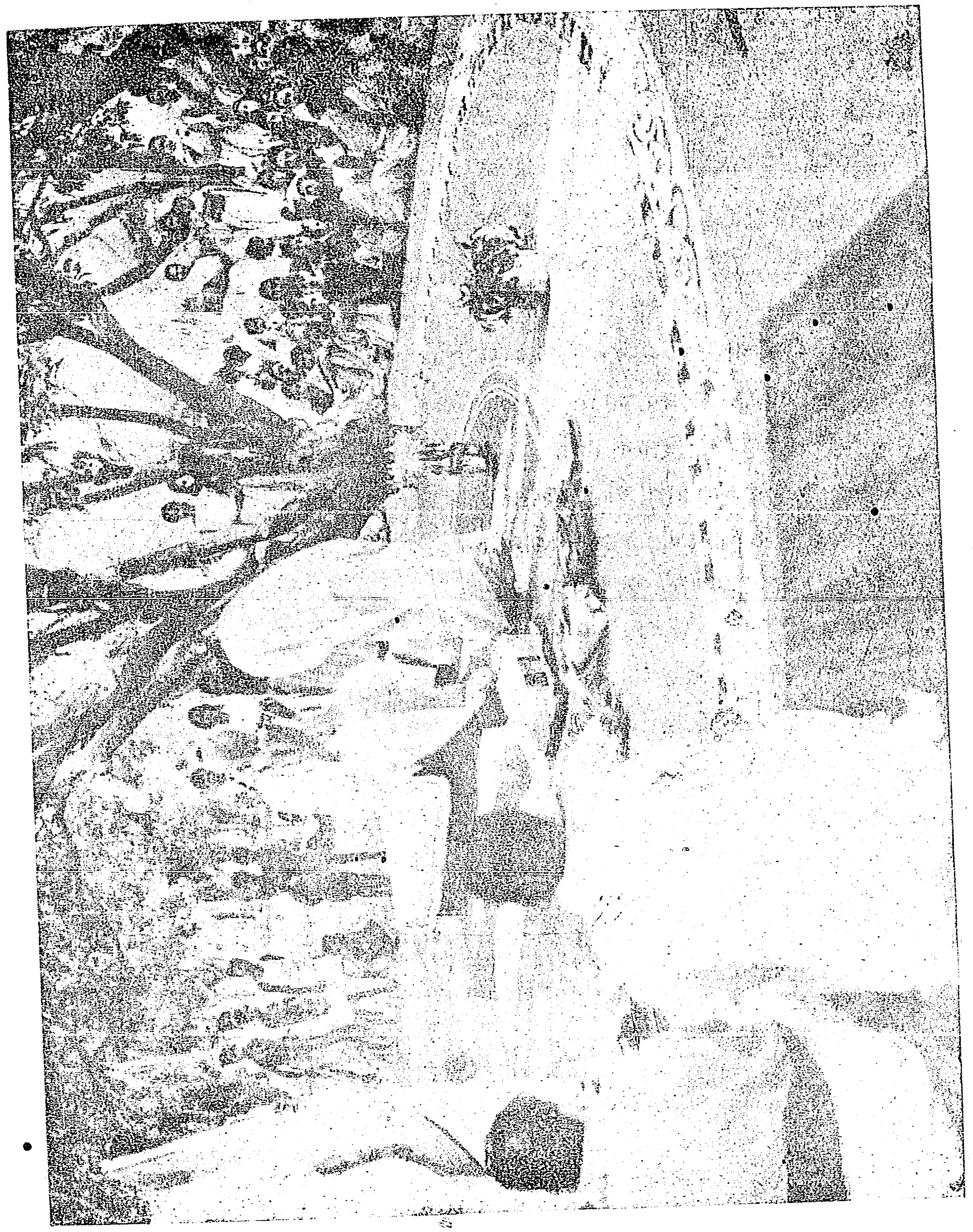

শান্তিনিকেতনের উৎসব

শান্তিনিকেতনে নৃত্য উৎসব

কলাভবন—মেয়েরা ছবি আঁকছে

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

কবে থেকে যে রবীন্দ্রনাথকে জেনেছি, তাই আমার জানা নাই। ছোট্ট বেলায় আমার বড় ভগ্নিপতি (৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী) ও মেজমামার (৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু) ফটোগ্রাফীর ঘরে দেখ্‌তাম, লম্বা লম্বা চুলের গোছাওয়ালা দাড়ী গোঁফ শোভিত একটী সুন্দর মুখের ছবি—আর ছবির মালিকদের কথায় বুঝতাম, যাঁর ছবি তাঁকে এঁরা খুবই ভালবাসেন। শুনতাম, লোকটির নাম রবি ঠাকুর। তারপর তাঁকে যখন আমাদের মায়ের বড় দাদা ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে দেখলাম—তখনও তাঁর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ঘাড়ের কাছে বটে কিন্তু পিঠ ছাপিয়ে নেই। সেই সময়ে তাঁর আর তাঁর মেজদাদা ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনি আবৃত্তি। কবিতাগুলি যে রবি ঠাকুরের লেখা, তা তখন শুনে থাকলেও বুঝিনি। তারপর শুনেছিলাম তাঁর কণ্ঠে গান—"অন্ধজনে দেহ আলো।" সেই আলো চাইবার প্রার্থনা যে কি আকুল প্রাণময় ছিল, তা ভাষায় বোঝাবার সাধ্য আমার নাই। আমার শিশুচিত্তে সেই গান যে দোলা দিয়াছিল তা আজও থামেনি। তারপর তাঁকে কত যায়গায় দেখেছি—তাঁর কত গান ও আবৃত্তি শুনেছি। এবং তাঁর মত করে আবৃত্তি করবার চেষ্টাও করেছি। "পুরাতন ভৃত্য" "দুই বিঘা জমি" বারবার শুনে আর বলেও পুরাতন হ'ত না। দাদার মুখে শুনতাম,—

ওরে তোরা কি জানিস কেউ,
জলে ওঠে কেন এত ঢেউ—

কিম্বা

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা",

আর ছোট মামার মুখে—

"ভুলু বাবু বসি পাশের ঘরেতে" —

আমার শিশু-চিত্ত মনে করত যে আমার মেজদাদার ভুলুকেই বুঝি লক্ষ্য করে কবি বলেছেন ওকথা। বড় জামাইবাবু আওড়াতেন, "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান" আর মেজমামা আদর করতেন, "মাগো আমার লক্ষ্মী," আমরা ভাবতাম—হাজার ঘরের আরও হাজার শিশুর মতই—আমাদের জন্যই বুঝি বিশেষ করে কবিতাগুলি কবি লিখেছেন।

তারপর একদিন অতি সুন্দর একখানা মুখের ফটো দেখিয়ে মামা বল্‌লেন, এই হচ্ছেন,

"তার নাম রেখেছি বাবলা রাণী একরত্তি মেয়ে" আর ইনিই হলেন সেই মনিষ্যি না পক্ষীটি। যদিও ছবিখানা মোটেই কোন একরত্তি মেয়ের নয়। আবার একেই নাকি শুনিয়ে কবি বলেছেন,—

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর ধ্বনি
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল
বিশ্ব চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।

তখনও শকুনির মত নির্ম্মমতা কেমন করে পরের হৃদয় নিয়ে টানাটানি করে তা বুঝি না কিন্তু ভাব, ভাষা ও ছন্দ মিলে চিত্তলোকে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করে—মনে হয় বিশ্ব চরাচরের সেই গান যেন মনের কাণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তখন পড়তে শিখেছি, দাদা দিলেন "নদী" বলে ছোট্ট একটা বই। বড় জামাইবাবু আবার হাত পা নেড়ে, ঘুরে ফিরে ঢেউএর দোলা ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়ে শেখালেন সেটা গাইতে। আমি ভাল গাইতে না পারলেও ঐ গানটা শেখবার উৎসাহ আমার কিছু কম ছিল না। সেই সময়ে—"সখা ও সাথী"তে বার হ'ল সেই সুবলচন্দ্র ও সুশীলচন্দ্রের গল্প—ইচ্ছা দেবীর বর—পেয়েও যাঁরা খুসী হতে পারেন নি।

তারপর পড়লাম, 'রাজর্ষি'—হাসি আর তাতা মন জুড়ে রইল। বড় দিদির ছেলে আর মেয়ে তাতা আর হাসির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ত এদের জীবনে নেমে আস্‌ছে বুঝি সেই সকরুণ দৃশ্যপট। বহুদিন পরে তাতার মৃত্যুশয্যার পাশে বসে কবির গান—ছেলেবেলার সেই আশঙ্কা বেদনা ভরা মূহুর্ত্তগুলিকে নূতন ভাবে সত্য করে তুলেছিল। কিন্তু তখন এও শিখেছি—তাতার কণ্ঠ থেকেই আশ্বাস বাণীর মত—

দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানি সেই কি শূন্যময়
জয় অজানার জয়।

একটু বড় হয়েই দেখ্‌লাম কবিকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা বাণে জর্জ্জরিত হ'তে এবং কর্‌তে। সমালোচনা তখন বুঝতাম না। কিন্তু সমাজপতির "সাহিত্য" এবং রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"র সমালোচনার অংশ নিয়ে বাড়ীতে বড়দের মধ্যে যে তুমুল উত্তেজনা বহে যেত—তা শুন্‌তে যেন বড়ই ভাল লাগ্‌ত। সঙ্গে সঙ্গে মনে যেন কেমন একটু বেদনাও অনুভব কর্‌তাম। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তখন বাংলার সাহিত্যিক মহলে বন্ধুবিচ্ছেদ হবার

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঠিক সেই সময়েই এল স্বদেশী বন্যা। বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন তখন সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের লোক আমরা, বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। বঙ্গজননী দ্বিখণ্ডিত হয়ে যে সব মঙ্গল প্রসূত হয়েছিল, তার মধ্যে কবি ও হাস্যরসিকের মিলন—পুণ্যপ্রাতে একের হাতে অন্যের রাখীবন্ধন অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ নিজের মনকে যে সুরে বাজতে বলেছিলেন, মন যে তাঁর সেই শাসন মেনেছে তা তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন— সঙ্কটে, সম্পদে থাক কল্যাণে—

থাক আনন্দে সদা নিন্দা অবমানে
সবারে করি ক্ষমা থাক আনন্দে

তাঁর দেশবাসী যাঁরা তাঁকে ভালবেসেছিলেন আর যাঁরা তাঁকে নিন্দা উপহাস করেছিলেন সকলকেই তিনি বুকের কাছে টেনে নিলেন। দেশবাসী তাঁরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইল—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

সাহিত্যিক দুইদলও একত্রিত হয়ে ভালবাসল রবীন্দ্রনাথকে আর দ্বিজেন্দ্রলালকে। গাইল একই সঙ্গে মিলে মিশে—

কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ

আবার

বাংলার মাঠ, বাংলার বন
বাংলার ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান।

আজও মনে হয়, মরা গাঙে বান আসার মত সেইদিনে কিশোর প্রাণেও আমাদের কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উত্তেজনা। জানলাম যে আমরা এক।

কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার আগেই বাংলার সুসন্তানদের মনকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর খেদোক্তি—

কাহার ভাষা হায়, ভুলিতে সবে চায়
সে যে আমার জননীরে—

বিদেশী ভাষায় মনের কথা খুলে বলার চেয়ে বাংলা ভাষায় বলাটাও কম জোরালো হয় না প্রতিপন্ন করেছিল বাঙ্গালী জননায়কদের মনে। কিন্তু যেদিন বাংলা তাঁকে তাঁর লেখা স্বর্ণ-

লেখনীপ্রসূত বলে বাংলা চিত্তে অক্ষয় সুন্দর হয়ে থাকবে বলে জানালো, সেদিন বাংলা ভাষার প্রকৃত গৌরব বাঙ্গালী বুঝল। তাই বাঙ্গালী বলল, "বাঙ্গালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব।" বাঙ্গলা ভাষাকে বলল "মোদের গরব, মোদের আশা"—

কবিকে জীবনে অনেক রূপে দেখেছি। তাঁকে ভালবেসেছি বলে অন্তর দিয়ে তাঁর অন্তরের স্পর্শ অনুভব করেছি। ভালবেসেছি তাঁর লেখাকে—কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ—ভালবেসেছি তাঁর বলাকে—বক্তৃতা, আবৃত্তি আর উপাসনা। শিশুর সহচর রূপে তাঁকে দেখেছি, দেখেছি পরামর্শদাতা রূপে, দেখেছি দেশসেবক, দেশনায়ক রূপে, শিক্ষক রূপে, দেখেছি অতিথি-সেবক রূপে, দেখেছি তুঃখের দিনে সান্ত্বনাদায়ক রূপে। কবি হিসাবে তাঁকে আমাদের বলে গৌরব অনুভব করেছি—কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁকে ভালবেসেছি, দিয়েছি অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য।

তাঁর কাছে ভালবাসার দাবী নিয়ে অনেক আব্দার করেছি—অন্যায় আব্দারও হয়তো—কিন্তু তাঁর যদি অসুবিধাও হয়ে থাকে, অস্বস্তিবোধও হয়ে থাকে, তবু তিনি হাসিমুখেই সে আব্দার রক্ষা করেছেন—তাঁর স্নেহ দিতে কার্পণ্য করেন নি। আজও তাই তাঁর কাছ থেকেই বরাবর সাহস পেয়েই, তাঁর অশীতিতম জন্মোৎসবে দেশের সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জোর গলায় বল্‌ছি, আমাদের জন্যই তোমায় শত বৎসর বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে—কারণ তোমাকে যে আমাদের চাই।

আমাদের সকলের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা, আমাদের আকুলতা ও আগ্রহ, আমাদের ভালবাসা তাঁর ক্লান্ত দেহ মনে নিয়ে আসবে না কি সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে-আসা বায়ুর স্পর্শ, পাহাড়ের ধ্যানস্তব্ধ শ্যামলতার স্নিগ্ধ শান্তি? দেবে না কি যযাতির জরাহর পুরুর সেই শ্রদ্ধানম্র, স্নেহাতুর সঞ্জীবন শক্তি ও প্রেরণা? আজ তাঁকে আমাদের নমস্কার প্রেরণ করি,—আর তাঁরি ভাষায় (যে-ভাষায় তিনি আচার্য্য জগদীশকে বন্দনা করেছিলেন) একটু বদল করে বলি—

জয়হে জয় নরোত্তম, পুরুষোত্তম জয় কবীন্দ্ররাজ হে

আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব থেকে আপন

শান্তির রাজ্যে অশান্তি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক, 'রবি-বাসর'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রকৃতই শান্তির নিকেতন। তোমরা সকলেই শান্তিনিকেতনের কথা শুনেছ, কেউ হয়ত সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখেও এসেছ। আমাদের একবার সৌভাগ্য হয়েছিল কবির নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে সব দেখে আসবার। দেখে আমরা সকলে যে আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি আমাদের নেই।

এরকম শান্তির রাজ্যে অশান্তি আবার কি করে আসতে পারে—এটা তোমাদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যে গোড়াতেই জানাচ্ছি, অশান্তি আমাদের কারও নয়, হয়েছিল শান্তিনিকেতনেরই একটী কিশোর ছাত্রের—তাও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে।

এইবার গল্পটা আরম্ভ করি।

কলকাতায় 'রবি-বাসর' নামে সাহিত্যিকদের একটা বৈঠক আছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার অধিনায়ক। চার বছর হয়ে গেল, অধিনায়কের নিমন্ত্রণে রবি-বাসরের সদস্যেরা একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। দলপতি ছিলেন পরলোকগত সাহিত্যসাধক রায় জলধর সেন বাহাদুর। আর দলের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, 'বিচিত্রা'র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আনন্দবাজারে'র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, 'শিশুভারতী'র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'পাঠশালা'র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, 'রংমশাল'-এর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু প্রভৃতি তোমাদের জানা অনেকেই।

সেখানে রবি-বাসরের অধিবেশন হয়ে যাবার পর, কবিগুরুকে সঙ্গে নিয়ে সদস্যদের একটা ফটো তোলা হয়। এই ফটো তোলা সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতার যে চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছি, তাতে মুগ্ধ হয়েছি। সভাসমিতিতে ফটো তোলা যে কি রকম ব্যাপার তা কারও অজানা নেই। বহুস্থলেই দেখেছি, ক্যামেরা বসালেই নবীন প্রবীণ সকলেই এগিয়ে আসতে চান, যাতে তাঁদের চেহারাটা সকলের চেয়ে ভাল করে ফটোতে ওঠে। শান্তিনিকেতনেই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখলাম। সভায় বহু অধ্যাপক, কর্ম্মী ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে, রবিবাসরের সম্পাদক হিসাবে আমি একবার মাত্র বলেছিলাম, "এইবার কবিগুরুকে মধ্যে নিয়ে সদস্যদের একটা ফটো তোলা হবে।" শান্তিনিকেতনের তরফ থেকে এ বিষয়ে কেউ আর একটী কথাও বলে সাবধান করে দেননি।

"উত্তরায়ণ" ভবনের সামনে ফটো তোলা হয়। আশে পাশে শতাধিক লোক উপস্থিত থাকলেও বয়স্কদের ত দূরের কথা, একটি ছোট ছাত্র বা ছাত্রীও ফটো তোলার কাছে আসেনি। কিন্তু যেই ফটো তোলা শেষ হয়, তখনই ছাত্রছাত্রীরা এসে সদস্যদের ঘিরে ফেলে। সকলেরই হাতে একটী করে ছোট খাতা, তাতে নাম সই চাই। তখন তাদের কি চাঞ্চল্য! কোন সঙ্কোচ নেই, যেন সব কতদিনের পরিচিত আপনার জন। সৈনিকের বা শান্তিরক্ষকের বা স্বেচ্ছাসেবকের নিয়মানুবর্তিতার চেয়ে কবির আশ্রমের এই নিয়মানুবর্তিতা যে কত বড় ও মধুর তা সেদিন বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছি।

আমাদের দলপতি জলধর দাদার কাছেই সকলের চেয়ে বেশী ভীড়। ছাত্রীরা তাঁকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। তিনি ঘাড় নীচু করে একটার পর একটা খাতায় নাম সই করার সঙ্গে লিখে চলেছেন—'চিরসুখী হও,' 'ভাল মা হও', 'গৃহলক্ষ্মী হও', ইত্যাদি। অন্য সদস্যদেরও নিস্তার নেই, তাঁরাও খাতায় সই করছেন। এই সই-পর্ব্ব শেষ হ'লে কবির পল্লী-উন্নয়ন-কার্য্যের নিদর্শন দেখবার জন্যে সদস্যরা শ্রীনিকেতনে চলে যান। গাড়ি ফিরে আসার জন্যে সেই সময় আমাদের কয়েকজনকে কিছুক্ষণ উত্তরায়ণেই অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমরা বসে গল্প করছি, এমন সময় একটি কিশোর ছাত্র এসে বিষণ্ণমুখে অনুযোগ জানালে যে, জলধর দাদা তার খাতায় "তুমি ভাল মা হও" লিখে দিয়ে গেছেন। শুনে সকলে আমরা খুব হেসে উঠলাম। তারপর উপেনবাবু খাতাটা হাতে নিয়ে দেখে গম্ভীরভাবে তাকে বললেন—"তোমার পক্ষে ত মা হওয়া সম্ভব নয়। তুমি এক কাজ কর। ঐ মা লেখার পাশে আর একটা মা লিখে নাও, তা হলেই নিজের শ্রেণীতে ফিরে আসতে পারবে।"—এবার আমাদের সঙ্গে ছাত্রটীও খুব হেসে উঠল।

উদারচরিতানাম

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ ভাই?

রবীন্দ্রনাথ—কণিকা

বৈশাখী-উৎসব

শ্রীরাধারাণী দেবী

এবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অশীতি বার্ষিকী জন্মদিন উপলক্ষে সমস্ত বাংলা দেশের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে তাঁর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি শুধু আনন্দেরই নয়, সার্থকতারও ব্যাপার। কারণ, এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের লোকের রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দ্বারা মানুষ নিজেকেই বড়ো করে তোলে, রবীন্দ্রনাথকে নয়। সুতরাং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছোটো ছোটো গ্রামের স্কুল-পাঠশালায় পর্য্যন্ত এই যে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান, এর দ্বারা জাতির সংস্কৃতি-চেতনাই সূচিত হচ্ছে।

প্রত্যেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, পত্রিকাগুলি "রবীন্দ্র-সংখ্যা" প্রকাশ করেছেন। সমস্ত ক্লাবে ক্লাবে, সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, পাঠাগারে, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে আনন্দোৎসব আচরিত হচ্ছে। আমাদের দেশের পক্ষে এটি মস্ত বড়ো শুভ লক্ষণ। এতে করে জাতির মনোবৃত্তি ও রুচি সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠবার অবকাশ ঘটেছে।

আমরা কামনা করি, পৌরাণিক ঋষিদের ধ্যান-মন্ত্র—সৃজিতা আমাদের ধ্যানলোক-বাসিনী বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর আরাধনারই মতো আমাদের দেশের প্রত্যক্ষ বাঙ্ময় বাগ্‌-দেবতার অর্চনা শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সভা করেই নয়, প্রতি ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা সরস্বতী পূজারই মতো বার্ষিক উৎসব আকারে অনুষ্ঠিত করুক। মাঘ মাসে বসন্ত-পঞ্চমীরই মতো—সমগ্র বৈশাখ মাসটা রবীন্দ্র-উৎসবের মাস হয়ে উঠুক। যাদের যেদিন এবং যখন সুবিধা, তারা সেইদিন সেই সময়ে আপন আপন ঘরে উৎসবের উদ্যোগ করবে। বৈশাখে ও জ্যৈষ্ঠে যে কোন একটি দিনকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আনন্দ করবার দিন, আলোচনা করবার দিন, তাঁর দানকে উপলব্ধি করবার, স্বীকার করবার দিন। এই দিনটিকে তাঁরই গানের সুরে সুরে ঝঙ্কৃত করে তোলা হবে। তাঁরই নাটকের অভিনয়ে আনন্দ পরিবেশন করা হবে। তাঁরই গড়ে তোলা নৃত্যাভিনয়ে—নৃত্য-শিল্পের আনন্দমূর্ত্তি দেখানো হবে। তাঁরই কবিতার আবৃত্তি, প্রবন্ধের আলোচনা, গল্প পাঠের আসর বসিয়ে তাঁকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করা হবে।

সরস্বতী পূজা মাত্র একটি দিনের উৎসব, রবীন্দ্রোৎসব সমগ্র বৈশাখ মাসের যে কোনও দিনেই যে কোনও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ছাত্র ছাত্রী ছোট বড় সকলেই আচরণ করতে পারেন। মাঘে বাগদেবীর অর্চনার উৎসবের চেয়ে এ উৎসব আরও ব্যাপক ও উদার হবে। কারণ এই মহোৎসব, সংস্কৃতি মহোৎসব—এতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই সমান অংশীদার। যে কোন মানুষ তার আপন ঘরে যে-কোনও আকারেই এর অনুষ্ঠান দ্বারা নিজেকে গৌরবান্বিত করতে পারবেন।

কবিদাদুর ছেলেবেলা

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাখ।

নতুন বছরের এই দিনটি বাংলার একটি বিশেষ গৌরবের দিন। এই দিনে জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা মায়ের কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। আজ সাবানের ফেনার মত তাঁর সাদা দাড়ি, শরতের মেঘের মত ঢেউ খেলানো চুলের পানে তাকিয়ে, তাঁর বিশ্বজয়ী সম্মান দেখে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভুলে যায় যে তিনিও একদিন অম্‌নি তাদের মত ছোট ছিলেন, বই খাতা নিয়ে স্কুলে যেতেন, খেলতেন, বেড়াতেন, পড়তেন। সেই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যই 'পঁচিশে বৈশাখ' বছরের পর বছর এসে তাদের কানে কানে বলে যায়—"ওই ঋষিকে দেখছ, যাঁর চরণে শ্রদ্ধা জানাচ্ছ, উনিও একদিন তোমাদের মতই ছিলেন, আজও তাঁর অন্তরে তোমাদের মতই শিশুমন লুকিয়ে আছে।" তাই হাজার কাজের চাপে এই বয়সেও তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আনন্দ দেবার জন্য নতুন লেখার পাত্‌তাড়ি খুলে বসেন, তাদের জন্য ছবি আঁকেন। নিজের ছেলেবেলাকার গল্প সুরু করেন তাদের কাছে—

"বয়স যখন ছিল কাঁচা, হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখীর মত শুধু ছিল না তার ডানা।"

এই মনীষীর ছোট বেলা কেমন করে কেটেছে তা' তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে খুব ইচ্ছে হয়, নয় কি? তাঁর ছোট বেলার কাহিনী যেমন করুণ তেমনি হস্যকর ঘটনায় ভরা। "ছেলেবেলা" বলে তাঁর বই আছে, সেখানি পড়ে দেখ। আমি এখানে তাঁর ছেলেবেলার কথাই তোমাদের বল্‌বো।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আটটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। এই তেরোটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ মেধা সম্পন্ন। এবং তাঁদের খ্যাতি, নিঃসন্দেহেই আরো অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়তো, যদি না রবীন্দ্রনাথের যশঃ-প্রভার তীক্ষ্ণ প্রখরতায় তা' কতকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেত। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋষিতুল্য দার্শনিক চিন্তাবীর; দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই-সি এস,—তাছাড়া একজন উচ্চাঙ্গের কবি। তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বিষয় অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃত কাব্য ও ফরাসী ভাষার চর্চ্চা

করতেন। পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বড় সুর-রচয়িতা; তাছাড়া সাহিত্য বিষয়ক বই লিখেছিলেন অনেক। য়ুরোপীয় ভাষা থেকে, বিশেষ করে ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন অনেক কিছু। মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী প্রথম লেখিকা; অনেক উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করে গেছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথ শৈশবেই এমন একটা পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে পালিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন যেখানে তাঁর মনীষার পূর্ণবিকাশের বিশেষ সুযোগলাভ ঘটেছিল।

তিনি ছিলেন ধনীর দুলাল। কিন্তু সাধারণত ধনীর ছেলে বলতে আমরা যা বুঝি মোটেই সেই রকম নয়। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, সাজ পোষাক ছিল নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মতো। আহারে তাঁদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের পক্ষে তার তালিকা করলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হবার আগে কোনদিন কোন কারণেই মোজা পরেননি। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপর আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। পিতার কাছে তাদের যাওয়া তো দূরের কথা সামান্য সহানুভূতি পর্য্যন্ত পাবার উপায় ছিল না। সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"আমার বয়স তখন বোধ হয় নয় হবে। ছিলুম স্রোতের শেওলার মতো—সংসার-প্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম—কোথাও শিকড় পৌঁছয়নি—যেন কারো ছিলুম না, সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত চাকরদের হাতে থাকতে হ'ত, কারো কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিলনা। জ্যো'দা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্য ভোরবেলা থেকেই রুটি তোষ আরম্ভ হতো। আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালু চরের দিকে, অনাদরের কূলে—সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না—ফসল ছিল না—কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর জ্যো'দা পদ্মার যে কূলে ছিলেন, সে কূল ছিল শ্যামল—সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু আধটু চোখে পড়ত।"

তারপর এল স্কুলে যাবার পালা। একটির পর একটি করে অনেকগুলো স্কুলে তাঁকে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকটিতে শিক্ষার চেয়ে তিনি পীড়া পেয়েছিলেন অনেক বেশী। তখনকার দিনে শিক্ষা দেওয়ার যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেয়েছিলেন স্কুলের ঘরগুলো তাঁর কাছে মনে হতো যেন অন্ধকূপ। অতি শৈশবে তাঁকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠানো হয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন—"সেখানে কি শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই, কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে

সঞ্চারিত হইতে পারে কিনা তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য" (পৃঃ ৫-৭)। এর পরে যে-সব স্কুলে তাঁকে ভর্ত্তি করা হয়েছিল, সেখানকার স্মৃতিও এর চেয়ে বেশি সুখকর ছিল না। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ছেড়ে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়েও তিনি মনের তৃপ্তি কিছু পাননি। নতুন ছেলে স্কুলে পড়তে এল, তার পড়াগুলো এগোয় না দেখে—

"গুরুমশায় বলেন তারে—
'বুদ্ধি যে নেই একেবারে'
দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ'মাস ধরে নাকাল
রেগে খেপে বলেন, 'বাঁদর নাম দিনু তোর মাকাল।'

তারপর স্কুল বদলের চেষ্টা করা হয়েছিল কোন ফল হয়নি। "দাদারা মাঝে মাঝে এক আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভৎর্সনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুষের মত হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" (পৃঃ ৮৫)

কিন্তু ছোট ভাইটির উপর এমন কঠোর রায় যিনি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রাতার চিত্তের গহনতলের কোন খবর রাখতেন না। সে কবিচিত্ত সকল কিছুর স্পর্শেই সচকিত, সকল কিছুর প্রতিই তাঁর অনন্ত কৌতূহল, প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু ধ্বনি, তা' শোনবার জন্য সদাই উন্মুখ। এমন চিত্তের বিকাশের জন্য স্কুলের কি প্রয়োজন?

তোমাদের অনেকের মনে হয়ত এই প্রশ্ন জাগবে কোলকাতার মত একটা বিশাল সহর থেকে কবি-চিত্তের খোরাক কতখানি মিলতে পারে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মেধা সকল রকমে ভূমি থেকেই রস সংগ্রহ করতে পারত। অতি শৈশব কালেই আপনার মধ্যে আপনি তন্ময় হয়ে থাকার আস্বাদ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। যে ভৃত্যের উপর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল, সে খড়ি দিয়ে এক চক্র এঁকে তার মধ্যে তাঁকে বসিতে দিত আর বলত, খবরদার এই দাগের বাইরে এস না, আসলেই বিপদ। একটা সাধারণ শিশুর উপর এমন ব্যবস্থা হয়ত' তাকে অস্থির করে তুলত; কিন্তু আমাদের শিশু-কবি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে, চোখের সামনে যে সব দৃশ্য উন্মোচিত হ'ত তাই শান্ত চিত্তে দেখতেন। জীবনস্মৃতিতে কবি এ বিষয় লিখেছেন,—"জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্ব-ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনাবট—দক্ষিণ ধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডী-বন্ধনের বন্দী পাখি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন পুকুরটিকে একখানি ছবির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে

আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্ব-টুকুও আমার পরিচিত।......এমনি করিয়া দুপুর কাটিয়া যায়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলো সারাবেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে। পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বড় গাছের তলাটা আমার সমস্ত মন অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলি ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।...(পৃঃ ৯)

তখনো তাঁর বয়স সাত হয়েছে, কি হয়নি,— তাঁর ভাগিনেয়, তাঁর চেয়ে কিছু বয়ঃজ্যেষ্ঠ, কিছু ইংরাজি সাহিত্য পড়ে মহা-উৎসাহে হ্যামলেট থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সহসা খেয়াল করলেন,—রবিকে দিয়ে কবিতা লেখাতে হবে। আর অমনি তাঁকে ছন্দের নিয়মগুলি দিলেন শিখিয়ে। এই বয়সে কবিতা লেখার কথা ভাবা—সে কি সহজ কথা! ছাপার বইতে ছাড়া কবিতা কখনো দেখেনইনি—"তার মধ্যে কাটাকুটি নাই, ভাবচিন্তা নাই, কোনখানে মর্ত্ত্যজনোচিত দুর্ব্বলতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।" কিন্তু তাঁর প্রথম চেষ্টা যখন উত্‌রে গেল, তখন আর তাঁকে পায় কে? একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করে তাতে পেন্সিল দিয়ে কতকগুলো অসমান লাইন কেটে বড় বড় কাঁচা অক্ষরের আঁচড় কাটতে কাটতে ছন্দ বানিয়ে চললেন। এ সম্বন্ধে কবি "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন,—"হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেইরূপ উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষতঃ আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।" (পৃঃ ২৮)

কবির জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই মহর্ষি বৎসরের অধিকাংশ সময়টাই ভ্রমণ করে কাটাতেন। কাজেই অতি শৈশবে পিতার সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু যখনই কবি শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করলেন, অর্থাৎ যখনই তাঁর চিত্ত-গঠনের সময় এলো তখনই মহর্ষি তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গে হিমালয় পাহাড়ে বেড়াতে। এই হিমালয় ভ্রমণকালে কবি জীবনে যে শৃঙ্খলার শিক্ষা পেয়েছিলেন—তার স্মৃতি কোনদিন তাঁর মনে ক্ষীণ হয়নি। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন—"ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা ও কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোন জিনিষ ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি অনশ্চক্ষুতে সুষ্ঠরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন।" হিমালয় ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল এগারো। এই সময় পিতার নিকট

তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়তেন,—তা' ছাড়া তাঁর মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত করবার জন্য কিছু টাকাকড়িও তাঁর কাছে রাখা হ'ত। রবীন্দ্র-চিত্তের মধ্যে যে সুশীলন, সুশৃঙ্খলা, স্থির যুক্তির প্রতিষ্ঠা ও গঠন-ক্ষমতা আছে,—যার ফলে বিশ্ব-ভারতীর মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে,—সে সবের বীজ নিহিত হয়েছিল এই সময়।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও দার্শনিক। এরকম সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিশ্বের খুব অল্প লোকেরই আছে। রবীন্দ্রনাথ এক-জায়গায় লিখেছেন—"আজ সেই শীতের সকালের অনাদৃত রবি জাহাজ চড়ে চলেচে বৃহৎ জগতে—সেদিনের সবচেয়ে যা সত্য তার কোন চিহ্ন নেই, আর সে দিনের সব চেয়ে বড় যা ছায়া, তা আজ অদ্ভুত রকম প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। আবার মনে হচ্ছে আজকের দিনের সমস্ত কিছু যেন এইভাবেই বরাবর চলবে—পরিবর্ত্তনের কথা মনে করা যায় কিন্তু মস্ত ফাঁক-গুলোর কথা কল্পনায় আনতে পারি নে—তবু চলতে চলতে এমন একটা বিশেষ দিন আসে রাত্রি আসে, যখন এক-টানা রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ মস্ত একটা গহ্বর দেখা দেয়—মনে করা যায় না এমন ফাঁক জীবনে সইবে কি করে—তার পরে—তার উপর দিয়েও সময়ের রথ অনায়াসে পার হয়ে যায়—তার পরে সেই রথের চিহ্নটাও যায় মুছে। অত্যন্ত পুরানো কথা কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত কথা, একটা ধারা চলেইচে, যেটা চিরকালই আছে অথচ পদে পদেই নেই—'সমস্ত' বলে মস্ত একটা কিছু আছে অথচ তার প্রত্যেক অংশটাই থাকবে না—একদিকে সে মায়া তবু আর এক দিকে সে সত্য।"

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

—লেখন

এক টুকরো ছবি

দিদিভাইয়ের কথা

খোকন—"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে...... ।"

দিদি—কি পড়ছিস রে খোকন ?

খোকন—কি সুন্দর কবিতা দিদি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আচ্ছা দিদি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ?

দিদি—রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি—বিশ্বের কবি।

খোকন—কবি ? তাই বিষ্টির কবিতা ভারী মিষ্টি করে লিখতে পারেন।

দিদি—তিনি শুধু কবিই নন, তিনি ঋষি, দার্শনিক ও কর্ম্মী। পৃথিবীতে কোনও দেশে কোনও যুগে কোন জাতের ভিতর এমনি প্রতিভার বরপুত্র হয়ে কেউ জন্মাননি।

খোকন—এই দেখো দিদি আমার পড়বার বইতে রবীন্দ্রনাথের ছবি, কি সুন্দর দেখতে, কী চমৎকার চোখদুটো, কী সুন্দর চেহারা।

দিদি—শুধু চেহারায় তিনি সুন্দর নন, দেহের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে অনেক বড় হলো তাঁর মনের ঐশ্বর্য্য। এই মনের ঐশ্বর্য্য দিয়ে চিন্তাধারা দিয়ে তিনি সারা পৃথিবীকে জয় করেছেন। সমস্ত পৃথিবী আজ তাঁর কাছে এসে ধরা দিয়েছে তাঁর শান্তিনিকেতনে।

খোকন—শান্তিনিকেতন বুঝি তাঁর বাড়ী ?

দিদি—না এটা ঠিক তাঁর বাড়ী নয়। তাঁর আসল বাড়ী হলো জোড়াসাঁকোয়। তবে শান্তিনিকেতনে তাঁর জীবনের বহু অংশ কেটে গেছে, এখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে।

খোকন—ওহো বুঝতে পেরেছি ওটা একটা স্কুল বলো।

দিদি—না, ঠিক স্কুল নয়।

খোকন—তবে কলেজ বুঝি ওটা ?

দিদি—না, ঠিক কলেজও ওটাকে বলা চলে না। এটা হলো একটা আশ্রম। বিভিন্ন দেশের ও জাতির ছেলেমেয়েরা এখানে থেকে লেখাপড়া শেখে, আমাদের দেশে আগে যেমন গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা ছিল—এখানে অনেকটা সেই পুরাণ পদ্ধতিতে শেখান হয়। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ললিতকলার চর্চ্চা হয়ে থাকে অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া নাচ গান ছবি আঁকা এমন কি কৃষিকাজও শেখান হয়—মানে মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলোকে সুপরিস্ফুট করে তোলবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়।

খোকন—বাঃ ভারী মজা তো, দিদি তুমি বাবাকে বলো আমি শান্তিনিকেতনে পড়বো—এত সুন্দর যিনি কবিতা লেখেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের পড়াবেন, না দিদি ?

দিদি—আগে বড় হও, তারপর শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তোমার জীবনের নব যাত্রা সুরু করো। হ্যাঁ কি বলছিলাম—সারা পৃথিবীতে যেখানে তিনি ভাল জিনিস দেখেছেন পরম যত্নে তা নিয়ে এসেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনে—তাই এ পৃথিবীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ ভাবুক, চিন্তাবীর, শিল্পী অধ্যাপক তিনি সবাইকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনে।

খোকন—ও তাই নাকি ? খুব ভাল লোক তো -

দিদি—বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্বের দরবারে গর্ব্বের আসনে বসিয়েছেন। উপন্যাস, প্রবন্ধে, কবিতায়, নাটকে, সঙ্গীতে, অঙ্কন বিদ্যায়, নৃত্যকলায় সবদিক দিয়ে তিনি বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সমাজকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবার ও তপঃসাধনার জন্যে তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পান, কবিগুরু বলে সমস্ত জগৎ তাঁর চরণে শ্রদ্ধা প্রণতি নিবেদন করলো। শুধু তাই নয়—তিনি নিজে সমস্ত পৃথিবীর লোককে ভালবেসেছেন—যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে—সেখানে প্রতিকারের বাণী নিয়ে এই দুঃস্থ দুর্গত মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যে এগিয়ে এসেছেন—অন্তরে বহন করে করুণা ও দয়ার স্নেহবারি। সমস্ত পৃথিবী তাই তাঁকে ভালবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে।

খোকন—আচ্ছা দিদি, একদিন তো তিনি আমার মতই ছোট ছিলেন।

দিদি—হ্যাঁ, একদিন তিনি সত্যিই তোমার মত ছোট ছিলেন—ছেলেবেলাকার দিনগুলো কেমন করে কাটতো তা তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

খোকন—'জীবনস্মৃতি' কি দিদি ?

দিদি—সেটা হচ্ছে তার আত্মজীবনীর মত। কিন্তু তুই বড় বড় হাই তুলছিস কেন খোকন ? ঘুম পাচ্ছে নাকি ?

খোকন—য়্যাঁ ? না, হ্যাঁ।

আগন্তুক—খোকন, খোকন !

খোকন—কে ? কে আমায় ডাকছ ? কোথায় যাবো আমি ?

আগন্তুক—যেখানে খুসী—নদ, নদী, বন, উপবন সব ডিঙ্গিয়ে আমার সঙ্গে তোমায় নিয়ে যাবো।

খোকন—নিয়ে যাবে ? আচ্ছা তুমি আমায় রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে পারো ? আমার পড়ার বইতে আমি তাঁর ছবি দেখেছি, আমার বড় ইচ্ছা করে তাঁকে একবার নিজের চোখে দেখি—আমায় নিয়ে যাবে ?

আগন্তুক—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিয়ে যাবো—

খোকন—কিন্তু কি করে যাবো—আমার কাছে তো পয়সা নেই, কাল স্কুলে যাবার সময় মা যে পয়সা দিয়েছিলেন তা আমি লজেন্স কিনে খেয়ে ফেলেছি—তবে ?

আগন্তুক—পয়সা কি হবে ? এসো আমার সঙ্গে, আকাশে মেঘের ভেলায় চলো আমরা ভেসে যাই, চলো খোকন।

খোকন—চলো চলো।

* * * * * *

খোকন—ও কারা গান করছে ? কি মিষ্টি গলা ওদের--

আগন্তুক—ওরা আশ্রমের ছেলেমেয়ে—এই দেখো আমরা শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছি।

খোকন—ও, এই বুঝি কবিগুরুর আশ্রম ?

আগন্তুক—হ্যাঁ, এই শান্তিনিকেতনকে তিনি তাঁর নিজের আয়ু দিয়ে গড়েছেন একথা রবীন্দ্রনাথ বলেন। ঐ দেখো উত্তরায়ণ, কবি ওখানে থাকেন। আর ঐ যে দূরে রয়েছে শ্যামলী মাটির ঘর, কবি এখানেও মাঝে মাঝে থাকেন। এই হচ্ছে উপাসনা গৃহ আর ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে শ্রীভবন—মেয়েদের বসবাসের জায়গা, তারপর ঐ দিকে চলো লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সব দেখবে।

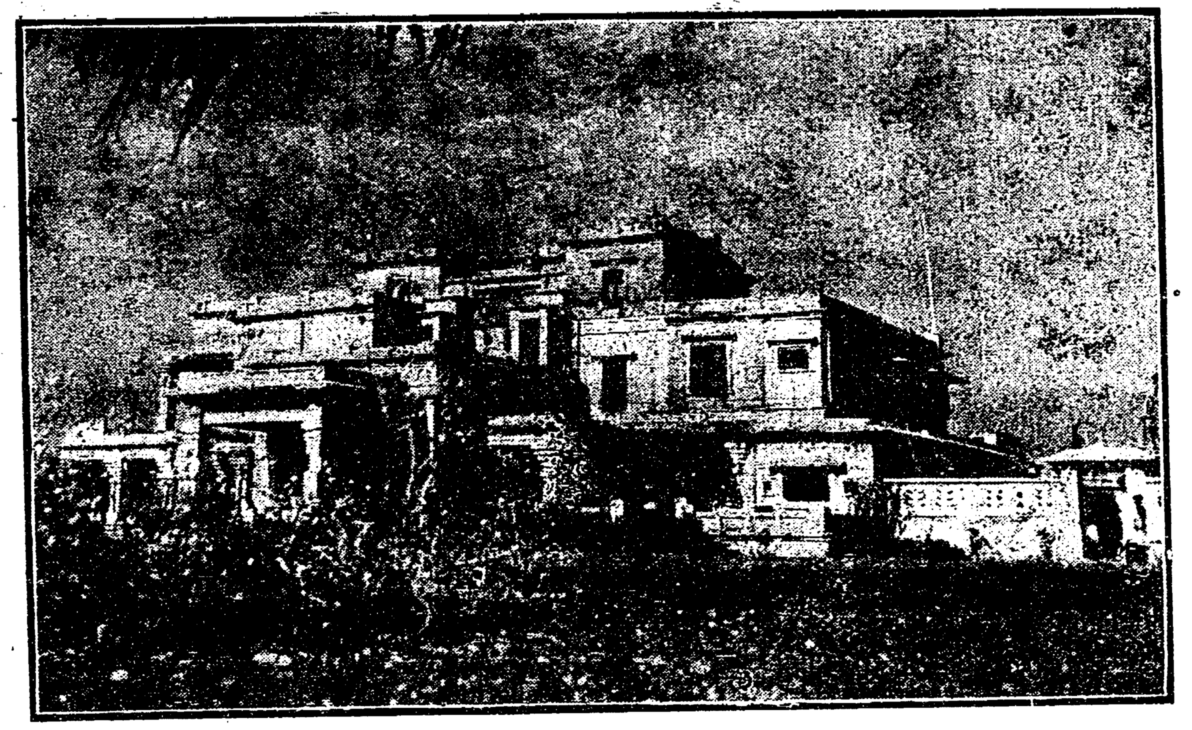

উত্তরায়ণ

খোকন—বাঃ ভারী চমৎকার জায়গা তো! রাঙা মাটির পথ, ওদিকে কত বড় মাঠ, এত ভাল লাগছে আমার। দেখ দেখ আমার মত একটা ছোট্ট ছেলে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ও কে ?

আগন্তুক—ও হলো শিশু ভোলানাথ। আচ্ছা এই দেখো এই গাছের তলায় খোলা মাঠের উপর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্লাস বসে।

খোকন—বাঃ ভারী মজার ব্যাপার তো ?

আগন্তুক—ছেলেমেয়েদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে—এখানে, পরীক্ষার সময় তোমাদের স্কুলের মত পাহারা দেবার দরকার হয় না।

খোকন—কি করা হয় তখন?

আগন্তুক—প্রশ্নপত্র নিয়ে ছেলেমেয়েরা যার যেখানে খুসী চলে যায়—কেউ ঘরে, কেউ মাঠে, কেউ গাছতলায় বসে প্রশ্নের জবাব লেখে।

খোকন—কেউ কেউ যদি চুরি করে উত্তর লিখে আনে—তাহলে?

আগন্তুক—তা হয়তো আনতে পারে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের যা বিশ্বাস করা যায় তা তারা সহজে ভাঙ্গতে পারে না। স্বাধীনতা ও মুক্তির মূল্য যারা জানে তারা এমন কাজ করে না।

মাঠের উপর ক্লাশ

খোকন—আমাদের যদি এমন সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু আমাদের কেউ বিশ্বাস করে না, আমরা ছোট, তাই কেউ আমাদের কথা ভাবে না।

আগন্তুক—এইবার রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাবে—চুপ করো! শুনতে পাচ্ছ স্তব গাথা? কবি বলেন—প্রকৃতিকে এড়িয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, তাই তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নানাভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাবার ব্যবস্থা করেছেন। ঐ দেখো খোকন—ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ!

খোকন—(আনন্দে) রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ—এত সুন্দর তুমি? তোমার ছোট নদী কবিতা আমি পড়েছি, কি চমৎকার তুমি লেখো, কি সুন্দর তোমার চেহারা—

আগন্তুক—চুপ করো খোকন—দেখছ না আজ রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মতিথি উৎসব।

খোকন—দেখ দেখ—শিশু ভোলানাথ কবির কানে কানে কি বলছে।

আগন্তুক—তোমার কথা বলছে।

খোকন—তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন? কি মিষ্টি হাসি ওঁর?

আগন্তুক—দেখছ অগুরু চন্দনের গন্ধে ঘর ভরে গেছে, কবির কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, ললাটে চন্দন—কী প্রশান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য চেহারা, এস আমরা প্রণাম করি, তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করো।

খোকন—হে কবি, হে রাজর্ষি, আজ তোমার জন্মদিনে তুমি বাংলার ছেলেমেয়ের প্রণাম গ্রহণ করো—তোমায় প্রণাম করি।

* * * * * *

দিদি—পাজী ছেলে, সন্ধ্যে বেলায় কথা বলতে বলতে ঢুলতে লাগলেন—পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল—গাঁট্টা মেরে মাথা ঠাণ্ডা করে দেবো। শীগ্‌গীর ওঠ।

খোকন—না, আমি শান্তিনিকেতন থেকে আসবো না—কিছুতেই না। য়্যাঁ—য়্যাঁ আমি শান্তিনিকেতনে থাকবো।

দিদিভাই

শিশু-রবির প্রতি বাঙালী শিশু-মহল

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হোল আশি?—
বাংলা দেশের আমরা শিশু তোমায় ভালোবাসি।
মোদের যত অভিভাবক, বাবা, জ্যাঠা, খুড়ো,
পাকা দাড়ির বহর দেখে তোমায় ভাবে বুড়ো,—
কিন্তু মোদের নজরেতে পড়লে ঠিকই ধরা—
'আসল বুড়ো নয়ক' তুমি, বুড়োর মুখোস্-পরা।

ছদ্মবেশে যতই আঁটো বুড়োর মুখোসখানা,
তুমি শিশু চির-কিশোর মোদের সেটি জানা।
সবাই মিলে আমরা জানি পাড়ার হারু, বিশু,
রবিঠাকুর বুড়ো ত নয়, মোদের মতই শিশু।
যখন তুমি মাকে নিয়ে চল্লে বিদেশ ঘুরে
আমরা তোমায় লক্ষ্য তখন করেছিলুম দূরে।
বর্ষামুখর ছুটির দিনে ঠেস দিয়ে চৌকাঠে
মন্‌টি যখন ঘুরত তোমার তেপান্তরের মাঠে,—
তখন ওহে কবি-শিশু, আমরা খোকাখুকি,
তোমার দ্বারের চারিপাশে দিতাম উঁকিঝুঁকি।
তোমার সাথে ভাব জমাতে ইচ্ছা হোত মনে,
সুরুৎ করে পালিয়ে যেতে শান্তিনিকেতনে।
'বাবা তোমায় রামের মত পাঠিয়ে দিলে বনে'—
লক্ষ্মণ ভাই আমরা হতাম যেতাম তোমার সনে;
হাজার হাজার লক্ষ্মণ ভাই থাকলে তোমার কাছে—
থাক্‌না সীতা, রাবণরাজার ভয়টা বা কি আছে।
যখন তুমি ছুটির পরে কাগজ নৌকা গড়ে'—
নাম লিখে তায় নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে ধরে'—
আমরা তখন জড় হতাম, পাড়ার ছেলেমেয়ে,
তোমার নজর পড়ত না-কি? দেখতে নাকি চেয়ে?
মনে কি নাই,—আম বাগানে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে—
আম কুড়াবার ধূম লাগাতাম সারা সকাল ধরে,
কোঁচড় তোমার ভরে' দিতাম উৎসাহেরই সনে—
ছেলেবেলার সে সব স্মৃতি নাই কি তোমার মনে?
চিরকালের বন্ধু রবি তোমায় ভালবাসি,
রথের দিনে বাজিয়েছিলুম তালপাতার এক বাঁশি,
সেই আনন্দে চিত্ত তোমার উঠলো নেচে দুলে,—
বিড়ালছানায় বই পড়াতে 'চ-ছ--জ-ঝ-ঞ'
দুষ্টু বিড়াল উঠত ডেকে 'মিঞ, মিঞ, মিঞ,'
আমরা তখন ডাক শুনে তার সবাই হোতাম জড়,
তোমার কাছে আসতে মোদের ভয় হোত যে বড়।
তুমি মোদের ভালোবাসো,—জানতাম তা মোরা,—
তোমার বাড়ীর চাকরগুলো বেজায় ছিল কড়া।
বেরিয়ে যখন আসতে তুমি 'প্রাচীন বটে'র তলে—
পুকুর ধারে হাজির হতাম আমরা দলে দলে।

আবার যখন গলি দিয়ে পাঠশালাতে যেতে—
ফেরিওয়ালা চুড়ি নিয়ে হাঁকত দুপুরেতে—
তখন মোরা সঙ্গী হয়ে যেতাম তোমার সনে
চাঁপা গাছে ডাকত ঘুঘু,—নাই কি তোমার মনে?
বাবার মত বড় হবার বড়ই ছিল আশা—
তাক্ লাগাতে সকল জনে, ভেবেছিলে খাসা,—
তুমি কিন্তু বাবার মত হোলে না আর বড়—
রইলে শিশু, যতই আশি বছরেতে পড়।
বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হোলো আশি?
মোদের কাছে শিশু তুমি রইলে বারোমাসই।
বুড়ো বলে তোমায় মোরা ভাব্‌তে পারি না-যে,
তোমার আসন রইল স্থায়ী মোদের আসর মাঝে,
তুমি শিশু চির-কিশোর, বন্ধু তুমি জানি,—
শিশু বুড়ো সবাই করে তোমায় টানাটানি,
তোমায় নিয়ে 'টাগ-অফ-ওয়ার' চলেছে দিবারাতে,
জানি কেহ পারবে না ভাই মোদের দাবীর সাথে।
বন্ধু রবি, শিশু কবি, বিদ্যা তোমার খুবই,—
শুনতে তো পাই কাদের নাকি কর'লে 'নৌকাডুবি।'
'কাদের 'চোখে বালি' দিয়ে ঝরিয়ে দিলে ধারা,
'শিশু ভোলানাথে'র দলে করলে যে 'খাপছাড়া'!
দুষ্টুমিতে দেখছি তুমি মোদের মতই পাকা,—
তবে কেন 'বুড়ো' বলেন বাবা, জ্যাঠা, কাকা?
বন্ধু রবি, তোমার বয়স আশি বছর নাকি?
আমরা জানি আটের পিঠে শূন্যটি যে ফাঁকি।
আশির থেকে অনায়াসে শূন্যটি বাদ দিয়ে
আটবছরের সঙ্গী মোরা করব তোমায় নিয়ে।
শুনতে তো পাই জগৎ-জোড়া তোমার খ্যাতি আছে,—
তুমি কিন্তু শিশু হয়েই রইবে মোদের কাছে।
'নোবেল পুরস্কারে' তোমায় পূজ্‌ল বিদেশ ভূমি,—
মোদের প্রেমের পুরস্কারে রইলে বাঁধা তুমি।

(কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে পঠিত)

দরদী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীইন্দিরা গুপ্ত

তিন বছর আগের কথা !—

নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে আমার জীবনের একমাত্র স্নেহাস্পদ বড় মধুর বস্তু হারিয়েছি। দারুণ ব্যথায় দেহ মন শক্তিহীন, এই সময়ে হাতের কাছে পাই কবিগুরুর বহুবার পঠিত 'গোরা' বইখানা। বই পড়ার মত মনের অবস্থা নয়, শুধু রবি ঠাকুরের নামটা আমার মনকে বইয়ের পানে আকৃষ্ট করে। অন্য মনে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল যেন আজই বইখানা নূতন দেখলাম, এ সব কথা কই আগে ত দেখিনি। কৌতূহলী মন মাঝ পাতা থেকে প্রথম পাতায় এসে স্থির হ'ল। তার পর অখণ্ড মনোযোগের সহিত বহুক্ষণ ধরে বইখানা পড়ে শেষ করলাম। কী অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা, কী শান্তি যে অনুভব করলাম ভাষায় তা বোঝান যায় না।

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে তাঁকে একখানা চিঠি লিখি। উত্তর পাব এ দুরাশা ছিল না। কিন্তু সামান্যা বলে উপেক্ষা না করে, কবি তার জবাব দেন। চিঠিখানা হাতে পেয়েও চোখকে বিশ্বাস হয় না, মনে হয় এ বুঝি ভুল! বুঝি ভ্রান্তি! এও কি সম্ভব! আমার মত অখ্যাতা এক মেয়েকেও তিনি লিখবেন চিঠি! চিঠিখানা পড়া হলে বার বার মাথায় ঠেকিয়ে কবিগুরুর উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লাম,—"রবি নাম তোমার সার্থক হয়েছে! দেব দিবাকর যেমন তাঁর মঙ্গলময় কিরণ ছোটবড় নির্ব্বিশেষে নির্ব্বিচারে ঢেলে দেন, তোমার কবিত্ব তোমার করুণা তোমার মহত্ত্ব তুমিও তেমনি করেই সকলের প্রতি ঢেলে দিয়ে পূত মুগ্ধ তৃপ্ত করছ।"

দরিদ্র ব্যক্তি মহামূল্য রত্ন পেলে আনন্দে অধীর হয়ে যেমন সবাইকে দেখিয়ে ফেরে, আমার অমূল্য সম্পদও তাই প্রকাশ করলাম, সকলকে আমার আনন্দের ভাগ দিতে।

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন

কল্যানীয়াসু,

তুমি হয়ত খবরের কাগজে পড়ে থাকবে আজকাল আমি চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নিগ্ধ চিঠিখানির উত্তর না দিয়ে থাকতে পারলুম না।

আমার রচনার ভেতর দিয়ে তোমার মন পরিতৃপ্তি লাভ করেছে সেটা আমি আনন্দের মনে করি। এমনি করেই আমাদের পরিচয় দূরে বিস্তার করতে পারি, কবিদের এটি একটি বিশেষ সৌভাগ্য।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি—

১৪।৭।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

জগতের সব চেয়ে বড় কবি তুমি,
করিয়াছ ধন্য জন্মভূমি
অহরহ পাও তুমি দেশ বিদেশের
শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য বহু মানুষের
গদ্যে পদ্যে ভক্তজন দ্রুত লেখনীতে
পুঁথি ভরে তব প্রশস্তিতে
সভায় হইয়া জড়ো ব্যগ্র নরনারী
যশ তব প্রচারে চীৎকারি।

জানি সবি, জানাইতে তবু আসিয়াছি
তোমাকে যে ভালোবাসিয়াছি—
নহে, সবে চারিদিকে ঘোষে বলি' জয়
কারো কোনো স্তবগানে নয়,
সে শুধু ভ'রেছে বলি' এই বসুধায়
আমাদের হৃদয়, সুধায়
সে শুধু রেখেছ বলি' বড়ো ও ছোটোরে
এক করি,' চির প্রেম-ডোরে।

অরুন্ধতি পরুন ধুতি
বশিষ্ঠকে পরিয়ে দিয়ে শাড়ি
জমদগ্নি অভিমানে পালকি চ'ড়ে
যান না বাপের বাড়ি ॥
রবীন্দ্রনাথ

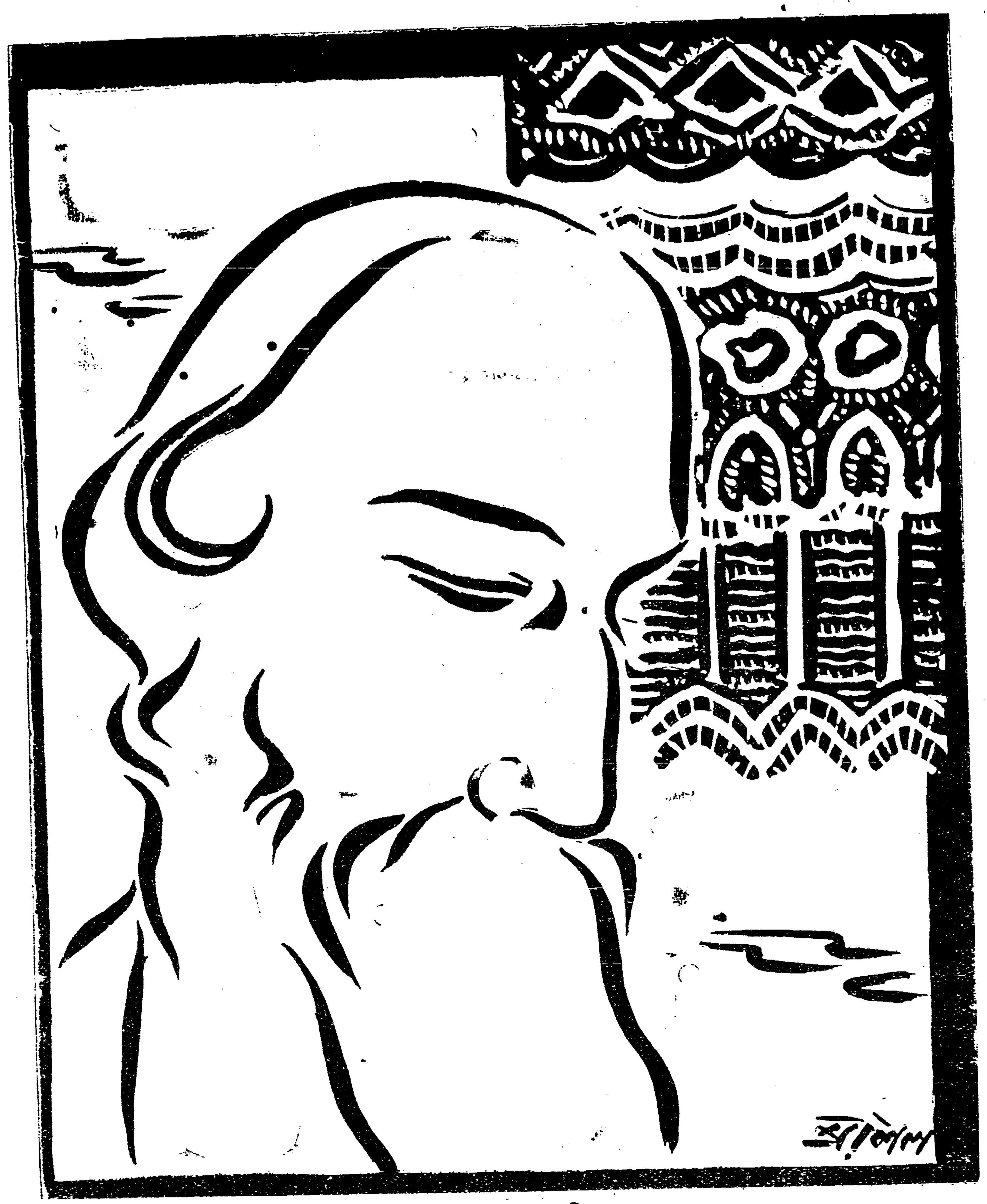

শিল্পীর চোখে রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন

শ্রীঅজিতকুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি গান লেখেন গল্প লেখেন যেমন আর কেউ লিখতে পারে না, "গীতাঞ্জলি" লিখে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আসন পেয়েছেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, এ-কথা তোমরা সকলেই জানো, তাই তাঁর জীবনের আশি বৎসর পূর্ণ হ'ল বলে দেশময় উৎসব চলেছে। তিনি যে দেশকে কত ভালোবাসেন, সে-কথাও তাঁর স্বদেশী গান শুনে তাঁর কবিতা পড়ে অনেকে জেনেছ, পঞ্জাবে যখন দেশের লোকদের 'পরে অত্যাচার হয়েছিল তখন সেই অপমানের প্রতিবাদে তিনি গবর্মেণ্টের দেওয়া "নাইট" বা "সার" উপাধি ত্যাগ করেছিলেন বড়লাটের কাছে তীব্র ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে, এও রংমশালের পাঠকপাঠিকা নিশ্চয় অনেকের জানা আছে, তাঁর "সভ্যতার সংকট"ও অনেকে পড়ে থাকবে। বীরভূম জেলায় বোলপুর শহরের কাছে তিনি যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেই শান্তিনিকেতনের নামও তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। তাঁর এই সাধনায় গড়া ইস্কুলের কথা তোমরা হয়ত বেশি কিছু জান না। পৃথিবীর যিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, দেশবিদেশ থেকে লোক যাঁর উপদেশ পাবার জন্য যাঁকে প্রণাম করে যাবার জন্য জড়ো হয়, যাঁর লেখা পড়বার জন্য দূরদূরান্তরের লোক বাংলাভাষা শেখে, আমাদের গৌরব সেই কবি তো একান্তে বসে তাঁর লেখাপড়া আর বইখাতা নিয়ে বসে নেই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও তিনি কত ভেবেছেন, তাদের আনন্দ দেবার জন্য, তাদের মানুষ করবার জন্য কত দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে তিনি ইস্কুল করেছেন তার কথা শুনতে নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন তোমাদের মত ছোট ছিলেন তখন তাঁকেও যথারীতি কিছুদিন ইস্কুলে পড়তে হয়েছিল। তখনকার দিনে আমাদের দেশে ইস্কুলগুলির অবস্থা ও ব্যবস্থা এখনকার চেয়েও দুঃখকর ছিল। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইঁটের দেয়ালের মধ্যে চারিদিকে বেঞ্চি আর বোর্ডের মধ্যে রুটিন-বাঁধা ক্লাস করে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে পড়ত, অবশেষে অল্প বয়সেই তাঁর ইস্কুলের পড়া শেষ হয়। বাড়ীতেও তাঁর নিয়ম-বাঁধা মাষ্টার ছিলেন, এক দিনও তাঁর কাছ থেকে ছাত্রের ছুটি ছিল না—তাঁর কাছ থেকে পালাবার জন্যও বালক রবীন্দ্রনাথ নানা উপায় অবলম্বন করতেন। এ-সব কথা তিনি তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে ও "ছেলেবেলা"তে লিখেছেন, ঐ বই দুখানি পড়লে তোমরা রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার কথা অনেক জানতে পারবে।

ইস্কুল ও তার নিরানন্দ ধরা-বাঁধা রুটিন-মত লেখাপড়া ভালো লাগত না বলে রবীন্দ্রনাথ যে লেখাপড়ায় কিছু কম মনোযোগী ছিলেন তা নয়। তোমরা হয়ত জানো না, তিনি যে শুধু কবিতা লিখেছেন গান বেঁধেছেন গল্প করেছেন তা নয়—ছোটবেলা থেকে খুব যত্ন করে মন দিয়ে,যত রকম পড়বার জানবার বিষয় হতে পারে সে-সম্বন্ধে অগুনতি বই তিনি পড়েছেন, আর এই বৃদ্ধ বয়সে এখনো তাঁর জানবার উৎসাহ ও আগ্রহ কমে নি, আর তাঁর পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে, তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, গণিত আর বিজ্ঞানও বাদ পড়ে নি—বিজ্ঞান সম্বন্ধে তো তিনি কয়েক বৎসর আগে "বিশ্বপরিচয়" নামে একখানি বইও লিখেছেন। তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের লাইব্রেরীর যে-সব বই এখনও পাওয়া যায় সেগুলি দেখলেই বোঝা যায় তিনি কত যত্ন করে সে-সব পড়েছেন! কিন্তু এ হচ্ছে জানবার স্বাভাবিক আগ্রহে আনন্দের সঙ্গে পড়া—এ তো আর পরীক্ষা পাশ করবার জন্যে জোর করে ইস্কুলে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুখস্থ পড়া নয়।

বাল্যের এই অভিজ্ঞতা তার মনকে গভীর ভাবে দুঃখ দিয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন যে, এ ভালোই হয়েছিল যে তিনি কিছুদিনের জন্য অন্তত ইস্কুলে পড়েছিলেন; তা না হ'লে এই পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ থেকে ছিন্ন করে বদ্ধ ঘরের মধ্যে বাঁধা শিক্ষায় শিশুরা যে কি দুঃখ পায় তা তাঁর অগোচর থেকে যেত।

তার পরে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চল্লিশ, তখন (১৯০১ সালে) তিনি শান্তি-নিকেতনের নির্জ্জন প্রান্তরে, নিজের সামান্য সম্বলের উপরেই ভরসা করে, মুষ্টিমেয় ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়ে, তাঁর মনের মতো প্রণালীতে শিক্ষা দেবার জন্য একটি ছোট ইস্কুল খুললেন। তখন, এবং তার অনেক পরে পর্য্যন্ত, এই ইস্কুলের কথা দেশের লোক বড় কেউ জানত না, তিনি জানতে দেনও নি। এই সময়ে তিনি আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও জীবনযাত্রার কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছিলেন, আমাদের দেশের প্রাচীন আশ্রম ও তপোবনের চিত্র যা তিনি আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে পেয়েছিলেন, তা তাঁর মনকে খুব আন্দোলিত করেছিল, তারই আদর্শ আধুনিক যুগের উপযোগী করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এই আশ্রমে।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার থেকে কোনো কোনো অংশ নীচে ছাপা হ'ল, তার থেকে এই বিদ্যালয় কোন্ ভাব থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তোমরা কতকটা বুঝতে পারবে—

"হে সৌম্য মানবগণ, অনেক কাল পূর্ব্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড় ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁরাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ।

"যথার্থ বড় কাকে বলে? তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড় বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নীচু করেন নি। সত্য কি তাই জানবার জন্য সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—মুখে সত্য জানবার

অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেই তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড় ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড় হবার উপায় মনে করি। ধনীকেই আমরা বলি বড় মানুষ। তাঁরা তা বলতেন না।...

"সেই তখনকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা যে শিক্ষা যে ব্রত অবলম্বন করে বড় হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করার জন্যেই তোমাদের এই নির্জ্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্ব্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে, ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্ব্বে স্ফীত হবে না। কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্ম্মপথে থেকে করবে; অথচ যখন কর্ত্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।..."

এই আদর্শ সামনে রেখে অল্প কয়েকটি ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়ে, গাছের তলায় শান্তি-নিকেতনের ইস্কুল আরম্ভ হ'ল—কোথায় বড় বড় ইস্কুল-ঘর আর বোর্ডিং, চেয়ার টেবিল বেঞ্চি কিছু নেই, তাতে কোনো বাধা হ'ল না। বস্তুতঃ যাতে অনাড়ম্বর ও সহজ সরলভাবে প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শে ছেলেরা মানুষ হতে পারে এইটিই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল।

সাধারণ বিদ্যালয়ের শুষ্ক নিয়মশৃঙ্খল রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করত তা বলেছি, কিন্তু তিনি নিয়ম, ডিসিপ্লিনের একান্ত আবশ্যকতা মানেন না, এ-কথা ভাবলে প্রকাণ্ড ভুল করা হবে। কিন্তু তিনি চান যে, নিয়ম ছাত্রদের উপরে জোর-ক'রে-চাপানো ভারমাত্র না হোক, বিদ্যালয় যেন একটা খাঁচা না হয়—নিয়মের প্রয়োজন তারা নিজেরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে নিজেরাই সেই নিয়মের পরিচালনা করুক। এই জন্য বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের পরিচালনার ভার তিনি ছাত্রদের উপরই অনেকটা ছেড়ে দিয়েছেন। ছাত্ররা নিজেদের মধ্য থেকে পালা করে পরস্পরকে প্রতিনিধি ও নায়ক নির্ব্বাচন করে, তারপর সেই প্রতিনিধি ও নায়কদের উপরে ভার নিয়ম ও দিনের সব কাজ যথারীতি পরিচালিত হচ্ছে কি না তাই দেখা। কেউ কোনো নিয়ম ভঙ্গ করলে বা অন্যায় আচরণ করলে তার বিচারের ভারও ছাত্রদের নির্ব্বাচিত বিচার-সভার 'পরে—মাষ্টার মহাশয়েরা সাধারণত তাতে হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক সময় অনেক অবিনীত ছাত্র বারবার দুর্ব্যবহার করবার ফলে মাষ্টার-মহাশয়েরা তাদের ইস্কুল থেকে সরিয়ে দিতে চাইতেন—এ-রকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার স্বয়ং তাদের ভার নিয়ে, তাদের বিশ্বাস করে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের ভালো পথে এনেছেন।

ছেলেরা যাতে তাদের মন প্রাণের বিকাশে কোথাও বাধা না পায়, যাতে তাদের প্রচ্ছন্ন শক্তি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, এজন্য তিনি বিদ্যালয়ে নানাভাবে তাঁর সমস্ত শক্তি ও

অবসর দিয়ে একটি আনন্দময় পরিমণ্ডল রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। ছেলেদের গল্প বলা, তাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য নূতন নূতন খেলা তৈরি করা ও তাদের সঙ্গে সেই খেলায় যোগ দেওয়া, তাদের অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করা ও তাদের দিয়ে তাই সুন্দরভাবে অভিনয় করানো—এই রকম নানাভাবে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে ছোট বড় ভেদে বিভিন্ন বিভাগে নিজেদের প্রবন্ধ কবিতা গল্প পড়বার জন্য নিজেদের সাহিত্য-সভা আছে, সে-সব সভা তারা নিজেরাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক'রে পরিচালনা করে, বড়রা কেউ সভাপতি হয়ে কিছু বলেন মাত্র। ছেলেরা নিজেই হাতে লিখে কাগজ বের ক'রে সেই সব রচনা প্রকাশও করে। তাদের অভিনয়, সাহিত্যসভা প্রভৃতি দেখে বয়স্ক লোকেরাও বিস্মিত হয়েছেন। খেলাধূলোতেও শান্তিনিকেতনের ছেলেদের কৃতিত্ব উল্লেখ করবার মত, সমস্ত বীরভূম জেলায় সে-কথা সুবিদিত। শুধু বাঁধা-পড়া মুখস্থ না করে শরীর-মনের সব রকম ক্ষমতা পরিচালনা করে ছেলেরা যাতে মানুষ হয়ে উঠতে পারে এইটাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ।

একদিন যা ছিল গাছের তলায় পাঁচজন ছাত্রের ছোট ইস্কুল, চল্লিশ বৎসরে আজ তা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, ছোট ছেলে মেয়েদের ইস্কুল ছাড়াও আরও তার নানা বিভাগ হয়েছে, দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিত লোক এখানে এসেছেন। এখন শান্তিনিকেতন পৃথিবীতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিশ্বভারতী আমাদের দেশের গৌরব। আয়তনে বিস্তারে শান্তিনিকেতনে যতই বড় হোক, এখনও তার আরম্ভকালের আদর্শটি কাজ করে চলেছে,—ইস্কুলকে খাঁচা তৈরি করব না, লেখাপড়াকে মুখস্থ বিদ্যা করব না, পরীক্ষা পাশ করাটাই জীবনের লক্ষ্য বলে জানব না, দেহমনকে স্বাস্থ্যে আনন্দে তেজে পূর্ণ বিকশিত করে তোলাকেই বলে শিক্ষা, সম্পূর্ণ মানুষ, মানুষের মতন মানুষ হওয়াকেই জানব জীবনের উদ্দেশ্য।

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।
ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়াল সেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ,
বলে—চাই গ্লিসেরিন সোপ।

—'সে'—রবীন্দ্রনাথ

সঙ্কলন

রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে তোমাদের অনেকের পরিচয় আছে। কিন্তু এমনও হয় তো অনেকে আছো যাদের সে সৌভাগ্য হয়নি।

আমরা রবীন্দ্রনাথের বই থেকে কতকগুলি লেখা সঙ্কলন ক'রে তোমাদের হাতে দিলাম। অবশ্য, কোনো সঙ্কলনই রবীন্দ্রনাথের লেখার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না, আমরাও সে-চেষ্টা করিনি। কেবল জগতের অপূর্ব্ব মধু ভাণ্ডারের একটুমাত্র স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। যে সব বই থেকে সঙ্কলন করা হয়েছে, আশা করি সেগুলি সবাই তোমরা সংগ্রহ ক'রে সম্পূর্ণ পড়বে।

রাখী সঙ্গীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান—।

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান—

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান—

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজরানী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিলনা রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, কোশল, কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, "মহারাজ, সে কি দেখলুম; কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খসে পড়ে মানিক। কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া,—সে যেন পূর্ণিমা রাতের স্বপ্ন।"

রাজা শুনেই বুঝলেন কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখ থেকে। তিনি বললেন, "আমি নিজে যাব দেখতে।"

সেনাপতি বললেন,—"তবে ফৌজ ডাকি?"

রাজা বললেন,—"লড়াই করতে যাচ্ছিনে।"

মন্ত্রী বললেন,—"তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?"

রাজা বললেন,—"পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।"

"তাহলে রাজহস্তী তৈরী করতে বলে দিই?"

রাজা বললেন, —"আমার এক জোড়া পা আছে।"

"সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?"

রাজা বললেন,—"যাবে আমার ছায়াটা।"

"আচ্ছা তাহলে রাজবেশ পরুন, চুনি পান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।"

রাজা বললেন,—"আমি রাজার সং সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্ন্যাসী।"

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায় মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেল কাঠের দণ্ড।

"বোম্ বোম্ মহাদেব" ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল—বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে,—তাঁর একশো পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, "ডাকো আমার কাছে।"

কন্যার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রং যেন ফিঙের পালং, চোখ ছু'টিতে হরিণের চমকে ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদী নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রং হবে যেন চাঁপা ফুলের মতো। কেউ বা আনল ভৃঙ্গরাজ তৈল, তাতে চুল হবে যেন পম্পা সরোবরের ঢেউ। কেউবা আনল মাকড়সাজাল শাড়ী। কেউ বা আনল হাওয়া-হালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই মনের মতন হয় না।

সন্ন্যেসিকে বললেন, "বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধাঁ, কাজ কর্ম্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আর কিছুই চাই না?"

রাজকন্যা বললেন, "না আর কিছুই না।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আচ্ছা আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে না হয় আবার দেখা দেব।"

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে।

রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নাম ডাক। প্রণাম করে বললেন, "বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারো কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা' বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, "সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।" বলে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর এক হাওয়া অন্দর মহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী করে কাঞ্চী জয় করে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদী করে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন। সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বাবা, শুনেছি সহস্রঘ্নী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে, যার তেজে নগর, গ্রাম, সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তার পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজলক্ষ্মীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউবা চামর দোলাবে, কেউবা ছত্র ধরে থাকবে, আর কেউবা আনবে তাঁর পানের বাটা।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আর কিছু চাইনা তোমার?"

রাজকন্যা বললেন, "আর কিছুই না।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সেই দেশ-জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম।"

সন্ন্যাসী গেলেন চলে, বললেন, "ধিক।" চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝরনার জলে স্নান করে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিন প্রহর। প্রখর রোদ শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়ীতে যোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে সুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগ-পড়া, তার দুইহাতে দুটি শাঁখা, কাণে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মত কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদল শেষের রাত্তির। রাজা বললেন, "বড়ো খিদে পেয়েছে।"

মেয়েটি বললে, "একটু সবুর করুন আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরী হবে আপনার জন্য।"

রাজা বললেন, "আর তুমি কী খাবে তাহলে।"

সে বললে, "আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে খায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্যি হয় গরিবের ভাগ্যে তাতো সহজে জোটে না।"

রাজা বললেন, "তোমার আর কে আছে।"

মেয়েটি বললে, "আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়ে ঘর, আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।"

কন্যা বললে, "আমার যে অপরাধ হবে।"

রাজা বললেন, "তুমি অন্ন নিয়ে চলো আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।"

রাজা বললেন, "তুমি দেবতার আশীর্ব্বাদ পাবে। তোমার কোন ভয় নেই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।"

বাপের জন্য তৈরী অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ করে দু'জনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়ে-ঘরের দরোজায় বসে।

সে বললে, "মা, আজ দেরী হলো কেন।"

কন্যা বললে, "বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।"

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, "আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথ-সেবা করব।"

রাজা বললেন, "আমি তো আর কিছুই চাইনে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর একদিন আসব।"

সাতদিন সাতরাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন, বললেন, "আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রাণী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি—যদি তুমি আমায় দান করো, আর যদি কন্যা থাকেন রাজী।"

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী—কাঠকুড়ানী মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন—রাজধানীতে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে,—ছি!*

চা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়,
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চলো
চলো চলো হে।
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে।
এল চীন গগন হ'তে
পূর্ব্ব পবন স্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণ বাসরে
রস ঝর ঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে।

এসো পুঁথি পরিচারক
তদ্ধিত কারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এসো গণিত ধুরন্ধর
কাব্যপুরন্দর
ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।
এসো বিশ্বভারনত
শুষ্ক রুটিন পথ
মরু-পরিচারণ-ক্লান্ত,
এসো হিসাব পত্তর ত্রস্ত
তহবিল-মিল ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে।

এসো গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন,
এসো চিত্রী চটপট
ফেলি' তুলিকাপট
রেখাবর্ণ বিলগ্ন।
এসো কনষ্টিট্যুশন
নিয়ম বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,
এসো কমিটি পলাতক
বিধান ঘাতক
এসো দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে॥

---

* গল্পসল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
দাম ১৲ টাকা

সে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারিনে। জানি না কত রাত। ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে খুব ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ার পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে,—দাদা ঘুমুচ্ছ না কি।—বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বল সর্ব্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্চি।

জানিনে কেন আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছো ভালো। তোমার ওরিজিন্যালিটি দেখে খুসী হলুম। একেবারে ক্লাসিক্যাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুসী হতেন।

দাদা সমজদার তুমি। এলেম এই জন্যেই তোমার কাছে এত রাত্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনই দেখা চাই।

হাঁ এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বল তো।

কেন যে এতদিন এই আইডিয়াটি মাথায় আসেনি, তাই ভাবি। আপিসের বড় সাহেবের মুখ-দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃত সমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও তো।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, এই একটা স্মরণ কোরো।

অহো, দাদা তোমার কথায় আমার কাঁটা দিচ্ছে। সাব্লাইম যাকে বলে। তাহোলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।

আমার বৌদির ছোট বোন, আছেন তাঁর বাড়ীতে।

চেহারায় তোমার বৌদির সঙ্গে কি মেলে।

মেলে এই কি। সহোদরা বটে।

তাহোলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।

বৌদি স্বয়ং বলে দিয়েছেন টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি।

বৌদির ঠিকানাটা!

সাতাশ মাইল দূরে—চৌবাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

ভোজন আছে তো।

আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হোলো বলতে পারিনে।

লিভরের দোষে ভুগে আসছি বারো বছর—খাবার নাম শুনলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত নিয়ে উচ্ছে সিদ্ধ চমৎকার রাধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাট্‌নি—

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে, টিটিটম্‌টম্, টিটিটম্‌টম্ টিটিটম্‌টম্।

জীবনে কোনদিন নাচিনি—হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল, দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে সুরু ক'রে দিলুম, টিটিটম্‌টম্। মনে হলো আশ্চর্য্য আমার ক্ষমতা, যমুনাদিদি যদি দেখ্‌ত তবে বলত নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্ করে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তো চাই।

একদফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম ?

মনে করলুম মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কিনা বলো।

ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই শোলোক মেলাতে পারো কী না। দূত পাঠিয়েছিলুম 'রংমশাল'-এর সহ-সম্পাদকে, তিনি আওড়ালেন—

সুন্দরী, তুমি কালো কুষ্টি,—

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল।

কনেটি এক নিঃশেষে বলে দিলে—

কানা, তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হোলো, ব'লে দিলে—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে
তোমাকে গড়েছে রাতে.
যবে শেষ হোলো আলো বৃষ্টি।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য্য কী হোলো ?

মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি,—তোমার চেয়ে ইঞ্চি দুই তিন বড়ো হবে। তাই শুনেই তো আমার উৎসাহ।

বলো কী ?

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠেনি।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কী রকম !

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে বলে উঠলুম—ধন্য ! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তাহলে আর কেন দিনক্ষণ দেখা।

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।

রূপে ?

না, কথার মিলে। ঠিক মতো যদি মেলাতে পারি তাহলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি।

পারবে তো।

নিশ্চয়।

প্ল্যানটা কী শুনি।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খুসী ক'রে দাও। মিল হওয়া চাই ফষ্ট্ ক্লাশ।

কনে দেখার যদি পেটেণ্ট নেওয়া চল্‌ত তুমি নিতে পারতে। বরের স্তব দিয়ে সুরু। অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না— আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্ছে এই—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত।

পুরো বহরের মিল দাবি করলে মেয়েটি, বোধহয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ করে।

আমি বললেম,—

স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ্ ভূত।

এক্‌সেলেণ্ট। কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্ত্তি হয় না। আমি বল্‌ছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে ? ভাষায় হোক্ অভাষায় হোক্।

একেবারেই না।

তাহোলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও
যখন তখন করো যদ্ভুত তদ্ভুত।

ও আবার কী ! ওটা কোন্ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত—কিম্ভুত শব্দের এক পর্য্যায়।

যদ্ভুত তদ্ভুত মানেটা কী হোলো ?

ওর মানে যা খুসী তাই। ওটা বঙ্গভাষায়—যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে, "অবদান"।

লোকটার ’পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হোল অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হোলে চলবে কেন? বলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ফস করে ববকরণ পেরিয়ে যাবে তখন্, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈষ্কুম্ভ যোগ, তার পরেই হর্ষণ যোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রাত্তিরে অসৃক যোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র—গোস্বামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ যত—ঘর করণার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড় বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ, ব্রহ্মযোগ, ইন্দ্রযোগ, শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে এক-দিনো পাওয়া যাবে না, রবীয়ান যোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক্। ডাক দাও পুত্তুলালকে মোটর-খানা আনুক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমুতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এ দশা হয়েছে।

গাড়ীতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আসসেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশিয়ালী উঠল ডেকে। তখন সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এদিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব করে লাফাতে দে, বিনিপয়সায় অমন ভালো মালিষ আর পাবিনে। গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী। ইষ্টুপিডের কোন সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল সে তখন বোলপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে। ভারি রাগ হোলো। ইচ্ছে করল তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসিগে। এদিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী করে। গোলমাল শুনে পুকুরধারে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক ক’রে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্চে। ঘুম আসছে।*

* * *

* সে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
দাম ৩৲ টাকা

মংপু পাহাড়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুজ্ঝটি জাল যেই
সরে গেল মংপু-র
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এল গেল, ম’ল এরি মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা-কাটাকাটি সভ্যে-অসভ্যে,
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরি’পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও’ মধুরের বিস্তার।
হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে,
টানা-পাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে
রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর,
আজি তো বয়স তার কেবল আঠাত্তর,
সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শূন্য;
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য।

ছোটো আয়ু মানুষের, তবু এ কী কাণ্ড,
এটুকু সীমায় গড়া মনোব্রাহ্মাণ্ড ;
কত সুখে দুখে গাঁথা, ইষ্টে অনিষ্টে,
সুন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ-উৎসবে, কত সভা-সজ্জায়,
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার নাগাল-ছাড়া কত উপলব্ধি,
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি' ।
অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি'
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি ।

বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য,
নিজেরই ত'বিল-ভাঙা হয় তার কার্য ।
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র,
আমারি কী লোকসান যদি হই শূন্য,
শেষ ক্ষয় হোলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ ।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য ।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সত্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অত্য
জাগ্রত র'বে চিরদিবসের জন্যে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে ।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি,
বারবার ঢাকা দেওয়া, বারবার মুক্তি ।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি,
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি ॥

কিশোর-বঙ্গ
রবীন্দ্র-জয়ন্তী

আনন্দ-উৎসব

— বিবরণী —

এম্পায়ার থিয়েটার
২৮শে মে, ১৯৪১
বুধবার

BLEED THROUGH.

কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

২৫শে বৈশাখ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি তোমাদেরও কবি। এ বছর ঐ দিনে তোমাদের কবি ৮১ বৎসরে পড়েছেন। অনেক বয়স, না? কিন্তু যিনি তোমাদের কবি, তিনি কি কখনও বুড়ো হন? এই তো সেদিনই তিনি তোমাদের জন্য "খাপছাড়া", "সে," "গল্পসল্প" লিখেছেন—সে সব খেলা-ভুলানো পড়া পড়লে কি মনে হয় তাঁর দাড়ি পাকা, ৮০ বচ্ছরের পুরাণো বিচ্ছিরি লোক, না, তোমাদেরই বন্ধু কোনো একজন, মায়াপুরীর যাতুকর, তোমাদের কল্পনারাজ্যের সোণার কাঠি যাঁর হাতে?

তাঁর জন্মদিনের উৎসবে যে তোমরা আনন্দ করতে চাও, তাঁকে তোমাদের প্রাণের খুসী জানাতে চাও, তোমাদের মনের গোপন এই কথাটি, কেমন-করে জানি, তোমাদের ভালোবাসেন এমন কয়েকজন বড়োরাও জানতে পেরেছিলেন। তাই আকাশে বাতাসে যখন খুসীর হাওয়া বইছে, বলছে আজ আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব, সেই সময় সেই আনন্দ উৎসবে যোগদেবার আমন্ত্রণ এলো বাংলার ছেলেমেয়েদের—"তোমরা, ভাই, তোমাদের কবির জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব করবে না?"

এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন তোমাদেরই তরফ থেকে ভারতী সাহিত্যসভা। মাত্র তিন বৎসর এই সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তোমাদের কঠিন দাবী মেটাবার দায়িত্ব এঁরা নিলেন। এঁদেরই উৎসাহে "কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী"র প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোলো এবং তোমরা যাঁদের ভালোবাসো তাঁরা সকলেই এলেন কিশোর-জগতের এই নব-প্রচেষ্টা সফল করে তুলতে। "আনন্দ-মেলা" "মৌচাক," "রামধনু," "শিশুসাথী," "কিশোর বাংলা," "মাস-পয়লা," "ভাই-বোন," "রূপকথা," "রংমশাল"—এঁরা এবং আরও অনেকে এলেন এই উৎসব সফল করে' তুলতে। যাঁদের লেখা পড়ে তোমরা আনন্দ পেয়েছো এবং পাও, তোমাদের মনের ভাঁড়ার-ঘরের চাবি যাঁদের হাতে, তাঁরাও এলেন এই আনন্দ-উৎসবটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে। এঁদের সকলকার উৎসাহ ও সহযোগিতায় এবং "কিশোর-বঙ্গ রবীন্দ্র-জয়ন্তী" কমিটির অক্লান্ত চেষ্টায় ভয়-ভাবনা এবং আশার গণ্ডি পার হয়ে এই উৎসব বাস্তবে পরিণত হ'ল—গত ২৮শে মে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, এম্পায়ার থিয়েটারে, সন্ধ্যা ৬টায়।

তুঃখের বিষয় তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কবি নিজে উপস্থিত থেকে তোমাদের কিশোর হাতের অর্ঘ্য গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু তোমাদের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অংশটুকু কবি নিজেই শান্তিনিকেতনে বসে' শুনেছেন। কারণ সন্ধ্যা ৭-৪ মিনিট থেকে উৎসবের শেষ পর্য্যন্ত যে অংশ, অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্ত্তৃপক্ষ এম্পায়ার থিয়েটার থেকে 'রীলে' করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তোমরা যারা আসতে পারনি তারাও নিশ্চয় এই অংশটুকু শুনতে পেয়েছিলে এবং সকলের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলে যে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ শতায়ু হোন!

সেদিনকার প্রোগ্রামটি তুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম অংশটিতে ছিল "বিচিত্র অনুষ্ঠান," উৎসবের উদ্বোধন, সভাপতির অভিভাষণ ও কবিকে অর্ঘ্য প্রদান। দ্বিতীয়ভাগে ছিল, বিভিন্ন শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকাগুলি থেকে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও কবির লেখা "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়।

এই উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যে তোমাদের মনের কথা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন সেদিনই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল! বিশেষ কিছু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ছিলনা অথচ উৎসব আরম্ভ হবার আগেই টিকিট ঘর বন্ধ করতে হয়েছিল। অনেককে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে সেদিন। অনেকে বিদেশ থেকে এসেছিলেন দেখতে। এই উৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমরাও ছিলাম একজন, যে-সব অতিথিদের নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি। আরও ক্ষমা চাচ্ছি তাঁদের কাছে যাঁরা হলের মধ্যে ছিলেন এবং উপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাবে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। জানেন তো—আমাদের ছোটদের ব্যাপার!

যাই হোক, যখন ড্রপ উঠল, প্রেক্ষাগৃহ তখন লোকে লোকারণ্য! যেদিকে তাকাই কালো কালো মাথা। ছোটমাথা, বড় মাথা, কালো চুল, পাকাচুল বা মোটেই চুল নেই। নীললাল রকমারি রংএর ফ্রক, নীললাল রকমারি রংএর শাড়ী, পাঞ্জাবী, সার্ট, কোট, পাগড়ী (লালপাগড়ী নয়!), টুপি—কিছুই বাদ ছিলনা। তার মধ্যে একজন গেরুয়াপরা স্বামিজিও ছিলেন। চুপিচুপি বলে রাখি—এই স্বামিজিটি তোমাদের ভয়ঙ্কর ভালোবাসেন, ভারতী সাহিত্য সভা বলতে উনি-ই। আবার কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটির উনিই 'মেনস্প্রিং'। কিন্তু উনি অ-নামী, অ-রূপ।

যখন ড্রপ উঠল, প্রেক্ষাগৃহের বিরাট জনতা যেন কেবলমাত্র একজোড়া চোখে পরিণত হয়েছে। নিস্তব্ধ, উদ্‌গ্রীব সভা। কে বলে বাংলার ছেয়েমেয়েরা ডিসিপ্লিন জানে না?

প্রথমে একটি গান হোলো। "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী—" গানটি গাইলেন কুমারী জ্যোতি ও শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা ও আভা মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় উৎসব-সভার উদ্বোধন করেন। তাঁর সম্পূর্ণ বক্তৃতা এই সংখ্যায় অন্যত্র ছাপা হয়েছে (১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার পর ভারতী সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে "অরূপ" সমাগত অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করেন। তারপর অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণটিও রংমশালের এই সংখ্যায় অন্যত্র ছাপা হল (১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অভিভাষণের শেষে "বর্ষশেষ" কবিতাটির উদ্ধৃত অংশ তিনি তাঁর উদ্দীপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি করে কিশোরদের বন্দনা করেন। অতঃপর কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী-র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ ঘোষণা করেন যে, এই বৎসরে কবিকে তিনটি অর্ঘ্য নিবেদন করা হবে। প্রথম অর্ঘ্যটি দেওয়া হবে সমগ্র বাংলার ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে, এটি তৈরী করেছেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ জুয়েলার্স এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স। দ্বিতীয়টি দেওয়া হবে আনন্দ-মেলার সভ্যসভ্যাদের পক্ষ থেকে—এটি তৈরী করেছেন ঘোষ এণ্ড সন্স। তৃতীয়টি দেওয়া হবে বাংলার শিশু-সাহিত্যলেখকদের পক্ষ থেকে, এটি তৈরী করেছেন ধাতুশিল্পী "রয়কো" প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া ভারতী সাহিত্যসভা থেকেও অর্ঘ্য প্রদান করা হয় কবির ফ্রেমে বাঁধান একটি প্রতিকৃতি। এই অর্ঘ্যের একটি ছবি আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশিত করলাম।

অতঃপর উৎসবের 'বিচিত্র অনুষ্ঠান' অংশটি আরম্ভ হয়। এই অংশটি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীবিমল বসু ও শ্রীবিমান ঘোষ। তোমরা শুনে সুখী হবে যে এই অংশে যারা যোগ দিয়েছিল তারা সকলেই রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকা এবং 'রংমশাল দল'এর সভ্যসভ্যা। যখন গত ৫ই বৈশাখ 'রংমশাল দল' রেডিওতে তোমাদের সম্পাদকের লেখা "বৈশাখী" নাটক অভিনয় করে, তখন এদেরই অভিনয় তোমরা বেতারে শুনে খুসী হয়ে আমাদের চিঠি লিখেছিলে। তোমাদের 'দিদিভাই'ও এই দলের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন, কিন্তু ধরা দেননি, তোমাদের 'মৌচাক'এর বন্ধুদের 'মধুদি'র মত।

জয়শ্রী সেন

বিচিত্র অনুষ্ঠানে প্রথম একটি গান হল। মিষ্টিগলা, গায়িকা কুমারী জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর হ'ল ছোট মেয়ে জয়শ্রী সেনের নাচ। "আমার ভুবন ভুলানো এলে—" কবির এই গানটির সঙ্গে সঙ্গে যখন নাচল—সকলেই এই ছোট মেয়েটির নাচের ছন্দে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সভাপতি ডাক্তার নাগ এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সরকার মহাশয় তখনই তাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন

জানান এবং সভার শেষেও তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কুমারী জয়শ্রী 'কনকলতা গান্ধর্ব্ব বিদ্যালয়ে'র ছাত্রী।

কুমারী জয়শ্রীর নাচের পর শ্রীমান্ অরুণ চক্রবর্ত্তী ও কুমারী মঞ্জুশ্রী 'অল্পেতে খুসী হবে দামোদর শেঠ কি—?'—এই কবিতাটি পরিষ্কার গলায় এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে আবৃত্তি করে। শেষ লাইন 'ঝরিয়ায় খোঁজ নিও জিলিপির রেট কি' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তার (অরুণ) অন্তর্ধান—কিন্তু সর্ব্বনাশ, ড্রপ আর পড়েনা! গিন্নী (মঞ্জুশ্রী) বোধ হয় তখন ড্রপের ভাবগতিক দেখে ভাবছিল এই ফাঁকে কর্ত্তাকে আর কিছু অর্ডার দেবে কিনা— কিম্বা পাল্লারামকে ডাকবে কিনা— আর দর্শকেরা বোধ হয় ভাবছিলেন কর্ত্তা একেবারে জিলিপি নিয়েই ষ্টেজে ফিরবে বুঝি। এমন সময় ড্রপ পড়ল! সাড়ে সাত বছরের গিন্নী মঞ্জুশ্রী জিলিপির ভাবনা থেকে বাঁচলো!

অরুণ চক্রবর্ত্তী

মঞ্জুশ্রী সেন

এর পরে শ্রীমান্ অজিত কবির আর একটি লেখা 'কাঠের সিঙ্গী' আবৃত্তি করল। তারপর আরম্ভ হল একটি সুন্দর ট্যাব্লো নৃত্য—রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার'—সেই 'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত' কবিতাটি সহযোগে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত (কুমারী শেফালিকা বসু) শুয়ে আছেন — বাসবদত্তা (কুমারী মিনতি ঘোষ) আসছেন মৃদু লঘু পদক্ষেপে, দীপহাতে। ট্যাবলোটি অতি সুন্দর হয়েছিল, উপগুপ্তের অভিনয় এবং বাসবদত্তার নৃত্য অপূর্ব্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় রেডিওতে যে অংশটি 'রীলে' হবে তার সময় হয়ে যাওয়ায় ট্যাবলোটি শেষ করা গেলনা। ঝড়ের ঝঞ্ঝনার মধ্যে সেই যে বাসবদত্তা গেল আর ফিরল না। পরে শুনলাম দর্শকেরা এর জন্য অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু উপায় ছিল না—Time, Tide and the Radio wait for no one!

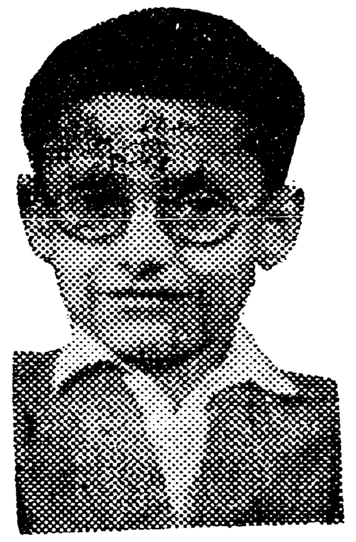

অজিত চক্রবর্ত্তী

প্রোগ্রামের দ্বিতীয়ভাগের সুরু হল। নজরুল ইসলামের একটী কবিতা আবৃত্তি করলেন শ্রীঅখিল নিয়োগী। তারপর শ্রীমতী লীলা দেবীর একটী গানের পর কবির লেখা

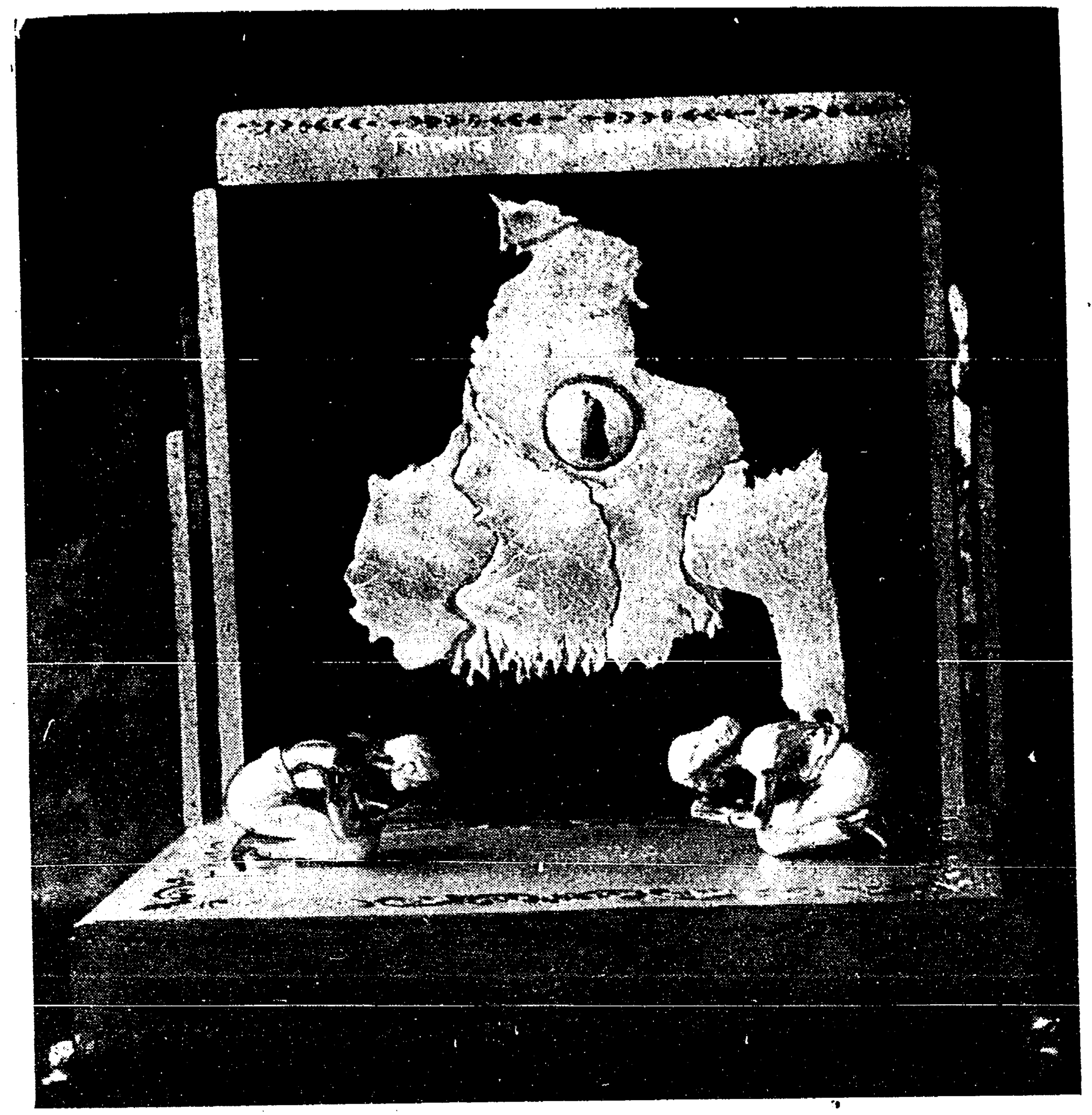

বাংলার বুকের মাঝে রবীন্দ্রনাথ

রৌপ্য-নির্ম্মিত এই উপহারটি বাংলার ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে কবিগুরুকে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ নিবেদিত হয়েছে। এটি তৈরী করেছেন সুপ্রসিদ্ধ রত্নশিল্পী এম বি সরকার এণ্ড সন্স। এটি কলেজ ষ্ট্রীটে গ্লোব নার্শারীর শো-কেসে দেখতে পাওয়া যাবে।

শ্রীমান্ নিখিল ঘোষ

'ডাকঘর' অভিনয়ে অমলের ভূমিকায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

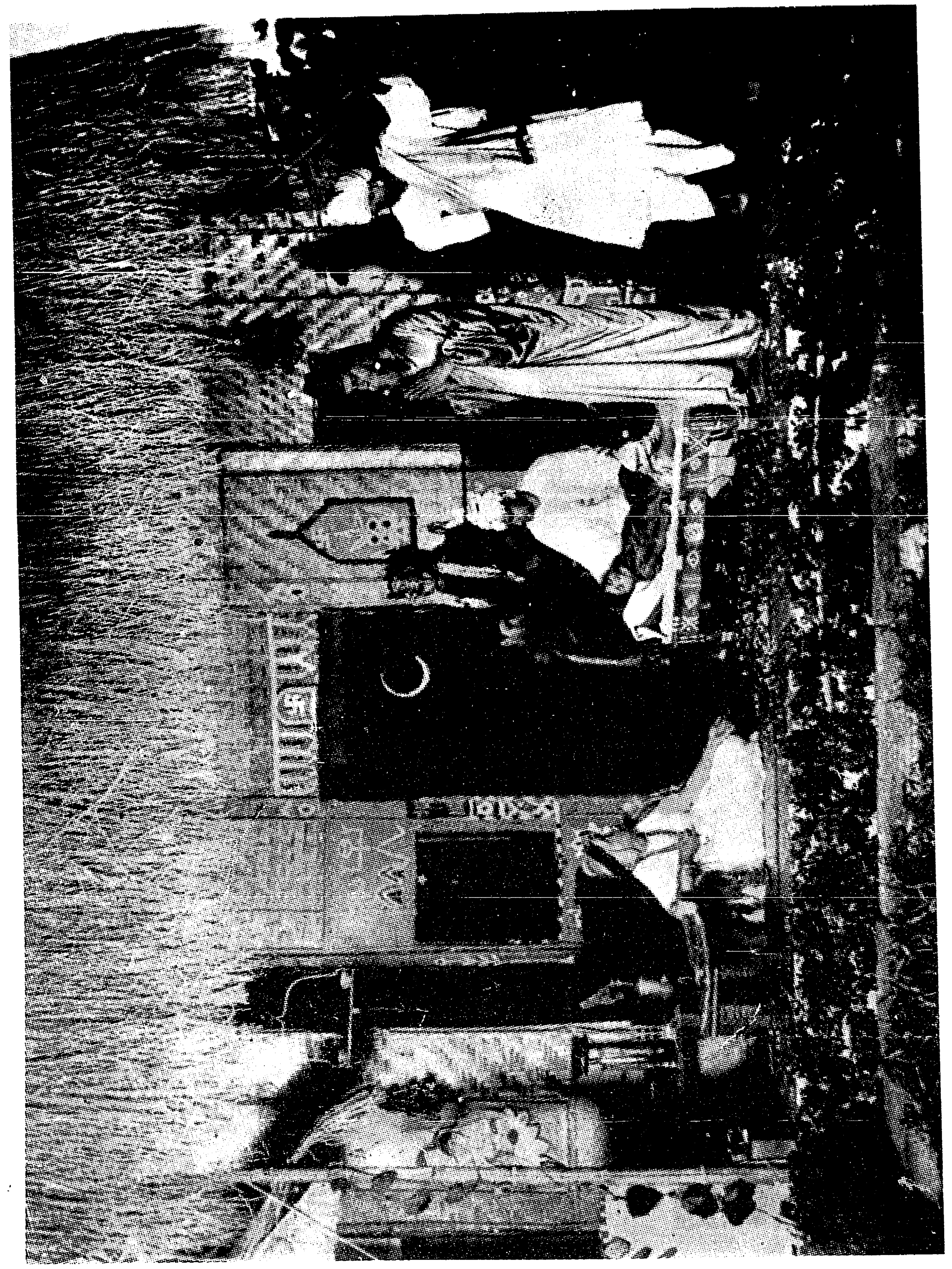

'ডাকঘর' নাটকের শেষ-দৃশ্য

ডিসেম্বর, ১৯১৭ সালে নাটকটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথকে দৃশ্যটির বিভিন্ন অংশে দেখা যাচ্ছে।

(শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে)

মুদ্রণ—বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

"ডাকঘর" অভিনয় হল। অভিনয়ের অংশগ্রহণ করেছিলেন—

অমল—শ্রীমান নিখিল ঘোষ
অমলের পিসেমহাশয়—শ্রীবিমল ঘোষ
সুধা —কুমারী বাণী ভট্টাচার্য্য
ঠাকুর্দ্দা—কবি গিরিজাকুমার বসু
কবিরাজ—শ্রীসুনির্ম্মল বসু
মোড়ল—শ্রীঅখিল নিয়োগী
রাজকবিরাজ—শ্রীমন্মথ রায়
রাজদূত—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রহরী—শ্রীনরেন্দ্র দেব
দইওয়ালা—শ্রীনির্ম্মল চৌধুরী
ছেলের দল—শ্রীহিমাদ্রি বসু, কুমারী জয়শ্রী ও মঞ্জুশ্রী সেন

নাটকটির অভিনয় অগোগোড়া অতি সুন্দর হয়েছিল। অমল (নিখিল) এবং সুধা (বাণী)র অভিনয় এত ভাল হয়েছিল যে সভাতেই ঘোষণা করা হয় যে তাদের কতকগুলি (নিখিল—৪টি, সুধা—২টি) পদক উপহার দেওয়া হবে। আমরাও শ্রীমান্‌নিখিল এবং কুমারী বাণীকে অভিনন্দন করি। তোমরা শুনে খুসী হবে যে শ্রীমান্ নিখিল পড়াশুনাতেও খুব ভালো।

বাণী ভট্টাচার্য্য

তোমরা বোধহয় অনেকেই জানো না রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'ডাকঘরের' অভিনয় করেছিলেন। এই সংখ্যায় অভিনয়ের শেষ দৃশ্যের একটি ছবি আমরা প্রকাশ করলাম।

'ডাকঘর' নাটকটি আরম্ভ হবার আগে শিশু-মাসিক-পত্রিকা-গুলির পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। প্রথমে বাংলার প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয় কবিকে তাঁর সুললিত গদ্যছন্দে অভিনন্দিত করেন। তার পর শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু, 'শিশু-রবির প্রতি বাঙ্গালী শিশুমহল' নামে একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি এই সংখ্যায় ছাপা হল। তারপর বিভিন্ন শিশু-পত্রিকার তরফ থেকে যথাক্রমে নরেন্দ্র দেব (পাঠশালা), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অনুপস্থিতিতে খগেন্দ্রনাথ সেন (রংমশাল), অখিল নিয়োগী (মাসপয়লা), মধুদি (মৌচাক), প্রভাতকিরণ বসু (ভাইবোন), ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (রামধনু), সুধাংশু গুপ্ত (কৈশোরক), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (রেডিওর ছোটদের আসর), রবিরঞ্জন মিত্রমজুমদার (রূপকথা), অরূপ (কিশোর বাংলা) এবং মৌমাছি (আনন্দ-মেলা) কবিকে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এঁদের লেখাও এই সংখ্যায় ছাপা হল।

গোপালদাস গুপ্ত

'ডাকঘর' নাটক অভিনয়ের পর বালক গায়ক শ্রীমান্ গোপালদাস গুপ্তের একটি গান, কুমারী নীলিমা গাঙ্গুলীর নাচ ও সবশেষে একটি কোরাস গানের পর উৎসব শেষ হয়। শ্রীমান্ গোপালের গান ও নীলিমার নাচ সকলেরই ভাল লেগেছিল।

উৎসবের শেষে যখন সকলেই আমরা বাড়ী ফিরলাম, তখন মনে হচ্ছিল বুঝি সকলকার মনেই এক প্রশ্ন—এমন একটি উৎসব আবার কবে হবে?

কবি-প্রশস্তি

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে 'ডাকঘর' অভিনয় হবার আগে শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধিরা কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, সেই রচনাগুলি থেকে সারাংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :—

'মধুদি' (মৌচাক)

...আজ এদেশের কিশোর-কিশোরীরা বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবার জন্য যে একত্রিত হয়েছে, এমন আনন্দমেলার সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে এদেশে আর ঘটেনি। কিশোর-কিশোরীদের প্রার্থনা যেন বিশ্বনিয়ন্তার চরণ স্পর্শ করে ধন্য হয়—কবিকে স্মরণ করে তাঁকে ঘিরে এদেশের ছেলেমেয়েদের এই আনন্দ-উৎসব যেন বিশ্বকবির অন্তর স্পর্শ করে।

'কিশোর রবীন্দ্রজয়ন্তী'র উৎসবে আজ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দল ও শ্রেণী বিভেদ ভুলে শিশু সাহিত্যিকরা একত্র হয়েছেন, মনে পড়ে রাখী-বন্ধনের শুভ প্রচেষ্টা,—রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তার উদ্যোক্তা, আজ বহুমানুষের এই একত্র সমাবেশ, এই সঙ্ঘবদ্ধ আনন্দমেলার আয়োজনে যেন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক-হওয়ার মধুমন্ত্র, একত্রীভূত শক্তিলাভ করবার মধুব্রত যেন এরা গ্রহণ করতে পারে। উৎসব-সভায় এসে আজ এই প্রার্থনা জানাই —হে যুগসূর্য্য ! তুমি প্রতি জন্মতিথিতে নব নবরূপে জন্মলাভ করেছ, তুমি তোমার প্রতিভার জ্ঞানের আলো রবি রশ্মির মত দিকে দিকে পাঠিয়ে দিয়েছ ! হে কবিগুরু, হে কার্ম্মশ্রেষ্ঠ, হে প্রতিভার পুত্র, আজকের উৎসবে তুমি সর্ব্বসাধারণের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বজাতির প্রণাম গ্রহণ করো। হে রাজর্ষি, তোমার আবির্ভাবের পরম লগ্নে এ পৃথিবী তোমায় প্রণাম পাঠায়। তোমায় প্রণাম করি।...

'মৌমাছি' (আনন্দ-মেলা)

...রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হলো যে তিনি ভালোবেসেছেন এই সুন্দর ধরণীকে, তার প্রতিটী প্রাণী গাছপালা সবাইকে—সকল দ্বন্দ্বের শেষ ঘটেছে তাঁর বাণী আর লেখার ভিতর দিয়ে। পশ্চিম আর পূব তার আলোতেই হয়েছে একাকার—এই রবি, ভারতের গৌরব সূর্য্যকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে তারাই, যারা মনে প্রাণে মেনে নেবে তাঁর 'মৈত্রী'র বাণী, 'সাম্যে'র বাণী 'শান্তি'র বাণী; হিংসা দ্বেষ দূরে রেখে যারা ভালোবাসতে পারবে সমস্ত মানুষকে। তাঁরই মত দরদভরা দৃষ্টি নিয়ে যারা তাকাবে জননী জন্মভুমি বাঙলার দুঃখ দুর্দ্দশার দিকে, যারা কালোমেঘের গুরু গুরু ডাকে ভয় পাবেনা, শেকলের ঝন্‌ঝনানিতে যারা শিউরে উঠবে না—যারা মেঘের পারের অরুণ আলোর আশায় বুক ভরে রেখেছে তারাই, শুধু তারাই পারে মুক্তি মন্ত্রের ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে—এ যোগ্যতা যে শুধু তোমাদেরই আছে, বাঙলার কিশোরকিশোরীরা একথা প্রমাণ করেছো—বাঙলার শিশুসাহিত্য লেখকেরাও তাই তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।.. সেই শিশু-ভোলানাথের দল, যারা কবিকে ভালবাসে নিঃস্বার্থভাবে, 'আনন্দ-মেলা'র সেই ছোট ছোট বন্ধুদের

ছোট্ট একজন আমি,—যারা আজ আমার দূরে কাছে বসে রয়েছে কবিকে শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদনের মন্ত্র নিয়ে—তারা সবাই বলো—ছোট্ট প্রণাম জানিয়ে—

পূর্ব্বাচলের গৌরব রবি
ভুবন-গগন জুড়ি
তোমার আলোতে বাঙালীর ব্যাধি
'দলাদলি' যাক্ পুড়ি।

তোমার আলোতে জাগুক বাংলা
দেখুক নয়ন মেলে
সকলের আগে ছুটিয়া চলুক
সবারে পিছনে ফেলে।

'অরূপ' (কিশোর বাংলা)

...রবীন্দ্রনাথ আমাদের কি দিয়েছেন, কতো মহান তিনি তা পরিমাপ করবার শক্তি আমার নেই। আর যাদের প্রতিনিধি হয়ে আমি আজ এখানে দাঁড়িয়েছি, তাদেরও সে শক্তি নেই। শুধু এইটুকুই আমরা বলতে পারি—কল্পতরুর মতো অফুরন্ত দান আমরা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনদেশে কখনও কেউ কোন জাতীকে এতো দিয়েছে কিনা জানিনে। তাঁর যোগ্য অর্ঘ্য দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে যত ছোটই হোক, যতো তুচ্ছই হোক, জানি—বাংলার ফুটন্ত কিশোরদের অন্তরের এ দান তিনি প্রত্যাখান করবেন না।

...বিশ্বদেবতার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

সুধাংশু গুপ্ত (কৈশোরক)

...১৩৪৩ সনের চৈত্র মাস। আমরা আমাদের পত্রিকা বের করার জন্য সব আয়োজন ঠিক করে ফেলেছি, কিন্তু নামকরণ তখনও হয়নি। প্রেসের মুদ্রাকর মশাই ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছেন, ফর্ম্মা যে মেক-আপ করতে পাচ্ছিনা, নামটা লিখে দিন। সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবেরা অনেক নাম লেখেন কিন্তু কোনটিই আমাদের মনঃপূত হলো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লেখা হলো। ছয়দিন কেটে গেল জবাব আর আস্‌ছে না। সাতদিনের দিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে জানালেন যে তোমাদের পত্রিকার নাম "কৈশোরক" রাখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম নিয়ে আমরা যাত্রা সুরু করি। আজ তাঁরি আশীর্ব্বাদে 'কৈশোরক' পাঁচ বছরে পড়েছে।.. ...কিছুদিন হলো আমরা বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম গল্পের বই "গল্পসল্প" সমালোচনার জন্য পেয়েছি। বইখানা আমাদের পড়া হয়ে গেছে। "গল্পসল্প" বইখানাতে মোট বত্রিশটি রচনা আছে। তার মধ্যে ষোলটি কবিতা। গল্পও কবিতাগুলো ভারী সুন্দর হয়েছে। যেমন মিষ্টি ভাষা, তেমনি মধুর রচনা ভঙ্গী আমরা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।....বছরের পর বছর তাঁর হাত থেকে এমনি সুন্দর বই বের হয়ে বাংলার শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুক, আমরা রসাস্বাদন করে নিজেরা ধন্য হই।

প্রভাতকিরণ বসু (ভাইবোন)

দেশ জুড়ে আজ সবাই বলে কেই বা বলো বল্‌ছে না ?
'একশো বছর একশো বছর, কম কিছুতেই চল্‌বে না !'
এমন কবি আস্‌বেনা আর পাঁচশো বছর যায় যদি !
একশো বছর তাই চেয়েছি, চাইছে গিরি, চায় নদী,
চাইছে সুনীল দিগন্ত, আর শ্যামল মেঘের জলকণা,
চাইছে কিশোর, চাইছে বালা, চাইছে তরুণ কল্পনা !

'রবীন্দ্রনাথ'—বাণী পূজায় মন্ত্র যেন জপ করায়।
রবীন্দ্রনাথ বাদ্ গেলে এই সাহিত্য আর লক্ষ্য কার!
একটি আলোর উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত মন্দিরে—
অন্ধকারের শঙ্কাতে সব করছে নূতন ফন্দীরে!
যুক্ত করে বিশ্বদেবে বল্‌ছে ডেকে প্রাণ খুলে,
'একশো বছর দাও হাতে তার দান তুলে।
দাও হাতে তার এমনি আয়ু!' কইছে দেশের লোক সবি।
একশো পাবে চাইবে আবার মৃত্যুহীন হোক কবি!
ভবিষ্যতের পথবিপথে আস্‌ছে আরো কিশোর মন,
চাইনা গো তাই বাংলাদেশের এই মুরতি বিসর্জ্জন।
লক্ষ গলায় চেঁচিয়ে বলো, কক্ষে কবির যাক্ শোনা—
একশো বছর পুর্ণ হবে! একান্ত এই প্রার্থনা।
কক্ষে কবির ঝঙ্কারিত লক্ষ গলার বীর মাতন
টলিয়ে দেবে অর্ঘ্য হ'য়ে স্বর্গলোকের সিংহাসন।

রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার (রূপকথা)

পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের ঘুমন্ত মন যিনি জ্ঞান, প্রীতি ও আলোর সোণার কাঠিতে জাগিয়ে চলেছেন, আমাদের দেশের সেই বিজয়ী ভাবুক রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের আজ জয়ন্তী উৎসব। জগতে বুঝি আনন্দের আর শেষ নেই। সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর তিনি। আজ ফুলেরা কত খুসী হয়ে ফুটেছে। এসো আমরা অঞ্জলী নিয়ে প্রণাম করি।—আমাদের বরেণ্য রাজকুমারকে জয়মাল্য পরিয়ে দিই। ঘরে ঘরে দীপ-জ্বালা হোক। তাঁর উৎসব সুরু হতে যেন দেরী না হয়।

অখিল নিয়োগী (মাসপয়লা)

...সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যা রবীন্দ্রনাথের করস্পর্শে প্রস্ফুটিত না হয়েছে! অন্য সব কথা বাদ দিয়ে আজকের দিনে শুধু যদি শিশুসাহিত্যের কথাই স্মরণ করা যায় তবে বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকেনা! নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব আর পাণ্ডিত্যকে দূরে সরিয়ে রেখে কী ভাবে তিনি শিশুর মতোই বালুকা নিয়ে 'খেলাঘর' রচনা করেছেন—সেকথা ভাবতে গেলে ভাবনার খেই যায় হারিয়ে! তাইত শিশুর দল মনে করে রবীন্দ্রনাথ তাদেরই দলের একজন। হাসির হুল্লোড়ে তাদের সেই খেলাঘরে এই বৃদ্ধ-শিশু কবি সবাইকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে মাতিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবেন। রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য শিশুদের মতোই ধূলো-কাদা মেখে, আতুল গায়ে একান্ত বন্ধুভাবে এসে পাশে দাঁড়ায়। তাইত শিশুরা তাঁর লেখা পড়বার সময় ক্ষণে ক্ষণে এই কথা মনে করে পুলকিত হয়ে ওঠে যে এত আমাদেরই গাঁয়ের নদী,—এযে আমাদেরই পাড়ার কুঁড়ে ঘর, এইত সব আমাদের মনের কথা বুকের মাঝে ভীড় জমিয়ে ছিল—কবির লেখনীর হালকা পরশ পেয়ে তা হুড়হুড় করে বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে আসর করে নিলে। তাইত রবীন্দ্রনাথের ছড়া রবীন্দ্রনাথের গান শিশুচিত্তকে এমন করে জয় করে নিয়েছে! বড়রা যখন ঘটা করে রবীন্দ্রনাথের জন্য স্বর্ণ-সিংহাসন তৈরী করতে ব্যস্ত, শিশুর

দল সেই ফাঁকে কবিকে লুট করে নিয়ে এসে তাদের ধূলো কাদামাখা খেলাঘরে বসিয়ে তাদের তৈরী কাদার-পায়েস আর পাতার লুচি পরিবেশন করতে লেগে গেছে। কবি জীবন-সায়াহ্নে স্মিতহাস্যে সেই খেলা উপভোগ কচ্ছেন...দূর থেকে সেই মহোৎসবের কলধ্বনি ভেসে আসছে। তাইত আজ আমরা পরিতৃপ্ত।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (রেডিওর ছোটদের আসর)

জগতে এক বিচিত্র দেশ আছে।

যেখানে মানুষ জন্মায়, আর তার পরই বুড়ো হয়ে যায়। সেখানে শিশুরা হাসে, কান্নার মত শোনায়; কিশোর কিশোরীরা খিল দেওয়া ঘরের ভিতর থেকে খোলা জানলা দিয়ে দেখে উদ্ধত হাতে বেতের আস্ফালন; যৌবন ছুটতে গিয়ে দেখে, ছুটে-চলা বারণ, পায়ে তাদের ছেকল।

সেই অবরুদ্ধ কিশোরের দেশে, শিশু-ভোলানাথের খেলাঘরে,

হে চির শিশু, হে চিরকিশোর,

একদা এমনি একটি অবরুদ্ধ কিশোর, তোমার লেখার মধ্যে পেয়েছিল, তার জীবনের স্বাদ,তুমিই চিনিয়েছিলে তাকে ফুলেতে আছে সুরভি আকাশে আছে রঙ, বন্ধনে আছে বন্ধন-খোলার আনন্দ, আজ তার সেই কৃতজ্ঞতা, প্রণাম হয়ে তোমার পায়ের কাছে যদি পৌঁছয়, তবে সে ধন্য হবে এবং আমি, বেতারের সাহায্যে বাংলা দেশের যে-সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়েছি,

আমার প্রণামের সঙ্গে,
তাদেরও প্রণাম,
হে কবি, পাঠালাম তোমার চরণে।

ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (রামধনু)

...পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিদ্বজ্জন সভা কতবার তোমার গলায় জয়মাল্য পরিয়েছে...পৃথিবীর যে দেশে গেছ সেখানেই তুমি রাজার মতো সম্মান পেয়েছ; সে সবের কথা স্মরণ করে আমাদের এই নগণ্য পূজোপকার নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াতে কুণ্ঠা বোধ করছি, কিন্তু তোমার মধ্যে যে চিরকিশোর কবি লুকিয়ে আছে তারই কথা মনে পড়তে সে সঙ্কোচ দূরে চলে গেছে।...শিশু ও কিশোরের মনোরাজ্যে ঢুকে তুমি যে সুধা বিতরণ করেছ, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা কোথায়? এতবড় কবি হয়েও ছোট্ট শিশু ও কিশোরদের তুমি দূরে ঠেলে রাখনি—তাদের প্রতি তোমার উচ্ছলিত স্নেহধারা তোমার কবিতার ছন্দে ছন্দে জড়িয়ে রয়েছে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের আর কারুও মধ্যে তো কখনও এমনটা দেখিনি!

হে কবিশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর তোমাকে শতায়ু করুন—চিরজীবী করুন। বার্দ্ধক্যের জরা যেন তোমার দেহে ক্লান্তি না আনে। আকাশ ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডল কুয়াসাচ্ছন্ন হ'লেও রবির কিরণকে সে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না, নতুন তৃণে যে সে কিরণকে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। কিশোর ভারত তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে, তুমি না হলে কে তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে? তোমার দীর্ঘ জীবন তাই আজ আমাদের সকলের বড় কাম্য। হে কবিভাস্কর, তোমাকে বারবার নমস্কার।

নরেন্দ্র দেব (পাঠশালা)

ভালে যাঁর চিরদীপ্ত প্রতিভার সমুজ্জ্বল শিখা
ভুবন ভরিল যাঁর লোকোত্তর মনীষার লিখা,
ভাবনা ত্রিকালস্পর্শী, বিশ্বজয়ী যাঁর সংবেদন
দর্শনে ভাষণে যাঁর পরিতৃপ্ত নিখিলের মন
নিত্য নব ছন্দ গীতে কাব্যে যাঁর চিত্ত-অভিরাম
আজি তাঁর পাদপদ্মে শ্রদ্ধাভরে নিবেদি' প্রণাম !

আয়ু যাঁর সমুত্তীর্ণ যশাকীর্ণ অশীতির সীমা
তথাপি অম্লান তেজে জাগে যাঁর তারুণ্য গরিমা
অফুরন্ত দানে যাঁর পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্য বাণীর
ঋষভ ঋত্বিক যিনি ঋতুযজ্ঞে প্রকৃতি রাণীর
পরম সঙ্গীতে যাঁর ঝঙ্কৃর্ত অমৃত সুরগ্রাম
আজি তাঁর শ্রীচরণে প্রীতমনে রাখিনু প্রণাম।

সত্যশিব সুন্দরের ধ্যানমগ্ন যিনি চিরদিন
ভূমার সন্ধান লভি নিরন্তর আনন্দে বিলীন
রম্যরুচি রসাবেশে কলালক্ষ্মী স্বপ্নে যাঁর জাগে
আত্মার আত্মীয় যিনি অপ্রমেয় প্রীতি অনুরাগে
মহাজ্ঞান মন্ত্রে যাঁর মূঢ় প্রাণে আলোর সঞ্চার
জানাই কৃতজ্ঞ চিত্তে আজি তাঁরে কোটি নমস্কার।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (রংমশাল)

একটি পিপীলিকা যদি হিমালয়ের পদপ্রান্তে গিয়ে হাজির হয়, তাহ'লে সে হিমালয়ের কতটুকুই বা দেখতে পায় ? ধরতে গেলে, কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথকে দেখবার চেষ্টা করলেই নিজেকে আমি পিপীলিকার চেয়ে বড় বলে মনে করতে পারি না।

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য রামা-শ্যামা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এবং অধিকাংশ রামা-শ্যামার চেয়েই মানুষ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মাথায় বেশী উঁচু হবেন না। 'মাথায় আমি রবীন্দ্রনাথেরও চেয়ে উঁচু'—এ-কথা সদর্পে বলতে পারে, পৃথিবীতে এমন অকিঞ্চিৎকর মানুষেরও সংখ্যা অল্প নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করলে আমার চোখের সামনে কোন নশ্বর মানুষের রক্ত-মাংস-হাড়ে গড়া তুচ্ছ দেহ জেগে ওঠে না। আমি তখন দেখতে পাই হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগর বা নায়েগ্রা প্রপাতের মত ধারণাতীত বা অভাবিত কোন প্রাকৃতিক মহা-বিস্ময়কে। এবং আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই বিচিত্র ও কল্পনাতীত প্রতিভা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে আমাদেরই মাঝখানে, সকলের সম্মুখেই। এজন্যে আমাদের প্রতি হিংসাপ্রকাশ করবে পরবর্ত্তী যুগ—রবীন্দ্র-প্রতিভার মাহাত্ম্য সকলে যখন আরো ভালো করে ধারণায় আনতে পারবে।

বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বলতে বোঝায় কোন ধারণাতীত প্রাকৃতিক মহাবিস্ময়—পরবর্ত্তী সর্ব্বকালের মানুষ যার সামনে এসে অসীম ভাবের আবেশে অভিভূত হয়ে থাকবে। এই আশ্চর্য্য প্রতিভার বয়স মাত্র আশী বৎসরের সীমা অতিক্রম করেছে বলে গগনভেদী কোলাহল করা বাহুল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগরের পক্ষে আশী বৎসর কতটুকু সময় ? তারা যে কল্পান্তকালস্থায়ী ! মানুষের সভ্যতা ও সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার জয়ন্তী-গাথা গাইবে চিরকাল প্রতি দিনে প্রতি মুহূর্ত্তে। আজকার উৎসব কেবল সেই সত্যটি মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া রবীন্দ্র-প্রতিভার কোন গৌরব বৃদ্ধিই করতে পারবে না।

আমাদের লাইব্রেরী

গল্পসল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৲
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'গল্পসল্প' রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম গল্পের বই। এতে বত্রিশটি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেক গল্পের অন্তেই আছে একটি করে কবিতা, মূল গল্প ঘেঁষা তার বিষয়বস্তু। 'গল্প ছোট হওয়া চাই, আর গল্প হওয়া চাই'– গল্পসল্পের সবকটি গল্পের ভেতরই তার রেশ রয়েছে।—'অল্প যা বললেম দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।'—কবি ভুমিকার মারফৎ এটি প্রকাশ করেছেন। কোনো স্নেহ-প্রত্যাশিনীর দাবী রাখতে গিয়ে কাবর দুপুরের বিশ্রাম থাকলো পড়ে, তিনি মেতে উঠলেন গল্প বলতে। তিনি বলছেন মন দিয়ে গল্প শুনতে, কারণ সত্যিকারের গল্প এলোমেলো মনকে একান্তে একাগ্রতায় ভরে রাখে। 'তারপর' এবং 'আরেকটা' দিয়ে শ্রোতার আগ্রহ দুর্ব্বার হয়ে ওঠে।—

'তবে শোনো মন্দ সে মন্দই
হোক না সে গুপিনাথ, হোক না সে নন্দই'—

সত্যি, অতো ভেবে দেখবার কী দরকার। ছেলেমানুষী মনের পেছনে যে-উস্কানি থাকে সেটা দুষ্টুবুদ্ধি—সে-বুদ্ধি বিচার করে না, ভালোমন্দ যাচাই করে না। কল্পনার রাজ্যে উস্কিয়ে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়। 'সত্যি' এবং 'আরো-সত্যি'র সাহায্যে সে-মন কল্পনাপুরীর সিঁড়ি ভাঙে।

কুসমির প্রশ্নজালে দাদামশায় জড়িয়ে পড়েছেন এদিকে। কথোপকথনচ্ছলে কেমন সুন্দরই না গল্পের দানা বেঁধে উঠেছে। দাদামশায় বলে যান এক নাগাড়ে, কুসমি শোনে, ভাবে আর অর্থ খোঁজে।

প্রথম গল্প 'বিজ্ঞানী' এই যেমন। কুসমি বিজ্ঞান বুড়োর খবর রাখে না, আর 'এলোমেলো আলুথালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না,'—কুসমিও না। তবু দাদামশায় বলছেন, 'লোকটা খাঁটি পুরুষ মানুষ।' গল্পের আকারে তিনি প্রমাণও করে দিলেন। শুনে কুসমি বললে, 'এতক্ষণে বুঝলুম এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন। আর তুমিই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাসো।'

'খাঁটি খবর ছোট হয়েই থাকে যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে'—গল্পের বিষয় ছোট, উদ্দেশ্য বড়ো-কিছু। "রাজরানী" গল্পে নিখুঁত একটি গল্পের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ ছেলে মানুষ, রূপকথা দিয়ে তাকে ভোলাতে হয়। আর একটি গল্প "ম্যানেজারবাবু," জমিদারশাসিত বাংলার পণরক্ষার উজ্জ্বল চিত্র। মিশির নিমক খেয়েছে বলে প্রাণকে গ্রাহ্য কোরলো না। কারণ তাকে নিমকের মান রাখতেই হবে। আশ্চর্য্য মোটেও নয় তার প্রাণ দেওয়াটা। এমন ঘটনা অপ্রতুলও নয়। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর দুধ দিয়ে স্নানের খ্যাতি টিঁকে কই ! "বনস্পতি," "চন্দনী," "ধ্বংস" ও "মুক্তকুন্তা" গল্পগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

রাখাল তালুকদার

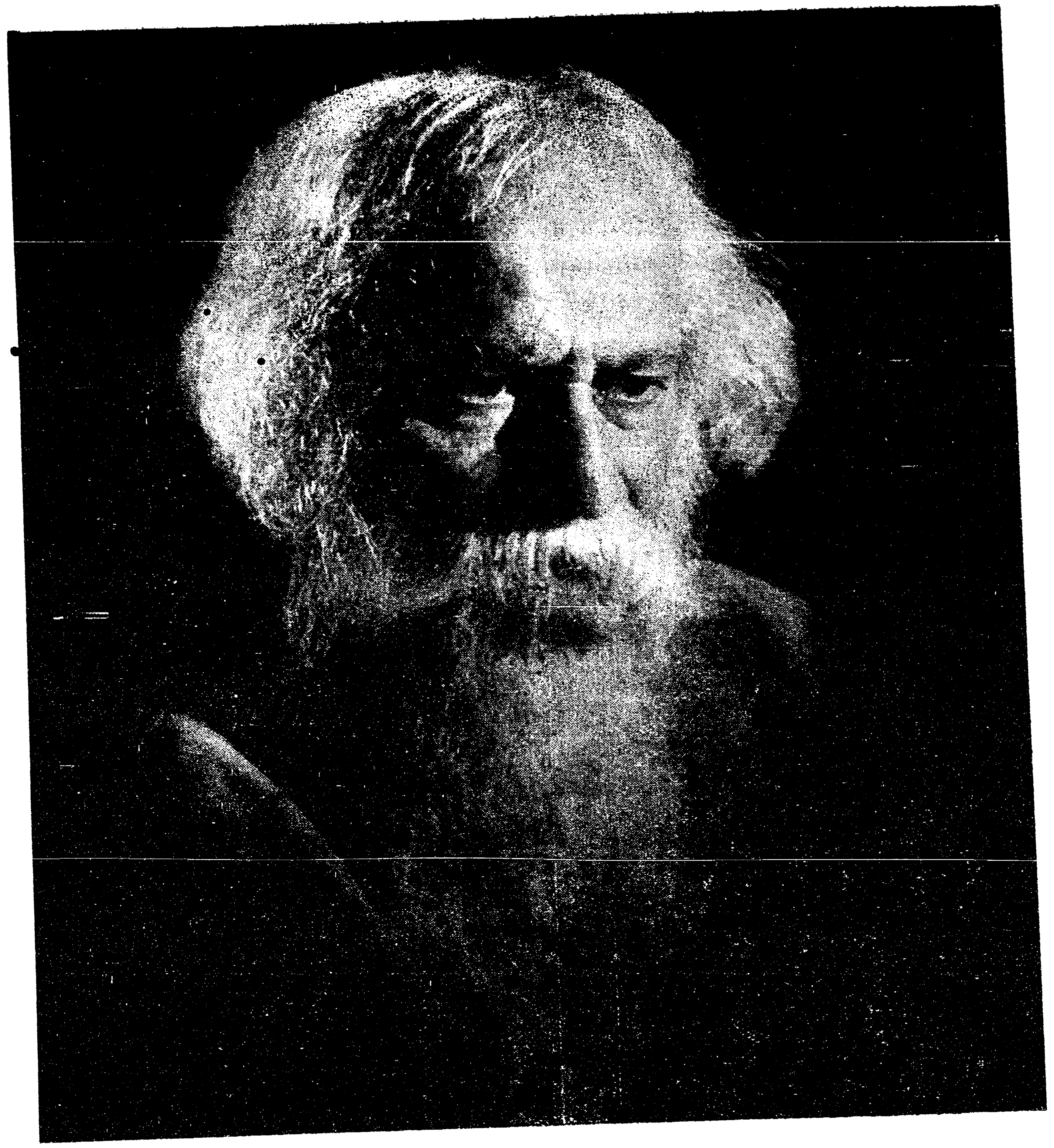

"বাণীবরতনয় তুমি স্বাগত সভা মাঝে"—

(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩৪৮

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

আষাঢ়িয়া দিনে কি লিখি লিখন ? চাও কি আষাঢ়ে-চিঠি ?
ধর তবে হাত, চল মোর সাথ, ভুলে বাজে খিটিমিটি !
ছাড়ো এ কঠোর ঘরের কোটর, থাক্ আজ লেখাপড়া,
দেখ বাদলের মহা-পাগলামি ! দেয় খালি জলছড়া !
আষাঢ় এসেছে ভাই !
আষাঢ় সেজেছে নব-সন্ন্যাসী, গায়ে মেখে কালো ছাই !

*

ছায়াময় বেলা, মায়াময় দিন, লীলাময় মনোপ্রাণ,
ঠাণ্ডা বাতাস ঘোরাঘুরি করে গেয়ে আতরের গান।
ময়ূর-মহলে মুজ্‌রো চলেছে, বন কাঁপে কেকা-রাগে,
আহা, ভুর-ভুরে সোঁদালি গন্ধ ভিজে পথে পথে জাগে !
চাঁপা করে ফুটি ফুটি,
বেলের চারায় ধরিয়াছে কুঁড়ি, তুলে নাও মুঠি-মুঠি !

নদী-বুক ভ'রে বৃষ্টিকুসুম ঝ'রেই মিলিয়ে যায়,
ঘাটে দোল খায় বন্দিনী তরী জলদের জল্‌সায়।
ছল্‌-ছল তানে জল বলে "চল্‌, কূল ভুলে ছুটে যাই,
আকাশের মেঘ পেয়েছি হৃদয়ে, আর তো ভাবনা নাই।"
মেঘ ছোটে দিবা-রাতি,
মন বলে, ওরে আমিও ছুটিব গতির আমোদে মাতি!

*

কালোয় কে আঁকে ঝিকি-মিকি ছবি নিয়ে বিদ্যুৎ-তুলি?
পৃথিবীকে স্নান করায় কে বল গগনের কল খুলি?
দ্রিমি-দ্রিমি বোলে বজ্র-বাজনা সজোরে বাজায় কারা?
তারি তাল ধ'রে তালবন তাই তাথৈ-নাচনে সারা!
মাঠে খেলে হাঁটু-জল,
পথ-ঘাট-ক্ষেত ধুয়ে দিয়ে করে কল্‌-কল্‌ কোলাহল!

*

শোনো শোনো ঐ মেঘের মন্ত্র কি নবজীবন-ভরা!
দেখ দেখ কাঁচা-সবুজে সাড়ীতে সাজে মোহনিয়া ধরা!
গাও গাও খালি কাজ্‌রীর সুর কাজ্‌লা আলোকে আজি,
বল বল বঁধু, কোথা যেতে চাও? আমি সাথী হ'তে রাজি!
ঠিকানা চাইনা ভাই!
মেঘ্‌লা দিবস যেথা নিয়ে যাবে সেখানেই যেতে চাই!

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— দুই —

ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

"ওঃ এখনো পাস্‌নি! পাব পাব মনে হচ্ছে! তবু ভালো! তবু রক্ষে!" ব্রজেশ্বর এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করে' দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন: "আরে, আমি তো বারো বচ্ছর ধরেই পাব পাব মনে করছি! মনে করায় আর পাওয়ায় ঢের দূর—ঢের ফারাক্‌! হুঁঃ!"

শিশির কোনো জবাব দ্যায়না, আপন মনে কী যেন ভাবে আর প্যাঁচ্‌ কষে।

লিলি বলে: "মামা, ও কথা থাক্‌! আসামের জঙ্গলে তারপর কী হোলো বলো। ষ্টেশন থেকে আস্‌তে আস্‌তে যতখানি বলেছ তারপর থেকে সুরু করো—"

"কদ্দূর বলেছি? পথে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেই পর্য্যন্ত—না? আচ্ছা তারপর থেকে বলি, শোন্‌।"

ব্রজেশ্বর পুনরায় নিজের পর্য্যটন-কাহিনী বল্‌তে সুরু করেন, নিজের মনে আর নিজের ভ্রমণে মশ্‌গুল্‌ হয়ে যান্‌:

"সেই ডাকাতরা তো? অতি বজ্জাত! বেজায় ভারী ফিচেল—আর ভয়ানক নাছোড়-বান্দা। আমি যতই বোঝাই যতই আপত্তি করি কিছুতেই কান দ্যায় না। যতই বলি যে বনের পশুরাও ভূপর্য্যটক বলে' আমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, নরখাদকরাও আমার কেশ স্পর্শ করেনি, আর ডাকাত হয়ে, মানুষ হয়ে, তোমাদের এসব কি কাণ্ড? এ কি রকম অভদ্র ব্যাভার?"

ততই ওরা বলে, আমরা তো আর চার পেয়ে জন্তু নই যে অম্‌নি পেয়ে তোমাকে ছেড়ে দেব। ওসব কথায় আমরা কর্ণপাত করিনে। আর তোমাকে হজম করে'—সাবড়ে দিয়ে আমাদের লাভ কি? খেতে আর এমন কি তুমি খাসা হবে? তোমাকে খেয়ে ছেড়ে দেব—এই যদি তুমি ভেবে থাকো—হুঁঃ! তুমি তো একটা অখাদ্য!"

আমি একটা অখাদ্য? শুনে আমার এমন দুঃখ হয়! মনে মনেই বলি, বাজে একটা ডাকাত, বুনো জানোয়ারেরও অধম; নেহাৎ একটা বর্ব্বর, আমার মূল্য তুমি কি বুঝ্‌বে? এক নম্বরের তুমি অপদার্থ! বেরসিক কাঁহাকা! বুঝেছিল বটে একজন—সেই হজম-হয়ে-যাওয়া নরখাদকটির প্রতি ভেবে চিন্তে আমার শ্রদ্ধা এখন আরো বেড়ে যায়—আমার রহস্য সে-ই

বুঝেছিল বটে! নিজের প্রাণের বিনিময়ে, আত্মদানের বদলে, আমাকে যথার্থ মর্য্যাদা দান করতে চেয়েছিল। আহার্য্য হবার অধিকার থেকে, মানুষের পাতে পড়বার সৌভাগ্য থেকে, কঠোর ভাবে নিজেকে বঞ্চিত রেখে, নিজের অদম্য প্রলোভন সম্বরণ করে, সেই উচ্চসম্মান আমাকে দিতে চেয়েছিল। অযাচিতভাবেই দিতে এসেছিল। তুমি একটা আসামের পাপী-তাপী ডাকাত — ডাকাতির আসামী— অধম তুমি কি বুঝবে? তোমাদের এলাকায়, একলা পেয়ে, অসহায় পেয়ে, অখাদ্য বলে' আমাকে খুব কসে' অপমান করে' নিচ্ছ। নাও, নিয়ে নাও, কী আর করছি! কিন্তু সে—সেই সামান্য নরখাদক—সেও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, বহুগুণে উত্তম, আমি মুক্তকণ্ঠে বলব, আমি নিজেই ভালো করে' চেখে দেখেছি। আমি কতখানি সুখাদ্য—কতটা সুস্বাদু, সে কিন্তু আমাকে না চেখেই বুঝেছিল—দেখেই বুঝতে পেরেছিল। প্রথম দর্শনেই, প্রলুব্ধ হয়ে, সে আমাকে তার হৃদয়ে—হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গা—তার উদরে আমাকে স্থান দিতে চেয়েছিল—তার অন্তরঙ্গ করতে চেয়েছিল আমায়!

তার কথা ভেবে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়। জিভ দিয়ে একটু জলও যে না পড়ে তা নয়। প্রথমে তার ওপরে আমার রাগ হলেও, সত্যি, প্রথমে তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—অতটা সমঝদার বলে' ভাবতে পারিনি। একটু ভুলই বুঝেছিলাম তাকে। আমাকে উদরস্থ করার তার উৎসাহটা আমি খুব ভালো মনে নিতে পারিনি গোড়ায়,—কিন্তু বেশিক্ষণ সে রাগ আমার ছিলনা। তাকে মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার রাগ পড়ে গেছল্—তাকে আত্মসাৎ করবার পরে আমার যাকিছু রাগ, জিভের জলের সঙ্গে এক হয়ে একাকার হয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে অন্তর্গত করবার পর থেকে, আমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ এখন তার উপর গিয়ে চড়াও হয়ে পড়েছে। সে আর আমি এখন অভিন্নাত্মা, বল্‌তে কি!

কিন্তু একজন সামান্য ডাকাত, যার কেবলমাত্র পরধনে লোভ, মানুষের মূল্য—যথার্থ মূল্য সে কি বুঝবে? একটা খুনে হলেও বরং বুঝতে পারত। চোর ডাকাতের কর্ম্ম না! হ্যাঁ, ডাকাতের আবার খাদ্যাখাদ্য-বোধ!

যাক্‌গে, যেতে দাও, পৃথিবীতে সবাই কিছু সব জিনিসের সমঝদার হয় না। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ বলেই দিয়েছে। সবার রুচি কিন্তু সমান নয়! কি হবে? আর বেশী কথা না বাড়িয়ে, আমার যা কিছু সাথে ছিল সব সেই ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে কেবলমাত্র কালাজ্বর সম্বল করে', অবশেষে কাঁপতে কাঁপতে, বার্ম্মায় এসে পৌঁছলাম।

জ্বর গায়ে, জর্জ্জর অবস্থায় একজন ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়ী অতিথি হলাম। লোকটি ভারী ভালো। না, না, সেরকম ভালো নয়—সেই নরখাদকের মত ভালো বল্‌ছি না। সেরকম ভালো কিনা জান্‌ব কি করে'? সবাই কি আর গায়ে পড়ে নিজেদের চাখ্‌তে দ্যায়? আর চাখতে দিলেও, সে-লোকটি যেরকম বুড়ো আর জরাজীর্ণ—তাতে সেই নরখাদকের মত ভালো হবার তার সম্ভাবনা ছিলনা।

তবু লোকটি ভালো। তথাপি লোকটিকে ভালোই বল্‌ব আমি। কেননা, আমি লোকটা ভালো কিনা, তার বাড়ীতে পেয়েও—হাতে নাতে পেয়েও—জান্‌বার চেষ্টা মাত্রও সে করেনি। কর্‌লে, সেই কাহিল অবস্থায়, আমি তাকে আট্‌কাতে পারতাম কিনা সন্দেহ!

যাহোক্, দিন কয়েক জ্বর-জড়িত থেকে কোনো গতিকে সেরে-সুরে তো উঠলাম—আর সেই লোকটী—সেই বুড়ো গৃহস্বামীটি—"

ব্রজেশ্বর বাবু বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলেন।

লিলি বলে' উঠল: "কি হোলো তার? কি হোলো মামা?"

"কী আবার হবে? কবিতা!"

"কবিতা! সে আবার কি?" শিশির জিগ্যেস্ করে।

"কবিতায় তাকে ধরল। কেন, কবিতা কি একটা ব্যামো নয়? কাল ব্যাধি নয়? কালাজ্বরের চেয়ে কিছু কম শক্ত নাকি?"

"হুঁ। খুব শক্ত।" শিশির ঘাড় নাড়ে। "কিছু বোঝা যায় না।"

"তা বলে' গান তুমি ব্যারাম বল্‌তে পারোনা মামা?" লিলি আপত্তি করে: "গান ভারী—ভারী ভালো—কী চমৎকার!"

"তাহলে কালাজ্বর না বলে' বসন্ত বল্‌তে পারিস্।" মামা বলে' দ্যান: "বড্ড ছোঁয়াচে।"

"হামও বল্‌তে পারিস্।" শিশির টিপ্পনি কাটে: "হামেসাই গাওয়া যায়।"

"কিন্তু সেই লোকটার কী হোলো? কবিতা পড়্‌তে সুরু করে' দিল না কি সে?" লিলি জান্‌তে চায়।

"কবিতা পড়বে কি, সে নামই কখনো শোনেনি।" ব্রজেশ্বরবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন: "তুই অবাক্ কর্‌লি লিলি!"

"বাঃ, আমি কি অবাক্ করব—তুমিই তো বল্লে।" লিলি অভিযোগ করে।

"আমি বলেচি? আরে, তোদের কি কবিতা লিখতে জানে নাকি? লিখলেও আমাদের মাইকেল-হেম-নবীনের মতো না! 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চুড়ামণি!' আহা! 'হুররে হুররে হুররে করি গর্জ্জিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'! আহাহা! এরকমটি আর হয়না! তারপর আমাদের হেমচন্দ্রের—'হের ঐ তরুটির কি দশা এখন!' আহাহাহাহা!—"

কাব্য-আলোচনায় ব্রজেশ্বরবাবু বিগলিত হয়ে পড়েন। হাসেন কি কাঁদেন বোঝা যায় না।

"আর দুজন-কার নাম বল্লে—জানিনে, তবে তোমার ঐ মাইকেলের কবিতা কিন্তু ভারী—ভারী—" পছন্দসই কথাটা শিশির ঠিক হাতড়ে পায়না।

"ভারী বিষম।" লিলি যুগিয়ে দ্যায়: "পড়তে গেলে বিষম লাগে।"

"তবে হ্যাঁ, লিখেছেন বটে ভদ্রলোক। তিনটে কবিতা লিখেছেন বটে। মাইকেল-হেম-নবীনের সমকক্ষ না হলেও—সেই তিনটেই মোক্ষম্। তাতেই তাঁর মোক্ষলাভ হয়ে গেছে। সেই তিনটেই তাঁর আসল। তিনখানা জুতো। সেই তিনটের জন্যেই তিনিই অমর হয়ে থাক্‌বেন। তোদের ঐ রবীন্দ্রনাথ, বুঝ্‌লি কিনা?"

কোন্ তিনটে, জানবার জন্যে লিলি আর শিশির লালসা প্রকাশ করে।

"কেন, একটা ঐ—'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে ঋণে?—"

"বাবু বলিলেন, বুঝেচ উপেন, ও জমি লইব কিনে।" লিলি সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ না করে' পারে না।

"হ্যাঁ, এ কবিতাটা ভালো বটে।" শিশির সায় ছায়ঃ "খুবই ভালো।"

"আরেকটা তো, ঐ সেইটে, ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর—"

"যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।" লিলি এবারও যোগ না দিয়ে পারেনা। চোখ মুখ ঘুরিয়ে, হাত পা নেড়েই সহযোগিতা করে।

"এ কবিতাটাও খাসা। কেষ্টা চাকরের মতই খাসা। সত্যি কথা বল্‌তে কি, কেষ্টার মতো চাকর আর হয় না। আমি হলে, বেচারাকে, কখনই অমন বেঘোরে মর্‌তে দিতাম না।" ব্রজেশ্বরবাবু আপ্‌সোস্ করেন: "মর্‌বার আগেই—"

"কি কর্‌তে? তোমার হৃদয়ের চেয়েও চওড়া কোনো জায়গাতেই স্থান দিতে বোধ হয়?" শিশির অনুসন্ধিৎসু হয়।

"দিলে কী ক্ষতি ছিল? বাজে নষ্ট হয়ে গেল তো চাকরটা! অমন ভালো চাকরটা তাকে উদরসাৎ করতে পারলে মারা গিয়েও তবু তার কিছু সান্ত্বনা থাক্‌ত, যে, মরেও মরবার, পরেও মনিবের কাজে লাগলুম। মরেও বেচারা মনে সুখ পেত। যৎকিঞ্চিৎ পেতই!"

"কেষ্টা খেতে খুব ভালো হোতো না, মামা।" তেমন উপাদেয় হোতো না! লিলি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে: "চেহারাটা তার তত ভালো ছিল না।"

"না থাকুক্! একটা পাঁঠার চেহারা আর এমন কি ভালো?" ব্রজেশ্বর বাবু কেষ্টার পক্ষ-সমর্থন করেন। "কেষ্টার চেয়ে কী ভালো শুনি?"

"রবীন্দ্রনাথের আরেকটা কবিতা কী, বল্লেনা?"

"তিন নম্বর? সেইটে! আহা, সেইটেই সব চেয়ে ভালো। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। সেটা তো ইস্কুলের বইয়ে নিশ্চয় তোরা পড়েচিস্! সেটা হচ্ছে—হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিখারিণী মেয়ে!"

ব্রজেশ্বরবাবু জলবত্তরলং করে ছান

কবিতার উচ্চারণেই লিলির চোখ ছল ছল করে' আসে। সে শুধু বলে: "হুঁ।"

শিশির জিগ্যেস্ করে: "তা, এই সবের সঙ্গে তোমার সেই বার্ম্মিজ্ লোকটার কী? তার কি সম্পর্ক?"

"সেই বর্ম্মীটার সঙ্গে? বাঃ! তবে আর বল্‌চি কি! সেই লোকটা নিজেই শেষে রবীন্দ্রনাথের একখানা কবিতা হয়ে বস্‌ল।"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে গেল সেই লোকটা? য়্যা?" শিশির-লিলি ভয়ানক ধাঁধাঁয় পড়ে যায়। "সে আবার কি?"

"আমি সেরে উঠ্‌তে না উঠতেই, বুঝ্‌লি কিনা,—" ব্রজেশ্বরবাবু এবার সটীক্ ব্যাখ্যা করে' সমস্তটা জলবত্তরলং করে' ছান্: "নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহপরে।"

"ওঃ, তাই বলো! তাকেও কালাজ্বরে ধর্‌ল!" শিশির হাঁপ ছাড়ে।

"আর তুমি—তুমি বুঝি তাকে—" লিলি সভয়ে দুচোখ বড়ো বড়ো করে' তাকায়, ও বেশী বল্‌তে পারেনা।

"দূর্ দূর্! আমি কি আর তাই করি? লোকটার প্রতি আমার একটুও ভালোবাসা হয়নি তো! তবে কেন?" ব্রজেশ্বরবাবু জবাবদিহি ছান্: "লোকটার ওপর আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গেছল।"

"তাই বোধহয় ও বেঁচে গেল?" শিশির বলে। "টিকে গেল এ যাত্রা?"

"উঁহু, বাঁচ্‌লনা। মারাই গেল শেষটায়। মর্‌বার সময় বলে গেল, মৌলমীনে তার একটা বাড়ী আছে, আর সেই বাড়ীর মধ্যে একটা চোর কুঠ্‌রি রয়েছে, আর সেই চোর কুঠ্‌রির মধ্যে—"

"অগাধ ধনরত্ন!" শিশির নিশ্বাস ছাড়ে।

"তুই কি করে' জান্‌লি?"

ব্রজেশ্বরবাবু রুখে ওঠেন: "কে বল্লে তোকে?"

"বল্‌তে হয়না। এমনিতেই জানা যায়। অনেক য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বইয়ে পড়া গেছে। এরকম ঢের পড়েচি আমি।"

"কই সে বই? সে সব বই কই দেখি।"

"সঙ্গে আনিনি তো।" শিশির জবাব ছায়।

"মাথা কিনেচ আমার!" মামা আরো ক্ষেপে যান্: "একটা যদি উপকার হয় কারু দ্বারা। কথায় বলে যম জামাই ভাগ্‌নে, তিন না হয় আপ্‌নে! এই তিন মূর্ত্তি কক্ষণো আপনার হয়না। কথাটা দেখচি ঠিক।"

"বাঃ আমি কি করে' জান্‌ব যে তোমার কাজে লাগবে?" শিশিরও একটু খাপ্পা হয়: "তুমি কি আন্‌তে বলেছিলে?"

"না বল্‌লে কি আন্‌তে নেই? ভাগ্‌নে তবে আর বলেচে কেন?"

লিলি মাঝখানে পড়ে ঝগড়া মিটিয়ে ছায়: "আচ্ছা, আমি মাকে লিখে দেব'খন। মা ভি-পি করে' পাঠিয়ে দেবে।"

মামা এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হন্: "হ্যাঁ, লিখে দিস্। যেন ফেরৎ ডাকেই পাঠায়। রেজেষ্টারি করে' পাঠায় যেন। এমন জরুরি দরকার যে কী বল্‌ব! যদি সেই সব বইয়ের ভেতরে কোনোরকম ফন্দিফিকির বাৎলানো থাকে। হদিশটদিশ থেকে যায়। হ্যাঁ, তারপর, কি বল্‌ছিলাম! সেই বর্ম্মী বুড়োটা! মরবার সময়, মৌলমীনের সেই বাড়ীটা আমাকে দিয়ে গেল। আর বলে' গেল, দিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি কখনো সে বাড়ীতে থেকোনা।"

আমি জিগ্যেস কর্‌লুম: "কেন, সে বাড়ীতে কি হয়েছে?"

সে বল্লে: "কেন, বুঝতে পাচ্ছনা? কোথায় আমি এই উত্তর ব্রহ্মে, আর কোথায় সেই সুদূর দক্ষিণে, সমুদ্রের ধারে মৌলমীন্! মৌলমীন্ সহর ছেড়ে, সেই রাজার অট্টালিকা ছেড়ে কেন এখানে এসে, এই হিমালয়ের পাদদেশে, এত কষ্টেস্থষ্টে, বসবাস কর্‌ছি! তাই থেকেই কি বুঝতে পার্‌ছনা?"

আমি বল্লুম ঃ "উঁহু ! এক বিন্দু না।"

বুড়ো বল্লে ঃ "সে বাড়ী ! সে বাড়ী—ভারী ভয়ানক। আর তার পরেই সে খাবি খেতে সুরু কর্‌ল।"

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস্ কর্‌লুম ঃ "তা সেই চোরকুঠরির সন্ধান পাব কি করে'? তার কি কোনো নক্সা টক্সা নেই? আছে? কোথায় সেই নক্সা? বলো, বলো, বলে' যাও। অমন করে' খাবি খেয়ো না। ঐ ভাবে ছলে' যেয়োনা; ছলনা করে' চলে যেয়ো না। আমি বারম্বার আবেদন করি, নিবেদন করি—সকাতরে প্রার্থনা করি—তার অন্তিম দরবারে আমার ব্যাকুল আর্জ্জি জানাই, আর সে ঘাড় নাড়ে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। কিন্তু তার বেশী আর কিছুই তার সেই হাঁ-করা মুখ দিয়ে বার হয়না।"

শিশির বল্ল ঃ "এমনিই হয়? ঠিক এই রকমটাই হয়। কি বলিস্ লিলি! ঠিক এই ধরণটাই হয় না কি?"

"হ্যাঁ, দাদা!" লিলি তার ছোট ঘাড়খানা নেড়ে সায় দ্যায়।

"তবে আমি জানি, আমি জানি বটে, কোথায় তোমার সেই নক্সা আছে।" শিশির ব্রজেশ্বরবাবুর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে ঃ বুড়ো না বল্লেও, "আমি বলে' দিতে পারি। বলে' দেয়া কেন, আমি বার করেই দিচ্ছি না হয়! এসো আমার সঙ্গে।"

ক্রমশ

রাজবংশীর মেয়ে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বন্‌কাপাসী পেরিয়ে গেলে ছাতিমতলার মাঠ
মাঠের ধারে অশথ তলায় রামনগরের হাট;
সেই সে হাটে ঘুন্‌সী বেচে রাজবংশীর মেয়ে
বাপ্ নিয়ে যায় মেয়েরে তার ছোট্ট ডিঙ্গি বেয়ে;
রাজবংশীর মেয়ের রূপে নয়ন ভুলে যায়,
পথ চলিতে কেও যদি তার মুখের পানে চায়—
ভীড়ের মাঝে হাটের মাঝে হঠাৎ মনে হবে,
এই মেয়েটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কবে!

কস্তা পেড়ে ডুরে শাড়ী, রুপোর খাড়ু হাতে
গলায় দোলে হাঁসুলিহার; কিসের বেদনাতে
মুখে মেয়ের নাইক হাসি, মুখখানি ভারভার
এক রত্তি নমোর মেয়ে দুঃখ কিসের তার?

খেলা ঘরের বাঁধনহারা ছোট্ট তাহার মন
হাটের মাঝে ঘুরে বেড়ায়, কিসের অন্বেষণ?

রাজকন্যা হার মানে যে রাজবংশীর রূপে
কোন্ সে রাজার রাজ্য থেকে আসল চুপে চুপে
নিয়ে এল সঙ্গে তাহার মেঘের বরণ চুল
কুঁচবরণ রাজবংশী মেয়ে, রাজকন্যা ভুল
ভুল করে কি অদল বদল করলে খেয়ার মাঝি
ঘুম্‌তি নদীর ঘুমো হাওয়ায় হল এ কারসাজি।
তাই কি মেয়ে মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়
রাজার দেশের স্বপ্নে বিভোর, জাগে কি বিস্ময়?—

"কোন বা দেশের মেয়ে আমি, কোন রাজার কনে
কোন্ পথে হায় বেরিয়েছিলাম কাহার অন্বেষণে,
কোন্ সে নদীর খেয়ায় আমি কবে হ'লাম পার
কোন্ আঁধারে পথ হারাল? সাঁতার পারাবার
সাম্‌নে রেখে এগিয়ে চলি, কোন সে কূলের আশে
এই হাটে কি সেই সে দেশের রাজার ছেলে আসে?"

রাজার ছেলে কিনতে এলে লাল ঘুন্‌সীর দোনা
পয়সা দিতে হয়ত দিবে আঁজল ভরে' সোনা,
রাজবংশীর মেয়ের পানে চাইবে রাজার ছেলে
বল্‌বে হেসে—হ্যাঁগা মেয়ে কোথায় তুমি পেলে—
কুঁচবরণ অঙ্গ তোমার, মেঘের বরণ চুল
ছাতিম তলার মাঠ পেরতে হয়নি ত পথ ভুল?

বাপে ডাকে—"চল্ মা ঘরে উৎরে গেছে সাঁজ
ভাঙা হাটে ঘুন্‌সী বেচা থাকনা কেন আজ;
কোল-আঁধারী রাতের মাঝে বৈঠা ঠেলে চলা,
কার মনে মা কি যে আছে যায়না কিছু বলা।"
গাঁয়ের মানুষ সঙ্গে নেব, বস্‌বি আমার কাছে,—
রাজবংশীর মেয়ের প্রাণে কিসের ব্যথা আছে?
বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে চকে আসে জল
রাজবংশী শুধায় তারে "বল্ মা আমায় বল,
কে তোরে দিয়েছে ব্যথা, কোন্ সে গাঁয়ের ছেলে
খেল্‌তে এসে অবহেলায় খেলনা গেছে ফেলে?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছুন-ছিউ

আমরা সবাই কৌতূহলী চোখে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

ধুক্‌ধুকির ডালা খুলে বাঁ-হাতের উপরে সেখানা রেখে বিনয়বাবু আগে সেই emboss করা বিন্দুগুলোর উপরে ডানহাতের আঙুল বুলিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "এর ওপরে ইংরেজী ভাষায় লেখা রয়েছে—'শা-লো-কা': পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ : কুবের মূর্ত্তি : গুপ্ত গুহা :—ব্যাস্, আর কিছু নেই!"

আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে কথাগুলো মনে-মনে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলুম, তারপর বললুম, "বিনয়বাবু আপনার মতে শা-লো-কা, কি-পিন, কা-পিন, কপিশ বলতে এক জায়গাকেই বোঝায়?"

—"আমার মত নয় বিমল, এ হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মত।"

—"ওখানে গুপ্তধন আছে। এটাও ঐতিহাসিক সত্য?"

—"একে ঐতিহাসিক সত্য না ব'লে ঐতিহাসিক গল্প বলা উচিত। এ গল্প বলেছেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং। ঐতিহাসিকরা গল্পটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ এর সত্য-মিথ্যার জন্যে ঐতিহাসিকরা দায়ী নন।"

—"তাহ'লে শা-লো-কা বা কপিশ মঠের কথাও গল্পের কথা?"

—"না। কা-পিন, কি-পিন্, শা-লো-কা বা কপিশ—যে নামেই ডাকো, ও-মঠের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে।"

—"উত্তর-পূর্ব্ব আফগানিস্থানে?"

—"হ্যাঁ। ও-জায়গাটির আধুনিক নাম হচ্ছে কাফ্রিস্থান।"

কুমার বললে, "কাফ্রিস্থান? ও বাবা, সে যে হিন্দুকুশ পাহাড়ের ওপারে! সেখানেও বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু দেবতা কুবের!"

বিনয়বাবু বললেন, "কুমার আজ্‌কের দিনে ভারতবাসী পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা পেয়ে নিজেকে সভ্যতায় অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করে বটে, কিন্তু স্বদেশ আর স্বজাতি সম্বন্ধে হয়েছে রীতিমত অন্ধ। তোমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজরা আফগানিস্থানের এপারেই ভারতের সীমারেখা টেনেছে বলে সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নেবার কারণ নেই। এক সময়ে ভারত-সম্রাটের সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, ইংরেজরা আজও ততদূর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। আফগানিস্থান নামে কোন দেশের নাম কেউ তখন স্বপ্নেও শোনে নি। মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুকুশেরও ওপারে। আজ বিলাতী জিওগ্রাফি যাকে আফগানিস্থান ব'লে ডাকে, তখনকার পৃথিবী তাকে ভারতবর্ষ বলেই জানত আর সেখানে বাস করত ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনরাই। ওখানে যে বৌদ্ধ মঠ আর হিন্দু দেবতা থাকবে, এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? ভারতের গৌরবের দিনে উত্তরে চীন দেশে দক্ষিণে জাভা, বালি, সুমাত্রা দ্বীপে আর পূর্ব্বে কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু দেবতাদের যাতায়াত ছিল। তোমরা সত্যিকার ভারতের ইতিহাস পড় ভাই, নিজেদের এমন ছোট করে দেখো না!'

আমি বললুম, "উত্তম! তাহলে দু-চার দিনের মধ্যেই আমরা কাফ্রিস্থানে ভারতের পূর্ব্বগৌরব দেখবার জন্যে যাত্রা করব, আর আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন আপনিই!"

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "তোমাদের এই আকস্মিক উৎসাহ অত্যন্ত সন্দেহজনক!

—"কেন?"

—"বিমল-ভায়া, আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না, আমি তোমাদের খুব ভালো ক'রেই চিনি! ধুক্‌ধুকির ওপরে ব্রেল্-পদ্ধতিতে লেখা এই অদ্ভুত কথাগুলো আর কা-পিন্ কি-পিন্ বা কপিশ মঠ সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহ দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি, আবার তোমরা নতুন কোন 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র গন্ধ পেয়েছ! আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

আমি তখন হাসতে হাসতে চীনে-হোটেলের ঘটনাটা বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে বিমলবাবু হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "বিমল! কুমার! তোমাদের মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

—"কেন?"

—"কনিষ্ক ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ। গুপ্তধনের কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়াও যায়, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য যে, এতকাল পরে সেখানে গিয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না।

—"কারণ?"

—"কারণ ঐতিহাসিক গল্পেই প্রকাশ, প্রাচীন কালেও ঐ গুপ্তধনের কাহিনীটি ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত, তাই আরো অনেকে তা লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।"

—"কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতেও হুয়েন সাং স্বচক্ষে সেই গুপ্তধন দেখেছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী বড় কম দিনের কথা নয়।"

—"তারপর কত বিদেশী দস্যু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ঠিক ঐ অঞ্চল দিয়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, এ-কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তারা কি ঐ গুপ্তধনের কথা শোনে নি?"

—"না শোনাও আশ্চর্য্য নয়! তারপর ভারতে কতবার অন্ধযুগ এসেছে, বার বার কত রাজ্যের কত ধর্ম্মের উত্থান-পতন হয়েছে, মঠ গেছে ভেঙে, সন্ন্যাসীরা গেছে পালিয়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্যে প'ড়ে লোকে গুপ্তধনের কথা না ভুললেও ঠিকানা হয়তো ভুলে গিয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত গুপ্তধনের গল্প শোনা যায়, যার কথা সকলেই জানে কিন্তু যার ঠিকানা কেউ জানে না!"

কুমার বললে, "তারপর আরো একটা কথা ভেবে দেখুন বিনয়বাবু! আপনি ইতিহাসের যে গল্পটা বললেন আমরা কেউই তা জানতুম না। কিন্তু সেই হতভাগ্য চীনেম্যানের কাছ থেকে আমরা যে ধুকধুকিটা পেয়েছি, তার সঙ্গে ঐ গল্পের প্রধান কথাগুলো অবিকল মিলে যাচ্ছে। যেমন শা-লো-কা, ভাঙা মঠ, কুবের মূর্ত্তি। আপনি বলছেন, শা-লো-কা, বা কপিশ মঠ ছিল পাহাড়ের উপত্যকায়, ধুক্‌ধুকির লেখাতেও রয়েছে, গুপ্তগুহার কথা আর গুহা থাকে পাহাড়েই। তারপর সেই চীনেম্যান মরবার আগে কি-পিন-এরও নাম করেছিল। এথেকেই বোঝা যাচ্ছে, যেমন করেই হোক্ একালের কেউ কেউ ঐ প্রাচীন ঐতিহাসিক গুপ্তধনেরই ঠিকানা জানতে পেরেছে।"

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "না ভায়া, আমি তোমাদের পথপ্রদর্শক হ'তে পারব না। তোমরা যতই যুক্তি দেখাও, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটবার বয়স আর আমার নেই। তারপর অত লোভও ভালো নয়। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাইই যথেষ্ট আবার গুপ্তধনের উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ছোটাছুটি করা কেন?"

বিনয়বাবু আমাদের ভুল বুঝেছেন দেখে আমি আহত স্বরে বললুম, "বিনয়বাবু, আপনি তো জানেন, টাকাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান নয়! এ গুপ্তধন হচ্ছে আমাদের ঘর ছেড়ে পথে বেরুবার একটা ওজর বা উপলক্ষ্য মাত্র। গেল-জন্মে আমি আর কুমার নিশ্চয়ই বেদুইন ছিলুম—শান্ত শ্যামলতার সুখ-স্বপ্নের চেয়ে অশান্ত মরুভূমির বিভীষিকাই আমাদের কাছে লাগে ভালো। দখিন বাতাসের চেয়ে কালবৈশাখীর ঝড়ই আমরা বেশী পছন্দ করি।"

এমন সময়ে রামহরি ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, "খোকাবাবু, চারটে চীনেম্যান এসেছে এ-বাড়ীর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "চীনেম্যান? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?"

কুমার চিন্তিত স্বরে বললে, "চীনে হোটেলের কর্ত্তারা নয়তো? হয়তো পুলিশ-হাঙ্গামে প'ড়ে আমাদের সাক্ষী মানতে এসেছে।"

আমি বললুম, "অসম্ভব। তারা আমার ঠিকানা জানবে কেমন ক'রে?

কুমার বললে, "তাও বটে!"

তাই তো, কে এরা? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কলকাতায় ভদ্র অভদ্র কোন চীনেম্যানের সঙ্গেই তো আমার আলাপ-পরিচয় নেই!

রামহরি বললে, "কি গো, ওদের কি বলব?"

—"এখানে আসতে বল।"

রামহরি চ'লে গেল। ধুক্‌ধুকিটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমি জামার পকেটে রেখে দিলুম।

ঘরের ভিতরে প্রথমেই যে মূর্ত্তিটা এসে দাঁড়াল তাকে দেখেই চিনতে আমার একটুও বিলম্ব হল না। কাল রাত্রে হোটেলে এই লোকটাই ছোরা হাতে ক'রে সেই চীনে-বুড়োকে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল!

আমি হতভম্বের মত তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একগাল হেসে ইংরেজীতে বললে, "কি বাবু, তুমি কি আমাকে চিনে ফেলেছ? হা হা হা হা—আমরা পুরাণো বন্ধু, কি বল?"

আমি রুক্ষ স্বরে বললুম, "এখানে তোমার কি দরকার?"

—"বলছি। আগে ভালো ক'রে একটু বসি।" তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। এবং তার আরো তিন জন সঙ্গীও ঘরের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল ঠিক তিনটে পাথরের মূর্ত্তির মত।

কুমার ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "তোমরা হ'চ্ছ হত্যাকারী। এখনি পুলিসে খবর দেব।"

প্রথম চীনেম্যানটা আবার একগাল হেসে বললে, "বেশ বাবু, তাই দিও। কিন্তু এতটা তাড়াতাড়ি কেন? আগে আমার কথাই শোনো।"

আমি ব'সে ব'সে লোকটাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করতে লাগলুম। আগেও দেখেছিলুম এখনো দেখলুম, মাথায় সে পাঁচ ফুটও উঁচু হবে না, কিন্তু তার দেহটা চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। অসম্ভব চওড়া দেহের উপরে মঙ্গোলীয় ছাঁচে গড়া মুখ—আমার সামনে ব'সে আছে যেন মানুষের ছদ্মবেশে বীভৎস একটা ওরাং-উটান্!

সে হাসতে হাসতে বললে, "বাবু, হোটেলে কাল তুমি আমার মুখের উপরে যে-ঘুসিটা চালিয়েছিলে, আমি এখনও তা ভুলি নি!"

আমি বললুম, "ও, সেইজন্যেই কি তুমি আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছ?"

—"মোটেই নয় বাবু, মোটেই নয়! আমি তোমার ঘুসির তারিফ করি!"

জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগলুম, লোকটার উদ্দেশ্য কি?

সে বললে, "ভগবান আমাকে ঢ্যাঙা করেন নি, কিন্তু আমার গায়ে শক্তি দিয়েছেন। এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। একহাতে আমি তিন মণ মাল মাথার ওপরে তুলে বোলো হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি! কিন্তু আমার মতন লোককেও তুমি এক ঘুসিতে কাবু করেছ! যদিও আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত থাকলে এমন অঘটন ঘটত না, তবু তুমি বাহাদুর!"

—"তোমার নাম কি ছুন্-ছিউ?"

সে চম্‌কে উঠল। তারপর বললে, "তাহ'লে তুমি আমার নাম পর্য্যন্ত আদায় করেছ? ভালো কথা নয়—ভালো কথা নয়"—বলতে বলতে ধাঁ-ক'রে পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করলে একটা রিভলবার।

তার পিছনের তিন মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গেই এক-একটা রিভলবার বার ক'রে ফেললে!

আমাদের চোখের সামনে স্থির হয়ে রইল চার-চারটে রিভলভারের চক্‌চকে নল্‌চে!

ক্রমশ

চলন্তিকা

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এবার অন্য বছরের চেয়ে শতকরা অনেক কম পাস করেছে। ৩৩,১৭৫ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১৮,৪৬৫ জন পাস করেছে। তার মধ্যে ১৯১৫ জন প্রথম ডিভিসনে, ৪৪২৯ দ্বিতীয় ডিভিসনে ও ১২,০৯০ তৃতীয় ডিভিসনে পাস করেছে। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়—এবারের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আসামের তিনটি ছাত্র, বাংলার কোন নাম গন্ধ নেই। বাংলার ছাত্র ছাত্রীদের এ বিষয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আসামের স্কুলগুলির এটা খুব গৌরবের কথা, গত বছরও আসামের একটি মেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। এবার ম্যাট্রিকুলেশনে যে ছেলেটি প্রথম হয়েছেন তাঁর নাম শ্রীকৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আই, এ,-তে রিপণ কলেজ থেকে শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী প্রথম হয়েছেন, আই, এস্, সি-তে আশুতোষ কলেজ থেকে শ্রীঅমরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী প্রথম হয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে আই, এ তে প্রথম হয়েছেন লেডী কিন্‌স কলেজ থেকে কুমারী এল্ কে গঙ্গাবাই ও আই, এস, সি তে আশুতোষ কলেজ থেকে প্রথম হয়েছেন কুমারী কৃষ্ণা রোহাৎগী। বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে কেউ প্রথম হয় নাই এ বিষয়ও দ্রষ্টব্য। আই, এস, সি তে দ্বিতীয় হয়েছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে কুমারী অশোকা বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরীক্ষায় বিশেষ করে ম্যাট্রিকুলেসনে বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সুখের বিষয় সুদূর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু ম্যাট্রিকুলেশন এ নয়—ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও বাঙ্গালী ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ম্যাট্রিকুলেশনে ১ম ও ২য় হয়েছেন শ্রীসুবোধ ঘোষ ও সুরিত দাস এবং আই, এস, সি তে ১ম ও ২য় হয়েছেন শ্রীঅজিত বসু ও অসিত হালদার। এবং বি, এ, পরীক্ষাতে একটি বাঙ্গালী ছাত্রী শ্রীমতী দীপ্তি সেনগুপ্ত প্রথম হয়েছেন। দিল্লীর বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীদের তো বটেই, বাঙ্গলা দেশেরও এটা খুব গৌরবের কথা।

ফুটবল লীগের খেলাগুলির প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। গত ৩১শে শ্রাবণ শনিবার মোহনবাগান-মহামেডানস্ যে বিরাট চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হয়েছিল যাতে মোহনবাগান এক গোলে হেরে গেল, এই খেলার ফলাফলেই মহামেডানস্, মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল এই তিন দলের এক রকম ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে গেল। অর্থাৎ মহামেডানস্ এর লীগ-জয় করা এখন এক রকম নিশ্চিতই, এরা মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল এই দুই দলের চেয়েই অনেক পয়েণ্ট এগিয়ে আছে। আর আজ পর্য্যন্ত মহামেডানস্ হারেনি এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। রিটার্ন খেলাগুলিতে যদি এই দল দু তিনটে ম্যাচও হেরে যায়—তাতেও কিছু তাদের যায় আসে না, তারা লীগ এর প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হবে না। মহামেডানস্ এর কাছে সেদিন হেরে গিয়ে মোহনবাগানের লীগ পাওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল অথচ সেদিন মোহনবাগান খুব ভাল খেলেছিল ও দু' একখানা গোল তারা দিতে পারত। যাক্—এখন দ্বিতীয় স্থান

পাবার জন্য মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হবে—ইষ্ট বেঙ্গল মাত্র এক পয়েণ্ট পিছিয়ে আছে। শেষ পর্য্যন্ত কে যে রানার্স-আপ হবে তা বলা শক্ত, এ দুই দলের পেছনেই আবার রেঞ্জার্স ও পুলিশ দল আছে—রানার্স-আপ্ হতে এরাও কম চেষ্টা করবে না। যে রকম বৃষ্টি সুরু হয়েছে এদের চান্স কিছু মন্দ নয়।

জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট উইলহেলম কাইজারের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ফ্রেডরিক উইলহেলম ভিক্টর এলবার্ট। কয়েকদিন আগে হলাণ্ডে ডুন্‌দুর্গে নির্ব্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। উইলহেলম কাইজারের মৃত্যুর সঙ্গে শেষ কাইজার নামটীও মুছে গেল। কাইজার ছিলেন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রানী ভিক্টোরিয়ার মেয়ের ছেলে অর্থাৎ রাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন কাইজারের দিদিমা। ২৯ বছর বয়সে কাইজার জার্ম্মাণীর সিংহাসন অধিকার করেন। অনেকে আজও বলে, গত মহাযুদ্ধ কাইজারই ঘটিয়েছিলেন। কাইজার ছিলেন ক্ষমতাপ্রিয় সম্রাট। মহাযুদ্ধের সময় কাইজারের নাম শুধু জার্ম্মাণীতে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে ঘুরত। তিনি কখন যে কি করে বসেন তা কেউ বুঝে উঠতে পারত না। তিনি নিজের খেয়ালমত কাজ করতেন। মহাযুদ্ধের সময় তাঁর কয়েকটী কাজে ও ব্যবহারে লোকেদের অনুমোদন ছিল না। তারপর এল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ আর জার্ম্মাণীর পরাজয়ের সূচনা হল কাইজারের কাল। ইতিমধ্যে অনেকেই কাইজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। একদল মন্ত্রী কাইজার রাজ্য ত্যাগ করুণ এই দাবী জানাল। তিনি অস্বীকার করলেন—জার্ম্মাণীর পরাজয় বিশ্বাস করলেন না। হিণ্ডেনবার্গ কাইজারকে বললেন, যে তাঁর সৈন্যগণও তাঁকে আর গ্রাহ্য করবে না এমনই মারাত্মক অবস্থা। তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কাইজারের আর গত্যন্তর রইল না। কাইজার হলাণ্ডে নির্ব্বাসিত হলেন। শোনা যায়, জার্ম্মাণীর সীমান্তে পৌঁছে ডাচ্ সীমান্ত প্রহরীকে তিনি তলোয়ার প্রদান করে বলেছিলেন, 'আমি হচ্ছি জার্ম্মাণীর কাইজার (I am the German Kaisar)!

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' ও
'জীবন-স্মৃতি' অবলম্বনে
বিমল ঘোষের লেখা
শিশু-রবি
অভিনব নাটিকা
আজই কিনে পড়
দাম—।৵০ ছয় আনা

বইটি সম্বন্ধে সুকবি গিরিজা বসু, নাট্যকার মন্মথ রায়, শিশু-সাহিত্যের সব সেরা লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, কবি সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী, ধীরেন্দ্রলাল ধর — সবাই একবাক্যে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার এরকম আন্তরিক প্রচেষ্টা এদেশে আর কোনও লেখকই করেননি, আর কোন লেখাও পাইনি।'

মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন ধাঁধাঁ

(শ্রীইন্দিরা গুপ্তের সৌজন্যে)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শুধু যে কবিতা, গান ও গল্প লেখেন তা নয়, তিনি চমৎকার ধাঁধাঁও তৈরী করেন,—যেমন—

(১) ঘরে কোন মর্কট জাতীয় প্রাণী নেই তবু—'ঘরে কোথায় বাঁদোর আছে বলত?'

(২) তিন অক্ষরে কথা। প্রথমটা ছাড়লে মান থাকে না, দ্বিতীয়টা ছাড়লে কান থাকে না আর সবটা ছাড়লে প্রাণ থাকে না।—কথাটা কি?

(৩) কোঁন্ সামাজিক্ ক্রিয়া থেকে কি বাদ দিলে সবটা একেবারে বরবাদ হয়?

ধাঁধাঁর উত্তর ২৫শে আষাঢ়ের মধ্যে পাঠাতে হবে।

● নূতন প্রতিযোগিতা ●

এবারের রংমশালে একেবারে একটি নতুন ধরণের চমৎকার প্রতিযোগিতার বিষয় আমরা তোমাদের উপহার দিচ্ছি। বিষয়টি—রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত যে কোন একটি বইয়রে সম্বন্ধে নিজের ভাষায় একটি ছোট প্রবন্ধ লেখা—যে বইটি তোমাদের ভাল লেগেছে (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বইই ভাল লাগে কিন্তু সমস্ত বই নিয়ে তো আলোচনা করা সোজা কথা নয়—একটি নির্ব্বাচিত বই আলোচনা করাই তোমাদের সুবিধা) ও কেন ভাল লেগেছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধটি লিখতে হবে। দুটি পুরস্কার থাকবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ দুটি রংমশালে ছাপা হবে। নীচের কুপন ভর্ত্তি করে প্রবন্ধের সঙ্গে রংমশাল আফিসে ৭ই শ্রাবণের আগে পাঠাবে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বই—

সে	বিশ্বপরিচয়	শিশু ভোলানাথ	শিশু
ছেলেবেলা	ছড়ার ছবি	ডাকঘর	হাস্যকৌতুক
গল্পসল্প	খাপছাড়া	বিসর্জন	মুকুট
		কথা ও কাহিনী	

নূতন প্রতিযোগিতা

নাম.......................................গ্রাঃ নং.............

ঠিকানা..................................এজেণ্ট..............

পিতামাতা বা..

অভিভাবকের স্বাক্ষর....................................

ঘরের বাইরে

শিল্পী—শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৪৮

রঙমশাল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঁচ

ভূ—উস্ করে ভাসে রুই।
জল ঢেউ কাটে।
পিঠের পাখনায় রাঙা সূর্য্য ঢলে পড়ে।   মুখের জল মুখে, রুই, তাকায় সূর্য্যের পানে।
"না থাক' জুড়ান,
না হও পুরাণ,
জন্ম-যুগ পূজ্যি   আত্তিকিরণ সূয্যি,
সোনার থালে
সাঁঝ সকালে

হাস! তা, কোথায় ডঙ্কা তোমার? ডঙ্কা তো দেখি নে!"

"বললে তবে পাঁকবুড়ী কেন?"

চারদিকে মাছেরা সা'র দিয়ে ভেসে উঠে।

কাঁপে থই থই জল।

পূব আকাশের উদয়শাল, পূব গগনের সোনার থাল—দেখে', টেখে', মাছেরা বললে, "তাই তো, ডঙ্কা তো দেখি নে!"

জলের ঢেউ উছ্‌লে নাচে সোনালী জলে।

টল্ মল্ টল্!
খ্বল্ বল্!
ছলৎ ছল্!—

—জল বললে, "দেখ না? ধূলো বালিয়ে দেখে, কীট-পোকায় দেখে, বাতাস আকাশে দেখে, দেখনি তোমরা!"

"আমরা? না তো ভাই, জল!"

থ্যাব্‌ড়া মুখ অবাক মাছেরা বললে জল ঘুলিয়ে দিয়ে।

"ডুবে থাক,
তবে—
দেখবে আর
কবে?"

বললে জল। ভার মুখ।

তা'পর বললে,

"জলের গায়ে জল ঝম্ ঝম্
বিজলীর ঝিলিকে অনুপম!
মেঘের মায়া সে কালো বৌ,
ঢালে স্বর্গের ধারা-মৌ!
যে যায় হেসে, যে করে শঙ্কা,
যে জাগে—শোনে সোনার ডঙ্কা!"

"আমরা?"

সুধায় মাছেরা।

"তোমরা হাসও না, কাশও না; ভাসতে না ভাসতেই, ডোব তো ডোব! তৃণ যদি ওড়ে হাওয়ায়, চড়ুই পক্ষী উড়ে যায়, তো তক্ষুণি—

আর বল আঁশটুকু কে বা পায় খুঁজে'!
পাতালে উস্ পাস্, চক্ষু বুজে'!"

অথৈ জলে, কুলকুচো করে......লেজ আছড়ে' মাছেরা বললে,

"ও ভাই জল!
রাখতে গে' পাট,
হয়েছে ঘা'ট;

আর বলো না! শঙ্কা থাক্, আতঙ্ক থাক্, আঁতেও তুমি, দাঁতেও তুমি, এই দেখ জাগলেম!"

উথাল পাথাল জল! নদী, পুকুর, খাল, নালা, দিঘী বিলে—হৈ রৈ! মাছেদের মালসাটে জেলেদের জাল ছিঁড়ে, বাজ চিল উড়ে পালায়, নিঝুম যে যায় দিন রাত, তা হল—অ-নিদ, নি-ঘুম!

হেসে জল বললে,

"থামো ভাই থামো! ডঙ্কা তোমাদের!"

"তো দেখাও!" বললে ছোট বড়, রূপালী ধোঁয়ালী সকল মাছ।

থেমে, জল বললে

"উচল বাতাস, মেঘল আকাশ,
বাঁশী অথির সুর!
অঝোর রাতি, অফুর সাথী,
পাষাণে রোদ্দুর!
ক্ষীর তরঙ্গ বাজে শঙ্খ,
অচিন্ সমুদ্দুর!—
যেথায় ডঙ্কা সপ্ত রঙা
রামধনুকের পুর!"

BLEED THROUGH.

"রামধনুকের পুর! হাঁ, হাঁ, শুনেছি তো!! দেখিনি!" কাৎ করে কানসা, বড় বড় চোকে বললে মাছেরা।

বললে জল ঢেউ দিয়ে,

"সেইখানে ডঙ্কা।

বাজে মেঘের পরতে পরতে। জন মনিষ্যি, কীট পক্ষী, পাথর পাথারে শোনে, শোন না তোমরা?

শুনবে কি,

ডঙ্কা বাজতেই ডোবো!"

আর কথা নেই। মাছেরা পিঠ জাগালো, পুচ্ছ জাগালো। কপালে রোদের টিপ, ঝিকমিক, মাছেরা ছুটল......কোথায় অচিন সমুদ্দর—কোথায় রামধনুকের পুরী!

ছয়

জল দু'ভাগ করে, ডুবতে ডুবতে ডুবতে ডুবতে চলেছে ডুবুরী।

মাছেরা দেশ ছাড়ায়, হাঙ্গরের দেশ ছাড়ায়, তিমির দেশ ছাড়ায়।

নীল জল, নোনা জল, তিত জল, মিঠে জল, ঘোলা জল, গহন জল, গহীন জল, আগুন জল ছাড়িয়ে যায়।

"কে!"

দেখে ডুবুরী,

এক রাঘব।

ডুবুরী কত হাঙ্গর, কত কচ্ছপ, কত মকর, কত তিমি, তিমিঙ্গিল দেখল; রাঘব?—ডুবুরী দেখেনি কখনো। কখনো দেখবে, জানে না।

দেখলে, জলে পাতালে এক হা!!

হাজার কুমীর কচ্ছপ মুছে থাকে তার দাঁতে, তিমিঙ্গিল তো জলগ্রাস, চৌদ্দ ডিঙার বহর যদি আসে পাল তুলে—তো সোঁ সোঁ চলে যে যাবে তার উদরে, তার দিক দিশা পাবে না কেউ!

ডুবুরী ডুব রুখ্‌ল।

জ্বলৎ আগুন তিন চোকে, ধূসর জল আলো করে সুধোয় রাঘব, "কেতুমি?"

ডুবুরী ভাবলে, 'যমের দুয়ার তো খুলল আমার; তা ডুবুরী আমি,

কত তিমি তিমিঙ্গিল,

এই বল্লমে তিল তিল,

শ'য়ে সহস্রে হল ঘায়েল; দেব দানো রাঘব হোক, দেখি-ই না!'

তর্ তর্ তীখণ বল্লম বাগিয়ে, টোপর-মাথা এগিয়ে, রাঘবের মণি-চোকে পলকে হেনে দিয়ে বললে, "আমি ডুবুরী!"

বলা আর! আগুনের হলকা ছুটল বল্লম ঠিকরে গিয়ে। প্রবালের দ্বীপ কেঁপে যায় সমুদ্রে, নড়ে উঠে শাঁখ শঙ্খের রাজ্য ঝিনুক মীনের অতল পুরী, থরো থরো ঝড়ো' ঝড়ো' শৈবাল শেওলার আবছা দেশ, হা! হা! করে অথৈ জল, ঘুর্ণি দিয়ে সমুদ্রের সোঁত গর্জ্জে উঠল প্রলয় শব্দে! রাঘবের গায়ে হেনেছে মানুষ, পৃথিবীর পাহাড় পর্ব্বত টলমল; নীল সমুদ্র দাবানল!

যায়, পৃথিবী!

জ্বলন্ত তিন চোক লাল হয়ে উঠল। পাতাল সমুদ্র ঘোর হয়ে উঠল। হা-মুখ আস্তে বুজলে রাঘব। সমুদ্রের রঙিন্ জল দুধের মত সাদা করে দিয়ে রাঘব বললে হেসে,

"পর্ণ টোপর শির,
স্বর্ণমুকুট বীর!
অতল ডুবে ডুবছে, তবু, মন কেন অস্থির?
নামো
, শাঁখ প্রবালের দেশে,
মুক্তো হাসি হেসে,
'উজল মণি'র জল নিয়ে যাও সিন্ধুবন-শ্রীর!"

সোঁ সোঁ করে ডেকে, সমুদ্রের ঢেউ থেমে গেল। চমকে' চাওয়া ডুবুরী দেখলে, সমুদ্রের দাবানল হিম হয়ে এসে....জ্বলছে শঙ্খের পঞ্চদীপে, সোনার পাঁচশিখা! তারার ফুল ফুটে উঠছে প্রবালের গাছে গাছে, শাঁখেরা সাঁঝের আওয়াজ দিচ্ছে, রূপালী সোনালী মাছেরা মুখের ধবল জলে মালা গাঁথছে, পড়ে আছে তার বল্লম—ঝিনুক মাণিকের বনে,—জ্বল জ্বল্ মণি নিয়ে চক্র সাপের ছেলেমেয়েরা খেলছে ছিনিমিনি শ্বেত শৈবালের দেশে!

ডুবুরী হেলে। হুঁস থাক্ সাহস থাক্, ডুবুরী ডুবুরী। অবাক্ ডুবুরী টোপর খুলে ফেললে, থলে সে ছুঁড়ে ফেললে, মুক্তোর পাহাড়ে হাঁটু ঠেকিয়ে দু হাত পা জোড় করলে; মাথা নোয়াতেই ডুবুরী দেখে—

না রাঘব......না কেউ,
সমুদ্রে সোনার ঢেউ !
অতলে মাথা,
পবনে পা,
পাতালে মুকুট,
মেঘ বজ্র দাঁতে,
নীল মশাল হাতে,
অপরূপ জলদূত !

বল্লম কুড়িয়ে তুলে নিয়ে ডুবুরী থ' খেয়ে রইল।

সাত

হিম কাঁদে।

রোদ শুকায়।

রাজকন্যার দোল-চৌদোল পড়ে রইল দুধসায়রের পাড়ে।

সিপাই, সৈন্য, যন্ত্রী, সান্ত্রী সাতদিন সাতরাত্রি সায়র কিনার ঘিরে রইল।

দাসী বাঁদী রাজপুরী শূন্য করে এল।

সামন্ত আসেন, মন্ত্রী আসেন, রাণী এলেন, রাজা এলেন, রাজকন্যার যে পাষাণে গা জলে পা, সে রাজকন্যা আর উঠলেন না।

বাতাস ঝুর্ ঝুর্,
দুধ সায়রের ঢেউ চুর্ চুর্,

রাজপুরীতে শুক নীরব, শারী নীরব; ভেরী তূরী ডয় ডঙ্কা ঢোল কাড়া জগঝম্প নীরব।

রাজ্যে হৈ হৈ পড়ল।

জন প্রজা কাতারে কাতারে আসে। পশু পক্ষী নড়ে না, ওড়ে না; ঝোপ জঙ্গলে, গাছের ডালে, মাঠে ঘাটে গৃহশালে চরন বলন ঘরকরণ নিভে' রইল।

ঘরের দীপ জ্বলে না ঘরে,
চাঁদ, সুরয, না জ্বলে;
বৃক্ষের পাতায় না পলক সরে,
হায় !
হাওয়ার না চরণ চলে !

সভা দরবার রাজপাটের কবাট বন্ধ।

ঘোড়াশাল হাতীশাল গোশাল রাজভাণ্ডারের দুয়ার বন্ধ।

সওদাগরের ডিঙা কাৎ; মণি-কোঠার হীরের দীপ নির্বাত।

থম্‌থম্ দিক।

দুধসায়রের জলে হাত ডুবিয়ে রাজকন্যা বললেন, "মা ! বাবা ! ফিরে যাও !"

দাসী বাঁদীকে বললেন, "তবে, ফিরে যাও !"

জন জৌলুষ, পশু পক্ষীকে বললেন, "এস, ফিরে যাও !"

রাণী বলেন—"মা !"

রাজা বলেন—"মা !"

জন জনাৎ হাওয়া বাতাস বলে—"রাজকন্যা !"

রাজকন্যা আরেক হাত ডুবান। বলেন, "মা, বাবা, জন—জীব—পৃথিবী !

টলমল নির্ম্মল দুধসায়রের জল, এই জলের যে আমি অঞ্জলি দিব।

যে আছ যেখানে, যদি আমি রাজকন্যা, তো সত্যি করে বলে দাও, এই অঞ্জলি আমি কোথায় ঢালি ? জলে ঢালি, মাটিতে ঢালি, না পাষাণে ঢালি ?"

চারিদিকে শব্দ উঠে

"না ! না ! রাজকন্যা, পাষাণে কি অঞ্জলি ফেলে ? অঞ্জলি জলে, নয় তো মাটীতে ঢাল, রাজকন্যা !"

দুধসায়র চুপ।
মাটী চুপ। ঘাস চুপ।

রাজকন্যা থামেন।

বলেন রাজকন্যা,

"তো
রাজ কি ? অরাজ কি ?
এই রাজ্যেই জন্মেছি !
এই মাটীতেই এই পাষাণ,
এই তো জলেই পাষাণটি !
পাষাণ কেন,
শূন্য ?
তবে কেন ধন্যি জল,
মাটী কেন পুণ্য ?

[আগামী মাসে—

সহরের ছেলে

শ্রীবিমল দত্ত

পুঁথি-পড়া যত সহরের ছেলে
গম্ভীর আর বিজ্ঞ—
আঙুলে তাদের ময়লা ও কাদা
চোখ ভরা শুধু ধূলো—
ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি তাদের ক্ষীণ।
আমি যদি এক বেদিয়া হতাম
বনের প্রান্তে তাঁবু
চুপে চুপে চুপে একদিন ঠিক
সহরে হাজির হ'য়ে
ভুলায়ে তাদের যেতাম লইয়া বনে।

সবুজ বনের গোপনে আঁধারে
হাতদুটী তার ধরে'
দুচোখ ভরায়ে পিয়াতাম তারে
কত অরণ্য শোভা
কোলে করে তারে ঘুম পাড়াতাম সুখে।
পাহাড়ে নদীতে স্নান করাতাম
খাওতাম বুনো ফল
সারাদিন আর সারা রাত ধরে
শুনাতাম পাখী-গান
স্বপ্ন ছাইয়া বাজিত বনের সুর।

বনের পাখীরে চিনিত সহুরে ছেলে
চিনিত বনের পশু
লতাতরু আর বুনো ফুল কত
বিস্ময়ে নির্ব্বাক
সহুরে শিশুর চোখ দুটী যেত' ভরে'।
তারাগুলো কেন ঝিল্ মিল্ করে রাতে
বাতাস কেন সে বয়?
চাঁদ কোথা ডোবে, সূর্য্য কোথায় ওঠে
নদী কোথা থেকে আসে?
স্বপ্ন সত্য মিশে একাকার হ'ত।
সকালের রোদে মাঠেতে নাচিত সুখে
দুপুরের রোদে বনে
সবুজ ছায়ায় আধ-শোয়া হ'য়ে সে যে
বন-মর্ম্মর শোনে
সন্ধ্যায় বালু চরেতে করিত খেলা।

এমনি তাহারে ভুলায়ে দিতাম সব
সহরের সব স্মৃতি
নোংরা বিশ্রী সহরের রাজপথ
কদাকার বাড়ীগুলো
বেমালুম আর বেবাক্ যেত সে ভুলে।
আমার তাঁবুতে থাকিত সে দিনরাত
প্রান্তরে বনে গ্রামে
আমার সঙ্গে বেড়াত সকল ভুলে
বেদিয়া ছেলের মত
সহরে আরত' ফিরতে দিতাম নাক'।

[ইংরাজী হইতে]

জননী জন্মভূমি

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সার্দিস

পারস্যরাজ ক্ষয়ার্শের প্রাসাদ— মন্ত্রণাকক্ষ

[ক্ষয়ার্শ, উজীর, কুবাদ ও বাজাজ]

ক্ষয়ার্শ (উত্তেজিত ভাবে)—না-না এ অসহ্য। এ অপমানের চাইতে মৃত্যু ভাল—মৃত্যু ভাল—উঃ আমার হৃদয়ে শতবৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব কর্চ্ছি—এ অপমান সইবার আগে কেন আমার মৃত্যু হল না? বার বার অসভ্য গ্রীকেরা আমাদের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত কর্ব্বে!—এ যে স্বপ্নেরও অতীত! এ কলঙ্ক কালিমা যে কিছুতেই যাবার নয়! না-না উজীর আমি আর সইতে পাচ্ছিনা—

উজীর—শান্ত হন জাঁহাপনা—এত অধীর হবেন না। এখনও হতাশ হবার কোন কারণ নেই। প্রভু আনুরমাজদার কৃপায়—

ক্ষয়ার্শ। কি ব'লছ তুমি উজীর? আমি শান্ত হব? বৃদ্ধ হ'য়ে মাথা কি তোমার খারাপ হ'য়ে গেছে? মান-অপমান জ্ঞান কি তুমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছ? কী বুঝ্বে তুমি বৃদ্ধ—এ বুকে কি জ্বালা! হৃদয় আমার পুড়ে একবারে খাঁক হ'য়ে যাচ্ছে। যত সব অপদার্থ হতচ্ছাড়াকে আমি দুধ কলা দিয়ে পুষছি! আমার সেনাপতিগুলো ভেড়া'না হ'য়ে যদি মানুষ হ'ত।

কুবাদ। সত্যি মহারাজ ব্যাটারা এক একটা আস্ত গাধা।

ক্ষয়ার্শ। ঠিক বলেছ কুবাদ—সব ব্যাটাই গাধা।

বাজাজ। জাঁহাপনা, আমরা হতভাগ্য—নিয়তির কঠোর পরিহাস!—না হ'লে আমাদের চেষ্টার ত কোন ত্রুটি হয় নাই মহারাজ।

ক্ষয়ার্শ। চুপ কর বাজাজ—লজ্জা করে না সাফাই গাইতে? যত সব কাপুরুষ—

বাজাজ। ভাগ্যদোষে আমরা যখন পরাজিত হয়েছি তখন মহারাজের সকল তিরস্কার গঞ্জনা আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু যদি জান্তেন জাঁহাপনা আমাদের কত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল তাহ'লে আমাদের প্রতি এমন নির্দ্দয় হ'তে পার্ত্তেন না!

ক্ষয়ার্শ। না—তোমাদের তিরস্কার কর্ব্ব না! সবাইকে পুরস্কার দিয়ে মাথায় তুলে নাচতে হবে!

বাজাজ। গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যে কী ভীষণ ব্যাপার তা আর কী বলব মহারাজ—

যাদের প্রাণের মায়া একটুও নাই—মরিয়া হয়ে যারা লড়াই করে তাদের সঙ্গে যুঝে উঠা অসম্ভব ব্যাপার।

ক্ষয়ার্শ। ওঃ—তোমাদের প্রাণের মায়া খুব বেশী—তাই বুঝি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে তোমরা ব্যাকুল হ'য়ে পড়? বেইমান—নরাধম—

কুবাদ। বাজাজ ঠিক কথাই বলেছে জাঁহাপনা। গ্রীকদের সঙ্গে লড়াই করা কোন ভদ্রলোকের কর্ম্ম নয়। অসভ্য ব্যাটারা—না জানে সভ্য যুদ্ধের নিয়মকানুন, না আছে প্রাণে ভয় ডর! তারপর যেমন কাঠ-খোট্টা চেহারা, গায়েও তেমনি অসুরের মত বল। গোঁয়ার ব্যাটারা যখন বল্লম হাতে রুখে দাঁড়ায়, তখন কার সাধ্য তাদের দিকে এগোয়?

ক্ষয়ার্শ। ও—তাই বুঝি আমার সৈন্যেরা সব কুর্নিশ কর্ত্তে কর্ত্তে পিছু হঠে একেবারে চোঁচা দৌড় লাগায়?

বাজাজ। (স্বগত)—প্রভুই ত এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক।

কুবাদ। অবিচার কর্ব্বেন না জাঁহাপনা। এ ছাড়া ভদ্রলোকে এ অবস্থার আর কি কর্ত্তে পারে? তবে এটা মানতেই হবে যে দৌড়ে আমাদের সৈন্যেরা এখনও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে।

ক্ষয়ার্শ। তা আমি একশ বার মানি। তবে কথা এই-যে এ বিষয়ে আমার সৈন্যেরা যদি একটু অপটু হ'ত তবে ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়াত।

কুবাদ। ভুল বুঝবেন না মহারাজ—এটা একটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। গ্রীকদের সঙ্গে লড়তে যাওয়াই আমাদের মস্ত বড় ভুল হয়েছে। আমরা হচ্ছি সুসভ্য পারসিক—আমাদের কি কতগুলো অসভ্য যবনের সঙ্গে লড়াই করা সাজে? ব্যাটাদের না আছে সভ্যতা—না আছে বিলাস বিভব। থাকবার মধ্যে ওদের আছে বড় জোর দুচারটা ছাগল, আর দু এক বিঘে জমি! বার্লিখোরের জাত—ওদের আবার জীবনের মূল্য—ছোঃ—মৃত্যু ওদের কাছে অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ! তাই ছোট লোকগুলো যখন লড়ে, তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লড়ে—প্রাণের মায়া একটুও করে না। প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়—প্রাণ নিতেও একটু ইতস্ততঃ করে না। লড়াই করবার সময় এমন ভাবে তরবারী চালায়—কে জানে কার গলায় কোপ পড়ে—নিজের না শত্রুর! আর ওদের ভাবগতিক দেখলে মনে হয় গর্দ্দানগুলো বুঝি ওদের নিজের নয়, পরের!

ক্ষয়ার্শ। আর আমাদের সৈন্যরা বুঝি সব সময়েই নিজেদের গর্দ্দান বাঁচাতেই ব্যস্ত? তাই বল—তবেই ত লড়বে কখন?

কুবাদ। জাঁহাপনা, যথার্থই অনুমান করেছেন—হবে না—আপনি হচ্ছেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর—আপনার কি আর কিছু জান্তে বাকি আছে? আমাদের সৈন্যেরা লড়বার আগে দুবার গোঁফে চাড়া দেবে, তিনবার দাড়ি আঁচড়ে নেবে—চারবার কোর্ত্তার ধুলো ঝাড়বে—একটু গুলাবের খোস্‌বু শুঁকবে—চাই কি জেব থেকে কাব্য গ্রন্থ বের করে দুলাইন আউড়ে নিতেও পারে। তবে, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে! আর এই অবসরে কাপুরুষ গ্রীকেরা বিনা নোটিশেই একদিক থেকে বেপরোয়া হয়ে তরোয়াল চালিয়ে আমাদের সৈন্যেদের একেবারে কচুকাটা কর্ত্তে লেগে যায়। বেচারারা কোষ থেকে তরোয়াল বের কর্ব্বে—সে ফুরসৎও পায় না—কাজেই নিরুপায় হয়ে তাদের তখন শ্রীচরণের শরণাপন্ন হতে

হয়! কি কর্ব্বে বেচারারা। প্রাণ তাদের যেমন করেই হ'ক বাঁচাতে হবে। তারা মলে যে তাদের প্রত্যেকেরই কমসে কম ডজন দুই করে বিধবা স্ত্রী অনাথা হবে!

[দৌবারিকের প্রবেশ ও কুর্নিশ]

জাঁহাপনা, তিষ্যফার্ণিশ আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ক্ষয়ার্শ। কে—তিষ্যফার্ণিশ? আস্‌তে বল তাকে।

[দৌবারিকের প্রস্থান ও একটু পরে তিষ্যফার্ণিশের কুর্নিশ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রবেশ]

ক্ষয়ার্শ। এই যে তিষ্যফার্ণিশ—কি সংবাদ? গ্রীস থেকে কবে ফিরলে?

তিষ্যফার্ণিস। এই আসছি জাঁহাপনা। গ্রীক সেনাপতি পসানিয়াস আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছেন। [পত্র প্রদান]

ক্ষয়ার্শ। [চিঠি খুলিতে খুলিতে]—আমার কাছে পসানিয়াস' চিঠি লিখেছে! কি ব্যাপার?—[পত্র পাঠ করিয়া উত্তেজিত হইয়া]—কী আস্পর্দ্ধা! ঘৃণ্য কুক্কুর! [পত্র পাঠ]

ক্ষয়ার্শ। [পাঠ শেষ করিয়া]—তিষ্যফার্ণিস তুমি আমার ভৃত্য হয়ে এই পত্র বহন করে এনে আমাকে অপমান কল্লে কোন সাহসে বেইমান! উঃ কী স্পর্দ্ধা এই অসভ্য যবনটার! ঘৃণ্য কুক্কুর—বামন হয়ে চাঁদে হাত! আমার কন্যাকে বিবাহ করবার সাধ! আমি বিস্মিত হচ্ছি এই বর্ব্বরটার সাহস দেখে! হকামনিষ্যির বংশের রাজকুমারী কিনা মালা দেবে এই বাঁদরটার গলায়! প্লেটিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে দেখছি ছোট লোকটার মাথা একেবারে ঘুরে গেছে!

তিষ্যফার্ণিস। সত্যিই জাঁহাপনা, বেকুবটার মাথার ঠিক নাই। সে আজ নিজেকে গ্রীসের ত্রাণকর্ত্তা বলে ভাবছে, এবং মহারাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে মহারাজের সাহায্যে গ্রীসের একছত্র রাজা হবার স্বপ্ন দেখছে। এই আমাদের বিশেষ সুযোগ। শুধু গায়ের জোরে গ্রীসকে পদানত করা যাবে না। কূটনীতি প্রয়োগ না করলে আমরা জয়ী হতে পারব না। বিদেশী শত্রুর আক্রমণে যে জাতি নিজেদের সকল দ্বেষবিদ্বেষ, গৃহবিবাদ ও দলাদলি ভুলে গিয়ে এক হয়ে দাঁড়ায়, দেশের স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়—যারা দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাদের হারাতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে আজো জন্মে নাই। এক্ষেত্রে দেশদ্রোহী পসানিয়াসই আমাদের একমাত্র ভরসা। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। তার সাহায্যেই গ্রীস জয় করা সম্ভব হবে। আগে কাজ শেষ হ'ক—পরে প্রয়োজন ফুরুলে তাকে ছেঁড়া জুতোর মত আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা যাবে। জাঁহাপনা, এই আমার পরামর্শ।

ক্ষয়ার্শ। চমৎকার। আমি তোমার পরামর্শ গ্রহণ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি, তিষ্যফার্ণিশ। যদি সাফল্য লাভ কর্ত্তে পারি, তোমাকে বিশেষ পুরস্কার দেব।

তিষ্যফার্ণিশ। (কুর্নিশ করিয়া) মহারাজের অনুগ্রহই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

ক্ষয়ার্শ। নাঃ, একটু গান শোনা যাক্। ওরে কে আছিস্?

[দৌবারিকের প্রবেশ]

ক্ষয়ার্শ। ওস্তাদকে আস্‌তে বল। হাঁ, আর সরাব নিয়ে আয়।

[দৌবারিকের প্রস্থান ও ওস্তাদের আগমন ও কুর্নিশ]

ক্ষয়ার্শ। একটি মিঠা দেখে গান গাও ত ওস্তাদ। [ওস্তাদ কুর্নিশ করিয়া গান ধরিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাইজান্তিয়াম্—সমুদ্রোপকূল

[গ্রীকদের নৌবহর নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে]

গ্রীক নাবিকগণ পারে জটলা করিতেছে।

১ম নাবিক। না ভাই, স্পার্টান বলদটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। কিছু দিন হ'ল ব্যাটার যে কি হয়েছে বুঝে উঠা দায়। নিশ্চয়ই কেউ ওযুধ করেছে—নাহ'লে বেশ ত ছিল, হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন হবে কেন? নিশ্চয়ই মাথার গোলমাল হয়েছে।

২য় নাবিক। মাথার গোলমাল না আর কিছু! হনে আর কি—প্লেটিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে ব্যাটা ভাবছে তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় বীর ও যোদ্ধা—দেশের তিনিই ত্রাণ কর্ত্তা!

৩য় নাবিক। হাঁ, হাঁ, আমিও শুনেছি ব্যাটার সব সাঙ্গপাঙ্গরা নাকি তাকে দেশত্রাণ বলে ডাকে!

৪র্থ নাবিক। এ কথা সত্যি—তবে ব্যাটাদের একটু ভুল হয়েছে—দেশত্রাণ হবে না—হবে দেশতাড়ন! প্রভুর তাড়নার চোটে আমরা সবাই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি।

২য় নাবিক। না ভাই, দেশব্রণ-ই ঠিক হবে। ব্রণের মতই ওর যাতনায় আমরা সবাই অস্থির হ'য়ে উঠেছি।

১ম নাবিক। না ভাই, ঠাট্টা নয়। বাছাধনকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। নাহ'লে দিন দিনই ওর খামখেয়ালি ও গোয়ার্ত্তুমি যে রেটে বেড়ে চলেছে তা আর সহ্য করা যাবে না।

৫ম নাবিক। আমার যেন কেমন সন্দেহ হয় ব্যাটা কি একটা ধান্দায় আছে। সত্যি ওর চালচলন বড়ই রহস্যজনক। শুন্তে পাই প্রায়ই ওর বাড়ীতে পারসিকদের আনাগোনা হয়। তাদের সঙ্গে ওর খুব দহরম মহরম। আজকাল নাকি প্রভুর পারসিক-খানা না হ'লে মুখে রোচেই না—সেজন্য তিনি একজন পারসিক বাবুর্চ্চিও রেখেছেন।

৩য় নাবিক। শুধুই তাই? বাড়ীতে নাকি পারসিক পোষাক পরে সং সেজে বসে থাকেন! আবার বলেন, আমাদের পোষাক নাকি অসভ্যতার নিদর্শন! পারসিক পোষাক নাকি খুব স্মার্ট দেখায়! কাজ করবার ক্ষমতা নাকি অসাধারণ রূপে বেড়ে যায়!

২য় নাবিক। এর পর কবে শুনব প্রভু নাকি আনুরমাজদার ভজনা করতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন!

৪র্থ নাবিক। তাইত! তবে ত দেখছি এবার জিউস্ ও অ্যাপোলোর রুটি মারা গেল!

১ম নাবিক। চুপ চুপ, ঐ যে দেশত্রাণ এদিকে আসছেন (অঙ্গুলি সঙ্কেত)। বাঃ—চমৎকার! প্রভু দেখছি এবার একেবারে পারসিক পোষাক পরে উদয় হয়েছেন! সঙ্গে তার ভক্তরাও আছেন!

[অনুচর সহ পারসিক পোষাক পরিহিত পসানিয়াসের প্রবেশ এবং গ্রীক নাবিকদের দণ্ডায়মান হইয়া হাত তুলিয়া অভিবাদন]

পসানিয়াস। না—না ঠিক হচ্ছে না। হাত তুলে অভিবাদন মোটেই সুরুচিসঙ্গত নয়। আমি আজ থেকে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন কর্চ্ছি যে আমাকে কুর্ণিশ করে অভিবাদন কর্ত্তে হবে। এই প্রথাই আমার মর্য্যাদার উপযোগী।

জনৈক অনুচর। প্রভুর আদেশ খুবই সঙ্গত। আপনি হলেন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা—আপনাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখানই আমাদেব কর্ত্তব্য।

১ম নাবিক। তা ব'লে আমাদের চিরদিনের প্রথা আমরা ছাড়তে রাজী নই। আমরা গ্রীক—দেবতা ছাড়া আর কারুর কাছে আমরা শির নোয়াই না। না-না—সে হবে না—কুর্ণিশ আমরা কখনই কর্ব্ব না।

পসানিয়াস। তোমার স্পর্দ্ধা দেখে বিস্মিত হচ্ছি! খবর্দ্দার! এরূপ ঔদ্ধত্য আমি কখনও সইব না। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও কুক্কুর।

অনুচর। নিশ্চয়ই—মনিবের কাছে এমন বেয়াদপি অমার্জ্জনীয়।

১ম নাবিক। মনিব আবার কে? গ্রীক কারও ভৃত্য নয়। আমরা সবাই সমান—তবে উনি আমাদের নেতা—নেতার সম্মান আমরা তাকে সব সময়েই দেখাতে প্রস্তুত আছি।

পসানিয়াস। চোপরাও বেইমান! আমি তোমার স্পর্দ্ধা কখনই ক্ষমা কর্ব্ব না।

১ম নাবিক। রসনা সংযত করুন সেনাপতি! গালাগালি কর্ব্বার কোন অধিকার আপনার নাই।

পসানিয়াস। বটে! উত্তম! দেহরক্ষী, এই বর্ব্বরটাকে বন্দী করে নিয়ে পঁচিশ ঘা বেত লাগাও।

[২জন দেহরক্ষীর ১ম নাবিককে লইয়া প্রস্থান]

পসানিয়াস। শোন, নাবিকগণ! আমি পসানিয়াস—গ্রীসের রক্ষাকর্ত্তা—ভাগ্য-বিধাতা—তোমাদের সকলের প্রভু! ভবিষ্যতে আমি কখনও কারো কোনরূপ অবাধ্যতা ও অসৌজন্য সহ্য কর্ব্ব না। সাবধান!

[অনুচরসহ পসানিয়াসের প্রস্থান]

২য় নাবিক। (ক্রুদ্ধভাবে) না—কখনই না—এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা আমরা কিছুতেই সইব না। আমরা স্বাধীন গ্রীক—কারো গোলাম নই। এর প্রতিকার করা চাই।

৩য় নাবিক। নিশ্চয়ই। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব। ব্যাটা যে বিশ্বাসঘাতক সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই ও পারসিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কর্চ্ছে। দেখলে না, আজ প্রকাশ্যেই পারসিক পোষাক পরে, পারসিক দেহরক্ষী নিয়ে এখানে এসেছিল। ব্যাটা দেশদ্রোহী! আবার এসেছে চোখ রাঙ্গাতে। না—না—এ অসহ্য।

৪র্থ নাবিক। ঠিক! এস, ওর নামে স্পার্টা ও এথেন্সে নালিশ করে পাঠাই—তাহ'লেই ব্যাটাকে সরিয়ে নেবে।

সকলে (সমস্বরে)—তাই ঠিক—তাই ঠিক।

তৃতীয় দৃশ্য

স্পার্টা—ইফোরদের মন্ত্রণা গৃহ

[পাঁচজন ইফোর পরামর্শ করিতেছে]

১ম ইফোর। পসানিয়াসকে নিয়ে সত্যি বড় বিপদ হয়েছে। কি যে সে আরম্ভ করেছে কিছুদিন থেকে আর বলা যায় না। কেন বাপু, তুই হলি গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—প্লেটিয়া-

বিজয়ী দেশের রক্ষা কর্ত্তা—স্পার্টার গৌরব—তোর কি এ সব খামখেয়ালি সাজে? কোথায় তোর সম্মানের জন্য নগরে নগরে প্রতিমূর্ত্তি গড়ে লোকে তোর পূজা কর্ব্বে—না তোর ব্যবহারে সবাই উত্ত্যক্ত হয়ে আজ তোকে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিচ্ছে! ওরে হতভাগা তোর বেকুবিতে যে স্পার্টার গৌরব ম্লান হতে বসেছে—সে যে তাঁর প্রাধান্য হারাতে চলেছে!

২য় ইফোর। এথিনীয়ানরা যাই বলুক না কেন--আমার কিন্তু মনে হয় না পসানিয়াস দেশদ্রোহী। একজন স্পার্টান বীর যে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বদেশকে বিদেশী-শত্রুর হাতে তুলে দেবে--এ অসম্ভব—বিশেষতঃ দেশকে সে ভীষণ সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছে! হাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে লোকটার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে—রোজই বাইজান্তিয়াম থেকে একটা না একটা নালিশ আসছেই।

৩য় ইফোর। আর সেই সুযোগ নিয়ে ধূর্ত্ত এথিনীয়ানরা আমাদের প্রাধান্য খর্ব্ব কর্ব্বার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে।

৪র্থ ইফোর। স্পার্টার দূর্ভাগ্য!

২য় ইফোর। তা আর বল্‌তে! যেমন খবর পাচ্ছি কোনদিন শুনব বাইজান্তিয়ামের পাজী নাবিকগুলো এথিনীয়ানদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করে একজন এথিনীয়ানকে না নৌসেনাপতি করে!

৫ম ইফোর। আমার কিন্তু মনে হয় অ্যারিষ্টাইদিস্ ব্যাটাই ওদের উস্কোচ্ছে।

১ম ইফোর। তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে নাকি? ব্যাটার ইচ্ছা নিজে সেনাপতি হয়—তাই তলে তলে পসানিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্চ্ছে।

৩য় ইফোর। পসানিয়াসকে ত অনেক দিন হল তলব দেওয়া হয়েছে--কই সে ত আজও এসে পৌঁছাল না?

৪র্থ ইফোর। না, আমি খবর পেয়েছি সে আজ সকালে স্পার্টায় এসেছে। বোধহয় আজই আমাদের সঙ্গে দেখা কর্ব্বে।

৫ম ইফোর। আচ্ছা ওকে নিয়ে কি করা যায় বল ত?

১ম ইফোর। আসুক ত আগে। সব শুনে যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

২য় ইফোর। হাঁ হাঁ তাই ঠিক।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবারিক। পসানিয়াস এসেছেন।

১ম ইফোর। তাঁকে আস্‌তে বল এখানে।

[দৌবারিকের প্রস্থান ও পসানিয়াসের প্রবেশ]

ইফোরগণ। এই যে আসুন।

পসানিয়াস। (রাগান্বিত হইয়া)—এ সবের মানে কি? তোমরা সবাই ভেবেছ কি? এমন জোর তবল দেওয়ার অর্থ কি আমি জান্তে চাই।

১ম ইফোর। শান্ত হোন—সবই শুনতে পাবেন।

পসানিয়াস। শান্ত হ'ব? অসম্ভব! এমন ভাবে হুকুম পাঠালে কার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে? ভুলে যেওনা আমি রাজপ্রতিনিধি—রাজপুত্র!

২য় ইফোর। তা কি কর্ব্ব বলুন? আপনার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ এসেছে।

পসানিয়াস। আমার বিরুদ্ধে নালিশ? ও বুঝেছি—এসব ছোটলোক ব্যাটাদের কাজ। তা আমি থোড়াই কেয়ার করি। এবার গিয়ে ব্যাটাদের এমন শিক্ষা দেব যে বাছাধনরা আর টঁ্যাফু কর্ত্তে সাহস কর্ব্বে না।

৪র্থ ইফোর। সে যাক্। আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। আপনি নাকি পারসিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

পসানিয়াস। আমি ষড়যন্ত্র কর্চ্ছি! মিথ্যা কথা। তোমাদের সবার স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

৩য় ইফোর। তা কি করা যাবে—আপনার বিচার হবে।

পসানিয়াস। আমার বিচার! কে কর্ব্বে শুনি? ভুলে যেওনা আমি তোমাদের রাজপুত্র ও রাজপ্রতিনিধি।

৫ম ইফোর। তা জানি। তবু আপনার বিচার হবে। আপনি স্বয়ং রাজা হলেও আমরা আপনার বিচার কর্ত্তাম।

পসানিঘাস। চমৎকার! উত্তম, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ? আমি বল্‌ছি আমি নির্দ্দোষ।

৩র ইফোর। ষড়যন্ত্রের প্রমাণ অবশ্য কিছুই নাই—আর আপনি যখন এ অভিযোগ অস্বীকার কর্চ্ছেন তখন আমরা তা প্রত্যাহার করে নিলাম। কি বল তোমরা?

অন্যান্য ইফোর। আমাদেরও তাই মত।

১ম ইফোর। তবে আপনার চালচলন যে অস্বাভাবিক সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনার ব্যবহারে গ্রীক নাবিকগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের ভাব-সাব দেখে মনে হয় কিছুদিন এরূপ চললে তারা বিদ্রোহ কর্ব্বে। কাজেই স্পার্টার স্বার্থ-রক্ষার জন্য আপনাকে নৌসেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তোমাদের কি মত?

অন্য সব ইফোরগণ। হাঁ—আমরাও তাই সমীচীন মনে করি।

১ম ইফোর। বেশ—আপনাকে আমার পদচ্যুত কর্ল্লাম।

পসানিয়াস। তোমাদের যা খুসি কর গিয়ে। যত সব ইয়ে—

[পসানিয়াসের উত্তেজিত হইয়া প্রস্থান]

৫ম ইফোর। আজকের মত আমাদের কাজ হয়ে গেল ত। চল এখন ওঠা যাক্।

সকলে। বেশ চল যাই।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পতন

[ক্রমশঃ

আয়নার ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক

বেনারসে বেড়াতে এসেছি। সঙ্গে আছেন মা ও ভাই-বোনেরা।

অগস্ত্য কুণ্ডের সরু একটা গলির ভিতরে একখানা মাঝারি আকারের বাড়ীতে আমাদের বাসা। বাড়ীখানা তেতালা এবং সেকেলে। এ-অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়ীর মত এরও নীচের তালার সঙ্গে সূর্য্যালোকের সম্পর্ক নেই কিছুমাত্র। তাই একতালার ঘরগুলো আমরা ব্যবহার করতুম না।

আমাদের বেনারসে থাকবার কথা মাস-তিনেক। দু-চার দিন যেতে-না-যেতেই এখানকার জনকয়েক লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কাজেই একখানা বাইরের ঘর বা বৈঠকখানার দরকার হ'ল। একদিন সকালে নীচে নেমে দেখলুম, নীচের কোন ঘর কাজে লাগাতে পারা যায় কিনা।

সদর দরজার পাশেই এক খানা বড় ঘর পছন্দ হ'ল। যদিও এ-ঘরে চারটে জান্‌লা ছিল, তবু ঘরের ভিতরে বিরাজ করছিল প্রায়-সন্ধ্যার অন্ধকার। কিন্তু বেনারসের বাসিন্দাদের অন্ধকার সম্বন্ধে বোধ হয় কোন অভিযোগ নেই, অতএব এই ঘরখানাকেই বৈঠকখানার উপযোগী করবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলুম।

ঘরের জান্‌লাগুলো খুলে দিয়ে দেখলুম, মাঝখানে রয়েছে একখানা চৌকি এবং পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো রয়েছে প্রকাণ্ড একখানা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি—নিশ্চয় বাড়ীওয়ালারই সম্পত্তি।

কিন্তু ছবিখানা ছিল পিছন-ফিরানো। আমি তাকে সামনে ফেরাতে গিয়ে দেখলুম—না, এখানা তো ছবি নয়, দামী সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত-বড় এক আয়না—লম্বায় পাঁচ ও চওড়ায় তিন হাত। ফ্রেমের সোনালী রং নানা স্থানে চ'টে গিয়েছে দেখে বুঝলুম, আয়নাখানার বয়স অল্প নয়।

এ-রকম মূল্যবান আয়না এ-ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে কেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছি, এমন সময় আমার সখের কুকুর ঝুমী সেখানে এসে হাজির হ'ল।

আদর ক'রে তাকে ডাকলুম, "আয় রে ঝুমী, আয়।"

ঝুমী ল্যাজ নেড়ে মনের আনন্দ জানালে,—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে আয়নার দিকে তাকিয়েই তার কান দুটো হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল এবং ল্যাজটা কুঁক্‌ড়ে ঢুকে গেল একেবারে পেটের তলায়।

ব্যাপার কি? ঝুমি কি আয়নার ভিতরে তার নিজের চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে? একটু অবাক হলুম। কারণ আমি বরাবরই লক্ষ্য করে দেখেছি কুকুর-বিড়ালরা আর্সিতে নিজেদের চেহারা দেখে বিশেষ বিস্মিত হয় না—অনেক সময়ে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

ঝুমী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে স'রে পড়ল। তারপর এ ঘরে সে আর ডাকলেও আসত না। এমন-কি এ ঘরের পাশ দিয়ে আনাগোনা করবার সময়েও গরর্‌-গরর্‌ ক'রে গর্জ্জন করত। তার এ ব্যবহারের কারণ বোঝা গেল না।

দুই

দিন তিনেক পরের কথা।

দোতালায় ব'সে মায়ের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ নীচ থেকে এল বিমলের পরিত্রাহী চীৎকার। বিমল হচ্ছে আমার ছোট ভাই। বয়স সাত বৎসর।

দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলুম। চীৎকার আসছে বাইরের ঘর থেকে।

সেখানে গিয়ে দেখি, আয়নার সামনে জড়োসড়ো ব'সে ভয়ার্ত্ত স্বরে বিমল দুই চক্ষু মুদে চীৎকারের পর চীৎকার করছে!

—"কি রে বিমলা, কি হয়েছে রে?"

—"জুজু দাদা, জুজু! আয়নার ভেতরে জুজু!"

—"কি যা তা বল্‌ছিস্‌? কৈ, আয়নার ভেতরে কেউ তো নেই—খালি তুই আর আমি ছাড়া!"

—"না দাদা, একটা ভয়ানক জুজু আয়নার ভেতর থেকে কট্‌মট্‌ করে আমার পানে তাকিয়ে ছিল!"

তার ছেলেমানুষী ভয়ের কথা শুনে আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম।

কিন্তু আমার হাসি শুনেও বিমল কিছুমাত্র আশ্বস্ত হ'ল না। দারুণ আতঙ্কে আয়নার দিকে তাকাতে তাকাতে পায়ে পায়ে পিছিয়ে প'ড়ে ঘর থেকে সে পালিয়ে গেল।

ব্যাপার কি? অবোলা পশু ঝুমী, অবোধ শিশু বিমল—এ ঘরে ঢুকে দুজনেই একরকম ব্যবহার করলে কেন? দুজনেই ভয় পেলে ঐ আয়নাখানা দেখিয়ে! আশ্চর্য্য! একখানা জীর্ণ, ত্যক্ত, সেকেলে সাধারণ আর্‌সি— তার অপরিষ্কার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে

কেবল এই ঘরেরই খানিকটা অংশ, এর মধ্যে আবার ভীতিকর কি থাকতে পারে? তবে কি ওর পিছনে কিছু লুকিয়ে আছে? সাপ-টাপ বা অন্য কোন রকম জীব?

সাবধানে এগিয়ে হেলিয়ে দাঁড়-করানো সেই আয়নার পিছনের ফাঁকে উঁকি মারলুম। কিছুই নেই। আরো ভালো ক'রে দেখবার জন্য দুই হাতে আয়নাখানাকে ধ'রে টেনে সরাতে গেলুম। কিন্তু পারলুম না—বিষম ভারি! অথচ সেদিন এখানাকে আমি নিজের হাতেই ফিরিয়ে খুব সহজেই সোজা ক'রে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিলুম! হঠাৎ এখানাকে জগদ্দল পাথরের মতন ভারি বলে মনে হচ্ছে কেন?.........আরো খানিকক্ষণ প্রাণপণে টানাটানির পর সে ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম।........ এ আবার কি রহস্য?

তিন

কয়েক দিন কেটে গেল।

সেদিন দুপুরে দুজন বন্ধু এসেছিলেন। বাইরের ঘরে ব'সে খানিকক্ষণ গল্প ক'রে তাঁরা চলে গেলেন। আমি একলাটি ব'সে ব'সে খবরের কাগজ পড়তে লাগলুম।

দুপুর বেলায় এ-ঘরটায় খানিকক্ষণের জন্যে কিছু আলো আসে।

পড়তে পড়তে প্রাণের ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। মনে হ'ল, আমি যেন এ ঘরে আর একলা নই, কে যেন অপলক চোখে আমার পানে তাকিয়ে আছে!

মুখ তুলে অবশ্য কারুকেই দেখতে পেলুম না।—দেখতে পাবার কথাও নয়। তবু কিন্তু মনের ভিতর থেকে সেই অদ্ভুত ভাবটা তাড়াতে পারলুম না—সেখানে আমার পাশে অদৃশ্য আর একজনের উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলুম বারংবার!

আবার মুখ তুলতেই চোখ প'ড়ে গেল সেই পুরাতন আয়নার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল!

আয়নার মধ্যে সবিস্ময়ে দেখলুম, ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণ এক মূর্ত্তি।

হ্যাঁ, সে মূর্ত্তিকে ভীষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না! তার চোখ দুটো কোটর থেকে যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার জিভখানাও ঠোঁটের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে, আর তার গলা বেড়ে রয়েছে একটা টক্‌টকে লাল দাগ।

আমি একবার একটা গলায়-দড়ী-দিয়ে-মরা লোক দেখে ছিলুম। এরও চেহারা ঠিক সেই রকম।

কয়েক মুহূর্ত্ত ব'সে রইলুম আচ্ছন্নের মত। তারপর ভয়ে-ভয়ে পিছন ফিরে তাকালুম। কিন্তু কই আর কেউ তো এখানে নেই!

আবার আয়নার দিকে চোখ গেল। তার মধ্যেও আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির চিহ্ন নেই।

ভুত-টুত মানি না, আর এমন অসম্ভবও কখনো সম্ভব হয় না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমার চোখের ভ্রম?

নিজের মনেই হেসে উঠলুম। এ হচ্ছে শিবের কাশী, আর শাস্ত্র বলে শিব হচ্ছেন ভূতনাথ। তবে কি কোন শিবানুচরই সময় কাটাবার জন্যে আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মস্করা করবার ফিকিরে আছেন?

অন্য লোক হ'লে হয়তো তাইই বুঝত। কিন্তু আমি হচ্ছি অবিশ্বাসী আধুনিক বাঙ্গালী, মেডিকেল কলেজে দস্তুরমত মড়ার পর মড়া কেটে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি,—আমার কাছে শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের কোন ধাপ্পাবাজিই খাটবে না। অ্যানাটমির কোন কেতাবেই ভৌতিক দেহের বর্ণনা নেই—ভূত-পেত্নী বাস করে কেবল শিশুদের উপকথায় আর অশিক্ষিত নির্ব্বোধের কল্পনা-জগতে।

কিন্তু মনের ভিতরটা কেমন-কেমন করতে লাগল। এই আবছায়া-মাখা স্যাঁৎসেতে ঘরের হাওয়া যেন বিষাক্ত! এ ঘরে কেউ নাই বটে, কিন্তু তবু যেন সন্দেহ হয়, আমি ছাড়া আর একজন কেউ এখানে আছে! তার নিষ্পলক দৃষ্টি এসে বিঁধ্‌ছে আমার সর্ব্বাঙ্গেই!

খবরের কাগজ ফেলে উপরে গেলুম। বিমলকে ডেকে প্রশ্ন ক'রে বুঝলুম, আয়নার ভিতরে সে যাকে দেখেছিল তারও চেহারা হচ্ছে আজ্‌কের আমার দেখা লোকটার মতই!

গভীর বিস্ময়ে যেন হতভম্ব হয়ে গেলুম। আমাদের দুজনেরই এমন একরকম চোখের ভ্রম হ'ল কেন? কুকুর ঝুমিই বা ও-ঘরে ঢুকতে চায় না কেন? সে তো শাস্ত্রীয় ভূতনাথের নাম শোনেনি বা উপকথায় উপদেবতার গল্পও পড়ে নি, তবে তার ভয় পাবার কারণ কি?

চার

গঙ্গার ধারে ভূষণবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভূষণবাবু হচ্ছেন এখানকার একজন সবজান্তা লোক—বেনারসের নূতন ও পুরানো সব খবর তাঁর নখদর্পণে।

আজ সকালে আমার বাসায় ছিল ভূষণবাবুর চায়ের নিমন্ত্রণ।

যথাসময়ে তিনি এলেন কিন্তু বৈঠকখানায় ঢুকে আয়নাখানা দেখেই চম্‌কে উঠলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "শিউপ্রসাদ বাবুর আয়নাখানা এখনো এ বাড়ীতেই আছে?"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "শিউপ্রসাদ বাবু কে?"

—"কাশীর এক মহাজন। আগে এ-বাড়ীখানা ছিল তাঁরই।"

—"তিনি এখন কোথায়?"

—"দশ বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি।

—"কি রকম?"

—"রাগের মাথায় এক চাকরকে তিনি এমন প্রহার করেন যে, সে বেচারা মারা পড়ে। শিউপ্রসাদ বাবুর নামে ওয়ারেণ্ট বেরোয়। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপতার করতে এসে দেখে, এই ঘরের কড়িকাঠে তাঁর মৃতদেহ ঝুলছে। তিনি গলায় দড়ী দিয়েছিলেন।

আমার বুক কেঁপে উঠল। আয়নায় দেখা সেই মূর্ত্তিটাকে আবার মনে পড়ল। সেই ঠিকরে পড়া-চোখ, সেই বেরিয়ে-পড়া লক্‌লকে জিভ, সেই গলা বেড়ে টক্‌টকে লাল দাগ। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "তারপর?"

—"তারপর এ বাড়ীখানা বিক্রি হ'য়ে যায়। নতুন মালিক এখানে এসে কিন্তু বেশী দিন বাস করতে পারেন নি।"

—"কেন?"

—"ঐ আয়নাখানার ভয়ে।"

—"তার মানে?"

—"আয়নাখানার ভারি দুর্ণাম আছে। নানান্ লোকে নানান্ কথা বলে। সে-সব আজগুবি কথা আমি বিশ্বাস করি না, আপনাকেও বলতে চাই না।

—"আয়নার যদি এমন দুর্নাম, তবে ওখানা ভেঙে ফেললেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়?"

—"নতুন মালিককে সে-পরামর্শও কেউ কেউ দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোয় নি। যে-অভিশাপ আয়নার ভেতরে বন্ধ আছে, ওখানাকে ভেঙে তাকে বাইরে আনতে তিনি ভরসা পান নি।"

—"তাহ'লে আপনি বলতে চান ওখানা হচ্ছে ভুতুড়ে আয়না?"

—"আমি বলি না, লোকে বলে।"

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম। ঘরের কোনে ছিল একটা জান্‌লা-ভাঙা লোহার গরাদে, টপ্ ক'রে সেটা তুলে নিয়ে আয়নার উপরে করলুম সজোরে এক আঘাত! প্রকাণ্ড কাঁচের উপর অংশ ঝন্-ঝন্ ক'রে ভেঙে পড়ল! আবার গরাদে তুললুম এবং পর-মুহূর্ত্তেই দেখলুম, আয়নার নীচের অংশে ফুটে উঠেছে আগুন-ভরা দুটো চক্ষু! কি ক্রুদ্ধ, কি হিংস্র সেই দৃষ্টি! মুখ নেই, দেহ নাই,—খালি দুটো জ্বলন্ত, ক্ষুধিত চোখ! এও কি আমার চোখের ভ্রম?

আবার আঘাত করলুম—কাঁচের বাকি অংশও ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে গেল।

ভূষণবাবু কিছু দেখেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি কাঁপতে কাঁপতে চৌকির উপরে ধপাস্ ক'রে ব'সে পড়লেন।

কবিতা

পিওন বুড়ো

শ্রীনারায়ণদাস সান্যাল

কাঁধের ঝোলায় বোঝাই চিঠি হন্‌হনিয়ে চলছে ছুটে,
পোষ্টাপিসের পিয়ন ও যে, পাগড়ীধারী চিঠির মুটে।
পার্শেলে আর খামের ভারে চিঠির থলি ভর্ত্তি ওর,
সাঁঝের আগেই বিলিয়ে দিলে দেখবে তখন ফুর্ত্তি জোর।
ঝুমুর ঝুমুর বাজছে ঘুমুর, সুরটা কানে লাগছে বেশ
স্ফূর্ত্তিবাজের মূর্ত্তিখানি,—প্রাণে গানের জাগছে রেশ!
কারণটা কি,—বুঝ্‌লে নাকি? আজ যে মাসের পয়লা ভাই,
পিয়ন ভায়ার ভর্ত্তি পকেট;—গানের সুরের বিকাশ তাই।

চিঠির পরে বিলিয়ে চিঠি ক্রমেই খালি হচ্ছে থলি;—
পথের মাঝেই বাড়ছে বেলা, পড়ছে পিছে রাস্তা গলি।
ভাল খারাপ নানান খবর মিলিয়ে আছে একই সাথে,
সারা ভারত এক হয়েছে,—মহামিলন ওর ঝোলাতে।
তারের খবর হচ্ছে বিলি, নেয়না খবর কি তার তা'র,
সে শুধু চায় কমিয়ে যেতে চিঠির থলির বিষম ভার।
তার পিছনে কান্না হাসির যে স্রোত ব'য়ে যায় যে রোজ,
চিনির বলদ পায়না খবর—নেয়না তাহার কোনই খোঁজ।

ফুরিয়ে গেলে দিনের আলো পিয়নবুড়োর কাজ ফুরালো;
সন্ধ্যাদেবীর স্নিগ্ধ বাতাস ক্লান্ত দেহে লাগ্‌লো ভালো।
পিয়ন ভায়ার পড়লো মনে অনেক দিনের অনেক স্মৃতি
আজকে তাহার শূন্য ঘরের হারিয়ে-যাওয়া প্রীতির গীতি।
হারিয়ে গেছে যে দিনগুলি, হারিয়ে গেছে যে সব সাথী,
এমনি সাঁঝে জ্বাল্‌তো যেজন তুলসী তলে সন্ধ্যে-বাতি;

ক্লান্ত মনে শ্রান্ত পায়ে বৃদ্ধ পিয়ন ফিরছে বাড়ি,
ডাইনে পুকুর, সম্মুখে পথ, রইল বাঁয়ে তালের সারি।
তারই সাথে হারিয়ে গেছে প্রিয় যেজন প্রাণের চেয়ে—
পিয়নবউয়ের সাথেই গেছে তার যে কচি ছোট্ট মেয়ে।
হঠাৎ পিয়ন দাঁড়িয়ে গেল, তাকেই যেন ডাক্‌ছে ও কে,—
ডাইনে বাড়ির জান্‌লা থেকে আশায় উজল দীপ্ত চোখে,
"পিয়নদাদা! একটু দাঁড়াও, দেখ দিকিন্ তোমার কাছে
আমার,—কিম্বা মায়ের নামে বাবার কোনো পত্র আছে?"
মায়ের সাথে গাঁয়েই থাকে রুগ্না মায়ের একই মেয়ে,
বাপ সহরের মিলের মজুর,—কী হবে ওর এরই চেয়ে?

যাওয়ার বেলা মেয়ের চোখের অশ্রুকণা মুছিয়ে দিয়ে
বাপ যে তাহার বল্লে টাকা পাঠিয়ে দেবে সহর গিয়ে!
চৌধুরীদের মতো তখন তাদের হবে মস্ত বাড়ি,
"গঙ্গাজলের" মত তখন তারও হবে রঙীন শাড়ী!
সেই সুদিনের স্বপ্নে বিভোর ডাগর দুটী চক্ষু চেয়ে,
পথের ধারে চিঠির আশে দাঁড়িয়ে একা মজুর মেয়ে।
ক্লান্ত পিয়ন শ্রান্ত দেহে পারলে নাকো চল্‌তে আর,
কী সব ভেবে পথের ধারেই নামিয়ে রাখে ঝোলার ভার।

বৃদ্ধ প্রাণের কোন্ নিভৃতে করলে আঘাত ছোট্ট মেয়ে,
কিসের আঘাত কাহার ব্যথা ঝরল তাহার দু চোখ বেয়ে!
—"এই যে আছে—হাত পেতে নাও"—বল্‌লে পিয়ন রুদ্ধ স্বরে,
"তোমার বাবা পাঠিয়ে দেছে এই থলিটী তোমার তরে!"
নীরব নীরস চিনির বলদ নামিয়ে দিয়ে ব্যাথার ভার
মজুর মেয়ের হাতেই দিলে একটী মাসের বেতন তার॥

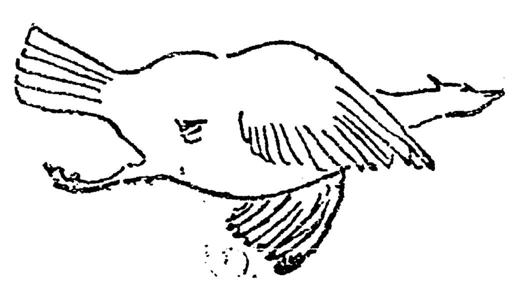

ট্যাঙ্কের জন্মকথা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

'ট্যাঙ্ক' নামটির পিছনে রয়েছে একটা চালাকীর ইতিহাস। কার্য্যকরী ভাবে এই ট্যাঙ্ক তৈরী হয়েছিল গত ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে। ইংরাজেরা ঐ সময়ে এইগুলি তৈরী ক'রে ফ্রান্সে চালান দিত। চালান দিবার সময়ে পাছে শত্রুপক্ষ জানতে পারে, এই জন্য প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ওটা পূরে উপরে লিখে দেওয়া হ'ত—'Tank for Russia' অর্থাৎ রাশিয়ার জন্য জলের চৌবাচ্চা!

এর থেকেই ঐ দুর্গ-যানগুলির নাম হ'য়ে গেল—'ট্যাঙ্ক'!

আসলে কিন্তু ওগুলি এক একটি ছোট দুর্গ বিশেষ। ওর মধ্যে থাকে সৈন্য আর কামান-গোলা প্রভৃতি নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র! খুব পুরু ইস্পাত দিয়ে এই বৃহৎ গুবরেপোকা ধরণের ট্যাঙ্কটির আবরণ দুর্ভেদ্য ক'রে তৈরী হয়।

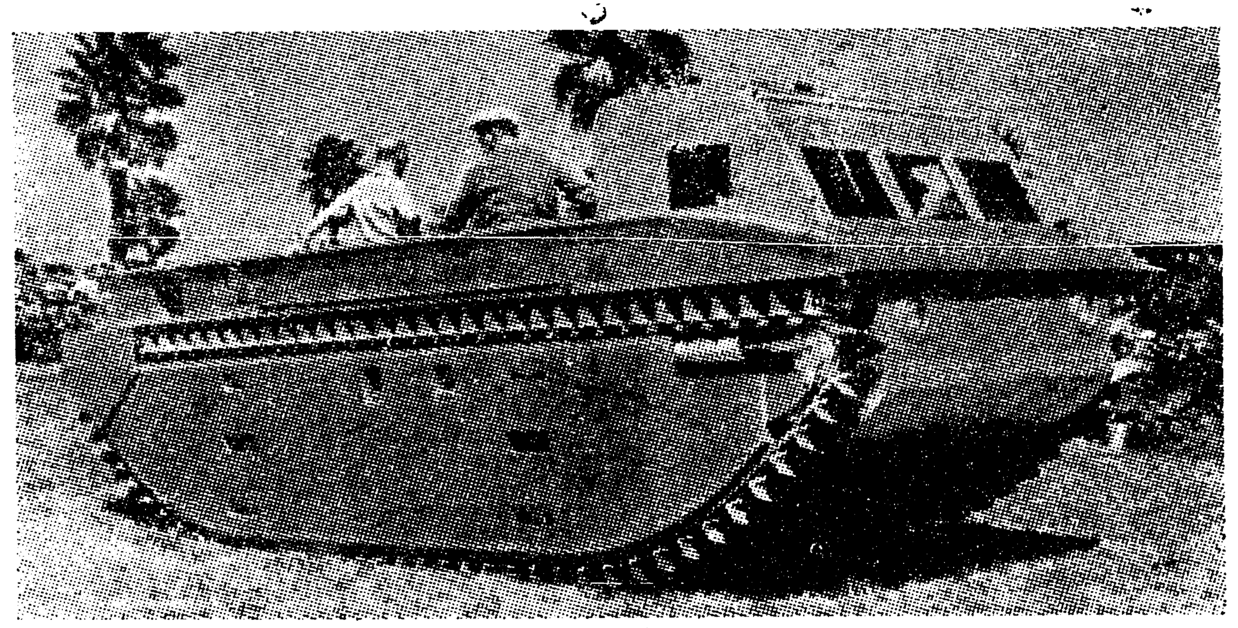

একটি আধুনিক ট্যাঙ্ক

ট্যাঙ্কের সব চাইতে বড় সুবিধা এই যে, বন-বাদাড় ভেঙ্গে, খাল নালা ডিঙ্গিয়ে এটা চ'লতে পারে। মোটরগাড়ী ভাল পথ না পেলে চ'লতে পারে না; কিন্তু ট্যাঙ্কের সে সব দরকার নেই কিছু। ছেড়ে দিলেই ওটা কচ্ছপের মত গুট্‌গুট্ ক'রে মাঠ-ঘাট, ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে চ'লতে আরম্ভ ক'রবে।

ওটা প্রথম যখন আবিষ্কৃত হ'য়েছিল তখন কচ্ছপের মতই মৃদুমন্দ গতিতে চ'লত।

তারপর ওর গতিবেগ ঘণ্টায় দশ মাইল পর্য্যন্ত উঠল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ট্যাঙ্কের গতি হ'য়েছে ঘণ্টায় ৩০ মাইলেরও উপর!

কেবল গতিবেগ নয়,—আরও অনেক দিক দিয়ে ট্যাঙ্কের উন্নতি হ'য়েছে। তখনকার দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেট্রোল পূরতে হ'ত, আর এখনকার ট্যাঙ্কে একবার তেল পূরলে একাদি-ক্রমে দেড়শো দুশো মাইল রাস্তা পেরিয়ে যাওয়া যায়! পূর্ব্বকার ট্যাঙ্ক থেকে আধুনিক ট্যাঙ্ক ঢের বেশী মজবুত। ওজনেও ওগুলি কম নয়—এক একটি ট্যাঙ্ক প্রায় ৫০।৬০ টন অর্থাং প্রায় চৌদ্দ-পনরশ' মণ!

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে সাপ, কচ্ছপ, কুমীর, কি শুঁয়োপোকা মাটিতে চলবার সময়ে সমতলভূমি অপেক্ষা অসমতল যায়গাতেই বেশী তাড়াতাড়ি চ'লতে পারে। তার কারণ, চ'লবার সময়ে এরা মাটি কামড়িয়ে বা মাটিতে জোরে ধাক্কা দিয়ে চ'লে।

ট্যাঙ্কও ঠিক এই কারণেই পাকা সমতল রাস্তা থেকে এবড়ো-থেবড়ো যায়গা দিয়েই বেশী জোরে চলে।

যুদ্ধ ব্যাপারটা প্রায়ই পাকা রাস্তার ধারে সংঘটিত হয় না অথবা যুদ্ধ হবে ব'লে কোনও স্থানের রাস্তাঘাটগুলো 'কংক্রিট' করে বা 'পিচ' দিয়ে নেওয়ারও সময় পাওয়া যায় না মোটেই। এইজন্য বর্ত্তমান যুদ্ধে ট্যাঙ্কের' প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী। কারণ, ট্যাঙ্কের চাকায় পরানো থাকে এক রকম খাঁজ-কাটা লোহার বেল্ট। ঠিক শুঁয়োপোকার মত চলে এই বেল্টগুলি। এজন্য ঐ খাঁজ-কাটা লোহার বেল্টের নাম হ'য়েছে—'ক্যাটারপিলার ট্র্যাকটর'।

অতি আধুনিক যুদ্ধের ট্যাঙ্কগুলি যেমন বন-বাদাড় ভাঙ্গতে পারে, তেমনি বালুকাময় ধূ ধূ মরুভূমিও পার হ'তে পারে—আবার প্রয়োজন হ'লে জলেও সাঁতার কাটতে পারে! জলে এর গতিবেগ ঘণ্টায় দশ-বার মাইলেরও বেশী।

অনেকে বলেন, বাজপাখীর পক্ষ এবং মাছের পুচ্ছ চালাবার অনুকরণ থেকেই প্রথম এরোপ্লেনের কল্পনা করা হ'য়েছিল। ট্যাঙ্ক অপদেবতাটি কিসের অনুকরণে করা হয়েছিল কে জানে! আমাদের দেশে এক রকম পোকা দেখতে পাওয়া যায়। পোকাগুলি ছোট, কিন্তু আকারটা ঐ ট্যাঙ্কের মতই। ঐ পোকাগুলির পিঠের উপর চাপ দিলেই পত্-পত্ ক'রে শব্দ ক'রে এবং দুর্গন্ধময় ধোঁয়া ছেড়ে আরও দ্রুত ছুটতে থাকে। পোকাগুলির বাইরের দিকটা গুবরে পোকার মতই শক্ত আবরণে ঢাকা। এই রকম কোন কীট থেকেই হয়ত প্রথম ট্যাঙ্কের কল্পনা করা হ'য়েছিল।

কোনও শত্রুপক্ষকে ট্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ করতে হ'লে সাধারণতঃ একদল ট্যাঙ্ক সম্মুখ থেকে কামান-গোলা ছুঁড়তে থাকে আর তাদের পিছনে থাকে আর একদল ট্যাঙ্ক যারা ধোঁয়া

বা বাতাসের গতি বুঝে বিষ-বাষ্প ছেড়ে পিছনের শত্রু-সৈন্যদের আর এগিয়ে আসতে দেয়না।

ট্যাঙ্কের আবরণ একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ-বিশেষ! এইজন্য ট্যাঙ্ক-যুদ্ধে একাধারে শত্রুহত্যা ও আত্মরক্ষা দুইই হয়।

ট্যাঙ্ককে প্রতিরোধ করবার জন্য আবার প্রতিপক্ষ তার আসবার পথে লোহার শক্ত বেড়া বা তারকাঁটার জাল দিয়ে ঘিরে রাখে। পিরামিডের আকারে কন্‌ক্রিট দিয়ে তৈরী ছোট ছোট স্তম্ভও শক্ত করে পুতে রাখা হয় পথে! আবার হাতী ধরবার ফন্দীর মত ট্যাঙ্কের পথে অনেক সময় বড় গর্ত্ত ক'রে তার উপর ঘাস-জঙ্গল চাপা দিয়ে রাখা হয়। বুঝতে না পেরে একবার ট্যাঙ্ক এসে তার মধ্যে পড়ে গেলেই, ব্যাস্!—কে সেই পনের শ' মণ লোহার দুর্গ টেনে তুলবে?

ইচ্ছা

শ্রীসুচিত্রা মুখোপাধ্যায়

পাখী যদি হতাম আমি এ সব ছেড়ে ছুড়ে—
দিনরাত্তির যখন তখন বেরিয়ে যেতাম উড়ে।
মুক্তপাখা মেলে দিয়ে নীল আকাশের কোলে—
ঘুরে ঘুরে যেতাম উড়ে—ইচ্ছে আমার হ'লে।
কিম্বা যদি হতাম তেজী, মস্ত বড় ঘোড়া—
টগ্‌বগিয়ে চলে যেতাম, মিলতোনা মোর জোড়া!
কিম্বা ধরো হতাম যদিই ছোট্ট কোনো পোকা—
বিনা পয়সায় 'ট্রাভ্‌ল' করতাম—বানিয়ে সবায় বোকা!
এ সব কিছু নাই বা হ'ল—হতাম যদি বিছেই—
কামড়ে সবায় একটুখানি—ব্যস্ত করতাম মিছেই!
হতাম যদি কারুর সাধের পোষা বেড়ালছানা—
দুধের বাটী, মাছের কাঁটা—জুটতো খাদ্য নানা।
বাঘের ছানা হয়ে যদি বনেই নিতাম বাসা—
হুম্‌কীতে সব চমকে দিতাম—জমতো ঠাট্টা খাসা।
কত কিযে ইচ্ছে করে—হতাম যদি তাই—
চারিদিকে দেখতাম, মোর দুঃখ কিছুই নাই॥

[গল্পের পূর্ব্বাংশ]

শিশির ও তার বোন লিলি এই প্রথম বর্ম্মা মুলুকে মৌলমীনে মামার বাড়ী এসেছে। এসে অবধি মামার এ বাড়ীটা তাদের কাছে বেশ রহস্যময় ঠেকছে। শিশির-লিলির মামা ব্রজেশ্বরবাবু বছর দশেক আগে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে একরকম ভূপর্য্যটনেই বার হন, নানা দেশ বন জঙ্গল ভ্রমণ করে নানান্ এডভেঞ্চারের মধ্যে কাটিয়ে সবশেষে তিনি বর্ম্মা মুলুকে উপস্থিত হন। তাঁর সে সমস্ত এডভেঞ্চার কাহিনী ব্রজেশ্বরবাবু সালঙ্কারে শিশির ও লিলিকে শোনান। ব্রজেশ্বরবাবু তাদের বলেন, শেষ পর্য্যন্ত বর্ম্মায় পৌছে তিনি একটি ব্রহ্মদেশীয় লোকের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করেন। লোকটি ভাল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে টিঁকল না, কালাজ্বরে মারা পড়ল। মরবার সময় সে-লোকটি তাঁকে মৌলমীনের তার একটি বাড়ী দিয়ে গেল, আর বললে বাড়ীতে একটি চোর কুঠুরী আছে। কিন্তু সে আরো বলে গেল, ব্রজেশ্বরবাবু যেন কখনও সে বাড়ীতে না থাকেন। ব্রজেশ্বরবাবু 'কেন' জিগ্যেস করাতে সে বললে, সে বাড়ী ভারী ভয়ানক। তারপর ব্রজেশ্বরবাবু সেই চোরকুঠুরির সন্ধান, তার কোন নক্সা টক্সা আছে কিনা জিগ্যেস করেন, কিন্তু সে মরণাপন্ন বুড়ো লোকটির হাঁ করা মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বাহির হ'ল না।—এই বাড়ীটার যে একটা কিছু রহস্য আছে শিশির মামার কথা শুনতে শুনতেই বেশ ঠাওর করেছিল। এখন মামার এই শেষ কথা শুনে শিশির মামার দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে বল্লে—বুড়ো না বল্লেও, আমি বলে দিতে পারি। বলে' দেওয়া কেন, নক্সাটা আমি বার করেই দিচ্ছি না হয়। এসো আমার সঙ্গে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— তিন —

কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

শিশির যায় আগে আগে, সাথে সাথে লিলি। পেছনে পেছনে ব্রজেশ্বর।

ব্রজেশ্বরের মুখে অবিশ্বাসের হাসি!

আশ্চর্য্য নয়! দীর্ঘ বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে বড় বড় বিশ্বাসই টলে

যায়। বারো বছর ধরে চেষ্টা-চরিত্র করে'; বাড়াবাড়ি করেও, এমন কি, ভগবানেরও যদি দেখা না মেলে—তাঁর টিকিটিরও সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে বড় বড়, বিরাট বিরাট, ভক্তও নাস্তিক্যবাদী হয়ে পড়ে। অগাধ ধনরত্ন তো তুচ্ছ, ব্রজেশ্বর তো কি ছার্!

শিশির জিগ্যেস্ করে: "নক্সাটা কোথায় রয়েছে, টের পেয়েছিস্ লিলি?"

"না তো!" লিলি ঘাড় নাড়ে।

"এত বই পড়া সব তোর ব্যর্থ হয়েছে দেখছি! বাজেই য়্যাদ্দিন য়্যাড্ভেঞ্চারের বই তোকে পড়ালুম। কিচ্ছু লেখা-পড়া হয়নি তোর। এখনো মানুষ হতে পারিস নি।" শিশির মুরুব্বির মতো মুখখানা বানায়: "মেয়ে মানুষই রয়ে গেছিস্। আস্ত একটা মেয়ে মানুষ!"

কথাগুলো ঠিক মোরব্বার মতো নয়, লিলি মুখ কাচুমাচু করে' থাকে। প্রতিবাদের একটা চেষ্টা করে: "বারে, আমি কি করে' জান্ব! আমি কি হাত গুন্তে জানি?"

"আমার যদি একটা 'টাইগার' থাক্ত, সেও যে বলে' দিতে পার্ত রে!" শিশিরের অসন্তোষ সীমান্ত ছাড়িয়ে যায়।

"আমার থাক্লে সেও বল্তে পার্ত।" লিলিরও এবার একটু ধোঁয়া বেরয়: "টাইগাররাই তো পারে। ওদেরই তো এই কাজ! ওরাই পার্বে তো। ও তো মানুষের কর্ম্ম নয়। কিন্তু—কিন্তু—" তার আশঙ্কাটা ব্যক্ত কর্বে কিনা, লিলি একটু ইতস্ততঃ করে: "কিন্তু টাইগার আর আমি পাচ্ছি কোথায়? তুমি তো আর টাইগার হতে পারবে না। অন্ততঃ এ জন্মে তো আর নিজেকে বাগাতে পারছ না!"

"এ জন্মেই পারব। পারব না, কে বলেছে—কে?" শিশির গরম হয়ে ওঠে।

"অনেকেই বলে! তা বলে' আর পারতে হয় না!" লিলির বেশ ধোঁয়া বেরয়:

"ঘেউ ঘেউ করা সহজ, টাইগার হওয়া অত সহজ না!"

"এক্ষুনি পাড়ব! এক্ষুনি আমি পেড়ে দেব।" শিশিরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

"হ্যাঁ, ডিম আর কি! পেড়ে দিলেই হোলো।"

"চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" শিশির সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে: "দেখ্তে না দেখ্তেই দেখ্তে পাবি।"

এই বলে, শিশির, সিঁড়ির সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেইখানে, যেখানে সে হোঁচট্ খেয়ে পড়েছিল একটু আগেই।

শিশির জায়গাটার আগাপাশতলা পা চালিয়ে, টিপে টিপে দেখে, কিছুনা! তারপর, সহসা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, একজন উঁচুদরের নাচিয়ের মত দাপাদাপি লাগিয়ে ছায়! দেখ্তে না দেখ্তেই আবার ধরণী দ্বিধান্বিত হয়েছে, এবং সেই দ্বিধার অবকাশে,, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে, শিশিরের একখানা শ্রীচরণ গলে চলে গেছে।

"এই যে! এই যে পেয়েছি! পেয়ে গেছি! কেল্লা মেরে দিয়েছি!" শিশির চীৎকার করে' ওঠে।

ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসে, আর সন্দেহে, বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে এতক্ষণ ওতোপ্রোত হচ্ছিলেন, এবার তিনিও আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লেন।

"ভাঙ্‌লি! ভাঙ্‌লি তো সিঁড়িটা! আমি তখনি জানি! এই তোমার নক্সা বের করা?"

কিন্তু বল্‌তে না বল্‌তে, শিশির, পায়ের সঙ্গে একখানা হাতও গলিয়ে দিয়েছে, এবং হাৎড়ে-মাৎড়ে, তার অন্তঃস্থল থেকে, রুলের মতো করে' পাকানো কাগজের কী একটা টেনেও বার করেছে।

কাগজটার পাকানো দূর করে' ভাঁজ খুলে ফেল্‌তেই—

বেরিয়ে পড়্‌ল পুরণো এক পার্চ্চমেণ্ট্ আর তার পিঠে কী সব মক্স করা!

"এই তো সেই নক্সা!" শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল: "সেই নক্সাই তো!"

শিশিরের মামা সিঁড়ির মাথায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কী যেন একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, এইবার তিনি এক লাফে, একটি মাত্র উল্লম্ফনে সব কটা সিঁড়ি এক নিমেষে টপ্‌কে এসে শিশিরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

"দে—দে! আমার নক্সা দে!"

"দে—দে! আমার নক্সা দে!" বল্‌তে না বল্‌তে পার্চ্চমেণ্টটা তিনি শিশিরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

"বাঃ, আমি আবিষ্কার কর্‌লাম, আর তোমার নক্সা কি রকম?" শিশির ঈষৎ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছে।

"তোর নক্সা! ভারী ইয়ার আমার!" এই বলে' ব্রজেশ্বরবাবু ঠাস্ করে' এক চড় বসিয়ে ছান শিশিরের গালে: "বারো বছর ধরে' আমি-ব্যাটা হাত্‌ড়ে মর্‌ছি, আর ওঁর কিনা নক্সা হোলো! আবদার আর কি!"

এই বলে' তিনি আর অযথা বাক্যব্যয় না করে' অতিরিক্ত চড়-চাপড়ের প্রলোভন পর্য্যন্ত সম্বরণ করে' দৌড়তে দৌড়তে নিজের ঘরে গিয়ে, সশব্দে খিল্ এঁটে দিয়ে, নক্সার ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছেন।

"খুব লেগেছে নাকি দাদা?" লিলির আবার শিশিরের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়।

শিশির কিছু না বলে' আহত গালে হাত বুলোয়।

"এ কিরকম মামা আমাদের?" লিলি অবাক্ হয়। "বাবাঃ, কী বদ্‌রাগী!"

"মামারা এই রকমই।" শিশিরের আপন মনে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস।

"আচ্ছা, মাতুল হঠাৎ বাতুল হোলো কেন দাদা?"

লিলি দাদার গালে হাত বুলাতে পারে না, ইচ্ছা থাক্‌লেও পেরে ওঠে না, একটু আগেই ওদের মধ্যে যে বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেছে সেই কথা মনে করেই ওর হাত ওঠে না। ভয় করে, হয়ত শিশিরের হাত উঠে যাবে। সে হাত বাড়ালেই সেই চড় তার নিজের গালে স্থানান্তরিত হবে—দাদার বেহাত হয়ে আস্‌বে। তবু, কথার সাহায্যে, শিশিরের অনুকরণে মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলে মাতুলের সঙ্গে বাতুল জমিয়ে, অনুপ্রাস জমাট করে' যতটা সম্ভব, ক্ষতস্থানে জাম্‌বাক্ ঘষ্‌বার চেষ্টা করে।

"অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্!" শিশির উদাসীনের মত জবাব ছায়। তার মুখপত্রে দার্শনিকতার বিজ্ঞাপন।

"এ রকম হবে আমি ভাবতেও পারিনি।" লিলির কণ্ঠে সান্ত্বনার সুর।

"আমি ভাব্‌তে পেরেছিলাম।" শিশিরের গলায় নির্লিপ্তির স্বর। "এই রকমটাই হয়। এই রকমই হয়ে থাকে। অনেক দিন আগেই আমি এ সব ভেবে দেখেছি।"

শিশিরের ললাটে ভূয়োদর্শনের প্রচ্ছদপট!

"থাক্ গে। যেতে দে। মামা তো খিল্ এঁটেছে। চোরকুঠ্‌রীর হদিস্ না নিয়ে আর নড়্‌ছেন। চল্ এই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। মৌলমীন সহরটা বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখে নিই!"

বেড়াতে বেড়াতে দুজনে সমুদ্রের ধারে চলে যায়। শিশির ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে: "মামা কি রকম চালাক দেখলি? দেখলি তো লিলি?"

মামার মূঢ়তা দেখেছে, রূঢ়তাও দেখা গেছে, মামা যে 'লাকী' সে বিষয়েও ভুল নেই, অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে, বাড়ীর নষ্ট-কোষ্ঠি পুনরুদ্ধারেই সেটা প্রত্যক্ষ হয়েছে, কিন্তু মামার চালাকি যে কোনখানে লিলি সেটা সম্‌ঝে উঠতে পারে না।

"আমাদের শিলং থেকে, অতো লং ডিস্‌ট্যান্স থেকে ধরে বেঁধে ডেকে আনানোর কী মানে, বুঝতে পারলি নে?"

"না তো!"

"এই জন্যেই! চালাকি করে' নক্সাটা উদ্ধার করে' নেবার জন্যেই! আমাকে ছাড়া আর কারু দিয়ে হোতো না কি না!" শিশির দুঃখের সহিত এবং একটু গর্ব্বের সঙ্গেই বিবৃতি ছায়।

এ ছাড়া তাদের আনানোর আর কী কারণ থাকতে পারে, শিশির ধারণা করতে পারে

না। কোথায় শিলং আর কোথায় মৌলমীন—কতখানি ফারাক্! এবং যে মামা বারো বছর আগে তাদের মায়া কাটিয়ে চলে এসেছেন, যে সময়ে তারা দু' তিন বছরের, সেই সময়েই যা কোলে পিঠে করে' মানুষ করে'—বা মানুষ করবার চেষ্টা করে' অবশেষে তাদের পরিত্যাগ করে' (দুশ্চেষ্টায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েই কিনা বলা যায় না) চলে এসেছেন, এমনও হতে পারে যে তারাই মামার বৈরাগ্যের কারণ;—মামার আকস্মিক বানপ্রস্থের, পরদেশ-আসক্তির, দেশান্তর-বিলাসিতার মূলে খুব সম্ভব তারাই,—মামা হয়তো ভেবেছিলেন, এই শিশুদের, যারা কখন নায়েগ্রা আর কখন গন্ধমাদন তার কিছুই স্থিরতা নেই—কখন প্রপাত আর কখন উৎপাৎ বলা কঠিন, কখন যে খাদ্য (চুমুর দিক দিয়ে) আর কখন অখাদ্য কে বলবে, তখন যাবতীয় লাভ ক্ষতি খতিয়ে, তিনি ভেবে দেখলেন, এদের কোলে পিঠে করার চেয়ে সমস্ত ভূভার ধারণ করাও সহজ, (এবং নিরাপদ, সে কথা আর বলতে!)—এর চেয়ে, এই পরস্মৈপদী নন্দন-কানন বহনের চেয়ে, কস্তুরী মৃগসম, নিজের গন্ধে—উন্মাদ হয়ে, বনে বনে, অরণ্যে অরণ্যে, সারা ধরিত্রীময় ছুটোছুটি করে' বেড়ানোও ঢের ভালো—ঢের ঢের ভালো! সেই বিবাগী মামার হঠাৎ যে আবার এত অনুরাগ উথলে উঠবে, এমন মন-কেমন করতে লাগবে যে, তাদের দেখবার লালসায়, মার কাছে তার ক'রে সামারভ্যাকেসনেই আমদানি করার জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন, এ রকম সম্ভাবনা ভাবনাই করা যায় না। শিশির, ব্রজেশ্বরবাবুর মৎলবটা, মনোগত অভিপ্রায়টা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চুল চিরে, লিলির কাছে পরিষ্কার করে। সমুদয় রহস্য, সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মতো, ফাঁক হয়ে যায় বেবাক্!

'তাই তো! তাই তো বটে!" লিলিও আর ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না।

"আমি অবিশ্যি প্রথমে অন্য কথা ভেবেহিলাম—" বলতে বলতে চেপে যায় শিশির।

"কি? কি কথা?"

"না, বলব না। বল্‌লে তুই ভয় খাবি।" শিশির বলে।

"না, বলোনা? ভয় কিসের?"

"আমি ভেবেছিলাম—মামার গল্প শুনতে শুনতেই মনে হয়েছিল আমার। মামা সেই তখন বল্লনা যে, সেই নরখাদকটার তার এখনো তাঁর্ মুখে লেগে রয়েছে।—বল্‌ল না?"

"বল্ল তো! তার কি?"

"সেই ভুক্তভোগী নরখাদকটা মামার পেটে গিয়ে যে এখন বসবাস করছে!"

"করছেই তো! কি হয়েছে তার?"

"সে আর এখনো করছে কি? কবে হজম হয়ে গেছে! তাই মামা হয়তো তার স্থান পূরণ করবার জন্যে, তার অভাব মোচনের অভিলাষেই, হয়তো—হয়তো—"

"হয়তো আমাদের—? য়্যাঁ?" লিলির দু চোখ, ভয়ে যেন ভুরুর পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায়।

"হ্যাঁ, তাই! মামা বল্ল কিনা যে লোকটার তার্ এখনো তাঁর মুখে লেগে রয়েছে। বলে' সুরুৎ করে' মুখের ঝোল টেনে নিল, আর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল—দেখ্‌লি না?"

"আর কেমন একটা অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকালো!" লিলি কম্পিতকণ্ঠে বলে: "দেখেছি বই কি!"

"তবু তো সে লোকটা খাসীই ছিল! বুড়ো একটা খাসী ছাড়া আর কি? আমাদের মতো কচি পাঁঠা পেলে—?"

বাকীটা, বাকী অনির্ব্বচনীয়ত্ব, শিশির অব্যক্তই রেখে দ্যায়। "তাহলে চলো, পালাই এখান থেকে। পরের ট্রেনেই পালিয়ে যাই। সোজা একেবারে রেঙ্গুনে—সেখান থেকে ফিরতি জাহাজে লম্বা এক পাড়ি!" লিলি লীলায়িত করে।

"উঁহু, যখন এসেছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখেই যাবো? গুপ্তধনের কিনারা না করেই? পাগল! তাছাড়া, খেলেই অমনি হোলো কি না! খাওয়া পথেই পড়ে আছে আর কি? হুঁঃ! আমরা হুসিয়ার থাকব না! তাছাড়া, আরেকটা কথা—"

"কি? কি কথা?" আরো কি আশ্চর্য্য কথা শিশিরের আশ্চর্যাতর মাথা থেকে বেরিয়ে আসে, লিলি সেজন্য উৎকর্ণ হয়।

"মামা বল্ল না, বল্ল না যে, ভয়ানক ভালোবাসা না পড়লে খাবার কথা মনেই জাগে না। যেমন সেই বর্ম্মীটার ওপর মামার তেমন ভালবাসা হয়নি বলে—কেবল মাত্র একটু মায়া হয়েছিল বলে'—তাকে মুখে তোলবার কথা মামার মনেই হয়নি।"

"তুমি বল্‌ছ যে মামা আমাদের তত ভালবাসে না। তত ভয়ানক নয়? তাই আমাদের তেমন ভয় নেই?"

"ভালো যা বাসে তা তো এক চড়েই বুঝেছিস্?" এই বলে' শিশির আবার নিজের গালে আরেকবার হাত বুলিয়ে নেয়। "উঃ, যা লেগেছিল!"

এতক্ষণে লিলি তবু কিছু ভরসা পায়। অমন কঠোর-হৃদয় মামার ভালোবাসার পাত্র হওয়া সহজ নয়, সে কথা সত্যি। এবং ভালোই যদি না বাসেন, তাহলে, কেন আর মামা, অত কষ্ট করে' তাঁর হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গায়, তাঁর উদার উদরের পরিধির মধ্যে অন্যান্য খাদ্যাখাদ্যদের হটিয়ে, তাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে উদ্ব্যস্ত হবেন?

"তাই ভালো! যদি কেবল চড়ের ওপর দিয়েই যায়, সেও মঙ্গল!" লিলি বলে: "চর্চ্চড়ি না হতে হলেই হোলো!"

ক্রমশঃ

আশুতোষের
জন্মদিনে

কবিশেখর কালিদাস রায়

ডম্বরু বাজে মেঘাড়ম্বরে গম্ভীর অম্বরে,
দিগম্বরের জটা কদম্বে করুণার ধারা ঝরে।
চাহি তাঁর পানে অঞ্জলি পাতি'
তাপসী ধরণী জাগে সারা রাতি,
হেন আষাঢ়ের পুণ্য বাসরে তুমি এলে ধরা 'পরে ॥

বর্ষচক্র-ঘনাবর্ত্তনে ডুবে গেল কত দিন,
বুদ্ধুদ সম, কত রবি জেগে কোথা হয়ে গেল লীন।
যে দিন প্রথম মেলিলে নয়ান
ধুতুরা হয়ে তা' আজো অম্লান ·
কালের দেবতা নটরাজ তারে শিরে ধরে সমাদরে।

বর্ষে বর্ষে কালের তীর্থ সেই দিনটিরে স্মরি,
সেই তীর্থের তুমি দেবাত্মা তোমা তাই পূজা করি।
ফিরিয়া এসেছে আবার আষাঢ়
কবি ছটা ঘটা জটা বিস্তার,
বজ্রগর্ভ অম্বুদ হেরি তোমা শুধু মনে পড়ে ॥

(আশুতোষ-স্মৃতি-বার্ষিকী সভায় পঠিত)

পিঙ্গল ধরিত্রী

মিহির রায়

চৈত্র একেবারে শেষ সীমানায়, তখনকারই একটা দুপুর।

দৃষ্টি অপ্রতিহত ভাবে যতদূর যায় ঝকঝকে নীল আকাশে দেখা যায় মেঘের আনাগোনা। মেঘের আবির্ভাবে সূর্যরশ্মিতে তেজের প্রখরতা নেই। ঝলমলে উজ্জ্বল একটি রোমাঞ্চকর দুপুর।

এমন একটা সুন্দর দুপুরকে শন্তু বৃথায় যেতে দিতে পারে না, ঘরের থেকে পা টিপে টিপে শন্তু বের হলো। কাকা তো নিশ্চয়ই এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন সমরেশবাবুদের বাড়ীতে তাসের আড্ডায়। তবুও প্রত্যেকটা ঘরেই একবার করে শন্তু উঁকি দিয়ে দেখল।

পুবের ঘরে মা পাটির ওপর শুয়ে ঘুমে অচেতন। উঠোনের এক পাশটায় আমগাছটার ছায়ায় ছোট বোনেরা পুতুল খেলায় ব্যস্ত, পাড়ার এক দংগল ছেলে আর মেয়ে জুটিয়ে। ইসারায় শন্তু ডাক দিল তার বোন মিন্তুকে।

—এই কাকা বেরিয়ে গেছে নাকি রে? দেখেছিস? শন্তু জিজ্ঞাসা করল।

—ওঃ, কখন।—নিচের ঠোঁটটা উল্টিয়ে মিন্তু বলল—সেই তোমাকে ধরে কান মলে দিল? তার পরেই—

—যা, যাঃ—। মিন্তুর বেণীটায় হেঁচকা গোটা কয়েক টানের উপর দিয়ে শন্তু কাকার অনুপস্থিতির সুখটা উপভোগ করে নিল। বললে—বেশি তোর ইয়ে হয়েছে, না?

এর পরে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট করবার কোন কারণই শন্তুর থাকতে পারে না। স্যাণ্ডেল জোড়াটার মধ্যে পা দুটো ঢুকিয়ে শন্তু অশোকের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। আজকে ওরা সবাই মিলে যে অভিযান করবে, তার আবিষ্কারের কৃতিত্ব ব্যক্তিগত ভাবে শন্তুরই একলার প্রাপ্য। অশোকের বাসায় এসে শন্তু দেখল সকলেই প্রস্তুত। ওই যা শুধু অনুপস্থিত ছিল এতক্ষণ। এ্যাড্‌ভেঞ্চারের লোভে সবারই মন উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ঝোঁকটা শন্তুরই সব চাইতে বেশী। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওরা সব এক দংগলে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রামের শেষে পটল বিলের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে শ্মশানের দিকে।

সে রাস্তা শ্মশান পেরিয়েও অনেক দূরে গিয়ে, ধূলি ধূসরিত আকাশে মিশেছে। ছড়িয়ে পড়া দূর দূরান্তরের গ্রামের পর গ্রামের লোকে সে রাস্তাটা একযোগ করে রেখেছে।

শ্মশানের পর বেশ খানিকটা দূরে আরো যাবার পরে,—তারপর সেই রাস্তা দুই ফাঁক হয়ে চিরে গেছে। প্রধান অংশটা ধূসর আকাশের দিকে গেছে এঁকে বেঁকে এবং ডানহাতি পশ্চিম দিকে যে বনের শ্রেণী দুই গ্রামের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ হয়ে আরো পশ্চিমে ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে, অবশেষে দৃষ্টিকে প্রতিহত করেছে, যেটা শাখা রাস্তা সেটা যেয়ে বিলুপ্ত হয়েছে সেই বনে। শন্তু এবং আলোরা মিলে সেই বনে পৌঁছবার জন্যই চলল।

বনের প্রারম্ভে যত সমস্ত গাছ; পাকুড়ের গাছের সংখ্যাই বেশী। যেন বহুকাল আগে কেউ এই সব গাছের রাখি-বন্ধন করেছিল, তারপরে মহাকালের হাতে সেই বাগানের রূপান্তরিত বর্ত্তমান রূপ, এই বনের সৃষ্টি করেছে।...কিন্তু এ সবই হচ্চে কল্পনা।

কাঁচা আমের তখন সময়! সেই সংগে গ্রীষ্মের আরো অনেক ফল এগাছে ওগাছে শোভিত। সবই অবশ্য তখন পরিপুষ্টতার পেছনে। কিন্তু বয়সেও যারা এই পরিপুষ্টতার অনেক দূরে, তাদের কাছে কাঁচা আমেরই স্বাদ বেশী মধুর! শন্তুরা যখন গিয়ে বনের সীমানায় পৌঁছল, তখনও দুপুরের ঝাঁঝ এতটুকুও ম্লান হয় নি।

গাছগুলোর এ ডালে ও ডালে ওদের সেই ছোট খাট দলের বেশীর ভাগই ছেলে উঠে পড়ল। নিচে দুই একজন মাত্র থাকল, গাছের নিচেকার আমগুলোকে আত্মগোপন না করতে দেবার জন্য! লবন, লংকার গুঁড়ো এবং ছোট একটা করে ছুরি প্রত্যেকেরই পকেটে বিদ্যমান।

আম পাড়বার মশগুলতায় কখন যে আকাশে পশ্চিমের এক কোণে মেঘের একটু খানি সারি দেখা দিয়েছিল, সেটা ওরা একেবারেই খেয়াল করে নি। সেই সামান্য মেঘের সারই যখন দেখতে দেখতে সূর্যের অর্দ্ধেকটাকে গ্রাস করল, সবার প্রথম তখন আকাশের অবস্থা পুলকই লক্ষ্য করল—শন্তু শন্তু—এই আলো—পুলক বলতে গেলে প্রায় আর্ত্তনাদই করে উঠল—শিগ্‌গির নেমে আয় তোরা, আকাশে কি হয়েছে দেখেছিস?

প্রত্যেকেই তখন সে আকাশকে লক্ষ্য করেছে! যে যত তাড়াতাড়ি পারে গাছ থেকে নেমে পড়বার জন্য চঞ্চল, কিন্তু সেটুকু সময়ই যথেষ্ট। সেই অতটুকু মেঘের শ্রেণী ক্রমে ক্রমে গভীর কালোয় পরিণত হয়ে সারা আকাশটাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাস করে ফেলল। সেকি মেঘ! কোথায় গেল রবিচ্ছটাতে উজ্জ্বল সে নীল আকাশ। তার পরিবর্ত্তে, আকাশের এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্রের গভীরতার মতো শুধু ধূসর মেঘের পুঞ্জীভূত শ্রেণী;—শ্রেণীর পর শ্রেণী সাজানো। সারা আকাশটা অন্ধকারে আবছায়া। প্রতি-

ফলিত হয়ে সে ছায়া মাটির ওপরকার পৃথিবীর প্রান্তরকে পর্যন্ত নিকষ অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে।

প্রথমে ঠাণ্ডা সামান্য একটু বাতাস শরীরকে রোমাঞ্চ করে দেবার পর, ঝড় আরম্ভ হোল। সে ঝড়ের উপমা সত্যিই নেই! পূর্ব বংগের পদ্মাপারের কাল-বৈশাখীর সংগে যারা পরিচিত নন, তারা কল্পনাতেও, কি যে সে ঝড়ের রূপ সেটাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না! পারা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মাত্র কয়েকটা মিনিট প্রবল ঝড়ো-বাতাসের পর বৃষ্টিও সে-ঝড়ের সংগে নেমে আসল। তীক্ষ্ণতায় অসাধারণ শক্তি সে বৃষ্টির প্রত্যেকটি ফোঁটায়। ঝড়ের মধ্যে তবু যা হোক দূরের জিনিষ আবছায়া ভাবে কিছু কিছু প্রতীয়মান হচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টির ধারায় চোখের দৃষ্টিকে প্রায় অন্ধই যেন করে ফেলল। সে বৃষ্টির তুলনা বুঝি নেই।

সন্ধ্যা যখন ঘোর করে পৃথিবীর ওপর নেমে প্রায় আসবে, তার আগে কাল-বৈশাখীর বর্ষণ শান্ত হোল। সুরু হল শুধু শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা বাতাস। আর বৃষ্টি ভেজা মাটির সোঁদো গন্ধ!

আলোরা বাড়িতে ফেরবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। একে একে সবাই ওরা জড়ো হোল এক জায়গাতে এসে। কিন্তু শন্তুরা কেন যে কিছুতেই আসছে না! কোথায় গেল শন্তু? সেই যে শন্তু বৃষ্টির মধ্যেই কাছ ছাড়া হয়েছে, তারপর বৃষ্টিটা থামবার পরেও তো কই আর আসছে না!

অস্থির হয়ে উঠল আলো। সত্যি শন্তুটা যেন কি। সন্ধ্যা এদিক প্রায় হয়ে এল আর ওর বাড়ীতে ফেরবার জন্য যদি ব্যস্ততা থেকে থাকে একটুকুও। বিরক্ত হয়ে শেষ মেশ আলো চেঁচাল—শন্তু—শন্তু—উ—উ।

কিন্তু চেঁচানোর সীমানার মধ্যে শন্তুকে আবিষ্কার করতে ওরা পারল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই দুই একজনে মিলে ওরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল শন্তুর খোঁজে।

শেষ পর্য্যন্ত পুলকই কিন্তু শন্তুকে প্রথমে দেখতে পেল. কিন্তু শন্তুর অস্বাভাবিক দাঁড়াবার ভংগী দেখে অজ্ঞাত একটা আশংকায় পুলকের মন ভরে উঠল। বনের একটু ভেতরের দিকে একটা পরিষ্কার মতন জায়গায় শন্তু সম্পূর্ণ নিষ্কম্পভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন একটা মোহাচ্ছন্নের ভাব শন্তুর সমস্ত শরীরে যেন ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে! চোখের দৃষ্টি পলকহীন স্থির, সে দৃষ্টি একটা যেন কিছুকে লক্ষ্য করে ভাবলেশহীন ভাবে নিবদ্ধ।

ভয় পেয়ে পুলক আলোকদের নিঃসাড়ে ডেকে আন্‌লো। ফিরে আসা পর্যন্তও শন্তুর সেই একই অবস্থা। অন্ধকার তখন বেশ আবছায়া করে বসেছে।

শন্তুর যে কি হয়েছে দেখবার জন্য ওরা এগিয়ে গেল শন্তুর কাছাকাছির মধ্যে। কিন্তু

শন্তুর দৃষ্টির সংগে ওদের দৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবে মিলে যে জিনিষটার ওপর গিয়ে পড়ল, সেটাকে দেখবার সংগে সংগেই একেবারে ওদের সকলেই প্রায় এক সংগেই থমকিয়ে দাঁড়াল।

এ রকম অদ্ভুত সাপের অস্তিত্ব পর্যন্ত ওদের মধ্যে কেউই কোথাও শোনেনি, নিজের চক্ষে দেখা তো কল্পনা! সাপটা লম্বায় আড়াই হাত বোধ হয় হবে। হয়তো কিছুটা আরো বেশীই। তিন রকম রং দিয়ে তিন ভাগে সাপটার শরীর ভাগ করা। একেক ভাগে একেক রকম রং।

মাথার থেকে রংটা ঝকঝকে কালো। মাঝের অংশটাতে অত্যন্ত ফিকে হলুদ রং। আর লেজের দিকটার রং পিংগল। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে সাপটার সারা শরীর যেন চকমক করছে একেবারে।

সাপটা মাটি থেকে প্রায় এক হাত খাড়া হয়েছিল। মাথাটা পেছন দিকে সামান্য একটুখানি হেলিয়ে সেটা শন্তুর দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে। উজ্জ্বল লাল দুটো চোখ থেকে রশ্মি একদম ছিটকে পড়ছিল যেন। শন্তুর অবস্থা একেবারে ভাবলেশহীন।

মুহূর্তের মধ্যে নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তিকে আলো প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে চেতনার মধ্যে ফিরিয়ে আনল। পেছন দিক থেকে শন্তুর কাঁধ দুটোতে হাতের জোরে ঝাঁকুনি দিল, ও—শন্তু, শন্তু—এই শন্তু!

যেন গভীর এক ঘুমের আচ্ছন্নতা থেকে শন্তু মাত্র এই জেগে উঠল। ধড়ফড় করে ঘুরে শন্তু চাইলে আলোর দিকে। আর সাপটার দৃষ্টি থেকে শন্তুর দৃষ্টি বিচ্ছিন্ন হবার সংগে সংগেই ওরা দেখল, লেজটা মুখের সংগে একরকম লাগিয়েই এক ঝটকায় সাপটা যেন ছিটকে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

শন্তুর বিশৃঙ্খলতা কিন্তু তখনও একেবারে যায়নি। একরকম প্রায় হাত ধরে শন্তুকে নিয়ে সবাই মিলে যখন গ্রামে ফিরে আসল, তখন চারদিকের অন্ধকারগুলো ঘন হয়ে জমাট বেঁধে এসেছে।

কাকা প্রস্তুত হয়ে ছিলেন দুপুরের ব্যাপারে শন্তুর সংগে একটা বোঝাপড়া করে নেবার জন্য। কিন্তু শন্তুর এখনকার ব্যাপার দেখে তিনি দু'পা পিছিয়েই এলেন। বাড়ীতে একেরারে আর্তনাদই পড়ে গেল। মিন্তু ওর লাঞ্ছিত হবার কাহিনী কাকাকে বলে দেবার জন্য দুঃখিত। ইতিমধ্যে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখও মুচছে মিন্তু, দুই তিন বার এবং মা ভগবতীকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞাও করেছে সে, এর পরে যদি ছোড়দা তার চুল হাজারবারও টানে, কাকাকে মিন্তু বলবে না, কিছুতেই বলবে না।

সারাদিন নিরম্বু একাদশীর পরে রাত্রির খাওয়া ঠাকুমা ভুলে গিয়ে শন্তুকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। আলোর মুখে সে সাপটার অদ্ভুত রংগিন গায়ের রংয়ের বর্ণনা শুনে

তিনি শিউরে উঠলেন একেবারে। শন্তুকে আরো তিনি জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁরই আদেশে কৃত্তিমণি ওঝাকে আনবার জন্য লোক তক্ষুনিই ছুটল। ওঝা হিসাবে আসে পাশের গ্রামের মধ্যে কৃত্তিমনি বিখ্যাত।

ঠাকুমা এর পর সাপটার যা রূপ বর্ণনা করলেন সেটা সত্যিই ভয়ংকর। সত্যিই যেন শন্তু আজকে মূর্ত্তিমান কালান্তকেরই মুখোমুখি হয়েছিল! এমন মারাত্মক বিষাক্ত সাপ, ভারতবর্ষের মতো অবাধে সাপেদের বিচরণ ভূমির মধ্যেও বিরল! ঠাকুমা বলে তাঁর জীবনে, এই ঘটনাটাকে শুদ্ধ দুই বারের মধ্যে একবার এ জাতীয় সাপকে দেখেছিলেন নিজের চক্ষে এবং আজকে এটা শুনলেন!

অত্যন্ত বদমেজাজি রাগী এবং বিষাক্ত সাপ বলে কালো কেউটে বিখ্যাত। কিন্তু এই সাপটাকে দেখলে সেই কেউটেও ভয় পায়। বিষের তীব্রতার বর্ণনা দিয়ে ঠাকুমা বললেন যে, রেগে গিয়ে যেখান দিয়ে এই সাপটা চলে যায়, সে জায়গার ঘাসগুলো কুঁকড়ে গিয়ে ধূসর হ: দে হয়ে যায়। বিষের প্রখরতাতে সাপটার এমনিই তেজ।

সেই রাত্রিতেই শন্তুর গভীর হয়ে জ্বর এল। একেবারে অচেতন অবস্থা ওর জ্বরের তীব্রতাতে। সে জ্বর অবশ্য ইনজেকসনের প্রভাবে ও মিন্তুর সেবায় দুই দিনের দিনই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবার পর থেকেও শন্তুর যেন কেমন আরো অসংলগ্নতা প্রকাশ পেতে লাগল ওর চাল চলনে।

এমনিতে চমৎকার ও ভাল থাকে। অবিকল সাধারণ ছেলে যেমন—কিন্তু থেকে থেকে শন্তু কেমন যেন চমকে ওঠে। ওর চোখের মধ্যে ফিরে আসে বুঝি সাপের সংগে দৃষ্টি-বদ্ধ সেই বিহ্বলতা!

গম্বুজ সিং

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

রায়দের দরোয়ান গম্বুজ সিং
মুখ ভরা দাড়ি গোঁফ রোগা টিং টিং।
ঝোপের মতই ঘন জোড়া ভুরু তলে,
জোনাকির মত আঁখি মিটি মিটি জ্বলে।
সরু সরু ঠ্যাং দুটো নড়্‌বড়্ করে,
নাগরার ভারে যেন পা দুটো না সরে।
র' ফলা নাগরা তার আগে আগে চলে
সুবৃহৎ পাগড়ীটী বেঁধে কুতূহলে।
খায় শুধু দিন রাত ভাঙ্গ আর গাঁজা,
কথায় কথায় মারে উজির ও রাজা।

জাঁক করে বলে সদা "এহি বাত্ ঠিক্
ডাকু পাকড়ানা মেরা খেল্‌কা মাফিক্।"
একটু শব্দ হলে বলে "কোন্ হ্যায়,
গম্বুজ সিং হাম্ আভি আতা হ্যায়।"
একদিন রায় বাড়ি পড়িল ডাকাত,
গোলমাল চিৎকারে গোটা পাড়া মাৎ।
লুটে নিয়ে তস্কর দিল পিঠটান্,
গম্বুজ তরমুজ ব'নে গড়াগড়ি যান্!
কহিনু—"গম্বুজ সিং, হ'ল কি তোমার?"
মাথা নাড়ি বলে, "আয়া বহুৎ বোখার।"

যেমনটি আমি দেখেছি

শ্রীবিমল বসু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও অসাধারণ গুণাবলির কথা তোমরা অনেকের কাছে শুনবে। তাঁর জীবন—এদেশের সাহিত্য ও সমাজের জন্যে তাঁর সাধনা—বিস্ময়কর! সে সম্বন্ধে আমি কিছু তোমাদের বলবো না।

সাধারণ লোকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বিলাসী কল্পনাপ্রিয়—সাধারণতঃ কবিরা যা নাকি হয়ে থাকেন। আর শান্তিনিকেতনে যারা পড়াশোনা করে—পড়াশোনা তো ঘোড়ার ডিম হয়: খালি কবিতা লেখা আর অলস কল্পনা। ছেলেরা নাকি বড় বড় চুল রাখে—যাকে বলে 'বাব্‌রী! সেই চুলের ভিতর থাকে ঘুমুর বাঁধা—যখন তারা হাঁটে, চলাফেরা করে—বাব্‌রী চুলের ভিতরকার ঘুমুর বাজ্‌তে থাকে—ঝুম্! ঝুম্! ঝুম্!

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনে ছেলেদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মতো এমনি কৌতুককর ধারণা নিয়ে একদিন হঠাৎ শান্তিনিকেতনের দিকে পাড়ি জমালুম।

বছর সাত আগেকার কথা। সব ঠিক স্মরণ নেই। পৌঁছলুম গেষ্ট হাউসে। ম্যানেজার মহাশয় বোধহয় শিশিরবাবু—খুব আদর যত্ন করে ডেকে নিলেন। জানলা দিয়ে দূরে হারিয়ে যাওয়া লাল রাস্তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ পথ বেয়ে চলেছে। সন্ধ্যার বিজলী বাতি জ্বলে উঠলে—শান্তিনিকেতনে এল এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য।

যা হোক্—ক' ঘণ্টা কেটে গেলে খাওয়ার ঘণ্টা পড়লো—তার আগেই চাকরকে সঙ্গে করে আমি খাওয়ার জায়গায় হাজির হয়ে আছি। কান দুটি উৎকর্ণ হয়ে আছে—মনে আছে উদ্বেগ—কখন আসবে শান্তিনিকেতনের ছেলে মেয়েরা, দেখবো তাদের, কখনো আসবে ছেলেরা—যাদের বাব্‌রীর ঘুমুর চলার সাথে সাথে বাজবে.ঝুম্! ঝুম্! ঝুম্!

যখন ওরা এলো—আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় সেই বাব্‌রী কোথায় সেই ঘুমুর! যা শুনেছিলাম তাহলে তা নয়! ভাবতে ভাবতে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। পরম পরিচিতের মতো এসে বার বার সশ্রদ্ধ অনুরোধ করছে একটি ছেলে—এটা খান্, ওটা খান—আর একটু দেবো...? ছেলেটীর ওপর আজকের অতিথিদের খাওয়াবার ভার ছিল!

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গলো—শুনলাম: বৈতালিকদের গান। আকাশে আলো আঁধারের খেলা—চারদিকে পরম নিস্তব্ধ—এমনি সময়ে গম্ভীর গলায় গান—মুহূর্ত্তে ভারতের সেই অতীত দিনে ফিরে গেলাম। সকালের আলো এসে দিল অভিনন্দন। পরম শান্তি পেলাম, তৃপ্তি পেলাম। বেরিয়ে পড়লাম শান্তিনিকেতনের পথে পথে—দেখলাম গাছের তলায়, ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পড়াশোনা চলছে ছেলেমেয়েদের। মাথার ওপর আকাশের চাঁদোয়া; তৃণময় মাটির ওপর বসে, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কী আন্তরিক যোগাযোগ। একা বেড়িয়ে বেড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম: লাইব্রেরী, চিত্রশালা, শ্রীভবন, খেলার মাঠ....

সব দেশের সব জাতের ছেলেমেয়েরা এসে এখানে বাসা বেঁধেছে, সঙ্কীর্ণতার মাঝে এসে উদারতার আলো।

দেশ ও কালের গণ্ডি এড়িয়ে, বর্ণ ও শ্রেণী বিভেদ ভুলে, কবি সবাইকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে। জাতির, দেশের ও শ্রেণীর সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত অশুভস্পর্শ এড়িয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, বিশ্বের সর্ব্বজাতির একত্রীভূত এক মিলন মেলা—স্বপ্ন দেখেছেন এক জাতি "মানুষ জাতি তার নাম।" ভারতবর্ষই হবে এই মানুষ জাতির মহান্ মিলন ক্ষেত্র—তাই বিশ্বভারতী আর শান্তিনিকেতনের হলো প্রতিষ্ঠা! মনটা শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো। সারাটা দিন কাট্‌লো বেড়িয়ে। আলাপ হলো কতকগুলি ছেলের সঙ্গে—আর একটি মেয়ে—বনলীলা বেন, ওদের চোখে মুখে আশা-আনন্দের আলো—অবয়বে—কর্ম্মের ও তেজের দৃঢ়তা। ওখানে বাঙ্গালীর চেয়ে অবাঙ্গালী ছেলেমেয়ে যেন বেশী।

সন্ধ্যায় উপাসনা গৃহে "রামমোহন স্মৃতি-বার্ষিকী" সভা হলো—রবীন্দ্রনাথ এলেন—গৈরিক আলখাল্লা—সৌম্য, শান্ত, ঋষির চেহারা। তাঁকে এই প্রথম দেখলাম চোখে। সে ছবি এখনো অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে আছে। উপাসনা গৃহের একদিকে গুরুদেবের বেদী লাল কাপড়ে মোড়া—মাঝখানে প্রায় পাঁচশো প্রদীপ চমৎকারভাবে সাজানো—শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর নির্দ্দেশে এটি সাজান হয়েছিল। মনে হচ্ছিল: যেন স্বপ্ন জগতে আছি। প্রথমে সুরু হলো: সমবেত কণ্ঠে ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত। তারপর গুরুদেব উঠলেন—রাজা রামমোহনের কর্ম্ম প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলতে। সেই দৈর্ঘ্য আয়ত সুন্দর চেহারা, গৈরিক বসন...পাঁচশো প্রদীপের অপরূপ সমারোহ আর জ্যোতি—মনের মাঝে স্বপ্ন বিস্তার করলো। কোন অতীন্দ্রিয় জগতে আছি যেন। গুরুদেবের বক্তৃতার পর আবার হলো গান একক কণ্ঠে—আবার আরম্ভ হলো গুরুদেবের বক্তৃতা। আমি অবাক হয়ে রইলাম: এই অতি বৃদ্ধ মানুষের বাগ্মিতা দেখে, তাঁর শক্তি দেখে। অনেক রাতে সভা ভাঙ্গলো। এত ভালো লাগলো—এখানকার মাটি, এখানকার বন্ধুর প্রদেশ—ভালো লাগলো এই শান্তিনিকেতন আর তার পরম শান্তির ছায়া।

সকাল বেলায় বিদায় নিলেম শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে। মনটা কেমন করলো—এখানে যদি সারা জীবন কাটাতে পারতাম! এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি সে সন্ধ্যার!—যে সন্ধ্যা কেটেছে শান্তিনিকেতনে।

বিলাসী কবিকে দেখতে পাইনি—কল্পনা প্রবণ অলস স্বাস্থহীন ছেলেমেয়েদের দেখতে পাইনি। কবিকে দেখেছি—সাধনায় মগ্ন সাধকরূপে—দেখেছি ছেলেমেয়েদের—তারা সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভাব ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখে এলাম।

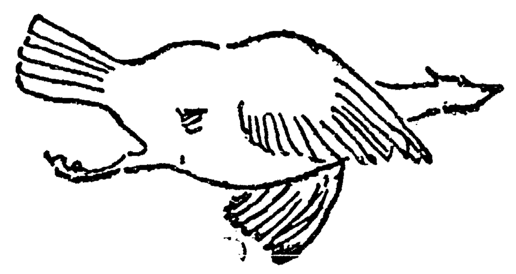

গাঁটকাটা

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক

এবার নাটুর বিচারের পালা!

ম্যাজিষ্ট্রেট মহিমবাবুর ক্লার্ক শীতল হেঁকে বললো,—"নাটু গাঁটকাটা কো আভি লাও।"

দুজন সিপাই সেলাম ঠুকে নাটুকে আনতে গেলো। কিছুক্ষণ পরে তারা একটা বেঁটে, রোগা লিকলিকে লোককে ধ'রে নিয়ে এলো।

শীতল বললো,—"স্যার, আসামী হাজির।"

মহিমবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে ব'সে ছিলেন। দিবানিদ্রায় তিনি অভ্যস্থ ছিলেন না; তবে সেদিন লাল জলের পরিমাণ একটু বেড়ে যাওয়ায় চোখ দুটো তাঁর আপনিই বুঁজে আসছিলো।

তিনি স্তিমিত চোখ দুটো খুলে বললেন,—"কোথায়?"

—"এই সামনে, স্যার।"

মহিমবাবু চেয়ারে সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন,—"তুমিই সেই স্বনামধন্য নাটু?"

বেঁটে রোগা লোকটা হাত-জোড় ক'রে বললো—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

—"কার গাঁট কেটেছিলে?" মহিমবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

—"আজ্ঞে হুজুর, কারুর কাটিনি। আমায় মিথ্যে ক'রে ধরেছে হুজুর—"

—"তাই নাকি?" মহিমবাবু আবার মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, একেবারে সত্যি কথা বলছি হুজুর; আপনি মা-বাপ আপনার কাছে কখনো মিথ্যে বলবো না হুজুর।—"

লোকটা আরো কি বলতে যাচ্ছিলো, একজন সিপাহী তাকে বিষম একটা খোঁচা দেওয়াতে চুপ ক'রে গেলো।

মহিমবাবু আবার দিবানিদ্রায় ঢুলে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পর চোখ তুলে কি ভেবে বললেন—"আচ্ছা নাটু, তুমি তো কোলকাতা

শুদ্ধ লোকের গাঁট কেটে বেড়াচ্ছো, আমার গাঁট কাটতে পারো কোনদিন?" বলে মহিমবাবু হো—হো ক'রে হেসে উঠলেন।

শীতলকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে মহিমবাবু বললেন—"আজ একটু মজা করি। রোজ তো কাজ করছি শীতু। কি বলো?"

—"স্যার, ও-সব বদলোককে নিয়ে—"

—"ওরা তো খালি পকেট কাটে। অদ্ভুত বিদ্যে। পকেট থেকে সমস্ত সাফ, অথচ কেউ একটুও জানতে পারে না!"

শীতল বুঝলো, মহিমবাবুর চোখে আজ জগৎ রঙিন!

—"কি হে?" মহিমবাবু বললেন; "পারো আমার গাঁট কাটতে?"

লোকটা হাত যোড় ক'রে বললো—"আজ্ঞে এ-সব কি বলছেন হুজুর। আপনি হচ্ছেন আমাদের মা-বাপ।"

—আরে তোমার ভয় নেই। বলনা হে, পারো?"

—"পারি হুজুর" লোকটা হাল্কা হেসে বললো।

মহিমবাবু চেয়ারে চমকে উঠে একটু জোরে বললেন—"আমার গাঁট কাটতে পারো তুমি?"

—"পারি হুজুর", লোকটা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো।

মহিববাবু বললেন", এই সিপাই, ইসকো ছোড় দেও।"

সিপাহীরা নাটুকে ছেড়ে দিলো। নাটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

মহিমবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"পারবে তো।"

লোকটা তেমনি হাসতে হাসতে বললো—"হ্যাঁ হুজুর।"

—"না পারলে কিন্তু ডবল্ সাজা।"

—"আচ্ছা হুজুর।" লোকটা হেসে আবার বললো—"হুজুর, আপনি মা-বাপ, পারলে কি বকশিস্ দেবেন?"

—"সেলাম হুজুর।" সেলাম ক'রে লোকটা চলে যাচ্ছিলো হঠাৎ ফিরে এসে বললো—"হুজুর তাহ'লে একবার সন্ধ্যের পরে মেছোবাজারের দিকে যাবেন।"

মহিমবাবু মৃদু হেসে বললেন—"পায়ে হেঁটে নাকি?"

—"না-না, হুজুর, আপনি হাঁটবেন কি? গাড়ী ক'রেই যাবেন।"

মহিমবাবু লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সবিস্ময়ে বললেন—"আচ্ছা।"

সন্ধ্যের দিকে মহিমবাবু নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরুলেন, সোফারকে আর নিলেন না। পাশে শীতল ব'সেছিলো। শীতলকে অনিচ্ছা সত্বেও আসতে হ'য়েছে, মনিবের হুকুম ব'লে।

শীতলের অনুরোধ, উপরোধ, শেষে অবরোধ এড়াতে না পেরে তাঁকে দুটো আর্দ্দালী নিতে হ'লো। আর্দ্দালী দুটো ঝলমলে উর্দ্দি প'রে গাড়ীর ভিতর বসলো।

গাড়ীটা মেছোবাজারের কাছে আসতেই মহিমবাবু প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলেন—পকেটে টাকা ঠিক আছে কিনা! প্যাণ্টের ভেতর চোরা-পকেটে ক'রে তিনি তাতে দশ টাকার পাঁচখানা নোট নিয়েছেন। চোরা-পকেটটি একেবারে সেলাই করা।

মেছোবাজারের শেষাশেষি এসেছেন হঠাৎ মহিমবাবু দেখলেন একটি ছেলে, বয়েস বড়ো জোর বারো হবে, একটা খাবারের ঠোঙা হাতে ক'রে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে ছুটে পালাতে লাগলো। আর একটা প্রায় সম বয়সী ছেলে তার পেছনে ডবল্ বেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে তাকে ধ'রে ফেললো ঠিক মাঝ-রাস্তায়।

তারপর সুরু হ'লো ঠোঙা নিয়ে কাড়াকাড়ি আর মারামরি। ফলে, ঠোঙার খাবার-গুলো সব রাস্তায় গেলো প'ড়ে।

মহিমবাবু হর্ণ দিলেন। হায়! কে শোনে?

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটো ছেলে মিলে কুরুক্ষেত্র সুরু ক'রে দিয়েছে আর রাস্তার লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছে।

হঠাৎ একটীকে অপরটী এমন বিষম ভাবে মারলো, যে, সে ধপ্ ক'রে মাটীতে গেলো পড়ে। সকলে ভাবলো আবার সে উঠে লাগাবে, কিন্তু সেই যে সে পড়লো আর তার উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। বেগতিক দেখে অপর ছেলেটা পালাবার চেষ্টা করছিলো, এমন সময় রাস্তার লোক হাঁ—হাঁ—হাঁ ক'রে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। কতক-গুলো লোক ছেলেটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো বেঁচে আছে কিনা! আর, একটা সা-জোয়ান লোক অচেতন ছেলেটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ সামনের ছেলেটাকে ধ'রে বেদম্ পিট্‌তে লাগলো।

মহিমবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট; তাঁর রক্ত গরম হ'য়ে উঠলো।

ভীড়ের পিছনে গিয়ে তিনি জোরে জোরে হর্ণ বাজাতে লাগলেন। ভীড় একটু সরে গেলো, আর সেই ফাঁকে সেই ছেলেটী, কেমন ক'রে কে জানে, ভীড় ঠেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে তাঁর গাড়ীর ফুট্-বোর্ডে চ'ড়ে জোড়হাতে বলতে লাগলো—"বাঁচা-ইয়ে, বাবু, বাঁচাইয়ে! এ হামকো মারডালে গা, হামারা যান লে লেগা।"

রাস্তার জনতা এবার তাঁর গাড়ীকে ঘিরে দাঁড়ালো।

পিছনের সেই সা-জোয়ান লোকটা এগিয়ে এসে খপ্ ক'রে সেই ছেলেটার একটা হাত ধ'রে ফেললো আর হিড়্‌হিড়্ ক'রে তাকে টানতে টানতে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে মারতে

মারতে বললো—"বাবু কিয়া ক্যরেগা? হামারা ছোটো ভাইকো তুম্ মারডালা, হাম্ তুমকো ভি মারডালে গা।"

আবার প্রহার চললো, প্রহারের চোটে ছেলেটার মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগলো। রাস্তার অতগুলো লোক স্তব্ধ হয়ে র'য়েছে।

সা-জোয়ান লোকটা আবার চেঁচিয়ে বলতে লাগলো;—"বাবু কেয়া ক্যরেগা? হামরা ভাইকো তুম্ মারডালা, তুমকো ভি—"

মহিমবাবু সে দৃশ্য আর দেখতে পারলেন না। তিনি আর্দ্দালী দুটোকে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন।

ইতিমধ্যে সামনের বাড়ী থেকে পুলিশে ফোন ক'রে দেওয়ায় তিন চার জন পুলিশকে আসতে দেখা গেলো।

আর্দ্দালী ও পুলিশ নিয়ে মহিমবাবু বজ্রকণ্ঠে বললেন,—"বাবু কেয়া ক্যরেগা?"

সা-জোয়ান লোকটা ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

—বাবু, কেয়া ক্যরেগা দেখো।" মহিমবাবু নিজে হাতে লোকটাকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে পুলিশকে বললেন—"যাও, আভি লে যাও ইসকো।" পরে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন—"কাল তুম্‌কে আউর কেয়া হোগা দেখ্‌না"—

লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে পুলিশের সঙ্গে থানার দিকে এগিয়ে চললো।

—"এই", আর্দ্দালীদের দিকে চেয়ে মহিববাবু বললেন "হাসপাতালকো গাড়ী আনে সে এই দোনো বাচ্চাকো উঠায় দেনা।"

মহিমবাবু শীতলকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

রাত ন'টার পর মহিমবাবু বাড়ী ফিরে দেখেন, তাঁর বাড়ীর ফটকে আবছায়ার মত কে ব'সে আছে।

—"কে?" মহিমবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন।

—"আজ্ঞে হুজুর আমি নাটু!"

"নাটু!!"

মুহূর্ত্তে মহিমবাবু পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন চোরাপকেট কাটা, নোটগুলোও অদৃশ্য!

নাটু একটু এগিয়ে এসে বললো—"হুজুর, এই আপনার টাকা!" পরে একটু থেমে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো—"যে লোকটীকে থানায় চালান ক'রলেন হুজুর সে আমার ভাই, আর ছেলেদুটো আমারই।"

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

(গল্পের পূর্ব্বাংশ)

বিমলের ডায়ারি। ছেলেমহলে বিমল হোল পৈতেহীন চেনা বামুনের মত। গল্পের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে তার ডায়ারির ঘটনাগুলি ভাগ ভাগ করে কথিত হয়েছে।

বিমল কুমারকে নিয়ে একদিন গিয়েছিল একটি চীনে হোটেলে খানা খেতে। চারিধার সাজানো-গুজানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেলটি। পরিবেশন করছিল একটী চীনে মেয়ে। চুং চাং চুংচিং কথা শুনতে শুনতে তাদের মনে হচ্ছিল যেন তারা আরব্য উপন্যাসের মায়া-গালিচায় চেপে হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চীন দেশেই এসে পড়েছিল। চীনেম্যানদের দেখে তাদের মনে হচ্ছিলো যেন এক-একটি রহস্যময় মূর্ত্তি। হঠাৎ পাশের ঘরেই জাগলো ক্রুদ্ধ গর্জ্জন—হুড়োহুড়ি, চেয়ার টেবিল উল্টে পড়ার শব্দ। তারপরেই এক আর্ত্তনাদ। মাঝ বয়সী একটি চীনেম্যান রক্তাক্ত দেহে টল্‌তে টল্‌তে বিমলদের ঘরে এসে উপস্থিত। তার পা থেকে যেন মাটি স'রে গেল—সে পড়ে গেল লুপ্ত চেতনার ভিতর। আট দশটি চীনেম্যান এসে ভিড়্ ক'রে দাঁড়ালো সেই কামরার সামনে। সব-আগে ছিলো লম্বায় চওড়ায় মস্তবড়ো এক মূর্ত্তি। সে রক্তমাখা ছোরাখানা উঁচিয়ে ধরে ভেতরে এসে ঢুকলো। বিমল মারলো এক ঘুষি তার চোয়ালের উপরে—লোকটা ঠিকরে প'ড়ে গেল। মৃতপ্রায় লোকটি অস্ফুটস্বরে ইংরেজিতে বললে, "আমি আর বাঁচবো না।...আমার গলায় ঝুলছে একটা লকেট—তুমি সেটা তাড়া-তাড়ি বের ক'রে নাও। লকেটটা লুকিয়ে রেখো। ছুন-ছিউ দেখতে পেলে তুমিও বাঁচবে না।"

ছুন-ছিউ কে? তাকে যে মেরেছে। যখন সে মরবেই তাকে সে কোনমতেই গুপ্তধন ভোগ করতে দেবে না।

গুপ্তধন? সে কোথায়?

কি-পিন! কি-পিন! যেও সেখানে, পাবে।

এই ব'লে লোকটি মারা গেল!

বিমল ও কুমার বাড়ি ফিরে এল। ধুক্‌ধুকিটা রুপোর তৈরী, তার উপরে খোদাই করা একটা বিদ্‌ঘুটে মূর্ত্তি। ধুক্‌ধুকির ভিতর ছিল ভাঁজ করা একটা পুরু কাগজ—নক্সার মতন—ফোঁটা ফোঁটা সাঙ্কেতিক চিহ্নেভরা। বিমলের ঠাওর হোল না। কি-পিন? কোথায় বা কোন্ চীনে মুল্লুকে! হদিশ সে পাবে কেমন ক'রে, এই নিয়ে তার মাথা তালগোল পাকাচ্ছিলো এমন সময় বিনয়বাবু এসে হাজির হলেন। বিনয়বাবু হলেন জ্ঞান-সমুদ্রের

ডুবুরি। তাঁকে এককথায় "জীবন্ত অভিধান"ও বলা চলে। বিনয়বাবুর চোখে পড়লো সেই লকেটটি, দেখে তিনি বললেন যে, এটি হোল হিন্দু যক্ষরাজ কুবেরের মূর্ত্তি। আর কি-পিন সপ্তম শতাব্দীর পরিচিত আফগানিস্থানের কপিশ নামক স্থান। এক সময়ে গান্ধারকেও কি-পিন বলা হোত। বিমলের চোখে আলো ঠিকরে যেন পড়লো, সে দেখতো পেল সব আবছা আবছা। যত মুস্কিল ঠেকলো তার ওই কাগজটি নিয়ে। বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়ে সহজস্বরে বললেন, "এতো দেখছি ব্রেল পদ্ধতিতে লেখা। এই পদ্ধতিতে এক থেকে ছয়টি মাত্র বিন্দুকে নানাভাবে সাজিয়ে বর্ণমালা প্রভৃতির সমস্ত কাজ সারা যায়।"

কৌতুহল-ব্যগ্র সবাকার মন। বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে হাত বুলিয়ে বললেন—"শা-লো-কা পশ্চিমদিক: ভাঙা মঠ: কুবের মূর্ত্তি: গুপ্তগুহা:—ব্যাস্ আর কিছু নেই।"

ঐতিহাসিকেরা শা-লো-কা, কি-পিন, কা-পিন, কপিশ বিভিন্ন নামে উত্তর-পূর্ব্ব আফগানিস্থানকেই আখ্যাত করেছেন। আধুনিক নাম তার কাফ্রিস্থান। ভারতবর্ষের সীমারেখা, হিন্দুকুশেই আবদ্ধ ছিল না, তার ওপারে আফগানিস্থানকেও জুড়ে' ছিল। বিমল ও কুমারের মন উদগ্র হয়ে উঠলো—ছুটলো তারা কাফ্রিস্থানের উদ্দেশে আনাচ-কানাচে ঢুঁ মেরে। তাদের পথপ্রদর্শক হবেন বিনয়বাবু। নতুন একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মতলবে তারা তাঁকে পুরোভাগে চায়, এটা তিনি ধরে নিলেন।

এমন সময় রামহরি এসে উপস্থিত। সে জানালো যে চারটি চীনেম্যান বিমলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

চীনেম্যান দেখা করতে চায়, কেন?

ধুক্‌ধুকিটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে জামার পকেটে বিমল রেখে দিল। ছুন-ছিউ তবে কি—যে ছোরা হাতে ক'রে চীনে বুড়োটাকে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল? মানুষের ছদ্মবেশে হত্যাকারীর পুনরাগমন। বিমল প্রমাদ গণলো।

—"তোমার নাম কি ছুন-ছিউ?"

ধাঁ ক'রে অমনি পকেট থেকে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করলে একটা রিভলবার। তার পিছনের তিন মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গেই এক একটা রিভলবার বার করে ফেললে। বিমলের চোখের সামনে স্থির হ'য়ে রইলো চার-চারটে রিভলবারের চক্‌চকে নলচে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামহরির ভীমরতি হয় নি

ছুন্-ছিউ'র রিভলভারটার লক্ষ্য ঠিক আমার দিকেই!

এ-ভাবে চোখের সামনে রিভলভার তুললে কারুরই মনে স্বস্তি হয় না, আমারও হ'ল না।

কুমার, বিনয়বাবাবু ও কমলের মুখের পানে একবার আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম। রিভলভারের মহিমায় তাদের কারুরই ভাবান্তর হয়নি দেখে বিস্মিত হলুম না। আমরা সকলেই একই বিপদ-পাঠশালার পাঠ গ্রহণ করেছি বহুবার, রিভলভার দেখেই আর্ত্তনাদ করবার অভ্যাস আমাদের কারুরই নেই।

ঘরের এদিকে-ওদিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমাদের পিছনে ঘরের দেওয়াল। আমার ডানপাশে কুমার, বাঁ পাশে বিনয়বাবু এবং তাঁর পাশে কমল ব'সে আছে। আমার সামনেই একটা গোল মার্ব্বেলের টেবিল। তার ওপাশে ব'সে ছুন-ছিউ এবং তার পিছনে এক সারে দাঁড়িয়ে আছে আর তিনটে চীনেম্যান। তাদের পিছনেই এ-ঘর থেকে বেরুবার একমাত্র দরজা। পিছনে হটবার উপায় নেই, চীনেদের এড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়াও অসম্ভব। নিজের ঘরেই ফাঁদে প'ড়ে গিয়েছি, পালাবার পথ একেবারে বন্ধ।

টেবিলের তলায় স্থির হয়ে বসে আছে বাঘা। অন্য কোন কুকুর হ'লে এতক্ষণে নিশ্চয় গর্জ্জন করে তেড়ে যেত। কিন্তু রিভলভারের সামনে গর্জ্জন করলে বা তেড়ে গেলে যে মহা বিপদের সম্ভাবনা, এটা বুঝতে তার দেরি লাগল না—এমনি শিক্ষিত কুকুর সে!

ছুন-ছিউ হাসতে হাসতে বললে, "বাবু কি দেখছ, কি ভাবছ? বুঝতে পারছ তো এ-বাড়ীর মালিক হচ্ছি এখন আমি?"

হতভাগার বাঁদুরে মুখে হাসি দেখে গা যেন জ্ব'লে গেল। বললুম, "ছুন্-ছিউ, তোমার রিভলভার নামাও। তুমি ভুলে যাচ্ছ এটা চীনদেশ নয়।"

ছুন্-ছিউ বললে, "না বাবু, ভুলিনি। আমি জানি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, আর এখানে বাস করে কাপুরুষ বাঙালীরা।"

—"আমরাও সশস্ত্র হ'লে এ-কথা বলবার সাহস তোমার হ'ত না।"

—"চুপ কর বাবু! তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে আসিনি। কাল হোটেল থেকে তোমরা একটা লকেট চুরি ক'রে এনেছ। ভালো চাও তো সেখানা ফিরিয়ে দাও।"

—"ছুন-ছিউ, তুমি চণ্ডু খেয়ে স্বপ্ন দেখেছ। লকেট! সে আবার কি?"

—"আকাশ থেকে খসে পড়বার চেষ্টা কোরোনা বাবু! তুমি কি বলতে চাও তোমার কাছে একখানা রূপোর লকেট নেই?"

আমার যুক্তি হচ্ছে, চোর-ডাকাত-খুনেকে ঠকাবার দরকার হ'লে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। অতএব কোন রকম দ্বিধা না ক'রে বললুম, "না। সোনার বা রূপোর বা পিতলের কোনরকম লকেট-ফকেটের ধার আমি ধারি না।"

কুমার মস্ত-একটা হাই তুলে বললে, "ওহে ছুন্-ছিউ তোমার ছাতা-পড়া হলদে দাঁত-গুলো দেখে আমার গা বমি বমি করছে। তুমি দাঁত বার ক'রে আর না হাসলেই বাধিত হব।"

বিনয়বাবু টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে সুরু ক'রে দিলেন।

কমলও কম দুষ্ট নয়। বললে, "ছুন্-ছিউ, তুমি একটা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী শুনবে?"

বাঘা যেন নাচারের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে, সামনের দিকে দুই থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার উপরে নিজের মুখ স্থাপন করলে—কিন্তু তার দৃষ্টি রইল চীনেম্যানদের দিকেই।

ছুন্-ছিউ বললে, "ওহে বাবু, আমার সঙ্গে রসিকতা করা নিরাপদ নয়। মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি, চোখে দেখবার আগেই আমি মানুষ খুন ক'রে বসি।"

আমি বললুম, "কিন্তু চোখে দেখেও তুমি দয়া ক'রে আমাদের খুন করছ না কেন শুনি!"

—"লকেটখানা কোথায় রেখেছ এখনো টের পাইনি ব'লে।"

—"তা'হলে লকেটখানা পেলেই তোমরা আমাদের খুন করবে?"

—"না। তোমরা ভদ্র ব্যবহার কর, আমরাও ভদ্র ব্যবহার করব।"

—"ধন্যবাদ। কিন্তু লকেট আমাদের কাছে নেই।"

—"নেই নাকি? কিন্তু হোটেলে কাল তুমি যখন মরো-মরো বুড়ো চ্যাংয়ের গলা থেকে লকেটখানা খুলে নিচ্ছিলে, আমাদের লোক তা দেখেছিল। তারপর তোমাদের পিছু ধ'রে এসে আমাদের লোক এই বাড়ীখানাও দেখে গিয়েছে। বুঝেছ? আমরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে এখানে আসিনি!"

ঠিক সেই সময়ে দেখলুম, দরজার বাইরে রামহরির মুখ একবার উঁকি মেরেই সাঁৎ ক'রে স'রে গেল! আগেই বলেছি, দরজার দিকে পিছু ফিরে তিনটে চীনেম্যান এক সারে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল ছুন্-ছিউ। সুতরাং তারা কেউ এই দৃশ্যটা দেখতে পেলে না!

আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলুম—এবং কুমার ও কমলের মুখ দেখে বুঝলুম, তারাও দেখেছে এই দৃশ্যটা।

বিনয়বাবু হঠাৎ হাতের বইখানা টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর গোঁফ-দাড়ীর ফাঁকে একটুখানি হাসির ঝিলিক্ ফুটেই মিলিয়ে গেল। হুঁ, বিনয়বাবু তা'হলে বই পড়তে পড়তে চোরা চোখেও তাকাতে পারেন!

বাঘা টপ্ ক'রে উঠে প'ড়ে একটা ডন্ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং ঘন ঘন নাড়তে লাগল তার ল্যাজটা।

ছুন্-ছিউ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "আরে, আরে, কুকুরটা খামোকা দাঁড়িয়ে উঠে ল্যাজ নাড়তে সুরু ক'রে দিলে কেন?"

আমি বললুম, "এতক্ষণ পরে ও তোমাকে বন্ধু ব'লে চিনে ফেলেছে!"

ছুন্-ছিউ চট্ ক'রে একবার পিছনদিকটা দেখে নিয়ে বললে, "আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি! না, আর দেরি নয়! হয় লকেট দাও, নয় মরো!" সে রিভলভারটা বাগিয়ে ধ'রে দুই পা এগিয়ে এল।

কুমার বললে, "অতটা এগিয়ে এস না ছুন্-ছিউ, অতটা এগিয়ে এস না! তা'হলে আমি খপ্ ক'রে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারি!"

ছুন্-ছিউ আবার পিছিয়ে প'ড়ে বললে, "কেড়ে নিবি? দানব মানব, ভগবান সয়তান—ছুন্-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?...ওরে, এই বাঙালী-বাবুদের কেউ একটা আঙুল নাড়লেই তোরা গুলি ক'রে তার খুলি উড়িয়ে দিবি, বুঝেছিস্?"

তারা চারজনে আমাদের এক-একজনের দিকে লক্ষ্য স্থির ক'রে রিভলভার তুলে ধরলে।

এইবারে সত্য-সত্যই ছুন্-ছিউর দুই চক্ষে ফুটে উঠল হত্যাকারীর জ্বলন্ত দৃষ্টি! দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে বললে, "এই আমি তিন গুণছি! এর মধ্যে লকেট না দিলে আর তোদের রক্ষে নেই!......এক.. ...দুই—"

ছুন্-ছিউ দুই গোণ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপথে আবার রামহরির আবির্ভাব! পা টিপে টিপে সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল—এক গাছা লম্বা, মোটা দড়ীর দুই মুখ দুই হাতে ধ'রে! তারপর সে-গাছাকে 'স্কিপিং'-দড়ীর মতন শূন্যে তুলেই সে একসঙ্গে তিন চীনে-মূর্ত্তির মাথার উপর দিয়ে ফেলে খুব জোরে মারলে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচ্‌কা-টান! বয়সে রামহরি পঞ্চান্নো

পার হলেও এখনো সে শক্তিহীন হয়নি—পর-মুহূর্ত্তেই তিন চীনে-মুর্ত্তি একসঙ্গে ঠিক্‌রে পপাত ধরণীতলে ! বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার ও কমলও সেই মুহূর্ত্তেই এক এক লাফে সেই ভূপতিত দেহ তিনটের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল !

এদিকে শব্দ শুনে চম্‌কে ছুন্‌-ছিউ যেই ভুলে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি বাঘা তড়াক্ ক'রে লাফ মেরে তার রিভলভারশুদ্ধ ডানহাতের কব্জিতে কামড় মেরে ঝুলে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ধাক্কা মেরে সাম্‌নের টেবিলটা সরিয়ে ছুন্‌-ছিউর চোয়ালের উপরে দিলুম বিষম এক 'নক্‌-আউট ব্লো' ! হঠাৎ গোড়া-কাটা গাছের মত ছুন্‌-ছিউ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মেঝের উপরে !

সমস্ত ব্যাপারটা বলতে এতগুলো লাইনের দরকার হ'ল বটে, কিন্তু এগুলো ঘট্‌তে এক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগেনি !

হাতে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা প'রে চোয়ালের ঠিক জায়গায় ঘুসি মারতে পারলে প্রতিপক্ষ তখনি কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বেই পড়বে ! কিন্তু দস্তানা-হীন হাতে চোয়ালের যথাস্থানে ঘুসি মারলেও প্রায়ই দেখা যায়, চোয়াল ভেঙে রক্তাক্ত হয়ে গেলেও এবং কাবু হয়ে শুয়ে পড়লেও প্রতিপক্ষ জ্ঞান হারায়নি !

ছুন্‌-ছিউও জ্ঞান হারালো না। মাটিতে প'ড়েই সে আবার ওঠবার উপক্রম করছে দেখে আমি তারই হাত থেকে খ'সে পড়া রিভলভারটা তুলে নিয়ে ধমক দিয়ে বললুম, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ চীনে-বাঁদর ! নড়লেই মরবি—তোকে মারলে আমার ফাঁসী হবে না !"

আচ্ছন্ন, হতভম্বের মত আমার হাতের রিভলভারের দিকে তাকিয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

ফিরে দেখি, বিনয়বাবু, কুমার ও কমলেরও হাতে গিয়ে উঠেছে তিন চীনেম্যানের তিন রিভলভার ! রামহরি আনন্দে আটখানা হয়ে হাততালি দিচ্ছে এবং বাঘা 'ঘেউ-ঘেউ' রবে ঘরময় ছুটে যা নৃত্য করে বেড়াচ্ছে !

বললুম, "রামহরি, নিয়ে এস আরো খানিকটা দড়ি ! এইচার বেটার হাত-পা বেঁধে ফ্যালো !"

রামহরি তখনি আরো দড়ী নিয়ে এসে চীনেম্যানগুলোকে বাঁধতে বসল।

কুমার বল্লে, "একেই ইংরেজীতে বলে টেবিল উল্টানো ! চীনেদের হল্‌দে হাতের রিভলভারগুলোই এসেছে এখন আমাদের বাদামি হাতে !"

কমল বললে, "দানব-মানব, ভগবান সয়তান—ছুন্‌-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে ? কেড়ে নেবে আমাদের প্রিয়তম বাঘা ! দানব-মানব, ভগবান সয়তানের যা অসাধ্য কুকুর বাঘার এক কামড়ে তা সাধ্য হ'ল !"

ছুন্‌-ছিউ রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, "তোমরা এখন আমাদের নিয়ে কি করতে চাও ?"

আমি বললুম, "রামহরি, ও-ঘরে গিয়ে থানায় 'ফোন' ক'রে দিয়ে এস তো !"

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, তুমি আমাকে মনে কর কি ? বুড়ো হ'লেও এখনো আমার ভীমরতি হয়নি—আর লেখাপড়া না জানলেও বুদ্ধিতে আমি তোমাদের কারুর চেয়ে কম নই ! এই চার চীনে-হনুমানের রকম-সকম উঁকি মেরে দেখেই আমি খানিক আগে থানায় 'ফোন' ক'রে দিয়েছি—পুলিস এসে পড়ল ব'লে !"

বিনয়বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "ধন্য রামহরি, ধন্য ! আজকের এই নাট্যাভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় তোমার কৃতিত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি !" ক্রমশঃ

চলন্তিকা

শান্তিনিকেতনের এক সংবাদে প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের শরীর বিশেষ অসুস্থ। কলকাতার বিধান রায় প্রমুখ কয়েকজন ডাক্তার তাঁর শরীর পরীক্ষা করে এসে এক ইস্তাহার দিয়েছেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই বটে কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের এখন প্রয়োজন এবং কলকাতায় তাঁর চিকিৎসা হওয়া উচিত। আমরা আশা করি তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁর চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না এবং ডাক্তার কবিরাজ যাঁদের হাতেই তাঁর চিকিৎসার ভার পড়ুক, তিনি যেন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন। সবার ওপরে আজ তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন—শারীরিক ও মানসিক কোনরকম পরিশ্রম থেকে তাঁকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। অনেকেই অনেক সময় তাঁকে অযথা চিঠি লিখে বা তাঁকে দেখার জন্য বিরক্ত করে, নানারকম ভাবে নানা বিষয়ে তাঁর মনের শান্তির ব্যাঘাত করে। আমরা আশা করি, উৎসুক ব্যস্তবাগীশ মানুষ তাঁকে কিছুদিনের জন্য রেহাই দেবে এবং আমরা আন্তরিক ভাবে কামনা করি তিনি শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠুন। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথা জানাই যে রংমশালের রবীন্দ্রসংখ্যা আশাতীত সমাদর লাভ করেছে এবং ঐ সংখ্যাটি সকলের এত পছন্দ হয়েছে যে রংমশাল বেরবার কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত কপি বিক্রী হয়ে যায় এবং পরে অনেকে কপি না পেয়ে নিরাশ হয়ে পড়েন। রংমশাল কার্য্যালয়ে ঘন ঘন তাগিদ—রংমশালের রবীন্দ্রসংখ্যা আছে, দিন না খুঁজে পেতে একটা ! কিন্তু আমাদের রংমশাল যা ছিল তা আমরা আগেই সব দিয়ে দিয়েছি। যারা পেলে না তাদের জন্য আমরা দুঃখিত ; যারা পেয়েছে, তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অভিনন্দনে আমরা আনন্দিত। যা হোক যাঁকে তোমরা বাংলার ছেলেমেয়েরা এত ভালোবাস, যাঁকে নিয়ে এত সমারোহ এত আনন্দ এত আগ্রহ—সে রবীন্দ্রনাথ আজ শয্যাগত—তিনি শীঘ্র নিরাময় হয়ে ওঠেন তাই আজ আমাদের সকলের বড় কামনা হোক।

রংমশালের গত সংখ্যায় আমরা বলেছিলাম মহামেডানস দল লীগ পাবে, হলও তাই। তারা মোহনবাগান বা ইষ্টবেঙ্গলের চেয়ে এত বেশী পয়েণ্টে এগিয়েছিল যে তাদের লীগ না পাওয়াটাই আশ্চর্য্যের হত। কেবল একটা খেলায় মহামেডানসকে পরাজিত করে ইষ্টবেঙ্গল শুধু গৌরব অর্জ্জন করেনি, মহামেডানসের না-হারার গর্ব্ব ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন রানার্স-আপ এর জন্য প্রতিযোগিতা চলছে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের মধ্যে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই তারও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। মোহনবাগান তৃতীয় স্থানে আছে, রানার্স-আপ হতে গেলে তাকে বাকি ম্যাচগুলিতে জিততে হবে। যা দেখা যাচ্চে ইষ্টবেঙ্গলের চান্স বেশী, তবে একটা 'টাই'ও হতে পারে। এদিকে আই এফ এ শীল্ড ম্যাচও সুরু হচ্চে এবং যা

দেখা যাচ্ছে খেলাগুলিতে এবার বিশেষ প্রতিযোগিতা হবে। বাইরে থেকে অনেক ভাল ভাল দল খেলতে আসছে এবং অন্য বছরের চেয়ে এবার অনেক বেশী দল আই এফ এতে খেলবে। নামজাদা দলের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—মাইশোর রোভার্স, স্যাণ্ডিম্যানিয়ানস্, ওয়েলচ রেজিমেণ্ট, তিলকমতি ক্লাব, সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স, ডবলু-আই-এফ-এ। বাইরের এ দলগুলি ছাড়া কলিকাতার আশাভরসা নির্ভর করছে তিনটি দলের ওপর—সে তিনটি দল হ'ল—মহামেডানস, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল। বাছাই করা এ কয়েকটি দলের মধ্যে যে কোন্ দুটি দল ফাইনালে উঠবে তা এখন বলা অসম্ভব। তাছাড়া আই এফ এ শীল্ডএর বদনাম আছে অনেক সময় কোন অজানা নাম-না-জানা দল আশ্চর্য্যরকম খেলা খেলে শীল্ড জয় করে বসবে। অবশ্য বলা বাহুল্য, কলকাতার কোন দল যদি এবার শীল্ড জয় করতে পারে সেটা খুবই গৌরবের বিষয় হবে কারণ এবার বায়রে থেকে অনেকগুলি ভাল দল খেলবে এবং তাদের হারিয়ে শীল্ডটি নিতে হবে। কাজেই আজ কেউ যদি জোর করে বলতে পারে—"মশায়, অমুক দল শীল্ড নেবে, আমি বলে দিচ্ছি," তাহলে লোকে তাকে নয় বলবে সাক্ষাৎ ভগবান, নয় বলবে ধাপ্পা দিচ্ছে। আমাদের জিজ্ঞেস করলে বলব—'মশাই, ফাইনালের দিন সন্ধ্যে পৌনে সাতটার সময় ঠিক বলবো, দেখবেন গোলশুদ্ধ একেবারে চ্যাম্পিয়ানের নাম করে দেবো!'

ইউরোপের যুদ্ধের সব চেয়ে জবর খবর—জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করেছে। খবরটা আনকোরা নতুন নয়, কয়েকদিন হয়ে গেল কিন্তু আজও এ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধের বাজারকে তা সরগরম রেখেছে। আজ ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের কোন বালাই নেই, বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে একটা বড় দেশ তার ছোটকে নাবালক বানিয়ে তার ওপর গার্জ্জেনগিরি করছে। এই যুদ্ধের গোড়ায় জার্ম্মাণী রাশিয়ার সঙ্গে মিতালী করে সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল আর আজ সে সমস্তই যেন মনে হচ্ছে বুজরুকি। কোন কথা না বলে, যুদ্ধ ঘোষণা না করে জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করেছে। কিন্তু এবারে লেগেছে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই—এবং এমন লড়াই সুরু হয়েছে যা পৃথিবীও কোনদিন দেখেনি। প্রায় ১৫০০ মাইল ব্যাপী যুদ্ধ হচ্ছে আর লক্ষ লক্ষ সৈন্য, ট্যাঙ্ক, কামান দুদিকেই গর্জ্জে উঠেছে। কিন্তু রাশিয়ার মত প্রকাণ্ড একটা দেশকে বাগ মানান একটা দেশ ছেড়ে দশটা দেশের পক্ষেও চারটিখানি কথা নয়। জার্ম্মাণীকে লড়তে হচ্ছে জার্ম্মাণী থেকে অনেক দূরে এসে, রাশিয়া লড়ছে নিজের জায়গায়। নানা দিক থেকে খবরে প্রকাশ, জার্ম্মাণীর বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে; রাশিয়ারও যে ক্ষতি না হচ্ছে তা নয়, তবে বিভুঁইতে জার্ম্মাণীর পক্ষে আক্রমণ করে লড়া আর রাশিয়াকে নিজের দেশে আত্মরক্ষার্থে লড়া দুটো আলাদা জিনিষ। সকলেরই বিশ্বাস রাশিয়ার কাছে জার্ম্মাণী এবার বুঝি জব্দ হ'ল। কিন্তু সব নিয়ে আজকের ইউরোপের এই বিরাট যুদ্ধের ফলাফল যে কি হবে তা আমরা ভাবতে পারছি না। হয়ত সমস্ত পুরোনো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়ে আবার এক নতুন পৃথিবী জেগে উঠবে।

————

আগামী মাসে রংমশাল বৈঠক

সম্পাদকের লিখন

বাদল-মহল যায় খুলে যায়! মেঘমল্লার শুনবি আয়,
ঝড়-মাতানো তালের বনে বেতালে তাল গুণবি আয়।
রিণিঝিনি রিণিঝিনি!
চিরদিনই ও-সুর চিনি!
শাঙন-সেতার মূর্চ্ছনাতে ছন্দমালা বুনবি আয়!

* *

গেরুয়া-রঙা নদী বাজায় রথের ঘাটে জলের নূপুর,
জান্‌লা খুলে শুনছি ব'সে সারা সকাল, সারা দুপুর।
বজ্র-কামান দেগে দেগে
শূন্য কাঁপে রেগে-মেগে!
মেঘ-পাহাড়ের ঝর্‌ণা থেকে ঝর্‌চে ঝারা ঝুপুর-ঝুপুর।

* *

সবুজ কানন! মাঠের ধারে ধরেচ কি ঐক্যতান?
বৃষ্টি-বীণার সঙ্গে চলে লতাপাতার কাজ্‌রী-গান।
কাজ্‌লা ছায়া ঘুমোয় কোলে,
জলদ-ঝালর মাথায় দোলে,—
তার উপরেই বিজ্‌লী ছোঁড়ে রামধনুকে অগ্নিবাণ!

* *

ও বাতাবি-নেবুর কুসুম! কুঁড়ি কখন খুলবে ভাই?
দুধ-বরণী কেয়া, কখন হাওয়ার দোলায় দুল্‌বে ভাই?
সাত-ভাই চাঁপা!—পারুল ডাকে।
মৌচুষি-ফুল খুঁজ্‌চে তাকে!
জর্দ্দা-গোলাপ! রংবাহারে নয়ন কখন ভুল্‌বে ভাই?

* *

ব্যাঙের ছাতা ! ও-নাম তোমায় কে দিয়েচে ? মিথ্যে যা তা !
রূপকথিকার শিল্পী এসে বানিয়েচে ঐ পরীর ছাতা !
টুপ্-টুপাটুপ্, টুপ্-টুপাটুপ্ !
বৃষ্টি পড়ে—কী অপরূপ !
বকুল-ছাওয়া ঘাস-গালিচায় স্বপন-পরীর আসর পাতা।

* *

আজ পৃথিবীর খেলার বেলা—নয় জোছনা, রৌদ্র নয় !
আঁধার-ছাঁকা আলোয় আঁকা জলছবি, মন মুগ্ধ হয় !
আকাশ, বাতাস, কানন খেলে,
খেল্চে ময়ূর প্যাখম মেলে,
মাঠে নতুন সাগর খেলে, শ্রাবণ খেলে বিশ্বময়।

তোমাদের—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আগামী মাসে রংমশাল দল ও 'ব্যাজ' সম্বন্ধে
তোমাদের একটি খবর দেওয়া হবে।

পরম স্নেহের ভাইবোনেরা আমার,

একমাসের অদর্শন, ঠিক অদর্শন বলা যায় না—চিঠিপত্রের আদান প্রদান বন্ধ'র জন্য তোমরা অনেক অনুযোগ করেছ, কিন্তু রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা পেয়ে খুসীও কম হওনি—সুতরাং তোমাদের অনুযোগ অভিযোগ এবার দুর্য্যোগ না বাধিয়ে সুযোগই এনে দিয়েছে। আমি বলি কি জানো ? এই যে মাঝে মাঝে চুপ করে সরে থাকা এটা তোমাদের একঘেঁয়েমী থেকে মুক্তি দেওয়া—তোমরা যদিও এ প্রস্তাবে সম্মত নও—কিন্তু নতুনত্বের দিক দিয়ে এ মন্দ কি ?

নতুন বছরে আমরা যা আশা করেছিলুম হলো তার বিপরীত, তবু কবির ভাষায় এই কথাই বলি ঃ

বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার খুলবে না
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

কান পেতে শোনো, চোখ চেয়ে দেখো—প্রাণ দিয়ে অনুভব করো কি অবস্থায় আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। চারিদিকে আর্ত্তনাদ আর হাহাকার। আজকের দিনে তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ,—দুর্য্যোগে, বন্যায়, ব্যাধিতে, অনাহারে, গৃহহীন হয়ে যারা মরণের মুখে এগিয়ে গেছে বা যাচ্ছে,—তোমাদের সাধ্যমত তাদের সাহায্য করো—একথা তারা জানুক, বাঙ্গলার ছেলে মেয়ে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে তাদের দুঃখে এগিয়ে আসতে পারে।

সত্যব্রত বসু (হাফলং) ১৬:৩—তোমার প্রবন্ধ যথাস্থানে গেছে, সময়েই জানতে পারবে। **মায়া ও খুকু** (পাটনা) ১৩৬০—তোমার বন্ধুদের বলো "দিদিভাই একটা মানুষ, ভারতবর্ষের কিশোর কিশোরীরা তাঁর ভাইবোন, তাদের তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন—কিন্তু এমন কোনও বড় পরিচয় নেই তাঁর যা দিয়ে তিনি পরিচিত হতে পারেন —সেইজন্য নাম বা পরিচয় বলেন না—এতে দুঃখ করে না—বরং আনন্দ পেতে হয়।" তোমাদের কথা শুনে আমি মোটেই হাসিনি ভাই, শুধু দুঃখিত হয়েছি কিছু পরিচয় নেই বলে। রংমশাল দেরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা Radio প্রোগ্রাম শুনতে পাওনি—বড়ই দুঃখের বিষয়—ভবিষ্যতে এরকম যাতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করবো নিশ্চয়। **কৃষ্ণা ঘোষ** (বালিগঞ্জ) ১৬১৫—হ্যাঁ ভাই আমার আসল নামই 'দিদিভাই'। তোমার বুঝি একটা নকল নাম আছে ? আমার মোটে একটী কিন্তু। **কপোত** (কলিকাতা)—তোমরা ভাই লেখনী বন্ধুর নাম লিখে **ষ্ট্যাম্প** পাঠিয়ে চিঠি দিও, অবশ্য বন্ধু পাঠিয়ে দেওয়া হবে। **অশোক দাশগুপ্ত** (কলিকাতা) ১৩৬৯—তোমার দু'টী চিঠিই পেয়েছি—তিনটী নয়। তোমার উপযুক্ত বইয়ের লিষ্ট আমি তাড়াতাড়ি পাঠাবো। আমি এত লেখা সত্ত্বেও পুরো নাম ঠিকানা কারুরই প্রায় থাকে না—এতে কাজের অসুবিধা ও অনর্থক দেরী দুই হয়। অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে লিখতে গেলে বহু দেরী হয়। তোমার প্রশ্নের উত্তর ঃ—যেটা লোকে

বলেন সেটাই ঠিক ভাই। **যশোধন ভট্টাচার্য্য** (বিষ্ণুপুর) ১২০৯—লেখনী বন্ধুর কথা আগেই জানিয়েছি ভাই, সেই মত কাজ করলেই পাবে। **সুধীরকুমার সরকার** (রাজবাড়ী) ১৭০৪—ধাঁধাঁর উত্তর, গল্প, কবিতা যা কিছু পাঠাবে সম্পাদক বা পরিচালক মহাশয়ের নামে রংমশাল অফিসে পাঠাবে। এখন প্রেস আর অফিস একই স্থানে হয়েছে। **অমিয়া** (পুরুলিয়া) ১২৯১—তোমার তারিখবিহীন চিঠিখানি কবেকার বুঝতে পাচ্ছি না, তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও আমার নিমন্ত্রণ—এ পড়ে কে না খুসী হবে বলো তো বোন? গল্প বা যে কোনও লেখার বিচারক আমি হলে খুসী হতে পারতুম—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কিছুতেই তা দেবেন না—কেননা—তোমরা অর্থাৎ আপনার লোকের লেখার বিচার করলে নাকি তোমরা ছাড়া রংমশালে আর কেউ লিখতে পাবেন না—যাঁরা বড় লেখক, এই কথা পরিচালক মশাই বলেছেন। তবে লেখা ভাল হলেই প্রকাশ করা হয়—এটা ঠিক। **অশোক মুখোপাধ্যায়** (নিউদিল্লী) ১৫১৫—সত্যিই খুব সুখী হয়েছি ভাই তোমার Matric এর রেজাল্ট শুনে। তোমার লেখনীবন্ধু উপরোক্ত নিয়মে লিখলেই পাবে। দুঃখ করবার কি আছে—পারলে না—পরে এক সময়ে উৎসবে যোগ দেবে। **পুষ্প সিংহ** (রাঁচী) ১৫৩৩—তোমার ষ্ট্যাম্প পাঠানর পর বিনীতায় ঠিকানা আমি তোমায় পাঠিয়েছি, কেন পাওনি? আশ্চর্য্য! রেখার ঠিকানা পাঠান হচ্ছে। গল্প'র কথা—সময়েই জানতে পারবে, অপছন্দ হলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প থাকলে ফেরৎ যায়—নচেৎ তা নষ্ট করা হয় ভাই। **লালমোহন ভট্টাচার্য্য** (কালীঘাট) ১৫৮৬—নিয়ম কি আছে? যারা গ্রাহক গ্রাহিকা তারাই লেখে। নিশ্চয় তোমার ভাইবোনেরা তোমায় সাদরে ডেকে নেবে ভাই। **অরুণকুমার** (গৌহাটী) ১৪৪৭—তোমার রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়ের ঠিকানা আমি জানি না তাই দিতে পারবো না। **বিমলকুমার দত্ত** (মেদিনীপুর) ১৩৫৬—আমাতে আর ইন্দিরা'দিতে তফাৎ জিজ্ঞাসা করেছ—তিনি ইন্দিরাদি আর আমি হচ্ছি আমি—অর্থাৎ দিদিভাই। **সুধারাণী মৈত্র** (বিলাসপুর) ১৬৯৭—তোমার দু'টী সুন্দর চিঠিই এসেছে ভাই। রংমশালের সঙ্গে পরিচয় তো পাকা হয়ে গেল। **শান্তিপদ রায়** (গয়া) ১৫১৫—তোমার ইচ্ছা রংমশালে একটা গবেষণা বিভাগ খোলা হয়—গাছগাছড়ার গুণ ইত্যাদি নিয়ে। অভিমতটা খুবই ভালো—তবে বর্ত্তমানে এটা সম্ভব হবে না বোধহয় কারণ এর চেয়ে রংমশালের কলেবর বাড়ান উপস্থিত চলবে না—তার জন্য চেষ্টা করবো। **সন্ধ্যা সিংহ** (রাঁচী) শিবানী সিংহ অনেকদিন চিঠি লেখেনি কি করে জানবো তার খবর? সেলাই নূতন ধরণের কিছু থাকলে লিখে পাঠাও ইন্দিরাদিকে বলে দেখবো। হ্যাঁ সেলাই প্রসঙ্গে ইন্দিরাদি তোমাদের জানাতে বলেছেন—জ্যৈষ্ঠের রংমশালে তোমাদের যে ডিজাইন দেওয়া হয়েছে তা ভুল করে—ছাপা হয়েছে—১নং চিত্রটী হচ্ছে টেবিলক্লথের বর্ডার এবং সেটার রং নির্ব্বাচনের ভার তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর ২নং চিত্রটী টেবিলক্লথের বা বড় বালিশের ওয়াড়ের কোণে দেবার জন্য—সেটা সুতোর রং মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা সকলেই এ ভুল সংশোধন করে নিও। **বরুণ রায়** (জঙ্গীপুর) ১৬০৬—রংমশালের চাঁদা তোমরা সকলেই বাড়াতে বলেছ—এত কমে এরকম কাগজ দেওয়া কতখানি ক্ষতি স্বীকার করে তা যে তোমরা বুঝতে পেরেছ এই ভাল। অন্যান্য যা বলেছ সে কথা আলোচনা করে দেখবো। **হৃষীকেশ দে** (সিলেট) ৭৫৩—নিশ্চয় মিষ্টিমুখের আশা রাখতে পারো—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তোমার

প্রথম বিভাগে পাশ করার সংবাদে বুঝি রংমশালদলের নিমন্ত্রণ। রংমশালে থাকার কথা? মানুষ সব সময় বয়সে বুড়ো বুড়ো বলা চলে না। তোমাদের মন চির তরুণ থাকে—একথা আমি বার বার জানাই। **সাধনা সরকার** (গৌহাটী) ৭৬৫—গল্পের বিষয় উপরের চিঠিগুলো পড়লেই জানতে পারবে। গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা পছন্দমত হলেই প্রকাশ করা হয়—তাতে দলের সভ্য সভ্যার কথাই আসেনা ভাই। **অশোক চৌধুরী** (টাকী) ১৫২৯—তোমার দু'খানা চিঠি পেয়েছি। তোমাব চিঠি অফিসে পাঠিয়ে দিলুম—যদি থাকে অবশ্যই দেবেন—ষ্ট্যাম্প দিয়ে দাম পাঠালেই চলবে। **শৈলেন্দ্রকুমার দে** (গৌহাটী) ১৬২৪—যা, যা চেয়েছ সব জানিয়ে দেবো। কিন্তু নির্ভুল সম্বোধন হয়নি। **অসীমদেব গোস্বামী** (কলিকাতা) ১৬৮২—তোমার যাকে ভাল লাগল—তার ঠিকানা নিয়ে তাকে চিঠি পত্র লিখে আলাপ করলে ভাব হলো—সেই লেখনীবন্ধু হয় বুঝেছ? না, সম্পাদক হচ্ছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় আর পরিচালক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন। ভবদেব—রংমশালের গ্রাহক তোমাদের ভাই। **সুনীল** (দিল্লী) ১২৩০—তোমাদের পরীক্ষার খবরে খুব আনন্দ পাচ্ছি। ঠিকানার ব্যবস্থা করলাম। **সুজিত রায়** (নৈহাটী) ১৩০৪—তোমার কথা সব বলবো। তোমাদের প্রত্যেকের চিঠির সবটুকু আমি পড়ি—সুতরাং ভাবনা নেই। আবিষ্কার ঠিক হয়নি অতএব কানমলা ছাড়া আর কি আশা করো? তুমি তো তাই চাইছ দেখছি। **গোপেশ্বর লহরি** (শান্তিপুর) ১৬৭০—তোমার চিঠি সব পড়েছি কিন্তু পৃথক ভাবে তো উত্তর দেওয়া হয় না ভাই। তোমার নিজের ভাইবোন নেই বলে অত দুঃখ করেছ—কিন্তু বাংলা দেশের এত ছেলেমেয়ে এদের তুমি ভাই বোন বলে গ্রহণ করতে পার না? **সন্দীপ** (বেনারস)—না, আমি চটবো না—দেখনি কি এর আগে কত গালাগালি এবং কত বিদ্রূপ হজম করে বসে আছি—আমি মনে করি তোমাদের স্নেহ করে ভালবেসে যদি ঐ পুরস্কার তাই পরম লাভ সুতরাং নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারো সব। **মদনলাল সবাঙ্গী** (গোপালগঞ্জ) ১৭৯৫—লেখনীবন্ধু পেতে হলে যা করতে হবে তা জানিয়েছি আগে। **জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়** (মজঃফরপুর) ৯৩৭—তোমায় ঠিকানা পাঠান হবে। **বিমল চক্রবর্ত্তী** (কানপুর) ১২০৫—রংমশাল ভাল হয়েছে সে আনন্দে ছোটভাইকে মারধোর সুরু করেছ? ব্যাপার তাহলে দেখছি সঙ্গীন। না, না ওরকম করলে আমরাই ভয় পেয়ে যাবো। **সাধনা মজুমদার** (চাঁইবাসা) ১৭৩২—আগের রংমশাল পড়লে ভবদেবের কথা জানতে পারবে। 'তুমি' বল্লেই ঠিক হবে। **বন্দনা ঘোষ** (জয়পুর হাট) ১৩৯৩—ঠিকানা পাঠাতে হলে যা করতে হয় তা করো—অবশ্য পাঠান হবে ভাই। **লীলা ব্যানার্জ্জি** (বালিগঞ্জ) ৪৮০—রংমশালের সব কথাই ওতে লেখা আছে দেখে নিও। নতুনে না পেলে পুরোণো দেখো। **নৃপেন্দ্রনাথ দাস** (জামসেদপুর) ১৪৯৩—গল্প? চিঠিতেই স্থান করতে পাচ্ছিনা—কি করে 'রূপকথা' শোনাই বল? শৈলেন্দ্র, শৈলেশ, সুধীন তোমাদের উত্তর পরের বার যাবে, আর স্থান নেই—রাগ করোনা। সকলে আমার প্রীতি ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের

দিদিভাই

নতুন ধাঁধা

১। পাঁচটি ছেলেমেয়ে যাদের নাম ফুল, চিনি, পুতুল, টাকা ও কলম—এদের মধ্যে একজন আর এক জনকে একটি করে উপহার দিল। উপহারের জিনিসগুলি হচ্চে—ফুল, চিনি, পুতুল, টাকা ও কলম। কিন্তু কোন ছেলেমেয়ে তার নিজের নামের উপহার দেয়নি বা নেয়নি এবং এমন কেউ কাউকে উপহার দেয়নি যার কাছ থেকে সে কোন উপহার পেয়েছে। ফুল যে উপহার পেল সে উপহারটি হ'ল যে কলম-উপহার দিয়েছে তার নাম; কলম ফুল-উপহার দিল একজনকে যে পুতুল-উপহার দিয়েছে আর একজনকে। চিনি কলমকে একটা উপহার দিল, পুতুল উপহার পেল চিনি।

এখন বল—কে কাকে কি উপহার দিল?

২। তিনটি ছেলের বুদ্ধির পরীক্ষা হচ্চে—তাদের নাম ক, খ ও গ। প্রত্যেকের কপালে একটি করে ক্রশ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে বলা হ'ল—চিহ্নটা হয় নীল নয় সাদা। তারপর, আয়না নেই এমন একটা ঘরে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল ও বলা হ'ল কেউ যেন কোন কথা না বলে। কেউ জানে না তার নিজের কপালে কি রংএর চিহ্ন আছে। এখন, প্রত্যেককে বলা হ'ল সে যদি অন্য তুজনের কপালে সাদা ক্রশ চিহ্ন দেখতে পায় বা নিজের কপালে কি রংএর চিহ্ন আছে বুঝতে পারে সে যেন তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। যে প্রথম বেরিয়ে আসবে তারই জিৎ। এখন ক ছিল একটু বেশী চটপটে যেই সে দেখলে খ ও গ তুজনেরই কপালে নীল চিহ্ন রয়েছে, সে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার নিজের কপালে কি রংএর চিহ্ন আছে ঠিক বলে দিলে।

এখন বল তো ক'এর কপালে কি রংএর চিহ্ন ছিল ও কেমন করে সে তা বুঝতে পেরেছিল?

(উত্তর পাঠাবার শেষ দিন ২৫শে শ্রাবণ)

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

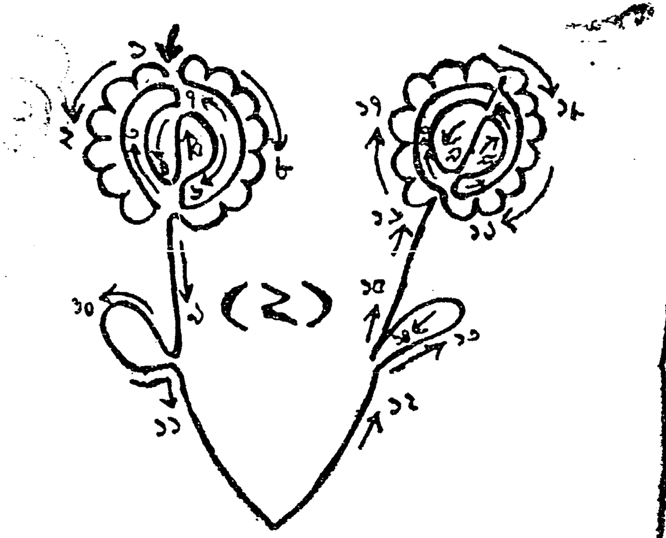
(২)

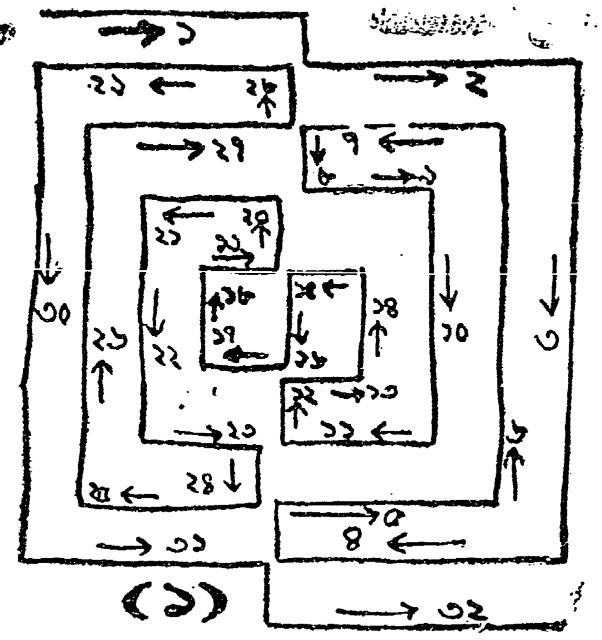
(১)

ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

যাদের তুটি উত্তরই নির্ভুল হয়েছে ঃ—

বাবু, আলিপুর; গৌরী চ্যাটার্জ্জি, কলিকাতা, হনী বনী, আলিপুর; যুগোলকিশোর ভট্টাচার্য্য, আলিপুর; অশোক, অজয়, অরুণ, নূপুর দাসগুপ্ত, চন্দ্রদ্বীপ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর; মায়া ও খুকু. পাটনা; শাপ্তি, কান্তি, টুকেন, হারু, পিরু, ইরা, হীমু গয়া; স্থখেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও তুষারকণা দেবী, বড়বেলুন; অরুণকুমার রায় ভবানীপুর; বাবু বোস, বালিগঞ্জ, শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বালিগঞ্জ; বি এ ক্লাব, বানীতলা; উলুবেড়িয়া; বেণুবালা চক্রবর্ত্তী, রাজসাহী; নিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান; স্থনীলচন্দ্র ঘোষ, দিল্লী।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর—(১) বাঁ দিকে দোর (২) কামান (৩) বর

বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

BLOCKS ENGRAVED & PRINTED BY

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৪৮

শরৎ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এস আমার মেঘপারের উদয়-আলোর জলছবি!
রূপোলীর রাজকুমার! চির সোনার দেশের কবি!
কাশফুলের কলম দিয়ে বর্ষা-ধোয়া সবুজ পাতে
লিখে যাও কবিতাটি শিউলি-ফোটা জ্যোৎস্নারাতে!
শঙ্খ তোমার ধ্বনিয়ে তোল রাতপোহানো সাগরতীরে,
অঞ্জলিতে ভরে দিতে আগমনীর রথখানিরে!
বিজয় পথের উজল বাণী যত আরো পার, দিও,
ব্যথা রাশির বাঁশী যেথায়, দিও হাসি শারদীয়!

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"তারক ব্রহ্ম রাম-নাম অপার মহিমা,
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা—"

—বলে চাঁইবুড়ো মহাবীরের পুঁথি খুল্লেন! মাম্‌চী চাম্‌চী খাম্‌চী আর খেম্‌চি সবাই যেন বেদান্ত বাগীশ, সিদ্ধান্ত বাগীশ, দৃষ্টান্ত বাগীশ, বৃত্তান্ত বাগীশ, চুড়ান্ত বাগীশ, সারে সারে চুড়ো ভাঙ্গা জোড়া-পেঁপে-তলায় বসে গেল থির গম্ভীর হয়ে কথা শুনতে। পুঁথি পাঠ সুরু হল ঃ—

"দেখতে যেন হনু—মুখটে পোড়া পোড়া,
আলি আঁধারেতে বুড়ো না ছোঁড়া !!"

জামীর গাছতলে জাম্বুবান হটাৎ ঘুম ভেঙ্গে এই কথা বলতেই, হনুমান জবাব করলেন—'হা রাম রাখতে বানর জেতের মান, সাগর ডিঙ্গালাম, লঙ্কা জ্বালালাম, পোড়ায়ে আলাম রাঙা মুখ, তারাই বলছে মুখপোঁড়া এই বড় দুখ !' তখন জাম্বুবান তাড়াতাড়ি উঠে হনুমানকে আলিঙ্গন করে বললেন,

"তুহুঁ বীর হনুমান বুদ্ধির সাগর
মুহিঁ মুরখ জাম্বুবান উদর ডাগর।"

এই না শুনে দলে দলে বানর হনুকে দেখতে উপস্থিত ঃ—

হনুমানে দেখিবারে আইল বানর।
সবে বলে, ধন্য ধন্য পবন কোঙর—রাম কার্য্যে মহাবীর বড়ই তৎপর !
সংবাদ শুনিতে অঙ্গদ কুতুহলী—হাত ধরি বসায়ে করে কোলাকুলি
জাম্বুবান বলেন, কহ সবিশেষ সমাচার—রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার।

হনুমান বল্লেন, "পরে হবে সে কথা, আগে চল রামচন্দ্রকে সব জানকীর খবর দিই।"

সুগ্রীব বল্লেন,

"গোঁসাই শয়নে আছেন পর্ব্বত গুহায়
এমতকালে ডাক দিতে নাহিক জুয়ায়।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোঁসাই
দূর্ভিক্ষ্য পড়িবে দেশে ইথে সন্ধ নাই।"

তখন হনু সভাস্থলে বল্লেন—

"'জয়রাম লঙ্কাধাম' বলে দিলেম তো একটা লম্ফ, তারপরেই দেখি মাঝ সমুদ্রে বিরাট এক বাস স্তম্ভ !! স্তম্ভটা চায় ঘাড়ে পড়ে বেঁকে! আমি নিরুপায়, রেগে একটি মুষ্টাঘাৎ—বস্ স্তম্ভ দোফাঁক হয়ে ধস্ জলপ্রপাত। আগালাম নির্ব্বিবাদে। একটু বাদে দেখি, পর্ব্বত মৈনাক শুশুকবৎ আকাশে তুলে নাক্! ঢুকলেম নাকের ছেঁদায়, বার হলেম কর্ণ পথে, তলালো পাহাড় লেজের ঠেলায়। লঙ্কার সিংদুয়ারে সিংগী মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকছে। সিংগীর ডাক শুনেই বুঝলেম সেটা সিংহল বন্দর। আঙ্গুলের ঘায়ে তারা গেল তল মশক সমান। তারপরেই দেখি সামনে লঙ্কা গড়। গড়ের দুয়ারে দেখি ডালি হাতে খাণ্ডা-দক্ষিণাকালী উগ্রচণ্ডা-প্রচণ্ড, দেখেই ভয়ে পেট গড় গড়, লেজ নড়বড়, ভরসা যেয়ে ফরসা হয় কর্ম্ম। সিন্দূর কপালে ভরা, করতলে চিক্কুর খাঁড়া, রাঙা খাড়ু, জবা মালা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি ! হাড়িয়া মেঘের মতো এক হাঁক দিতে 'মা ভৈঃ,' বস্ আর আমি আমাতে নই—ছিলেম হাতির প্রমাণ হলাম মাছির সমান ! 'জয় রাম' বলে বগলার বগল গলে পগার পারে প্রস্থান রাক্ষসপুরে বেলা থাকতে অল্প ! ঝাড়া একটি ঘণ্টা ফিরে দেখলেম—লঙ্কার বাজার না রাবণের দেখা, না সীতার।"

জাম্বুবান বল্লেন, "তারপরে ?"

"—তারপরে, অস্ত গেল ভানুমান, বেলা অবসান, খিদায় পেট আনচান, চক্ষু দেখছে আম জাম। সেইকালে রাবণের ভোজনাগারে প্রবেশ করল্যাম। সে স্থানে দেখি কাঁচা পাঁঠার মুড়ো নানা পশুর মাংস ভাজা, তায় লঙ্কার গুঁড়ো। পেলে খাই যদি পাই কাঁচাপাকা ফল, ফল না দেখিয়া বানর হলাম বিকল ! 'রাম রাম' বলে সে স্থান ত্যাগ করে গুটি গুটি প্রবেশ অন্দরে। অন্তঃপুরে সীতার না পেয়ে উদ্দেশ, অশোক বনেতে গিয়া করলাম প্রবেশ।

সোনার ফুলে ফুলময় অশোক কানন—
না শুনি পাখির গান ভ্রমর গুঞ্জন।

পাঁচীলে বসিয়া আমি ভাবি মনে মনে—
অন্বেষণ করিতে হইবে এই বনে।

দুপুর রাত হয়েছে তখন, চাঁদ উপর গগন, মন্দ মন্দ হাওয়া লাগে গায় সুশীতল, এমন সময়ে দেখি রাক্ষসীর দল :

এড়ি বেড়ি চেড়ী সব দেখতে ভয়ঙ্কর—হাত পা গুলা যেন লোহার মুদ্গর।
আউদর চুল কারো, মাথা জুড়ি নাক্ ; কাঁকলাস মূর্ত্তি কারো, কপাল জুড়ি টাক্।
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি ; ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব দেখে ভয়ে মরি !
তার মাঝে দেখি নারী মলিনা দুর্ব্বলা,—দ্বিতীয়ার চন্দ্র কিবা হেম কলা।
'শ্রীরাম' বলিয়া নারী ছাড়িতে নিঃশ্বাস, সীতারে চিনিয়া পেলাম আশ্বাস।"

এই কথা হচ্ছে, এমন সময় রাম এসে বল্লেন,

"সত্য কহ হনুমান দেখেছো সীতাকে
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে প্রাণ থাকে।"

তখন হনুমান রামের চরণে গড় করে জোড় হাতে বল্লেন,

'দুপ্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে, অশোক বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে।
ধীরে ধীরে আগুসরি করিনু প্রণাম, নিজ পরিচয় দিয়া কহিলাম নাম।
তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করিনু অর্পণ। নিদর্শন পেয়ে সীতা করেন রোদন।
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী—সীতার মাথার সিঁতি লও রঘুমণি।'

সিঁতি পেয়ে রঘুমণি বল্লেন,

'ধন্য মহাবীর ধন্য হনুমান,—ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান !
অন্য কি প্রসাদ দিব—লহ আলিঙ্গন, ইহা বলি কোল দেন কমল লোচন !

হনুমানকে কোল দিয়ে রাম তো যান শয়নে, তখন জাম্বুবান বল্লেন,—

"হনুমান কহ সবিশেষ সমাচার
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার।"

হনুমান বল্লেন,

'কহিব সকল কথা পরে যথা স্থানে, এখন ভাই শান্ত কর ফলজল দানে।
একশত যোজন সাগর পাথার—অনেক কষ্টেতে আমি হয়ে এলাম পার।'

এই বলে চাঁই বুড়ো পুঁথি গুড়িয়ে উঠলেন।

ক্রমশঃ

সংলাপী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান বিশেষত্বগুলি এত-বেশী স্পষ্ট যে, বাংলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে তার মোটামুটি পরিচয় দেবার কোনই দরকার নেই। তবে এ-কথা সত্য যে, আর্ট ও সাহিত্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবে দেখে বহু আলোচনার অবসর আছে। কিন্তু সেজন্যে প্রচুর সময়ের দরকার—আমার হাতে যা নেই।

তোমাদের কাছে আজ আমি আর একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার চেষ্টা করব। আজ কয়েক যুগ ধ'রে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা-রত্নের সঙ্গে জনসাধাণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন হয়েছে। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব ছিল, বাইরের পৃথিবী যার কোন খবর রাখবার সুযোগ পায়নি।

তাঁর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, সংলাপ-পটুতা! সংলাপ বলতে এখানে সাধারণ এলোমেলো কথাবার্ত্তা বোঝাচ্ছে না। ইংরেজিতে যাকে বলে conversation, সেটি হচ্ছে একটি উচ্চ-শ্রেণীর আর্ট। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক ডাঃ জনসন্ ও কবি কোলরিজ এবং জার্ম্মানির সাহিত্য-সম্রাট গেটে প্রভৃতি এই শ্রেণীর conversation বা সংলাপের জন্যে অমর হয়ে আছেন!

এদেশেও আমি কয়েকজন অসাধারণ সংলাপ-পটু ব্যক্তির সঙ্গে অনেকবার আলাপ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি। যেমন, স্বর্গীয় নাট্যকার অমৃতলাল বসু এবং বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি।

এবং বহুবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ-প্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়ে বুঝেছি যে, সংলাপে তিনি ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়। ডাঃ জনসন্ আজও পৃথিবীর মধ্যে এতটা সুপরিচিত হয়ে আছেন, তাঁর রচনাশক্তির জন্যে নয়। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের পাঠকরা তাঁর লিপিকুশলতার কোন খবরই রাখেন না। কিন্তু ভাগ্যে তিনি বস্ওয়েলের মতন অনুগত নিত্য-সহচর পেয়েছিলেন, তাই তাঁর জীবনচরিতে প্রকাশিত অপূর্ব্ব সংলাপের মধ্যেই তিনি আজ সারা পৃথিবীর বাসিন্দাদের সম্ভাষণ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন নি।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ এমন কোন বস্ওয়েলকে লাভ করেন নি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে জগতের কত শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য শ্রেণীর বিখ্যাত গুণীর সঙ্গে কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি কত না উপভোগ্য ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লিখে রাখবার মতন লোক যদি রবীন্দ্রনাথের পাশে বর্ত্তমান থাকতেন, তাহলে আজ অনায়াসেই প্রমাণিত করা যেত যে, সংলাপেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন

বর্ত্তমান পৃথিবীর মধ্যে হয়তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এমন কি, লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলে, রবীন্দ্রনাথের সেই বিরাট সংলাপ-গ্রন্থ তাঁর নিজের হাতেরসৃষ্ট বিখ্যাত ও অমর সাহিত্যের পাশে কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়ত না।

সংলাপ যে কতখানি উচ্চস্তরে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার আগে আমার সে ধারণাই ছিল না। বলবার গুণে সাধারণ কথাগুলিও তাঁর মুখে হয়ে উঠ্‌ত অত্যন্ত অসাধারণ। আবার তিনি যখন সহজ ভাবেও কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তখনও তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই ঝ'রে পড়ত আর্ট ও সাহিত্যের অজস্র সৌন্দর্য্য।

আমি এমন কয়েকজন সংলাপ-নিপুণ বিখ্যাত গুণীকে দেখেছি, যাঁদের আলাপ মূল্যবান হ'লেও শোনাত অনেকটা উপদেশের মত। তাঁরা নিজেরাই অনর্গল কথা ব'লে যেতেন, কিন্তু শ্রোতাদের কারুকে মুখ খোলবার অবকাশ দিতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-শ্রেণীর সংলাপী ছিলেন না। আমার বেশ মনে আছে, ৩৪।৩৫ বৎসর আগে প্রথম যেদিন রবীন্দ্র-নাথের সামনে উপস্থিত হই, তখন বালক-সুলভ মুখরতা ও চপলতার মহিমায় তাঁর সঙ্গে বহু বাক্যব্যয় করতে সাহসী হয়েছিলুম। কিন্তু সেই অপরিচিত ও প্রায়-বালক আমার প্রতিও তিনি এতটুকু অবহেলা প্রকাশ করেন নি। আমার নির্ব্বোধ প্রশ্ন শুনেও একবারও তাঁকে অধীর হ'তে দেখিনি। বরং মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখে এমন ভাবে তিনি তাঁর বাক্য-মাধুরী প্রকাশ করেছিলেন, যেন আমি তাঁর সমবয়সী ও সমকক্ষ ব্যক্তি! সেদিনের কথা স্মরণ হ'লে আজও আমার লজ্জা হয়।

সেদিনকার আরও একটা কথা মনে হ'ল। একই বিষয়কে সোজা ও উল্টো দিক্ দিয়ে দেখবার ও দেখাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত! অধিকাংশ ব্যক্তিই এক একটি বস্তুকে কেবল একদিক দিয়েই দেখতে পারে। অন্তত ভাববার সময় না পেলে একটি বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করতে গেলে তারা বক্তব্য বিষয়ের খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে-কথা বলতে পারা যায় না।

মনে আছে সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য-চিত্রকলা নিয়ে তর্ক করবার চেষ্টা ক'রে-ছিলুম। স্মরণ হচ্ছে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র সেন। তিনিও তখন বালক। সে সময় সবে প্রাচ্য-চিত্রকলার নবজীবন সুরু হয়েছে; এবং অনেকের মতন আমিও ছিলুম তার একজন গোঁড়া ভক্ত।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এবং তোমরাও জানো বোধ হয়, প্রাচ্য চিত্রকলার সেই নূতন আন্দোলনের মূলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূর্ত্তিমান প্রেরণার মত। সুতরাং তিনিও যে প্রাচ্য চিত্রকলার একান্ত অনুরাগীই ছিলেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু প্রাচ্য-চিত্রকলা নিয়ে আমার অতিরিক্ত মুখরতা, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস দেখে তাঁর

মনের ভিতরে জাগল বোধ হয় কৌতুকের ইঙ্গিত! তিনি এমন ভাবে আলোচনা আরম্ভ করলেন যে, আমি তাঁকে প্রাচ্য-চিত্রকলার একজন বিশিষ্ট শত্রু ব'লে সন্দেহ না ক'রে পারলুম না। ফলে, ক্রুদ্ধ হ'লে অনেক তার্কিকেরই যেমন দশা হয়, আমারও তাই হ'ল। মনে মনে চ'টে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি এমন সব কথা ব'লেছিলুম যা নিতান্তই বালকোচিত ও যুক্তিহীন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ'লেন না, সেই মধুর মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখেই এমন সুন্দর ভাবে প্রাচ্য-চিত্রকলার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাতে লাগলেন যে, আমার পক্ষে মুখ বন্ধ করা ছাড়া মুখরক্ষার অন্য উপায় রইল না।

রবীন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর ভাবে আলাপ করতেন না এবং তাঁর সংলাপ হ'ত প্রায়ই নির্ম্মল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। অথচ তাঁর খুব লঘু হাসির ভিতর দিয়েও প্রকাশ পেত না এতটুকু কুরুচি। তাঁর আটপৌরে ঘরোয়া কথাগুলির মধ্যেও থাকত সাবলীল আর্টের ছোঁয়া এবং হাসির আলোয় সেগুলি করত নির্ঝর-ধারার মতন ঝিল্‌মিল্।

দার্শনিক-সুলভ গাম্ভীর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন না হ'লেও রবীন্দ্রনাথের মুখ-চোখ ও ভাব-ভঙ্গির ভিতর দিয়ে এমন একটা গভীর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত যে, পরিণত বয়সেও তাঁর কাছে যেতুম রীতিমত ভয়ে ভয়ে। বৃহৎ জনতার মধ্যেও এই ব্যক্তিত্ব তাঁকে আর সকলের কাছ থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখত।

সংলাপের আসরে মাঝে মাঝে আর-একটি আশ্চর্য্য শক্তির দ্বারা সকলকে তিনি ক'রে দিতেন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। কেউ গল্প শুনতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখেই চমৎকার সব গল্প ও উপন্যাসের প্লট বা আখ্যানবস্তু রচনা করতে পারতেন! আমরা ক্ষুদ্র লেখকের দল, উপন্যাস লেখাই আমাদের পেশা, কিন্তু এ সত্য আমরা জানি যে, প্রত্যেক উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করবার জন্যে কত দিন ধ'রে কত কাঠ-খড় পোড়াতে ও যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মন যেন ইচ্ছা করলেই গল্প ও উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারত, এ-শক্তি আর কোন লেখকের ছিল ব'লে শুনি নি! আমার স্বর্গীয় বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর কয়েক খানি উপন্যাসের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন।

সংলাপের আসরে বারংবার রবীন্দ্রনাথের মতন মহামানবকে নিজেদের মাঝখানে পেয়ে জীবন সার্থক করেছি। এ-সম্বন্ধে অনেক গল্প বলতে পারতুম, কিন্তু এখন আমার গল্প বলবার মত মনের অবস্থা নয়। এই মহাদুর্ভাগ্য কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, রবীন্দ্রনাথের মতন সর্ব্বশক্তিমান অভিভাবককে হারিয়ে আর্ট ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কতটা অসহায় হয়ে পড়েছি! স্রষ্টা চ'লে গেলেন মহা-অজানার অন্ধকারে, প'ড়ে রইল তাঁর সৃষ্ট আধুনিক বাংলা সাহিত্য। যে সৃষ্টির কাজ বন্ধ হ'ল, তা এই ভাবেই আরম্ভ করবার লোক হাজার বছরেও আর আসবার সম্ভাবনা নেই। এই শোক-দুঃখের দিনগুলি হচ্ছে চোখের জলে নীরবে বুক ভেজাবার দিন।

লোক-দেখানো সভার আয়োজন ক'রে শ্রদ্ধাপ্রকাশে আমার আস্থা নেই! চিরসাধক রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা আদর্শকে আমাদের জীবনে যদি চির-জাগ্রত রাখবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করতে পারি, তবেই তাঁর আত্মার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে।

ছেলেদের গান

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

জলে রোদের ঝিকিমিকি
হাওয়ায় ফোলে পাল,
গহীন গাঙে ডিঙা বেয়ে
আমরা ফেলি জাল।

ফুল কোথা যার নাই ঠিকানা
সেই দরিয়ায় দিলাম হানা
ভয় করিনা আসুক তুফান
হই হ'ব বাণ্‌চাল।

নইক শুধু মাছের কাঙাল
রুই কাৎলা চিতল বোয়াল—
মুক্তো মাণিক আনব তুলে
লুট করে পাতাল!

ছবি

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

যখন ছোট ছিলুম তখন কেউ ভালো ছবি আঁক্‌লে প্রশংসা পেতুম এই ধরণের—"বাঃ, বেশ ছবি এঁকেছিস্ ত? ঠিক যেন ছাপা মনে হচ্ছে!" এই ধরণের প্রশংসা এখনো অনেকে ক'রে থাকেন কিন্তু খুব ভালো ক'রে যদি ভেবে দেখ ত' বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, ওটা খুব চমৎকার প্রশংসা নয়!

ছাপা ছবিগুলো আসে কোথা থেকে? আমি আলোক-চিত্রের কথা বল্‌ছি না। আলোক-চিত্র ত' যন্ত্রের সাহায্যে কল টিপে তোলা যায়! রং তুলি দিয়ে—কিম্বা পেন্সিল দিয়ে কোনো বইয়ের ছাপা ছবি দেখে নয়—মন থেকে কিম্বা কোনো দৃশ্য দেখে যে-ছবি আঁকা—সেই ছবির কথা বল্‌ছি। ছাপা ছবিগুলো ত' কারুকে আঁক্‌তে হয়েছে—নয় কি? তারপর তার থেকে ব্লক ক'রে ছবি ছাপা হচ্ছে। ছাপা ছবি যতই ভালো হোক্, হাতে আঁকা ছবিটার চেয়ে ভালো ত' হতেই পারে না!

যাক্, ছবি আঁক্‌তে ছোটবেলা থেকে সবাই চেষ্টা করে। তোমরা কেউ হয়তো বল্‌বে—"আমি কখনো ছবি আঁকি নি—আঁক্‌তে পারিও না।" মোটেই বিশ্বাস কর্‌বো না তোমাকে। তুমি যখন ছোট ছিলে—'কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং' কত যে তোমার বাবার, কাকার কিম্বা মামার ভালো সাদা কাগজ নষ্ট করেছ—সে কথা তুমি ভুলে গেছ! আর সেই যে

দাঁত মাজ্‌বার খড়ি দিয়ে সমস্ত বাড়ীর মেঝেতে হিজিবিজি কেটেছিলে ? আর স্কুলের দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে একটা মানুষের মাথা (মানুষেরই ত ?) আঁকার জন্য বকুনি খেয়েছিলে ? এমন মানুষ বোধ করি নেই যে ছবি আঁকেনি বা আঁক্‌তে চেষ্টা করেনি। যারা লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে না, তারাও কাঠি দিয়ে মাটিতে কিছু এঁকেছে গল্প কর্‌তে কর্‌তে কিম্বা এক্‌লা অন্যমনস্ক হ'য়ে ! আমি জানি তুনিয়ার অনেক বড় বড় লোক যাঁদের পেশা ছবি আঁকা নয়—তারাও অন্যমনস্ক হ'য়ে অনেক সময় ছবি এঁকে ফেলেন কাগজে কিছু ভাব্‌তে ভাব্‌তে।

মৌলবি সাহেব — আমিনুদ্দিন (বয়স দশ)

ছবি আঁকাটা কিছু অসাধারণ নয়, কিন্তু একটা ভারী মজার জিনিষ লক্ষ্য করেছি। কাগজ পেন্সিল, এমন কি সুন্দর একটি রবার দিয়ে যদি কারুকে বলা যায়—"আঁক ত' দেখি এক খানা ছবি।" ব্যস্‌, সেরেছে—তুনিয়ার এতো জিনিষ—এতো সুন্দর দৃশ্য, এতো জন্তু-জানোয়ার—ফলফুল লতাপাতা, এমন কি ঘরের চেয়ার টেবিল কিছুই আর মাথায় আসে না ! আকাশ পাতাল কত কিছু ভেবেও কূল-কিনারা নেই ! সাদা কাগজটার একটা পেন্সিলের আঁচড় কাট্‌তেই পার্‌লে না ! কাগজটাকে দেখে ভয় লাগে—পেন্সিলটা হাত থেকে ফস্কে যায় ! তারপর ভেবেচিন্তে যদি বা ঠিক করা গেল কি আঁক্‌বো—একটু পেন্সিলের আঁচড় দিয়েই মনে হয়—ভুল হ'য়ে গেছে—সাদা কাগজটা শুধু শুধু-ই নষ্ট হ'ল ! কিন্তু কেন এমন হয় ? ভেবে দেখেছ কি ?

ধর তোমার 'ফাউন্‌টেন পেন্‌'টা নিখিল নিয়েছে—তোমার ভীষণ রাগ হয়েছে, তুমি নিখিলকে শিক্ষা দিতে চাও ওর নাকে একটা ঘুঁষি মেরে ! যদি তোমার সত্যিকারের সেই রকম শিক্ষা দেবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে তুমি সোজা নিখিলের কাছে গিয়ে একেবারে সময় নষ্ট না ক'রে তোমার ডান হাতে যত জোর আছে সমস্ত জোর দিয়ে ওর নাক লক্ষ্য

ক'রে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দেবে—নয় কি ? তা না ক'রে, তুমি যদি নিখিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াও ভয়ে ভয়ে—তারপর মনে কর্‌তে থাক যে, নিখিলের বোধ হয় গায়ের জোর বেশী, তারপর মনে হ'ল—যদি ঘুঁষিটা নাকে না লাগে !—যদি খুব জোরে লেগে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে !—ও যদি উল্টে তু'টো ঘুঁষি মারে। ব্যস্‌, তবে তোমার দ্বারা হবে না ঘুঁষি মারা !

ছবি আঁকাতেও তাই ! যদি তোমার মনে কোনো বিশেষ কিছু আঁকবার বিষয় এসে যায়—চট্‌পট্‌ সাহস করে যদি আঁক, তবেই আঁকা হবে—ভালো হবে কি খারাপ হবে—তা' অত ভাব্‌লে চলবে না !

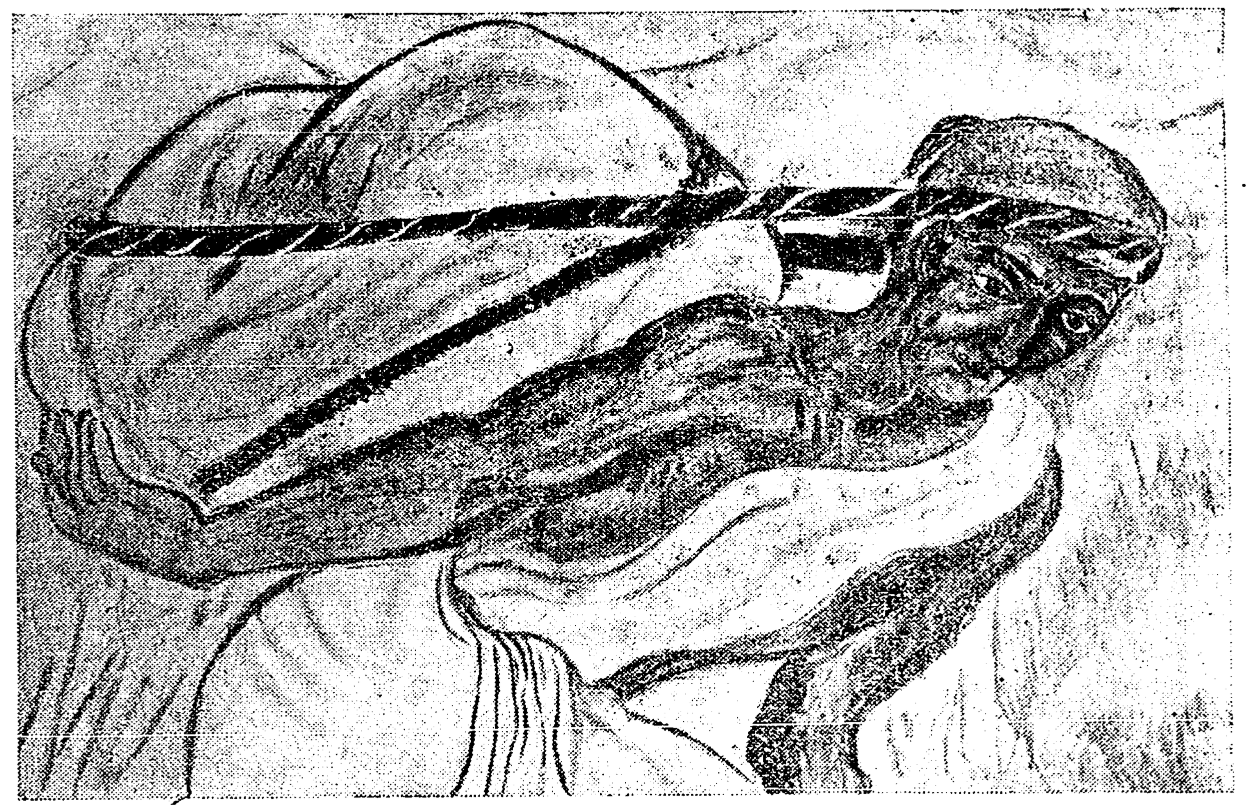

বোঝা — মহিউদ্দীন (বয়স বারো)

ছবি আঁকতে গিয়ে একটা জিনিষ বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, যা' তুমি খুব ভালো ক'রে দেখেছ বা জান মনে কর তা তুমি সত্যিই খুব ভালো ক'রে জান না ! মোট কথা সেটাকে এঁকে ফেল্‌তে পার যা এখন ভালো ক'রে জান না ! ধর তোমার শরীরটা। তোমারই ত শরীর— হাত পা আঙ্গুল চোখ মুখ নাক কান সবই তুমি জান—চোখে দেখেছ— আয়নায় হাজার বার মুখ দেখেছ অথচ এতো জেনেও আঁক্‌তে কেন পার্‌বে না ? তোমার হাতে ধর একটা পিঁপড়ে কামড়ালো, একটুখানি ফুলে উঠেছে মাত্র—অম্‌নি তোমার নজরে পড়্‌লো ! তুমি তোমার হাতটাকে এতো ভালো ক'রে জান যে একটুখানি ফুলেছে আর তোমার চোখে তা ধরা পড়্‌লো ! অথচ হাতটাকে একটা কাগজে আঁক্‌তে বল্‌লেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌বে !

এই সব কারণেই লোকে কথায় বলে 'সাধারণ দেখা' আর 'চিত্রকরের চোখ দিয়ে দেখা।' শিল্পী যখন যা' দেখে তা' মনে গেঁথে নিতে চেষ্টা করে এমন ক'রে, যা পেন্সিল কিম্বা তুলিতে সে প্রকাশ করবে যা' দেখেছে তাতে কল্পনার রং ফলিয়ে।

তোমরা অনেকেই স্কুলে পড়, এবং সে সব স্কুলে ছবি আঁকবার বন্দোবস্ত আছে। তোমাদের যাদের কপাল ভালো (মানে আমার যেমন কপাল তেমন নয়!) তারা হয়তো ভালো মতো মনের খুসীতে ছবি আঁক্‌তে পারছ স্কুলে। কিন্তু আমার স্কুল জীবনের দুর্দ্দশার কথা একটু বলি।

মজুর ১৪ বছরের ছেলের আঁকা

ছোটবেলা দু'টো জিনিষে আমার মন ছিল। এক হচ্ছে মাটি দিয়ে পুতুল বানানো খেয়াল খুসী মতো—খুব ছোটবেলায় মা যখন লুচী ভাজ্‌তে বস্‌তেন তখন মাখা ময়দা নষ্ট করেছি অনেক! খানিকটা মাখা ময়দা নিয়ে তাই দিয়ে পাখী সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি বানিয়ে আবার ভেঙ্গে আবার কিছু বানিয়ে—এমনি ক'রে যখন ময়দাটা হাতের ময়লায় কালো কুষ্টি আর শুকিয়ে ফেটে ফেটে যেতে সুরু কর্‌তো, তখন পুকুরের ধারে গিয়ে সেগুলো ছোট ছোট গোলা ক'রে টুপ্ টুপ্ ক'রে জলে ফেল্‌তুম—পুঁটি মাছ—চুনো মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সেগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগাতো। সে মজা মন্দ নয়। আরেকটা সখ ছিল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা রং দিয়ে ছবি আঁকা। আমার এক দিদি জন্মদিনে আমাকে একটি রঙের বাক্স দিয়েছিলেন, সেইটে যখের ধনের মতো আগলে রাখতাম—তার মধ্যে ছিল রং দশ বারো রকমের

রঙ আর দু'টো তুলি। কত যে কাগজ বাবার টেবিল থেকে নিয়ে রঙের পর রঙ লাগিয়ে নষ্ট করেছি! সেগুলি কি আর সব ছবি হ'ত—মোটেই নয়!

একদিন স্কুলে হ'ল এক কাণ্ড! ড্রইং মাষ্টারমশাই ছিলেন—রোগা পাতলা লম্বা। বড় ভয় করতুম তাঁকে! যদি রবার ড্রইং পেন্সিল কিম্বা খাতা আন্‌তে কেউ ভুলতো, তবে এমন জোরে পেটে উনি চিম্‌টি কেটে দিতেন যে, দু'চার দিন মনে থাকৃতো।

এতো যে ভয় কর্‌তুম তবু একদিন ড্রইংয়ের ঘণ্টায় বোর্ডের ছবিটা না এঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাতার পিছনের পাতায় আঁক্‌ছিলুম ড্রইং মাষ্টারমশাইয়ের রোগা পাতলা কাঠি চেহারাখানা! পাশের ছেলেরা তাই দেখে হাস্‌তে লাগলো।—মাষ্টারমশাইয়ের নজর পড়লো আমাদের দিকে। উনি আমাকে ডাক্‌লেন—খাতাটা কেড়ে নিয়ে দেখ্‌লেন, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে পেটে একটা জোরে ঘুঁষি বসিয়ে দিলেন! ভাগ্যি আমার, শরীরখানা নেহাৎ খারাপ ছিল না, কোনো রকমে সাম্‌লে নিলাম, কিন্তু সে স্কুলে আমার ছবি আঁকা ইতি হয়ে গেলো। ড্রইংয়ের ঘণ্টা যেদিন থাক্‌তো সেদিন আমার জ্বর জ্বর হ'ত—পেটে ব্যথা কর্‌তো, স্কুলে আর যাওয়া হ'ত না।

মোগল ছবি ১৪ বছরের ছেলের আঁকা

এর পর আরেক স্কুলের কথা! এখানে দেখ্‌লুম—ব্যবস্থা একটু ভালো! ড্রইং ছাড়াও কাগজ কেটে ছবি কিম্বা বাক্স ইত্যাদি তৈরী করা, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শেখানো হয়। আরেকটা বেশ নতুন জিনিষ এখানে ছিল। সেটা হচ্ছে, একটি হাতের লেখা মাসিক পত্রিকা, ছেলেরাই সম্পাদক, লেখক—কর্ম্মকর্ত্তা। মাঝে মাঝে কোনো কোনো মাষ্টার মশাইয়েরাও লিখতেন তাতে। আমার ছবি আঁকার (ক্লাশের ঘটি বাটি বোতল পেয়ালা নয়!) হাত থাকাতে পত্রিকাটিকে চিত্রিত করবার ভার আমার ওপর

পড়্‌লো। এইবার আমি আমাকে যেন খুঁজে পেলুম। এ কাজটাতে খুব পরিশ্রম করতে হ'ত কয়েকদিন প্রতি মাসে। মাষ্টারমশাই ও ছেলেরা আমার প্রশংসা করতে আরম্ভ করলো। আমি যে প্রশংসনীয় কাজ করতে পারি, এই প্রথম উপলব্ধি করলুম। এ যেন আমায় একটু উঁচু জায়গায় তুলে দিলে হঠাৎ। বুঝলুম, মন লাগিয়ে কাজ করলে ছবি আঁকা কেন, শক্ত শক্ত অঙ্ক জ্যামিতি কিছুই আর শক্ত থাকে না—একেবারে জল হয়ে যায়। ক্লাশের পড়াশুনাতেও হঠাৎ আমার উন্নতি হ'ল। এখন যখন ভাবি—তখন বুঝতে পারি ঐ হাতের লেখা মাসিক পত্রিকাটা আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে। নয়তো স্কুলের গণ্ডি পার হওয়া হয়তো আমার হ'ত না! এর পর চ'লে গেলাম শান্তিনিকেতন, জোর জবরদস্তী ক'রে। শান্তিনিকেতনের কথা আজকাল কে না জানে! এখানে এসে দেখলুম, সকলেরই বেশ সহজ, সরল, সাধাসিধা ভাব। পোষাক পরিচ্ছদের হাঙ্গামা নেই—জুতা না পরলেও চলে! খাবার

রাঁধুনী এম্, এম্, সোন্ধি (বয়স ১৫)

ঘণ্টা পড়্‌লে থালা বাটি নিয়ে খেতে যেতুম— খাওয়াও অতি সাধারণ— ডাল ভাত আর পটলের ঝোল।—তাই পেট ভরে খেতুম। গুরুদেব (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ওখানে সবাই গুরুদেব বল্‌তেন) ওখানেই থাকতেন, মাঝে মাঝে ইংরেজী ও বাংলা ক্লাশ নিতেন। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সবাই সময় পেলে সে ক্লাশে যোগ দিতো। জায়গাটায় আমার প্রথমটা কষ্ট হ'য়েছিল; খুব সকালে উঠতে—কাপড় কাচা, বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া সবই তখন করতে হ'ত! ওসব কাজে অভ্যস্ত ছিলুম না! ছবি আঁকা জোর চল্‌তে লাগ্‌লো। ওখানে গিয়েছিলুম, ছবি আঁকার সঙ্গে কলেজের ক্লাশও করছিলুম, ক্রমে এক একটা করে কলেজের ক্লাশগুলোতে যেতে ভুলতে আরম্ভ করলুম। শেষকালে লজ্জা-সরম একেবারে গেলো! কলেজের পড়াই ছেড়ে দিলুম। পরীক্ষার পড়াতে কি মন লাগে ছাই? ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া, আর যখন ইচ্ছা কলাভবন লাইব্রেরী থেকে দেশ-বিদেশের শিল্পবিষয়ক বই নিয়ে পড়া!—এর চেয়ে আর লোভনীয় কি হতে পারে বল?

ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া এই দুকাজ নিয়ে জীবন কাটাবো ঠিক করে ফেললুম। স্কুল কলেজ আর মাড়াচ্ছি না প্রতিজ্ঞা করলুম। বছর পাঁচ কাটলো এমনি ক'রে ছবি এঁকে মূর্ত্তি গড়ে'। তারপর সময় এলো নিজের পায় দাঁড়ানোর। কত ঘুরলুম, এদিক-ওদিক দেশ

বিদেশে বেড়ানোর সখ হল—কোথায় কত কি আছে দুনিয়ায় তার কি শেষ আছে? এক ভারতবর্ষেই এতো শিল্পের নিদর্শন ছড়ানো তা এক জীবনে ভালো ক'রে দেখে শেষ করা যায় না। এসব দেখতে গেলে চাই সুস্থ দেহ আর পাথেয়। ছবি বিক্রী করে' বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে কোনোরকমে চালিয়ে ভারতবর্ষ ঘুরছিলুম; দাক্ষিণাত্য ও সিংহল শেষ করে শেষকালে বোম্বাই গিয়ে পৌঁছুলুম—সেখানে কিছুদিন থেকে এলিফ্যাণ্টা গুহা দেখে অজন্তা, ইলোরা ঘুরে একেবারে ক্লান্ত। পয়সাও নেই। হঠাৎ কাগজে দেখি এক জায়গায় এক শিল্পী চায়। পাঠিয়ে দিলুম ঝাঁ করে এক চিঠি চাকরীপ্রার্থী হয়ে। কপালে ছিল সেই স্কুলেরই কাজ। আবার সুরসুর্ করে স্কুলে ঢুকলুম। এবারে ছাত্র ভাবে নয়, একেবারে মাষ্টারমশাই হয়ে!

স্কুলে পড়বার সময় ড্রইং ক্লাশে যে-কষ্টটা পেয়েছি, সে-কষ্টটা ছাত্রদের আর দিতে চাই না। কারণ এদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে কি হবে—পেতাম যদি তাঁদের—যিনি পেটে ঘুঁষি মেরেছিলেন কিম্বা যিনি ক্লাশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন—তবে হয়তো কি ইচ্ছা হ'ত বলতে পারি না।

আমার ছাত্রদের তাই ছেড়ে দিয়েছি একেবারে নিজের ইচ্ছেমতো চল্‌তে। আমি নিজের কাজ করি। তারা দেখে—কেউ আঁকে, কেউ ছবির বই দেখে। কেউ মাটি নিয়ে মূর্ত্তি গড়ে, কেউ কুমোরের চাকা চালিয়ে গেলাস, বাটি তৈরী করে। কেউ পাথর কাটে। যার যা ইচ্ছে, কিন্তু কিছু করা চাই এইটুকু কেবল আশা করি তাঁদের কাছে। তাদের সব রকম কাজের নমুনা দেওয়া গেল না, কেবলমাত্র এখানে তাদের আঁকা কয়েকটি ছবির নমুনা দেওয়া হ'ল। তোমাদের ছবিগুলি ভালো লাগুক আর নাই লাগুক এগুলি যারা এঁকেছে তারা এঁকেই খুব খুসী। ছবিগুলি দেখে আর কারুর যদি ভালো লাগে—সেটাত উপরি-পাওনা।

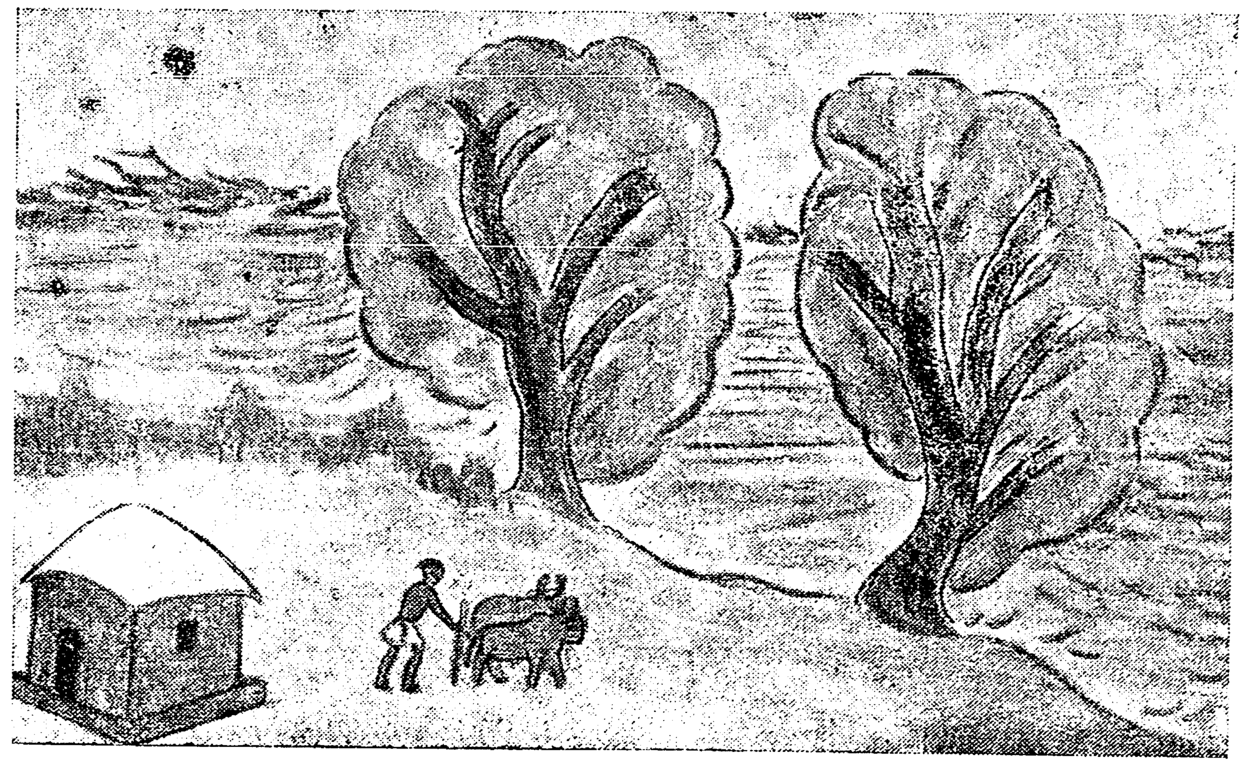

ল্যাণ্ডস্কেপ রবি সেন (বয়স এগার)

পাগলা গারদ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

"টপসীর মাথায়ই যত উদ্ভট বুদ্ধি খেলে, ওকে নিয়ে আর পারা গেল না"—বলতে বলতে টিচার সুলেখা-দি ড্রেসিং রুমে এসে ঢুকলেন। "কোথায় গেল দুষ্টুটা? হাড় জ্বালিয়ে খেলে একেবারে! মুখে সুলেখাদি যতই বিরক্ত ভাব প্রকাশ করুন না কেন, চোখদুটী তাঁর হাসছিল দেখে প্রণতি সাহস করে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি হয়েছে সুলেখাদি?"

"এই দেখ না টপসীর কীর্ত্তি। শান্তি সুধার পিঠে এক টুক্‌রো বরফ নাকি চালিয়ে দিয়েছে; সে এক কাণ্ড। পিঠ তার নাকি জমে গিয়েছে, সে বল্‌ছে আর কাঁদছে, আর ততোধিক কাঁদছেন তার পিসী, তার ভাইঝি'র নাকি ডবল নিউমোনিয়া হয়ে প্রায় অন্তিমদশা। অতএব ডাকো ডাক্তার। না ডাকি যদি তো আমার মত নিষ্ঠুর দুনিয়ায় নাই হব, আর ডাকি যদি তো ন্যাকামীর প্রশ্রয় দেওয়া হবে।"

অনিমা বল্ল, "টপসীই বা ওরকম কর্‌তে গেল কেন, জানেই তো যে অমন ন্যাকা দুনিয়ায় সহজে মেলে না।"

"দুর্ব্বুদ্ধি আর কি? শান্তির ন্যাকামী অসহনীয় হওয়ায় তাকে জব্দ কর্‌ল ঐভাবে। এখন খাক্‌ বকুনী পাক্‌ শাস্তি!"

প্রণতি ঠোঁট উল্‌টিয়ে বল্‌ল, "তাতে তো ওর বয়েই যাবে। দু মিনিট না যেতেই দেখবেন আর একটা কিছু করে বসে আছে। সে মেয়ে—"প্রণতির কথা শেষ না হ'তে হ'তেই টপসী এসে হাজির।

"সুলেখাদি, আমায় আপনি ডাক্‌ছেন? কেন?"—প্রণতি তো ওর নিরীহ মুখের দিকে তাকিয়ে "এই রে" বলেই পলায়ন আর সুলেখাদি ওর চুলের ঝুটী ধরে টেনে বল্লেন, "কেন? জানো না কিছুই; শান্তিকে কি করেছ?"

"ওর যে বড্ড গরম লাগছিল—পিঠ নাকি পুড়ে যাচ্ছিল, এত কষ্ট হচ্ছিল যে ও সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিল না, তাই অল্প একটু বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। বেশী নয়, সুলেখাদি, এই অল্প একটু—এতটুকু" ব'লে টপসী দুটী আঙ্গুল দিয়ে পরিমাণটা দেখাল।

"তাত বুঝলাম; এখন চল বকুনী খাবে।"

* * *

জানলার গরাদে ধরে টপসী উদাসভাবে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। তার শাস্তি হয়েছে, ডার্ম্মিটরির বাইরে যেতে সে পার্‌বে না বেলা চারটা অবধি। ছুটীর দিন বেচারীর বড়ই মুস্কিল। খানিকটা আমচুর মাথা পাতে জড়িয়ে আর খানিকটা আঙ্গুলের ডগায় চাট্‌তে চাট্‌তে মুকুল এসে উপস্থিত। "কিরে তোর হল কি?"

ভারী গলায় টপসী বল্‌লে, "শাস্তি হয়েছে ডর্ম্মিটরির বাইরে যেতে মানা।"

"খুব বকুনী খেলি?"

"হুঁ তা খেলাম খানিকটা বৈ কি! আর মিসেস সাহুর প্যানপ্যানানি কান্না শুন্‌লুম। তোমার আমরা কি করেছি টপসী—তুমি কি শানুকে একটুও, ভালবাস না ইত্যাদি।"

"তবে আজকের দুপুরটা কি মাটী হবে না কি? এই নে আমচুর মাখা তো খা।"

"এই ডর্ম্মিটরিতে সুশীলা সুবোধবালা হয়ে শুয়ে থাক্‌ব—আয় না।"

"না ভাই, তা হয় না। ও ধাতে আর সয় না।, তোরই তো জ্বালায় রে। সব্বাইকে তুই খারাপ করে দিয়েচিস্‌। এমনি রাগ হয় তোর উপর, ইচ্ছে করে গোটা মাথাটা তোর কাঁচা কচমচিয়ে চিবিয়ে খাই।"

"আহা! কি আমার রাক্কুসী সাধ রে! আমি স্কন্ধকাটা হয়ে ঘুরে বেড়াই আর কি! তার চেয়ে আয়, একটা নতুন খেলা খেলি।"

"কোথায়? তুই ডর্ম্মিটরির বাইরে যাবি?"

"না, ভাই, শাস্তি আমি মাথা পেতে নি। এই ডর্ম্মিটরিতেই খেলা হবে। যা সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অল্প কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বিল্লু, সুলু, পিকো, টুসী সবাই এসে উপস্থিত। টপসী বল্লে, "আজ আমরা পাগলা গারদ খেলব। এই ডর্ম্মিটরিটা গারদ আর প্রত্যেকটা বেড এক একটা সেল! সেখানে রকম রকম পাগল নিজের খেয়াল নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। যার যা কাজ তা আমি বলে দিচ্ছি। কিন্তু, খবরদার, মাসীমারা বা টিচাররা এলেও, বকলেও নিজের পার্ট ভুললে চলবে না।"

"না না আমরা ঠিক তৈরী থাক্‌ব। সব আফ্‌টার ইউ, বুঝলি?"

ছোট ডর্ম্মিটরি বেশ শান্ত, নীরব দেখে সিনিয়র মেট্রন মিসেস সাহু অর্থাৎ বড়মাসীমা জুনিয়র মেট্রন বা ছোট মাসীমা মিসেস আইচকে ডেকে বল্লেন, "এস তো সরসীদি একবার দেখে আসি ছোট মেয়েগুলো সব ঘুমুচ্ছে কি না, আর টপসীটাই বা কি কর্‌ছে? বেচারা শানুকে আজ ও কি নাকালটাই না করেছে—এই এতক্ষণে একটু সুস্থির হয়ে সে ঘুমোতে

পারল! কি যন্ত্রণাটাই না সে ভোগ করল—ঘণ্টাখানেক পাউডার মালিশ করি, সেঁক দি, একটু দুধ ব্রাণ্ডি খাওয়াই, তবে না মেয়েটা সুস্থির হয়। পিঠের রক্ত জমে যদি নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতো—এ কি দস্যিপণা।"

"তা বিজলীদি, ঐ টুকু বরফে রক্তই বা জমবে কেন নিউমোনিয়াই বা হবে কেন? ওরকম দুষ্টুমী ছেলেপিলেরা করেই থাকে।"

"না বাপু, আমার জন্মকালে আমি এমনি দেখি নি। খামাকা একজনের গায়ে বরফ ছেড়ে দেওয়া।"

"তা শানু আপনার গরমে যে অসহ্যি হয়ে উঠেছিল, গা পুড়ে গেল, জ্বলে মলুম বলে চেঁচামেচি করছিল আমিই তো শুনেছিলুম। টপসী ছেলেবুদ্ধিতে ওকে ঠাণ্ডা করতেই গিয়েছিল।"

"হুঁ, ছেলেবুদ্ধি! তুমিও যেমন! শয়তানী বুদ্ধি লা শয়তানী বুদ্ধি। আমার শানুকে ও হিংসে করে লা হিংসে করে।"

গম্ভীর মুখে দুজনে ডর্মিটরীতে ঢুকেই দেখেন সামনের বিছানায় বসে মুকুল গালে হাত দিয়ে যেন কি ভাবছে আর আপন মনে থেকে থেকে বিজ বিজ করে কি বলছে, তার চোখের তারা দুটো ঘুরছে, চোখ অস্বাভাবিক বড় লাগছে।

মিসেস সাহু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বল্লেন, "ওকি লা মুকুল অমন কচ্ছিস কেন? মুকুল এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিকট মুখভঙ্গী করে, ওঁর মুখের সামনে একটা আঙ্গুল তুলে বল্ল, "লাল তো হলদে কি?"

মিসেস সাহু সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বল্লেন, "এ্যাঁ এ্যাঁ কী কি?"

মুকুল তার প্রতি দৃক্‌পাত না করে অত্যন্ত চিন্তান্বিতভাবে বলে চল্‌ল, "ভাবছি আর ভাবছি কিছুই কিনারা করে উঠতে পারছি না। দেখুন না সাদা? সে তো ধব্‌ধবে। কালো? সে কুচকুচে লাল! সেও টুকটুকে; কিন্তু হল্‌দে?" তারপর এক হুঙ্কার দিয়ে বল্‌ল, "বলই বা তুমি হল্‌দে কি?

মিসেস আইচ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পালাতে যাবেন এমন সময় গম্ভীর গলায় কে বল্‌ল, "হ'ল না, হ'ল না! ওরকম নয়—" দুইজনেই চমকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, মাথায় একটা রাংতা মোড়া মুকুট পরে বসে পিকো তাঁদের দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছে।

"কি হ'ল না, পিকো, কি বল্‌চিস তুই?"

প্রথমে তিন পা এগোবে কুর্ণিশ করতে করতে, তারপর তিন পা পেছোবে আবার এগোবে আবার পিছোবে, এমনি ছয়বার।"

"তোকে আমি কুর্ণিশ করতে যাব? আস্পর্দ্ধা তোর কম নয় তো?"

পিকো হাতের আঙ্গুলগুলো বিশ্রীভাবে বাঁকাতে বাঁকাতে, (যেন পেলেই এখুনি ওঁর টুঁটি চেপে ধরে ছিঁড়ে দেবে) ওঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল, "করবে না, কুর্ণিশ তুমি? জান আমি কে? আমি সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান! এখুনি তোমার গর্দ্দান নিতে পারি?"

মিসেস সাহু ভ্যাকাচাকা খেয়েই পাশেই টুসিকে বসে থাকতে দেখে বল্লেন, "এদের কি হয়েছে রে টুসি?

টুসি বল্‌ল, "আমি গড্‌, আমার হুকুমে এই অনন্ত আকাশে তাদের গতিপথ ধরে নিয়ত ছুটছে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা। ধূমকেতু সেও চলছে তার লক্ষ্যহীন লক্ষ্যপথে—"

মিসেস আইচের পিছন দিককার খাট থেকে হঠাৎ খুব জোরে একটা বুঁ-উঁ-উঁ শব্দ শুনে সেদিকে চোখ ফেরাতেই দুজনে দেখলেন, যে বিল্লু চিৎ হয়ে শুয়ে তার মোটা ঠ্যাং দুটো উপরের দিকে তুলে সাইকেল চালাবার ভঙ্গীতে নাড়ছে আর বুঁ-উঁ-উঁ করছে। মিসেস সাহুর এ দৃশ্য সহ্য হল না, চেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, "ওকিরে বেহায়া মেয়ে, ধুমসী হলি তবু তোর লজ্জা হ'ল না এমনি করতে।"

বিল্লু কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে তার কাজ করে যেতে লাগল। স্মুলু শুধু একটা প্যাডে কি লিখেই যাচ্ছিল। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে মিসেস সাহু জিজ্ঞাসা করলেন, "বল তো স্মুলু, লক্ষ্মী মেয়ে, এদের হ'ল কি?"

স্মুলু হাসিমুখে হাত কচলাতে কচলাতে উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, আসুন, আসুন। গবর্ণমেণ্ট আমাকে এই পাগলা গারদের তত্ত্বাবধায়িকা করে পাঠিয়েছে—আমিও একটা পাগল কিনা এঁ হেঁ হেঁ। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে কুর্ণিশ না করে কেমন করে যাবেন?"

হঠাৎ বিল্লু এসে এক খোঁৎ খেয়ে পড়্‌ল মিসেস সাহুর গায়ে। পিছন থেকে পিঠের ও কোমরের সন্ধিস্থলে ওর মাথার এক ধাক্কা খেয়ে উনি পড়েই যাচ্ছিলেন, স্মুলু আর মিসেস আইচ ধরে ফেলাতে সে রকম কিছু দুর্ঘটনা ঘট্‌ল না। উনি চেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, "এ কী ব্যাপার!"

স্মুলু তেমনি অতি বিনীত স্বরে উত্তর দিল, "আহা, ও যে গুব্‌রে পোকা হয়ে গিয়েছে, বুঝছেন না? বেচারা গুবরে পোকা!"

এমন সময় কোণের বিছানার উপর চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে উঠে বস্‌ল টপ্‌সী। ঘুমজড়িত বিরক্তির স্বরে সে বল্‌ল, "বাবাঃ, একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোবারও যো নেই।"

মিসেস আইচ বল্লেন, "তা আর কি করে ঘুমোবে বল! তোমার বন্ধুবান্ধব কয়টি যে পাগলা গারদের অধিবাসিনী হয়েছেন।"

"পাগল হয়েছে তো? তা হবে না, যা তা খাওয়াবেন আপনারা? ধুত্‌রো বিচীর সরবৎ না কি—না কিসের মূল বাটা।"

"ও কি কথা, টপসী! কি বল্‌চিস্ তুই।"

"জিজ্ঞাসা করুন না বড় মাসীমাকে, উনি আজ ওদের কিচ্ছু খেতে দেন নি কি! তাতে কি ছিল কে জানে!"

বড় মাসীমা ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বল্লেন, "হায়! হায় কি সর্ব্বনাশ হ'ল। আমি তো একটু নিজেরই হাতের তৈরী মিষ্টি আর সরবৎ কয়জনকে খাইয়েছিলাম; শানুর জন্যেই করেছিলাম, এদের কয়টাকেও দিয়েছিলাম—কিন্তু শানুর তো কৈ কিছু হয় নি?"

মিসেস আইচ তাড়াতাড়ি বল্লেন, "তাই বা বলেন কি করে? সেও তো পিঠ জমে গেছে বলে চেঁচাচ্ছিল। মাথা খারাপ না হলে কি আর—"

"তাই বলুন তো মাসীমা! এই ও-তো টুকু বরফ, পিঠে লাগতেই কারো কি পিঠ জমে যায়! যাই আমি বলে গিয়ে মিস্ ঘোষ বা কাউকে! এদের সবায়ের যা দশা হয়েছে!" বলে টপ্‌সী ঘর ছাড়তে উপক্রম করাতেই মিসেস সাহু ওর হাত দুটো ধরে বল্লেন, "ওরে টপ্‌সী বাবা আমার! যাস্‌নে তোকেও একটু মিষ্টি দিচ্ছি।"

"বাবা! আমার মাথাটাও খারাপ হোক আর কি? দরকার নেই।"

মিসেস আইচ বল্লেন, "তোকে মিষ্টি খেতে দেবেন কেন বিজলীদি—মিষ্টি আমের আচার বা তেঁতুলের আচার দেবেন—বুঝলি?"

"হাঁ, হাঁ, তাই দেবো টপ্‌সী, তুই যাস নি!"

"ওঃ, আমি তো আমার ডাক্তার দাদার কাছে শুনেছিলাম, এ্যাসিড খেলে এ রকম পাগলামী সারে! মাসীমা আপনি সব্বাইকে একই আচার দিন না—দেখবেন ওদের কোনও অসুখ থাকবে না। এমন কি শানুর ডবল নিমোনিয়া পর্য্যন্ত পাঁই পাঁই করে কোথায় পালাবে তার পথ পাবে না।"

"তাই বাছা, তাই। সবাই তোরা খা। আর ভালয় ভালয় ভাল হয়ে ওঠ্। নইলে কপালে আজ কিছু আছে। কি গেরো রে বাপু!"

আচার খেতে খেতে মুকুল বল্ল, "এমনি যদি ওষুধ মেলে তো ন্যাকামী অসুখ বাধাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কি বলিস্‌রে পিকো?

পিকো বলল, "শানুটা যে শায়েস্তা হবে না। বাবা কি ন্যাকা-ই।"

বিল্লু বল্লে, "তা ওর ন্যাকামী নাই সারুক—আমাদের ভাগ্যে আচার জুটেছে তো।"

পায়রা সৈন্য

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

পায়রা গৃহ-পালিত পাখী। সব সময়ে গৃহকর্ত্তা যে ইহাদের পালন করেন তাহা নয়। অনেক সময়ে গৃহকর্ত্তার বিনা অনুমতিতেই ইহারা পূজার দালান বা বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান করে। তখন তাড়াইলেও ইহারা যায় না! শিক্ষা দিলে ইহারা ভৃত্যের কাজ করিতে পারে। 'রক্ ডাভ্' বা পাহাড়ে পায়রাকেই একমাত্র স্বাধীনভাবে বাসা বাঁধিয়া বাস করিতে দেখা গিয়াছে। ইহা হইতেই অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর পায়রার উৎপত্তি; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আর কোন পায়রাই নিজে ঘর বাধিয়া বাস করিতে রাজী নয়!

বিবিধ শ্রেণীর পায়রার মধ্যে নোটন বা লক্কা পায়রাগুলি দেখিতে বেশ সুশ্রী। ছেলেবেলাকার ছড়ায় আমরা পড়িয়াছি—

'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে', —এই 'নোটন' পায়রাকে ইংরাজীতে 'fan-tailed' পায়রা বলে। ইহার স্বভাব এই যে উপর হইতে নামিবার সময় ইহারা ভোল্ট্ মারিতে মারিতে অর্থাৎ মাথাটাকে একবার উপর-দিকে এবং একবার নীচের দিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নামিয়া পড়ে। ইহাদের কোন কোন শ্রেণীর পায়েও লম্বা পালক থাকে। ইহাদের গায়ের রং প্রায়ই শাদা হয়।

জার্ম্মান সৈন্যদের হাতে শিক্ষিত সংবাদবাহী পায়রা

ঝোটন পায়রার মাথায় থাকে ঝুঁটি। পায়ে লম্বা লম্বা একগোছা পালক।

পায়রাকে বিশুদ্ধ ভাষায় কপোত বলে। কোন কোন অঞ্চলে কপোতের অপভ্রংশ 'কবুতর' নামেও ইহারা পরিচিত।

পায়রার ডানার হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। অনেকগুলি পোষা-পায়রার মধ্যে দাঁড়াইয়া উহাদের উঠাইয়া দিলেই সুশীতল বাতাস অনুভব করা যায়। শোনা যায়, কোন কোন মোগল সম্রাট বহু পায়রা পুষিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে সুগন্ধি ফোয়ারার জলে ঐ সকল পায়রা স্নান করিয়া পর পর দলে দলে উড়িত, আর তাদের পাখার স্নিগ্ধ হাওয়া সেবন করিতেন সম্রাট নিজে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘরে বাস করিলেও সব সময়ে গৃহস্বামীই যে পায়রাগুলিকে প্রতিপালন করেন এমন নয়। উহারা দল বাঁধিয়া বহু দূরে মাঠের শস্য ক্ষেত্রে আহার সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়—আবার সন্ধ্যা হইলে ঘরে ফিরিয়া আসে। ঘর চিনিতে ইহাদের মোটেই অসুবিধা হয় না।

পায়রার বুকে ক্যামেরা

রাজপুতেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পায়রা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। যুদ্ধে পরাজয় হইলে সেই পায়রা ফিরিয়া আসিত—তারপর হইত জহর ব্রতের উদ্‌যাপন।

পায়রা একদিকে যেমন বিলাসের সামগ্রী অন্যদিকে তেমনি বড় বড় প্রধান যুদ্ধের সহচর। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে পায়রার অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে শিক্ষিত পায়রার বুকের নীচে, উহার পায়ের সঙ্গে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্যামেরা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এই ক্যামেরাগুলি এত হাল্কা যে তার ওজন মাত্র দেড় আউন্সের বেশী নয়। আপনা আপনিই (কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় পরে) ফটো উঠবার ব্যবস্থা থাকে এই ক্যামেরায়। পায়রাগুলি শত্রুপুরীর উপরে গিয়া সেখানকার সব গোপন-খবর ফিল্‌ম্-এ তুলিয়া আনিত!

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের যুদ্ধ। হাতী, ঘোড়া এমন কি পদাতিক সৈন্যেরও স্থান নাই এই যুদ্ধে! এই যুদ্ধে tank, bread-busket bomb, mosquito boat এবং প্যারাসুট, বিষবাষ্প প্রভৃতি বহুবিধ অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইলেও আদিম কালের সেই পায়রাকে উহারা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই!

পায়রা খুব দ্রুতগামী সংবাদ-বাহক। গত মহাযুদ্ধে 'চের আমি' নামে একটি শিক্ষিত পায়রা ৪৫ মিনিটে প্রায় ২৫ মাইল পথ উড়িয়া গোপন-সংবাদ আনিয়া দিয়াছিল! খুব বেশী শিক্ষিত পায়রা একদিনে নাকি ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে!

এখনও গ্রেটব্রিটেনে প্রায় ৩৫০০০ হাজার পায়রা-সৈন্য কাজ করিতেছে। অবশ্য মানুষ মাত্রেই যেমন যোদ্ধা হয় না, পায়রা মাত্রেই তেমনি বিশ্বস্ত সংবাদ-বাহক হইতে পারে না। সেজন্য পায়রাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিতে হয়; কারণ, তাহাদের সংবাদের উপর অনেক সময় জীবন-মৃত্যু এবং হার-জিত নির্ভর করে।

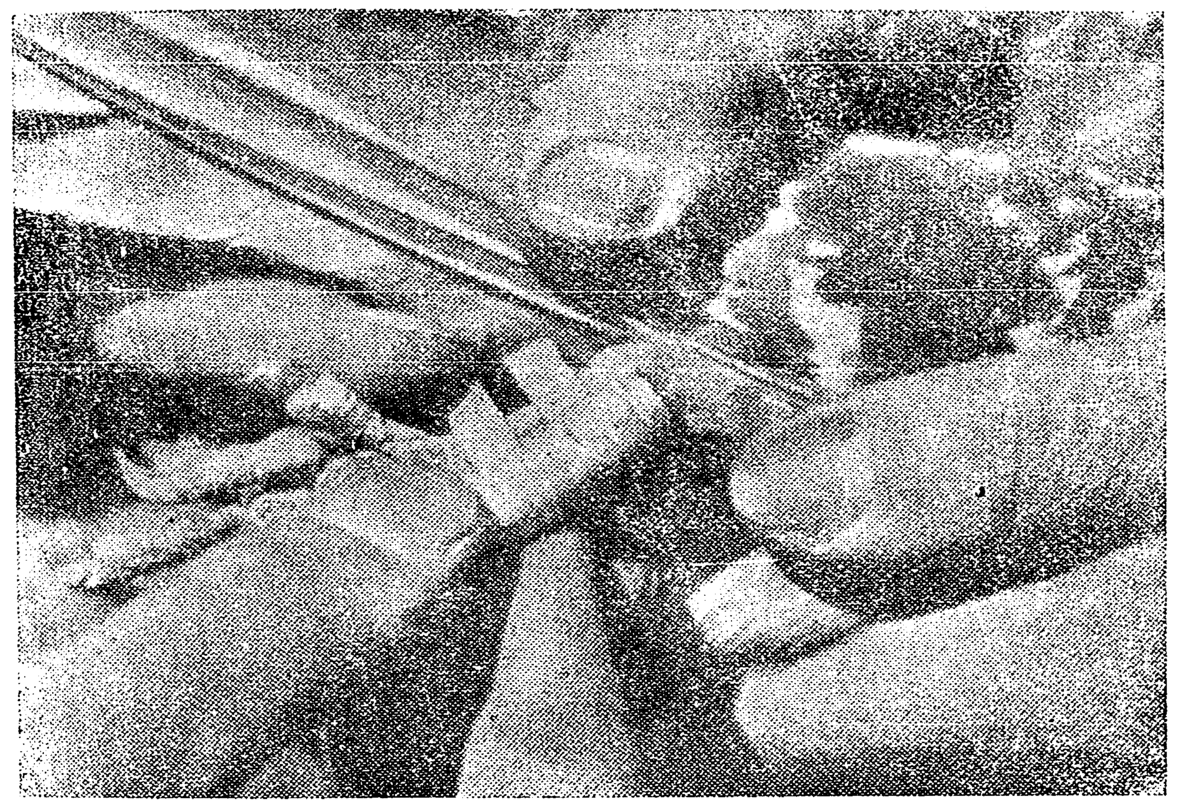
পায়রার পায়ে গোপন সংবাদবাহী কাগজ বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে

লণ্ডনের ভিতর পায়রা সৈন্যের একটা হেড-কোয়ার্টার আছে। এখানে প্রায় ১০০০ পায়রা-সৈন্য শিক্ষা পায়। পায়রা গুপ্তচর ফরাসী এবং বেলজিয়মের উপকূল হইতে লণ্ডনে নিয়মিত যাতায়াত করিয়াছে! এক প্রকার স্বচ্ছ, পাতলা কাগজে (tissue paper) সংবাদ লিখিয়া ইহাদের পা বা ডানার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষিত পায়রা সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যুৎ বেগে গন্তব্যস্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে তার-বেতারে সংবাদ প্রেরণও নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। তখন পায়রাই একমাত্র বন্ধু। পায়রা নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গোপন-সংবাদ আনিয়া দেয়। কখনও ইহারা পথ ভুল করে না। গত মহাযুদ্ধে 'স্পাইক' নামে একটি শিক্ষিত পায়রা ৫২ বার এইরূপ গোপন-সংবাদ সরবরাহ করিয়াছিল!

এইরূপ পায়রা নষ্ট করিবার জন্য শত্রুপক্ষদের আবার শোন বা বাজপাখী পুষিবার দরকার হয়। বাজ পাখীর নখ ও দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। গুপ্তচর পায়রা দেখিলেই ইহারা আক্রমণ করে!

শরৎ

শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

গাল ভরা হাসি নিয়ে কে এল দ্বারে,
পরিচিত মনে হয় দেখে উহারে!
কাঁচা কাঁচা রোদ মাখা সাড়ী পরণে
অতসী নূপুর বাজে রাঙা চরণে।
কচি রোদ খেলা করে সোনালী চুলে
শিশিরের দুল দুলে কর্ণ মূলে।
নীল নব ঘন রঙে আকাশ জুড়ে
মলয় পবনে তার ওড়না উড়ে।
অরুণ সিঁদূর ফোঁটা জ্বলিছে ভালে
রামধনু আঁকা দুটি গোলাপী গালে।
নদী বুকে তাল ঠুকে অবগাহনে
শুকায় সে এলো-চুল কাশের বনে।
ফুর ফুরে নির্ম্মল হাওয়ায় মেতে
লুকোচুরি খেলা করে ধানের ক্ষেতে।
হাসে নাচে গান গায় পাখী কূজনে
বনের হরিণে ধরি খেলে দুজনে।
হাওয়ার কাঁচুলি বোনে জ্যোছনা দিয়ে
কাজল খোঁপায় রাখে কমল নিয়ে।
পাহাড়ের চূড়া ছাড়ি আরো উপরে
বলাকা পাখায় চড়ি' মেঘে ভ্রমরে।
ইনি কি ইনি কি সেই শরৎ রানী—
যার সাথে প্রতিবার আসে ভবানী।
ঠিক ঠিক তাই ঠিক, বাজারে ভেরী,
চিনেছি উহারে আমি মু'খানি হেরি।

জুম!

বুদ্ধদেব সুব

পাড়ার ডাক্তারে আর কুলোলো না; বড় ডাক্তার ডাকতে হ'লো।

লক্ষণগুলো বিশেষ সুবিধের নয়। রোজ অল্প-অল্প জ্বর, শেষরাত্রে ঘাম, ওজন কমছে ঘি-মাখন-ডিম-সন্দেশ খাচ্ছি, তবু খামকা দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছি। ছেলেবেলায় ভাবতুম যক্ষ্মা হ'লেই মস্ত সাহিত্যিক হ'তে পারব, পৃথিবীর কোন কোন কবি ঐ রোগে মরেছেন তার লিষ্টিও মুখস্থ ছিলো; কিন্তু বড় লেখক হবার এমন চমৎকার উপায়টি যখন যেচে এসে ধরা দিতে চাইলো তখন, কেন জানি, হাতে চাঁদ পেলুম মনে করে লাফিয়ে উঠতে পারলুম না। এমন কি, রোগশয্যায় কয়েকটি মাত্র কবিতা রচনা ক'রে পৃথিবীতে অমর নাম রেখে যেতে পারবো এ সম্ভাবনা যদিও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তবু সে খ্যাতি ছড়াবার আগেই আমি যে মরে যাবো তা ভাবতে মনটা রীতিমতো খারাপই লাগলো। মরবার পরেই ঐ নামটার উপর মরবার আগের এই আমি-র কেমন একটা ঈর্ষা যেন ফোঁস ক'রে উঠলো—আশ্চর্য্য মানুষের মন।

বড়ো ডাক্তার এলেন, ফুসফুসের সমস্ত রোগের ফুসমন্তর তাঁর জানা। নাম সুবল সান্যাল; লম্বা ছিপছিপে চমৎকার চেহারাটি, দেখলেই অর্দ্ধেক রোগ সারে। গলার আওয়াজ গম্ভীর, কথা বলেন আস্তে-আস্তে, সে কথা, শুনলে কান আর মন যেন জুড়িয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই সুবল বাবুকে আমার ভাল লাগলো।

বুক পিঠ চোখ গলা জিভ নাড়ি সমস্ত পরীক্ষা ক'রে তিনি বললেন—হুঁ।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী হয়েছে?

—তা শুনে কী করবেন?

দু' একবার ঠোঁট চেটে, একটু কেশে বললুম—বাঁচবো তো?

—তা একদিন তো মরতেই হবে।

—সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই, তবে কিনা—আমি জানতে চাই—আমার তারিখটা কি খুব শিগগিরই পড়েছে?

—আপনি একটু ভুল করছেন। আমি ঈশ্বর নই, সামান্য ডাক্তার মাত্র। আপনি যদি ট্রাম চাপা প'ড়ে, কি জলে ডুবে, কি কার্ব্বাঙ্কল হ'য়ে, কি ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে মারা যান তাহ'লে আর কী করা যাবে বলুন?

—তাহ'লে এই অসুখটা—

—এ অসুখটা আপনার কিছু নয়। খাবেন দাবেন ঘুমোবেন, সেরে যাবে। নতুন বই-টই লিখেছেন নাকি ?

এত বড়ো ডাক্তারের কানে, আমি মরবার আগেই, আমার খ্যাতি পৌঁচেছে দেখে রোমাঞ্চিত না হ'য়ে পারলুম না। সবিনয়ে বললুম—লিখছিলুম একটা, মাঝখানে এই অসুখটা হ'য়ে—

—ও কিছু না, ভুলে যান। লিখুন, খুব বেশী ক'রে লিখুন, তাহ'লে—

সুবল বাবুর কথায় বাধা দিয়ে বললুম—দেখুন, শরীরটা বড় দুর্ব্বল বোধ করি। কোন ওষুধ-টষুধ—

—ওষুধ! মাপ করবেন মশাই, সজ্ঞানে জোচ্চুরি করতে পারবো না। এই যে আপনারা সব ওষুধ-ওষুধ ক'রে পাগল, ওষুধে কী আছে ভেবে দেখেছেন কখনো ?

—না, তা তো ভেবে দেখেনি।

—কিচ্ছু নেই, মশাই, কিচ্ছু নেই। পেট ভ'রে খাবেন, দশঘন্টা ক'রে ঘুমোবেন, দুশ্চিন্তা করবেন না, বেড়াবেন, কাজ করবেন—এই আমার প্রেস্ক্রপশন। আচ্ছা চলি। যা লিখেছিলেন ফেলে রাখবেন না, আজ থেকেই আবার ধরুন। হ্যাঁ, দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি নাটক লেখেন না কেন ?

—কী হবে লিখে ?

—কী হবে মানে ? আশ্চর্য্য দেখুন, বাংলাদেশে আজকাল এতগুলো লেখক, কেউ নাটক লিখছে না। কেন বলুন তো ?

—অনেকদিন আগে আমি একটা লিখেছিলুম, একটা থিয়েটর নিয়েও ছিলো, কিন্তু প্রধান অভিনেত্রীর পচ্ছন্দ না হওয়ায়—

—হ্যাঁঃ, ওদের আবার পছন্দ আর অপছন্দ! এক কাজ করুন আপনি, নাটক লিখে আমার হাতে দিন, আমি চালিয়ে দেবো। ওদের সকলের সঙ্গে আমার চেনাশোনা। বেশ জোরালো নাটক লিখবেন মশাই, যাতে পড়তে-পড়তে জুম ধরে।

আমি বললুম—জুম কী জিনিষ ?

—আহা, জুম বোঝেন না—এই জুম আর কি। যেমন ধরুন—হঠাৎ আমার টেবিলের কাছে স'রে এসে সুবলবাবুর সারে দাঁড়-করানো বইগুলোর নামের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন।—বাঃ, এই তো, পেয়েছি। ব'লে তুলে নিলেন চামড়ায় বাঁধানো শেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী।—যেমন ধরুন—এদিক ওদিক একটু পাতা উণ্টিয়ে এক জায়গায় থেমে বললেন—যেমন ধরুন, এই ম্যাকবেথ। আহা—হা—একটু শুনুন, মশাই, একটু শুনুন—

আমার সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন লেডি ম্যাকবেথের ঘুমের মধ্যে হাঁটবার দৃশ্যটি। গম্ভীর মধুর তাঁর কণ্ঠস্বর, চমৎকার আবৃত্তি, আমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনলুম। দেখা গেলো, বই হাতে না রাখলেও তাঁর চলে, প্রায় সবই মুখস্থ। খানিক পরে বই রেখেও দিলেন; আমাকে শোনালেন—হ্যামলেট, ওথেলো, মার্চ্চেন্ট অফ ভেনিস, অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর বাছা বাছা দৃশ্য। বেলা এগারোটা বেজে গেলো।

হঠাৎ থেমে বললেন—এখন চলি, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম।

সময় নষ্ট! হায়রে, আমার আর সময়ের মূল্য কী ? ঘষড়ে-ঘষড়ে তিনদিনে একটি গল্প লিখে দশটি টাকা তো পাই। আর ইনি রোগীকে একটু ছোঁবেন তার দামই বত্রিশ টাকা। এতক্ষণে তিনি দশটা কল্ অন্ততঃ সারতে পারতেন, ছাকা তিনশো-কুড়ি টাকা দামের সময় এর নষ্ট হ'য়ে গেলো এ কথা ভেবে আমিই অন্ততঃ কুণ্ঠিত বোধ করছিলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—আপনি তো দেখছি চমৎকার অভিনেতা।

—আর মশাই, ডাক্তারি করতে করতেই জীবন কাটলো। ভাল লাগে না আর এ জীবন; একটা দিন ব'সে যে নিশ্চিন্তমনে নাটক-টাটক পড়বো তার কি উপার আছে। বাইরের ঘরে লোক বসে আছে তো আছেই, ক্রিং-ক্রিং টেলিফোনের কামাই নেই। লোকের অসুখও করে! উঃ!—সুবলবাবু দুঃখের ভার সইতে না পেরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। —তাও দেখুন, রোগীগুলো সব এমন হাঁদা যে কী বলবো। মস্ত বড়ো-বড়ো লোক সব, কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কত খাটপালং দামি-দামি ফার্ণিচার, এদিকে সারা বাড়িতে একখানা শেক্সপিয়র পর্য্যন্ত পাবেন না। আমি আবৃত্তি-টাবৃত্তি করলে বিরক্তই হয় তারা। চুপ ক'রে থাকতে হয়, ভালো লাগে না কোন রোগীর বাড়ী গিয়ে। অসুখের কথা, ওষুধের কথা কত আর বলা যায়। কুড়ি বছর ধ'রে এই তো করছি—ঘেন্না ধরে না! আপনি সাহিত্যিক ব'লেই না আপনার সঙ্গে এমন জমলো! ভারি ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে। জানেন আমার খুব ইচ্ছে সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ হয়, কিন্তু তাদের দেখাই পাওয়া যায় না।

মনে মনে বললুম—কী ক'রে পাবেন ? সাহিত্যিকদের যা আর্থিক অবস্থা—যক্ষা-টক্ষা একটা কিছু হ'য়ে না বসলে তো আর আপনাকে ডাকবে না। আমিই বা কী, খামকা বোকার মত ভয় পেয়ে বড়ো ডাক্তার ডেকে বসলুম, গেলো এতগুলো টাকা। টাকাগুলোর জন্য চড়চড় করছিলো শরীরটা, আজ সকালেই এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার ক'রে এনে রেখেছি—তিনটি কড়কড়ে নোট আর দুটি টাকা! সুবলবাবুর পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে পকেটে হাত দিয়ে সেগুলো মুঠোয় ভ'রে নিলুম, তারপর সুবলবাবুর দিকে হাতটি আস্তে বাড়িয়ে দিলুম। প্রচলিত রীতি অনুসারে ডাক্তারবাবুর হাতটি এসে আমার

হাতকে ভারমুক্ত করা উচিত ছিলো, কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখলুম সুবলবাবু আমার বাড়ানো হাতটিকে লক্ষ্য না ক'রে নেমেই যেতে লাগলেন। রাস্তায় এসে আমি বলতে বাধ্য হলুম—আপনার ইয়েটা—

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবলবাবু বললেন—ও থাক্।

থাক মানে? আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললুম—না, না, সে কী হয়?

সুবলবাবু আবার বললেন—ও থাক্। ব'লে প্রকাণ্ড ঝকঝকে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মুখ বাড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে—চলি, আবার দেখা হবে।

আমি তো স্তম্ভিত! এত বড়ো ডাক্তার, অথচ কী অমায়িক! কী মহানুভব।

(২)

সুবলবাবু যখন বলেছিলেন, আবার দেখা হবে—আমি ভেবেছিলুম কথাটা নেহাৎই ভদ্রতাসূচক; কিন্তু সপ্তাহ খানেক পরে রাত্তির ন'টা নাগাদ আমার ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে গম্ভীর গলার হাঁক শুনলুম—হরিহরবাবু আছেন নাকি?

দরজা খুলে সুবলবাবুকে দেখে আমি তো অবাক! সত্যি যে তিনি আমার বাড়ীতে কখনো স্বয়মাগত হবেন তা ভাবতেও পারিনি। রোগীরা ডেকে ডেকে নাকি তাঁর দেখা পায় না, আর আমি বিনা-রোগে, নিজের বাড়িতে ব'সে তাঁর দেখা পেলুম—কী ভাগ্য আমার!

—আপনি! আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, আসুন, আসুন।

বসবার ঘরে একটি চেয়ারে ব'সে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে তিনি বললেন—তারপর? কী খবর?

আমি তাড়াতাড়ি বলতে লাগলুম—ভালো আছি, বেশ ভালো আছি। জ্বর আর হয় না, আর তাছাড়া—

আমাকে বাধা দিয়ে সুবলবাবু ব'লে উঠলেন—আহা, সে-কথা না! কী লিখেছেন? নাটক-টাটক হচ্ছে?

—না, এখনো তো—

—এখনো প্লট ভেবে উঠতে পারেননি বুঝি? আচ্ছা, আমি আপনাকে কয়েকটা গল্প বলছি—নিজের জীবনের ঘটনা—দেখুন তো এতে কিছু হয় কিনা।

—আমি বললুম—বেশ তো।

—তা'লে এক কাজ করা যাক। একটু লেকে ঘুরে আসি—চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে বাইরে।

সুবলবাবুর মস্ত খোলা গাড়িতে লেকের চারদিকে বারকয়েক ঘোরা হ'লো। সারাক্ষণ

তিনি অনর্গল কথা বলেছিলেন—সে যে কত রকমের কথা তার অন্ত নেই। সুবলবাবু শুধু ভালো আবৃত্তিই করেন না, কথাও বলেন চমৎকার। বিস্তর খোঁজ-খবর রাখেন, নানা বিষয়ে উৎসাহ আছে, শুধু ডাক্তারির কথা উঠলেই তাঁর মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়।

নিরিবিলি একটি জায়গা দেখে তিনি বললেন—আসুন এখানে একটু বসা যাক।

ঘাসের উপর বসলুম দু'জনে। সুবলবাবু আরম্ভ করলেন—আচ্ছা, এবারে শুনুন দেখি এই গল্পটা।

ব'লে তিনি যে-গল্পটা ফাঁদলেন সেটা অতি বিচিত্র। তাতে অনেক চরিত্র, অনেক ঘটনা, ঘটনাস্থল কখনো কাশ্মীর কখনো রেঙ্গুন কখনো লণ্ডন—মোটের উপর তা নিয়ে নাটক হয় না, যদি কিছু হয় তো সে মহাকাব্য। চুপ ক'রে শুনেই যাচ্ছি, গল্প আর ফুরোয় না। রাত যখন সাড়ে দশটা, আমি ক্ষীণস্বরে একবার বললুম—রাত কিন্তু মন্দ হয়নি—

সুবলবাবু ব'লে উঠলেন—আহা মশাই, আপনি বড্ড বাজে বকতে পারেন। তারপর কী হ'লো শুনুন—

আবার চললো গল্প। ক্ষিদের জ্বালায় আমার পেট ততক্ষণে চোঁ-চোঁ করছে। মিনিট পনেরো পরে আমি আর একবার চেষ্টা করলুম—এবার উঠলে হয়।

—আহা, এখনই কী হয়েছে, মশাই, কী আর এমন রাত হয়েছে। শুনুন—এবার অনেকখানি নৈতিক বল সঞ্চয় ক'রে আমি বললুম—বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

—খিদে পেয়েছে? সে-কথা বললেই হয়। এই চানাচুর—চানাচুর—

—এখন ভাত-টাত খেলেই ভালো হয় না?

—আহা, এখন এই চলুক তো। এক সময় খেলেই হয় মশাই—ও-সব ঘড়ি ধ'রে খাওয়া-টাওয়া ডাক্তারদের বুজরুকি।

চানাচুর চিবাতে-চিবাতে আবার চললো গল্প। গল্প শেষ হ'লো ঠিক রাত বারোটায়, তারপর আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে সুবলবাবু বিদায় নিলেন।

এর দু'দিন পরেই আবার তাঁর গম্ভীর গলার হাঁক শোনা গেল—হরিহরবাবু আছেন নাকি? রাত তখন এগারটা, আমি খেয়ে-দেয়ে শুতে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললুম—এ কী! সুবলবাবু! এত রাত্রে!

—রাত আর এমন বেশী আর কী হয়েছে—এগারটাও তো বাজেনি। চলুন একটু ঘুরে আসি।

—এখন...আমি একটু ইতস্তত করলুম।

আমার কাঁধে হাত রেখে সুবলবাবু বললেন—আরে মশাই বেশি গুড্ বয় হবেন না।

চলুন না—বেশি দূরে তো আর নয়—এই তো কাছেই লেক। চলুন ব'সে একটু গল্প-সল্প করা যাক।

আমাকে একরকম জোর ক'রেই গাড়িতে নিয়ে তুললেন। লেকের ধারে নির্জন একটি জায়গায় ব'সে ড্রাইভারকে বললেন—তুমি বাড়ী চ'লে যাও।

আমি না-ব'লে পারলুম না—গাড়িটা ছেড়ে দেবেন ?

—যাক্, ও-বেচারা বাড়ী গিয়ে ঘুমোক। এই তো, কাছেই তো—হেঁটেই ফিরবো। ওদের জ্বালায় সারাদিনে একটু তো হাঁটবার জো নেই, এখান থেকে ওখানে যেতে হ'লেও গাড়িটা বা'র করে। মহা উৎপাত, মশাই, এই গাড়ি। তারপর—সেদিনের প্লটটা আপনার কেমন লাগলো ?

—এখনো তো ভাবিনি !

—ওঃ, কী সব নাটক দেখেছি মশাই বিলেতে, আমাদের দেশে তার তুলনায় কী ! তবু যাই বলুন, শিশির ভাদুড়ী ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টর। ওর আলমগীর—আঃ কী অদ্ভুত ! মনে করুন সেই আলমগীর যখন বলছে—

আলমগীরের মস্ত একটা অংশ সুবলবাবু গড় গড় ক'রে আবৃত্তি ক'রে গেলেন। তারপর আর একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেলো, তারপর আর একটা। মোটের উপর প্রায় সমস্ত নাটকখানাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন। রাত তখন প্রায় দুটো।

আমি বললুম—এবার ওঠা যাক।

—আরে বসুন না মশাই, এত ব্যস্ত কেন।

—না—ব্যস্ত কিছু না—তবে রাত তো মন্দ হ'লো না—ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

—ঘুম পায় তো এখানেই ঘুমিয়ে পড়বেন—সে আর মুস্কিল কী ! চমৎকার খোলা হাওয়ায় ঘুমুবেন—শরীর ভালো হবে। আর এক রাত্তির না-নয় না-ই ঘুমুলেন—ওতে কিছু হয় না।

—আপনিই বলেছিলেন রোজ দশ ঘণ্টা ক'রে—

—আরে মশাই ডাক্তারদের ও-সব কথা বলতেই হয়, ও-সব ধরবেন না। কম ঘুমুলেই যদি শরীর খারাপ হ'তো আমি তাহলে বাঁচতুম না।

—আপনি খুব কম ঘুমোন বুঝি ?

—ও-সব ঘুম-টুম আমার বড় একটা হয় না। তিনটে-চারটে অবধি রোজই জাগি।

—কী করেন ?

—কী আর করবো ? বন্ধু-বান্ধব গেলে আড্ডা দিই—নয় তো বই-টই পড়ি। কাল হ্যামলেটটা আবার পড়লাম আগাগোড়া—এই নিয়ে বোধ হয় একশো বার হ'লো। সিবল্ থর্ণডাইকের ওফেলিয়া দেখেছিলাম—ওঃ, সে কী জিনিস ! সেই পাগল হবার দৃশ্যটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—

—এর পর আরম্ভ হ'লো হ্যামলেট। ঘুমে আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিলো, এক ফাঁকে শেষ চেষ্টা করলুম—দেখুন এখন বোধ হয় উঠলেই ভালো হয়।

—আঃ, আপনি বড্ড বাজে বকেন মশাই, বলে সুবলবাবু হ্যামলেটের বিখ্যাত সলিলকি (Soliloquy) আরম্ভ করলেন।

এর পর আমি আর প্রতিবাদের চেষ্টা করলুম না, চোখের ঘুমও ছুটে গেল। শেক্সপিয়র থেকে দৃশ্যের পর দৃশ্য তিনি আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন—চারিদিক নিঃঝুম—শেষরাত্রে কৃষ্ণ পক্ষের ভাঙ্গা চাঁদ উঠলো, চাঁদের আলো মিলিয়ে এলো, ভোর হয়-হয়—এতক্ষণেও থামবার কোনই লক্ষণ নেই সুবলবাবুর। বুঝলুম কাকে বলে জুম !

ভোরের প্রথম আলো যখন ফুটলো সুবলবাবু বললেন, চলুন এবার কোথাও গিয়ে চা খাওয়া যাক। আপনার নিশ্চয়ই চা খাওয়ার অভ্যাস আছে ?

সারা রাত জাগবার পরে চায়ের নাম করতেই যেম চাঙ্গা হয়ে উঠলুম। বললুম—বেশ তো, চলুন কাছাকাছি কোথাও—

—না, না, এ-পাড়ার দোকানগুলো অতি জঘন্য। পার্ক ষ্ট্রিটে আমার এক চেনা দোকান আছে—সেখানে চলুন। এই ভোরের হাওয়ায় চমৎকার হাঁটতে হাঁটত যাওয়া যাবে।

সে কী ! লেক থেকে পার্ক ষ্ট্রিট হেঁটে ! তাও সারা রাত জাগবার পরে !

আমার মুখের ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সুবলবাবু বললেন—আহা—এমন আর দূর কী—চলুন না। তেমন ক্লান্ত লাগে একটা টাক্সি-ফ্যাক্সি নিলেই হবে।

—আপনার গাড়িটা—

—ওরে বাব্বাঃ, গাড়ির নামও করবেন না। অনেক কষ্টে ওদের ফাঁকি দিয়ে একটু হেঁটে নিচ্ছি, ওরা টের পেলে রক্ষে আছে !

কথা বলতে-বলতে আমরা ল্যান্সডাউন রোডে এসে পড়েছিলুম। মোড়েই সুবলবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। তাঁর বাড়ির কাছাকাছি যেই এসেছি, তিনি ফস করে হাত ধ'রে টান দিলেন।

—শিগগির, এই গলিতে।

গলির ভিতরে মিনিটখানেক লুকিয়ে থেকে তিনি বললেন—চলুন এবার। উঃ, আর একটু হলেই গেছলুম আর কি।

—কেন বলুন তো ?

—দেখলেন না ড্রাইভার আমার গাড়িটা নিয়ে সাঁ করে লেকের দিকে চলে গেল। খুঁজতে বেরিয়েছে। দেখলে কি আর রক্ষে ছিলো—জোর করেই তুলতো গাড়িতে। খুব বেঁচে গেছি। ও-সব গাড়ি-ফাড়ি যা-ই বলুন, মশাই, হাঁটবার মতো সুখ কিছু নেই।

বলতেই হয় যে এই সুখ সুবলবাবু আমাকে সেদিন যথেষ্টই দিয়েছিলেন। সোজা ল্যান্সডাউন রোড ধরে আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। এলগিন রোডের মোড়ে এসে আমি আর পারি না। কাতরভাবে বললুম এখন একটা ট্যাক্সি নিলে হয়।

সুবলবাবু বললেন, আরে মশাই এটুকু হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ! এই তো এসে গিয়েছি ঐ গাছগুলো না থাকলে পার্ক ষ্ট্রিট দেখা যেতো। এ তো কিছুই না। অল্প একটু হাঁটা। শ্যামবাজার অবধি গেলে না হয় বুঝতুম যে কিছু হাঁটা হলো। এমন হয়েছে মশাই, আমার কপালে আর হাঁটাই হয় না। এই ডাক্তারি এমন কাজ অবসর নেই, ছুটি নেই, সব সময়ই রোগীর তাঁবেদারীতে আছি। আর রোগীও এত—হেঁটে হেঁটে রোগী দেখবো তার কি উপায় আছে ! তাহলে দিনে হয়তো দু'তিনজনের বেশি রোগী দেখা

হয় না। আমরা তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু রোগীরাই চ্যাঁচামেচি করবে তিষ্ঠাতে দেবে না। কী মুশকিল বলুন তো!

সুবলবাবুর এই মুশকিলের কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগলুম। সার্কুলার রোড, ক্যামাক ষ্ট্রিট, তারপর শেষটায় পার্ক ষ্ট্রিটের চায়ের দোকানে যখন এসে উঠলুম তখন আমি আর আমাতে নেই।

ছোট্ট দোকানটি, চালয়িত্রী এক বুড়ি মেমসায়েব। দোকানটি এত সুন্দর যে ভিতরে ঢুকেই ক্লান্তি যেন অনেকটা ভুলে গেলুম এটা স্বীকার করবো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই টেবিলের উপর উপস্থিত হলো চা আর আনুষঙ্গিক অনেক খাবার।

আমি আর দেরি করলুম না। চা ঢেলে নিয়ে অত্যধিক আগ্রহে খেতে লাগলুম। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম সুবলবাবু কিছুই খাচ্ছেন না। লজ্জিত হ'য়ে বললুম—সে কী! আপনি খাচ্ছেন না?

—আমি ও-সব কিছু খাইনে।

—চা?

—চাও না।

—চা খান না? তবে এখানে এলেন কেন?

—ধাঃ, আপনার জন্যে। আপনি খান।

—এ কী অন্যায় আপনার, আমি তো বাড়ি গিয়েই খেতে পারতুম।

—আহা, খান না, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একজন খেলেই হ'লো।

—আপনি কিচ্ছু খাবেন না?

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও খাচ্ছি। ব'লে সুবলবাবু পকেট থেকে এক মুঠ ছোলা ভাজা বার করে চিবোতে লাগলেন। একটু পরে বললেন—ছোলাভাজা বাদাম চানাচুর এ সব খেতেই আমার খুব ভালো লাগে। সব সময় পকেটে থাকে, গাড়িতে যেতে যেতে মাঝে মাঝে খেয়ে নিই। এছাড়া আর বিশেষ কিছু খাইনে। কাজেই দেখছেন, আমার জন্যে লজ্জিত হবার আপনার কোনো কারণ নেই। আপনার যা ইচ্ছে খান।

আমি অবাক হ'য়ে সুবলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

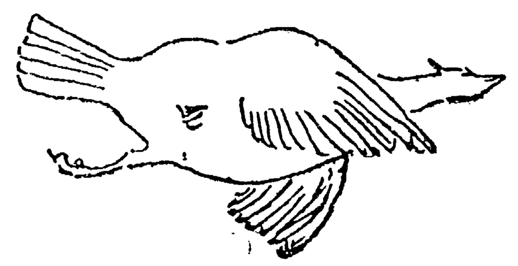

স্বর্গ ও মর্ত্ত্য

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

নূতন বর্ষে নারায়ণকে স্মরণ করে কার্য্য আরম্ভ করা এ দেশের রীতি। যিনি নরনারীর আশ্রয় তিনিই হচ্ছেন নারায়ণ। তাঁকে কল্পনা করা হয় পৃথিবী বা মর্ত্ত্যের অধিবাসী রূপে নয়, কারণ তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত। পৃথিবীর সব কিছুতেই ঘটে পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু, এ জন্য এর নাম মর্ত্ত্য; অথচ মানুষ চিন্তা করে' এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে মৃত্যুর অতীত রাজ্যও আছে। সেখানে যাঁরা বিহার করেন তাঁরা হ'লেন দেবতা, তাঁদের মৃত্যু নেই।

সকল সভ্যতাই যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বস্তু কল্পনা করেছে তেমনি অতি প্রাকৃত বা স্বর্গীয় ব্যাপারও ধ্যান করেছে। সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টি হচ্ছে মানুষ-কল্পনা নয় দেব-কল্পনা। এ সব দেবতাদের জলে স্থলে অনলে অনিলে কল্পনা করা হয়েছে। ভগবান সব জায়গায় আছেন। এবং তিনি সকল জায়গায় বিচরণ করেন এবিশ্বাসে সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখা হয়। এজন্য মর্ত্ত্যেও দেবতার বিহার হয়।

বিষ্ণু

শুধু মর্ত্ত্যে দেবতাদের কল্পনা করে কোন সভ্যতা শান্তি পায় নি। যেখানে জরামরণ নেই, যেখানে আনন্দে পরিপূর্ণ এরূপ জায়গা কল্পনার প্রভাবে স্বর্গকে সকলে চিন্তা করেছেন। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধের ভিতর এজন্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দুইটি কল্পনা স্থান পেয়েছে। বৌদ্ধেরা কল্পনা করেছে তুষিত স্বর্গকে। চীন দেশে এ নিয়ে বহু চিত্র রচিত হয়েছে।

দেবতারা ভক্তের অনুরোধে মর্ত্ত্যে নেবে আসেন ও মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করেন। কোথাও বা মানুষের রূপ নিয়ে কোথাও বা নিজের রূপ নিয়ে কোথাও বা আংশিক ভাবে পশুমূর্ত্তি নিয়ে। কোন কোন সভ্যতা দেবতাদের নিজের সমাজে টেনে নিয়েছে এবং

তাঁরা মানুষের পক্ষে যুদ্ধও করেছে, অন্য সভ্যতার অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের দমন করেছে।

অলিম্পাস পাহাড়ে দেবতারা বিচরণ করেন গ্রীকরা এরূপ কল্পনা করেছিল। এ পাহাড়ের চূড়া মেঘরাজ্য ভেদ করে আকাশে গিয়ে অদৃশ্য হ'ত। এখানে বিরাজ করত চির বসন্ত। এই মেঘরাজ্যে বহু অট্টালিকা আছে এরূপ কল্পনা করা হ'ত। মানুষের সুখ দেবতাদের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করে এ কথা গ্রীকরা বিশ্বাস করত। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন জুপিটার, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর দেবতা ছিলেন এপলো। ইনি ছিলেন সূর্য্য ও সঙ্গীতবিদ্যার দেবতা। গ্রীকরা দেবতাকে মানুষের রূপেই কল্পনা করেছে, কিন্তু তারা ছিল মানুষ অপেক্ষাও সুন্দর ও ক্ষমতাশালী। তারা চিরসুখী ও অমর ছিল। ভিনাস ছিলেন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবী। সমুদ্রের দেবতার নাম ছিল নেপচুন, জ্ঞান ও যুদ্ধের দেবী ছিলেন মিনার্ভা।

মহেশ্বর

দৈহিক সৌন্দর্য্যে গ্রীক মূর্ত্তি পৃথিবীতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে। তোমরা এ শিল্পের কথা মনে রেখো। সমগ্র ইউরোপে এ শিল্পের রচনাকে এক সময় মাথায় পেতে নিয়েছে! এ শিল্পের এপলো মূর্ত্তির চমৎকার শরীর গঠন দেখে বিস্ময় জন্মে। এ মূর্ত্তি দেখে শিল্পীরা পরবর্ত্তী যুগে খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ মূর্ত্তি রচনা করেছিল।

গ্রীক সভ্যতার পরে খ্রীষ্টীয় যুগ আরম্ভ হতেই রোম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। গ্রীক সভ্যতা চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক কিছু দান করেছে। রোম ছিল ইতালীর রাজধানী। রোম দেবতার মূর্ত্তিদের গৃহের শোভা বাড়াবার জন্য তৈরী করেছিল। তাদের জাগ্রত বিশ্বাস ছিল না। রোমক শিল্পও বাইরে কোন আদর্শ রেখে তা নকল করত। শরীরের সৌন্দর্য্য উপস্থিত করাই ছিল এ শিল্পের আদর্শ।

মনের কোন হেরফের বা কল্পনার কোন কঠিন তরঙ্গ এ সব মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়নি। রোমের দৃষ্টি ছিল মর্ত্ত্যের দিকে, স্বর্গের দিকে নয়। রোমের আইন কানুন

জগদ্বিখ্যাত সমগ্র ইউরোপের আইন রোমক আদর্শে তৈরী। রোম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা তৈরী করে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে চায়—কিন্তু তা'তে সফল না হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় সভ্যতার কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ হ'তে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। মাটি খুঁড়ে আশ্চর্য্য সহর মহেন-জো-দড়ো আবিষ্কার হয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে বেদের কল্পনায় অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা আবির্ভূত হন। শক্তি যেখানে, সেখানেই ভগবানের প্রকাশ সকলে অনুভব করে—তা'তে বহু দেবতা সৃষ্ট হয় মানুষের কল্পনায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্রাদি দেবতা, মর্ত্ত্যে অবতারগণ এমনি করে' পূজা লাভ করলেন।

ভারতীয় দেববাদ অতি কঠিন সৃষ্টি। বিখ্যাত জর্ম্মণ দার্শনিক কাউণ্ট কেইজারলিন্ বলেছেন, অদৃশ্য ও কল্পিত জগতকে এ রকম বিস্ময়কর রূপ কোন সভ্যতাই দান করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধকে মধ্যবিন্দু একটি নূতন দেববাদ সৃষ্টি করে। এর ভিতর এক বুদ্ধ হয়ে যান পঞ্চবুদ্ধ—এদের নাম হচ্ছে—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও রত্নসম্ভব। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগ অসংখ্য দেবতা কল্পনা করে নব নব চিন্তা ও তত্ত্বকে রূপ দানের চেষ্টা করে।

নরসিংহ

এর ভিতর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় একটি বড় ব্যাপার। নিত্য নূতন সৃষ্টি হচ্ছে—সে সব রক্ষিতও হচ্ছে এবং পরে তাদের ধ্বংসও দেখা যায়। কাজেই ভগবানের এই ত্রিমূর্ত্তি নিয়েই পূর্ণধারণা কল্পিত হয়েছে। এসব দেবভাবকে নানারূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাবে বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বাঙ্গলা দেশে তৈরী হয়েছে।

রত্নহার, রত্নবলয়, রম্য উপবীত প্রভৃতি এই মূর্ত্তিকে এক চমৎকার শ্রী দান করেছে। মুখেতে প্রসন্নভাব, আবার সকল দিকে হাত বাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত, এ রকম একটা অবস্থা এই মূর্ত্তিতে দেখান হয়েছে। অন্য দেশের মূর্ত্তিকলায় এরকম বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের দুর্গামূর্ত্তিতেও এজন্য দশভুজা আছে।

এ প্রসঙ্গে বহু মস্তকযুক্ত মূর্ত্তিও কল্পিত হয়েছে। এলিফেন্টা গুহার মহেশ্বর মূর্ত্তিতে তিনটি মস্তক আছে—পুরীর মাতৃকা মূর্ত্তিতে তিনটি মুখ আছে। জগতের ইতিহাসে স্বর্গবিহারী দেবগণের এরূপ বিভূতি কোন সভ্যতাই দান করতে পারেনি।

অপরদিকে পৃথিবীর নীচে যে পাতাল রাজ্য কল্পনা হয়েছে, তারই অধিপতি নাগরাজের কল্পনা হয়েছেও চমৎকার। অতি সুদর্শন, বিনীত মূর্ত্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। অজন্তাতে নাগরাজের মূর্ত্তি আছে—ময়ূরভঞ্জের খিচিঙ্গেও এরকম মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। আবার এসিয়ার দক্ষিণে ইন্দোচীনেও নাগরাজের বিরাট মূর্ত্তি খোদিত হয়েছে।

পশুর মুখ ও মানুষের দেহের সহযোগে কিম্বা মানুষের মুখ বা পক্ষীর দেহের সহিত যোগ করেও চমৎকার মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে। গণেশ মূর্ত্তি সিদ্ধিদান করে—গরুর মূর্ত্তি বিষ্ণুর বাহন এবং পরমভক্ত। এসব মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে নানা রসের অবতারণা করা হয়েছে। স্বর্গীয় দেবতাদের এত বিচিত্ররূপ কোন সভ্যতা দান করেনি।

অপরদিকে জলে স্থলে যে সব দেবমূর্ত্তি কল্পনা হয়েছে, তাদের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। যমুনা নদী শ্রীকৃষ্ণের বিহারের ক্ষেত্র বলে সকলে নমস্য হয়েছে। যে শিল্পী যমুনার মূর্ত্তি তৈরী করেছে সে এই মূর্ত্তির ভিতর মাধুর্য্য, শ্রী এবং একটি মধুর ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হবে। কাজেই মর্ত্ত্যের দেবতাও ভারতে স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করে সকলের প্রীতি উৎপন্ন করে।

এলিফেণ্টা গুহার মূর্ত্তির রচনাকাল হচ্ছে ৬০০—৮০০ খ্রীঃ। বাঙ্গলার মূর্ত্তিকলার যুগ দশম হ'তে ত্রয়োদশ শতাব্দী। ভারতে মহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পার মূর্ত্তি কলার সময় হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০। কাজেই ভারতের স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের কল্পনার ধারা বহু শতাব্দী হ'তে চলে এসেছে। জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ হ'তে দেব-কল্পনার আদর্শ পেয়েছে। মধ্য এসিয়ার বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি অতি চমৎকার।

প্রাচীন সভ্যতার অন্য ক্ষেত্র হচ্ছে মিশর। এখানকার অধিবাসীরাও দেব-কল্পনা করেছে। দেবতাদের ভিতর অসিরাস বিখ্যাত। আবার মর্ত্ত্যেও নর নরসিংহ কল্পনা করেছে। সিংহের দেহ ও নরের মুখভঙ্গী নিয়ে। মিশরের ইতিহাস খুবই প্রাচীন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৪৫০ হ'তে ৭৭৬ পর্য্যন্ত এই সভ্যতার সজীব অস্তিত্ব ছিল। এখানকার পিরামিড জগতের একটি বিস্ময়। সম্রাট খেফ্রেন গিজের পিরামিড নির্ম্মাণ করেন। এ সমস্তের রচনাকাল হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৮০০ সাল। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে লক্ষ্য করে' এইভাবে প্রাচীন এই তিনটি প্রসিদ্ধ সভ্যতা এই রকমের অপরূপ সৃষ্টি করে' জগতের বিস্ময় উৎপন্ন করেছে। মিশরের লোকেরা মনে করত মৃত্যুর পর মর্ত্ত্য হ'তে আত্মা চলে যায় স্বর্গে—পরে আবার ফিরে এসে মৃতদেহে প্রবেশ করে থাকে। এজন্য মৃতদেহ অটুট রাখ্‌বার ব্যবস্থা আছে। নানা মশলা দিয়ে মৃতদেহ রাখা হয়—তাদের মমি বলে। আবার পাথরের প্রতিমূর্ত্তিও রাখা হয় যাতে করে স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে এসে আত্মা আবার মানুষ ও পশুপক্ষীর জীবন দান করে। এ সব মূর্ত্তি পিরামিডে রক্ষা করা হয়, কাজেই মিশরের পিরামিডগুলি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সেতু স্বরূপ।

গুপ্তধন

বন্দে আলি মিয়া

রসিক কুণ্ডু ডাক্‌সাইটে কৃপণ,—সকাল বেলায় তার নাম নিলে হাঁড়ি ফাটে—সারাদিন আহার জোটেনা। আট হাত ধুতি আর হাত কাটা সার্ট ছাড়া তার অন্য বেশ ভূষা কখনো কেউ দেখেনি। দু'পয়সার চিংড়ি মাছ আর পুঁই ডাঁটা তার নিত্য দিনের বাজার।

এ হেন রসিকের ঘাড়ে বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ আর তার বছর বারো তেরো বয়সের একটি ছেলে মাণিক এসে আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেটি অতিশয় হাবা এবং সেই কারণেই অতিরিক্ত বাধ্য! রসিককে সে বাঘের মত ভয় করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কাকাটিকে সে চিনে নিয়েছে, সুতরাং মুখ থেকে কথা খস্‌তে না খস্‌তেই মাণিক কাজ করতে ছুটে যায়।

রসিকের বাজার হাটটা করা, গরু বাছুরটা মাঠে চরানো, কাঠ চেলাই ইত্যাদি সব কাজই এই বালকটিকে কর্‌তে হয়। ইহার আগমনের পর থেকে রসিক সংসারের অনেক কাজ অবসর নিয়েছে। তাই সারাদিন তার একরূপ বসে বসেই কাটে। থেলো হুঁকা টানে আর বসে বসে মৎলব আঁটে।

গত রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে অবধি রসিকের চিন্তার অবধি ছিলো না। তার বসত-বাটীর দক্ষিণ দিকে একটা ডোবা—ডোবার ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে অনেক কালের একটা অশথ গাছ, গাছের শাখা থেকে থোকা থোকা ঝরি নেমে মাটিকে আঁকড়ে ধরেছে—ইহার নীচে আছে এক ডেক্‌চি মোহর। সেই ডেক্‌চির পাহারায় আছে একটা কালনাগ আর একটা শঙ্খচূড় সাপ। যক্ষ রসিককে এই ধন ভোগ কর্‌বার জন্য গ্রহণ কর্‌তে স্বপ্নে আদেশ করেছেন। কিন্তু সর্ত্ত, যে এই ডেক্‌চিটা প্রথম স্পর্শ কর্‌বে তার সঙ্গে রসিকের রক্তের সম্পর্ক থাকা চাই—তাকে যক্ষ গ্রহণ কর্‌বে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে তখনি সে হতভাগ্যের প্রাণান্ত হবে।

রসিক চিন্তায় পড়্‌লো—কা'কে দিয়ে ডেক্‌চিটা খুঁড়ে তোলা যেতে পারে। তার তিনটি মাত্র পুত্র—যক্ষের বলি এদের হতে কাহাকেও দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু অত গুলি মোহর! বলির অভাবে এই রাজ ঐশ্বর্য্য হাত ছাড়া করা একেবারেই অসম্ভব।

মাণিকের সঙ্গে তো রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। তাকে দিয়ে কার্য্যটা উদ্ধার করলে

কেমন হয়! কিন্তু সে যে তার বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। বিধবার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা ওই বালকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাকে কী করে যমের মুখে এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে?

তবে? তবে কি সে অতগুলো মোহর নেবে না? অতি তুচ্ছ কারণের জন্য পিছিয়ে আসবে? কখনো নয়।

রসিক মেটে ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ঠেসান দিয়ে চুপ করে তামাক টান্‌ছিলো। পদশব্দে চেয়ে দেখ্‌লে মাণিক এক বোঝা ঘাসমাথায় নিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌ছে।

রসিক তার দিকে চেয়ে বল্‌লে: মান্‌কে, আজ এত বেলা গেলো কেনরে?' তোকেই আমি খুঁজছিলুম যে।

মাণিক ঘাসের বোঝাটা মাটিতে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, কেন কাকা?

রসিক বল্‌লে: একটা সাবল আর একটা কোদাল যোগাড় কর দিকি। ভোর রাত্রের দিকে আমরা একটা জিনিষ তুলে আন্‌বো। কাউকে বলিস্ না যেন—শুধু তুই আর আমি যাবো।

এখানে এসে অবধি মাণিক এমন মিষ্টকণ্ঠের কথা রসিকের মুখে কোনদিন শোনেনি। আনন্দে সে গলে গেল। সারা মুখ তার হাসিতে বিস্ফারিত করে জবাব দিলে: সে আমি ঠিক করে রাখবো'খন। আমি তো বাইরের ঘরেই থাকি—তুমি যখন যাও আমায় ডেকে নিয়ে যেও। মাণিক মনে কর্‌লে না জানি কি মজার বস্তুই কাকা তাকে সঙ্গে নিয়ে আন্‌তে যাবে। সে খুব খানিকটা কৌতুক বোধ কর্‌লে।

রাত্রি প্রায় তিনটা। রসিকের ডাকে মাণিক ধড়্ মড়্ করে বিছানার ওপরে উঠে বস্‌লো। এক হাতে হ্যারিকেন ও অপর হাতে লাঠি নিয়ে রসিক দাঁড়িয়ে ছিলো—মাণিক সাবল ও কোদাল ঘরের কোণ থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ কর্‌লে।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী। শেষ রাত্রির দিকে জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠেছে। আলোর প্রয়োজন ছিলো না তথাপি জঙ্গলের পথ এবং যক্ষের ধনের পাহারায় ছুটো সাপ রয়েছে ইহা সে স্বপ্নে দর্শন করেছে—সুতরাং লাঠি ও হ্যারিকেন সঙ্গে না নিয়ে সে যেতে সাহস পায় নি! গাছপালার ঝোপ্ সরিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ছু'জনে চলেছে, আগে হ্যারিকেন হাতে মাণিক—পেছনে রসিক।

অশথ গাছের কাছাকাছি এসে রসিকের বুকটা ছুরু ছুরু করে উঠ্‌লো। সত্যিই যদি

সাপ ছুটো তেড়ে আসে! কী কর্‌বে সে? মাণিককে না কাম্‌ড়িয়ে যদি তার উপরেই অনুগ্রহ করে তবে এই মোহরের স্তূপ ভোগ করবে কে? না—না—এসব ছুশ্চিন্তা এখন নয়। রসিক মুখে কাষ্ঠহাসি টেনে আন্‌লে। ভাবলে—বৃথা ভয় শুধু কাপুরুষদের জন্যই।

রসিক দিনের বেলায় জায়গাটি চিনে রেখে গিয়েছিলো, সুতরাং অতি অল্প চেষ্টাতেই খুঁজে বের কর্‌তে পার্‌লে। দূরে থেকে বিশেষ লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লে, সাপ খোপ কিছু নেই তো!

মাণিক প্রশ্ন কর্‌লে: কি কাকা?

রসিক তিক্ত কণ্ঠে বল্‌লে: তোর মাথা? ওই বটের ঝুড়িটা দেখছিস্—ওইখানে সাবল ঠুকে দেখ্ কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা।

মাাণক হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখে সাবল দিয়ে মাটিতে আঘাত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ছু'চার বার আঘাত কর্‌তেই ঠুন্ করে একটা শব্দ হ্‌লো।

রসিক আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠলো: হয়েছে রে হয়েছে—ঠিক—ঠিক—ওখানেই রে মান্‌কে, ওখানেই। বাবা, লক্ষীছেলে, তোকে ঘুড়ি লাটাই কিনে দেবো মান্‌কে। বল্‌তে বল্‌তে মাণিকের দিকে এগিয়ে এলো। ভুরু কু'চ্‌কে স্থানটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে: সাবল রেখে কোদাল দিয়ে খুড়তে সুরু কর্। মস্ত বড়ো ডেক্‌চি—পেল্লায় ডেক্‌চি—খালি মোহর—হাজার হাজার মোহর।

কাকার কাছে থেকে উৎসাহ পেয়ে মাণিক মনের আনন্দে কোদাল চালাতে লাগ্‌লো খানিকক্ষণের মধ্যেই ডেক্‌চিটা মাটির ওপরে জেগে উঠ্‌লো। অনেক কালের পুরাণো জিনিস মাটির নীচে কতদিন ধরে পোঁতা ছিলো—বিশেষ মলিন হয়েছে বলে মনে হলো না।

রসিক চাপা কণ্ঠে বল্‌লে: হয়েছে—হয়েছে—নে—এখন ওটা টেনে ওপরে তোল দিকি।

মাণিক প্রাণপণ চেষ্টা করেও ডেক্‌চিটা এতটুকু নড়াতে পার্‌লে না। বল্‌লে: বেজায় ভারী কাকা, আমি একা তো পার্‌ছি না—তুমি এসো।

—তুমি এসো—উল্লুক, থালা থালা ভাত মার্‌তে তো খুব ওস্তাদ। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলো রসিক।

বকুনি হজম করে মাণিক যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। গা দিয়ে দর্ দর্ করে ঘাম ঝর্‌তে লাগলে।

রসিক দেখলে মাণিক সত্যি সত্যিই পেরে উঠছে না। তাই স্বরটা একটু নরম করে বল্‌লে: উপরের ঢাকনিটা সরা দিকি মান্‌কে—দেখি ভেতরে কী আছে!

শুধু হাতে উপরের আচ্ছাদনী অপসারিত কর্‌বার চেষ্টা করে মাণিক কৃতকার্য্য হতে

পার্‌লে না। সাবল দিয়ে চাঁড় দিতেই ঢাক্‌নাটা সরে গিয়ে ভেতরের টাকাগুলো বাতির আলোয় চক্‌ চক্‌ করে উঠলো।

ওঃ, রূপার টাকা এরি জন্যে এত মেহনৎ! রসিক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়্‌লে। তবু একেবারে নিরাশ হতে হয়নি। রূপোর টাকাই কি কম! এতটাকা জীবনে একসঙ্গে পাওয়া, দূরে থাক কোনদিন সে দেখেইনি।

কিন্তু মুশ্‌কিল হলে, মাণিককে নিয়ে। সে ছেলেমানুষ—

—কী করে এত বড়ো ডেক্‌চিটা একা বয়ে নিয়ে যাবে! স্বপ্নে দেখেছে—প্রথমে যে স্পর্শ কর্‌বে তাকেই যক্ষ গ্রহণ কর্‌বে। সে হিসাবে মাণিকই প্রথম স্পর্শ করেছে। এবারে রসিক স্পর্শ কর্‌তে পারে, কারণ যক্ষ তাকে যখন অর্থটা ভোগ কর্‌বার জন্য দান কর্‌ছে তখন সে ছাড়া আর কে স্পর্শ কর্‌বে! রসিক এগিয়ে এসে বল্‌লে: নে ধর্‌—দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে যাই।

দু'জনে ডেক্‌চিটাকে গড়িয়ে বাড়ীর উঠানে এনে হাজির কর্‌লে। রসিক হাঁপাতে হাঁপাতে শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরে বল্‌লে: ও বউ ওঠ্‌ ওঠ্‌ দ্যাখ্‌ কী এনেছি ওঠ্‌, এক ছিলিম তামাক সেজে দে।

বউ ঘুমিয়ে ছিলো—স্বামীর আহ্বানে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে টাকা ভরা ডেক্‌চি দেখে সে তো হতভম্ব। জিজ্ঞেসা কর্‌লে: হ্যাঁ গো, এ সব কোত্থেকে আন্‌লে?

জবাব দিতে গিয়ে রসিক স্তম্ভিত হয়ে দেখ্‌লে, দুটো সাপ রান্না ঘরের ওপাশ থেকে উঠানের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ কর্‌ছে।

'ওরে বাপ্‌' বলে মাণিক একলাফে বারান্দায় গিয়ে উঠ্‌লো। রসিক অতটা চাঞ্চল্য প্রকাশ কর্‌লে না, আস্তে আস্তে নিরাপদ স্থানে গিয়ে বউকে উদ্দেশ্য করে বল্‌লে: এই ধনের পাহারায় ওনারা অনেকদিন ছিলো কিনা, তাই মায়া ত্যাগ কর্‌তে পারেনি—আমরা নিয়ে এসেছি, তাই সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌তে এসেছে। হ্যাঁ দ্যাখো, খোকাদের দুধ যদি থাকে, তবে খানিকটা দাও তো—ওনাদের খেতে দিই।

বউ দুটো মুছিতে দুধ এনে রসিকের হাতে দিলে। রসিক মাণিককে ডেকে বল্‌লে: মুছি দুটো উঠানে দিয়ে আয় তো বাবা—ওনারা সেবা করে চলে যাক্‌।

মাণিক আপত্তি করে জবাব দিলে: না কাকা, ও আমি পারবো না—তুমিই দিয়ে এসো।

একটা সাপ ততক্ষণে ডেক্‌চির মাথার ওপরে উঠে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছে। অপরটা নীচে চক্র তুলে দুল্‌ছে।

মাণিক গেল না—মানে, তাকে প্রহার কর্‌লেও সে যাবে না, রসিক ইহা বুঝতে পার্‌লে

—অগত্যা তাকেই যেতে হলো। দু'হাতে দুটো মুছি নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। উঠানের উপরে দুধটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সাপটা বিদ্যুৎগতিতে এসে তার পায়ে মার্‌লে এক ছোবল। 'উঃ বাবারে' বলে রসিক ক্ষতস্থান চেপে ধরে বসে পড়্‌লো।

স্বামীর বিপদ দেখে রসিকের স্ত্রী ঘর থেকে একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে উঠানে নেমে এলো। যে সাপটা ডেকচির মাথার ওপরে শুয়েছিলো—ঝুপ্‌ করে মাটিতে নেমে সে তেড়ে গেল বৌর দিকে। বৌ সভয়ে পিছু ফির্‌তেই সাপটা তার বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপরে একটা ছোবল মেরে চক্ষের পলকে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এমন অভাবনীয় ব্যাপার ঘট্‌বে মাণিক তা বুঝ্‌তে পারেনি। এইবার সে চীৎকার করে উঠ্‌লো। গোলমাল শুনে মাণিকের মা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে, দেবর ও ভাজ উঠানের ওপরে পড়ে যন্ত্রনায় কাৎরাচ্ছে।

মাণিকের মা'র চ্যাচামেচিতে পাড়া পড়্‌শীরা ছুটে এলো। মেয়েছেলেরা 'হায়' 'হায়' কর্‌তে লাগ্‌লো—পুরুষেরা চল্‌লো রোজা ডাক্‌তে।

আজিডাঙা, কাজিডাঙা থেকে রোজা এলো—বদ্যি এলো। রসিক আর তার বউ বেলা এক প্রহর হতে না হতে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটিয়ে চোখ মুদ্‌লে।

রেডিও

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসী জনের প্রিয় রমনীয় রেডিও
কালাদেরও কানে দিতে সংবাদ ready ও!
তেতলার ফ্ল্যাটে খোঁজো পাবে দেখা ওখানে,
রাস্তার ধারে ধারে ছোট বড় দোকানে।
পার হয়ে চলে আসে গিরি বন নদীও,
হাটে হাঁড়ি ভাঙা ওর স্বভাবটি যদি ও,
তবু ওকে ভালবাসে দেশে দেশে বাঙালী!
রবি ঠাকুরের গান শুনতে সে কাঙালী!
এতদিন শুনিয়েছে নানা সুর সেতারে
কত কথা উপকথা নাটক সে বেতারে
যুদ্ধের হাঙ্গামা শুনি ওর খবরে,
ঘুমহারা যায় কারা জীবন্ত কবরে!
রাত জেগে বসে বসে কেউ ধরি 'মস্কো'
কেউ ধরি 'বার্লিন'—'সান্‌ ফ্রাসিস্‌ কো'!
পাশাপাশি ঘাটে পাই পৃথিবীর রেডিও
ফেটে গেলে 'ভাল্‌ভ' বুঝি কী মর্ম্মভেদী ও।

পৃথিবীর ছাদ ও কস্‌মিক্ রশ্মি

শ্রীধর

বুড়ী দিদিমার কোলে শুয়ে আমরা সকলেই শুনেছি, পৃথিবীর মস্ত ছাদ আছে। যে ছাদে রাতে তারার আলো ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলে, যেখান থেকে চাঁদামামা তার সবুজ আলো পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেয়।

আজ বৈজ্ঞানিকরাও বলেন বৈকি, পৃথিবীর ছাদ আছে, নিশ্চয়! বাড়ীর যেমন ছাদ থাকে তেমনি পৃথিবীর ঠিক ওপরের ছাদের নাম—বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)। অবশ্য এ বায়ুমণ্ডলরূপী পৃথিবীর ছাদ প্রায় ৫ মাইল গভীর। কিন্তু এই ছাদ আমাদের ঝড়, জল, বৃষ্টি, সূর্য্যের তাপ থেকে রক্ষা করা দূরে থাক, যত ঝড়ঝাপ্টা ঐ ছাদ থেকেই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। রক্ষা করে না বটে, কিন্তু রক্ষা করে না বলেই রক্ষে, নইলে জল হাওয়া সূর্য্যালোক না পেলে কি পৃথিবীর মানুষ কখনও একদিনও বাঁচতো? তাই পৃথিবীর ছাদ এই বায়ুমণ্ডলই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্ত্তা।

কিন্তু এই বায়ুমণ্ডলেরও আবার একটা বড় রকমের ছাদ আছে বলে বৈজ্ঞানিক বাজারে গুজব। বায়ুমণ্ডলের সেই ওপর অংশ, সেই ছাদের নাম—ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere), পৃথিবী থেকে সাত মাইল উঁচুতে উঠলে এই ছাদটির নাকি নাগাল পাওয়া যায়! কিন্তু এই দুটি ছাদের—বায়ুমণ্ডল ও ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার, এদের মধ্যে তফাৎ কি শুধু উচ্চতায়? না, শুধু উচ্চতায় নয়, অনেক কিছুতেই ওদের তফাৎ। প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলের মত এই ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে ঝড়, জল মেঘ বৃষ্টি নেই, দ্বিতীয়তঃ এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য—এর তাপ সব সময় একই রকম সমান, কম বেশী নেই। এই জন্য ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের প্রথম নাম দেওয়া হয়েছিল সমতাপী মণ্ডল (Isothermal layer)। বেলুনে থার্ম্মোমিটার লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, সে বেলুন সাত মাইল উঁচুতে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে পরিভ্রমণ করে এসে জানাল, তার তাপ সবসময় স্থির, সবসময়ে শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ৫৭ ডিগ্রী কম অর্থাৎ :—৫৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অর্থাৎ সেখানকার আবহাওয়ার কোনই পরিবর্ত্তন নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই—জল ঝড় বৃষ্টি হীন নির্ম্মল এই ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার।

ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার আবিষ্কার হওয়ার আগে লোকের ধারণা ছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলে

যত উঁচুতে উঠবে ততই ঠাণ্ডা বাড়বে আর বায়ুর গতিও তত বাড়বে। কিন্তু সাত মাইল ছাড়িয়ে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে একই রকম ঠাণ্ডা, আর বায়ুরও কোন গতি নেই, এখন কি বায়ু বলতে আমরা যা বুঝি, সেরকম জিনিষেরও বেশ অভাব। বায়ুমণ্ডলে এরোপ্লেন চালান সময় সময় কত বিপদজনক হয় তা তোমরা জানো। বিপদ বেশীর ভাগ আসে বায়ুমণ্ডলের ঝড় ঝাপ্টা বৃষ্টি প্রভৃতি নানা উপদ্রব থেকে। তাহলে বুঝে দেখ ঝড়ঝাপ্‌টাহীন ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে এরোপ্লেন চালান কত সুবিধের হবে, কোন বাধা উপদ্রব, কোন বালাই সেখানে নেই। ঘণ্টায় সাতশ আটশ মাইল বেগে অনায়াসে স্বচ্ছন্দে এরোপ্লেন চালান যাবে! ঝড়ঝাপ্‌টা নেই, বায়ুর বাধা নেই এরোপ্লেনের গতিকে আটকাবে কে? তখন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত ঘুরে আসা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার হবে। অবশ্য কোনরকম বাধা একেবারেই নেই বল্লে বড্ড ভুল বলা হবে! প্রথম বাধা সেখানকার ঠাণ্ডা, শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ৫৭ ডিগ্রী কম, চারটিখানি কথা নয়, আর দ্বিতীয় উপযুক্ত অক্সিজেনের অভাব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার বিহারী প্লেন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। প্লেনের ভেতর উপযুক্ত গরম রাখা ও যথেষ্ট অক্সিজেন সঞ্চয় করে রাখবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে পৃথিবী থেকে সাড়ে সাত মাইল উঁচু পথে এরোপ্লেন চালান সবচেয়ে সুবিধের।

এই ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার নাকি প্রায় ২৫ মাইল গভীর। এর পরে যে স্ফিয়ার আছে অর্থাৎ কিনা আরেকটি ছাদ, তার নাম ওজোনোস্ফিয়ার (Ozonosphere), তারপরের যিনি আছেন, তার নাম আয়োনোস্ফিয়ার (Ionosphere), তারপরের খবর আর আমরা জানি না এই যথেষ্ট; শোনা যায়, ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে যে স্তর সেখান থেকে ঠাণ্ডা আবার কম্‌তে থাকে। হয়ত এসব স্তরেও মানুষ একদিন উঠতে পারবে, সেদিন যে মানুষের স্বর্গলাভ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদিকে যে বায়ুমণ্ডলে আমরা আছি তার ওপরে এবং ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের নীচে একটি ছোট দু মাইল গভীর স্তর আছে, সেটার নাম ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere), এটাকে বায়ুমণ্ডলেরই একটি অংশ বলা যেতে পারে।

কিন্তু ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের সবচেয়ে গভীর রহস্য হচ্চে—কস্‌মিক্ রশ্মি। এই কস্‌মিক্ রশ্মির রহস্য সন্ধানের অভিযানেই বল্‌তে গেলে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অবশ্য কস্‌মিক্ রশ্মির উৎপত্তি স্থল ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার নয়, তারও অতীত কোন অজানা জায়গা বা স্তর, বা কোন গ্রহ উপগ্রহ বা তারা থেকে হয়ত এই কস্‌মিক্ রশ্মি বিকিরণ হচ্ছে।

এই রহস্য রশ্মি নেমে আস্‌ছে, নেমে এসে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে নানা উপদ্রব নানা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যখন এই রশ্মির উপস্থিতি ও পরিচয় টের পাওয়া গেল, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল সাড়া পড়ে গেল। কারুর কারুর বিশ্বাস যে

ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার না থাক্‌লে এই কসমিক্ রশ্মির রোষে পৃথিবী হয়ত রসাতলে যেতো! কিন্তু কোথেকে এই রশ্মি আসছে? কোথায় কিরকম এর রূপ? সুরু হল নানা অভিযান, নানা দেশে নানা গবেষণা! জলের তলায়, খনির নীচে, পাহাড়ের চূড়ায়, বায়ুমণ্ডলে, বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে, চলল খোঁজাখুঁজি। জলের তলায় দেখা গেল, এই রশ্মির প্রভাব বেশ কম। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে এই রশ্মির যা জোর, জলের তলায় এর জোর তার বারো ভাগের এক ভাগ। ছ'শ ফিট জলের নীচে এর প্রভাব নেই বল্‌লেই চলে। আবার ওপরে উঠে দেখা গেল এই রশ্মির প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ছে। পাহাড়ের চূড়ায় এর প্রভাব বেশ জোর, সমতল ভূমির চেয়ে অনেক বেশী। তারপর আকাশে উড়ল বেলুন, তাতে দেখা গেল যত উঁচুতে ওঠা যাচ্ছে এর জোর একটু একটু করে ক্রমশঃ তত বাড়ছে। পৃথিবী থেকে সতেরো মাইল উঁচুতে অর্থাৎ ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের এক জায়গায় বেলুন উড়িয়ে জানা গেল, এর প্রভাব পৃথিবী থেকে প্রায় পনেরো গুণ বেশী!

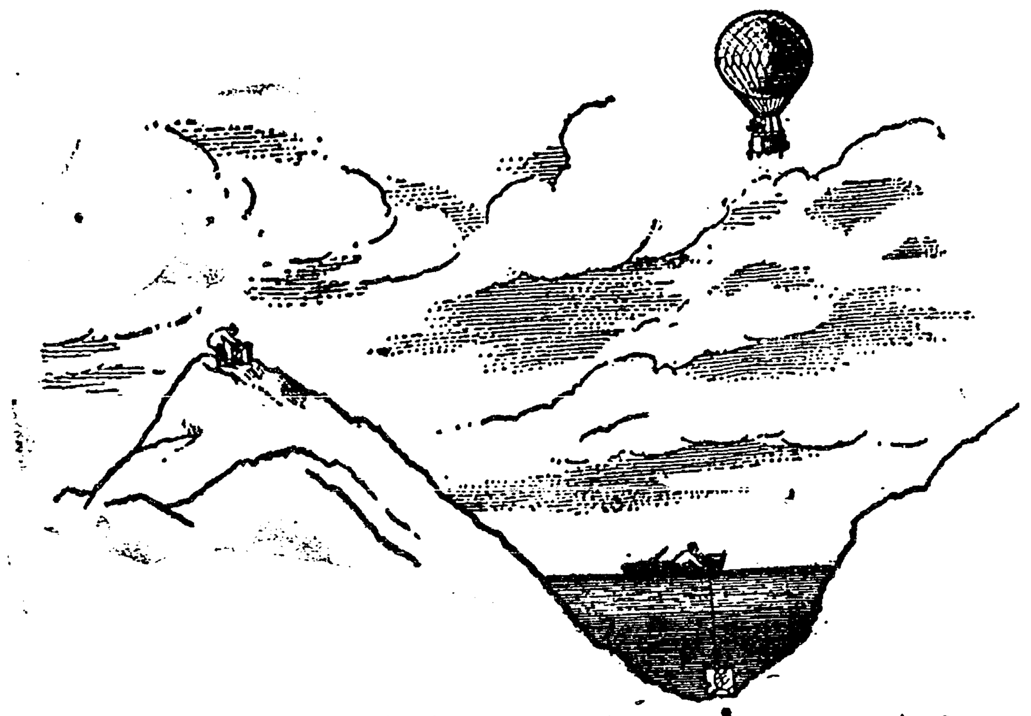

হ্রদের তলায়, পাহাড়ের চূড়ায়, বেলুনের দ্বারা আকাশে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে কস্‌মিক রশ্মির প্রভাব মাপবার জন্য অভিযান সুরু হল

১৯৩১ সালে প্রফেসর পিকার্ড এই কস্‌মিক রশ্মি ধরবার জন্যই বেলুনে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে পাড়ি দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে, ট্রপোসস্ফিয়ার অতিক্রম করে তিনি ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে যখন তাঁর বেলুন দশ মাইল উঁচুতে ভাসছে তখন সেখানকার কস্‌মিক রশ্মির তীব্রতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন অসাড় হয়ে পড়েছিলেন। ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার যেখানে শেষ, তারও সীমানা ছাড়িয়ে কোন জায়গা থেকে নাকি এই রশ্মি আসছে কিন্তু তার জোর এতই বেশী, এতই প্রচণ্ড, যে এত পথ নীচে নেমে এসেও পৃথিবীর বুকেও তার স্পন্দন বেশ জোরেই টের পাওয়া যাচ্ছে, এমন কি খনির নীচে, গভীর জলের তলায় এ রশ্মি প্রবেশ লাভ করছে।

পিকার্ডের পরেও আরো উঁচুতে কয়েকজন উঠতে পেরেছিলেন। ১৯৩৫ সালে ষ্টিভেন্স ও এণ্ডারসন বেলুনে প্রায় চোদ্দ মাইল উঠেছিলেন। ১৯৩৭ সালে এ্যাডাম এরোপ্লেন চালিয়ে দশ মাইল ওপরে উঠেছিলেন। এছাড়া, চালকহীন বেলুন আবহাওয়া

মাপবার নানা যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম নিয়ে আরো অনেক উঁচু থেকে ঘুরে এসেছে। কয়েক বছর আগে এ রকম একটি বেলুন প্রায় সাতাশ মাইল উঁচুতে উঠতে পেরেছিল। সেই সাতাশ মাইল উঁচুর আবহাওয়ার অনেক আশ্চর্য্য খবর সে বেলুনের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ জানতে পারেন। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বেলুনে চোদ্দ মাইল উঁচুতে উঠে সেখান থেকে বেতারবার্ত্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, পৃথিবীর লোকে তা শুনতে পেয়েছিল কিন্তু তাঁরা নিজেরা আর জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেন নি।

আজও ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি বটে, কসমিক্ রশ্মির হদিস্, তার যথার্থ চেহারা আজও মেলেনি বটে, কিন্তু তবুও যে সকল অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক মৃত্যুপণ করে অনেক কিছুরই রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার জন্য সমস্ত পৃথিবী আজ কৃতজ্ঞ। একদিন যখন ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে বিরাট যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ষ্ট্রাটোসপ্লেন নিঃশব্দে নিরাপদে হাজার হাজার মাইল উড়ে চলবে, একদিন যখন কস্‌মিক রশ্মির সাহায্যে মানুষ নানা প্রাকৃতিক বিস্ময় উপলব্ধি করবে, অগাধ প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী হবে তখন আমরা এই বিজ্ঞানীদের যেন শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আর আজকের পৃথিবীর এই দুর্দ্দিনে প্রার্থনা করি, বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার ও এই সাধনা মানুষের দ্বারা ধ্বংসের পথে না চালিত হয়ে যেন শুধু কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়।

রংমশাল

শ্রীরাধারাণী দেবী

রংমশালের সপ্ত রংয়ের শিখা
দিকে দিগন্তে লিখুক আলোর লিখা।
লিখুক সে আলো জ্যোতি-উজ্জ্বল ভাষা,
জ্বালাক্ আঁধার আকাশে আবার আশা।
শিশুর হৃদয়ে আসুক উষসী ধীরে!
চেতনা এবং অবচেতনার তীরে
সাতরঙে রাঙা আলোর রশ্মিগুলি
অন্ধকারের সব দ্বার দিক্ খুলি।
সব দ্বার দিয়ে আসুক জ্ঞানের আলো;
অজ্ঞান মনে রঙের মশাল জ্বালো।
রংমশালের আলোর এ' অভিযান
ছোট ছোট বুকে আনুক খুসীর বান॥

বৌদ্ধ যুগের গল্পসাহিত্য

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

বুদ্ধদেবের কথা শোনেনি এমন লোক এদেশে শুধু কেন, বিদেশেও নেই। আড়াই হাজার বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। তিনি এদেশে নতুন ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। নতুন ধর্ম্ম প্রচার করতে হ'লেই নতুন নতুন তত্ত্বকথা বল্‌তে হয়। তিনি যে সকল তত্ত্বকথা বলেছিলেন, সাধারণ লোক সে সব ভালো ক'রে বুঝতে পারেনি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অর্থাৎ শ্রমণ ভিক্ষুগণ গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে সব তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে আসতেন। কিন্তু তাতেই ত যথেষ্ট হ'লো না। সব দেশ, সব যুগ ও সব শ্রেণীর লোককে ত বুঝানোর জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা চাই। সেজন্য বুদ্ধের ভক্তেরা সেই সব তত্ত্বকথাকে সহজ সরল ভাষায় প্রচার করবার জন্য কলম ধরলেন।

বেদবেদান্তের কথা—উপনিষদের শিক্ষাও দেশের সাধারণ লোক বুঝত না। হিন্দু ঋষিরা সাধারণ লোককে তা' বুঝাবার জন্য নানা প্রকার গল্পের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই গল্পগুলোই পুরাণ নামে চলেছে। সব পুরাণকেই ব্যাসদেবের রচনা ব'লে চালানো হয়েছে। তার ফলে পুরাণগুলো বেদবেদান্তের মত হিন্দুদের শ্রদ্ধা ভক্তির বস্তু হ'য়ে উঠেছে। কোন কঠিন জিনিস সাধারণ লোককে বুঝাতে হলেই গল্পের আকারে প্রকাশ করতে হয়। বুদ্ধের ভক্তেরাও বুদ্ধের মুখের তত্ত্ব কথাগুলো সাধারণ লোকের বোধগম্য করবার জন্য গল্পের সৃষ্টি করলেন। এই গল্পগুলোর নামই জাতক কথা। জাতকের গল্পগুলোই বৌদ্ধ পুরাণ।

এই গল্পগুলো একই সময়ে একই লোকে রচনা করেন নি। বহু বৎসর ধ'রে এই গল্পগুলো ধীরে ধীরে রচিত হয়েছে। এগুলো পালি ভাষাতে রচিত। পল্লীর লোকে যে ভাষা বুঝত, তাই পল্লীভাষা বা পালি ভাষা। সংস্কৃত ভাঙ্গা এই ভাষা সে কালে সকল লোকেই বুঝত। সে ভাষার রূপ ক্রমে ক্রমে বদলে এখন বাংলা, হিন্দী, আসামী ইত্যাদি ভাষার জন্ম হয়েছে। এখনকার লোকে পালি ভাষা আর বোঝে না—সেজন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশের লোক জাতকের গল্পগুলোর পরিচয় পায়নি। অনেক দিন আগেই কিন্তু ওগুলোর ইংরাজিতে তর্জ্জমা হয়েছিল। তা থেকে এখন ওগুলোর বাংলায় তর্জ্জমা হয়েছে। তার ফলে এখন তোমরা এ গল্পগুলার কতক কতক জান্‌তে পেরেছ। অনেকে বলেন, এদেশের লোক গল্প লিখতে পারত—কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু বা কাঠামোটা আবিষ্কার করতে পারত না। আমাদের পুরাণো বাংলা সাহিত্য পড়লে তাই মনে হয় বটে। ৫।৬ শ' বছর ধ'রে বাঙালী কবিরা একই চাঁদসদাগর, শ্রীমন্তসদাগর, কালকেতু ও বিদ্যাসুন্দরের গল্পকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছেন। নতুন গল্প তাদের মাথায় আসত না। কিন্তু জাতক কথা পড়লে মনে হয়, একদিন এ দেশের লোক যেমন অজস্র গল্প লিখতে পারত—তেমনি অজস্র গল্পের প্লটও আবিষ্কার করতে পারত। অবশ্য জাতকের সব গল্পগুলোর প্লট তারা আবিষ্কার করেনি। রামায়ণ মহাভারত ও দেশে বিদেশে প্রচলিত অনেক গল্পও তারা নিয়েছিল—কিন্তু আবিষ্কারই করেছিল বেশির ভাগ। যে গল্পগুলো তারা অন্যত্র হ'তে পেয়েছিল সেগুলোকেও তারা ভেঙ্গেচুরে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিল। হিন্দুভাবের কথাগুলোকে তারা বৌদ্ধভাবে বদলিয়েও নিয়েছিল। তাদের এই অজস্র গল্প আবিষ্কার করবার অদ্ভুত শক্তি দেখলে অবাক

হ'তে হয়। জাতক কথা গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। জানিনা কতগুলো লুপ্ত হ'য়ে গেছে—যা পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যাও কম নয়। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের পর গল্প হিসাবে এই জাতক কথা ঠাঁই পেয়েছিল।

এদেশে যা কিছু লেখা হ'তো তার প্রায় সবই লেখা হ'তো পদ্যে। এমনকি বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, কৃষিবিদ্যা পর্য্যন্ত পদ্যে লেখা হ'তো। সংস্কৃতে গদ্যে লেখার রেওয়াজ না থাকায় গল্প লেখার আগ্রহই ছিল না। তা সত্ত্বেও সংস্কৃতেও কিছু কিছু গল্প সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু জাতক কথার মতন অমন চমৎকার গদ্য সাহিত্য প্রাচীন যুগে আর হয় নি।

জাতক কথাগুলো বুদ্ধদেবের মুখের কথা নয়। বুদ্ধদেবের মুখে কতকগুলোকে বসান হয়েছে—নয়ত বুদ্ধদেবের কোন-না-কোন জন্মের সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ আছে—এইভাবে লেখা হয়েছে। তার কারণ এই, বুদ্ধদেবের জীবনের সঙ্গে এগুলোর যোগ আছে একথা না বল্‌লে লোকের শ্রদ্ধা হবে কেন—গল্পের ভিতরকার সার কথা লোকে বা'র করেই বা নেবে কেন,—সাদরে রক্ষা ও প্রচার করবেই বা কেন—গল্পগুলোর মহিমা ও মর্য্যাদা স্বীকরে কর্‌বে কেন? কথাটা একবারে মিথ্যাও নয়। কারণ, গল্পের ভিতরকার উপদেশটা ত বুদ্ধদেবেরই বটে।

আর একটা কথা—এদেশের ধর্ম্মের সঙ্গে একটু-না-একটু যোগ না থাকলে সাধারণ লোকে গল্পও শুনতে চাইত না। যদি বলা যায়, জাতকের লেখকরা গল্প লিখতেই চেয়েছিল—তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গল্প লেখা। তাহলে বলতে হয়,—সাধারণ লোকের উপভোগ্য করবার জন্যই তারা গল্পগুলোকে বুদ্ধদেবের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রত্যেক গল্পের গোড়ায় আছে—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা—তখন বুদ্ধদেব অমুক হয়ে জন্মেছিলেন। এক ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব বহুবার জন্মাতে পারেন না—ব্রহ্মদত্ত হাজার হাজার বছর বাঁচতে পারেন না। ওটা গল্পের ধরতা মাত্র। প্রত্যেক গল্পেই বোধিসত্ত্ব আছেন—কোনটিতে জীবজন্তুরূপে, কোনটিতে সাধারণ মানুষরূপে, কোনটিতে রাজপুত্র বা রাজপুরুষরূপে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কথা এই—মানুষ বহুবার ইতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে—তারপর ক্রমে মানুষ হয়ে জন্মায়—তারপর মানুষ হয়ে সৎকর্ম্ম কর্‌লে ক্রমে সে ভালো লোকের ঘরে জন্মায়—এমনি ক'রে জন্মে জন্মে তার উন্নতি হয়। শেষে অনেক জন্মের সৎকর্ম্মের ফলে এবং কামনাজয়ের ফলে সে মহাপুরুষ হয়ে জন্মায়। মহাপুরুষ হ'য়ে সে সারাজীবন সৎকর্ম্ম করে—সাধনা করে—জীবের মঙ্গল করে—তপস্যা ক'রে একেবারে নিষ্কাম হয়ে যায়। তখন সে হয় বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব হ'লে তার আর জন্ম হয় না—সে নির্ব্বাণ লাভ করে।

বুদ্ধদেব বলেছেন—আমিও একজন্মে বোধিসত্ত্ব হইনি—ইতর প্রাণী হতে আরম্ভ ক'রে বহু জন্ম পার হয়ে এসে বহু সৎকর্ম্ম ক'রে তবে এ জন্মে বোধিসত্ত্ব হয়েছি। জাতকের গল্পগুলো বোধিসত্ত্বের এই জন্মগুলির কাল্পনিক উপাখ্যান—এক এক জন্মে তিনি এক একভাবে সৎকর্ম্ম করেছেন। তাঁর এই সৎকর্ম্মগুলোকে আশ্রয় ক'রে এক একটা গল্প—রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের ঘটনা কোনটাই নয়—তিনি যে সকল সৎকর্ম্ম করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন—সেই সকল সৎকর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্য ঘটনাগুলোর কল্পনা করা হয়েছে। জন্মে জন্মে সৎকর্ম্ম ক'রে কেমন ক'রে মুক্তির পথে আনাতে হয়,

বুদ্ধদেবের দোহাই দিয়ে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য গল্পগুলো রচিত হয়েছে। যে জন্মগ্রহণ করে—সেই জাতক। বুদ্ধদেবকে বলা হ'ত মহাজাতক। মহাজাতকের জন্মজন্মান্তরের কাল্পনিক কাহিনী ব'লে এগুলোর নাম জাতক।

মূল উদ্দেশ্য বুদ্ধদেবের উপদেশের সারকথা প্রচার হলেও এগুলো গল্পাংশে নিকৃষ্ট নয়। বেশির ভাগ গল্পে গল্পটাই প্রধান হয়েছে—উপদেশটা হারিয়ে গিয়েছে। অনেক গল্পে আবার কোন উপদেশ নেই, কেবল বুদ্ধদেবের কোন-না-কোন জন্মের সঙ্গে যোগমাত্র আছে।

বুদ্ধের উপদেশ কৌশলে গল্পচ্ছলে বুঝানো হয়েছে যে সকল গল্পে সেই রকমের একটা গল্প এখানে বলি :—

বাঁরাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একজন ধর্ম্মভীরু রাজা ছিলেন। দেবদ্বিজে গ্রহগণকে পাঁজি-পুঁথিতে ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। তিনি দাতা ছিলেন—কিন্তু যা কিছু দান করতেন—সবই দেবতার নামে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের। দীনদুঃখীদের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। পুরোহিতদের তিনি মনে করতেন সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ছিলেন বড়ই ভীরু স্বভাবের রাজা। একটা হাঁচি পড়লে বা টিকটিকির শব্দ হলেই তিনি চমকে উঠতেন। একটা স্বপ্ন দেখলেই তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডাকাতেন এবং তার ফলাফল জিজ্ঞাসা করতেন। পণ্ডিতরাও তার একটা বিভীষিকাময় ব্যাখ্যা ক'রে রাজাকে যাগযজ্ঞ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করবার জন্য উপদেশ দিতেন। কেবল স্বপ্ন নয়—একটা উল্কাপাত হলে, একটা শকুনি রাজবাড়ীর উপর দিয়ে উড়ে গেলে এমন—কি রাত্রিকালে কাক কিংবা দিনের বেলায় শেয়াল ডাকলেও তিনি পুরোহিতদের উপদেশে খুব ঘটা ক'রে যাগযজ্ঞ করাতেন। দিনকতক খুব দীনতাম ভুজ্যতাম্ চল্‌ত, পশুবলি হ'ত, ঢাক ঢোল বাজত, পেটুক বামুনঠাকুররা সশব্দে ঢেকুর তুলত, রাজার কর্ম্মচারীরা দুহাতে লুটত—আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হ'ত।

একদিন গভীর রাত্রে রাজা উপরি উপরি আটটা শব্দ শুন্‌তে পেলেন। প্রথমে ডাকুল কয়েকটি বাদুড়, তারপর একটি কাক, তারপর ডাক্‌ল একটি গাভী—তারপর রাজবাড়ীর পোষা কোকিল—তারপর একটি বাঁদর—তারপর একটি পোষা হরিণ—তারপর রাজার আস্তাবলের একটি ঘোড়া—সব শেষে একটি মানুষ গান গেয়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। রাজা উপরি উপরি আটটি ভিন্ন ভিন্ন জীবের কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। রাত্রে আর ঘুম হলো না—ভাবতে লাগলেন—আটটি জীব চক্রান্ত ক'রে কি বিপদের কথাই না শুনিয়ে গেল! এ যে অষ্টবজ্রের মিলন। রাত পোহাবামাত্র রাজা পাত্রমিত্র অমাত্য পুরোহিত ও সভাপণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সকলে এসে উপস্থিত হলে রাত্রির ব্যাপার খুলে বল্‌লেন। প্রধান পুরোহিত মাথা আর পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া ক'রে চোখ বুজে বল্‌লেন—"মহারাজ, এ যে বড় অমঙ্গলের কথা। আপনাকে এজন্য অষ্টাঙ্গ শব্দমেধ যজ্ঞ কর্‌তে হবে।" সমবেত সকলেই এতে সায় দিলেন।

রাজা বল্‌লেন—"যা কর্ত্তব্য হয় আপনারা করুন, আমার ত ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছে।"

পুরোহিত একটা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ তৈরী কর্‌লেন—আটমাস ধ'রে যজ্ঞ হবে। আট হাজার আট শ আটটা পশুবলি হবে,—আটজন পুরোহিতের অধীনে আটশত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ব্রতী হবেন—অষ্টধাতুর দেবীমূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো কর্‌তে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত নগরে হৈ

চৈ পড়ে গেল—যজ্ঞের আয়োজন হ'তে লাগল,—ব্রাহ্মণেরা বগল বাজাতে লাগ্‌ল—ভারে ভারে ভোজ্য দ্রব্য আসতে লাগল।

প্রধান পুরোহিতের এক তরুণ শিষ্য গুরুকে গোপনে ডেকে বল্লেন—"গুরুদেব, আপনি কেন অযথা রাজাকে এই যজ্ঞে ব্রতী করলেন? রাজা আটটা শব্দ উপরি উপরি শুনেছেন—তাতে ক্ষতিটা কি? একশ'টাও শুনতে পারতেন। চারদিকে জীবজন্তু থাক্‌লেই তারা শব্দ করবেই— এতে বৈচিত্র্য কি আছে? আপনি ত আমাকে সকল শাস্ত্রই শিখিয়েছেন—কোন্ শাস্ত্রে আছে যে এরূপ শব্দ শুন্‌লে যজ্ঞ করতে হবে! শব্দমেধ নামে কোন যজ্ঞের কথা ত কোন দিন শুনিনি। কোন্ স্মার্ত্ত সংহিতায় একথা আছে?"

পুরোহিত—বাপুহে তুমি থাম! যে শাস্ত্রে এ ব্যবস্থা আছে সে শাস্ত্রটি তোমাকে পড়ান হয়নি। এ ব্যবস্থা আছে স্বার্থ সংহিতায়,—স্মার্ত্ত সংহিতায় নয়। জনাও বাপু বহুদিন হতে মোটা রকমের পাওনা কিছুদিন ভাগ্যে হয়নি। মাসিক বরাদ্দ বৃত্তিতে ছেলেপুলে নিয়ে আর চলে না। বিয়ে থাওয়া ও ছেলেপুলে হ'লে এ শাস্ত্রে তোমারও জ্ঞান হবে।

শিষ্য—তবে গুরুদেব ওসবের মধ্যে আমি নেই। ভীরু রাজাকে বোকা বানিয়ে দান দক্ষিণা আদায় করা মহা পাপ মনে করি।

পুরোহিত—মূর্খ, দান দক্ষিণা নাই নিলে, ভূরি ভোজনের কথাটা ভুলছ কেন? কাঁচকলা ভাতে খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়নি? মুখ বদলাতে ইচ্ছে করছে না? রাজার অভাব কি বাপু? প্রজায় যোগাবে।

শিষ্য—না গুরুদেব, এ আহারকে আমি শকুনির আহার মনে করি, আমি বিদায় নিলাম। প্রজার বুকের রক্তের চেয়ে কাঁচকলা সিদ্ধ ঢের ভালো।

পুরোহিত—তোমার মত বেকুব শিষ্যে আমার দরকার নেই, তুমি যাও, কখনও তোমার অন্ন জুটবে না।

শিষ্য চলে গেল, কিন্তু ভাব্‌তে লাগ্‌ল কি ক'রে রাজাকে এদের খপ্পর হ'তে বাঁচানো যায়। রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলতে সে সাহস করলে না—রাজাত শুনবেনই না—উপরন্তু তার গঞ্জনার অবধি থাকবে না। এই সময়ে রাজার বাগানে একজন সাধু ক'দিনের জন্য এসেছিলেন। তিনি নির্লোভ সন্ন্যাসী। স্বয়ং বোধিসত্ত্বই এজন্যে সন্ন্যাসী হয়ে রাজার বাগানে এসে বাস করছিলেন। শিষ্য তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল্‌লেন। সন্ন্যাসী বল্‌লেন—"আমি রাজাকে এই স্বার্থপরদের হাত হতে বাঁচাতে পারি, কিন্তু আমি অযাচিত উপদেশ দিতে ত রাজবাড়ী যাব না। রাজা নিজে এসে যদি আমার কাছে অষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন—তবেই তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারি।" তরুণ শিষ্য তখন সাহস ক'রে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "মহারাজ, আপনার বাগানে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন—তিনি অষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা করতে পারেন।" সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি রাজার ভয়ভক্তি ছিল। তাছাড়া রাজা এখন বিপন্ন, তিনি শুনবা মাত্র সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বিপদের কথা জানালেন। সন্ন্যাসী হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন—"মহারাজ এই আটটি শব্দে আপনার বিপদের কোন সূচনা নেই। তবে ঐ শব্দে এই জীবগুলির নিজেদের অভিযোগ জানাচ্ছে, সেটা আপনার শোনা উচিত।" আপনি প্রথমে শুনেছিলেন—কতকগুলো বাদুড়ের শব্দ। তাই না? বাদুড়গুলো কি বলছিলো জানেন?... রাজার বাগানে এলাম ফল খেতে পাঁচ

ক্রোশ দূর হ'তে। রাজা এমনি কৃপণ যে সব ফলন্ত গাছগুলোকে জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

তারপর শুনেছিলেন একটী কাকের শব্দ। আপনার ফটকের উপরে ঐ কাক বাসা বেঁধে ছিল...ফটকের তলা দিয়ে যখন আপনার হাতী যায়, তখন হাতীর মাহুত ডাঙ্গস দিয়ে ঐ বাসায় আঘাত করে—তাতে প্রত্যহ দুই একটি ক'রে কাকের ডিম ভেঙ্গে যায়। তাই কাক বলছিল—এ রাজ্যে কি বিচার নেই ?"

তারপর শুনেছিলন একটি গাভীর ডাক। গাভী বলছিল—"রাজার চাকরগুলো এমন ক্রে আমার দুধ দুইয়ে নেয়, যে বাছুরটা পেট ভরে খেতে পায় না। রাজার গোয়ালে হাজার গাই—রাজার পেট কি কিছুতে ভরে না ?"

তারপর শুনেছিলেন পোষা কোকিলের ডাক। পোষা কোকিল বলছিল "আমাকে খাঁচায় বন্দী ক'রে রেখে রাজার কি লাভ ? আমি ত খাঁচায় থেকে আর্ত্তনাদ করি। আমাকে ছেড়ে দিলে ঐ চাঁপা গাছে বসে আমি মনের আনন্দে গান করতে পারি। আর্ত্তনাদ শুনে রাজার কি লাভ হয় ? আমাকে মুক্ত ক'রে রাজা গান শোনেন না কেন ?"

তারপর শুনেছিলেন পোষা হরিণের ডাক। হরিণটা বলছিল—"পাহাড়ে ঝরণার ধারে কচি ঘাস খেতাম—বাঘের ভয় ছিল বটে—তবু স্বাধীন ছিলাম—সুখে ছিলাম। আমাকে বন্দী ক'রে রাজার কি লাভ ? রাজার চেয়ে বাঘও ঢের ভাল।'

তারপর শুনেছিলেন পোষা বানরের শব্দ। সে বলছিল—"আমি কোন দিন রাজার বাগানে এসে কোন ক্ষতি করিনি—রাজা বিনা দোষে আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন। আমাকে দেখে কেউ আনন্দও পায় না। এমন অত্যাচারী রাজা কেউ দেখেছ ?"

তারপর শুনেছিলেন একটি ঘোড়ার ডাক। ঘোড়াটি বলছিল—"সহিস আমার দানা চুরি করে—আমি পেট ভরে খেতে পাই না। দিন দিন দুর্ব্বল হচ্ছি...দ্রুত রথ টানতে পারি না। সারথি কেবলই পিঠে চাবুক মারে...রাজা দেখেও আমার দুঃখ বোঝেন না। এ রাজ্যে বিচার নেই।

শেষে শুনেছিলেন আমারই গান। আমি গান করতে করতে বাগানে ফিরছিলাম—আমি গাইছিলাম—"হে ভগবান্—রাজাকে মূর্খ স্বার্থপর পাষণ্ডদের হাত হ'তে রক্ষা কর। রাজা কেবল অপাত্রে দান করেন, দেশে লক্ষ লক্ষ কাঙাল দুঃখী রয়েছে তাদের পানে রাজা তাকানও না। ধর্ম্ম কাকে বলে রাজা জানেনও না। ভগবান্ রাজাকে সুমতি দাও।

অষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা শুনে রাজার মন ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হ'ল। সুযোগ পেয়ে তরুণ শিষ্য পুরোহিতদের চক্রান্তের কথা রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন। রাজা রাজ ভবনে ফিরে এসে যজ্ঞ বন্ধ ক'রে দিলেন—পুরোহিতদের দূর করে দিলেন—পোষা জীবজন্তুদের মুক্তি দিলেন—গৃহপালিত জীবজন্তুদের যত্নের ব্যবস্থা করলেন। আর তিনি চিরদিনের জন্য যাগযজ্ঞ ও পশুবলি উঠিয়ে দিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র অনাথ আশ্রম, চিকিৎসাসত্র, অন্নসত্র, জলসত্র, পিঁজরাপোল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করলেন। সন্ন্যাসীর কাছ হতে মন্ত্র দীক্ষা নিলেন এবং ঐ তরুণ শিষ্যকে ভার দিলেন রাজ্যময় জীব সেবার ব্যবস্থার।

প্রবন্ধ

প্রাচীন যুগের আবিষ্কার

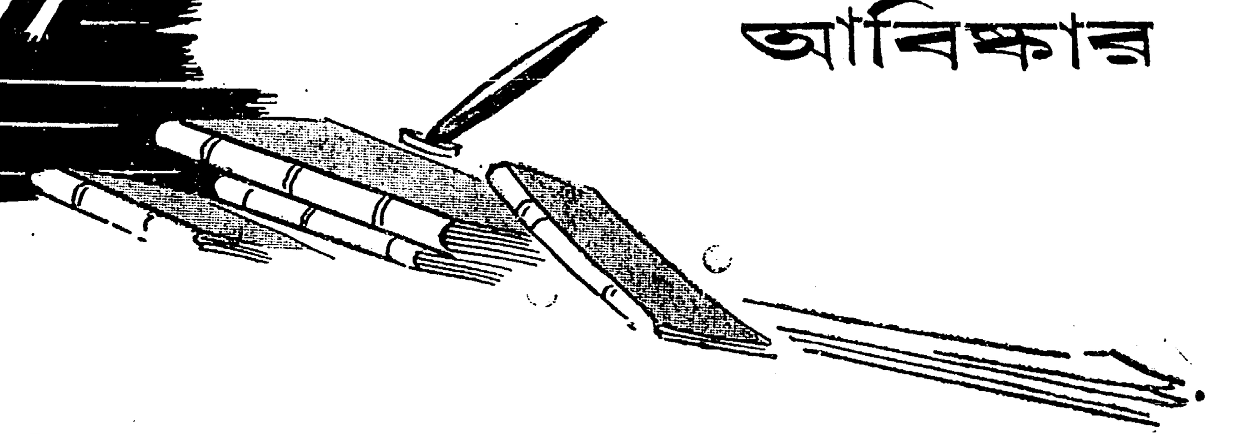

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার আদিম ইতিহাস মানুষের নূতন নূতন অস্ত্র-আবিষ্কারের কাহিনী। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে সর্ব্বপ্রথম মানুষ পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিত; কঠিন প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার বুদ্ধি তখনও সে অর্জ্জন করিতে পারে নাই। তাই সভ্যতার এই যুগকে বলা হয় "ইওলিথিক্" বা প্রাক্-প্রস্তরযুগ। এই সময়ে কাঁচা মাংস আহার করিয়া মানুষ ক্ষুধাতৃপ্তি করিত। তারপর আসিল "প্যালিওলিথিক্" বা প্রত্ন-প্রস্তর যুগ। এ যুগে পাথরের নানা অস্ত্রশস্ত্র নানা জিনিষ মানুষ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। আর এ যুগেই মানুষের শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুগ পরিবর্ত্তনের ফলে ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠ মানুষের পক্ষে অধিকতর বাসোপযোগী হইল। এই নাতিশীতোষ্ণ যুগকে বলা হয় "মেসোলিথিক্"। ইহার ফলে পরবর্ত্তীকালে যে-যুগের উদয় হইল, তাহাকে সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলা চলে। ইহার নাম "নিওলিথিক্" বা নবপ্রস্তর যুগ। এই যুগে বর্শাফলক, শর ও কুঠারফলক, ছুরিকা প্রভৃতি বহুবিধ সুদৃশ্য ও সযত্ননির্ম্মিত প্রস্তরের অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধাদি ও বন্য পশুহননে এই জাতীয় অস্ত্রই তাহার একমাত্র সহায় হইল। নবপ্রস্তরযুগে মানুষ জমি চাষ করিতে ও বন্যজন্তু পোষ মানাইতেও শিখিয়াছিল। তারপর বহুসহস্র বৎসর পরে মানুষের কৌতূহল নিবারণ ও প্রয়োজন সাধনের প্রেরণায় তাম্রযুগের উদয় হইল। তাম্রযুগের পর ব্রোঞ্জ-যুগ ও সর্ব্বশেষ লৌহ-যুগ আসিল।

খনি হইতে লৌহ-আবিষ্কারের পুর্ব্বযুগে আকাশ হইতে পতিত উল্কা খণ্ড লৌহরূপে ব্যবহৃত হইত। লৌহযুগে মানুষ লোহা গলাইয়া আবশ্যকমত অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর মধ্যে সব জাতি একই সময়ে উন্নত হইতে পারে নাই; অনেক জাতি বহুদিন ধরিয়া অসভ্যই রহিয়া গেল। যখন ইউরোপের অধিবাসীরা রেড্-ইণ্ডিয়ানদের প্রথম সাক্ষাৎ পায়, তখনও তাহারা নবপ্রস্তরযুগের অবস্থায় ছিল। আবার ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অবস্থায় ছিল, তাহারা নিজ

অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। কেমন করিয়া কবে মানুষ সর্ব্বপ্রথম ধাতু গলাইয়া নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে শিখিল, তাহা বলা কঠিন। টিন অত্যন্ত কোমল বলিয়া ইহাতে ছুরি বা বর্শাফলক তৈরী হয় না; তামার অস্ত্রাদি থাকিলেও তাহারা খুব ধাতসহ নয়। তবে টিন ও তামা একত্রে গলাইয়া ব্রোঞ্জ নামক যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহা বেশ শক্ত। কিন্তু আদিম মানুষ লোহার বদলে ব্রোঞ্জের ব্যবহার আগে শিখিল কেন? ইহার উত্তর সরল। সামান্য তাপেই টিন ও তামা গলিয়া যায়; কিন্তু লোহা গলাইতে হইলে অত্যন্ত বেশী তাপশক্তির প্রয়োজন। যখন মানুষ হাপরের উদ্ভাবন করিল, তখন লোহার ব্যবহার সম্ভব হইল।

প্রস্তর যুগের মানুষেরা তাহাদের কৃতিত্বের অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের জীবন কাহিনী হাড়ের কলমে বা পাথরের ছুঁচ দিয়া অনেক গুহাগাত্রে আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। স্পেনে মাজ্ দাজিল্ (Mas d'Azil) নামক পর্ব্বত গুহার গাত্রে এইরূপ অনেক ছবি আঁকা আছে। তারপর বারো হইতে পনেরো হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার এই সব অঞ্চলে ধনু ও পালকের শিরোভূষণের চিত্র আছে। একটী ছবিতে দুইজন লোক মধুচক্রে ধূম প্রয়োগ করিয়া মধুমক্ষিকা তাড়াইয়া দিতেছে। এই সব ছবিতে আধুনিক লিখন প্রণালীর সূচনা পাওয়া যায়। যেমন মানুষ আঁকিতে হইলে, আড়াআড়ি ও উপরে নীচে দুইটী রেখা টানিয়া দুই দিকে দুইটী বিন্দু দিলেই হইল। প্রাচীন ঈজিপ্টের লিখন-প্রণালীও এই ধরণের ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই নব প্রস্তরযুগেই মঙ্গোলীয়বংশের একটী শাখা এশিয়ার পূর্ব্ব-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বেরীং প্রণালী (তখন হয়ত এটী যোজক ছিল) অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া বসতি বিস্তার করে। ইহারা শিকার করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন করিত। এক স্থানের পশু-হত্যা শেষ করিয়া আবার স্থানান্তরে গিয়া পশুর সন্ধান করিত। তাই ইহাদিগকে "যাযাবর" বা ভবঘুরে বলা হয়। তাহাদের সাহস, সহিষ্ণুতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি সহজেই বিকাশলাভ করিয়াছিল। তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে আকাশমণ্ডল দেখে তারকার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে শেখে। এই সব আদিম জাতিই আমাদিগকে নক্ষত্রবিদ্যার পথ দেখাইয়াছে।

ঈজিপ্টের আবিষ্কার

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের লোকেরা যে উপায়ে ব্রোঞ্জ তৈরী করিত সে বিদ্যা আধুনিক কালের লোকেরা জানেনা। ঈজিপ্টের আদিম অধিবাসীরা গ্রীক, এট্রুশ্কান্ ও রোমানেরা এই মিশ্র ধাতুতে কাস্তে, ছুরি, তরবারি, বর্শা, করাত ও ক্ষুর পর্য্যন্ত তৈরি করিত। আদিম কালের অনেক খবর খুঁড়িয়া এই সব অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রোঞ্জ প্রথম মিশ্র ধাতু হইলেও পৌরাণিক যুগের লোকেরা অন্য কয়েকটী ধাতুর ব্যবহার জানিত।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে সোণা, রূপা, পিতল, শিসা, লোহার উল্লেখ আছে। অবিমিশ্র অবস্থায় লোহা অপেক্ষাকৃত নরম অবস্থায় থাকে; কাঠকয়লার সঙ্গে পুড়াইয়া ইহাকে শক্ত ইস্পাত করা হইত। সে ব্যবহার মানুষ অনেক পরে শিখিয়াছে। ঈজিপ্টের পিরামিডের মত জিনিষ আজকাল আর তৈরি হয় না। সর্ব্ববৃহৎ পিরামিডটীর উচ্চতা ৪৫০ ফিট। ইহার নির্ম্মাণে যে প্রস্তরস্তূপ নাইল্ নদের উপর দিয়া বাহিত হইয়া গঠনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার ওজন ৪৮,৮৩,০০,০ টন, বা ১৪, ৬৪, ৯০,০০,০ মণ।

পণ্ডিতেরা বলেন, ঈজিপ্ট দেশের আদিম অধিবাসীরাই প্রথমে কাচের আবিষ্কার করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি নামক একজন পণ্ডিত ঈজিপ্‌টদেশের একস্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে ঈজিপে্টর এক রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতির একটী বাক্স উদ্ধার করেন। ইহা প্রায় তিন হাজার দুইশত বৎসরের পুরাতন। ইহার মধ্যে প্যাঁচ্ দেওয়া ছেঁদা করিবার একটী তুরপুন (drill) পাওয়া যায়। এই তুরপুনটী এমন কৌশলে তৈরি যে ইহার দ্বারা যতদূর গভীর ছেঁদা করিয়া সর্ব্বনিম্নস্তরের অংশটীও কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া যায়। পেট্রি সাহেব সেইরূপভাবে কাটা তল-মধ্যস্থ তিনটী অংশ পাইয়া বলেন যে, ইয়োরোপে আজকাল এমন কাটিবার যন্ত্র পাওয়া যায় না। শক্ত পাথর কাটিবার জন্য তাহারা করাত ও হীরাবসানো তুরপুন ব্যবহার করিত। কেমন করিয়া এই সব হীরকখণ্ড যন্ত্রে শক্ত করিয়া বসাইয়া তাহার উপর চাপ দিয়া ঈজিপে্টর কারিগরেরা কঠিন পাথর ইচ্ছামত কাটিয়া লইত, তাহা আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ জানে না। ভারতের মৌর্য্যসম্রাট অশোক একটী লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে। আজ ঐ অশোক-স্তম্ভটী এলাহাবাদ দুর্গের তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। মহাকাল তাহার অপূর্ব্ব চিক্কণতা আজও নষ্ট করিতে পারে নাই। এইরূপ ধাতু নির্ম্মাণ কৌশল বর্ত্তমান যুগের সাধ্যাতীত। মাটী পোড়াইয়া শিশুদের দুধ খাইবার বোতল-নির্ম্মাণেও ঈজিপ্‌টবাসিগণ পটু ছিল। প্রাচীন ঈজিপে্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ঐ দেশে মাটীর মধ্যে নানারূপ অস্ত্র ও সোণা বাঁধানো কৃত্রিম দাঁতও পাওয়া গিয়াছে। তাহারা চশমা ও magnifying glassএর ব্যবহার জানিত। মৃতদেহগুলি একপ্রকার ঔষধ মাখাইয়া সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রে ভাঁজে ভাঁজে তাহারা এমনভাবে জড়াইয়া রাখিত যে উহা পচিয়া বা খারাপ হইয়া যাইত না। এইরূপ একটী ম্যামি কলিকাতার যাদুঘরে আছে; উহার বর্ত্তমান বয়স আড়াই হাজার বৎসর। এ বিদ্যাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই সুপ্রাচীন জাতি রসায়ন বিদ্যা ভাল করিয়াই জানিত। তাহাদের ওজন পাল্লা ছিল, ভগ্নাংশ ও দশমিকের জ্ঞান ছিল। বড় বড় পাথরের ভারি টুকরা তাহারা এক অদ্ভুত উপায়ে স্থান হইতে স্থানান্তরে সহজেই লইয়া যাইতে পারিত। ইজিপ্‌টের পিরামিডগুলিতে ব্যবহৃত বড় বড় পাথরের টুকরাগুলি দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। নীলনদের উর্ব্বর তীর ভূমিতে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি হয়, এখনও তাহার বহু নিদর্শন অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান।

চল্ উধাও

শ্রীবিমল দত্ত

নির্জ্জন গৃহকোণ
ভাল ত' লাগে না আর—
ভালত' লাগেনা ভালত' লাগেনা ভালত' লাগে না আর।
পক্ষীরাজের লাগাম খেঁচিয়া উধাও নিরুদ্দেশ
আজ ঘুরে আসি ছুনয়ার ছায়াপথ
পিছে পড়ে 'থাক্ সাজানো সহর
মানুষের ভীড়, একঘেয়ে নীড়—
নির্জ্জন গৃহকোণ......

ছুধে ধোয়া মোর ছুর্ব্বার ঘোড়া
পক্ষীরাজের বংশধর
কেশর ঝাঁকিয়া অধীর হাঁকিছে
ক্ষুরে ক্ষুরে তার অশনি ডাকিছে
মেলি দিয়া ডানা
মানে নাকো মানা
রূপার তরণী ভাসিয়া যায়
নীল মেঘ ভেদি উধাও উদাস
শাদা মেঘ যেন ভাসিয়া যায়।
পক্ষীরাজের সওয়ার হইয়া
ছুটে চলে দূর দূরান্তর.. ...
নীল আকাশের পারাবার বুকে
শিহরিয়া সুখে
ছুটিয়া যায়
অজানায় সব লুটিয়া যায়
কে দেখিবি তোরা আয়রে আয়
ছায়া হ'য়ে যায় ধোঁয়া হয়ে যায়
পৃথিবী কোথায় মিলায়ে যায়।

ছুধারে ঝড়ের ফোঁপানি হাঁক্
শত সহস্র বাজিছে শাঁখ
সূর্য্য ডুবিছে সূর্য্য উঠিছে
সব কিছু আজ পিছনে হটিছে
ছুর্ব্বার গতি পক্ষীরাজের পিঠে চাড় হই
নিরুদ্দেশ,
তেপান্তরেরও মিলিছে শেষ।

সাত সমুদ্র ছুলিছে রুদ্র,
নীচে আরো নীচে
ঐ গেল পিছে
ঝিলিমিলি জ্বলে রূপালি জরীর
ঝলোমলোময় সাড়ীর পাড়
তেরো নদী যেন জড়ানো নাগিনী
দূর-দূরান্তে খায় আছাড়।

ছাড়্ গো ছাড়্
আব্ছায়া ঘেরা প্রাচীর ডিঙায়ে
ঐ সে মেরেছে বিরাট্ লাফ
সাবাস্ তুরগ ভেদি' আঁধার
ছুটিয়া চলেছে পাগল প্রায়
কালো কালো ছায়া পথে মিলায়
মণি হীরা ঝলে
ও কানন তলে
পরীদের ঐ মায়া কানন
গাছে গাছে গাছে হীরক জ্বলিছে
হীরা মুক্তার ম্যাজিক্-বন।

রংদার জ্বলে, উড়িছে ফুলকি
না—না—তারা জ্বলে নভোসীমায়...
ডানায় লেগেছে সোনার চুম্কি
চোখে জ্বলে বুঝি রংমশাল
আলোয় আকাশ হ'ল উথাল
উধাও তবুও পক্ষীরাজ
চাঁদ ঐ বুঝি ?
রূপালী আলোয় ঐ সাগর ?
হিম ঝরে পড়ে পশ্লার বেগে
হিম ঝরে যায় চার খুরে লেগে
চাঁদ পিছে যায়—
ঝড়েতে উড়ায়
ফুঁ দিয়ে সরায় সাবান-বল
চল্‌রে চল্
ছুধে ঘোড়া মোর
চল্ উধাও—

রূপকথা

সায়ামী

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সায়ামের রাজার প্রথমে তুটি মেয়ে ছিলো। তাদের নাম দিয়েছিলেন তিনি : দিন আর রাত্রি। তারপর আরো তুটি মেয়ে জন্মালো। সে জন্যে প্রথম তুটির নাম বদ্‌লে তিনি চার মেয়ের নাম রাখ্‌লেন : শরৎ, বসন্ত, শীত আর গ্রীষ্ম—বছরের চারটি ঋতুর নাম। কিন্তু আরো কিছুদিন পরে তাঁর আরো তিনটি মেয়ে হল। তাই, আবার তিনি সবাইকার নাম বদ্‌লে সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম রাখ্‌লেন। কিন্তু তাঁর অষ্টম মেয়ে জন্মাবার পর তিনি ভেবে পেলেন না কী নাম রাখবেন! হঠাৎ বছরের বারোটি মাসের নামের কথা মনে পড়্‌লো। রাণী বল্‌লেন, মাস অনুযায়ী নাম রাখলেও মাত্র বারোটি নাম পাওয়া যায়, তা' ছাড়া আবার অতগুলি নতুন নাম তাঁর পক্ষে মনে রাখাও শক্ত। কিন্তু রাজার মন খুব হিসেবী, আর একবার যেটা ঠিক করেছেন হাজার চেষ্টা কর্‌লেও তিনি তা বদ্‌লাতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর আট মেয়ের আবার নাম করণ কর্‌লেন : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত। এর পরে যে মেয়েটি জন্মালো তার নাম রাখলেন পৌষ।

রাণী বল্‌লেন, "এখন শুধু বাকী রইল : মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। চৈত্রর পর আবার আমাদের নতুন করে আরম্ভ কর্‌তে হবে।"

"না না, তার আর দরকার হবে না," রাজা বল্‌লেন, "যে কোন মানুষের পক্ষে বারোটি মেয়েই যথেষ্ট। তাই আমাদের ছোট্ট মেয়ে চৈত্র জন্মাবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তোমার মুণ্ডু কেটে ফেল্‌তে বাধ্য হব।"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে রাজা শোকে অধীর হয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ আসলে তিনি রাণীকে ভীষণ বালোবাস্‌তেন। রাণীও মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌লেন, কারণ তিনি জান্‌তেন তাঁকে কেটে ফেল্‌তে রাজার কী ভীষণ কষ্ট হবে। আর নিজের মাথাটা কাটা গেলে তাঁর পক্ষেও ব্যাপারটা খুব সুখের হবে না! কিন্তু তাঁদের তুজনের মানসিক অশান্তির কোনো কারণ রইলো না, কারণ পৌষই তাঁদের কোলের মেয়ে হয়ে রইলো। এর পর থেকে রাণীর শুধু ছেলেই হল, আর বর্ণমালার অক্ষর

অনুযায়ী তাদের নামকরণ হতে লাগ্‌লো। ভাব্‌নার কিছু রইলো না, কারণ মাসের চেয়ে অক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশী, তা ছাড়াও রাণী মাত্র 'ঞ' পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেলেন।

বার বার নাম বদল হওয়ায় সায়ামের রাজকন্যারা সবাই অল্প বিস্তর রাগী হয়ে উঠ্‌লো। বিশেষ করে সবচেয়ে যে বড়, কারণ তার নামই সবচেয়ে বেশীবার বদল হয়েছিলো। শুধু পৌষ-এর স্বভাব রাগী হল না, কারণ তাকে কখনো অন্য নামে কেউ ডাকে নি (অবশ্য তার জন্য বোনেরা ছাড়া; তারা অনর্থক রেগে বেচারি পৌষকে যখন যা খুসি বলে গালাগালি কর্‌তো, তাদের স্বভাবই ছিলো ঐ রকম।) কিন্তু পৌষ হল একেবারে অন্য রকমের, ভারি মিষ্টি তার ব্যবহার আর 'সব সময় হাসিখুসি তার মুখ।

সায়ামের রাজার চমৎকার একটি অভ্যেস ছিলো, আর আমার মনে হয় য়ুরোপের লোকদের তাঁর কাছ থেকে এটা শেখা উচিত। নিজের জন্মদিনে উপহার না নিয়ে তিনি সবাইকেই উপহার দিতেন। তাঁর কথা শুনে মনে হত উপহার দিতে তিনি ভালোই বাসেন। কারণ প্রায়ই তিনি তুঃখ করে বল্‌তেন : বছরে কেবলমাত্র একটি দিনে জন্মানোয় তাঁর কেবল একটিই জন্মদিন। এই ভাবে ক্রমশ তাঁর বিয়ের সমস্ত উপহার, সায়মের নানা নগরের মেয়রদের দেওয়া সম্মানপত্রগুলি আর যে সমস্ত মুকুটগুলি পুরোনো হওয়ায় বর্তমান ফ্যাসনের বাইরে চলে গেছে, দিয়ে শেষ করে ফেল্‌লেন। একবার তাঁর জন্মদিনে দেবার মত হাতের কাছে কিছু না দেখে তিনি প্রত্যেক মেয়েকে সুন্দর সোনার খাঁচায় চমৎকার সবুজ একটি করে কাকাতুয়া দিলেন। নটি সোনার খাঁচায় বছরের প্রথম নটি মাসের নাম খোদাই করা হল, কারণ মাসের যা নাম রাজকন্যাদের নামও তাই। কাকাতুয়াগুলি রাজকন্যাদের বিশেষ গর্বের জিনিস হল, আর তারা প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টা করে তাদের কথা বল্‌তে শেখাতে লাগলো! কাকাতুয়াগুলি একদিন God save the King বল্‌তে শিখলো (অবশ্য ইংরিজিতে নয়, সায়ামী ভাষায়, আর সায়ামী ভাষা যে ভীষণ কঠিন কেনা সে কথা জানে!)। কিন্তু একদিন সকালে পৌষ তার কাকাতুয়ার কাছে Good Morning বল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লো পাখীটা সোনার খাঁচায় মরে পড়ে রয়েছে। রাজকন্যা কান্নায় ভেঙে পড়্‌লো, তার দাসীরা কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পার্‌লো না। পৌষ এতো কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো যে কী কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে দাসীরা রাণীকে খবর দিলো, আর রাণী বল্‌লেন, এর জন্যে কান্নার কোনো মানেই হয় না, কিছু না খেয়ে পৌষএর ঘুমুনোই এখন উচিত। দাসীদের এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিলো, তাই তারা ছোটো রাজকন্যাকে বিছানায় শুইয়ে, এক্‌লা রেখে চলে গেল। এদিকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাজকন্যার একসময় ক্ষিদে পেলো। আর সে বিছানায় উঠে বসে দেখ্‌লো একটি ছোট্ট পাখী লাফাতে লাফাতে তার ঘরে আস্‌ছে। রাজকন্যা তাকে দেখে খুসি হয়ে বস্‌লো আর সেই ছোট সুন্দর পাখী গান ধর্‌লো : আশ্চর্য সে গান; রাজার উদ্যানে যে হ্রদ আছে পাখী তার গান গাইলো, গাইলো বিরাট দেবদারু গাছের গান, যার ছায়া হ্রদের স্থির জলে ধরা পড়েছে আর যে ছায়ার মধ্যে সোনালী মাছগুলি চিক্‌চিক্ ক'রে ছুটে বেড়ায়। যখন গান থাম্‌লো

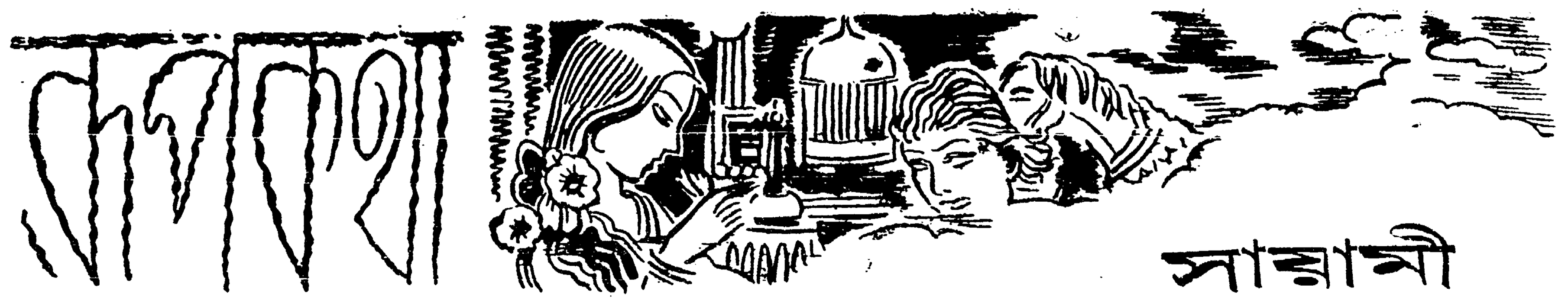

সায়ামী

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সায়ামের রাজার প্রথমে দুটি মেয়ে ছিলো। তাদের নাম দিয়েছিলেন তিনি : দিন আর রাত্রি। তারপর আরো দুটি মেয়ে জন্মালো। সে জন্যে প্রথম দুটির নাম বদ্‌লে তিনি চার মেয়ের নাম রাখ্‌লেন : শরৎ, বসন্ত, শীত আর গ্রীষ্ম—বছরের চারটি ঋতুর নাম। কিন্তু আরো কিছুদিন পরে তাঁর আরো তিনটি মেয়ে হল। তাই, আবার তিনি সবাইকার নাম বদ্‌লে সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম রাখ্‌লেন। কিন্তু তাঁর অষ্টম মেয়ে জন্মাবার পর তিনি ভেবে পেলেন না কী নাম রাখবেন! হঠাৎ বছরের বারোটি মাসের নামের কথা মনে পড়্‌লো। রাণী বল্‌লেন, মাস অনুযায়ী নাম রাখলেও মাত্র বারোটি নাম পাওয়া যায়, তা' ছাড়া আবার অতগুলি নতুন নাম তাঁর পক্ষে মনে রাখাও শক্ত। কিন্তু রাজার মন খুব হিসেবী, আর একবার যেটা ঠিক করেছেন হাজার চেষ্টা কর্‌লেও তিনি তা বদ্‌লাতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর আট মেয়ের আবার নাম করণ কর্‌লেন : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত। এর পরে যে মেয়েটি জন্মালো তার নাম রাখলেন পৌষ।

রাণী বল্‌লেন, "এখন শুধু বাকী রইল : মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। চৈত্রর পর আবার আমাদের নতুন করে আরম্ভ কর্‌তে হবে।"

"না না, তার আর দরকার হবে না," রাজা বল্‌লেন, "যে কোন মানুষের পক্ষে বারোটি মেয়েই যথেষ্ট। তাই আমাদের ছোট্ট মেয়ে চৈত্র জন্মাবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তোমার মুণ্ডু কেটে ফেল্‌তে বাধ্য হব।"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে রাজা শোকে অধীর হয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ আসলে তিনি রাণীকে ভীষণ বালোবাস্‌তেন। রাণীও মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌লেন, কারণ তিনি জান্‌তেন তাঁকে কেটে ফেল্‌তে রাজার কী ভীষণ কষ্ট হবে। আর নিজের মাথাটা কাটা গেলে তাঁর পক্ষেও ব্যাপারটা খুব সুখের হবে না! কিন্তু তাঁদের দুজনের মানসিক অশান্তির কোনো কারণ রইলো না, কারণ পৌষই তাঁদের কোলের মেয়ে হয়ে রইলো। এর পর থেকে রাণীর শুধু ছেলেই হল, আর বর্ণমালার অক্ষর

অনুযায়ী তাদের নামকরণ হতে লাগ্‌লো। ভাব্‌নার কিছু রইলো না, কারণ মাসের চেয়ে অক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশী, তা ছাড়াও রাণী মাত্র 'ঞ' পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেলেন।

বার বার নাম বদল হওয়ায় সায়ামের রাজকন্যারা সবাই অল্প বিস্তর রাগী হয়ে উঠ্‌লো। বিশেষ করে সবচেয়ে যে বড়, কারণ তার নামই সবচেয়ে বেশীবার বদল হয়েছিলো। শুধু পৌষ-এর স্বভাব রাগী হল না, কারণ তাকে কখনো অন্য নামে কেউ ডাকে নি (অবশ্য তার জন্য বোনেরা ছাড়া; তারা অনর্থক রেগে বেচারি পৌষকে যখন যা খুসি বলে গালাগালি কর্‌তো, তাদের স্বভাবই ছিলো ঐ রকম।) কিন্তু পৌষ হল একেবারে অন্য রকমের, ভারি মিষ্টি তার ব্যবহার আর 'সব সময় হাসিখুসি তার মুখ।

সায়ামের রাজার চমৎকার একটি অভ্যেস ছিলো, আর আমার মনে হয় য়ুরোপের লোকদের তাঁর কাছ থেকে এটা শেখা উচিত। নিজের জন্মদিনে উপহার না নিয়ে তিনি সবাইকেই উপহার দিতেন। তাঁর কথা শুনে মনে হত উপহার দিতে তিনি ভালোই বাসেন। কারণ প্রায়ই তিনি দুঃখ করে বল্‌তেন : বছরে কেবলমাত্র একটি দিনে জন্মানোয় তাঁর কেবল একটিই জন্মদিন। এই ভাবে ক্রমশ তাঁর বিয়ের সমস্ত উপহার, সায়মের নানা নগরের মেয়রদের দেওয়া সম্মানপত্রগুলি আর যে সমস্ত মুকুটগুলি পুরোনো হওয়ায় বর্তমান ফ্যাসনের বাইরে চলে গেছে, দিয়ে শেষ করে ফেল্‌লেন। একবার তাঁর জন্মদিনে দেবার মত হাতের কাছে কিছু না দেখে তিনি প্রত্যেক মেয়েকে সুন্দর সোনার খাঁচায় চমৎকার সবুজ একটি করে কাকাতুয়া দিলেন। নটি সোনার খাঁচায় বছরের প্রথম নটি মাসের নাম খোদাই করা হল, কারণ মাসের যা নাম রাজকন্যাদের নামও তাই। কাকাতুয়াগুলি রাজকন্যাদের বিশেষ গর্বের জিনিস হল, আর তারা প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টা করে তাদের কথা বল্‌তে শেখাতে লাগলো! কাকাতুয়াগুলি একদিন God save the King বল্‌তে শিখলো (অবশ্য ইংরিজিতে নয়, সায়ামী ভাষায়, আর সায়ামী ভাষা যে ভীষণ কঠিন কেনা সে কথা জানে!)। কিন্তু একদিন সকালে পৌষ তার কাকাতুয়ার কাছে Good Morning বল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লো পাখীটা সোনার খাঁচায় মরে পড়ে রয়েছে। রাজকন্যা কান্নায় ভেঙে পড়্‌লো, তার দাসীরা কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পার্‌লো না। পৌষ এতো কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো যে কী কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে দাসীরা রাণীকে খবর দিলো, আর রাণী বল্‌লেন, এর জন্যে কান্নার কোনো মানেই হয় না, কিছু না খেয়ে পৌষএর ঘুমুনোই এখন উচিত। দাসীদের এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিলো, তাই তারা ছোটো রাজকন্যাকে বিছানায় শুইয়ে, এক্‌লা রেখে চলে গেল। এদিকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাজকন্যার একসময় ক্ষিদে পেলো। আর সে বিছানায় উঠে বসে দেখ্‌লো একটি ছোট্ট পাখী লাফাতে লাফাতে তার ঘরে আস্‌ছে। রাজকন্যা তাকে দেখে খুসি হয়ে বস্‌লো আর সেই ছোট সুন্দর পাখী গান ধর্‌লো : আশ্চর্য সে গান; রাজার উদ্যানে যে হ্রদ আছে পাখী তার গান গাইলো, গাইলো বিরাট দেবদারু গাছের গান, যার ছায়া হ্রদের স্থির জলে ধরা পড়েছে আর যে ছায়ার মধ্যে সোনালী মাছগুলি চিক্‌চিক্ ক'রে ছুটে বেড়ায়। যখন গান থাম্‌লো

রাজকন্যার কান্নাও তখন থেমে গেছে, আর সে ভুলে গেছে কিছুই তার খাওয়া হয় নি।

"চমৎকার গান তো," রাজকন্যা বল্‌লো। আর পাখীটা মাথা নীচু করে রাজকন্যাকে অভিবাদন জানালো, কারণ শিল্পীরা প্রায়ই খুব ভদ্র হয় আর চায় নিজেদের প্রশংসা শুন্‌তে।

"তোমার কাকাতুয়ার বদলে আমাকে কি তুমি চাও?" ছোট্ট পাখী জিগ্‌গেস্ কর্‌লো। "অবশ্য তার মত আমি যে সুন্দর নই এ কথা সত্যি, কিন্তু তার চেয়ে আমার গলা ভালো এ কথাটাও মিথ্যে নয়।"

ছোটো রাজকন্যা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো আর পাখীটা তার বিছানার এক পাশে লাফিয়ে উঠে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

পরের দিন ঘুম থেকে চোখ খুলেই ছোটো রাজকন্যা দেখ্‌লো ছোট্ট পাখীটি তখনো সেখানে রয়েছে। রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্‌তে দেখে সে সুপ্রভাত জানালো। দাসীরা খাবার নিয়ে এলে রাজকন্যার হাত থেকে সে ভাত খেলো আর খাওয়া হবার পর জলের পাত্রে ডুব দিয়ে সে স্নান সেরে নিলো আর জল খেলো। স্নানকরা জল থেকে জল খেতে দেখে দাসীরা নিন্দে করলো, কিন্তু রাজকন্যা পৌষ আপত্তি জানিয়ে বল্‌লো শিল্পীরা নাকি ঐ রকমই করে থাকে! স্নান খাওয়া শেষ করে পাখীটি আবার গান ধর্‌লো, আর বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল দাসীরা, জীবনে এতো সুন্দর গান তারা শোনে নি। আর রাজকন্যার বুক আনন্দে আর গর্বে ভরে উঠ্‌লো।

"তোমাকে আমার আট বোনের কাছে নিয়ে যাই, চলো" বল্‌লো রাজকন্যা।

ছোট্ট পাখীটি রাজকন্যার ডান হাতের আঙ্গুলে উড়ে এসে বস্‌লো। দাসীরা তাদের পেছন পেছন চল্‌লো। পৌষ প্রথমে গেল বৈশাখের কাছে, তারপর জ্যৈষ্ঠ, এমনি করে অগ্রহায়ণের কাছ পর্যন্ত। সবচেয়ে ছোটো হলে কি হয়, পৌষ অত্যন্ত কেতা দুরস্ত মেয়ে। প্রত্যেক রাজকন্যার কাছেই ছোট্ট পাখীটি নতুন নতুন গান গাইলো। কিন্তু কাকাতুয়াগুলো God save the King আর কতকগুলি বাঁধা বুলি ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে পারে না! পৌষ শেষকালে পাখীটিকে রাজা আর রাণীর কাছে নিয়ে গেল। তাঁরা একসঙ্গে আশ্চর্য আর খুসি দুই-ই হলেন।

রাণী বল্‌লেন, "আমি বরাবরই জানি তোমাকে খেতে না দিয়ে বিছানায় শুইয়ে ভালো করেছি!"

রাজা বল্‌লেন, "কাকাতুয়াগুলোর চেয়ে অনেক ভালো এই পাখী গান পাইতে পারে।"

রাণী বল্‌লেন, "আমার তো মনে হয় সব সময় God save the King শুন্‌তে শুন্‌তে তুমি বিরক্ত হয়ে উঠেছো। আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি না মেয়েগুলো কেনো ঐ কথাগুলোই কষ্ট করে কাকাতুয়াদের শেখালো।"

অন্য রাজকন্যাদের বদ্ মেজাজের কথা আগেই বলেছি। পাখীটিকে দেখে সবাই তারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো, কাকাতুয়াগুলোও যেন মুখ ভার করে ফেল্‌লো! কিন্তু রাজকন্যা পৌষ প্রাসাদের এ ঘর থেকে ও ঘরে লার্কের মত গান গেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লো আর পাখীটিও তার চারদিকে উড়ে, কখনো বা কাঁধে বসে, নাইটিঙ্গেলের মত গান গাইতে লাগ্‌লো।—আসলে সেই ছোট পাখীটি নাইটিঙ্গেলই!

কিছুদিন এইভাবে চল্‌লো! তারপর একদিন আট রাজকন্যা পরামর্শ করে পৌষএর কাছে গেল আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে বস্‌লো, পা লুকিয়ে সায়ামী রাজকন্যারা যে রকম ভাবে বসে।

আট রাজকন্যা বল্‌লো, "আহা, বেচারা পৌষ, তোমার কাকাতুয়াটা মরে গেছে বলে সত্যিই আমরা খুব দুঃখিত। আমাদের মত তোমার পোষা পাখী নেই বলে নিশ্চয়ই মনে মনে তুমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছো! আমরা সবাই আমাদের হাত-খরচের টাকা দিয়ে তোমাকে একটি চমৎকার সবুজ আর হল্‌দে কাকাতুয়া কিনে দোবো ঠিক করেছি!"

"মিছিমিছি মাথাব্যথার জন্যে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ," পৌষ বল্‌লো (অবশ্য ঐভাবে বলা তার পক্ষে খুব ভদ্র হয় নি, কিন্তু সায়ামী রাজকন্যারা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে খুব ভদ্র ব্যবহার করে না), "আমার একটি পোষা পাখী আছে, সে আমাক সবচেয়ে চমৎকার গান শোনায়! তাই বুঝতে পার্‌ছি না একটা সবুজ আর হল্‌দে কাকাতুয়া নিয়ে কী আমি কর্‌বো!"

বৈশাখ মুখ বাঁকালো, তারপর জ্যৈষ্ঠ মুখ বাঁকালো, তারপর আষাঢ় মুখ বাঁকালো; সত্যি কথা বল্‌তে কি সব রাজকন্যারাই মুখ বাঁকালো, তবে ঠিক বয়েসের অনুপাতে নিজের নিজের দান অনুযায়ী।

"তোমরা মুখ বাঁকাচ্ছো কেনো? তোমাদের কিছু অসুখ হল নাকি?"

তারা বল্‌লো, "তোমার পাখী তোমার পাখী যে বল্‌ছো, কিন্তু ওটা কি হাসির কথা নয়? পাখীটা তো নিজের খুসিমত আসে খুসিমত যায়!" তারা ঘরের চারদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লো, শেষে ভ্রূগুলো এতো উঁচুতে তুল্‌লো যে তাদের মাথাগুলো প্রায় অদৃশ্য হল।

"ও রকম কোরো না, কপালে বিশ্রী দাগ হবে," পৌষ বল্‌লো।

"তোমাকে জিগ্‌গেস্ কর্‌লে আশাকরি কিছু মনে কর্‌বে না: বল্‌তে পারো, এখন তোমার পাখীটা কোথায়?" তারা জিগ্‌গেস কর্‌লো।

"সে তার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছে," রাজকন্যা পৌষ উত্তর দিলো।

"সে যে ফিরে আস্‌বে এ কথা তুমি ভাব্‌ছো কেনো বল্‌তে পারো?"

"সে তো সববারেই ফিরে আসে।"

"কিন্তু, আমরা বলি কি," রাজকন্যারা বল্‌লো, "আমাদের পরামর্শ শোনো। তা হলে কোনো ভয়ের কারণ থাক্‌বে না। যদি সে ফিরে আসে, অবশ্য সে ফিরে এলে বল্‌তে হবে তোমার কপাল খুব ভালো, তাকে খাঁচায় পুরে ফেলো। এই একমাত্র উপায়ে তাকে তুমি ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে।"

"কিন্তু আমি চাই সে ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াক।"

—"কিন্তু সাবধান হওয়া সবচেয়ে আগে দরকার," রাজকন্যারা বিজ্ঞ লোকের মত মাথা নাড়িয়ে বল্‌লো।

তারপর তারা মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়্‌লো, আর তারা চলে যেতেই পৌষ মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কর্‌লো। তার মনে হল ছোট পাখীটি অনেকক্ষণ চলে গেছে, সে যে কী কর্‌ছে রাজকন্যা ভেবে পেলো না। হয়তো তার কোন বিপদ হয়েছে। হয়তো বাজ পাখী তাকে ছোঁ মেরে ধরেছে, হয়তো মানুষের কোনো জালে সে আট্‌কে গেছে। তা' ছাড়া,

পাখীটা তাকে ভুলেও তো যেতে পারে, অন্য কাউকেও তো তার বেশী ভালো লাগতে পারে।—কী ভীষণ বিশ্রী তা' হলে হবে! রাজকন্যা মনে মনে প্রার্থনা করলো ভালোয় ভালোয় সে ফিরে আসুক, তারপর সোনার খাঁচাটাতো খালি পড়েই রয়েছে।

হঠাৎ রাজকন্যা ঠিক তার পেছনে ট্যুইট্ ট্যুইট্ শব্দ শুন্‌লো আর ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লো পাখীটি ফিরে এসে তার কাঁধে বসেছে। এতো নিঃশব্দে এসেছে আর এতো শান্তভাবে বসেছে যে রাজকন্যা কিছুই টের পায়নি।

"তোমার জন্যে আমার খুব ভাব্‌না হচ্ছিলো," রাজকন্যা বল্‌লো।

"আমার জন্যে তুমি যে ভাব্‌বে সে কথা আমি জান্‌তুম," ছোট্ট পাখীটা বল্‌লো। "কী হয়েছিলো জানো, আর একটু হলেই আমি আজ ফির্‌তুম না। আমার শ্বশুরমশাই বিরাট একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছেন, আর সবাই চেয়েছিলো আমি সেখানে থাকি। কিন্তু মনে হল আমার জন্যে নিশ্চয়ই তুমি ভাব্‌বে, তাই চলে এলুম।"

ঠিক এই সময়েই এই কথাগুলোর ফল খুব খারাপ হল। রাজকন্যা পৌষএর বুক ধ্বক্‌ধ্বক্ করে উঠ্‌লো, আর সেই মুহূর্তেই সে ঠিক করে ফেল্‌লো আর নয়। হাত তুলে সে পাখীটিকে ধর্‌লো! এই ব্যাপারে পাখীটি অভ্যস্ত ছিলো। রাজকুমারী তার হাতের মুঠোয় ছোট্ট পাখীর বুকের কাঁপুনি ছুঁতে ভালবাস্‌তো, পাখীটিও ভালবাস্‌তো রাজকন্যার নরম হাতের স্পর্শ গায়ে মাখ্‌তে। তাই পাখীটি কোনো সন্দেহ কর্‌লো না। কিন্তু রাজকন্যা যখন তাকে খাঁচায় পুরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো, সে এতো আশ্চর্য্য হল যে কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বল্‌তে পার্‌লো না। কিন্তু কিছু পরেই সে খাঁচার ভিতরকার হাতির দাঁতের দাঁড়ে লাফিয়ে উঠে বল্‌লো, "এ কী ধরণের ঠাট্টা কর্‌ছো?"

"নানা, এটা কোনো ঠাট্টা নয়," রাজকন্যা বল্‌লো, "মার কতকগুলো বেড়াল আজ রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই আমার মনে হয় এখানে তুমি একেবারে বিপদের বাইরে থাক্‌বে।"

একটু রেগেই যেন পাখীটি বল্‌লো, "আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না কেন রাণী ওই সব হতচ্ছাড়া বেড়াল পুষতে ভালবাসেন।"

"আহা, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, ওরা যে বিশেষ ধরণের বেড়াল। ওদের চোখ নীল, ল্যাজ অদ্ভুত—আর সবচেয়ে বড় কথা ওরা রাজপরিবারের একটি আশ্চর্য জিনিস। অবশ্য জানি না আমি যা বল্‌ছি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছো কিনা।"

"খুব পার্‌ছি," পাখীটা বল্‌লো, "কিন্তু আগে কোনো কথা না বলে কেন তুমি আমাকে খাঁচায় বন্ধ কর্‌লে? এ ধরণের জায়গা পছন্দ হচ্ছে বলে মনে করি না।"

"তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদে আছো না জান্‌লে সমস্ত রাত আমি দু'চোখের পাতা এক কর্‌তে পার্‌তুম না।"

"যাক্, এবারের মত আমি কিছু মনে কর্‌ছি না," ছোট্ট পাখীটি বল্‌লো, "সকালে খাঁচা থেকে বেরুতে পেলেই হল।"

খুব ভালো করে সে রাত্রের খাওয়া খেলো আর তারপর গান গাইতে আরম্ভ কর্‌লো। কিন্তু গানের মাঝে হঠাৎ থেমে বল্‌লো, "কিন্তু আমার যে কী হয়েছে জানি না। আজ রাতে আমার কেমন যেন গাইতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

"ভালো কথা। শুয়ে পড় তা হলে," রাজকন্যা বল্‌লো।

ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে এক মিনিটের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। পৌষও ঘুমুতে গেল। খুব ভোরে সে জেগে উঠ্‌লো, পাখীটা ভীষণ চীৎকার করে বল্‌ছে, "উঠে পড়, উঠে পড়। খাঁচার দরজা খুলে দাও। পৃথিবীতে শিশির থাক্‌তে থাক্‌তে আমি অনেকটা উড়ে আস্‌তে চাই।"

"তুমি ওখানে অনেক ভালো আছো," পৌষ বল্‌লো, "তোমার চমৎকার সোনার খাঁচা হয়েছে। এই খাঁচাটা আমার বাবার রাজত্বের সবচেয়ে ভালো কারিগর তৈরি করেছিলো। আর জানো বাবা এতো খুসি হয়েছিলেন যে তার মাথাটা কেটে ফেল্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে সে এ রকম দ্বিতীয় খাঁচা তৈরি কর্‌তে না পারে।"

"আমাকে বেরুতে দাও, আমাকে বেরুতে দাও," ছোট্ট পাখীটি বল্‌লো।

"তোমাকে দাসীরা দিনে তিনবার খাবার দেবে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তোমার দুর্ভাবনার কারণ থাক্‌বে না, প্রাণভরে তুমি গান গাইতে পার্‌বে!"

"আমাকে বেরুতে দাও, আমাকে বেরুতে দাও," ছোট্ট পাখীটি বলে চল্‌লো, আর খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো! কিন্তু খুলতে পার্‌লো না! আরো আট রাজকন্যা এলো, তাকে দেখ্‌লো, পৌষকে বল্‌লো তাদের উপদেশ শুনে সে খুব ভালো করেছে। তারা বল্‌লো, শিগ্‌গীরই খাঁচায় থাকা পাখীটার অভ্যেস হয়ে যাবে আর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তার মনেই পড়্‌বে না কখনো সে বাইরে ছিলো বলে। তারা যতক্ষণ সেখানে ছিলো ছোট্ট পাখীটি কিছুই বল্‌লো না কিন্তু তারা চলে যেতেই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো: "আমাকে বেরুতে দাও, আমাকে বেরুতে দাও।"

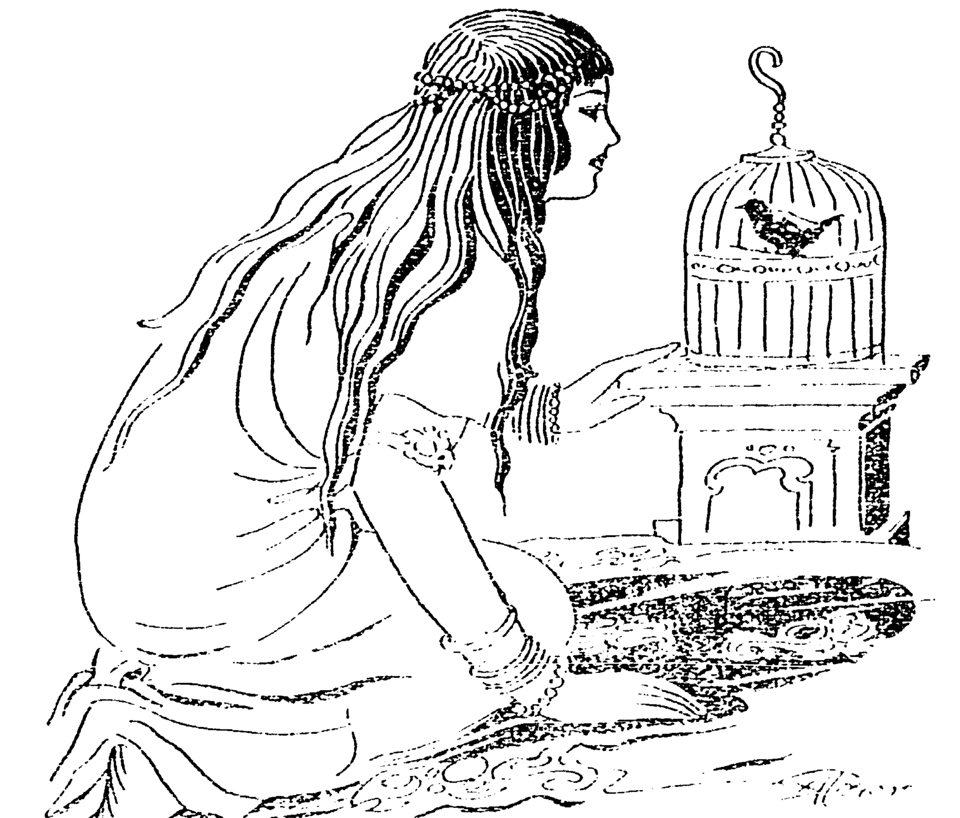

কি করে গান গাইবো?

"কেন বোকার মত চ্যাঁচাচ্ছো?", রাজকন্যা বল্‌লো, "তোমাকে ভালোবাসি বলেই তো খাঁচায় রেখেছি। তোমার কিসে ভালো হবে সে কথা তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী জানি। আমাকে ছোট্ট একটি গান শোনাও, তা হলে তোমাকে এক টুক্‌রো চিনি খেতে দেবো।"

কিন্তু ছোট্ট পাখীটি খাঁচার এক কোণে দাঁড়িয়ে বাইরের নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইলো, একটাও গান গাইলো না। সমস্ত দিন সে গাইলো না।

"মুখ গোম্‌ড়া করে থেকে লাভ কি বল?" পৌষ জিগ্‌গেস কর্‌লো, "কেন তুমি গান গেয়ে নিজের দুঃখু ভুলে যাচ্ছো না?"

"কি করে গান গাইবো ?" সে বল্‌লো, "আমি গাছ দেখ্‌তে চাই, হ্রদ দেখ্‌তে চাই, দেখ্‌তে চাই সবুজ ধান মাঠে দুল্‌ছে।"

"এই যদি তুমি চাও তা হলে আমিই তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবো," পৌষ বল্‌লো।

খাঁচাটা নিয়ে সে বাইরে এলো আর দেবদারু ঘেরা হ্রদের চারদিকে বেড়িয়ে ধান ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়ালো ঃ যতদূর দেখা যায় ততদূর শুধু সবুজ ধানের চারা।

রাজকন্যা বল্‌লো, "তোমাকে আমি প্রত্যেক দিন নিয়ে আস্‌বো। তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে শুধু সুখী কর্‌তে চাই।"

পাখীটি উত্তরে বল্‌লো, "কিন্তু কৈ, ঠিক সেই রকম লাগ্‌ছে না তো। ধান ক্ষেত আর দেবদারু আর হ্রদকে খাঁচার গরাদের মধ্যে দিয়ে দেখ্‌লে একেবারে অন্য রকম দেখায়।"

রাজকন্যা তাকে বাড়ীতে এনে খেতে দিলো। কিন্তু কিছুই সে খেলো না। এতে রাজকন্যা খানিকটা দুর্ভাবনায় পড়্‌লো, আর অন্য উপায় না দেখে বোনেদের জিগ্‌গেস কর্‌লো, কী করা উচিত।

"তোমাকে শক্ত হতে হবে," তারা বল্‌লো।

"কিন্তু কিছু না খেলে ও যে মরে যাবে!"

"কাজটা তা হলে তার পক্ষে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ'র মত হবে," তারা বল্‌লো। "ওর জানা দরকার তুমি শুধু ওর ভালো'র কথাই ভাব্‌ছো। তা সত্ত্বেও যদি ও একগুঁয়েমি করে মরে যায় তা হলে ওর উচিত শাস্তিই হবে আর তুমিও ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচ্‌বে।"

পৌষ ভেবে পেলো না তাতে কী তার উপকার হবে। কিন্তু তারা আটজনে একদিকে, আর সবাই তারা পৌষের চেয়ে বড়, তাই কোনো কথা না বলে চুপ সে করে রইলো। আর বল্‌লো, "হয়তো আগামী কালের মধ্যে ওর খাঁচায় থাকা অভ্যেস হয়ে যাবে।"

পরের দিন সকালে উঠেই পৌষ বল্‌লো 'গুড্‌ মর্ণিং', কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না। বিছানা থেকে বাইরে লাফিয়ে দৌড়ে সে খাঁচার কাছে গেল আর চম্‌কে কেঁদে উঠ্‌লো। সে দেখ্‌লো পাখীটা খাঁচার ভেতর পাশ ফিরে পড়ে রয়েছে, চোখ বন্ধ, দেখলে মনে হয় মরে গেছে। খাঁচার দরজা খুলে পাখীটিকে সে বাইরে নিয়ে এলো। আর সে আশ্বস্ত হল। তার নরম হাতের মধ্যে তখনো পাখীর ছোটো বুক ধুক্‌ধুক্‌ কর্‌ছে।

"ছোট্ট পাখী, জেগে ওঠো, জেগে ওঠো।"

সে কাঁদতে লাগ্‌লো আর তার চোখের জল পাখীর গায়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়্‌তে লাগ্‌লো। আর পাখী জেগে উঠে দেখ্‌লো তার চারদিকে খাঁচার গরাদ নেই।

"মুক্তি না পেলে আমি গাইতে পারব না, আর গাইতে না পেলে আমি বাঁচ্‌তে পারি না," পাখী বল্‌লো।

রাজকন্যা ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো। বল্‌লো, "তা হ'লে তোমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে নাও তুমি। সোনার খাঁচায় তোমাকে বন্ধ করেছিলুম কারণ তোমাকে শুধু আমার

কর্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু কখনই ভাবি নি আমার ভালোবাসা তোমাকে মেরে ফেল্‌বে। তুমি যাও। উড়ে যাও গাছের মধ্যে দিয়ে, যে সব গাছ হ্রদকে ঘিরে রয়েছে, উড়ে যাও সবুজ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে, যে ক্ষেত আকাশকে ছুঁয়েছে। তোমার নিজের মত করে সুখী হতে দেবার মত যথেষ্ট তোমাকে ভালোবাসি।"

রাজকন্যা জান্‌লা খুলে ধীরে ধীরে পাখীকে কার্নিশে নামিয়ে দিলো। পাখী নিজের সমস্ত শরীরকে সামান্য ঝাঁকিয়ে নিলো।

রাজকন্যা বল্‌লো, "তোমার খুসিমত এসো আর যেয়ো, আর কখনো তোমায় খাঁচায় পুর্‌বো না।"

"ছোট্ট রাজকন্যা, আমি নিশ্চয়ই আস্‌বো, কারণ তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে শোনাবো আমার সবচেয়ে ভালো গান। আমি অনেক দূরে চলে যাবো, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার ফিরে আস্‌বো, তোমাকে কখনো ভুল্‌বো না।" নিজের শরীরকে আর একবার ঝাঁকিয়ে সে বল্‌লো, "কী বিপদ! কী ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে গেছি।"

তারপর সে তার ডানা খুলে সোজা স্বচ্ছ নীল আকাশে ডুব দিলো। কিন্তু ছোট্ট রাজকন্যা কান্নায় ভেঙে পড়্‌লো। তার ছোট্ট পাখী অনেক দূরে উড়ে যাওয়ায় হঠাৎ নিজেকে তার ভীষণ একূলা লাগ্‌লো। তার বোনেরা সমস্ত শুনে ঠাট্টা করে বল্‌লো, ছোট্ট পাখী আর ফিরে আস্‌বে না। কিন্তু শেষে একদিন সে ফিরে এলো। সে পৌষের কাঁধে উড়ে বস্‌লো, তার হাত থেকে দানা খেলো আর শোনালো তার সমস্ত নতুন গান। সে সব গান পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর জায়গা থেকে সে শিখে এসেছে। পৌষ তার জান্‌লা দিন-রাত্রির সব সময় খুলে রাখে যাতে তার ছোট্ট পাখী ইচ্ছে হলেই যেতে-আস্‌তে পারে। আর এই জান্‌লা খুলে রাখা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো হল; ক্রমশ সে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠ্‌লো। আর যখন সে বড় হল তখন কাম্বোডিয়ার রাজাকে বিয়ে করে একটা শাদা হাতীর পিঠে সমস্ত রাজত্বটা তুলে নিয়ে গেলো। কিন্তু তার বোনেরা কখনো জান্‌লা খুলে ঘুমুতো না। তাই তারা খুব কুৎসিত আর বিশ্রী হয়ে উঠ্‌লো আর যখন তারা বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌লো, তাদের বিয়ে হল কর্মচারিদের সঙ্গে। বিয়ের যৌতুকে রাজা প্রত্যেককে দিলেন এক পাউণ্ড করে চা আর একটি করে সায়ামী বেড়াল।

* Somerset Maugham-এর লেখা থেকে

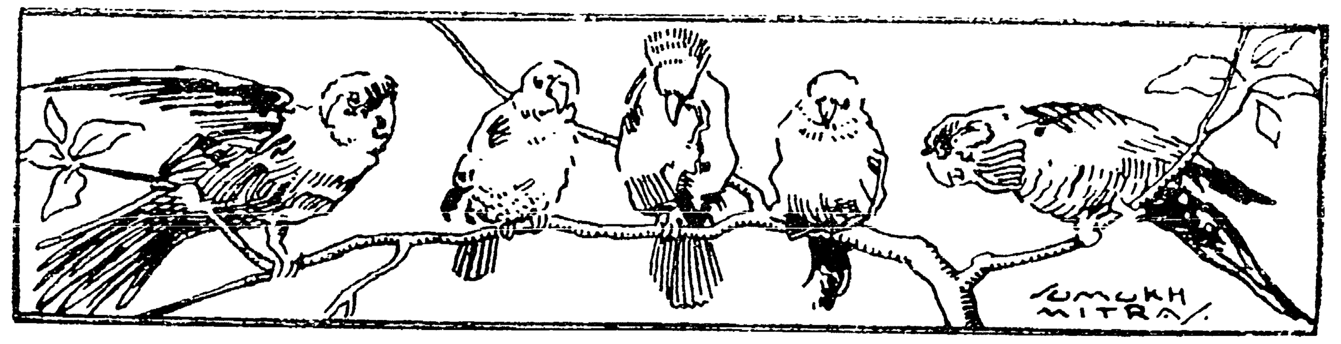

কাহিনী

শেষ প্রার্থনা

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত।

কাভুর মৃত্যুশয্যায়।—

কাভুর তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে বহুধা বিভক্ত ইতালিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটী স্বাধীন রাষ্ট্রে গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এই কাজে তিনি আরও অনেকের পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষ সাহায্য পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম মনে পড়ে ম্যাটসিনির নাম। ম্যাটসিনিকে নবীন ইতালির মন্ত্রগুরু বলা যেতে পারে। তিনিই "নবীন ইতালি" সৃষ্টি করে ইতালির জনসাধারণকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর আদর্শ ছিল এক অখণ্ড স্বাধীন ইতালীয় প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। যদি ইতালিয়ানরা মনপ্রাণ দিয়ে জন্মভূমিকে মুক্ত ক'রতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে কোনশক্তিই তাদের পরাধীন করে রাখতে পারবে না। এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তারপর নাম করতে হয়, সার্দ্দিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের। দেশের মুক্তির জন্য তিনি যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। আর অদ্ভুতকর্ম্মা গ্যারিবল্‌ডির নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি যেন যাদুমন্ত্রবলে তাঁর বিখ্যাত "লালসার্ট দলের" সাহায্যে দক্ষিণ ইতালি জয় করে ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপহার দেন।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, কাভুর না থাক্‌লে এঁদের সবার চেষ্টা ও পরিশ্রম সফল হ'তে পারত না। কাভুর সার্দ্দিনিয়ার মন্ত্রী হয়ে এই ক্ষুদ্ররাজ্যের যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেছিলেন, সত্যই তা বিস্ময়কর। অবশ্য একাজে তিনি রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছিলেন। এই রাজ্য সংস্কারের ফলে 'ইতালির দেশপ্রেমিকেরা সার্দ্দিনিয়াকে দেশের একমাত্র আশাভরসাস্থল বলে মনে করতে আরম্ভ ক'রলেন। এদিকে কাভুর বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত ইতালিকে অষ্ট্রিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত করা যাবে না। কাজেই তিনি ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা কল্লেন—এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ইংরাজ ও ফরাসীর পক্ষ হ'য়ে ক্রিমিয়ান যুদ্ধে যোগ দিলেন। যুদ্ধ শেষে নেপোলিয়ান কাভুরকে এই প্রতিশ্রুতি

দেন যে ইতালিকে অষ্ট্রিয়ার অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত ক'রতে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য ক'রবেন। এইবার কাভুর নেপোলিয়ানের সাহায্যে অষ্ট্রিয়ানদের পরাজিত করে লম্বার্দি প্রদেশ সার্দ্দিনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হ'লেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, নেপোলিয়ান তাঁর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পালন করতে অস্বীকৃত হ'লেন। ভেনিশিয়া প্রদেশ আষ্ট্রিয়ার অধীনেই থাক্‌লো। এতে অবশ্য কাভুর খুব মর্ম্মাহত হ'লেন—কিন্তু তিনি নিরুপায়। সে যা হ'ক, মধ্য ইতালির রাজ্যগুলি বিদ্রোহ করে তাদের অষ্ট্রিয়ান ডিউকদের তাড়িয়ে দিয়ে সার্দ্দিনিয়ার সঙ্গে মিলিত হ'ল। তারপর গ্যারিবাল্‌ডি মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে দক্ষিণ ইতালির নেপ্‌ল্‌স ও সিশিলি রাজ্য জয় করে ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপহার দেন। এইবারেও কাভুর যে অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা বড় একটা দেখা যায় না। শুধু বাকি রইল ভেনিশিয়া ও রোম। কাভুরের জীবদ্দশায় এই দুইটী স্থান ইতালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

—সেই কাভুর মৃত্যুশয্যায়।

মরণপথযাত্রীর মুখে একে একে মৃত্যুদূতের জরুরী আহ্বাণের চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল—ধীরে ধীরে জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে এল। এমনসময় এক শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি পাদরী এসে মুমূর্ষুর কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"পুত্র, এবার আমি তোমার আত্মার মঙ্গলকামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাব।" অনন্তপথযাত্রীর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল—ধীরে ধীরে তিনি চোখ মেলে চাইলেন। তারপর পরিষ্কার ও দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললেন—"হ্যাঁ পিতা, আসুন আমরা ইতালিয়ার জন্যও তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই।"

এই মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম প্রার্থনা বিশ্বপিতার চরণপ্রান্তে নিশ্চয়ই পৌঁচেছিল।

তাঁর মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সফল হ'য়েছিল।

———

এগ্‌জামিনের 'হল্'-এ

শ্রীসুচিত্রা মুখোপাধ্যায়

বসে বসে এগ্‌জামিন্ দিচ্ছি—
দূরে গাছপালা সার বেঁধে আছে।
ওই চওড়া মাঠের ওপর 'বাস্কেট-বলে'র 'পোষ্ট'।
পেছনে তার নতুন 'বোর্ডিং-হাউস'—
সবুজে গোলাপী মিশে লাগে অদ্ভুত!
আরও দূরে দৃষ্টি চলে—তিন-চারটে
চূড়ো পড়ে চোখে;—কিসের? কে জানে!

ও বাড়ী কাদের ? বারান্দায় মেলেছে কাপড়—
(হরেক-রঙের লাল, নীল, বেগুনে, সবুজ,
দোকানেতে কেনা লাল ফ্রক্—ছেড়া মোজা একপাটি)
আন্দাজে বোঝা গেল গেরস্তর বাড়ী।
চাকুরের দল কেউ আসেনিকো ফিরে,—
নিস্তব্ধ দুপুর—নিদ্রামগ্ন বাকি লোকজন।
মন আর চোখ দুই ফিরে এল 'হল্'-এ !
'গার্ড'-রূপী 'টিচারে'র হাই-হিল জুতো
বারে-বারে তোলে ধ্বনি—খট্, খট্, খট্ !
চোখ পড়ে সামনের কালো শাড়ীপরা ঐ মেয়েটির দিকে—
জিজ্ঞাস্য কিছু লিখে 'ব্লটিং'-এ 'পাশ্' করে দিল ওর
সামনের মেয়েটিকে (ক্লাসে'রই সে 'ফ্রেণ্ড' হবে,
তা না হ'লে এত ভাব ?)
শ্রান্ত চোখ, দেখবার কিছু পেয়ে
দৃষ্টিটাকে করে দিলে স্থির।
চোখের সামনে 'ফিল্মে'র মত, দেখলাম—
'গার্ড' তার চৌর্য্যবৃত্তি দেখে ফেলেছে !]
এগিয়ে এল—
খাতা নিলে কেড়ে ;
চোখে জল নিয়ে বেরিয়ে গেল
সেই মেয়ে !
পরীক্ষার্থীরা হোলো স্তম্ভিত,
'টিচারে'র কড়া আদেশ এল কানে।
চোখে চোখে ইসারার ঢেউ
প্রত্যেক ক্লাসে ;
পরে ফের মন দিল লেখাতে।
এবারেতে ফিলে এল চোখ
নিজের খাতার 'পরে।
লেখা হয়ে গেছে—তবু ছেড়ে নাহি দিবে !
কেন ? কেন ?
অর্থ খুঁজে জ্বালাতন হয়ে মরি !
কি যে ভাবে এরা, তা এরাই জানে।
সত্যি, ঘণ্টা পড়তে কত দেরি ?

———

শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—পাঁচ—

অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক

বাড়ী ফেরার পথে শিশির চুইংগাম্ কেনে। গোটাকতক নিজের এবং লিলির মুখে অর্পণ করে বাকীগুলো রেখে ছ্যায়।

"মামার পায়ে লাগানো যাবে এগুলো।" শিশির বলে।

মুখের বদলে পায়ে কেন, লিলি ভেবে পায় না। "কেন, পায়ে কেন ? মুখ থাক্তে—পায়ে ?" সে জিজ্ঞেস করে।

"আন্দাজ কর্ দেখি ! বুঝ্ব তোর বুদ্ধি !" শিশিরের রহস্যময় চাহনি।

লিলি আন্দাজ করে : "মামা বুঝি ফের আবার ভূপর্য্যটনে বার হবে মনে কর্ছ ? তাই চুইংগাম্, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখ্তে চাও ?"

চুইংগাম্ যেমন চর্ব্বনের—চর্ব্বিত চর্ব্বনের অন্তরায়, তেম্নি নিশ্চয় ভূপর্য্যটনকারীর পদে পদে বাধার সঞ্চার করবে, সম্মুখস্থ প্রমাণে—তার নিজের রোমন্থনের মুস্কিল—মুখস্থ করার অসুবিধা দেখে এই পর্য্যন্ত লিলি অনুমান করতে পারে।

"তোর মাথা !—তোর কিচ্ছু মাথা নেই ! তুই একটা গাধা !" শিশির সাদা বাংলায় বলে ছ্যায়।

"মুখে লাগালেও মানে বুঝতুম ! পাছে মামা প্ল্যানের খবর আর কারো কাছে ফাঁস্ করে ছ্যান্ সেই কারণে মামার মুখ বন্ধ করার মৎলবে—"

"মোটেই না, মোট্টেই না !" শিশির বাধা দিয়ে বলে : "কেন চুইংগাম্ কিন্লাম

বলি। মামা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মাথা খাটিয়ে প্ল্যান্‌টার রহস্যভেদ করেচে। করেনি কি ?"

"নিশ্চয় !" মামার কার্য্যকারিতায় লিলির অগাধ বিশ্বাস।

"আর আমি মামার পা খাটিয়ে তার সমস্ত জেনে নেব !" শিশির জানায়।

"পা খাটিয়ে ? মামার পা ?—" লিলি আবার গোলোক ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে, কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারে না।

"এই চুইংগাম্ এখনই গিয়ে মামার যাবতীয় জুতো আর শ্লিপারের তলায় ভালো করে এঁটে দেব। তাদেরই একজোড়াকে পায়ে দিয়ে তো মামা সেই গুপ্ত কক্ষের সন্ধানে যাবে। আর যে-যে ঘরের ভেতর দিয়ে যেখান দিয়েই যাক্ না—মামার প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে চুইংগামের চিহ্ন থেকে যাবে। চুইংগাম্‌রা তো সহজপাত্র নয় !"

লিলি অবাক্ হয়ে দাদার বুদ্ধির বহর ছাখে, তার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

বাড়ী ফিরে লিলি শিশির জুতোদের খোঁজখবর নিতে যাবে, এমন সময়ে মামার রুদ্ধ ঘরের ভেতরে ভয়ঙ্কর সোরগোল শুন্‌তে পায়।

—"তুমি তাহলে এই বাড়ী আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি নও ?" অপরিচিত কণ্ঠের বাজ্‌খাই আওয়াজ।

"নাঃ, কিছুতেই না।" মামার গলা।

"ভেবে ছাখো, আমি কদ্দূর থেকে এসেছি ? কিরকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে, প্রাণ তুচ্ছ করে—"

"আমার বয়েই গেল !"

এ বাড়ী হাতে রেখে তুমি কি করবে ? পুরণো পচা বাড়ী—এর ভাড়াটেও পাবে না কোনোদিন। এর ইঁট কাঠ কড়ি বরগারই বা কতো দাম হবে ! যদি চাও উচিত মূল্যে আমি এটা কিনেও নিতে পারি !"

"হ্যাঁ, এই বাড়ী বেচ্‌তে গেছি কিনা আমি !" মামার জবাব শোনা যায় : "এ বাড়ীর দাম আমার জানা আছে। তোমাকে আর বেশী করে জানাতে হবে না।"

"হুম্।" অপরিচিত গলার সুর বদ্‌লায় এবার : "হুম্, বুঝেচ। এই বাড়ীর কোনোখানে গুপ্ত ধন লুকানো আছে, তুমি ভেবেচ বোধ হয় ? যদি লুকানোও থাকে, কোনোদিন তুমি তার সন্ধান পাবে না। তার প্ল্যান্‌ই খুঁজে পাবে না কোনোদিন। সারা জন্ম খুজলেও তোমার ও হাঁদা বুদ্ধির কর্ম্ম না !"

"পাব কি পাব না, পেয়েছি কি পাই নি—সে আমি জানি !" মামা জানায় : "তোমাকে বল্‌তে গেছি আর কি ! কী আমার গুরুঠাকুর এলেন !"

"বটে ? এই কথা ? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যদি না দেখে নি, তাহলে আমার নাম—আমার নাম—"

বল্‌তে বল্‌তে ঝাঁঝালো গলায় ভদ্রলোক দরজা খুলে তীরবেগে বেরিয়ে যায়।

শিশির ও লিলি সিঁড়ির আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে ছাখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছাখে—তর্জ্জনগর্জ্জনকারী নবাগতটি আর কেউ নন্, তাদের সদ্যপরিচিত শ্রীমান্ বঙ্কেশ্বর আইচ !

সারাদিন শিশির আর লিলি ওৎ পেতে থাকে, মামার সবকটা জুতোর পরিচর্য্যা সেরে, মামাসুলভ গতিবিধির মাঝখানে, এখানে সেখানে, মামার যাত্রাপথের সর্ব্বত্র, প্রলোভনজনক করে ছড়িয়ে রেখে ছায়। যেদিকেই মামা পা বাড়ান্, একজোড়া পেয়ে যাবেন্—পায়ে পায়ে না পড়ে নিস্তার নেই—জুতোর জন্যে ইতস্ততঃ কর্‌তে হবে না—পায়ের গোড়াতেই, পায়চারির নাগালেই পড়ে রয়েচে ওরা।

কিন্তু সমস্ত বজ্র আঁটুনিরই ফস্‌কা গেরো রয়েচে—সারাক্ষণ মামার জুতোদের (এবং মামাও বাদ না) নজরে নজরে রেখে, বিকেলের দিকে, বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে পাঁপড়-ভাজাওয়ালা ফেরি করে যাচ্ছে দেখে, কেনার লোভ দমন কর্‌তে না পেরে, শিশির আর লিলি যেই না দৌড়ে গেছে—কতক্ষণ আর ? পাঁপড় চোখে দৌড়ে গেছে আর পাঁপড়-মুখে দৌড়ে এসেছে—আর এর মধ্যেই ফিরে এসে ছাখে—মামা নেই ! মামার দরজা ফাঁক্ ! মামার ঘর খালি ! কোথায় গেল—কোথায় গেল মামা ! জানাশোনা সমস্ত ঘর আঁতি-পাঁতি করে খোঁজা হোলো—কোনো ঘরেই মামা নেই !

নিশ্চয় তবে—তাহলে—সেই ধনভাণ্ডার সঙ্কুল গুপ্তকক্ষেই মামা বিরাজ কর্‌ছেন এখন ?

তক্ষুনি মামার বত্রিশ জোড়া জুতোর হিসেব সেখান নেয়া হোলো—গোনাগুন্তি করে ছাখা গেল, হ্যাঁ, ঠিক ! একজোড়া কমই বটে। মামার পায়ে পায়ে—মামার সাথে সাথেই উধাও হয়েছে মানিকজোড়।

এইবার চুইংগামের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে অন্বেষণের পালা ! শিশির বিচক্ষণ গোয়েন্দার মতো খুঁটিয়ে ছাখে আর খানিক এগোয়—লিলি যায় তার পেছনে পেছনে। দাদা যা করতে বলে তাই করে। লিলির চোখ বড়ো বড়ো, নিশ্বাস রুদ্ধ আর বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপুনি !

এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে—লম্বা ঘর, চওড়া ঘর, গোল ঘর অতিক্রম করে—এক ফালি ঘর, তিনকোনা ঘর, তের্‌ছা ঘর পার হয়ে—দুবার ওপরে উঠে, তিনবার নীচে নেমে—অবশেষে সোঁদা-গন্ধ-ওলা, গুদাম ঘরের মতো, পোড়ো ঝোড়ো চামচিকে-ওড়ো একটা ঘরের নেপথ্যে গিয়ে ওরা উত্তীর্ণ হোলো।

নেপথ্য থেকেই জরাজীর্ণ জান্‌লার আনাচ থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌ল, এক হাতে টর্চ্চ আরেক হাতে সেই প্ল্যান্‌খানা নিয়ে, সেই গুদামঘরের দেয়ালে কী যেন খোঁজাখুঁজি কর্‌ছেন!

কী খুঁজচেন, বুঝতে দেরি হয় না শিশিরদের। ওরই মধ্যে কোন্‌খানে অর্থপূর্ণ দেরাজ—দেয়ালের অন্তর্গত হয়ে, দেয়ালের সঙ্গে একাকার হয়ে, ছলনা কর্‌ছে তাকে আবিষ্কার করারই মামার প্রয়াস।

শিশির আর লিলি পা টিপে টিপে গুদাম ঘরের মধ্যে সেঁধোয়।

খুট করে' আওয়াজ হয় একটু। অমনি তীব্র টর্চ্চের আলো এসে ওদের মুখের ওপর আছাড় খায়। "কে? কে ওখানে?" মামার খন্‌খনে গলার ভেতর থেকে ধারালো প্রশ্ন বেরিয়ে আসে—মামার পকেট থেকে ঝক্‌ঝকে পিস্তল বার হয়—একেবারে যুগপৎ।

"আমি? আমরা। আমরা মামা।" শিশিরের কম্পিত কণ্ঠ।

"কে? কে তোমরা?" মামা চিন্‌তে পারেন না—পিস্তল লক্ষ্য করেন।

এক হাতে টর্চ্চ আরেক হাতে সেই প্ল্যানখানা নিয়ে

"আমরা তোমার ভাগ্‌নে।" শিশির লিলিকে আড়াল করে দাঁড়ায়—গোলাগুলির যা কিছু ঝড়ঝাপ্‌টা আসুক, ও নিজেই বুক পেতে নেবে। লিলি দাদাকে আঁক্‌ড়ে ধরে পেছন থেকে।

"ভাগ্‌নে? ভাগ্‌নে!—"মামা বিকট অট্টহাসি হেসে ওঠেন: "ভাগ্‌ নেবার ভাগ্‌নে আমার!"

তারপর হাসি থামিয়ে, টর্চ্চের আলোয়, উন্মুক্ত পিস্তলে, মামা এগিয়ে আস্‌তে থাকেন—তাঁর ছুচোখে অহেতুক পৈশাচিক উল্লাস!

"সোজা হয়ে দাঁড়া! ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়ে থাক্‌। আমি একটার পর একটাকে সাবাড় কর্‌ব। পিস্তলটা আজই কিনেছি! কোনো কাজের কিনা এটা, তাও তো পরীক্ষা করা দরকার! আরেকটা কই, আরেকজন গেল কোথায়? ছুটোকেই খতম কর্‌ব—কোনো আপত্তি শুনছিনে। কিচ্ছু না!"

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। অভাবনীয় কাণ্ডটা যে ঠিক এই রকম সময়েই ঘটবে তার আর আশ্চর্য্য কি? ওরা তো সব ওৎ পেতে—এই ধরণেরই যুৎ খোঁজে।

গুদামঘরের পেছনের দিকে আরেকটা প্রবলতর টর্চ্চের আলো মামার পিঠের ওপর এসে পড়ে—পিঠে যেন সহসা ধাক্কা মারে মামার।

"য়্যা? একে? এধার থেকে কে আবার?" মামার অগ্রপশ্চাৎ-বোধ লোপ পায়—মামা কোন্‌দিকে যে ফিরবেন স্থির কর্‌তে পারেন না।

"যেমন আছো তেমনি থাকো। নোড়োচোড়ো না! একটু এদিক ওদিক হয়েছ কি মাথার খুলি উড়ে গেছে?" পেছনের টর্চ্চার—(কিম্বা টর্চ্চারার) বাজখাঁই গলায় হুকুম ছ্যান্‌।

মামা সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকটি এগিয়ে এসে, মামার হাত থেকে প্ল্যান্‌ এবং পিস্তলটি কেড়ে নেয়।

"একি? মামা—তুমি? তুমিই ভাগ্‌নের সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছ? ফের এসেচ আবার?" ব্রজেশ্বরবাবুর কাতরকণ্ঠে থেকে বার হয়।

"সকালে যখন বল্লুম তখন হোলো না? এখন তো হোলো, কেমন?" বক্কেশ্বর আইচ হো হো করে হাসেন—"প্যাঁজ—পয়জার ছুইই, হোলো তো! এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো বিছানায় ফিরে যাও!"

মামার হাতে ভাগ্‌নের মরণ—চিরদিনই জানি!" ব্রজেশ্বর বিদীর্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

শিশির পশ্চাৎবর্ত্তিনীর কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করে: "মামার ওপরেও মামা আছে! কী দেখছিস্‌ লিলি?"

বক্কেশ্বর টর্চ্চটাও কেড়ে নেন্‌ ব্রজেশ্বরের হাত থেকে।

ক্রমশঃ

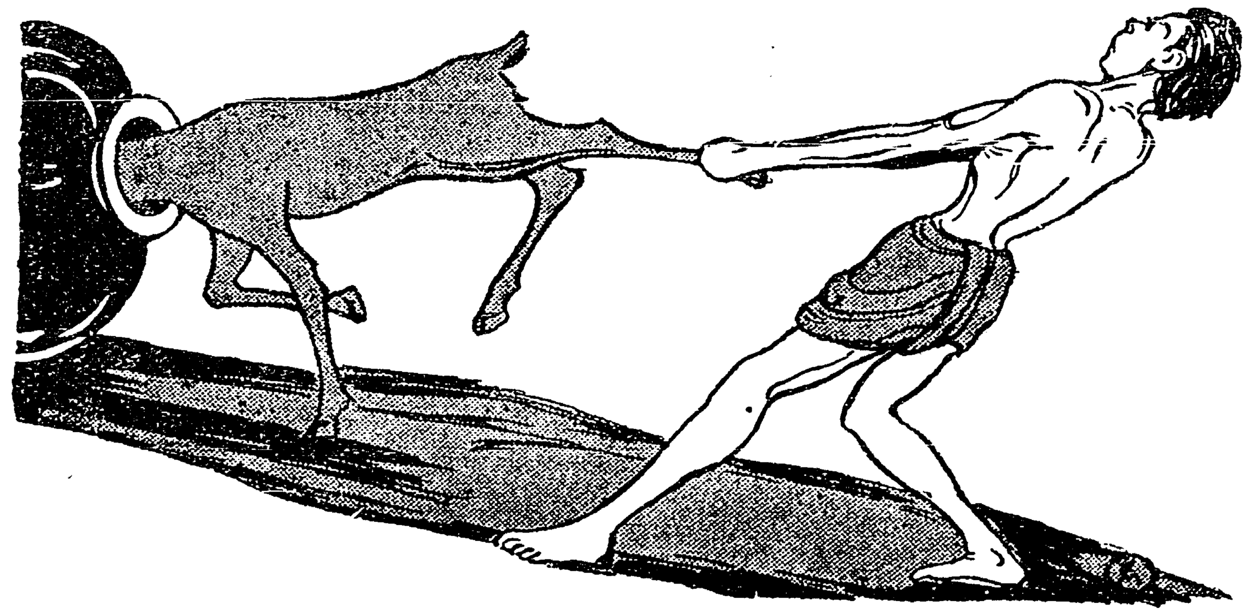

পৃথিবীর শেষে

শ্রীসত্যকান্ত গুহ

লাল জাহাজের কাপ্তেন আর এক বুড়ো সদাগর
একদিন, শোনো, আট্‌লান্টিকে
—যার ডাঙা নেই কোনো একদিকে—
ভাসালো জাহাজ, মস্ত জাহাজ, যেন পাহাড়ের ঘর ;
পালগুলো সব ফুলে ফুলে ওঠে
যেন রাক্ষস শিষ দেয় ঠোঁটে
'জয় শঙ্কর' বল্‌ল মাঝিরা সাতশো সাতাত্তর ;
আট্‌লান্টিক বলে 'আরে ! আরে !'
জাহাজটা খালি খালি ঘাড় নাড়ে,
হাততালি দিয়ে ডেকে কয় কারে পথ্ কর্ পথ্ কর্ ।

এমনি করে তো কেটে গেল শেষে একশত বৎসর
বিশ্বাস কেউ করো বা না করো,
একশ বছর হিসেবটা ধরো,
ভালো করে পড়ে বলো অদ্ভুত আছে কিছু এর পর !
একশ বছরে কত কোটি চাঁদ ঢেউয়ে ঢেউয়ে গেল গলে,
কত আঁধারের কালো পোষাকের রং গেল তাতে জ্বলে ;
তবু্তো জাহাজ চলে আর চলে,
ঢেউয়ে আর ঝড়ে, ঝড়ে আর জলে,
শেষে একদিন নামলো কুয়াসা যেন কালো পাথর ।
লাল কাপ্তেন রেগে মেগে খুন
বলে, "কে ডাইনী করল এ গুণ,"
বলে সদাগর "জ্বেলে দে আগুন, কুয়াসাটা দূর কর্ ।"

লাল জাহাজের মাঝি যারা ছিল সাতশ সাতাত্তর,
একশ বছরে হয়ে গেছে কারো বয়স বাহাত্তর
সলা করে তারা ডেক-য়ে এসে কয়
'এমন সুযোগ ছাড়বার নয়
ভাগ্যে জাহাজ আটকালো আজ জয় জয় শঙ্কর
আজকের রাত ঘুমিয়ে কাটাবো ঘুমের গান্‌টা ধর ।'
রেগে মেগে কাঁ'ই কাপ্তেন সাঁই ফেললেন নোঙ্গর ।

বললেন হেঁকে 'কে আছিস্ ডেকে সাতশ সাতাত্তর'—
কে বা দেয় সাড়া কে বা তোলে কানে,
নাকের বাঁশীটা বাজে একতানে,
সাগর যেন সে ঘুমে ঢুলে যায়, নিঝুম তেপান্তর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে শুধু বাজছে বাজনা ঝর ঝর ঝর ঝর ।
হঠাৎ আকাশে কালো মেঘে বাজ হাঁকল কড়াক্কড়,
বাঁকা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন আগুনের অজগর,
আকাশেতে কার চলে ভারী রথ
জ্বলে' জ্বলে' ওঠে মেঘ-ঢাকা পথ
উড়ে চলে যেন গোটা পর্ব্বত থর্ থর্ চরাচর,
সামাল সামাল বলে জেগে ওঠে সাতশ সাতাত্তর ।
লাল কাপ্তান ঠোঁট কামড়ান সদাগর নাড়ে দাড়ী,
বলে দুইজন "একি অঘটন মুস্কিল হ'ল ভারী—
কাটলো সাগরে একশ বছর
তুাড় দিয়ে এনু কত জল ঝড়
আজকে প্রাণটা বাঁচে কি না বাঁচে কে জানে অতঃপর ।"

কালো কুয়াসায় কালো ছায়া ফেলে গুড়ি মেরে আসে কেরে !
ওকি নরকের দুঃস্বপ্নের পাতাল এসেছে ছেড়ে ?
এ কার জাহাজ ? কোন্ অভিযানে
ভূতের মতন চলেছে ! কে জানে ?
যার নেই মানে, তার খুঁজে মানে কাঁপলো যে থর থর
লাল জাহাজের লাল কাপ্তেন আর বুড়ো সদাগর ।
কালো জাহাজের কালো কাপ্তেন হেঁকে বলে "এই রও !
কে যায় কোথায়—লাল জাহাজের কাপ্তেন কথা কও ।
খালি খালি ভেসে কোথা চলে যাস্ ?
পৃথিবীর শেষ দেখতে কি চাস্ ?
আজকে এসেছে ঝড়ের বাতাস তুলে ফ্যাল্ নোঙ্গর !"
লাল জাহাজের কাপ্তেন কয় "খুঁজে খুঁজে মরি সোনা,
বুড়ো সদাগর নোন্‌তা হাওয়ায় দাড়ি ধরে গেল নোনা—"
হা হা করে কালো কাপ্তেন হাসে
বলে "অত সোনা কোথা হতে আসে !—
পৃথিবীর শেষে সোনার পাহাড় একশোটা পর পর—
লাল জাহাজের কাপ্তেন আয়, আয় বুড়ো সদাগর ।"

লাল জাহাজের একশোটা পাল উঠে গেল ফর ফর
কালো কাপ্তেন বলল "সাবাস্ ! পথ ধর্ পথ ধর্—"

ঢেউয়ে ঢেউয়ে কারা গায় কোন্ গান !
সে কি ভূত ওরে সে কি সয়তান !
কেঁপে কেঁপে ওঠে, দুরু দুরু প্রাণ সাতশ সাতাত্তর—
লোভে জর্জ্জর লাল কাপ্তান আর বুড়ো সদাগর।
আটলান্টিক দিনে আর রাতে কাঁপে কাঁপে থর থর,
হাওয়া পাক খায় ঢেউ ছলকায় বয়ে যায় জল ঝড়,
দিনের সোনালী মিশে যায় রাতে
কত আঁধারের কালো কিনারাতে
এক এক করে গলে গলে' পড়ে একশোটা বৎসর।
একশো বছরে কেটে গেল বুঝি পাঁচশোটা বৎসর
বয়স হয়েছে কারো সাত কুড়ি তিনশো পঁচাত্তর—
শনের মতন পেকে যায় দাড়ি
ক্ষীণ হয়ে আসে বুড়োদের নাড়ি
পালগুলো সব ঝুলে ঝুলে যায় রশিগুলি জর্জ্জর !
মুখে কথা নেই লাল কাপ্তেন আর বুড়ো সদাগর।
একদিন রাত তিনটে প্রহর চারিদিক নিঝ্ঝুম
লাল কাপ্তেন জেগে বসে আছে চোখে নেই তার ঘুম—
ভাবে এ চলার কবে হবে শেষ ?
আজকে কথার হয়ে যাক শেষ ?
আজ চলে যাব কালো জাহাজের কাপ্তেনটার ঘর !
বুড়ো সদাগর ঘুমোয় ঘুমোয় নাক ডাকে ঘর্ঘর।
রশি ধরে' ঝুলে লাফ দিয়ে পড়ে কালো জাহাজের ডেকে—
"কেই হ্যায় কালো কাপ্তেন" লাল কাপ্তেন কয় হেঁকে—
কোথায় মাঝিরা ? কোথা কাপ্তান ?
চারিদিকে শুধু হাওয়ার তুফান !
লাল কাপ্তান ভয়ে তার প্রাণ ধর্‌ফড় ধর্‌ফড় !
"কই হ্যায়" বলে' যত ডাকে তত সাড়া নেই কোনোখানে
মনে হয় যেন চলেছে জাহাজ একা কোন্ অভিযানে—
"কোথা কাপ্তান ! কালো কাপ্তান !"
ঘরে ঢুকে দেখে এক বুনো গান
গায় কাপ্তান, কালো কাপ্তান, সে গান ভয়ঙ্কর !
"পৃথিবীর শেষ আর কত দূর" লাল কাপ্তান কয়
"মানুষকে নিয়ে এই অদ্ভুত ছেলেখেলা আর নয়।"
কালো কাপ্তেন হো হো করে হাসে
লাল কাপ্তেন কেঁপে মরে ত্রাসে
খুলে তরোয়াল বিঁধে দিতে আসে কাপ্তেন তার ধড়।

হো হো করে কারা হেসে ওঠে আর বলে "কোথা পাবি ধড় ?
পৃথিবীর শেষে আমরা এসেছি ছায়া পৃথিবীর ঘর"—
চারিদিক কারা ভীড় করে আসে
ছায়ায় তাদের দেহ শুধু ভাসে
গলায় তাদের যেন বেজে ওঠে সাত নরকের স্বর।
"পৃথিবীর শেষে আমরা এসেছি, দড়ি ধরে' ঝুলে পড়,
গলায় ফাঁসটা লাগলে মিলবে পৃথিবী শেষের ঘর।"
লাল কাপ্তেন হেঁকে কয় "কেরে !"
তারা বলে "আয় পৃথিবীটা ছেড়ে।"
ভয়ে হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ল ডেকের'পর।
যা আগে দেখেনি, আজ তাই দেখে ভয়ে কাঁপে কাপ্তান,
পালের রশিতে ঝুলে আছে শব একশ একাশী খান—
ডেকে শুধু কারা ছায়া হয়ে চলে
জাহাজ চলেছে একা একা জলে—
আটলান্টিক ! আটলান্টিক ! প্রেতের তেপান্তর !
ভয়ে কাপ্তেন নিজের গলায় হাত দিতে গেল যেই
দেখে গলা নেই, শরীরটা নেই, সে-ও নেই, নেই, নেই—
হাঁক দিয়ে কয় "ওরে সদাগর
পৃথিবী শেষের এসেছে প্রহর—
ওরে গান ধর লাল জাহাজের সাতশ সাতাত্তর।
জেগে ওঠে তারা, জেগে উঠে দেখে তারা নেই তারা নেই,
"আছি" ভেবে শুধু চলছিল এক বিরাট ঘুমের খেই ;
আকাশের রং কালো হয়ে আসে
জাহাজের ডেকে ছায়াগুলো হাসে
হেসে হেসে ওঠে আটলান্টিক, হাসে কারা নিশাচর !
পৃথিবীর শেষে এলো কাপ্তেন আর বুড়ো সদাগর।

তুমি যদি যাও আটলান্টিকে, চেওনা সোনার ঘর
কালো জাহাজের পিছনে যেওনা কাপ্তেন সদাগর—
রাত হলো দুটো ছায়ার প্রহর,
কারা কয় দড়ি ধরে' ঝুলে পড়,
আমি ভাব শুতে হবে সত্বর হয়তো তাহার পর
স্বপ্নে দেখব ছায়ার জাহাজ, কাপ্তেন সদাগর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপদগ্রস্ত পৈতৃক প্রান

এই অস্থানে কেন হঠাৎ গাড়ী থামল, আলো নিয়ে জলে ভিজে কেন অত লোক ছুটাছুটি করছে ?

পৃথিবীকে সশব্দ ক'রে অন্ধকার আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছিল হুড়্-হুড়্ এবং কাম্‌রার জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়া আলোক-রেখার মধ্যে এসে তারা উঠছিল চক্-চক্ ক'রে। কিন্তু দেখতে দেখতে বৃষ্টির তোড় এল ক'মে।

আমি তাড়াতাড়ি বর্ষাতি বার ক'রে পরতে লাগলুম।

বিনয়বাবু স্থধোলেন, "বিমল, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ ?"

—"হ্যাঁ, আপনারাও আস্থন। কাম্‌রায় কেবল রামহরি থাক্।" ব'লেই আমি রিভলভারটাও বার ক'রে পকেটের ভিতরে রাখলুম।

—"ও কি ওটা নিয়ে আবার কি হবে ?"

—"সাবধানের মার নেই।"

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, "বাঘা আমাদের সাজগোছ দেখে কি-রকম উত্তেজিত হয়েছে দেখ! ওকেও সঙ্গে নেব নাকি ?"

—"নিতে চাও, নাও।"

সবাই সশস্ত্র হয়ে কাম্‌রা ছেড়ে বাইরে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন ট্রেণের প্রত্যেক কামরা থেকে ভীত যাত্রীরা বেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড জনতা সৃষ্টি করেছে। ট্রেণের অনেক কাম্‌রার ভিতর থেকে আর্ত্তনাদ ও শিশুদের কান্নাও শোনা যাচ্ছে ; অত্যন্ত আচম্‌কা ট্রেণের গতি রুদ্ধ হওয়াতে হয়তো বহু লোক চোট খেয়েছে অল্পবিস্তর।

দূরের আলোগুলো লক্ষ্য ক'রে ভিড় ঠেলে আমরা দ্রুতপদে এগুতে লাগলুম। যথা-স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, ট্রেণের ড্রাইভার, গার্ড ও আরো কয়েকজন কর্ম্মচারী রেললাইনের উপরে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কি পরীক্ষা করছে।

সেই সময়ে এক সাহেব-যাত্রী এসে প্রশ্ন করাতে গার্ড বললে, "কারা এখানে গাড়ী উল্টে দেবার চেষ্টা করেছিল। এই দেখুন, লাইনের দুখানা রেল একেবারে খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে! ভাগ্যে 'ড্রাইভার' সতর্ক ছিল, তাই 'ব্রেক্' ক'ষে কোনরকমে শেষ-মুহূর্ত্তে গাড়ী থামিয়ে ফেলতে পেরেছে!"

রেলপথের দিকে তাকিয়ে দেখে গা শিউরে উঠল! ট্রেণ থেমে পড়েছে লাইনের ভাঙা অংশের মাত্র হাত-কয়েক আগে! চালক যদি দেখতে না পেত বা একটু অন্যমনস্ক থাকত, তাহ'লে এই শত শত পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুতে পরিপূর্ণ দ্রুতগামী মেল-ট্রেণের অবস্থা যে কি ভয়ানক হ'ত, সেটা ভাবলেও স্তম্ভিত হয়ে যায় বুক!

অনেকে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে গিয়ে সাদরে ড্রাইভারের করমর্দ্দন ক'রে তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে ধন্যবাদের পাত্র! তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ না হ'লে এতক্ষণে হয়তো আমাদের সমস্ত সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে যেত মাটির পৃথিবীর সঙ্গে! বেঁচে থাকলেও হয়তো হাত বা পা হারিয়ে চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে দিন কাটাতুম—মৃত্যুর চেয়ে যে-অবস্থা ভয়ঙ্কর।

কুমার বললে, "বিমল, এ কাজ কার ? এর মধ্যে ছুন্-ছিউর হাত নেই তো ?"

গোলেমালে ছুন্-ছিউর কথা ভুলে গিয়েছিলুম, কুমারের মুখে তার নাম শোনবামাত্র আমার সারা মন চম্‌কে উঠল!

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, না, অসম্ভব!"

কুমার বললে, "কেন, অসম্ভব কেন ? সে যে আমাদের ভোলে নি, গেল কালই তার প্রমাণ পেয়েছি! কে বলতে পারে, আমাদের গতিবিধির উপরে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে নি ? হয়তো কাল যখন আমরা গাড়ী রিজার্ভ করতে ইষ্টিশানে এসেছিলুম, তখনো তার চর ছিল আমাদের পিছনে পিছনে। টিকিট-ঘর থেকেই আমাদের গন্তব্য স্থানের খোঁজ নেওয়া কিছুই অসম্ভব নয়! হয়তো ছুন্-ছিউ ভেবেছিল, ট্রেণ-দুর্ঘটনায় গাড়ীশুদ্ধ লোক যখন হত বা আহত হবে, চারিদিকে যখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে, তখন সে সদলবলে সেই গোলে-হরিবোলে এসে আবার লকেটখানা উদ্ধার করবে!"

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "কুমার, তোমার আজগুবি কল্পনাকে সংযত কর! তুচ্ছ একখানা লকেটের লোভে ছুন্-ছিউর এতখানি বুকের পাটা কিছুতেই হ'তে পারে না।"

—"কেন হ'তে পারে না ? ছুন্-ছিউ কত-বড় গোঁয়ার, ভেবে দেখুন দেখি! কলকাতার

জনতায় ভরা হোটেলে মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপে না, কলকাতার মত সহরে দিনের বেলায় আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে সে পিছ্‌পাও হয় নি, কলকাতার পুলিস-কোর্ট থেকে সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সে লম্বা দিয়েছিল—এমন সব দুঃসাহসের কাহিনী আর কখনো শুনেছেন ? অদ্ভুত এই চীনে-দস্যু ! আমার বিশ্বাস সে সব করতে পারে !”

আমি এ তর্কে যোগ দিলুম না। আমি তখন ভাবছিলুম, ঘটনাস্থলে অদৃশ্য অপরাধী কোন চিহ্ন রেখে গেছে কিনা ? বিজলী-মশালের আলো ফেলে রেলপথটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। সেখানে পাথর-ভাঙা নুড়িগুলোর উপরে কোন চিহ্নই নেই। উঁচু বাঁধের ঢালু গায়ে রয়েছে ঘাসের আগাছার আবরণ। সেখানেও কিছু পেলুম না। আঁধার রাত্রি তখনো টিপ্‌-টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি বর্ষণ করছিল—বাঁধের তলায় দেখলুম কর্দ্দমাক্ত জমি। অপরাধীরা নিশ্চয়ই পাখী হয়ে উড়ে পালায় নি। বাঁধের এপাশে কি ওপাশে মাটির উপরে তাদের কোন চিহ্নই কি পাওয়া যাবে না ? ভাবতে ভাবতে নীচে নামতে লাগলুম, বাঘা করলে আমার অনুসরণ। এ-রকম কাজ পেলে সে ভারি খুসি হয়, ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সেইটেই বোধ করি আমাকে জানিয়ে দিতে চাইলে।

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন, “ওকি হে, ওদিকে কোথায় নামছ ? শেষটা সাপের কামড়ে মারা পড়বে ?”

কোন জবাব দিলুম না। একবার সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম। ঝির্‌-ঝির্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, গোঁ-গোঁ ক'রে ঝড় ডাকছে, অন্ধকার ফুঁড়ে দূর অরণ্যের কোলাহল ভেসে আসছে। অদৃশ্য কালো মেঘকে দৃশ্যমান ক'রে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠছে মাঝে মাঝে। খানিক তফাতে আঁধার-পটে আরো ঘন আঁধার-রং দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা ছোট বন, নীচের দিকে কালি-মাখা ঝোপ-ঝাপ, উপর-দিকে টলোমলো গাছ—যেন কতগুলো শিকলে-বাঁধা দানব মুক্তিলাভের চেষ্টায় করছে ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ !

বাঁধের তলাতেই পেলুম আমি যা খুঁজছিলুম ! কুমারকে ডাকতেই সে ছুটে নেমে এল।

সে বল্‌লে, “এ যে অনেকগুলো লোকের পায়ের দাগ ! দাগ দেখে মনে হচ্ছে লোকগুলো মাঠের দিকে গিয়েছে।”

বাঘা গম্ভীরভাবে সশব্দে মাটি শুঁকতে লাগল। তারপর চাপা-গলায় গর্জ্জন ক'রে বোধ করি পলাতক শত্রুদেরই ধমক দিলে।

বাঁধের উপর থেকে কৌতূহলী গার্ডও নেমে এসে বললে, “বাবু, তোমরা কি করছ ?”

আমি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মাটির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

গার্ড খানিকক্ষণ নীরবে দাগগুলো পরীক্ষা ক'রে বললে, “দেখছি টাট্‌কা পায়ের দাগ !”

বললুম, “হ্যাঁ, এদের বয়স বেশীক্ষণ নয়। সেইজন্যেই মনে হচ্ছে এই দাগগুলো অপরাধীদেরই পায়ের। কারণ এমন দুর্য্যোগে এতগুলো লোক নিশ্চয়ই এখানে ফুর্ত্তি ক'রে হাওয়া খেতে আসে নি।”

গার্ড বললে, “বাবু, ঐ কুকুরটা মাটির ওপরে কি শুকঁতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে ?”।

—“পায়ের চিহ্নর ভিতরে ও শত্রুদের গন্ধ আবিষ্কার করেছে।”

গার্ড বিস্মিত স্বরে বললে, “ওটা তো দেখছি দিশী কুকুর, ও আবার পায়ের দাগের কি মর্ম্ম বুঝবে ?”

কুমার বললে, “যত্ন আর শিক্ষা পেলে আমাদের দিশী কুকুর তোমাদের বিলিতী হাউণ্ডের চেয়ে কম কাজ করে না। বাঘা শত্রুদের গন্ধ চেনে।”

দেখছি টাটকা পায়ের দাগ

বাঘার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও রেলপথের তারের বেড়া পার হয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল আরো অনেক কৌতূহলী লোক—তাদের ভিতরে সাহেব আছে বাঙালী আছে হিন্দুস্থানী আছে।

খানিক পরে একটা ঝোপ। গার্ডকে ডেকে বললুম, “এইবারে দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ।”

—“কি দেখব ?”

—“খানিক আগে মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ছিল ব'লে পায়ের ছাঁচগুলো ছিল জলে ভর্ত্তি ! কিন্তু এখানকার পায়ের ছাঁচ ভিজে হ'লেও জলে ভর্ত্তি নয়।”

—“তাতে কি বোঝায়?”

এই বোঝায় যে অপরাধীরা একটু আগেই ঝোপের আড়ালে ছিল দাঁড়িয়ে। বোধ হয় অপেক্ষা করছিল ট্রেণখানা ওল্টাবার জন্যে। কিন্তু ট্রেণ রক্ষা পেয়েছে আর আমরা আসছি দেখে তারা চট্‌পট্‌ স'রে পড়েছে।”

—“বাবু, তোমার যুক্তি বুঝলুম না।”

—“মুষল-ধারার পর যখন টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি সুরু হয় অপরাধীরা তখনই এখান থেকে

পালিয়েছে। তাই এখান থেকে যে-সব পায়ের ছাপ সুরু হয়েছে তাদের ভিতরটা এখনো জলে পূর্ণ হবার সময় পায় নি।"

গার্ড বললে, "বাবু, তুমি কি পুলিসে কাজ কর?"

—"না।"

—"তবে তুমি এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পেলে কেমন ক'রে?"

—"ভগবান দিয়েছেন ব'লে। ভগবান সবাইকে চক্ষু দেন বটে, কিন্তু সকলকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন না।"

গার্ড বললে, "ঠিক বাবু, তোমার কথা আমি স্বীকার করি। পায়ের দাগগুলো আমিও দেখছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। অথচ এখন তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে, এটুকু আমার অনায়াসেই বোঝা উচিত ছিল।.. ...বাবু, তুমি আর কিছু বুঝতে পেরেছ?"

—"এখান থেকে প্রায় দু'শো গজ তফাতে একটা জঙ্গলের আবছায়া দেখা যাচ্ছে! পায়ের দাগগুলো ঐদিকেই গিয়েছে। অপরাধীরা নিশ্চয় ঐ জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে আছে।"

কুমার বল্লে, "এখন আমরা কি করব? ঐদিকে যাব?"

গার্ড বললে, "না, এখন আমাদের ফিরতে হবে।"

—"কেন?"

—"আমার উপরে রয়েছে অপরাধী গ্রেপ্তার করার চেয়েও বড় কর্ত্তব্যের ভার। রেল-লাইন ভেঙেছে, এই খবর দেবার জন্যে আমাকে এখন গাড়ী নিয়ে পিছনের ইষ্টিশানে ফিরে যেতে হবে। নইলে কোন ডাউন-ট্রেণ এসে পড়লে বিষম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, আর সেজন্যে দায়ী হব আমিই।"

গার্ডের কথা সত্য। তার উপরে আমরা ঠিক প্রস্তুত হয়েও আসি নি, সঙ্গে যে লোকেরা রয়েছে তারা হয়তো এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঐ অচেনা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ভরসা করবে না। আর এমন রাতে অপরাধীদের খুঁজতে যাওয়াও হবে হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে এলোমেলো ছুটোছুটি করার মত। খুব সম্ভব তাদের খুঁজে পাব না, আর খুঁজে পেলেও ছুন্-ছিউ ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করা বড় চারটি-খানিক কথা নয়! হয়তো তারা দলে ভারি আর সশস্ত্র।

বিনয়বাবু বললেন, "ওহে বাপু বিমল! চুপ ক'রে ভাবছ কি? গোঁয়ারতুমি করবার ইচ্ছে হ'চ্ছে বুঝি?"

আমি হেসে বললুম, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! গার্ড-সায়েবের পিছু পিছু আমিও পলায়ন করতে চাই!"

কুমার বললে, "যঃ পলায়তি স জীবতি! সেকালে কোন বুদ্ধিমান বাঙালীও ব'লে গেছেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমরা হচ্ছি পিতৃভক্ত পুত্র, বাপের নাম করবার সুযোগ পাব ব'লেই পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করা দরকার।"

আমি বললুম, "কিন্তু কুমার, বাঘা বোধহয় পশু ব'লেই পৈতৃক প্রাণের' মর্য্যাদা বোঝে না। ঐ দেখ, সে আবার বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

বাঘা খালি এগুচ্ছে না, উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ চীৎকারও করছে। তার ও-রকম চীৎকারের অর্থ আমরা বুঝি। মানুষের পক্ষে অসাধারণ তার পশু-দৃষ্টি তিমির-যবনিকা ভেদ ক'রে নিশ্চয়ই কোন শত্রু আবিষ্কার করেছে।

বাঘা ফিরতে রাজি নয় দেখে কুমার দৌড়ে গিয়ে তার বগ্‌লোস্ চেপে ধরলে। কিন্তু তবু সে বাগ্ মানতে চাইলে না—বার বার জঙ্গলের দিকে ফিরে ফিরে দেখে আর কুমারের হাত ছাড়াবার জন্যে টানা-হ্যাঁচড়া করে। তার ক্রুদ্ধ চোখদুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মত।

ওদিকে তাকিয়ে আমি কিন্তু খালি দেখলুম, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-বাহু আকাশে আন্দোলিত ক'রে জঙ্গল করছে মর্ম্মর-হাহাকার। তবে এ সন্দেহটা বারংবারই মনের মধ্যে জাগতে লাগল যে, ঐ অন্ধকার-কেল্লার ভিতরে যারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা একটুও অচেতন নয়—ঝোপঝাপের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়ে আছে তাদের হিংস্র চক্ষুগুলো।

গার্ড বললে, "আর দেরি নয়, সবাই ফিরে চল!"

কমল আফ্‌সোস্ ক'রে বললে, "হায় রে হায়, একটা নতুন এ্যাড্‌ভেঞ্চার একেবারেই মাঠে মারা গেল!"

ক্ষাপ্পা হয়ে বিনয়বাবু বললেন, "চুপ, চুপ! একে মনসা, তায় ধূনোর গন্ধ!"

হঠাৎ বাঘা জঙ্গলের দিকে চেয়ে একেবারে যেন হন্যে হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কুমার আর তাকে ধ'রে রাখতে পারে না!

গার্ড আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কুকুরটা হঠাৎ এমন করছে কেন?"

তার প্রশ্নের উত্তর এলো জঙ্গলের দিক থেকে। আচম্বিতে অন্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম ক'রে দুইবার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল—চোখের উপরে জ্ব'লেই নিবে গেল দুটো বিদ্যুতের চমক!

যে কৌতূহলী যাত্রীগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল, তারা সভয়ে প্রাণপণে দৌড় মারলে রেলপথের দিকে, আমাদের চারজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল খালি গার্ড ও একজন সাহেব।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, "ঐ ঝোপের আড়ালে চল—ঝোপের আড়ালে চল!"

ঝোপের পাশে গিয়ে গার্ড উত্তেজিত স্বরে বললে, "বাবু, বাবু, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়?"

কুমার বললে, "করতে চায় কি, আক্রমণ করেছে! ঐ দেখ, জঙ্গলের দিক থেকে কতগুলো সাদা কাপড় পরা মূর্ত্তি ছুটে আসছে!"

আমি রিভলভার বার ক'রে বললুম, "দেখছেন বিনয়বাবু, সঙ্গে কেন অস্ত্র আনতে ব'লেছিলুম?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "ভাই বিমল, আমাদের পৈতৃক প্রাণগুলো এ-যাত্রা শনির দৃষ্টি বুঝি আর এড়াতে পারলে না।"

ক্রমশঃ

পালিয়েছে। তাই এখান থেকে যে-সব পায়ের ছাপ সুরু হয়েছে তাদের ভিতরটা এখনো জলে পূর্ণ হবার সময় পায় নি।''

গার্ড বললে, "বাবু, তুমি কি পুলিসে কাজ কর?"

—"না।"

—"তবে তুমি এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পেলে কেমন ক'রে?"

—"ভগবান দিয়েছেন ব'লে। ভগবান সবাইকে চক্ষু দেন বটে, কিন্তু সকলকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন না।"

গার্ড বললে, "ঠিক বাবু, তোমার কথা আমি স্বীকার করি। পায়ের দাগগুলো আমিও দেখছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। অথচ এখন তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে, এটুকু আমার অনায়াসেই বোঝা উচিত ছিল।.. ...বাবু, তুমি আর কিছু বুঝতে পেরেছ?"

—"এখান থেকে প্রায় দু'শো গজ তফাতে একটা জঙ্গলের আবছায়া দেখা যাচ্ছে। পায়ের দাগগুলো ঐদিকেই গিয়েছে। অপরাধীরা নিশ্চয় ঐ জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে আছে।"

কুমার বল্লে, "এখন আমরা কি করব? ঐদিকে যাব?"

গার্ড বললে, "না, এখন আমাদের ফিরতে হবে।"

—"কেন?"

—"আমার উপরে রয়েছে অপরাধী গ্রেপ্তার করার চেয়েও বড় কর্ত্তব্যের ভার। রেল-লাইন ভেঙেছে, এই খবর দেবার জন্যে আমাকে এখন গাড়ী নিয়ে পিছনের ইষ্টিশানে ফিরে যেতে হবে। নইলে কোন ডাউন-ট্রেণ এসে পড়লে বিষম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, আর সেজন্যে দায়ী হব আমিই।"

গার্ডের কথা সত্য। তার উপরে আমরা ঠিক প্রস্তুত হয়েও আসি নি, সঙ্গে যে লোকেরা রয়েছে তারা হয়তো এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঐ অচেনা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ভরসা করবে না। আর এমন রাতে অপরাধীদের খুঁজতে যাওয়াও হবে হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে এলোমেলো ছুটোছুটি করার মত। খুব সম্ভব তাদের খুঁজে পাব না, আর খুঁজে পেলেও ছুন-ছিউ ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করা বড় চারটি-খানিক কথা নয়! হয়তো তারা দলে ভারি আর সশস্ত্র।

বিনয়বাবু বললেন, "ওহে বাপু বিমল! চুপ ক'রে ভাবছ কি? গোঁয়ারতুমি করবার ইচ্ছে হ'চ্ছে বুঝি?"

আমি হেসে বললুম, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! গার্ড-সায়েবের পিছু পিছু আমিও পলায়ন করতে চাই!"

কুমার বললে, "যঃ পলায়তি স জীবতি। সেকালে কোন বুদ্ধিমান বাঙালীও ব'লে গেছেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমরা হচ্ছি পিতৃভক্ত পুত্র, বাপের নাম করবার সুযোগ পাব ব'লেই পৈতৃিক প্রাণটা রক্ষা করা দরকার।"

আমি বললুম, "কিন্তু কুমার, বাঘা বোধহয় পশু ব'লেই পৈতৃক প্রাণের' মর্য্যাদা বোঝে না। ঐ দেখ, সে আবার বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

বাঘা খালি এগুচ্ছে না, উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ চীৎকারও করছে। তার ও-রকম চীৎকারের অর্থ আমরা বুঝি। মানুষের পক্ষে অসাধারণ তার পশু-দৃষ্টি তিমির-যবনিকা ভেদ ক'রে নিশ্চয়ই কোন শত্রু আবিষ্কার করেছে।

বাঘা ফিরতে রাজি নয় দেখে কুমার দৌড়ে গিয়ে তার বগ্‌লোস্ চেপে ধরলে। কিন্তু তবু সে বাগ্ মানতে চাইলে না—বার বার জঙ্গলের দিকে ফিরে ফিরে দেখে আর কুমারের হাত ছাড়াবার জন্যে টানা-হ্যাঁচড়া করে। তার ক্রুদ্ধ চোখদুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মত।

ওদিকে তাকিয়ে আমি কিন্তু খালি দেখলুম, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-বাহু আকাশে আন্দোলিত ক'রে জঙ্গল করছে মর্ম্মর-হাহাকার। তবে এ সন্দেহটা বারংবারই মনের মধ্যে জাগতে লাগল যে, ঐ অন্ধকার-কেল্লার ভিতরে যারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা একটুও অচেতন নয়—ঝোপঝাপের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়ে আছে তাদের হিংস্র চক্ষুগুলো।

গার্ড বললে, "আর দেরি নয়, সবাই ফিরে চল!"

কমল আফ্‌সোস্ ক'রে বললে, "হায় রে হায়, একটা নতুন এ্যাড্‌ভেঞ্চার একেবারেই মাঠে মারা গেল!"

ক্ষাপ্পা হয়ে বিনয়বাবু বললেন, "চুপ, চুপ! একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ!"

হঠাৎ বাঘা জঙ্গলের দিকে চেয়ে একেবারে যেন হন্যে হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কুমার আর তাকে ধ'রে রাখতে পারে না!

গার্ড আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কুকুরটা হঠাৎ এমন করছে কেন?"

তার প্রশ্নের উত্তর এলো জঙ্গলের দিক থেকে। আচম্বিতে অন্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম ক'রে দুইবার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল—চোখের উপরে জ্ব'লেই নিবে গেল দুটো বিদ্যুতের চমক!

যে কৌতূহলী যাত্রীগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল, তারা সভয়ে প্রাণপণে দৌড় মারলে রেলপথের দিকে. আমাদের চারজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল খালি গার্ড ও একজন সাহেব।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, "ঐ ঝোপের আড়ালে চল—ঝোপের আড়ালে চল!"

ঝোপের পাশে গিয়ে গার্ড উত্তেজিত স্বরে বললে, "বাবু, বাবু, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়?"

কুমার বললে, "করতে চায় কি, আক্রমণ করেছে! ঐ দেখ, জঙ্গলের দিক থেকে কতগুলো সাদা কাপড় পরা মূর্ত্তি ছুটে আসছে!"

আমি রিভলভার বার ক'রে বললুম, "দেখছেন বিনয়বাবু, সঙ্গে কেন অস্ত্র আনতে ব'লেছিলুম?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "ভাই বিমল, আমাদের পৈতৃিক প্রাণগুলো এ-যাত্রা শনির দৃষ্টি বুঝি আর এড়াতে পারলে না।"

ক্রমশঃ

কাহিনী

আরবের সত্য-রক্ষা

এস. ওয়াজেদ আলী, বার-য়্যাট-ল

প্রাচীন আরবেরা সত্য রক্ষাকে অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন। সত্য রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব অকাতরে বলি দিতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না। সত্য রক্ষায় তাঁদের এই নিষ্ঠা ছিল বলেই হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের পর তাঁরা পৃথিবীতে এত উচ্চ স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। তাঁদের সত্য রক্ষার একটী গল্প বলি শোন।

আরব দেশে মস্ত বড় এক কবি ছিলেন তাঁর নাম ইমরাল কায়েস। তাঁর গাথা এখনও আরবের ঘরে ঘরে গীত হয়। তিনি উচ্চ রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁর মূল্যবান বর্ম্ম এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সামুয়েল-বিন-আদী নামক এক সর্দ্দারের নিকট গচ্ছিত রেখে যান। ঝিন্দার বাদশা এ বিষয় অবহিত হয়ে সামুয়েলের নিকট থেকে ইমরাল কায়েসের গচ্ছিত মাল চেয়ে পাঠালেন। সামুয়েল উত্তর দিলেন, "এ হচ্ছে গচ্ছিত মাল। ইমরাল কায়েসের যথার্থ উত্তরাধিকারী ছাড়া আর কাউকে এ মাল আমি দিতে পারি না।"

বাদশা কিন্তু পুনরায় দূত পাঠালেন, ঐ সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে। সামুয়েল এবারও সম্পত্তি দিতে অস্বীকার-করে দূতকে বললেন, "তোমার বাদশাকে বলো, আমি কখন বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারব না। প্রতিশ্রুতি পালনে আমি কখনও শৈথিল্য করতে পারব না। আর বিশ্বাস ঘাতকের কোন কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

বাদশা কাল বিলম্ব না ক'রে লোকজন নিয়ে সামুয়েলের দেশ আক্রমণ করলেন। সামুয়েল কেল্লার ফটক বন্ধ করে দিলেন। বাদশা কেল্লা অবরোধ করলেন।

সামুয়েলের এক পুত্র কেল্লার বাইরে ছিলেন। বাদশা তাঁকে বন্দী করলেন। তার-পর কেল্লা প্রদক্ষিণ করে সামুয়েলকে আহ্বান করলেন। সামুয়েল কেল্লার প্রাকারে এসে দাঁড়ালেন। বাদশা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "এই দেখ সামুয়েল! তোমার পুত্র আমার হস্তে বন্দী। যদি তুমি ইমরাল কায়েসের বর্ম্ম এবং অন্যান্য মাল পত্র আমাকে সমর্পণ কর, তাহলে তোমার পুত্রকে মুক্তি দেব, আর অবরোধ উঠিয়ে এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু আমার কথা যদি না রাখ, তাহলে তোমার পুত্রকে তোমার চোখের সম্মুখেই আমি হত্যা করব। এখন তোমার যা ভাল মনে হয় তাই কর।"

সামুয়েল উত্তর দিলেন, "আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারব না। আপনার যা ভাল মনে হয়, আপনি তা করতে পারেন।" বাদশা সামুয়েলের চোখের সামনেই তাঁর পুত্রকে হত্যা করলেন। সামুয়েল এ দৃশ্য দেখলেন—কিন্তু সত্য থেকে বিচলিত হলেন না!

অবরোধ অনেকদিন ধরে চললো, কিন্তু কোন ফল হল না। সামুয়েল আত্মসমর্পণ করলেন না আর ইমরাল কায়েসের সম্পত্তিও বাদশাকে দিতে রাজী হলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বাদশা অবরোধ উঠিয়ে প্রস্থান করলেন। যথা সময় ইমরাল কায়েসের উত্তরাধিকারীরা উপস্থিত হলেন। সামুয়েল সানন্দে তাঁদের হস্তে কবির গচ্ছিত মাল অর্পণ করলেন। সত্যরক্ষার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি তিনি চিরকালের তরে রেখে গেছেন।

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

একখানি ইংরাজী বই পড়ছি—তার পূর্ণ-সভ্য দেশগুলির তালিকার মধ্যে ভারতবর্ষের নাম নেই।

তবে লেখকের সাদা গায়ে এখনো পাৎলা ভদ্রতার চামড়া আছে। অধিকাংশ ইংরেজ-লেখকের মতন ভারতবর্ষকে তিনি বর্ব্বর বলেন নি। কী দয়া!

সভ্যতা বলতে য়ুরোপ কি বোঝে, হিট্‌লার ও মুসোলিনী দিচ্ছেন তার বড় বড় নজির। তাঁরা যত রাজ্য জয় করেছেন তাঁদের রক্ত-পিপাসা বেড়ে যাচ্ছে তত।

তারও আগে—অর্থাৎ উনিশ শতকে নেপোলিয়নও অল্প রক্তপান করেন নি। প্রায় সারা য়ুরোপ তাঁর পায়ের তলায় রাখলে মাথা, কর্সিকার উকীলের ছেলে হ'লেন সার্ব্বভৌম সম্রাট, তবু তিনি তরবারিকে কোমর থেকে খুলে রাখতে পারলেন না।

আরও আগে—অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্বকালে জন্মেছিলেন আলেকজান্দর, যাঁকে ওরা বলেন—'গ্রেট্'। য়ুরোপের, মিশরের ও পারস্যের সাম্রাজ্যও তিনি যথেষ্ট মনে করতে পারলেন না। দিকে দিকে আগুন, রক্ত ও মৃত্যু ছড়াতে ছড়াতে ছুটে এলেন তিনি ভারতবর্ষে। তারপরেও তিনি নূতন নূতন দেশ জয়ের কল্পনা করছিলেন, এমন সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী মহাকালের কাছে তাঁকে করতে হ'ল চরম পরাজয় স্বীকার।

এইবারে 'বর্ব্বর' ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত দেখ।

আলেকজান্দরের সমসাময়িক চন্দ্রগুপ্ত হ'চ্ছেন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। তিনিও প্রথম দেখা দিয়েছিলেন যুদ্ধবীরের বেশে। সমগ্র ভারত জয় ক'রে গ্রীক-দস্যুদের খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি হিন্দুকুশ পাহাড় পার করিয়ে দিয়ে এলেন। হিন্দুকুশের ওপারেও নিজের বিজয়-পতাকা ওড়াবার সাধ্য তাঁর ছিল। কিন্তু সে সাধ তাঁর হ'ল না। যখন দেখলেন তাঁর স্বদেশ স্বাধীন হ'য়েছে, তিনি খুলে ফেললেন রত্নমুকুট, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রক্তাক্ত তরবারি, পরলেন সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র। তারপর প্রয়োপবেশন ক'রে—অর্থাৎ অনাহারে—স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলেন। তখনও তাঁর বয়স পঞ্চাশ হয় নি।

তাঁরই পৌত্র প্রিয়দর্শী অশোক। তিনি সমগ্র ভারতের অধীশ্বর—অর্থবল ও জনবল তাঁর অসাধারণ। তখন তাঁর সমকক্ষ রাজা পৃথিবীর কোথাও ছিল না। ইচ্ছা

করলেই ভারত থেকে বেরিয়ে তিনি বহু দেশ জয় করতে পারতেন। কিন্তু একবারও তাঁর সে লোভ হয় নি। ইতিহাসে তাঁর প্রথম জীবনের একটিমাত্র যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই যুদ্ধ জিতেই রক্তে হ'ল তাঁর বিতৃষ্ণা। তারপর থেকেই তিনি চারিদিকে—এমন কি সুদূর চীন ও রোমেও দূত পাঠাতে লাগলেন অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার করবার জন্যে। কেবল মানুষকেই তিনি ভালোবাসলেন না। তাঁর সাম্রাজ্যে ছোট ছোট পশু, কীট-পতঙ্গ হত্যাও নিষিদ্ধ হ'ল। তিনি নিজেও পরলেন গৈরিক কাপড়।

তারপরেই দেখি সমুদ্রগুপ্তকে। মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লেন, দিগ্বিজয়ে যাবেন। তিন বৎসরের মধ্যে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত জয় ক'রে তিনি প্রতিজ্ঞারক্ষা করলেন। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ তাঁকে ডেকেছেন "ভারতের নেপোলিয়ন" ব'লে। এ উপাধি তাঁর পক্ষে অপমানকর। কারণ শক্তি থাকলেও তিনি কোনদিন ভারতের বাইরে দস্যুতা ও রক্তপাত করতে যান নি এবং আর্য্যাবর্ত্ত স্বাধীন ক'রেই ত্যাগ করেছিলেন অস্ত্রশস্ত্র। অসি ফেলে ধরলেন বীণাবেণু ও লেখনী। সঙ্গীত, কাব্য ও ললিতকলা—এরই মধ্যে ক'রে গেছেন তিনি জীবনযাপন।

আরও কয় শতাব্দী পরে এলেন হর্ষবর্দ্ধন। প্রথমে তিনি হন অপরাজেয় দিগ্বিজয়ী সম্রাট। তারপর তিনি অমর হলেন কবি শ্রীহর্ষ রূপে। রক্তপাতব্রত ত্যাগ করে নিয়মিত ধর্ম্মচর্চ্চা এবং শাস্ত্রালোচনাই হল তাঁর জীবনের পরম আনন্দ।

এইসব হলে 'অসভ্য' ভারতের আদর্শ। 'সুসভ্য' য়ুরোপের সমগ্র ইতিহাসেও এমন আদর্শ একটিও নেই। যোদ্ধা সেখানে চিরদিনই যোদ্ধা। 'রাজর্ষি' সেখানে অশ্রুতপূর্ব্ব কথা।

ভারতের এই আদর্শ থাকুক্ তোমাদের সামনে। ইতি

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পরিচালিকা—দিদিভাই

আমাদের স্নেহের ভাই বোনেরা,

আশ্বিন এলো। সোনালি আলোর সোনার স্বপ্ন রচনা করে সে এসেছে।

মেঘযুক্ত আকাশ নীল—পত্রে পুষ্পে সজীবতা ও আনন্দ, ভাল লাগার আনন্দ-মাস হলো এই আশ্বিন। মহামায়ার শুভাগমন এই আশ্বিনে—তাই বিশ্ব-প্রকৃতি রূপময়ী আনন্দময়ী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই কি ভাল করে মন এ আনন্দে সাড়া দেয়? কোথায় যেন একটু ব্যথা বেদনা, কি যেন হারানোর হুতাশ্বাস সারা জাতির অন্তর ছেয়ে আছে। সে বেদনার বোঝা বহন করেছে তোমাদের কিশোর মন। অন্তরের আভাষ তোমাদের প্রত্যেকের পত্রে সুপ্রকাশিত। প্রার্থনা করি—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কর্ম্ম ও চিন্তা ধারার সঙ্গে তোমাদের আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত হোক।

মণিমালা সেন (ভবানীপুর) ৫৭৭—চিঠি তোমাদের নিশ্চয় পেয়েছি কিনা বলতে পারি না—কারণ গতবার কোনও চিঠির উত্তর দিতে পারিনি সুতরাং নিশ্চয় কি বলবো? এবারের চিঠি পেলাম। ব্যাজ সম্বন্ধে আফিসে ভাল করে কথা বলে জেনে নিও। **দেবীপ্রসাদ বসু চৌধুরী** (ভবানীপুর) ১৬২৫—তোমার দিদির জন্য সেলাইয়ের যা ডিজাইন চেয়েছ—তাতো ভাই আমার দেবার কথা নয়, ওসব ইন্দিরা'দির ভার, স্থানাভাবে তিনি কয়েক মাস আসেননি—আমি তাঁকে বলে দেবো যাতে তোমার দিদির ডিজাইন পান। **তরুণ ঘোষ** (কলিকাতা) ১০৬৬—রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোটদের জন্য বহু গাথা, কবিতা গল্প আছে ভাই। তুমি যেটুকু বুঝতে পারবে তাই পড়ো। বইগুলি ভাল লাগছে জেনে আনন্দ হয়েছে। **উৎপল গুপ্ত**। চিঠিতে ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর নেই কেন? তোমার সুবিধামত তুমি ব্যাজ নিও; অসাধারণ নিয়ম কিছু নেই। তুমি পল্লীগ্রামের ছেলে আর গরীব বলে তোমার কেউ বন্ধু হবে না একথা কিন্তু ভুল। রংমশালের ভাইরা এমন কথা ভাবতেও পারে না ভাই, নিশ্চয় আলাপ করবে সকলে। **মনোরঞ্জন রায়**

(দিল্লী) ১৯১০—কবিতা বা লেখা নির্ব্বাচনের ভার তো আমার উপর নয় ভাই, তাই সে সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলাম না। ঠিকানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। **অসীমা বিশ্বাস** (বক্সার) ১৯৩৯—নতুন গ্রাহিকা হলেই বা বোন, দাবী সকলের সমান। লেখনীবন্ধু পেতে হলে ষ্টাম্প পাঠাতে হয় তাছাড়া যদি ইচ্ছা করো কার সঙ্গে আলাপ করবে নাম জানিও—ভাইএর সঙ্গে ভাই, বোনের সঙ্গে বোন আলাপ করতে পারবে। **মাধুরী গুপ্তা** (আসাম) তোমাদের প্রত্যেকের চিঠিতে আমি রবীন্দ্রনাথের জন্য যে বেদনা দেখেছি তাতে এত দুঃখেও আনন্দ পেয়েছি। সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। **বাসন্তী মুখার্জ্জি** (১৯২৪). তোমায় গেঁয়ো বা অন্য কিছুই ভাবিনি—যে সম্পর্কে জানতে চেয়েছ আমি বলে দেবো। অন্য বোনেরা নিশ্চয় চিঠি লিখবে, বোলো তাদের। দস্যি, ধাংড়ী তো সুন্দর নাম—আমায় কেউ বলে না বলে, আমার ভীষণ দুঃখ হয়—তোমার কিন্তু এতে অনুযোগ থাকা উচিত নয়।

ছবি দেব, পুষ্প ও সন্ধ্যা সিংহ, অশোক দাশগুপ্ত, ভবদেব কর, রেখারাণী দে, দিবাকর সেনরায়, মণীষা ধর, নৃপেন্দ্রনাথ দাস (কবে দিতে হবে জানাবে—ঠিকানা লিখবে ভাল করে) লালমোহন ভট্টাচার্য্য—তোমাদের পৃথক ভাবে উত্তর দেবার কিছু নেই—যা জানতে চেয়েছ ও অনুরোধ করেছ তা সময়ে রক্ষিত হবে।

আমার শুভকামনা ও ভালবাসা সকলে নিও। শুভার্থিনী

দিদিভাই

● বিশেষ বিবৃতি ●

আশ্বিনে যে সকল গ্রাহকগ্রাহিকার ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা ফুরিয়ে যাবে অর্থাৎ যাঁহাদের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত রংমশালের চাঁদা দেওয়া আছে, তাঁরা যেন অবিলম্বে তাঁদের কার্ত্তিক থেকে ষাণ্মাসিক (১৷৷০) বার্ষিক চাঁদা (২৷৷৵০) অনুগ্রহ করে ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে রংমশাল অফিসে পাঠিয়ে দেন। মণি-অর্ডারে টাকা পাঠানই সুবিধা। ৭ই কার্ত্তিকের মধ্যে ও যাঁদের কাছ থেকে চাঁদা আমরা পাবো না, তাঁদের কাছে কার্ত্তিকের রংমশাল আমরা ভি, পি, করে পাঠাব। আশা করি তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে ভি, পি, ফেরৎ না দেন। তাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়।

চলন্তিকা

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসব সেদিন অনুষ্ঠিত হোলো। রবীন্দ্রনাথের শেষ ইচ্ছা প্রতিপালিত হয়েছে, তাঁর অমৃত আত্মা নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করবে! অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় তিনি শিল্পী—ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের গুরু—তাঁরই নব-আদর্শের প্রেরণায় আজ আমাদের শিল্পশাখা মঞ্জুরিত হয়েছে—ভারতীয় সংস্কৃতমনের বিকাশ ঘটেছে। এ পরিচয় হোল বাইরের লোকদের কাছে, আর আমাদের কাছে একটি তাঁর সত্যিকারের পরিচয় আছে—তিনি গল্প লেখেন ও কবিতা রচনা করেন—হয়ত করেন খেয়াল খুশির নিভৃত অবসরে। এমন লেখা যেন কেউ একটা লেখেন নি! ছোটদের জন্য এমন দরদ দিয়ে ভাবা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যেন কেউ ভাবেননি। তাঁর 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্রীর দেশে', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'মারুতির পুঁথি', 'বাদশাহী গল্প', 'চট্‌জলদী কবিতা' ইত্যাদি বাংলা শিশু-সাহিত্যের উজ্জলতম রত্ন সামগ্রী। তাঁর জয়ন্তী-উৎসবে আমাদের শ্রদ্ধানিবিড় সমর্থন আছে—ভালোবাসার জোরে তাঁর আমরা দীর্ঘজীবন চাই। সত্যি, জীবনবিধাতার কাছ থেকে দীর্ঘ জীবন যেন চেয়ে নিতে বারণ। রবীন্দ্রনাথের বেলায় সেটা ফলেছে বেশ। তবু আমাদের জোর—ভক্তি যেমন পূজার জোর—আমাদের প্রার্থনা আজ সার্থক হোক। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। কী অদ্ভুত, কী সুন্দর তাঁর রচনা-নৈপুণ্য—এবারের রংমশাল তাঁর নতুন একটি ধারাবাহিক রচনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। তোমাদের মন রংমশালের আদর্শ রঙ ও আলো সহযোগে তাঁর মোহন্ তুলির স্পর্শে আরো রঞ্জিত হোক্।

*　　*　　*　　*

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরে বহু দেশ বিদেশে, নানা অধিবেশনে নানা সভা সমিতি গঠন হয়ে গেল। কলিকাতা টাউন-হলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে যে স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা'তে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থাকল্পে একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মর মূর্ত্তি, রবীন্দ্রনাথের নামে রাস্তা ঘাট পার্ক রবীন্দ্রনাথের নামে বাংলা সাহিত্যে স্কলারশিপ বা পুরস্কার দান, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধ্যাপনা, বিশ্ব-ভারতীর পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি নানা বিষয় নানা উপায়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির যাতে উপযুক্ত সম্মান ও গৌরব দেওয়া যায় তার জল্পনা কল্পনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এটার চেয়ে ওটা ভাল, ওটার চেয়ে এটা ভাল। অনেকে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার কিছু দরকার নেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে কবিতায় শিল্পে গানে তাঁর বাণীতে চিরদিন মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। এ কথা খুবই সত্যি। তাঁর দান যে আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে ভক্তিচিত্তে গ্রহণ করেছি তার প্রতিদানস্বরূপ চিন্তার ক্ষেত্রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে এমনিই তো, দেশবাসীর অনেক কিছুই করা উচিত। কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষ চায়, ভগবানের যেমন নানারূপ পরিকল্পনা হয়েছে, নানা দেউল মন্দির, মস্‌জিদ, গির্জ্জা নির্ম্মাণ হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জাগরুক রাখবার জন্য, তাঁকে শ্রদ্ধা তাঁর পূজা নিবেদন করতে স্মৃতি-দেউলেরও দরকার

আছে। যেমন করে হউক, যে ভাবেই হউক, বরঞ্চ সকল রকম সম্ভব উপায়েই তাঁর পুণ্য স্মৃতির জন্য আমাদের চিন্তা করবার দিন এসেছে। আর এ বিষয়ে বাংলা দেশেরই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী হওয়া উচিত।

* * * *

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ দিনে দিনে ভীষণতর হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পূর্ব্ব-সীমান্তে লেনিনগ্রাড অঞ্চলে, মধ্যপুরোভাগে ও য়ুক্রেইন অঞ্চলে যে যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্চে ইতিহাসে তার তুলনা দেখা যায় না। মস্কো থেকে সম্প্রতি খবরে প্রকাশ যে, লেনিগ্রাড্ যুদ্ধে জার্ম্মাণদের এত ক্ষতি পূর্ব্বে কখনও হয়নি এবং এমন ভীষণ যুদ্ধও কখন দেখা যায় নি। রুশ সৈন্য চতুর্দ্দিক আট-ঘাট বেঁধে যুদ্ধ করছে। লেনিনগ্রাডের রেল রাস্তায় সাঁজোয়া রেল-গাড়ী পাহারাদারী করছে। রুশ সৈন্য যে অসমসাহসিকতায় নিজের দেশরক্ষায় প্রাণপণ যুদ্ধ করছে তাতে মনে হয় জার্ম্মাণরা আর বেশীদিন টিঁকতে পারবে না। জার্ম্মাণরা চট্‌জল্‌দী বিদ্যুৎবেগে যুদ্ধ করে জয়লাভ করবে ধারণা করেছিল, কিন্তু সেখানেই রুশের কাছে ভীষণ জব্দ হয়েছে।

* * * *

যুদ্ধের দরুন ভারতবর্ষে বিশেষ করে কলকাতায় পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ বা পেট্রোল বরাদ্দের ব্যবস্থা হওয়াতে বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। কল্‌কাতার রাস্তা খাঁ খাঁ করছে, বিশেষ করে চৌরঙ্গীর দুরবস্থা আমরা এমন আর দেখিনি। লোকের বেড়াবার সখ তো দূরে থাক কাজে কর্ম্মে মোটর গাড়ী চালান তুলে দিতে হচ্চে। বাসে ট্রামে লোকের ভীড় বেড়েছে, বাসের সংখ্যা তো কমেই গিয়েছে। একটা দোতলা বাস শ্যামবাজার—কালীঘাট তো দু'বার চালালেই তার পেট্রোল বরাদ্দ খতম্। অনেকদিন আগেকার কল্‌কাতা যেন ফিরে এসেছে—ফিটন্ গাড়ী, পাল্কি গাড়ীর বহর বেড়েছে, গরুর গাড়িকে পুলিশ আর থামায় না, তারাই লরীর বদলে মাল সরবরাহ করছে। বাবুরা একটু হাঁটাহাঁটি করে তাঁদের স্বাস্থ্যের দিকে মন দিচ্ছেন। রাস্তায় মোটর নেই, মোটর চাপা ও ধাক্কাধাক্কির দুর্ঘটনা থাকবে কি করে। বড় রাস্তা পার হতে বেশী নজরের দরকার নেই।

* * * *

লণ্ডনের একটি খবরে প্রকাশ যে, সেখানকার পৃথিবী বিখ্যাত ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে স্যার উইলিয়ম রদেনষ্টাইন ও স্যার মায়রহেড বোন্ এর আঁকা দুখানি রবীন্দ্র-নাথের ছবি শীঘ্রই টাঙানো হবে; রদেনষ্টাইন পৃথিবীর নাম করা শিল্পী, তাঁর আঁকা রবীন্দ্র-নাথের ছবি ন্যাশ্যানাল আর্ট গ্যালারীর গৌরব বৃদ্ধি করবে। রদেনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যে মধুর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আর আজ এঁদের একজন আছেন আর একজন নেই। বন্ধুত্বের স্মৃতি স্বরূপ রদেনষ্টাইনের বিশ্ববরেণ্য কবির ছবি আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শিত মহাপুরুষদের ছবির মধ্যে বিশেষ শোভা পাবে। বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ্জ বার্নার্ড শ' তিনিই প্রথমে এই বিষয় প্রস্তাব করেছিলেন।

আমাদের লাইব্রেরী

বুড়ো আংলা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এম্ সি সরকার সন্‌স্, কলিকাতা।

অবনীন্দ্রনাথের বইয়ের কোন পরিচয় দেবার দরকার করে না। এ বইখানি নতুন নয়, কিন্তু পুরাতন হলেও যেন চির নতুন। আজ যারা বুড়ো তারা যখন ছোট ছিল এ'বই এক নিঃশ্বাসে পড়েছে, আর আজও আবার তারা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেন। বুড়ো আংলা বুড়ো হলেও কবিদের নিয়ে তার ঘর সংসার, আর এমন মজার জিনিষ নিয়ে তার কারবার যে কালের গতিতে বয়সের বাহাত্তর তলাতেও সে সবুজ থাকে, কখনও তার মধ্যে মরচে পড়ে না। নিজের হাতে আঁকা মলাটের ছবিটি অদ্ভুত সুন্দর। ভিতরের ছবিগুলি বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা। বলা বাহুল্য এ'বই যারা আজও কেনেন নি তারা সকলেই কিনে পড়বেন।

অথই জলে শিশুর মেলা—রাখাল তালুকদার। দি বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

অথই জলে শিশুর মেলা—Charles Kingsley'র Water Babies-এর সহজ সুন্দর অনুবাদ। আমরা অনেক কাল থেকেই চাইছিলুম যদি কেউ এই বিখ্যাত বইটির অনুবাদ করেন, তা'হলে বাংলার শিশু ও কিশোর-কিশোরীর দল একটি নতুন অদ্ভুত জিনিষের আস্বাদ পেতে পারে। রাখালবাবু এই অনুবাদটি করে বাংলার শিশু সাহিত্য তথা অনুবাদ-সাহিত্যের একটা বড় রকম অভাব পূর্ণ করেছেন। তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এম্নি তো আমাদের দেশে ভাল ভাল বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ খুব কমই দেখা যায়। এ অনুবাদটির বিশেষ গুণ হচ্ছে বইটি পড়ে মনে হয় না যে এটি ইংরাজীর একটা অনুবাদ মাত্র। বইটি পড়ে আমাদের খুব ভাল লাগল। শৈল বাবুর আঁকা ছবিগুলি যেন লেখা ও গল্পের সঙ্গে খুব মিল খেয়ে গিয়েছে। ছাপা বাঁধাই ছবিতে ঝকঝকে এই বইখানি ছেলেমেয়েদের পূজোর বাজারের খুব উপযুক্ত হয়েছে।

কল্পনা—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃতি পরিষদ, কলিকাতা। দাম সাত আনা।

রাজকন্যা কল্পনাকে ঘিরে যে ভাবরাজ্যটি গড়ে উঠেছে কল্পনার সোনার কাঠিতে ফুটে উঠেছে বাংলা দেশের সোনার ছবি। ছোট অলোক এলো নায়ক হয়ে—কল্পনা ও অলোকের কাহিনীর মধ্যে ফুটিয়া বাংলা দেশের ভাবরাজ্যে সোনার ছেলে মেয়েদের কাহিনী। বইটি ছোট্ট হলেও ভাবটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে, রূপকথার বর্ণে লেখাটিও ভালো। বইটিতে ছবিও আছে অনেকগুলি।

ছেলেধরা সার্কাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়। দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের একটি নতুন ধরণের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই। বাড়ী থেকে পালিয়ে তিনটি ছেলেমেয়ে মালগাড়ীতে কেমন করে দেশ বিদেশে চালান হল, তারপর সার্কাসে তারা ভর্ত্তি হয়ে কত নতুন খেলা শিখল, কত নতুন খেলার সাথী করল, কত জায়গায়

তারা হারিয়ে গেল, শেষে সার্কাসেই বাপমায়ের সঙ্গে তাদের পুনর্মিলন—সবটাই আগাগোড়া ছেলেমেয়েরা ঠিক যা চায়, ছেলেমেয়েরা যে জিনিষ সব সময়ে ভালবাসে তারই একটি আন্তরিক কাহিনী। বইটি পড়তে সুরু করলে না শেষ করে থাকা যায় না। ছবিতে ছাপাই ও বাঁধাইতে বইটির সাজসাজ্জও বেশ সুন্দর।

গেষ্টাপো—শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরণজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৫৬বি, নিয়োগী পুকুর লেন হইতে। দাম ৷৷০ আনা।

শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত হাসির কবিতার বই 'গেষ্টাপো' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গেষ্টাপো হোল জার্ম্মাণ গোয়েন্দা পুলিশ; চোখের আড়ালে তারা থাকে গা-ঢাকা দিয়ে সবাইকার সাথে। তবু হঠাৎ এদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে বসলে চোরের ওপর বাটপাড়ির উপক্রম হয়, তখন যেন—

'লাফিয়ে উঠে গোমেশ শুধায় "হু ইউ হেল, লেট মি গো,"
মুচকি হেসে চিত্ত বলে "আই য়্যাম দি গেষ্টাপো"।'

প্রথমকার কবিতার এই হোল শেষছত্র, এমনি বিশেবত্বের মাঝ দিয়েই বইখানা আনবিল হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত, রামধনুর সাতরঙা আলোয় প্রদীপ্ত। বইটিতে এগারটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে। রংমশালে প্রকাশিত হ'য়েছে বিভিন্ন মাসে তার ভিতর গোটা তিনেক। শৈলেনবাবু সহজ হাসির কবিতায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। আমরা বইখানা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, হেসেছি এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ করছি কবিরই ভাষায় ব'লে—

'তাইতো দেখো অরসিকের রহস্যের এই চেষ্টা,
একটি মুখেও ফুটলে হাসি, সফল হবে ক্লেশটা।'

ভরসা দিচ্ছি আমাদের দিক থেকে তিনি সাফল্য অর্জ্জন করেছেন—এমনি করবেন যাঁরা পড়বেন। ছাপা ও বাঁধাই ভালো। রচয়িতার চিত্রণেরও পরিচয় পেলাম। ছবিগুলি সত্যিই মনোরম।

আকাশ গঙ্গা—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত; প্রকাশক, দেব-সাহিত্য কুটীর, মূল্য বার আনা।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের ভ্রমণ-কাহিনী লইয়া বইখানি লিখিত। তীর্থস্থান বলতে লেখক কিন্তু কাশী-বৃন্দাবনই ধরেন নাই, তাঁর মতে যুগাবতার মহাপুরুষেরা, দেশ-প্রাণ বীরেরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র সেগুলিও তীর্থ এবং মহাতীর্থ। এইজন্য শান্তিনিকেতন বা পলাশী যশোর প্রভৃতি স্থানও তাঁর ভ্রমণ কথায় স্থান পেয়েছে।

ননীবাবু শিশু-সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক। বইখানির পৌরাণিক এবং ভৌগলিক তত্ত্বকথাগুলি তাঁর সরস রচনাভঙ্গীতে বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ভ্রমণ কথাগুলি গল্পের আকারে লিখিত, কাজেই বিবরণগুলি নীরস তত্ত্ব-আলোচনা বলে মনে হয় না। বইখানির ছবি এঁকেছেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী প্রতুলবাবু, তার উপর অনেকগুলি ফটোও দেওয়া হয়েছে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই বেশ সুন্দর—এর আকার দেখে মনে হয় বইখানির দাম কমই ধরা হয়েছে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

———

নূতন প্রতিযোগিতা

এবার পূজার রংমশালে নূতন প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ—

—পূজার ছুটি—

পূজার ছুটিতে এবার তোমরা কে কোথায় কেমন ভাবে দিনগুলি কাটালে তার ছোট্ট সুন্দর একটি বর্ণনা নিজের ভাষায় গদ্যে বা পদ্যে লিখে আমাদের কাছে প্রতিযোগিতা বিভাগে রংমশাল অফিসে ৭ই কার্ত্তিকের মধ্যে পাঠাবে। দু'টি পুরস্কার থাকবে।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে)

উপরের ছবিতে ছেলেগুলি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করছে—তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। এখন্ বলো তো কে (নম্বর দিয়ে) কি করছে?

২৫শে আশ্বিনের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

● গত মাসের ধাঁধার উত্তর ●

১, চন্দ্র। ২, পক্ষ। ৩, নেত্র। ৪, বেদ। ৫, বাণ। ৬, ঋতু। ৭, সমুদ্র। ৮, বসু। ৯, গ্রহ। ১০, দিক।

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছেঃ—

চিন্ময়ী রায়, কুষ্টিয়া; মণিমালা দেবী, ভবানীপুর; শান্তি, পিকু, ইরা, গণেশ, জেমস্, ননীমামা, গয়া, গয়া; মায়া ও খুকু, পাটনা; রণজিৎ ঘোষ, কাশীপুর; ...ধন সরকার, চিলকিগড়; সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও তুষারকণা দেবী, বড়বেলুন; অসীমদেব গোস্বামী, ভবানীপুর; কালু, মিনু, ফেলু, সবিতা, বুড়ী, নীলু, সুকুমার, সুনীল সান্যাল, কলিকাতা; প্রণবেন্দু, নির্ম্মলেন্দু, আরতি, মীনা ও বেণু, ঝুমরি

তিলাইয়া ; অপূর্ব্বলাল মজুমদার, বাগেরহাট ; অমিয়কান্তি ঘোষ, শাকচি ; অরুণ, গোরী, রমা, মায়া ও রুবী সরকার, বিকানীর ; পিন্টুরাণী, মিন্টুরাণী ও সুরথকুমার বসু, রংপুর ; হীরক ও মীরা সান্যাল, রাজশাহী ; যামিনীকান্ত স্মৃতি সমিতি, শ্রীপুর বনগ্রাম ; বরুণ ও বিনায়ক রায়, জঙ্গীপুর ; কৃষ্ণা বসু, বালিগঞ্জ ; সুপ্রভা নাহার, কলিকাতা ; শ্যামসুন্দর মাইতি, কোলাঘাট ; কমলেন্দু ঘোষ, পাটনা ; শৈলেন্দ্রকুমার দে, গৌহাটি , অরুণকিরণ শীল, বালিগঞ্জ ; অমিয়া, প্রতিমা, লক্ষ্মী, নীলিমা, স্নেহলতা, যূথিকা ও কল্যাণী, পুরুলিয়া ; বিশ্বনাথ দাস ভাটপাড়া ; সব্যসাচী, নিবেদিতা ও ইন্দ্রলীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা , বিমল, বিজয়, মহামায়া, অভয়া ও দীপ্তি, মেদিনীপুর ; চিরঞ্জীব, সঞ্জীব ও কুসুম সেন, পাটনা ; আত্রেয়ী ও দীপক রায়চৌধুরী, কলিকাতা ; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার, শালিখা ; কেশবলাল আটা, শালিখা ; সুজিত রায়, নৈহাটি ; সুধীরকুমার সরকার, রাজবাড়ী ; বেলারাণী গাঙ্গুলী, হবিগঞ্জ ; রজতকুমার মৈত্র, বহরমপুর ; শেখর গাঙ্গুলী, পুরুলিয়া ; শিশির অমিয়, অরুণ, মীরা ও বাবু, কলিকাতা ; শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, ফয়জাবাদ ; বটকৃষ্ণ মিত্র, হাওড়া ; বি, এ, ক্লাব, বানীতলা, উলুবেড়িয়া ; শঙ্কর লাহিড়ী, শ্রীরামপুর ; শামশের, বিশ্বনাথ ও দুলাল, মণ্ডলগাঁথ ; সোমেশ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ; সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটি ; যশোধন ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুর ; নমিতা ও শ্যামলেন্দু মিত্র, দিল্লী ; সাধনা ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ ; শিবদাস বসু, কলিকাতা ; রেখা, শীলা, সতু ও কনক সিংহ, কলিকাতা ; নৃপেন্দ্র দাস, জামশেদপুর ; উষা ও সবিতৃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা ; বিজন, লীলা, কল্পনা, স্বপন ও তরুণ চক্রবর্ত্তী, নওগাঁ ; অরুণ, রাণী ও ঈশানী রায়, রাজমহল ; জ্যোতির্ম্ময় ও মঞ্জুরাণী মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর ; সুবীর ভট্টাচার্য্য, শিলং ; নারায়ণ ও জ্যোৎস্না রায়, ডিব্রুগড় ; সুনীল চ্যাটার্জ্জি, কলিকাতা ; সুন্দরেশ্বর রায়, জামশেদপুর ; অজিত দাস, চিলকিগড় ; আবুল ফজল, শিলচর ; যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য, ভবানীপুর ; অশোক, অজয়, অরুণ, নূপুর দাশগুপ্ত, কলিকাতা ; রেণু চক্রবর্ত্তী, নওগাঁ ; দুর্গারাণী দত্ত, ডাল্টনগঞ্জ ; নিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান ; সবুজ পাঠাগার, শাকচি ; সিটি ক্লাবের সভ্যবৃন্দ, দিল্লী ; উৎপল গুপ্ত, যশোলং ; গিরীন্দ্র রায়, নৈহাটি ; জয়ন্তকুমার দাশ, কলিকাতা ; যূথিকা, নমিতা, জীমূত, শান্তি, হীরা, জহর, সুভাষ ও গোপাল, গিরিডি ; অশোক মিত্র, দিল্লী ; বাসন্তী, শরৎশ্রী, যুঁই, বানী ও কল্যানী, মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ বারাসাত ; অমরনাথ, মণ্ট , মিনু, মা ও বাবা, বাহিরগাছি ; নীলিমা, নমিতা, ও অমল, সিমলা ; যূথিকা সিংহ, জুহই ; অরুণা, গোরা, মাষ্টার মশাই, মা, ছোড়দা ও নিতু, বরপেটা ; পারুল, উমা ও অসীম, লাহোর ; নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পাটনা ; নারায়ণ সেন, কলিকাতা ; অরুণ ও অমিত, ভবানীপুর ; মনোরঞ্জন রায়, দিল্লী ; সুবীর সেন, শান্তিনিকেতন ; কবিতা ও প্রদীপ পালিত, পাটনা ; গোপেশ্বর লহরি, শান্তিপুর ; মনীন্দ্রনাথ ও জ্যোতি কুণ্ডু, সিরাজগঞ্জ ; জয়ন্ত, স্বপ্না ও রত্না রায়, পাটনা ; সুনীল ঘোষ, দিল্লী ; রবীন্দ্র ও রমেশ বসু, ঝাঁসী ; দেবীপ্রসাদ বসুচৌধুরী, ভবানীপুর ; শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, চাইবাসা ; বয়েজ লাইব্রেরী, নওপাড়া ; দুর্গা, শান্তি, চিত্ত, প্রীতি, ভক্তি ও অসীম, লোকনাথপুর ; লালমোহন ভট্টাচার্য্য, কালীঘাট ; মলয় দাস, বেনারস।

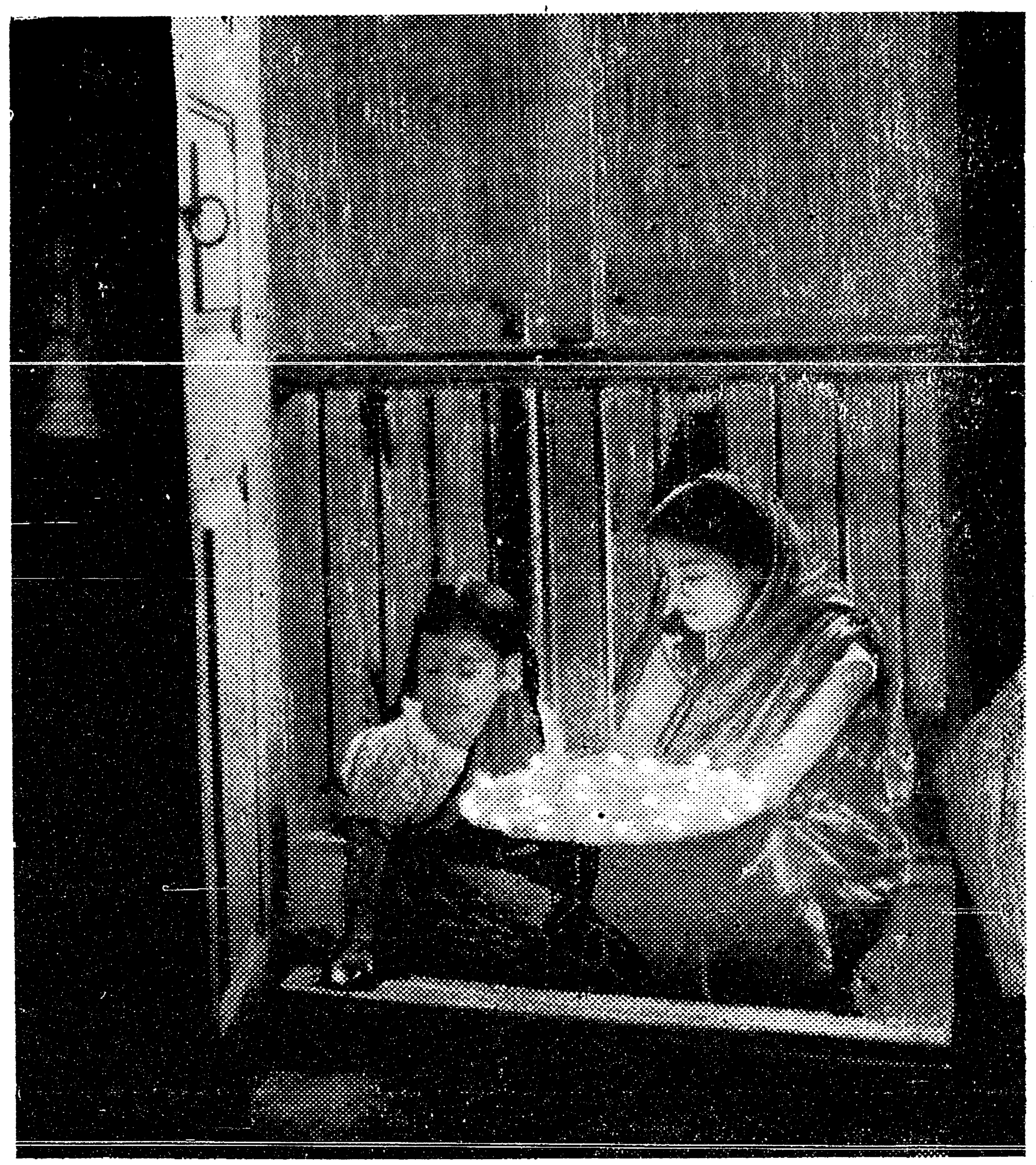

দীপালী

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৪৮

দীপালী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

শরৎ মেঘের শাদা পালের নৌকো ছোটে পরীর দেশে
সন্ধ্যেবেলার আড়ালে ঐ অথৈ ঢেউয়ে কোথায় মেশে!
দেশের বুকের অন্ধকারে
দীপ জেলেছি সারে সারে,
কোন্ গ্রহে কে কোথায় আছো, এই যে আছি, আমরা আছি!
আগে চলার দারুণ পথের গাঁথছি আলোর মালাগাছি!
জোনাকীরা আসছে সাথে,
হাউই হেসে যায় হাওয়াতে,
কার চোকের আজ অবশ পাতা আলসেরি কালো মেখে,
চলছি রাতের সব সাথীদের ঘুম ভাঙানো চিঠি রেখে!

মহাবীরের পুঁথি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরের দিনে ফলার করে চাঁইবুড়ো কথকতা সুরু করলেন ঃ—

বসিলেন মহাবীর বহু বানর বেষ্টিত
কহিলেন শুন কথা হয়ে এক চিত
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কাতে প্রবেশ
অশোক বনে পাইলাম সীতার উদ্দেশ !
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতা দেবী কান্দে
হৃদে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বান্ধে !

তারপরে মনের খেদে কেঁদে কেঁদে বলেন ঃ—শুন বাপু হনুমান—শ্রীরাম না আইলে যাইবে মম প্রাণ।

নানাবিধ দুঃখ দেয় দুরন্ত রাবণ
চেড়ীর প্রহারে বুঝি হইবে মরণ,
শুন বাছা কহি এই সারোদ্ধার,
বিনা যুদ্ধে মম নাহিক নিস্তার।
লক্ষ্মণে জানাইও দুঃখ বিবরণ
সমুদ্র পারে হ'ল সীতার মরণ !

মা জানকীর কথায় আমি জবাব করলেম—

তোমার লাগিয়া প্রভু আছেন কাতর,
সে লাগি আমারে পাঠালো সত্বর।
এসো মাতা মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ,
তোমা লয়ে যাই যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ—

মা জানকী তখন বললেন—তোমার তো বাছা এই বিঘত প্রমাণ দেহ আমার ভার কেমন করে লইবে ?

দশমাস রামের শোকে আছি উপবাস
মোর সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস।

আমি তখন নিজ মূর্ত্তি ধরলেম—যোজন দশ আড়ে পরিসর সত্তরি যোজন খাড়াই দীর্ঘতর। দীঘল ল্যাজ যোজন পঞ্চাশ নল বাঁশ ঠেলে উঠিল আকাশ। ব্যস্ সেখান থেকে আমিও দেখিনা সীতাকে, সীতাও দেখেন না আমাকে।

দর্পণ হেন করি নজর দুস্পার সাগর,
লঙ্কাপুরী দেখি যেন পুত্তিকা সহর।

তখন পিতা এসে আমার কাণে কাণে বল্লেন—

সত্বর সত্বর বাছা সীতা পেলে ত্রাস
সকল রামের কার্য্যে হইবে নৈরাশ।

সাত পাঁচ ভেবে তখন আবার কলেবর ছোট করলেম—ছিলেম যে হনু ফিরে তা হনু ! তখন মা জানকী বল্লেন—

দুইমাস রাবণ দিয়েছে প্রাণদান,
তারপর কাটিয়া কারবে খানখান।

আমাকে কেটে মানুষের কোপ্তা করবার আগে ভর্ত্তা রামচন্দ্রকে যদি আনতে পারো, তবেই এ যাত্রা রক্ষা হয় নচেৎ জেনো আমার জীবন সংশয়।

—এই বলে মাথার সিঁথি খসিয়ে আমার গলায় বেঁধে দিয়ে বল্লেন—যাও বাছা আমি একটু কাঁদি ! সীতা রোদন করতে বসলেন, আমি অশোকবন ছেড়ে বার হলেম। তখন মনে হল—আচম্বিতে আইলাম যাব আচম্বিতে, এতো হয় না, রাক্ষসকটাকে কিছু চমৎকার দেখিয়ে যাওয়া তো চাই !—

জন্মাবো সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী আজ করিব বিনাশ।

এই না ভেবে রাবণের মধুবনের দিকে অগ্রসর—একে তো মধুবন তাহাতে বানর, ডাল ভাঙি পাতা ছিড়ি পেড়ে খাই ফল।

ডাল ভাঙে মোটা শব্দ মড়মড়ি,
আতঙ্কে রাক্ষসগণ উঠে নড়বড়ি।
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়,
অমন যে মধুবন কিছু নাহি তায় !

'কেটারে বানর, কুথাকার বানর'—বলে মুড়োনো মাথা মুড়ো রাক্ষস 'মার মার ধর ধর' করে ছুটে আসতেই আখাম্বা এক আমগাছ উপড়ে একঘায়ে মুড়োকে সাবাড়। তারপর

—ঝুড়ি ঝুড়ি ফল পড়ে কুড়ি কুড়ি মাথা। এই হচ্ছে কাণ্ড এমন সময় কোথা ছিল রাবণের বেটা ইন্দ্রজিত হটাৎ আসি বাগানে উপস্থিত।

রণেতে পণ্ডিত সেটা জানে নানা ফন্দি
ইন্দ্রজাল ফাঁসে মোরে করে বন্দী।

রাক্ষসদের কাঁধে সওয়ার হয়ে তো হাজির হলেম রাবণের আগে—

বসিয়াছে রাবণ আপন কোঠায়
চারিভিতে রাক্ষস বেড়িয়াছে তায়।

রাবণ শুধোলে—কে তুই বানর?—

"আমি রামচন্দ্রের দূত,
ভাঙিলাম তোমার মধুবন অদ্ভুত
বন্ধন মানিনু তোরে দেখিবারে—
নচেৎ রামদাসে কে বাঁধিতে পারে?"

'তবে রে বানর!' বলে রাবণ আজ্ঞা দিলে—দে বানরটার ল্যাজ পুড়িয়ে।

ল্যাজ পোড়াইয়া ছাড় রামদাসে,
ল্যাজ পোড়া দেখে যেন জাত কুটুম হাসে!

তখন আমি পঞ্চাশ যোজন ল্যাজ বাড়িয়ে বল্লাম—কত পোড়াবি পোড়া, দেখি তোর দর্প! ল্যাজের বহর দেখে বালি রাজার ল্যাজের কসন মনে পড়ে রাবণ যত কাঁপে তত চেঁচায়—

ওরে ধর ধর চেপে ধর ল্যাজে ধর,
দড়াদড়ি বেঁধে ধর এ যে দেখি বালির সহচর!

বলতেই তিন লক্ষ রাক্ষস মিলে বড় বড় দড়ি দিয়া আমারে তারা বান্ধে, সহর ফিরাতে চলে করি আমায় কান্ধে।

তখন—ল্যাজ চেপে ধরে জড়ায় তেল কালি, একবেড় দিতে লাগে বস্ত্র একখানি!

তিরিশ মোট কাপড়ে কুলোলোনা—যার গায়ে ছিল যতেক কাপড় ঘৃত তৈল দিয়া করিল জাবড়! ল্যাজের ডগা ভুঁয়ে পড়লো যেন মোটা মশাল—কাপড়ের আড়ত খালি সহরের সবাই উলঙ্গ! কাণ্ড দেখে হেসে বাঁচিনে।

জাম্বুবান বলে উঠলেন—তারপর?

তারপর ভাই সবাই মিলে ধরিয়ে দিলে ল্যাজের ডগায় আগুন ওই—যেমন আগুন পাওয়া অমনি বয়েছে জোরে হাওয়া, দড়পুড়ে আমিও খালাস পাওয়া।

শেখেতে বিদ্যুৎ যেন ল্যাজে অগ্নি জ্বলে
চালে চালে লম্ফ দিই বড় বড় ঘরে।
জ্বলে সহরের চাল যেন রাবণের চুলো,
চুল পোড়ে মন্দোদরীর সুর্পনখীর কুলো
হাঁড়ি মাথায় রাবণ রাজা পুকুরে দেয় ডুব,
মশাল নিভাতে আমার পুড়ে গেল মুখ।
কপি পোড়া হতে হতে রয়ে গেছি ভাই,
লঙ্কার বাজারে চাল একটী আর নাই।

এই বলে হনু চুপ করতেই মর্কটের দল মুখপুড়া বলে খিলখিল হেসে উঠলো। তখন বীর হনুমান আক্ষেপ করে বল্লেন—হে রাম, রাখতে জাতের মান সাগর ডিঙালাম, হাতে করে প্রাণ ভয় না রাখলাম, এতটুক মুখ পোড়ালাম রাখতে যাদের মুখ—তারাই বলছে—মুখপোড়া এই বড় দুখ।

—ওহে ভাই তোমার বীরত্বকে ধন্য!—বলে জাম্বুবান হনুমানকে আলিঙ্গন করতে, অঙ্গদের ভগ্নিপতি প্রবঙ্গ দেশী বিনদ বানর বিঘৎ প্রমাণ অঙ্গ নধর কলেবর বল্লেন—ভাই রাবণের কটা মাথা দেখলে?—কেন দশটা মাথা বিশটা হাত।

—বলতো দাদা কখানা পা? হনুমান দুটো আঙুল দেখিয়ে ঘুরে বসলেন।—হিসাবে তো মেলে না দাদা, আচ্ছা বলতো কপাটি দাঁত?—বত্রিশ পাটি—বলে হনুমান ভেঙচে সভাংত্যাগ।

সবাই স্তব্ধ। শত যোযন সাগরের সুগম্ভীর শব্দ শুনতে শুনতে জম্বীর গাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়লো বিঘৎ বানরের দল।

এই বলে চাঁইবুড়ো সেদিনের মত কথা বন্ধ করলেন।

ক্রমশ:

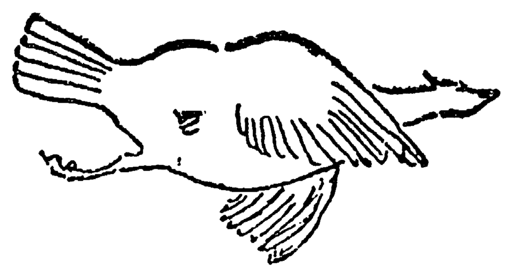

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

তোমরা কেউ মেয়ে, কেউ ছেলে। তোমাদের কচি কচি মিষ্টি মুখগুলি সর্ব্বদাই আমি কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করি। তাই এবারে তোমাদের অনেকের কাছ থেকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ পেয়ে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে। সকলকে আলাদা আলাদা চিঠি লেখা সম্ভবপর নয়। অতএব 'রঙমশালে'র বৈঠকে ব'সেই জানাচ্ছি—তোমরাও আমার আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসা গ্রহণ কর।

* * * *

তোমরা অনেকেই পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে গিয়েছ। আবার অনেকেই হয়ত যেতে পারো নি নানা কারণে। বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েও যেতে না পেরে যাদের মনে দুঃখ হয়েছে এই গল্পটি তাদের মন্দ লাগবে না।

চার্ল্‌স্ ফ্রোম্যান হচ্ছেন আমেরিকার একজন নামজাদা কর্ম্মী। সহরের কাজের ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে যখন তাঁর শ্রান্তি আসে, অথচ সহুরে ইট-কাঠ ধুলো-ধোঁয়া ছেড়ে বেড়াতে বেরুবার ফাঁক পান না, তখন তিনি মনকে শান্ত করেন এক চমৎকার উপায়ে।

ফ্রোম্যানের এক বন্ধু একদিন তাঁর আপিসে গিয়ে এই দৃশ্য দেখলেন!......আপিসের বাইরের ঘরে দলে দলে লোক ফ্রোম্যানের জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ফ্রোম্যান তখন তাঁর নিজের ঘরে ব'সে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে আইশ-ক্রিম খেতে খেতে একমনে পড়ছেন 'রেলওয়ে গাইড'!

বন্ধু সুধোলেন, "কি হে, ব্যাপার কি?"

ফ্রোম্যান্ বললেন, "চুপ, চুপ! শোনো। আমি এখন কর্ণওয়ালের সাগর-তীরে ভ্রমণ করছি! আমার মুখের ওপরে এসে লাগছে ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়ার ঝাপ্‌টা! চোখের সামনে দেখছি পাহাড়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফেণায় সাদা সমুদ্দুরের ঢেউয়ের পরে ঢেউ!........ এইবারে সহরে ফেরবার ট্রেণ এল.........গাড়ী সহরে ফিরে এল!"

কাল্পনিক দেশভ্রমণ করবার পর ফ্রোম্যান সাহেবের সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আপিসের কাজে মনকে নিযুক্ত করতে পারেন।

তোমরা বোধহয় দেশ বেড়াবার এই উপায়ের কথা শুনে সকৌতুকে হাসাহাসি করছ? কিন্তু এটা হাসির কথা নয়। মন বড় আশ্চর্য্য জিনিষ। সে যাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে না, বাস্তব হ'লেও তা মিথ্যা হয়ে যায়। আবার, সে যাকে মিথ্যা মনে করে না, কাল্পনিক হ'লেও তা সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

ম্যাজিকের কথা ধর। চোখ সবিস্ময়ে দেখলে, পাঁচ মিনিটে বীজ থেকে গজিয়ে উঠল আমগাছ, তাতে ধরল ফল। কিন্তু মন বললে, না, ও হ'চ্ছে ফাঁকি। মন মানলে না ব'লে স্বচক্ষে যা দেখলুম, তাও হয়ে দাঁড়াল ম্যাজিক—অর্থাৎ অসত্য।

মন সর্ব্বদাই বেড়িয়ে বেড়ায়। কখনো ভাব হ'তে ভাবান্তরে, কখনো দেশ হ'তে দেশান্তরে। আমাদের ভাষায় তাই বলে 'মনোরথ'—কি না মনের রথ। সত্য সত্যই এই মনোরথে আরোহণ ক'রে সহরে ঘরের কোণে ব'সেই তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল যেখানে খুসি যাত্রা করতে পারো—এক আধ্‌লা ভাড়া লাগবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই অদ্ভুত মনোরথের কাছে উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, মেল-ট্রেণের গতিও নগণ্য। মহাকবি মধুসূদন বলেছেন —"মনোরথ গতি।" তার মানে হচ্ছে, "যথেচ্ছগমনশক্তি।"

তবে মনোরথ চালাতে শেখা চাই। কিছুদিন অভ্যাস না করলে মনোরথ চালানো সহজ নয়। কিন্তু একবার অভ্যস্ত হ'লেই দেখবে বিশ্বজগৎ তোমার নখদর্পণে। তখন বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকলেও ব্যর্থ হবে না তোমার পুজোর ছুটি। ইতি

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শুভেচ্ছা

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ

যাঁর করুণায় পোহায় রাতি, দিনের আলোক হাসে,
বর্ষা শেষে বিমল জলে শরৎ-কমল ভাসে ;
স্নেহের শিশু মায়ের কোলে,
প্রাণ জুড়ায়ে দোতুল দোল,
ঝাঁপিয়ে চোখে শান্তি দিতে ঘুমের মাতন আসে।

গান গেয়ে যায় ভোরের পাখী সুরের লহর তুলে,
পরাণ ওঠে ঘুম ভেঙে, সেই সুর-সোহাগে তুলে ;
জাগিয়ে দিতে নূতন হরষ,
আবার আসে নূতন বরষ,
ঢেউ ব'য়ে যায় তরুণ আশার তরুণ বুকের কূলে।

যাঁর করুণায় উজল রবি নিখিল সজীব রাখে,
পৌর্ণমাসীর রাত্রি অমল চাঁদের কিরণ মাখে ;
ফুলের গন্ধ পাগল করা,
ফলের বিকাস সুরসভরা,
তুচ্ছ কয়লা মাঝেও হীরা স্বচ্ছ লুকান্ থাকে।

ক্ষুদ্র-গাভেও যাঁর করুণায় ছোটে মহান্-বান,
সেই আশিসে পরম পিতার সর্ব্বশক্তিমান্ ;
রংমশালের রঙীন আলো,
সবার চেয়ে লাগিয়ে ভালো,
উঠুক জ্ব'লে উজল ছটায় রাঙিয়ে সবুজ-প্রাণ।

মানুষের শত্রু

শ্রীশামুক

১৮ই জুলাই, ১৯৪১ শুক্রবার ঃ— আনন্দবাজার পত্রিকা

রাশিয়ার চারিটি প্রধান রণাঙ্গণে জার্ম্মাণদের অগ্রগতির সংবাদ

পসকোভ, পলেটস্ক ও স্মলেনস্ক এর দিকে প্রবল যুদ্ধ

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃক গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখলের দাবী

——:*:——

১৬ই জুলাই, বুধবার ঃ—

ভোরের সবুজ আলো এল, ঝড়কে সঙ্গে নিয়ে। মাঝ রাত্রে ঝড় হয়েছে সুরু, থামলো না।

পশ্চিম রাশিয়ায় ছোট গ্রাম কোমি, আলমা নদীর দুপাশে। ছড়িয়ে পড়া ভালদাই পাহাড়ের একটা টুকরো অংশ, গেরুয়া রংএর পাথর সাজানো ছোট্ট পাহাড়, গ্রামের সীমানায়। মাথার উপরে ছোট্ট সাদা বাড়ী। পুব দিকে যাও বড় সহর স্মলেনস্ক। আরো দূরে মস্কো। মস্কো কে না চেনে ?

ভোরের সবুজ আলো ঝড়কে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের গা' বেয়ে উপরে উঠে এল। জানালার কাঁচে ঠোকা মারলো, চিড় চিড় ঝন্ ঝন্। আলো ঘরে ভিতর ঢুকে পড়ে।

আইভান ঘুমন্ত রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে বসে হাতের উপর মাথা রেখে ঝিমোচ্ছিল, চমকে জেগে উঠে। আইভানের গায়ে সশস্ত্র সৈনিকের পোষাক। আস্তে উঠে পা' টিপে টিপে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে পায়—রূপালী সরু নদী আলমা, দিগন্তপ্রসারী ধূসর মাঠ খেত খামার, আর সাপের মত বাঁকা বাঁধানো কালো রাজপথ। কান পেতে শুনলো—কামানের চাপা গর্জ্জন, বোমা ফাটার নির্দ্দয় হুহুঙ্কার আর ঝড়ের উন্মত্ত প্রলাপ।

এই মিশ্রিত শব্দ তরঙ্গ ঢেউয়ে পর ঢেউয়ে এসে কাঁচের উপর আছড়ে পড়ছে। কাঁচ বলছে, চিড় চিড় চিড় ঝন্ ঝন্—বুক ফেটে যায়।

আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে আসে। ঘুমভাঙ্গা সূর্য্যের লাল চোখের আলো ধমকে ওঠে,

আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘের টুকরোগুলোকে। আইভান বিড় বিড় করে বলে,—আর ত' দেরী করা যায় না। এবার যে যেতেই হবে।

ঘুমে জড়ানো শিশুর কথা কানে এল,—বাবা যেওনা তুমি।

আইভান ফিরে সোফার সামনে এসে দাঁড়ালো! সোফায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে ভাই বোন, নিকোলি ও ভারণা। ভারণা ঘুমের ঘোরে আবার বলে,—বাবা যেওনা তুমি। তার দু'গালে শুখিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ।

ওদের রুগ্না মা এতক্ষণে জেগে উঠেছে। আইভান তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে বললো,—বাচ্চাদের জাগালাম না, ঘুমাক। আমি চললাম, আর দেরী করিতে পারি না।

মা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। নিকোলি ও ভারণা ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে। ভারণা ছিটকে এসে আইভানকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের সঙ্গে কাঁদতে সুরু করে। নিকোলি চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে রইলো। ও বড় হয়ে গেছে কাঁদতে লজ্জা করে।

স্ত্রী ও মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে আইভান নিজের চোখের জল জামার হাতায় মুছে ফেললো। কার্ত্তুজের বেল্ট সমান করে বাঁধলো, খোলা বোতামগুলি লাগিয়ে পোষাক ঠিক করে নিল, খাপশুদ্ধ পিস্তল ও ছোট তলোয়ার যথাস্থানে লাগালো। একবার দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। পরে নিকোলির কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বললো,—দেখো তোমার মাকে, তোমার বোনকে, আমি চললাম। ভগবান তোমাদের সহায় হবেন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছুটি নিয়ে রুগ্না স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে দেখতে এসেছিল রুষ সৈনিক আইভান। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছে।

নিকোলি তেমনি মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথাটি আরেকটু ঝুঁকে পড়লো, চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। শুনতে পেল দরজা খোলার শব্দ, শুনতে পেল বাতাসের হাহাকার কামানের গজরানি, শুনতে পেল দরজা বন্ধ হওয়া। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো আইভানের লোহা বাঁধানো বুটের পরিচিত শব্দ—পাথরের সাথে ঠোক্কর ঠকাঠক্—শুনতে পেল না।

নিকোলি ও ভারণার সময় কাটে না। হঠাৎ এ কি হয়ে গেল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! আজ চব্বিশ দিন যুদ্ধ চলেছে জার্ম্মাণদের সঙ্গে। পঁচিশ দিন আগে এমনটি ছিল না। সমস্ত ওলোট পালোট হয়ে গেল। ছেলেমেয়ে মায়েরা গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। তাদের যাবার দৃশ্য বেশ মনে পড়ে। কি ভয়, কি ব্যস্ততার ছবি! গাড়ীতে, মোটারে, পায়ে হেঁটে মানুষের পরে মানুষ, তাদের নিজের গ্রাম, নিজের ঘাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেছে। নিকোলিদেরও যাবার কথা ছিল কিন্তু মার অসুখে আটকা পড়ে গেল। নিকোলি ভারণা কেউ রাজী নয় মাকে ছেড়ে যেতে, তাতে মরতে হয় দাঁড়িয়ে,—সেও ভাল।

সব চেয়ে কষ্ট হয় স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। কি সুন্দর স্কুল! খেলা পড়া একসঙ্গে হত! কতদিন দল বেঁধে নদীর ধারে গেছে। আল্‌মার দু'পাশে বালীর সঙ্গে ধূসর রংএর মাটি মিশানো। পড্‌জল মাটি। উপরটা ধূসর কিন্তু খুঁড়লে গাঢ় রং বেরিয়ে আসে, কখনও বাদামী বা। এটেল্ মাটির মত চিট্‌চিটে। দুর্গ, পাহাড়, উপত্যকা, স্কুলবাড়া সমস্ত কোমি গ্রাম বানানো যায়। খেলাঘরের বাড়ীঘর, ছোট ছোট।

একবার মাষ্টার মশাই মস্কো সহরের প্ল্যান দিয়েছিলেন, সাতদিন খেটে মস্কো বানানো হ'ল, ছোট্ট এতটুকু।

আরেকটি খেলা বিশেষ করে মনে পড়ে। আল্‌মায় নৌকা ভাসানো। সে কত রংএর কত ঢংএর। কোনটা ময়ুরপঙ্খী, কোনটা হাঙ্গরমুখী প্রত্যেকের উপর নাম ঠিকানা লেখা।...নিকোলি ও ভারণা—আইভানের ছেলেমেয়ে—গ্রাম কোমি।

মাষ্টারমশাই বলেছেন আল্‌মা নদী গিয়ে পড়েছে সেই প্রকাণ্ড বড় নদী নিপারে। নিপার হেলেদুলে প্রিপেটের প্রসিদ্ধ জলাভূমি পার হয়ে দক্ষিণ রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে কৃষ্ণসাগরে গিয়ে মিশেছে।

নৌকা ভাসিয়ে ছেলেমেয়েরা জটলা করতো কেমন করে, কত বিদেশ বিভুঁই পেরিয়ে, নৌকা যাবে কৃষ্ণসাগরের কালো ঢেউএর মাথায়। পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউ—অজাগরের লক্ষ ফণার ফোঁসফোঁসানি—তার উপরে নাচবে ছোট ছোট নৌকা। কেউ হয়তো দেখবে সেই কৃষ্ণসাগরের তীরের কোন ছেলেমেয়ে—লেখা আছে, নিকোলি ও ভারণা—আইভানের ছেলেমেয়ে—গ্রাম কোমি।

ভারণা বলে,—দাদা ভাল লাগে না কিচ্ছু এই যুদ্ধটুদ্ধ।

শুধু ভাল লাগা? ভয় করে না বুঝি? বুকের ভিতর রক্ত শুকিয়ে যায় না? সেই রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যখন ঘুম আসতে চায় না? যখন সেই বুক ফাটানো আওয়াজ? যখন জানলার কাঁচ চুপিসারে বলে উঠে, চিড় চিড় চিড় ঝন্ ঝন্?

আর এ'ত যে সে যুদ্ধ নয়। এ হ'ল বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মানুষ মারা কল! যত কম সময়ে যত বেশী মানুষ মারা যায়! এর চেয়ে আগের যুদ্ধ বরং ছিল ভাল। সেই দু'পাশে ট্রেঞ্চ কেটে বালুর বস্তার ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক চালানো। আর এ? ব্লিট্‌জ—ক্রিগ্! কি ভয়ানক নাম! সচল বাহিনীর তড়িৎ আক্রমণ!

সচল ট্যাঙ্ক—সচল সাঁজোয়া কামান—সচল মোটারবাইকে মেসিনগান নেওয়া সৈন্য—মাথার উপরে আকাশ ছেয়ে সচল এরোপ্লেনের ঝাঁক। সবই সচল। তর্ তর্ করে এগিয়ে আসে। ঘরের উপর এসে পড়ে, সরে দাঁড়াবার আত্মরক্ষার সময়টুকু দেয় না—ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেই হয়। তারপর? তারপর ছায়াঢাকা নদীবহা নির্জ্জন গ্রামের পর গ্রামে সরল মানুষের স্বাধীন জীবনগুলি দু'পায়ে মাড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে এগিয়ে যাওয়া—তর তর্ তর্। এই হ'ল যুদ্ধ! এই হ'ল বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মানুষ-মারা কল!

ভারণা বলে,—দাদা ভাল লাগে না মোটেই এই যুদ্ধুটুদ্ধু।

নিকোলি উত্তর দেয় না কিছু। চুপ করে উঠে আইভানের দূরবীণ নিয়ে জানলা দিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। আগুণের আতসবাজী. ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর বাজপাখীর মত ছোট ছোট এরোপ্লেন,—এই একঘেঁয়ে দৃশ্য কতক্ষণ দেখা যায়?

মার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, বলে,—মা খাবে কিছু? খিদে পেয়েছে? মা নিঃশব্দে কাঁদে, দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে যায়। নিকোলির হাত নিয়ে মা নিজের মুখে চোখে বুলায়, চুমা খায়।

১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবারঃ—

রাত্রে ঘুম হয়নি ভাল। নিষ্ঠুর আওয়াজ বেড়েই চলেছে। নিকোলি কতবার দেখেছে দূরবীণ নিয়ে, সেই এক ঘেঁয়ে দৃশ্য। যেন কাছে আরো এগিয়ে আসছে। ভোরের দিকে ঘুমের ঘোরে নিকোলি শুনলো বহু সৈন্য মার্চ্চ করে চলেছে, সঙ্গে যাচ্ছে গড়গড় করে কামানের গাড়ী, লরী বোঝাই মানুষ ও রসদ। স্বপ্ন? ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানলার কাছে উঠে এসে দেখে, স্বপ্ন নয় সত্যি! লাইন বেঁধে সৈন্য চলেছে—রুশ সৈন্য স্মলেনস্ক-এর দিকে—সঙ্গে সাজ সরঞ্জাম।

হরিণের মত লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে এল। দাঁড়িয়ে দেখলো কতক্ষণ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো একজন সৌনককে,—

—তোমরা যাচ্ছ কেথা?

— স্মলেনস্ক।

—আগের ঘাঁটির অবস্থা খারাপ বুঝি?

—শত্রুরা এগিয়ে আসছে। আমরা পিছিয়ে স্মলেনস্ক-এ গিয়ে ওদের আটকাবো।

—আমার বাবা আইভানকে দেখেছ?

—না।

সৈনিক চলে গেল।

সারাদিন এই রকম। পিছু হটে ফিরে যাওয়া। পথের উপর তালে তালে ভারী বুটের আওয়াজ—কাঁধ থেকে ঝোলানো বন্দুকের উঁচু সঙ্গীনের জাল—মাথায় লোহার টুপির সারি—পিটে বাঁধা বোঝার স্তূপ। সৈনিকদের মুখের পেশী কঠিন হয়ে ফুলে উঠেছে, চোখে নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদ!

নিকোলি ও ভারণা সারাদিন ছুটে ছুটে কত লোককে জিজ্ঞাসা করলো,—আইভানকে দেখেছ, জান আইভান কোথায়?

কেউ উত্তর দিতে পারে না।

মার কাছে ফিরে ফিরে এসে এই ব্যর্থতার কাহিনী বারবার বলতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়। তবু বলতেও হয়। এদের বিশ্বাস সৈন্যরা যখন ফিরছে এই সঙ্গে আইভানও এসে পড়বে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। মা অসুস্থ বটে; কিন্তু আর অপেক্ষা চলে না। এখন দেরী করা মানে বিপদের মুখে গিয়ে পড়া। জার্ম্মাণ সৈন্য এগিয়ে আসছে। কে জানে কখন এসে পৌঁছে যাবে গ্রামে—তখন?

সারাদিন তিনটি মানুষ, মা ও দুটি ছেলেমেয়ে পথ চেয়ে রইলো—এইবার আসবে, এই এল বলে। এদিকে সেই নিষ্ঠুর শব্দ আরো এগিয়ে আসছে। পিছুহাঁটা সৈনিকেরাও বেশী ব্যস্ত বেশী উৎবেগের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ভারী কামানের গাড়ীর ও লরীর আওয়াজ উপরি উপরি ঝন্‌ঝন্ করে পথ বেয়ে চলেছে।

দিন ফুরিয়ে গেল। রাত্রির আঁধার ব্ল্যাক আউটের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে দিক্‌রেখা সম্পুর্ণভাবে মুছে লুপ্ত করে দিল। শুধু রূপালী নদী আল্‌মার সরু ফালি ও রাজপথে কালো কালো সচল অস্পষ্ট স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু আইভান এল না। আইভানের কোন খবরও পাওয়া গেল না।

মা হতাশভাবে চোখ বুজিয়ে কাঁদতে লাগলো। ভারণা ভয়ার্ত্তচোখে দরজার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। জানালার কাঁচ গলা চড়িয়ে বলছে—চিড় চিড় চিড় ঝন ঝন্। রাত গড়িয়ে চললো।

নিকোলি মার কাছে এসে বলে,—মা আমার সঙ্গে যাবে গ্রাম ছেড়ে? বলতে গিয়েও বলতে পারলো না—বাবা ত' এল না।

—তুমি কি করে ব্যবস্থা করবে ছোট্ট মাণিক আমার? সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিকোলি বললো,—চেষ্টা করে দেখি। এক মিনিট কি ভেবে দরজার দিকে পা' বাড়ালো।

—যাসনে বাবা যাসনে একলা এই অন্ধকারে, আজকের এই দুর্য্যোগে—মা চেঁচিয়ে উঠলো।

মার কথার উত্তরে দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। নিকোলি মার কথা শুনতে পেল না, না শুনলো না, বোঝা গেল না।

নিকোলি আধখানা পাহাড় নেমে যা দেখলো তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকজন, গাড়ীঘোড়া যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। ব্যস্ততার সীমা নেই। বেঁচে দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসৎ যেন ফুরিয়ে গেছে। জার্ম্মাণরা এসে পড়লো? তাহলে? মার, ভারণার কি হবে? চিন্তায় ছোট কপালটুকু কুঁচকে গেল, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নিকোলি তর্‌তর্‌ করে বাকী পথ নেমে এল। সকলে ছুটে চলেছে স্মলেনস্ক-এর দিকে প্রাণভয়ে, প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। সকলের মুখে এক কথা, শত্রুরা এসে পড়েছে, এসে পড়ল বলে।

পথের একপাশে একটা প্রকাণ্ড লরী দাঁড়িয়ে, সৈন্যভরা। কি খারাপ হয়ে গেছে। তু'জন লোক ইঞ্জিন খুলে মেরামতে ব্যস্ত। কয়েকজন সৈনিক রাস্তায় এলোমেলো দাঁড়িয়ে।

একজনের কাছে গিয়ে নিকোলি বললো,—আমার মা ও বোন্‌কে নিয়ে যাবে? আমার বাবা আইভান রুশ সৈনিক যুদ্ধ করছে ফিরে আসেনি। নিয়ে যাবে?

তু'হাত সামনে উলটে সৈনিক উত্তর দিল,—উপায় নেই। এমনি আরো চার পাঁচজনকে বললো, কেউ রাজী হয় না। সকলে বিরক্ত হয়। ধমকে উত্তেজিতভাবে উত্তর দেয়। নিজের প্রাণ নিয়েই সকলে এত ব্যস্ত যে দয়া দেখাবার, করুণা করবার সময় নেই।

ব্যর্থতায়, অপমানে, আশঙ্কায়, নিকোলির মুখ শুকিয়ে গেল। একটা গাছের তলায় এসে চুপ করে ভাবতে লাগলো, করবে কি।

এদিকে পালানো মানুষদের ব্যস্ততা উন্মত্ততায় পরিণত হয়েছে। সেই নিষ্ঠুর আওয়াজ যেন কানের পাশেই এগিয়ে আসেছে। ঘন ঘন বিস্ফোরণ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। আকাশের মেঘের সঙ্গে মিশে মিশে এরোপ্লেন চরকীর মত ঘুরছে। আগুনের হল্‌কা এসে চোখে মুখে লাগে, বাতাস এমনি গরম।

নিকোলি দেখে একটু দূরে একজন বুড়োমতন সৈনিক একটা পাথরের উপর বসে টুপিতে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছে। নিকোলি মরিয়া হয়ে তার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তু'হাতে তার হাত ধরে, কান্নার সুরে বললো,—আমাদের বাঁচাও, আমাদের বড় বিপদ। আমার মা রুগ্না, আমার বোন বড্ড ছোট। আমার বাবা আইভান তোমাদেরই সঙ্গে এতদিন লাইনে যুদ্ধ করেছে, জানিনা এখন কোথায়। তোমার সঙ্গে আমাদের না নিয়ে গেলে জার্ম্মাণরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। যাবে না নিয়ে?

লোকটি মুখের উপর থেকে টুপি সরিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। যেন শুনতে পায় নি বুঝতে পারেনি কোন কথা।

নিকোলি আবার বললো সমস্ত কথা বুক ভাঙ্গা কাতর স্বরে।—কোথায় তোমার বাড়ী?—লোকটি বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো। আঙ্গুল দিয়ে নিকোলি দেখায় পাহাড়ের চূড়ায়।

—তু'মিনিটে নিয়ে এস। ইঞ্জিন মেরামত হলেই চলে যেতে হবে আমাদের, এক্ষুনি। আমার নাম মাকারভ আলেস্কিভিচ্‌!

নিকোলি ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চললো বাড়ীর দিকে। পা' ব্যথা করে, টন্‌টন্‌ করে, আর পারে না। দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—ভগবান আর একটু শক্তি দাও, আর একটু সময় দাও,—মাকে বোনকে আমি বাঁচাবই।

একটু পরে দেখা গেল নিকোলির কাঁধে ভর দিয়ে, ভারণার হাত ধরে মা পাহাড়ের গা' বয়ে নেমে আসছে। তুর্ব্বল শরীরে পাহাড়ে নামা খুব কষ্টকর ব্যাপার। পায়ে পা জড়িয়ে যায়, কয়েক পা' নেমেই হাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। নিকোলি যেন টেনে নিজের শরীরের উপর সমস্ত ভার দিয়ে, নামিয়ে যেতে লাগলো। সময় নেই, সময় কোথায়? কোন জিনিষ সঙ্গে আনা হয়নি। জীবনের মূল্য জিনিষের চেয়ে এখন অনেক বেশী।

নীচে এসে পৌঁছে দেখলো, লরীতে ষ্টার্ট দিয়েছে। সৈন্যরা নানাদিক থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ছে। এবার ছেড়ে দেবে।

—ভারণা মাকে ধরে একটু।—একলাফে নিকোলি লরীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

—মাকারভ, মাকারভ আলেস্কিভিচ্‌। এসেছি আমরা, দয়া করে তুলে নাও।

অন্ধকারে কারুর মুখ দেখা গেল না। অন্ধকারে সেই কোলাহলের মধ্যে কোন জবাবও এসে পৌঁছালো না।

—মাকারভ মাকারভ! আমি নিকোলি রুশ সৈনিক আইভানের ছেলে। তুমি আমার মা ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলেছ, তারা এসেছে। মাকারভ—! নিকোলি তুঃখে হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়লো। গলার স্বর আটকে গেল। তবুও প্রাণপণে শেষবার ডাকলো—মাকারভ!

লরী তখন গা ঝাড়া দিয়ে গড়িয়ে চলতে সুরু করেছে। হঠাৎ কে চেঁচিয়ে লরী থামাতে হুকুম করলো। তু'চার জন প্রতিবাদ করে উঠে। আরো চেঁচিয়ে ধমকে তাদের চুপ করালো। অন্ধকারে লরী আবার থেমে গেল। এক ছায়ামূর্ত্তি ধারে এসে ঝুঁকে তু'হাত বাড়িয়ে বললো,—এস এস, আমি মাকারভ, চট্‌পট্‌ উঠে পড়।

ভারণা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল না। মাকে ধরে নিকোলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। টেনে হিঁচড়ে তোলা হ'ল তিনজনকে। অন্যরা বিরক্তভাবে জায়গা ছেড়ে দিল বসতে, কোনরকমে কষ্টে হাঁটুজুড়ে।

এমন সময় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বোমা এসে ফেটে পড়লো ভীষণ শব্দ করে। ভূমিকম্প হয়ে গেল। একটা এরোপ্লেন গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে গোঁৎ খেয়ে মাটিতে আছড়ে এসে পড়লো। চারিদিকে তখন বাজছে কামানের ঝাঁঝর, দুম্ দুম্ ঝম্ ঝম্—মেসিনগানের চেরাগলার বাঁশী, সুই সুইচ সুই!

একজন লরীর ভিতর বলে উঠলো,—আর বুঝি রক্ষা পেলাম না, শত্রুরা এসে পড়েছে কাছে। সকলে বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকো।

নিকোলি মাকারভের কানের কাছে চেঁচিয়ে বললো,—আমায় একটা বন্দুক দাও. আমিও যুদ্ধ করবো। মাকারভ হাহাহা করে হেসে উঠলো পাগলের মত। বললো,—দুধের ছেলে যুদ্ধ করতে চায়. মানুষ মারতে চায়—হাহাহা!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে, আকাশের দিকে দু'হাত মুঠো করে তুলে বললো,—দেখছো ভগবান! দেখছো তুমি কি নিষ্ঠুর, কি জঘন্য এই কাজ—মানুষের কি ভয়ানক শত্রু এই যুদ্ধ! আমার একমাত্র মা'মরা ছেলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে মানুষ মেরেছে, শেষে আজ সকালে নিজেও মরলো! আবার এই দুধের ছেলে বলে মানুষ মারবো! যুদ্ধ খারাপ, যুদ্ধ জঘন্য, যুদ্ধ পৈশাচিক কাজ!

কে একজন পিছন থেকে বললো,—মাকারভ চুপ করো, কর্ত্তারা শুনলে তখন কি হবে?

—শুনুক সকলে। শোনা দরকার! আবার বলবো মানুষের শত্রু এই যুদ্ধ—

কথা শেষ করতে হল না। কে একজন জাপটে ধরে মুখে হাত চাপা দিয়ে দিল। এই ধস্তাধস্তি চলেছিল একটু, হঠাৎ ভীষণ নাড়া দিয়ে লরী চলতে সুরু করলো। আচম্‌কা ধাক্কায় মাকারভ ও তার সঙ্গী টাল সামলাতে না পেরে এ' ওর ঘাড়ে পড়ে গেল। লরী তখন চলছে, ঝড়্ ঝড়্ ঝড়্।

মাকারভ মুখ চাপা অবস্থায় অস্পষ্টভাবে চেঁচাতে লাগলো,—যুদ্ধ মানুষের শত্রু—যুদ্ধ মানুষের শত্রু! লরী চললো ঝড়্ ঝড়্ ঝড়্।

———

রাতের বন

কুমারী মমতা দাশগুপ্ত

হে রাতের বনভূমি
পাণ্ডু চাঁদের আব্‌ছা আলোতে কী স্বপন দেখ তুমি?
মোদের জগৎ ঘুমে অচেতন
পরিশ্রান্ত পশুর মতন
নীরব হ'য়েছে জীবনের মর্ম্মর—
সারারাত ভ'রে আমাদের অবসর।

বনের সভাটি জুড়ে
নূতন করিয়া কলরব সুরু কত বিচিত্র সুরে!
ধূসর শেয়াল ধুঁকিছে ক্ষুধায়ঃ
নরম হাঁসেরা কোথা ঘুম যায়
কালো পেঁচা কাঁদে কোন অমা নিশি লাগি!
শকুনের শিশু অকারণে থাকে জাগি।

ঝোপের অন্ধকারে
সচকিত ভাবে খরগোসগুলি উঁকি দেয় বারেবারে—
শরবনে হাওয়া বিলাপ জাগায়
সোণালী নাগিণী এঁকে বেঁকে যায়
অতি চুপে চুপে তাকায় দূরের শাখেঃ
পাখার বাসায় কচি-ছানা বুঝি ডাকে।

গাছের গোপন কোণে
রাতজাগা এক কাঠ বিড়ালীর ভয় জাগে ভীতু মনে ঃ
পিপাসু নেকড়ে মাতিয়াছে ভোজে
আহত হরিণ আশ্রয় খোঁজে ;
কচি খোকা সম ককিয়ে হায়েনা হাসে ঃ
পাঁশুটে সিংহ হ্রদে জল খেতে আসে।—

হে রাতের বনভূমি
আমরা যখন ঘুমাই তখন জেগে থাক শুধু তুমি।
দিনের আলোতে যারা অগোচর
তারাই জমায় রাতের আসর,
মোদের জীবন যখন ঝিমিয়ে আসে
বনের জীবন কথা কয় প্রতি ঘাসে॥

প্রবন্ধ

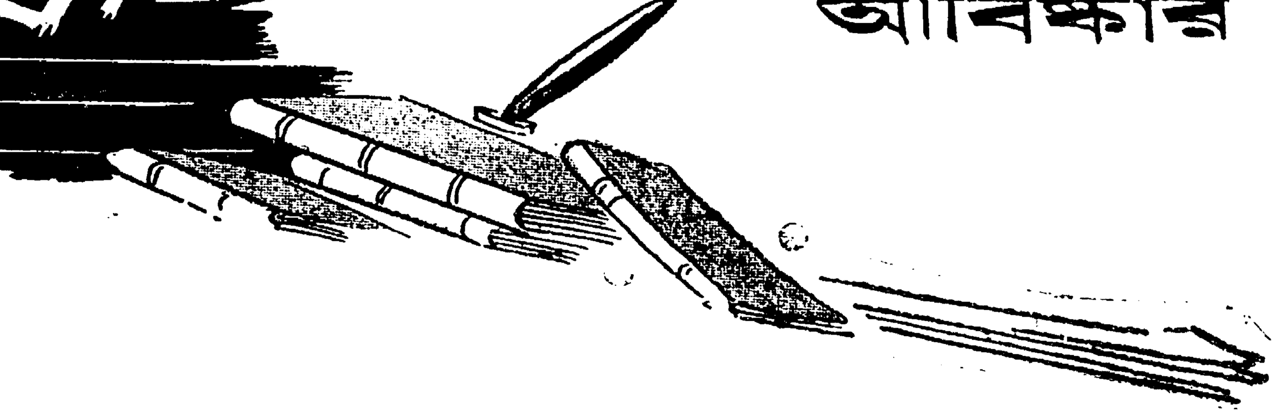

প্রাচীন যুগের আবিষ্কার

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন রোমানদের তড়িৎ-শক্তি ব্যবহার

প্রাচীন রোমান জাতি বিদ্যুৎ-প্রবাহক যন্ত্রের (Electric Conductor) ব্যবহার জানিত। আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলে ডুইনো প্রাসাদের অত্যুচ্চ শিখরে অতি প্রাচীনকাল হইতে একটী লৌহদণ্ড আছে। ঝড়ের সময় ঐখানে একজন সৈনিক দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহার হস্তধৃত বর্শাফলকের ধাতব অংশটি সে এই লৌহদণ্ডে ঠেকাইয়া বিদ্যুৎশিখা জ্বালাইয়া মাঝে মাঝে একটী ঘণ্টা-ধ্বনি করিত। এই শব্দ শুনিয়া সমুদ্রে যে সব জেলেরা নৌকা লইয়া গিয়াছে তাহারা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিত।

রোমান পয়ঃপ্রণালী ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ

চীন ও মিশরবাসীরা গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া কূপের জল উঠাইত। প্রাচীন রোমানেরাও এইরূপ কূপ খনন করিতে পারিত। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে এই প্রকার কূপ খনন করা হয় ফ্রান্সের আর্টোয়া প্রদেশে। সেইজন্য এইরূপ কূপের নাম আর্টেসিয়ান কূপ। রোমানেরা এইরূপ অদ্ভুত জলবাহী খালের ব্যবহার জানিত। ইহার দ্বারা তাহারা বহুদূর হইতে পানীয় জল আনিয়া সমগ্র নগরে সরবরাহ করিত। এইরূপ তিনটী জলনালী (aqueducts) এখনও মুসোলিনীর রোমে ব্যবহার হইতেছে। উহাদের আনুমানিক বয়স প্রায় আড়াই হাজার বৎসর। ফ্রান্সে নিমের (Nimes) কাছে যে জলনালী আছে, তাহা প্রাচীন রোমানেরা তৈরী করে ; আজও তাহা অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান। জলপাই-রস নিষ্কাশন ও গম এবং শস্য চূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের জল-চালিত কল ছিল। ১৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিপিও নসিকা জল-ঘড়ির উদ্ভাবন করেন। সম্রাটদের যুগে রোমে আকাশস্পর্শী বহু প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এত বড় প্রাসাদের কল্পনা নিউইয়র্কেও হয় নাই। প্যালাটাইন পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত রোমান সম্রাটদের বিরাট প্রাসাদে উঠিবার জন্য উত্তোলক-যন্ত্রের (lift) ব্যবহার ছিল। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত রোমানদের ইঁটে-গড়া প্রশস্ত প্রাচীর এখনও পর্তুগালে বিরাজ করিতেছে। যে-উপায়ে তাহারা সিমেণ্ট ও গাঁথুনির মশলা তৈরী করিত, আজ তাহা লুপ্ত। রোমান ও গ্রীকদের নির্ম্মিত ইঁট হয়ত কোথাও খারাপ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গাঁথুনির মশলা এখনও ঠিক আছে। তাহারা লিখিবার জন্য যে-কালি ব্যবহার করিত বা রঞ্জশিল্পে যে-সমস্ত রং প্রয়োগ করিত, মহাকাল তাহার

উপর আজও কোন প্রলেপ দিতে পারে নাই। প্রাচীন ফিনিশিয়া দেশের বিখ্যাত শহর টায়ারে (Tyrus) শ্রমিকেরা এক প্রকার রাঙা রং তৈরি করিত। গভীর সমুদ্রচারী একপ্রকার মৎস্য হইতে এই রং প্রস্তুত হইত। তাহার নাম ছিল—Tyrean purple। রাজবংশীয়েরাই এই রং ব্যবহার করিত। এখন আমরা সে অপূর্ব্ব রংএর কথা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রাচীন বিদ্যাসমূহের লোপ

দামাস্কাস শহরের অদ্ভুত ইস্পাত আজ কোথায় গেল? বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সারাসেন জাতি যে-ইস্পাতে তরবারি তৈরি করিত, বিলাতের শেফিল্ড্ তাহার সঙ্গে এখনও পাল্লা দিতে পারে না। এই তরবারি শৃঙ্খলে নির্ম্মিত কঠিন বর্ম্ম স্বচ্ছন্দে ভেদ করিতে পারিত। গ্রীকেরা এক প্রকার অগ্নির গলিত স্রাব ব্যবহার করিয়া বাইজেন্‌টিয়ামের শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে তাহারা ইহার ব্যবহার ভারতীয়গণের নিকট শেখে। হিন্দুদের এই প্রাচীন বিদ্যা আজ লুপ্ত।

পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্য ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে নষ্ট হইয়া যায়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের লোকেরা ইহার ফলে বর্ব্বরতার যুগেই রহিয়া গেল। চারিদিকে পরস্পরের হানাহানি চলিল। সৈনিক, বণিক, সাধু-সন্ন্যাসী ও ক্রীতদাসের সংখ্যাই বাড়িয়া চলিল। পঠনপাঠন ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা লোকে একপ্রকার ভুলিয়া গেল। বিদ্যার পূজা ও সাধনা কেবল সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল। এ বিদ্যাও আবিষ্কার বা কলাবিদ্যা চর্চ্চার পক্ষে প্রচুর ছিলনা। ইহা সত্ত্বেও এক হাজার বৎসর ধরিয়া তাহারা যে-সব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছে তাহাতে সভ্যতার ইতিহাসে তাহাদের নাম অমর হইয়া থাকিবে।

বিস্ফোরক ও ঘড়ি আবিষ্কার

ইউরোপের মধ্যযুগে মানবসমাজ যুদ্ধবিদ্যারই বিপুল সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে রজার্ বেকন্ বারুদের উদ্ভাবন করিয়া যুদ্ধবিদ্যার যুগান্তর গঠন করিয়া গিয়াছেন। তবে বেকনের পূর্ব্বেও বিস্ফোরক চুর্ণের ব্যবহার প্যালেষ্টাইনে ধর্ম্মযুদ্ধকারিগণের (crusaders) বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে বার্টোল্ড স্‌ভার্ট্‌স্ (Berthold Schwartz) নামক একজন জার্ম্মাণ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরকের প্রথম আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান কালের ঘড়ির আদি পুরুষের প্রথম উদ্ভাবন হয় জার্ম্মানির মাগ্‌ডেবুর্গ শহরে আনুমানিক ৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে ইহা ধর্ম্মযাজকগণকে প্রার্থনায় আহ্বান করিবার জন্য গির্জ্জায় ব্যবহার করা হইত। এই সব ঘড়িতে কাঁটা বা ডায়াল্ থাকিত না, কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজিবার মত ঘণ্টা থাকিত।

কম্পাস-যন্ত্র

চীনেরা বলে যে তাহাদের সম্রাট হোয়াং-টি ২৬৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নাবিকদের ব্যবহারের জন্য সর্ব্বপ্রথম কম্পাস-যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাহারাই প্রথমে চুম্বকীকৃত শলাকার ব্যবহার করে। কেহ কেহ বলেন যে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মার্কো পোলো চীন হইতে এই কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ইউরোপে লইয়া যান। মধ্যযুগের "ইহাই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

একটি উল্লেখযোগ্য হাউইএর কাহিনী

শ্রীমানসী আচার্য্য

রাজার ছেলের বিয়ে হবে। রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। বিরাট একটা শোভাযাত্রা করে কনেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। রাজহাঁসের আকারে তৈরী সোনার একটা শ্লেজ গাড়ীর ভেতরে বসে আছেন রাজকুমারী। ছয়টি হরিণ সেটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। "ঠিক যেন একটি সাদা গোলাপ।"—যে তাকে দেখছে সেই একথা বলছে। আর চারিদিক থেকে অজস্র ফুল এসে তার গায়ে পড়ছে।

কনেকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে রাজপুত্র নিজে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে। মাথাভরা তার সোণালী চুল আর বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন স্বপ্নে ভরা।......

মহাসমারোহে বিয়ে শেষ হ'ল। মুক্তোর কাজ করা ভেলভেটের প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে বরকনে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

খাওয়া দাওয়া, গান বাজনার পর, সব শেষের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে আতসবাজির খেলা। রাজকুমারী কোনদিন আতসবাজি দেখেন নি বলে, রাজা তাই তাঁর বিয়ের রাতেই এ ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক মাঝরাতে সেটি দেখানো হবে।

বাগানের ঠিক শেষপ্রান্তে একটি টেবিল এনে রাখা হয়েছে। এবং যখন আতসবাজিগুলি তার ওপর গুছিয়ে রাখা হচ্ছে, এমন সময় তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু করে দিল।......

"পৃথিবী বাস্তবিকই ভারী সুন্দর!" ছোট্ট একটি আকাশ-পট্‌কা বল্লে। "রাজার বাগানকে একটা পৃথিবী বলে না," বড় একটা রোম্যান মোমবাতি বল্লে, "পৃথিবী হচ্ছে একটা বিশাল জায়গা।"

"প্রত্যেকের নিজের, নিজের ভালবাসার জায়গাই হচ্ছে তার কাছে একটা পৃথিবী," ক্যাথারাইন চক্র বল্লে। জন্ম থেকেই সে একটা কাঠের বাক্সের সঙ্গে শক্ত করে আট্‌কানো। "কিন্তু আজকাল আর ভালবাসার কোন মূল্যই নেই। কবিরা একে একেবারেই হত্যা

করেছে। প্রকৃত ভালবাসা হচ্ছে নীরব আর সহনশীল। আমার মনে পড়ে আমি একবার ——কিন্তু সে কথা এখন থাক্। রোম্যান্স হচ্ছে অতীতের জিনিস।"

"বোকা কোথাকার!" রোম্যান মোমবাতিটি বল্লে, "রোম্যান্স হচ্ছে চাঁদের মত আর কোনদিনই তার মৃত্যু নেই।"

"উঁহু", ক্যাথারাইন চক্র মাথা নেড়ে বল্লে, "রোমান্স বেঁচে নেই।" হটাৎ শুক্‌নো একটা কাশির শব্দে তারা চম্‌কে উঠ্‌লো। শব্দটা আস্‌ছে একটা দাম্ভিক চেহারার হাউইএর কাছ থেকে। সে একটা লম্বালাঠির শেষ প্রান্তে আট্‌কানো। কোন কিছু মন্তব্য করবার আগে, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে, সে সর্ব্বদাই এই রকম একটা শব্দ করতো। "তোমরা সবাই আমার কথায় কাণ দাও।" সে বল্লে এবং প্রত্যেকেই তার কথায় চুপ করলো। কেবল ক্যাথারাইন চক্র তখনও নিজের মনে বকে যাচ্ছিলো, "রোমান্স মরে গেছে।"

"চুপ্! চুপ্!" একটা পটকা চীৎকার করে বল্লে।

"একেবারেই মরে গেছে।" ক্যাথারাইন চক্র আবার ফিস্ ফিস্ করে বল্লে। তারপর সব চুপ্ চাপ্।

হাউইটি এবার তার বক্তব্য সুরু করলো। "রাজপুত্রের ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে," সে বল্লে, "আমাকে ছাড়বার দিনটিতেই ওর বিয়ে হচ্ছে।"

"কিন্তু আমার মনে হয়," ছোট্ট আকাশ-পট্‌কাটি বল্লে, "রাজপুত্রের সম্মানেই জন্যেই আজ আমাদের ছাড়া হচ্ছে।"

"সে-কথা অবশ্য তোমাদের সম্বন্ধেই খাটে," হাউই উত্তর করলো, "কিন্তু আমি হচ্ছি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। কোন এক বিখ্যাত বংশে আমার জন্ম। আমার মা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ক্যাথারাইন চক্র। তিনি ছিলেন তখনকার দিনে নাম করা একজন নাচিয়ে। তাঁকে যখন ছাড়া হল, তিনি প্রায় উনিশবার তাঁর চাকার উপর ঘুরেছিলেন আর প্রত্যেক-বারই সাতটি করে সোণালী তারা এমন সুন্দর করে তাঁর চার পাশে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন যে সবাই একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছ্‌লো। আমার বাবা ছিলেন আমারই মত একজন বিশিষ্ট হাউই। তাঁকে যখন ছাড়া হল, তিনি এমন উঁচুতে উঠে গেলেন যে সকলে ভাব্‌লো তিনি বুঝি আর ফিরেই আসবেন না। কিন্তু তিনি নেমে এলেন অজস্র সোণালী বৃষ্টি ধারার ভেতর দিয়ে। খবরের কাগজে তাঁর অনেক প্রশংসা বেরিয়েছিল। আর কোর্ট গেজেট ও তাঁকে পাইলো টেক্‌নিক আর্টের একজন শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে প্রভূত প্রশংসা করেছিল।"

"পাইলো টেক্‌নিক্ নয়, পাইরো টেক্‌নিক," বেঙ্গল লাইট বল্লে, "আমার টিনের গায়েই তা লেখা আছে।"

কিন্তু আমি বলছি পাইলো টেক্‌নিক।" হাউই গম্ভীর স্বরে বল্লে। বেঙ্গল লাইট এবারে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।

"আমি বলছিলাম," হাউই আবার আরম্ভ করলো, "আমি বলছিলাম——হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম?"

"তুমি তোমার নিজের বিষয়ে কিছু বলছিলে।" রোম্যান বাতিটি উত্তর করলো।

"নিশ্চয়ই!" সে বল্লে, "কিন্তু বিশ্রী একটা বাধা পড়ায় আমি আমার সেই প্রীতিকর আলোচনাটির খেই হারিয়ে ফেলেছি। কথার মাঝে এরকম বাধা দেওয়াকে আমি মস্ত বড় একটা অভদ্রতা মনে করি। এবং যে কোন রকম অভদ্রতাকেই আমি ভয়নক ঘৃণা করি। কেননা আমি হচ্ছি একজন ভাব প্রবণ ব্যক্তি।"

"ভাব-প্রবণ ব্যক্তি কাকে বলে?" একটি পট্‌কা রোম্যান বাতিটিকে প্রশ্ন করলো।

"একজন মানুষ যার, নিজের পায়ে কড়া আছে বলে সর্ব্বদাই অন্যের পা মাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে।" রোম্যান বাতিটি চাপা গলায় উত্তর কর্‌লো। এবং তার কথায় পট্‌কাটি একেবারে হাসিতে ফেটে পড়্‌লো।

"হাসছ কেন?" হাউই তাকে প্রশ্ন করলো।

"আমি হাসছি," পট্‌কা বল্লে, "আমি সুখী তাই।"

"এটা হল একটা ভয়ানক স্বার্থপরের মত কথা।" হাউই রাগের সঙ্গে বল্লে, "তোমার সুখী হওয়ার কি অধিকার আছে? তোমার উচিত অন্যের বিষয়ে চিন্তা করা, বিশেষ করে আমার বিষয়ে। কেননা আমি সর্ব্বদাই নিজের বিষয়ে চিন্তা করে থাকি, এবং চাই সকলেই আমার বিষয়ে চিন্তা করুক। এরই নাম হচ্ছে, সহানুভূতি। এবং এটি আমার মধ্যে বেশ একটু বেশী মাত্রাতেই আছে। এই যেমন ধর, আজ রাতে যদি আমার ভাগ্যে কিছু খারাপ দুর্ঘটনা ঘটে, সকলের কাছে সেটা কি রকম একটা দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে বলত? রাজার মন একেবারে ভেঙ্গে যাবে, আর রাজপুত্রবের নতুন বিবাহিত জীবন চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে। সত্যিই আমি যখন আমার সেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা ভাবি, আমার চোখ ফেটে জল আসে।"

"যদি তুমি সকলকে আনন্দ দিতে চাও," রোম্যান বাতিটি বল্লে, "তোমার উচিত নিজেকে শুক্‌নো রাখা।"

"নিশ্চয়ই!" বেঙ্গল লাইট বল্লে, "এটুকু সাধারণ জ্ঞান সকলেরই থাকা উচিৎ।" সে তখন নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে।

"কি বল্লে, সাধারণ জ্ঞান? বটে!" হাউই বিরক্তির সঙ্গে বল্লে, "কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছ আমি হচ্ছি সম্পূর্ণ অসাধারণ আর বিশিষ্ট একজন হাউই। সাধারণ জ্ঞান তাদেরই

থাকা সম্ভব, যাদের কল্পনা শক্তি একেবারেই নেই। কিন্তু আমার তা আছে। বাস্তব নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনে। জীবনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত রকম নীচতাকে বাঁচিয়ে চলা। এবং সে বিষয়ে আমি যথেষ্টই সচেতন। অবশ্য এখানে আমার মূল্য বোঝবার মত লোক কেউই নেই। এইমাত্র তোমাদের হাস দেখে মনে হচ্ছে যেন রাজপুত্রের আজ বিয়ে হয়নি।"

"কেন হাস্‌বো না?" একটি আগুনে বেলুন বল্লে, "আজ হচ্ছে মস্ত একটা আনন্দের দিন। যখন আমাকে ছাড়া হবে, আমি অনেক উঁচুতে একেবারে তারার কাছে উঠে যাবো। সেখানে আমি তাদের বলব এই সুন্দর উৎসবের কথা আর সুন্দর বর কনের কথা।"

"জীবন সম্বন্ধে তোমাদের কী ক্ষুদ্র ধারণা!" হাউই বল্লে, "তোমাদের ভেতরটা দেখ্‌ছি সত্যিই একেবারে ফাঁপা। তোমরা যদি অবস্থাটা একবার ভেবে দেখতে তাহলে হাসতে কিছুতেই পারতেনা। এই যেমন ধর, রাজপুত্র হয়ত তার কনেকে নিয়ে কোন এক দেশে বেড়াতে যাবে, সেখানে হয়ত গভীর একটা নদী আছে, হয়ত সেখানে তাদের একটি সুন্দর ছেলে হবে, কোনদিন হয়ত ছেলেটি তার নার্শের সঙ্গে বেড়াতে যাবে, হয়ত তখন নার্শটি ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়্‌বে, আর হয়ত ঠিক সেই সময় ছেলেটি নদীতে পড়ে ডুবে যাবে। ক্বী ভীষণ দুঃখের কথা বলত? মা বাপ তার একমাত্র সন্তান হারাবে, ভাবতেই আমার গা শিউরে ওঠে।"

"কিন্তু তারাতো তাদের একমাত্র সন্তান হারায়নি," রোম্যান বাতিটি বল্লে, "আর কোন দুর্ঘটনাও তাদের ঘটেনি।"

"আমি তো বলিনি যে ঘটেছে," হাউই উত্তর করলো, "আমি বল্‌ছি ঘটতে পারে। যদি তারা সত্যিই তাদের একমাত্র সন্তান হারাতো, তাহলে অবশ্য আমার বল্‌বার কিছুই থাকতো না। যারা নষ্ট দুধের সামনে বসে কাঁদে তাদের আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যখন ভাবি তারা তাদের সন্তান হারাতে পারে, তখন আমার মন সত্যিই বিচলিত হয়ে ওঠে।"

"বাস্তবিকই তোমার মত এরকম অস্বাভাবিক ভাবের লোক আমি আর কোনদিন দেখিনি।" বেঙ্গল লাইট বল্লে।

"আর তোমার মত অভদ্র লোকও আমি কোনদিন দেখিনি," হাউই বল্লে, "রাজপুত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তোমরা বুঝ্‌বে না।"

"তার সঙ্গে তো তোমার আলাপই নেই!" রোম্যান বাতিটি বল্লে।

"আমি তো বলিনি যে আছে," হাউই উত্তর করলো, "আর আলাপ থাকলেও আমি ওর সঙ্গে কখনই বন্ধুত্ব করতাম না। কেননা বন্ধু বলে কাউকে পরিচয় দিতে যাওয়াটাই হচ্ছে বিপদের কাজ।"

"তোমার এখন উচিত নিজেকে শুক্‌নো রাখা।" আগুনে বেলুন বল্লে; "আর সেটাই হচ্ছে বিশেষ দরকারি জিনিষ।"

"তোমার পক্ষে অবশ্য সেটা দরকারি হতে পারে," হাউই বল্লে, "কিন্তু আমার যদি ইচ্ছে হয় আমি নিশ্চয়ই কাঁদব।" বল্‌তে বল্‌তে সে সত্যিই কেঁদে ফেল্লে। তার চোখের জল তার লাঠির গা বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

"সত্যিই ওর স্বভাবটা ভারী অদ্ভুত," ক্যাথারাইন চক্র বল্লে, "কাঁদবার মত কিছুই হয়নি কিন্তু ও কাঁদছে।"

"যত সব ভণ্ডামি!" রোম্যান বাতি আর বেঙ্গল লাইট একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। ন্যাকামি জিনিষটাকে ওরা নাকি একেবারেই পছন্দ করে না।......

* * * * *

দশটা, এগারোটা, বারোটা—তারপর ঘড়িতে একটা বাজলো।

"এইবার আতসবাজি সুরু হোক্‌"—রাজা বল্লেন।

চারিদিক থেকে দলে দলে লোক এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। "হু-উ-স্‌!" ক্যাথারাইন চক্র ঘুরতে ঘুরতে আকাশে উঠ্‌লো।

"গুড্‌বাই!" আগুনে বেলুন উড়তে, উড়তে বল্লে। "ফটাস্‌-ফট্‌!" পট্‌কাগুলি জবাব করলো। "সাবাস! সাবাস!" দর্শকেরা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো। এইবার হাউইএর পালা। কিন্তু এতক্ষণ ও এত কেঁদেছে যে, ওর সমস্ত শরীর ভিজে একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। কাজেই তারা তাকে সেইখানেই ফেলে রেখে, যে যার মত বাড়ী ফিরে গেল।......

"আমার মনে হয়," হাউই বল্লে, "কোন একটা বিশেষ উৎসবের জন্য ওরা নিশ্চয়ই আমায় হাতে রাখ্‌ছে।" তারপর সে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশী গর্ব্ব অনুভব করলো।

পরের দিন কতগুলি লোক সেই জায়গাটি পরিস্কার করতে এলো। "নিশ্চয়ই ওরা আমায় নিয়ে যেতে এসেছে।" হাউইটি বল্লে। এবং সে মুখখানাকে এমন করে রইল যেন ও কতই ভাব্‌ছে। কিন্তু কেউই তা লক্ষ্য করলো না। অনেক পরে একজন তাকে দেখ্‌তে পেলো। "কী বিশ্রী এই হাউইটা?" সে বল্লে। তারপর সে তাকে একটা নর্দ্দামায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো।......

"বিশ্রী হাউই! বিশ্রী হাউই!" সে উঁচুতে উঠ্‌তে উঠতে বল্লে, "সুশ্রী হাউই, ওরা যা বল্‌তে চাইছে।" তারপর নর্দ্দামার কাদার ভেতরে এসে পড়্‌লো।

"এ জায়গাটা তেমন আরাম দায়ক নয়," সে বল্লে, "তবে এটা যে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং সেইজন্যেই ওরা আমায় এখানে পাঠিয়েছে।

বাস্তবিকই আমার নাড়ি ভুঁড়িগুলি একেবারে বেরিয়ে গেছে। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।"......

খানিক বাদে একটা ব্যাঙ সেখানে এলো। "গ্যাঙোর গ্যাঙ!" সে বল্লে, "কাদার মত সুন্দর জিনিস আর পৃথিবীতে নেই। বর্ষাকাল আর একটা নর্দ্দামা পেলেই আমি সুখী।"

"আমার কথায় কান দাও।" হাউই বল্লে। তারপর সে তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে কাশ্‌তে আরম্ভ করলো।

"ওঃ তুমি দেখছি একজন নতুন লোক!" ব্যাঙটি বল্লে, "তা তোমার গলাটিতো বেশ মিষ্টি বাপু! অনেকটা আমাদের মতই। আমাদের ডাক নাকি এত মিষ্টি যে সবাই সারাটি রাত ঠায় জেগেও তা শোনে। সেদিন একটা চাষার বৌকে এই রকমই বল্‌তে শুনেছি।"

"আমার কথায় কান দাও।" হাউইটি এবার বিরক্তভাবে বল্লে। কেননা এ পর্য্যন্ত সে একটা কথাও বলতে পারেনি।

"বাস্তবিকই তোমার গলার স্বরটি ভা-রী মিষ্টি!" ব্যাঙটি বল্লে, "আশা করি শিগ্‌গিরই তুমি আমাদের পুকুরটিতে আসছ? কিন্তু আমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে। সেখানে আমার ছয়টি সুন্দরী কচি কচি মেয়ে আছে, আর তাদের সব সময়ে আমাকেই আগ্‌লাতে হয়। কেননা কতকগুলি মাছ আছে তাদের আবার ব্রেকফাষ্ট সম্বন্ধে কোন বাচ বিচারই নেই। তারা আমার বাছাদের দেখ্‌তে পেলেই খেয়ে ফেলবে। আচ্ছা তা'হলে আজ আসি কি বল? তা তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে খুবই আনন্দ পেলাম।"

"একে কথাবার্ত্তা কওয়া বলে না," হাউই বল্লে, "সমস্ত সময়টাই তুমি একাই কথা বলে কাটিয়ে দিলে।"

"কেউ নিশ্চয়ই শুনবে," ব্যাঙটি বল্লে, "কেননা আমি নিজেই কথা বল্‌তে ভালবাসি। এতে অনেক সময়ও বাঁচে, আর কোন তর্কও উঠ্‌তে পারে না।"

"কিন্তু তর্ক করতেই আমি ভালবাসি।" হাউই বল্লে।

"আর আমি তা একেবারেই পছন্দ করি না।" ব্যাঙটি বল্লে, "সভ্য সমাজের লোকরা বলে, তর্ক হচ্ছে একটা বিশ্রী জিনিস। আচ্ছা এবারে আসি। গুড্‌বাই!" ব্যাঙটি সাঁতরে চলে গেল।

"তোমার মত স্বার্থপর লোককে আমি ঘৃণা করি।" হাউই বল্লে, "স্বার্থপরতা হচ্ছে একটা জঘন্য জিনিস, বিশেষ করে আমার মত একজন লোকের কাছে। কেননা আমি হচ্ছি একজন, যাকে বলে দয়ালু ব্যক্তি। তোমার উচিত আমার আদর্শ মেনে নেওয়া। চরিত্র সংশোধনের এমন একটা সুযোগ হারানো কখনই তোমার উচিত নয়। কিন্তু শিগ্‌গিরই আমাকে রাজবাড়ী ফিরে যেতে হচ্ছে। সেখানে আবার সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা

করে বসে আছে কিনা! সেখানে আমার সম্মানের জন্যে আজ রাজপুত্রের বিয়ে হ'ল। অবশ্য তোমরা গেঁয়ো লোক তার কিছুই বুঝ্‌বে না।"

"এখন বলে আর লাভ নেই," একটা মাছি বল্লে, "সে অনেক্ষণ চলে গেছে।"

"তাতে তারই ক্ষতি, আমার নয়," হাউই উত্তর করলো। "সে আমার কথা শুনলো না তো বয়েই গেছে! আমি নিজের কথা নিজে শুনতে খুব ভালবাসি। যদিও সময় সময় আমি নিজের কথা নিজে এক বর্ণও বুঝতে পারি না।"

"তবে তুমি তোমার পাণ্ডিত্যের বর্ণনা করতে থাক," মাছিটি বল্লে। তারপর সে উড়ে চলে গেল।

"এরকম ভাবে চলে যাওয়াটা ওর পক্ষে নিতান্ত একটা বোকার মত কাজ হয়েছে।" হাউই বল্লে, "চরিত্র সংশোধণের এমন একটা সুযোগ নিশ্চয়ই ও আর পাবে না। যদিও আমার তাতে কিছুই আসে যায় না। যাক্ গুণগ্রাহী লোক একদিন নিশ্চয়ই আমার মূল্য বুঝবে।" তারপর সে কাদার ভেতর আরও একটু ঢুকে গেল।.. ...

"প্যাঁক! প্যাঁক! প্যাঁক!" একটা হাঁস তার কাছে এলো। "বলি তোমার চেহারাটাই এমনি, না কোন দুর্ঘটনার ফলে এমনি হয়েছে?" সে তাকে প্রশ্ন করলো।

"তুমি দেখ্‌ছি নিতান্তই একজন গ্রাম্য লোক," হাউই বল্লে, "নইলে নিশ্চয়ই জানতে চাইতে না, আমি কে। যাক্ তোমার মূর্খতাকে আমি ক্ষমা কর্‌লাম। কেননা আমার মত বুদ্ধি বিদ্যে তো আর সকলের নেই! তুমি শুনে অবাক্ হবে যে, আমি আকাশে উঠ্‌তে পারি, আর নেমে আসি অজস্র সোণালী বৃষ্টি ধারার ভেতর দিয়ে।"

"আমি ওসব বাজে কাজের ধার ধারি না," হাঁসটি বল্লে, "যদি তুমি বলদের মত জমি চাষ করতে পারতে তবে সেটা একটা কাজের মত কাজ হতে পারতো।"

"তুমি হচ্ছ একজন নীচ জাতিয় লোক," হাউই গর্ব্বিত ভাবে বল্লে, "আর ওসব কাজ তোমাদেরই পোষায়। আমার অনেক বড় বড় কাজ করবার আছে। ওসব নীচ কাজ তাদেরই জন্যে যাদের পৃথিবীতে করবার আর কিছু নেই।"

"তা বেশ, বেশ!" হাঁসটি বল্লে। সে একজন নির্ব্বিবাদি লোক। "সকলেরই ভিন্ন, ভিন্ন রুচি। তা তুমি এখন এখানেই বাস করবে নাকি?"

"নিশ্চয়ই না," হাউই বল্লে, "আমি এখানে বেড়াতেই এসেছি। এ জায়গাটা আমার কাছে নিতান্ত বিরক্তি কর ঠেক্‌ছে। এখানে না আছে সমাজ না আছে কিছু! না, এখানে আমি মোটেই থাকৃতে আসিনি। শিগ্‌গিরই আমাকে রাজবাড়ী ফিরে যেতে হবে। আমি জানি আমি জগতে একটা মস্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে যাবো।"

"আমি একবার জনসাধারণের কাজে মন দিয়েছিলাম," হাঁসটি বল্লে, "সেখানে মস্ত বড় একটা সভায় আমি নেতার আসন গ্রহণ করেছিলাম। সমাজের অনেক দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনাও সেখানে হয়েছিল। কিন্তু কাজে তেমন কিছুই ফল হল না। কাজেই আমি আবার গার্হস্থ্য সংসারে মন দিয়েছি।"

"কিন্তু আমাদের জন্মই হচ্ছে জনসাধারণের জন্যে।" হাউই বল্লে, "আর——" কিন্তু হাঁসটি ততক্ষণ চলে গেছে।

খানিক বাদে ছু'টি ছেলে নর্দ্দামার ধারে এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতে একটা কেট্‌লি আর ছোট্ট একটা কাঠের বাণ্ডিল।

"এরা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে," হাউইটি বল্লে। তারপর সে মুখখানাকে যথা সম্ভব গম্ভীর করে রইল।

"দেখ্‌ ভাই, একটা পচা পুরোণো লাঠি!" একটি ছেলে বল্লে, "এটা এখানে কি করে এলো?" তারপর সে হাউইটিকে নর্দ্দমার থেকে টেনে তুল্‌লো।

"পচা পুরোণো! পচা পুরোণো!" হাউই বল্লে, "অসম্ভব! সোনায় মোড়ানো, ওরা যা বলতে চাইছে!"

"চল্‌ এটাকে জ্বালাই!" অন্য ছেলেটি বল্লে, "এক কেট্‌লি জল ফোটার পক্ষে এটা যথেষ্টই সাহায্য করবে।"

"কী মজা! ওরা আমাকে ছাড়্‌তে নিয়ে যাচ্ছে!" হাউইটি বল্লে, "পরিস্কার দিনের আলোতে সবাই এবারে আমায় দেখ্‌তে পাবে!" তারপর ছেলে ছু'টি কাঠগুলিকে এক জায়গায় জড় করে, তার ওপর হাউইটিকে রেখে আগুন ধরিয়ে দিল। হাউইটি ভিজে থাকাতে গরম হতে অনেক সময় লাগল। শেষটায় তাতে আগুন ধর্‌লো।

"আমি যাচ্ছি," হাউই বল্লে। এবং নিজেকে সে খুব শক্ত আর সোজা করে ধর্‌লো। "আমি জানি, আমি তারার চেয়েও অনেক উঁচুতে উঠে যাব, তারপর চাঁদের চেয়েও, সূর্য্যের চেয়েও, তারপর এত উঁচুতে উঠে যাব যে"—হু-উ-স্‌-স্‌! সে তীরের বেগে আকাশে উঠ্‌লো। "চমৎকার!" সে বল্লে, "আমি এমনি করে চিরদিনই উঠ্‌তে থাক্‌বো! উঃ আমার কী অসাধারণ কৃতিত্ব!"

কিন্তু দিনের আলোয় কেউই তা দেখতে পেলো না।......

হটাৎ সে ভেতরে একটা অদ্ভুত ভাব বোধ করলো।

"এইবার আমি ফাট্‌বো," সে বল্লে, "তারপর এমন একটা প্রচণ্ড শব্দ করে পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দেব, যাতে করে সারাটা বছর সবাই আমার কথা বল্‌বে।"

"দুম! দুম! দুম!" সত্যিই সে ফাট্‌লো। কিন্তু কেউই তা শুনতে পেল না, এমন কি সেই ছেলে ছু'টি পর্য্যন্ত না। তারা তখন ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো......

হাউইএর শেষ অবশিষ্ট লাঠিটা এসে একটা রাজহাঁসের পিঠের ওপর পড়্‌লো। সে তখন নর্দ্দামার ধারে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলো।

"ওমা কি হবে গো!" সে বল্লে, "লাঠি বৃষ্টি হচ্ছে যে!" তারপর সে জলের মধ্যে নেমে পড়্‌লো।

"জানি জানি," হাউইটি বল্লে, "আম পৃথিবীতে একটা মস্ত অনুভূতির সৃষ্টি করবই!"

তারপর সে শেষ নিশ্বাস ফেল্‌লো।......

Oscar Wildeএর "The Remarkable Rocket"—নামক গল্পের অনুবাদ।

হেমন্ত

শ্রীকালিদাশ রায়, বি. এ

গ্রীষ্মেরে চিনিতে পারি গরম বলিয়া,
নদী বুকে ছোটে বান বরফ গলিয়া।
আম জাম নারিকেল, ঝুলে গাছে গাছে,
কোকিল, দোয়েল, টীয়ে গান গেয়ে নাচে।

বর্ষারে কে-না চিনে,—পৃথিবীর প্রাণ,
মানুষের খাদ্য যাহা—সে যে তারি দান।
নদ নদী ভ'রে উঠে, ছাপায় দু'কূল
মাঠে মাঠে চাষ চলে, গাছে গাছে ফুল।

শরতের হাসি মুখ, সোণালী বরণ,
ধব্‌ধবে শাদা শাড়ী, অরুণ চরণ,
জ্যোছনায় খেলা করে শেফালীর বনে,
যে দেখিবে সেই তারে চিনে নেবে মনে।

শীত তো সবারই চেনা, হাড়ে হাড়ে বুঝি
গরম পোষাক আর লেপ কাঁথা খুঁজি।
দিবারাতি চারিধার কুয়াশায় ঢাকা,
সোণার জগত যেন ঘন মসি-মাখা।

সুখী যে বসন্ত ঋতু, তাও বোঝা যায়,
আরামে কাটাই কাল,—শীত গ্রীষ্ম নাই।
গাছে গাছে ফোটে ফুল, পাখী ডাকে বনে,
মধুর উৎসব জাগে মলয় পবনে।

কিন্তু হায়, প্রশ্ন ওঠে কার্ত্তিকের প্রাতে,
পরিচয় কৈ হো'লো হেমন্তের সাথে!
—গ্রীষ্মও কতক আছে, শীতও যেন কিছু,
উভয়ে লুকায় গিয়ে উভয়ের পিছু।

শিশির নোলক হ'য়ে তৃণ-নাকে ঝুলে,
রোদের প্রখর তাপ নেয় তারে খুলে।
শিরে শিরে হাওয়া বয়, গায়ে দেয় কাঁটা,
মধুর কিরণ লেগে তেতে ওঠে গা-টা।

মহামায়া মহাকালে দেছে আলিঙ্গন
শরত ও শীতের তাই এ মহা মিলন।
কত শান্ত, কত শিষ্ট, কত তৃপ্তি ভরা,
তাই আজ লাগে ভাল সারা বসুন্ধরা॥

গল্পের পূর্ব্বানুস্মৃতি

[শিশির ও লিলি যখন খুব ছোট ছিল তখন তাদের আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়ে, পরাস্ত হয়ে, তিক্তবিরক্ত হয়ে, বৈরাগ্যের বেশে তাদের মামা ব্রজেশ্বর বড়ুয়া পদব্রজেশ্বর হয়ে পায়ে হেঁটেই একদা ভূপর্য্যটনে বেরিয়ে পড়েন। তিলপরিমাণ ভাগ্‌নেদের তাল সাম্‌লাতে না পেরে, সামান্য শিশুপালের অত্যাচারে কাহিল হয়ে সভয়ে যিনি বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন, তিনি যে কি করে' শ্বাপদসঙ্কুল ঘোরতর অরণ্যানী অকাতরে অবলীলায় অতিক্রম করে' গেলেন, সেই এক বিস্ময়ের কাহিনী! আসামের জঙ্গল পার হয়ে বর্ম্মামুলুকে পৌঁছবার মাঝখানে তিনি যে কতো বিপদে পড়েছেন তা বলা যায় না! এমন কি তিনি ভয়াবহ নরখাদকদের কবলে পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। পাহাড়পর্ব্বত বনজঙ্গল একে একে উৎরে বর্ম্মার উত্তর সীমান্তে যে বর্ম্মী ভদ্রলোকের বাড়ী তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, ব্রজেশ্বর পৌঁছাবার দিনকয়েকের মধ্যে ম্যালেরিয়ার উৎপীড়ণে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। মরবার সময়ে তিনি ব্রজেশ্বরকে মৌলমীণের তাঁর জরাজীর্ণ অট্টালিকাটি দান করে' যান্। এবং বলে' যান্ যে সেই বাড়ীর কোনো এক গুপ্ত কক্ষে ধনসম্পদ লুকানো আছে, কিন্তু এর বেশী আর কিছু, নাভিশ্বাসের বাধায়, তাঁর মুখ দিয়ে বাহির হয় না। ব্রজেশ্বর অতঃপর মৌলমীণের সেই ধনসঙ্কুল রহস্যময় অট্টালিকার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন এবং আসামের তাঁর ভাগ্‌নেদের আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে' পাঠান। শিশির আর লিলি, দুভাইবোন, তারা পত্রপাঠ এই নতুন মাতুলালয়ে এসে পদার্পণ করে। শিশির একদিন অকস্মাৎ সিঁড়ির এক গোপন কক্ষ থেকে গুপ্তস্থানের নক্সাটা আবিষ্কার করে, মামা তার হাত থেকে তৎক্ষণাৎ সেটা কেড়ে নিয়ে, নক্সার হদিশমতো লুক্কায়িত ধন ভাণ্ডার নিজেই হাতিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হন। লিলি আর শিশির কী আর করবে—ইতিমধ্যে এরোপ্লেন থেকে প্যারাচুট-চ্যুত সমুদ্র গর্ভে জলমগ্ন একটি লোককে উদ্ধার করে' বসে। এবং এই লোকটি আর কেউ না, হংকংএর জেল থেকে পালানো দুর্দ্ধর্ষ বাঙালী দস্যু শ্রীমান্ বক্কেশ্বর আইচ্ স্বয়ং! এবং তিনি যে কী মৎলবে নিজেকে জলাঞ্জলি দিয়ে মৌলমীনে পা দিয়েছেন তাও পরে ক্রমশঃ জানা যায়। ঐ রহস্যময় অট্টালিকার গুপ্ত ধন ভাণ্ডারেই ওঁর লোভ! আরো জানা যায়, যে উনি লিলি-শিশিরের মামার মামা। ব্রজেশ্বর যে সময়ে, রাত্রির অন্ধকারে, টর্চ্চ্ আর প্ল্যান হাতে সেই গোপন কক্ষের গুপ্তস্থান আবিষ্কার করতে উদ্‌ব্যস্ত, আর এধারে যখন শিশির আর লিলি মামার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই ঘরে গিয়ে হাজির, সেই সময়ে হঠাৎ কোত্থেকে বক্কেশ্বর আইচ আবির্ভূত হয়ে ব্রজেশ্বরের হাত থেকে প্ল্যান্ আর টর্চ্চ্ কেড়ে নিয়ে তাদের সকলকে অন্ধকার ঘরে ফেলে রেখে উধাও হ'ন]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—ছয়—

মামার ওপরেও মামা আছে!

"মামার ওপরেও মামা আছে দেখ্‌ছিস্ তো লিলি!" শিশির লিলির কাণে কাণে বলে: "মামার মামারা আরো কতো ভয়ানক, ত্যাখ্!"

"ভগবাণও আছে দাদা!" লিলি ফিস্‌ফিস্ করে।

"হ্যাঁ, ভগবাণকে আর থাক্‌তে হোতো না, আর একটু হলেই গুলির চোটে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে যেতে হোতো। মামা যেমন করে' রিভল্‌ভার তুলেছিল! ভাগ্যিস—এই অন্য মামাটা—মামার স্কোয়াররুট্‌টা এসে পড়ল্ তাই রক্ষে!"

"লোকটা একটা জল্‌জ্যান্ত বিভীষিকা! কী বলো দাদা?"

"বিভীষিকা? বিভীষিকা কেন? একটুও বিভীষিকা না! অন্ততঃ আমার কাছে তো নয়! তবে হ্যাঁ, জল্‌জ্যান্ত বটে! আমিই তো আজ সকালে ওকে জল থেকে জ্যান্ত কর্‌লুম!

"তোমার একটুও ভয় করেনি?"

"একটুও না।"

"তবে কাঁপ্‌ছিলে কেন অমন করে?" লিলি জিজ্ঞেস্ করে।

"আমি কাঁপ্‌ছিলুম? আমি না তুই?" শিশিরের উল্‌টো চাপ।

"আমার হাত পা কাঁপ্‌ছিল!" লিলি সমস্ত দোষ অসহায় হাত পার ঘাড়ে চাপিয়ে দ্যায়।

"তাহলেই হোলো! আর তুমি আমাকে পেছন থেকে আঁক্‌ড়ে ধরে অমন করে' কাঁপ্‌তে থাক্‌লে—তুমিই হও আর তোমার হাত পাই হোক্—তখন না কেঁপে আমি করি কি?" শিশির নিজের অনুকম্পার কারণ দেখায়: "ভাগ্যিস্ তুমি পড়ে যাওনি—তাহলেই হয়েছিল আর কি! আমাকেও চীৎপাৎ হতে হোতো সেই সঙ্গে!"

লিলির আনুকূল্যে শিশিরের যে অবশ্যম্ভাবী অধোগতি ঘট্‌তে পারত, অথচ ঘটেনি—এবং ঘটনার বিষয়ে লিলির বিন্দুমাত্রও সহায়তা ছিল না—তার জন্যে লিলিকে দায়ী করায়, সে তার কি জবাব দেবে? সে চুপ করে' থাকে।

"কিন্তু যাই বল্, গু'লটুলির চলাচলের সময়ে অতো কাছাকাছি থাকা ভালো কি? এমন করে' আমার পিঠে লেপ্‌টে এক হয়ে থাকা তোর ঠিক হয়নি।"

শিশির বলে: "আমার আড়ালে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো হোতো।"

লিলি কিছু বলে না। তার অভিমান হয়ে যায়। তার কি দোষ? সে কি গায়ে পড়ে' দাদার পৃষ্ঠপোষকতা করতে গেছল? দাদাই তো তাকে আব্‌ড়ান্ করে' নিজের পৃষ্ঠা রক্ষা করেছিলেন! সে কথা এখন ওঁর মনে পড়ছে না! বা রে!

"যেমন পিঠ আঁক্‌ড়ে দাঁড়িয়েছিলি, গুলি ছুঁড়লে মজাটা টের পেতিস্! গুলিটা আমাকে ভেদ করে' তোর ভেতরে গিয়ে সেঁধতো! গুলিদের কি ভেদাভেদ জ্ঞান আছে? মেয়েছেলে বলে' একটুও খাতির করত না! সোজা ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত!"

যেত—যেত—লিলির যেত—দাদার কি? উনি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে গুলির যাতায়াতে কতটা বাধা-সৃষ্টি করেছিলেন, শুনি? নেহাৎ সেই জলজ্যান্ত বিভীষিকাটা ঠিক সময়ে এসে পড়ল বলেই না? তাই বলেই না ফাঁড়াটা অত সহজে কেটে গেল—ভুল পথ দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল ফাঁড়াটা?

লিলি গুম্ হয়ে থাকে। কোনো জবাব দ্যায় না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের নিরন্ধ্রতা বিদীর্ণ করে' খন্‌খনে কার স্বর ফেটে পড়তে থাকে—তাদের মামার আর্ত্তনাদ!

বক্কেশ্বর আইচ্ ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার হাত থেকে পিস্তল, প্ল্যান্ পরিশেষে টর্চ্চ্‌টা পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে পলায়ন করার পর, এতক্ষণ পরে, তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি উচ্চৈস্বরে হায় হায় করে' ওঠেন!

"যাক্, মামার কিছু হয়নি, বাঁচা গেল!" শিশির বলে: "এতক্ষণ ধরে' মামার কোনো সাড়্ না পেয়ে ভাবছিলুম মামাকে বুঝি সাবাড় করে' গেছে! কিন্তু এতক্ষণে—প্রত্যক্ষ না দেখা গেলেও শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে মামাকে।"

"হুম্—একেবারে না মেরে ফেল্‌তে পারলেও, মামাকে নিয়েও তো পিট্‌টান্ দিতে পারত লোকটা।"

"হ্যাঁ, মামা যা বহুমূল্য রত্ন একটি! কিন্তু লোকটার নিজের পিঠের ওপর টান্ আছে বলেই মামাকে নিয়ে পিট্‌টান্ দ্যায়নি! একটা মামার বোঝা তো বড় কম নয়!" শিশির হাসে।

"তার কাছে তো ভাগ্‌নের বোঝা!" লিলি বোঝাবার চেষ্টা করে: "মামা তো সেই লোকটার ভাগ্‌নেই তো!"

মামার কাতরোক্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলে। অন্ধকারের কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে যে তিনি অনুশোচনা করচেন ঠিক ঠাওর হয় না, তবু ওরই মধ্যে হাত্‌ড়ে মাত্‌ড়ে, শব্দের ধার আর ক্রন্দনের ধারা অনুসরণ করে' যারপর নাই বিলাপকারীর কাছাকাছি গিয়ে তারা দাঁড়ায়।

"মামা! মামা!" শিশির ডাক ছাড়ে।

"আর মামা!" ব্রজেশ্বরে বিক্ষুব্ধ আক্ষেপ: "তোদের জন্যেই আমার আজ এই সর্ব্বনাশ!"

"আমাদের জন্যে? আমাদের জন্যে কেন?" শিশির একটু বিস্মিতই।

"একদিকে তোরা—ভাগ্ নেবার ভাগ্‌নেরা। আরেক দিকে মামা—সাক্ষাৎ মামা! সর্ব্বস্ব নেবার মামা! দুদিকেই ভারী পাল্লা—আমি কোন্‌দিক্ সাম্‌লাই?"

"তা—আমরা কি কর্‌লাম?" শিশিরের বিমূঢ় প্রশ্ন।

"তোরা আর কি করবি? কিছুই করতে পারলিনে! মামাই স্বর্ব্বশ্বান্ত করে' চলে গেল!" ব্রজেশ্বরের আফসোস বাগ মানে না: "বাঘ এসে পড়লে বেড়ালরা কি কিছু করতে পারে? বেড়ালদের সুবিধা করতে দেবে—বাঘরা সে পাত্রই নয়! তারা নিজেরাই সব সাবড়ে দিয়ে যায়, বেড়ালদের জন্যে ছিটে ফোঁটাও রাখে না!"

"তাহলে—আমাদের কী দোষ?"

"তোদের আর দোষ কি? টর্চ্চ্ ফর্চ্চ্ কিছু আছে সঙ্গে?

"কিচ্ছু না!"

"তবেই হয়েছে! তবে এই অন্ধকারের গর্ভ থেকে কি করে' বেরুব আমরা?" মামার সুকরুণ কণ্ঠ। "পিস্তল টিস্তল আছে? তাও নেই? পিস্তল নেই টর্চ্চ নেই—বাছারা গুপ্তধনের সন্ধানে এসেচেন!—" মামার হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে যায়: "ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার। আব্‌দার দ্যাখো না কি রকম!"

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই, কাকে বলা যায় না, আস্পর্দ্ধার সেই জাজ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত দুটিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তিনি দেখাতে চান।

দেখাতে চান বটে, কিন্তু নিজে তিনি দেখ্‌তে পান্ না! নিদর্শন দুটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দর্শন পেলে এই দণ্ডেই এইসা এক চড় কসিয়ে, মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কার্পণ্য হোতো না।

—সাত—

অন্ধকারের বিভীষিকা!

"কেন, পিস্তল না থাক্‌লে কী হয়?" লিলি জান্‌তে ব্যগ্র হয়ে ওঠে: "পিস্তল থাক্‌লে কী হোতো মামা?"

"চাম্‌চিকেরা এই অন্ধকারের মধ্যে কি রকম ফর্ ফর্ করছে দেখ্‌চিস্‌নে? না দেখ্‌লেও, শুন্‌তে পাচ্ছিস্ তো? গায়ে মুখে এসে ঝাপটা লাগালেই হোলো! পিস্তল থাক্‌লে এক্ষুণি ওদের ফর্‌ফরাণি বন্ধ করে' দেয়া যেত। একটি আওয়াজ করলেই—ব্যাস্! গুড়ুম্ শুন্‌লেই, দুদ্দাড়্ করে' পালিয়ে যেত সব।

"জানিস্ তো লিলি, ওরা ভারা চুল ছেঁটে নেয়, ওই চাম্‌চিকেরা। মাথায় এসে ঝাপ্‌টালেই বুঝ্‌বি, খানিকটা চুল খুব্‌লে নিয়ে গেছে—!" শিশিরও উড্ডীয়মান ওই দুরন্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে পারে না।

লিলি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, মাথায় হাত চাপা দিয়ে নিজের কেশদাম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। খুব্‌লে নিলেই হোলো আর কি? চুলের দাম নেই? আঙুল-ঢাকা দিয়ে চুল বাঁচিয়ে লিলি মামার বিশাল বগলের তলায় এসে মাথা বাঁচাতে চায়,—এই অন্ধকারে ওই চক্রাকারে উড়ন্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার এ ছাড়া আর কী উপায়?

"অন্ধকার পেলেই চাম্‌চিকেরা ফর্ ফর্ করবে এ তো জানা কথা।" মামা উদাহরণ সহযোগে অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন: "গণ্ডুষ জল মাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে!"

শাস্ত্র বাক্য থেকে নজিরের পঙ্কোদ্ধার না করে' তিনি পারেন না।

"এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করা যাক্, এসো মামা!" শিশির বলে: "কিন্তু দরজাটা কোন্ দিকে, তোমার মনে আছে?" আমন্ত্রণ করার সাথে সাথেই মামার মন্ত্রণার তার প্রতীক্ষা।

"আরে তাই যদি মনে থাক্‌বে তাহলে তো কোন্ কালে বেরিয়ে পড়তুম! তোদের জন্যে কি অপেক্ষা করতুম নাকি? এক মিনিটের জন্যেও দাঁড়াতুম না তাহলে!" মামা বলেন: "এই বিচ্ছিরি অন্ধকার আর ভ্যাপ্‌সা গন্ধের মধ্যে কি এক মিনিটও দাঁড়ানো যায়?"

একটু থেমে মামা আবার বলেন: "কেন, তোদের মনে নেই? তোরা তো এই মাত্র

এলি ? পথ দেখে আসিস্‌নি ? এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছিস্‌ ? এই মেমারি নিয়ে কি করে' যে তোরা পরীক্ষা পাশ করবি তাই ভাবি।''

মামার সমালোচনার ধারা ক্রমশই উগ্র হতে উগ্রতর হতে থাকে।

"আমরা কি আর পথ দেখে এসেছি। আমি তো চুইং গামের চিহ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলাম।'' শিশির বলে।

"আর আমি তো দাদাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেচি।'' বিনা জিজ্ঞাসাতেই লিলি নিজের জবাব দিয়ে দ্যায়—আগে থেকেই !

"মাথা কিনে নিয়েচ ! এই জন্যেই না বলে যে যম জামাই ভাগ্‌না তিন না হয় আপ্‌না—মিথ্যে কথা বলে কি ? ভেবে দেখ্‌লে, তিনটেই অপদার্থ !''

"বারে ! তোমার নিজের বাড়ী ! এর ঘর দোর সবই তোমার মুখস্ত—আর তাই যখন তোমার নিজেরই মনে নেই তখন আমরা তো আজ্‌কের ছেলে ! আজ্‌কেই তো এই বাড়ীতে পা দিলুম ! আমাদের মনে থাক্‌বে ?''

"আমার কি করে' থাকে, শুনি ?'' মামার ঝাঁঝালো আপত্তি : এই ঘোরালো ঘরটা যে এই বাড়ীর ভেতরেই ছিল আমি জান্‌তামই না। প্ল্যান্‌ দেখে দেখে তো এলাম। তারপর যখন এক মনে গুপ্তস্থানটা খুঁজে বার করছি তখন তোরা এসে গোলমাল কর্‌লি—তখনো হয়তো বার-পথের একটা আন্দাজ ছিল তারপর সেই হতভাগা মামাটা এসে সব গুলিয়ে দিল। ক'বার এগুলাম, ক'বার পেছুলাম,—কতবার ঘুর্‌পাক খেয়েছি—কিছু কি ছাই মনে আছে ? তারপর এখন তো ঘুট্‌ঘুট্টি আঁধার ! মামাটা এমন বেয়াক্কেলে যে টর্চ্চ্‌টা পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে।'' ক্ষণেক থেমে আবার তাঁর আক্ষেপোক্তি হয় : "প্ল্যান্‌টাও ছাড়েনি।''

"সেজন্যে তুমি আফ্‌সোস্‌ কোরো না মামা ! ওর খর্পর থেকে তোমার প্ল্যান্‌ আমি উদ্ধার করে' আন্‌ব ! তোমায় দেব এনে, তুমি দেখে নিয়ো—দুঃখ কোরো না তুমি ! কেবল একবার ওর দেখা পেলেই হয়।'' শিশির বলে : "কিন্তু যাই বলো মামা, তোমার মামাটি গ্র্যাণ্ড্‌।''

"গ্র্যাণ্ড্‌ ? কেন গ্র্যাণ্ড্‌ ? কিসের জন্যে গ্র্যাণ্ড্‌, শুনি ?'' মামা ভারী খাপ্পা হয়ে যান্‌।

"মামার মামা তো এম্‌নিতেই গ্র্যাণ্ড্‌ মামা, তাই নয় কি ? আপনা থেকেই তো গ্র্যাণ্ড্‌ ?'' শিশির শুধ্‌রে নিতে যায় : "বাবার বাবা যেমন গ্র্যাণ্ড ফাদার্‌ !''

'হুঁঃ ! মামারা কক্ষনো গ্র্যাণ্ড হয় না ! মামার মামা হলেও না। ভারী বদ্‌ হচ্ছে এই মামারা, বলে' দিতে পারি।'' মামা বলে' দ্যান : "ভাগ্‌নেদের চেয়ে কোনো অংশে কিছু কম খারাপ নয়।''

মামার এই ব্যাখ্যানাও বরং সহ্য হয়, কিন্তু চাম্‌চিকেদের ঝড় ঝাপ্‌টা কতক্ষণ সওয়া যায় ? শিশির অস্থির হয়ে উঠ্‌ল—যে করেই হোক্‌, অন্ধকারের চক্রব্যূহ থেকে বার হতেই হবে।

এই মুক্তির অভিযানে সে নেতৃত্বপদ নেয়, লিলি তার অনুগামিনী হয়—এবং মামাও শোক সম্বরণ করে' তাদের পিছু নিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

কিন্তু দরজা যে কোন ধারটায়, তার হদিশ পাওয়া যায় না। এ কোণে ধাক্কা খেয়ে, ও কোণে ঢুঁ মেরে, ইঁদুরদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দেয়ালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, অবশেষে, এক ধারে উঁচু শান্‌-বাধানো একটু জায়গা পেয়ে, হতাশায় ক্লান্ত হয়ে ওরা বসে' পড়ে।

শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে : "না, এই গোলোক ধাঁধাঁ থেকে আজকে আর বার হওয়া যাবে না। রাত্রের মত এখানেই থাক্‌তে হবে দেখ্‌ছি !''

"তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন এদশা হবে, আগে থেকেই আমি জানি !'' মামা গজ্‌গজ্‌ করেন।

"এই জায়গাটা একটু উঁচু রয়েছে ! শান্‌-বাঁধানোও আবার ! ইঁদুররা এতদূর উঠ্‌তে পারবে না আমার ধারণা। আয় লিলি, শুয়ে পড়া যাক্‌। গা গড়িয়ে জিরিয়ে নেয়া যাক্‌ একটু।''

"আমার ঘুম পাচ্ছে দাদা !'' লিলি জানায়।

"ঘুমোতে পারিস্‌। আমি পাহারায় জেগে থাকলাম। মামা তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো। কোনো ভয় নেই।''

"হ্যাঁ, ভয়ে তো আমি মারা যাচ্ছি কিনা ! কাঠ হয়ে রয়েছি, বল্‌তে কি !'' বল্‌তে বল্‌তে মামা লম্বা হয়ে পড়েন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাক্‌তে থাকে। লিলিরও নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে।

শিশিরের চোখে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে জেগে জেগে, আজ্‌কের সকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সে ভাবে। প্ল্যান্‌ উদ্ধার থেকে প্ল্যান্‌ হারাণো পর্য্যন্ত ! আর সেই জলজ্যান্ত লোকটার অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ! থানার গায়ে-লাগানো সেই পুরস্কার-ঘোষণার নোটিশ ! একটার পর একটা তার মানসপটে উদিত হতে থাকে।

পকেট থেকে বার করে' মাঝে মাঝে চুইংগাম্‌ মুখস্থ করে আর কি করে' দুর্দ্ধর্ষ বক্কেশ্বর আইচের কাছ থেকে প্ল্যান্‌ পুনরুদ্ধার করবে, এই নিয়ে মাথা ঘামায়।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—হঠাৎ একটু খুট্‌ ! ইঁদুররাই হয়ত ! আমল দ্যায় না শিশির।

কিন্তু একটু পরেই আবার খট্‌ খট্‌ খট !

শিশিরকে উঠে বস্‌তে হয়। ইঁদুরদের খট্‌খটি তো এত জোর হবার কথা নয় ! অন্য কারো খুঁটিনাটি হবে। ভূত—ভূতরাই নাকি ?

শিশির সভয়ে অন্ধকারের চারিধারে ধারালো দৃষ্টি চালিয়ে দ্যায়। এধার ওধার থেকে, অন্ধকার ফুঁড়ে, কালো কালো ছায়ামূর্ত্তিরা উঁকি ঝুঁকি মারবে, হয়ত বা কঙ্কালদেহীরা দেহি দেহি রবে এগিয়ে আস্‌বে—পুনঃপুনঃ তাদের হি হি হাসিও শুন্‌তে পাবে হয়ত, এই রকমটা প্রতি মুহূর্ত্তেই সে প্রত্যাশা করে। কিন্তু না, সেরকম কিছু দেখা যায় না।

অবশ্যি, একটু আগে সে, তন্দ্রার ঘোরে, তিনটি নরকঙ্কালকে করমর্দ্দনের অভিপ্রায়ে এগিয়ে আস্‌তে দেখেছিল—কিন্তু চট্‌কাটা ভেঙে যেতেই চোখ মেলে দ্যাখে, সব ফাঁকা ! ফাঁকি সব ! কোথ্‌থাও কিছু না !

এবারও দেখ্‌ল, কোথ্‌থাও কিছু নেই !

কিন্তু তথাপি সেই খুট্‌—খাট্‌—খুট্‌ ! খুট্‌খুট্‌নি বেড়েই চলে ক্রমশঃ—

খুট্‌—খাট্‌—খটাং !

এবার যেন দূরে—খুব দূরে—অন্ধকার বিদীর্ণ করে' এক ফালি আলোর মতো কী যেন ঘোরাফেরা করছে বলে' বোধ হয়।

আলেয়া নয় তো ?

ভূতেরা—খুব সম্ভব মেয়ে-ভূতরাই—অনেক সময়ে আলেয়ার ছদ্মবেশে আসে বলে' শিশিরের শোনা আছে। সে নড়ে চড়ে বসে। তার বুক দুর্ দুর্ করে! লিলির পায়ে পা ঠেকিয়ে ছুঁয়ে থাকে।

লিলির ঘুম ভাঙানো ঠিক হবেনা, ভয় পেয়ে যাবে ছোট বোন্—আর,—আর মামার ঘুম ভাঙাতেও তার সাহসে কুলোয় না!

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে ভূতের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে।

সেই ভৌতিক আলোটা এবার এগিয়ে আসে। এসে এক জায়গায় থাকে। চারধারে কী যেন খুজে ফেরে। এগোয়, একটু এগোয়, আবার থামে। অবশেষে একটা দেয়ালের গা-ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায়।

দেয়ালে ধাক্কা-খাওয়া আলোর প্রতিচ্ছায়ায় চারধারের আশপাশ ঈষৎ একটু আভাময় হয়ে ওঠে। তার আব্ছায়ায়, আলোর আড়ালের ছায়ামূর্ত্তিটিকে এবার দেখা যায়। ছায়ামূর্ত্তি হাত পা নাড়ছে, বেশ স্পষ্ট করেই শিশিরের চোখে পড়ে এবার।

শিশিরের কৌতূহল এবার তার ভয়কেও ছাপিয়ে ওঠে। আলো হাতে, এ আবার কিরকম ভূতরে বাবা? ভূত, কিম্বা, ভূতের ছদ্মবেশে অন্য কোনো গুপ্ত-রত্ন-সন্ধানী? গুপ্ত-ধনের অভিলাষী দুঃসাহসী আর কেউ?

জান্বার অভিপ্রায়, (এবং বাধা দানের মতলবেও), শিশির মুখের চুইগাংম্টা বার করে' তাক্ করে' সেই ছায়ামূর্ত্তিটিকে ছুড়ে মারে।

গায়ে লাগ্তেই ছায়ামূর্ত্তিটি চেঁচিয়ে ওঠে: "ইস্! এ আবার কিরে বাবা? কোথ্থেকে এল? য়্যাঁ? কোনো ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি?"

ছায়ামূর্ত্তিটি বিচলিত হয়।

শিশির আরকটা চুইংগাম্কে রসায়িত করে' কসে' লাগায়।

"ইস্! কি এগুলো! ভারী ল্যাট্ প্যাট্ করছে! টেনে ছাড়ানো যায়না—কীরে বাবা! চট্চটে দেখ্ছি আবার!"

ছায়ামূর্ত্তিটি আপনমনেই মন্তব্য ঝাড়ে।

শিশির ক্ষান্ত হয় না, একটার পর একটা, অশ্রান্তভাবে ছুড়ে ষায়!

ছায়ামূর্ত্তিটি ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে। এগুলো গায়ে লাগে, পিছুলে পায়ে লাগে, কা করবে ভেবে পায় না। ভারী মুস্কিলে পড়ে যায়। অথচ, কোথ্থেকে যে ওইসব চট্টোপাধ্যায়রা এসে পড়ছে কিছুই বুঝ্তে পারে না।

যেখানেই পা ফ্যালে, চুংইগামে পা আট্কায়—পা তোলা, এবং তুলে পুনরায় ফেলা দুরূহ হয়ে পড়ে—যেদিকেই এগোয়, পা আট্কাতে আট্কাতে যায়। এক পা তুলে ছায়ামূর্ত্তিটি খানিকক্ষণ ভাবে—তারপর সে আপ্না থেকেই বলে ওঠে:

"বুঝেছি! এ হচ্ছে যখের ধন! যক্ষেরা সব আগ্লাচ্ছে একে। রাত্রির বেলা ওদের চোখের সাম্নে থেকে বাগানো যাবেনা।—ইস্! এবার একটা আমার নাকের ওপর! চট্চটে লট্পট্ সিং কারা এরা—বলতো?"

বল্তে বল্তে কারো কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের কোনো অপেক্ষা না করে দুপ্ দাপ্ করে অন্ধকারের মধ্যেই সে দৌড় মারে।

ক্রমশঃ

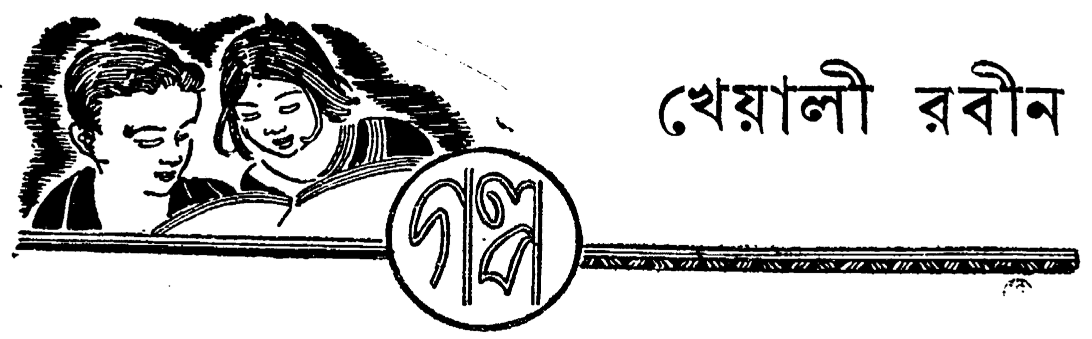

খেয়ালী রবীন

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

দূর থেকে দেখলেই রবীনকে চেনা যায়। বেঁটে খাটো কালোকোলো খাঁদা নাক চেহারা একমাত্র রবীনেরই ছিল। চিরকাল সে রীতিমত দাঁত মেজে আসছে, কাজেই দাঁত বের করে হাসতে তার এতটুকু লজ্জা করে না।

কতগুলো অদ্ভুত ব্যবহার ছিল তার। ভদ্রপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সে ফুটবল খেলবে না—কিন্তু দুপুর বেলা যখন সামনের ধূ ধূ করা মাঠের ঝাউয়ের ছায়ায় ছায়ায় রাখালেরা এসে জড়ো হয় পাচন হাতে, রবীন চলে ডাণ্ডাগুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে। তেলোয় গুলিটা রেখে পাঁচের মার মারা কিংবা মুটহাতের উপর গুলি রেখে চার মারতে যেমন সে ওস্তাদ তেমনি খেলায় খেলোয়াড় সাজাতেও সে নিপুণ।

সেবার এক পাদ্রী সাহেব মাঠ দিয়ে যেতে ওদের খেলা দেখে খেলার নাম জিজ্ঞাসা করলে রবীন উত্তর দেয়—'ভারতীয়দের দেশীয় ক্রিকেট'।

রবীনের হাতখানা দেখলে আর এই দেশী ক্রিকেটের উপর লোভ থাকে না। আঙ্গুলগুলোতে ডাণ্ডার মার লেগে কোনটা থেঁৎলে গেছে কোনটা বা গেছে বেঁকে। কপালের উপর মস্ত দাগ ঐ ডাণ্ডাগুলি খেলতে গিয়েই। আর ঐ ছোঁড়াদের সঙ্গেই সে খেলবে হাডু-ডু।

কেউ রাখালদের সম্বন্ধে কিছু বললে, ও বলে কি,—'যা, যা, ওরা ছোট লোক হতে পারে কিন্তু বড়লোককে ঘৃণা করে না, ওরা রাগতে জানে কিন্তু ঝগড়া করে না, ওরা কায়দা জানেনা কিন্তু খেলতে জানে, ওরা খেলাপড়া করেনা কিন্তু কাজ করতে জানে। আর তোরা বড়লোক নস্ অথচ ছোটলোক বলিস ওদের—ফুটবল খেলিস কিন্তু সেই পাঁকাটি হয়েই থাকলি, লেখাপড়া করিস কিন্তু আল্সের গুরুঠাকুর।'

যেমন বাইরে তেমন স্কুলে। কেন, রাজেন কি মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করে না! এই সেদিনও রাজেন দস্তুরমত ইতিহাসের মাষ্টার অন্নদা বাবুকে কেমন ভেঙচী কেটে বেরিয়ে এল। হেডমাষ্টার ভোলানাথ বাবু তাকে ত' কিছুই বল্লেন না! বলবেন কি করে, রাজেন যে ভীষণ সেয়ানা, মাথাটা ঠিক রেখে তবে হাত পা গুলোতে হাত দেয়। হেডমাষ্টারকে সে তোষামোদ করতে জানে। আর রবীন ঠিক তার উল্টো।

রবীন সব ছেলের প্রধান শিকার পণ্ডিতকেই করে ভয় আর হেডমাষ্টারের টিকি কাটতেই সে যায় এগিয়ে। হ্যাঁ, হেডমাষ্টারের টিকি সেবার কেটে দিয়েছিল ঐ রবিনই ত'। সে কথাটা তা হলে বলা যাক্।

রবীনের মনটা চিরকাল কেমন যেন বিভিন্ন খেয়ালে চলতে থাকে। একবার খেয়াল

হল সে টিকি রাখবে। টিকি রাখবে সে হেডমাষ্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এই মতলব করে সে বেশ এক দলও গড়ে তুলল। সঞ্জয়, শিবু, হরি, বিপিন আর রবীন এই পাঁচজনে এক টিকিওয়ালার দল তৈরী করে। পাঁচজনে এক জোটে টিকি রাখতে আরম্ভ করে। রবীনই দলের সর্দ্দার। রবীন তুবেলা চিরুণী দিয়ে টিকি আঁচড়ে আবার বেঁধে রাখে। কোন দিন বা জবাফুল গুঁজে এল স্কুলে। ছেলেরা হাসতে চেষ্টা করে কিন্তু রবীনের আগুন চোখের দিকে তাকিয়ে তারা হাসতে সাহস করে না। রবীন পড়াশুনায় ভাল না হতে পারে কিন্তু ছেলেদের পিঠে হাত চালাতে কসুর করেনা সে।

রামপদ মাষ্টার সেদিন বলছিলেন সেই কথা। রবীন খুব বিনয়ের সঙ্গে বললে—স্যার, রেষারেষির কথা হচ্ছে না তবে বলতে হবে বলে বলছি, যে হুসেন যদি টুপীটাপী পরে আসতে পারে তবে আমি টিকি রাখতে পারব না কেন—আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে স্যার এই কথা বল্লেন!

রামপদ বাবু কিছু বলেন না। রবীনের এক দোষ ছিল—ঠিক রামপদ মাষ্টারের ক্লাশে সে ঘুমে ঢুলে পড়বে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। রবীনের ঘুম আবার আজব রকমের। ঘুমুতে ঘুমুতে মাথাটা যখন হেলে পড়ে তখন তার ঘুম ভেঙে যায় আর এই ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে সে পাশের ছেলেকে ডেকে বলে—'আমার মাথাটা ধর্‌ত রে।' চোখে তখনও তার কিন্তু ঘুম আছে।

আজও রবীন ঘুমিয়ে পড়ল। রামপদ মাষ্টার আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে তার টিকিটা টেনে ধরলেন। ব্যস্‌ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে রবীন বল্লে,—এ অন্যায়!

রবীন সুমুখে চেয়ে দেখে রামপদ বাবু মিটি মিটি হাসছেন আর বলছেন,—এখন আর মাথা ধরতে হবেনা রবীন, আসল বস্তু পাওয়া গেছে।

পরদিন রামপদবাবুর ক্লাশে এক সোরগোল পড়ে গেল। রামপদ পড়াচ্ছেন—রবীনেরও ঢুলুনী নিয়মিতই আসছিল! এমন সময়—

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং রিং রি-রিং, ক্রিং—

সবাই রবীনের দিকে তাকায়। রবীনের তখন ঘুম ভেঙে গেছে।

সমস্ত ক্লাশটা হাসির চোটে ফেটে পড়ল। রামপদ বাবুও হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

রবীন ইয়া-বড় এক টেবিল-ক্লক হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে বসে আছে ঠিক যেন রিষ্ট-ওয়াচ হাতে বেঁধেছে।

রামপদ বাবু সেই টেবিল ক্লক-রূপ অতিকায় রিষ্টওয়াচ দেখে হেঁকে বল্লেন—ও কি?

রবীন দেঁতো হাঁসি হেসে বলে—এলার্ম দিয়ে রেখেছিলুম স্যার যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি।

হরিনাথ বলল—তাই বলে ক্লক বেঁধে আনতে হবে নাকি?

রবীন ধমকে বলল—যাঃ যাঃ হাঁদা কোথাকার এলার্মিং ক্লক বাঁধব না তবে এলার্মিং রিষ্টওয়াচ পাব কোথায়?

বরেন বল্লে—ভারী লাগে না তোর!

'তোদের মত ট্যালকম্‌-পাউডার-ঘষা শরীর কিনা! জানিস্‌ যারা জোয়ান তারা বাঁশের লাঠিই হাতে নিয়ে চলে, ছড়ি ঘুরোয় না রোগা পট্‌কা বাবুদের মত।'

ঘড়ি তখনও বাজছিল—

রামপদ বাবু ক্লাশের গোলমালের ভেতরই হেঁকে বল্লেন—চোপ্‌ তোমার ঘড়ি থামাও বাক্যবাগীশ কোথাকার।

এ পৃথিবীতে বাস করবার পক্ষে এক মস্ত বিপদ হচ্ছে সকলেরই শত্রু জোটে; নতুবা পৃথিবীটা বোধ হয় থাকবার পক্ষে নেহাৎ মন্দ যায়গা নয়। অন্ততঃ আর যাই হোক স্বর্গের মত এখানে এক ঘেয়ে কেবল দেবতারাই থাকে না। তাই রবীনেরও শত্রু জুটল।

একদিন হঠাৎ চেঁচামেচি করে প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে রবীন হেড্‌ মাষ্টারের কাছে নালিশ করে বসল—স্যার, আমার টিকি কেটে নিয়েছে—

হেড্‌ মাষ্টার নিজের টিকিতে হাত দিয়ে বিস্ময়ে বল্লেন—

—তোমার টিকি, কেমন টিকি!

রবীন এবার বেকু'ফ্‌ বনে যায়। সে কেমন করে বোঝাবে টিকির বিবরণ, হেড্‌ মাষ্টারের নজরে কি পড়েনি তার সুবিখ্যাত টিকি, যে টিকি এই নারায়ণপুরের ছাত্রসমাজে এক যুগান্তর এনেছে! রবীন বল্লে—

আজ্ঞে, ইয়ে, সেই মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ কাঁচা চুল. বাঁধা—সেই যাতে আমার জবাফুল ঝুলত!

হেড্‌ মাষ্টার বল্লেন—হুম্‌, কে ছিঁড়েছে!

'আজ্ঞে ছেঁড়েনি, লোপাট করেছে—কে তা জানি না, জানলে ত আর নালিশই করতুম না আমি!

—তা হলে ক্লাশে যাও, হাতে হাতে ধরতে পারলে আমার কাছে নিয়ে এস—

আজ্ঞে তাহলে কি আমি টিকি পাব না?

হেড্‌ মাষ্টার কড়া হুকুম দিয়ে তাঁকে থামালেন!

রবীন ক্লাশে এসে পণ্ডিতের কাছে তুঃখ প্রকাশ করে বল্লে,—স্যার, টিকির মর্য্যাদা আর রইল না—এটা নিশ্চয়ই ঘোর কলি। পণ্ডিত নিজের টিকির বাঁধনটা খুলে আবার বাঁধন কসে বল্লেন—যা বলেছ, সনাতন ধর্ম্ম আর থাকবে না।

রবীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

একদিন যায়, তুদিন যায় স্কুলের প্রাঙ্গণে গাছে গাছে বিজ্ঞাপন ঝুলে গেল—

'সাবধান, টিকি চোর নিকটেই আছে;
ছাত্রগণ দলবদ্ধ হও এই দারুণ তুর্য্যোগের দিনে।'

তবে, টিকি-চোরের উৎপাতটা তেমন বোধ হল না। রবীনের দলের সবাই নিজেদের টিকি কেটে ফেলল কি জানে টিকি-চোর যদি তাদের মাথাতেও কাঁচি বসায়!

সেদিন টিফিনের সময় হেড মাষ্টার রবীনদের ক্লাসে এসে বই খুলে পড়াবার আগে অন্যান্য দিনের মত টিকিতে হাত বুলিয়ে নিতে যাবেন—হঠাৎ হাতের সঙ্গে টিকি-টা খসে এল। হেড মাষ্টার ঝরে পড়া টিকির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলেন। মাথাতে হাত ঘসে দেখেন সেখানে সুজীর-আঠা মাখান।

হেড্ মাষ্টার চোখ বড় বড় করে বল্লেন,—কে করেছে !

রবীন নিশ্চিন্তে বসে হেড মাষ্টারের সেই মুখের চেহারাটা কাগজে আঁকছে আর মাঝে মাঝে পেন্সিলের পেছনটা দাঁতে কামড়াচ্ছে। এমন সময় হাঁউ মাউ করতে করতে রামভরণ দপ্তরী কেঁদে এসে হেড্ মাষ্টারের কাছে বলে—বাবু হাম্‌কো ভি—

রামভরণ আর বলতে পারে না। হাতের তেলোতে তার কাটা-টিকি বের করে হেড্ মাষ্টারকে দেখায়। হেড্ মাষ্টার তাঁর নিজের কাটা-টিকিটা পকেটে পুরে বল্লেন—তুই, কি করছিলি তখন ?—

হৈ চৈ আরম্ভ হল, গোলমাল, একটা যেন যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়েছে এমনি মনে হল। সমস্ত মাষ্টার এবং ছাত্রেরা এসে জুটল। পণ্ডিতও এলেন তাঁর টিকি টানতে টানতে —দেখছিলেন তাঁরটা জোড়া দেওয়া না একেবারে মস্তিষ্ক প্রসূত ! রামপদ বাবু হেড্ মাষ্টারকে বল্লেন—টিফিন ঘণ্টার আগেও ত' আপনার টিকি জ্যান্তই ছিল দেখতে পেয়েছিলুম বলে মনে হয় !

হেড মাষ্টার বল্লে—হ্যাঁ তা ছিল ; এই টিফিনের ভেতরেই কাণ্ডটা হয়েছে। অপরাধের ভেতর মশাই টিফিন ঘণ্টায় বৈঠকখানা ঘরে ইজিচেয়ারে একটু কাৎ হয়েছিলুম—এরই ভেতর এত কাণ্ড। এখন ত' দেখছি রবীনের টিকি চুরির ব্যাপারটা খুব মিথ্যে নয় !

রবীন এগিয়ে এসে বল্লে—আজ্ঞে না স্যার।

কালীপদ মাষ্টার (ডাক নাম বি, এস্-সি) চশমার ফাঁক দিয়ে রামভরণের টিকির দিকে তাকিয়ে বল্লেন—রামভরণের হাতের টিকিটা হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বলে মনে হচ্ছে না ! অমন মিহি চুলের সুদৃশ্য টিকি রামভরণের বলে ত' মনে হয় না !

সকলের নজর গেল টিকির দিকে—তাইত, তাইত ! হেড্ মাষ্টার কাটা টিকি পকেট থেকে বের করে দেখেন তাঁরটা রামভরণের ! গন্ধ শুঁকে দেখেন সেটাতে সর্ষের তেল, কেরাসীন আর নারকেল তেল এমন কি তামাক-গাঁজা আলকাতরা প্রভৃতির এক মিশ্রণ বিকট গন্ধ। টিকি বদলে গেছে। রামভরণ সন্ত্রস্ত হয়ে'পড়ে প্রভুকে সম্মান দেখাবার জন্যে তাঁর সেই মড়া টিকিটাকেই বার বার করে সেলাম ঠুকতে থাকে।

রবীন পণ্ডিতকে বলছিল—এ যে হবে, তা আমি জানি, আমারটা যখন চুরি গেছে তখন সকলের টাই খোয়া যাবে। হুঁ হুঁ এ বাবা, ধর্ম্মের কল—বাতাসে নড়ে।

পণ্ডিত চমকে বল্লেন, বাবা আমারটা থাকবে ত। আমাকে দশটা বাড়ী পূজো-আর্চ্চা করতে হয় তুমি একটু দেখত আমারটা যেন কাটা না যায়।

পণ্ডিত বোধ হয় বুঝেছিলেন—এ ধর্ম্মের কল কে নাড়িয়েছে।

ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত এই সময় এক মহাপুরুষ এক আশ্চর্য্য মন্ত্র উচ্চারণ করে ভারতের সমস্ত নরনারীর প্রাণে এক হিল্লোল জাগিয়ে তোলেন। বনে বনে সাড়া জেগে গেল, পাহাড় পর্ব্বতগুলো স্তব্ধতা ভেঙে সচকিত হয়ে উঠে—নদীতে এল জোয়ার। এইটেই হল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ছেলেরা স্কুল ছাড়ল, কলেজের ছেলেরা বেরিয়ে এল পথে, উকীলেরা কোর্ট-কাছারী যায় না ঃ একটা বিরাট ভূকম্পন সমস্ত দেশজুড়ে আরম্ভ হয়ে গেল যেন। নারায়ণপুরের দুর্দ্দান্ত ছেলেটিও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আজ রবীনের মুখে কথা নেই, তার শরীরের বলিষ্ঠতা সামনে রূপ ধরে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। রবীনের মনে এসেছে অফুরন্ত উৎসাহ।

স্কুলের ফটকের মাঝখানে শুয়ে পড়ল রবীন—পিকেটিং করবার জন্য। আরও ভলান্টিয়ার এসে তার সঙ্গে যোগ দেয়। মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি।

স্কুলের সেরা ছেলে বিশু স্কুল গেল নবীনকে টপ্‌কে। মুহূর্ত্তে রবীনের চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। একটা জ্বলন্ত আগুন যেন ঠিক্‌রে পড়তে থাকে তার চোখ থেকে। রবীন 'বন্দে মাতরম' বলে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু এ-কি-মন্ত্র ! মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রবীনের মারমুখী স্বভাবটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আজকের মত এত শান্ত রবীন কোন দিন হতে পারে নি। অন্যদিন হলে বিশুকে হয়ত রবীন খুনই করে বসত। কারণ রবীন জগতের সব জিনিষকেই ভয় করে কিন্তু জগতের বাইরের ঐ মৃত্যু দৈত্যটাকে সে ভয় করে না। অদ্ভুত তার মন আর অদ্ভুত তার মন্ত্র।

দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে জুটছে। স্কুলের ছেলেরা পিকেটারদের ফাঁকি দিয়ে স্কুলের বোর্ডিংএর পেছন দিয়ে, হেডমাষ্টারের বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে ক্লাশে যেতে থাকে। একধারে স্বেচ্ছাসেবকের অসম্ভব ধৈর্য্য আর একধারে স্কুল যাবার জন্যে নিতান্ত স্কুল পালান ছেলেদেরও লুকোচুরি ব্যাপারটাকে যুগপৎ করুণ এবং কৌতুককর করে তুলছিল।

দূর থেকে দেখা যায় লাল পাগড়ীপরা পুলিশের দল আসছে—আর আসছে দারোগা। আসছে সি, আই, ডি আসছে টিকটিকি। অনেক হুজুগে স্বদেশীওয়ালারা ভয়ে কেটে পড়ল। কিন্তু নতুন স্বেচ্ছাসেবক রবীন তেমনি মাথায় রোদ্দুর নিয়ে ফটকের ভেতর শুয়ে পড়ে আছে। আগুনে-পোড়া মাটির পর শুয়ে পুলিশের রক্তবর্ণ পাগড়ীর দিকে তাকিয়ে পড়ে আছে রবীন। পুলিসের বজ্রনির্ঘোষ হয়ত বা পাহাড়কেও আঘাত করত কিন্তু রবীন যেন নিশ্চল পাষাণের চেয়েও নির্জীব। জীবন তার আছে—জীবনটা আজ তার দুঃসাহসা।

পুলিসের লাঠি ঘুরতে আরম্ভ করে। আশেপাশের ছেলেগুলো লাঠির ঘায়ে উঠে পড়ে কিন্তু রবীন তেমনি পড়ে আছে। পুলিসের একটা কঠিন লাঠির আঘাত পড়ে রবীনের মাথায় ! রবীন একবার চোখ খুলে বলে উঠল—'বন্দে মাতরম'। তার হাতটা যখন অজ্ঞাতসারে তার মাথার ক্ষত স্থানে স্পর্শ করতে যাবে—হাতে পড়ল পুলিসের হাতকড়া। বাক্যবাগীশ রবীন আজ আর কোন কথা বলেনা—শুধু 'বন্দে মাতরম'।

নারায়ণপুরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—আগে যারা পুলিস দেখে ভয় পেত আজ তারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে—পুলিসদের দেখতে আর দেখতে গান্ধীটুপী পরা স্বদেশীওয়ালারা। তাদের প্রাণে ভয় নেই অবশ্য উৎসাহও নেই। পথের ধারের জানালা কপাট খুলে বন্দীদের দেখবার জন্যে। রবীন যাদের সঙ্গে হাডু-ডু আর ডাণ্ডাগুলি খেলত সেই রাখালেরা পথে এসে দাঁড়ায়। জুব্বার বলে—চললি ভাই খেলা ভেঙে !

রবীন দেঁতো হাসি হেসে বলল—'বন্দে মাতরম্'। কিন্তু মাথার ভারে মুখ বাড়িয়ে সেই সব সঙ্গীদের ভাল করে দেখতে পায় না। রাখালেরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে—'বন্দে মাতরম'।

গ্রামের পথ ছেড়ে রবীনদের গাড়ী চলেছে নদীপথ ধরে। বর্ষাকাল থৈ, থৈ করছে জল। তর্‌তর্ করে বয়ে চলেছে নৌকো আর তির্‌তির্ করে বয়ে যায় জল, জল আর জল।

রবীনদের ওপারে যেতে হবে—ওপারেই থানা।

নদীর নাম চন্দনা। খুব ছোট নয়। মাইলটেক হবে চওড়া।

মাঝি বললে—ঝড় উঠবে।

সরকারের কর্ম্মচারীরা বলে—তুই নৌকো ছাড়না হারামজাদা।

মাঝি নৌকো খুলে দেয়।

কিন্তু সরকারের কথা মাঝি শোনে, ভগবান হয়ত শোনেন না।

নদীর মাঝখানে এল তুমুল ঝড়।

শন্ শন্ করে ঝড়ের হাওয়া লাগছে ছইয়ে। রবীন তন্দ্রার ঘোরে ঝড়ের হুহুঙ্কার কাণ পেতে শোনে। ঝড়ের এমন সম্পূর্ণ চেহারা সে তেমন ভাবে দেখেনি তাই তার আজ ভাল লাগছে। নৌকোটা যদি ডুবেই যায় ক্ষতি কি! সরকারীর নৌকো ছুটে চলল ঝড়ের আগে পারের দিকে।

সামনে আর একখানা নৌকো আসছে। নদীর জল সে নৌকোখানায় উঠে পড়েছে। একটি বাবু, একটি বৌ আর তুটি ছেলেমেয়ে দেখা যায়। নৌকো থেকে কান্নার রোল ভেসে আসে।

রবীন মাথার যন্ত্রণায় শুয়ে পড়েছিল—সামনের নৌকোর আর্ত্তনাদে উঠে বসে—চেয়ে দেখে নৌকোখানা ডুবছে প্রায়!

রবীন চীৎকার করে বলল—আপনার লোকজনের হুকুম দিন না দারোগাবাবু নৌকোখানা যে ডুবল!

দারোগার আইনে হয়ত এমন উপকার করার কথা নেই।

—তবে আমারই হাত-কড়া খুলে দিন।

দারোগা একবার রবীনের ফাটা মাথার দিকে তাকালেন। ছেলেটা বলে কি, এই ফাটা-মাথা নিয়ে সে এই ঝড়ের সঙ্গে যুঝবে! কিন্তু দারোগার হয়ত নৌকোর তুর্দ্দশা দেখে করুণার সঞ্চার হয়েছে, পরের জীবন দিয়ে যদি পরকে রক্ষা করা যায় ক্ষতি কি!

দারোগা—নগেন আর রবীনের হাত কড়া দিলেন খুলে।

নিমেষে রবীন আর নগেন উত্তাল তরঙ্গের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশে পাশের ঝড়ের ঝাপটা আর বুকের তলে জলের উন্মত্ততাকে ঠেলে নগেন আর রবীন যেন এগোতে পারে না।

নৌকোখানা ডুববার মুহূর্ত্তে ছেলেমেয়ে তুটিকে ধরে ফেলল ওরা। বাবু আর বৌটি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে!

কিন্তু তারপর রবীন যেন পারে না ঝড় আর জলের সঙ্গে। নগেন এগিয়ে চলেছে—কিন্তু রবীনের মাথাটা যেন ক্রমে জলের নীচে ডুবে যেতে চায়। বারবার ডুবে যায় সে আর বারবার মাথা ভাসিয়ে তোলে—মাথার পটিটা গেল খুলে। খুকীটা তার পিঠের ওপর, ভয়ে কোন সময় বা তাকে জাপটে ধরে কোন সময় সে ডুবে যায়। রবীনের নিঃশ্বাস যেন

আর চলে না। নগেন সরকারের নৌকোখানায় উঠে পড়েছে। আর রবীন—আর একটু, একটু ঐ ত সরকারী নৌকো বোধ হয় একটু এগিয়েই আসছে। আর পাঁচ হাত—তিন হাত, তুই হাত। রবীনের কাঁধ থেকে দারোগা বাবু খুকীটিকে টেনে তুলে নিলেন। কিন্তু সরকারী নৌকোখানাও টলমল করছে। রবীন নৌকো ধরে উঠতে থাকে—হঠাৎ এক ঝট্‌কায় নৌকো দশ হাত পেছিয়ে গেল—আর তীব্র এক স্রোতের টানে রবীন কোথায় তলিয়ে যায় আর খোঁজ পাওয়া যায় না। দারোগারাবু তখন ঝড়ের ভেতর হাঁকছেন—

—নৌকো শীগ্‌গীর পারে নিয়ে চল—একটা আসামী পালায় পালাক্।

কিন্তু আসামী রবীন হয়ত পালায়নি, দূরে একবার তার জলের ওপর মাথা দেখা যায়—কিন্তু আবার ডুবে গেল। আর উঠল কিনা জানা যায় না।

পরদিন কিন্তু ছুটি হয়ে গেল নারায়ণপুরের স্কুলে এই তুরন্ত আর খেয়ালী ছেলেটার জন্যেই।

রামপদ বাবু হেড্ মাষ্টারকে বলছিলেন—ছেলেটার কতগুলো বিবেচনা শূন্য এক গুঁয়ে খেয়াল ছিল।

ভোলানাথ বাবু বল্লেন—আমার এই পোড়া দেশে এমনি একগুঁয়ে ছেলেই যেন শত শত জন্মে।

পণ্ডিত বল্লেন—রবীন মরেনি অমন ছেলে মরতে পারে না, চিরকাল বেঁচে থাকে।

———

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হলে ১২ ডি হেশাম রোড, কলিকাতার কনট্রাকটার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

"ফাদার পিটার গিলিগ্যাণ"

("The Ballad of Father Peter Gilligan

(W. B. Yeats")

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বৃদ্ধ বাবা পিটার গিলিগ্যাণ
বন্ধু যাঁর বিশ্ব নরনারী—
ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন তিনি দ্যান
তৃষার্ত্তের কণ্ঠে দেন বারি।

রাত্রে ঘুম নাহি বিরাম বিণে
পীড়িত যবে জাগিয়া যাপে রাতি
মড়কে মরে এমনি তর দিনে
অনেক পাড়া পড়শী নানা জাতি।

বিষাদে ভরা অবসাদের ভারে
বৃদ্ধ পড়ি শয্যাহীন ভূমে—
রমণী এল ছুটিয়া তা'রি দ্বারে
বৃদ্ধ আঁখি তুলিতে নারে ঘুমে।

বৃদ্ধ যেন প্রলাপ-রাঙা-চোখে
কহিল "মাতা, সকলে যদি মরে
মরার ষড়যন্ত্র করি লোকে—
কি বল আমি করি কাহার তরে!"

হতাশে নারী চলিয়া গেল যবে
বৃদ্ধ ঘুমে ডুবিল অচেতনে
ঘুমেরো ঘোরে কাতরে কহে তবে
"হে প্রভু দয়া করিও অভাজনে।"

মোরগ কাক চটক নাহি জাগে
জাগিয়া বাবা পিটার গিলিগ্যান
ছুটিয়া গিয়া তীরের আগে আগে
কুটীর দ্বারে অধীরে ডাক দ্যান।

কহিলা "মাতা কেমন আছে স্বামী?"
কহিলা নারী "আবার তুমি এলে
ঘুমাল মহা ঘুমের পথ-গামী
তখনি প্রভু যখনি তুমি গেলে।

বাঁধিয়া মোরে নিবিড় বাহু পাশে
ঊর্দ্ধপানে তুলি করাঙ্গুলি
হরষে যেন চোখের তারা ভাসে
ঘুমায়ে গেল সকল দুখ ভুলি।"

বৃদ্ধ কহে যুড়িয়া দুটী পাণি
লুটায়ে পড়ি মৃতের পদতলে
"আপনি প্রভু আসিল হেন জানি
তোমার লাগি ধরার ধূলি তলে।"

———

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

(আগেকার সারাংশ)

[বিমলের ডায়েরী। ছেলেমহলে বিমল হোল পৈতেহীন চেনা বামুনের মত। গল্পের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে তার ডায়েরীর ঘটনাগুলি ভাগ ভাগ ক'রে কথিত হয়েছে।

বিমল কুমারকে নিয়ে একদিন গিয়েছিল একটি চীনে হোটেলে খানা খেতে। সাজানো-গুছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেলটি। পরিবেশন করছিল একটি চীনে মেয়ে। চুং চাং চুং চিং কথা শুনতে শুনতে তাদের মনে হচ্ছিল যেন তারা আরব্য উপন্যাসের মায়া-গালিচায় চেপে হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চীন দেশেই এসে পড়েছে। চীনেম্যানদের দেখে তাদের মনে হচ্ছিল যেন এক-একটি রহস্যময় মূর্ত্তি। হঠাৎ পাশের ঘরেই জাগলো ক্রুদ্ধ গর্জ্জন—হুড়োহুড়ি, চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়ার শব্দ। তারপরেই এক আর্ত্তনাদ। মাঝ-বয়সী একটি চীনেম্যান রক্তাক্ত দেহে টল্‌তে টল্‌তে বিমলদের ঘরে এসে উপস্থিত। তার পা থেকে যেন মাটি স'রে গেল—সে প'ড়ে গেল লুপ্ত চেতনার ভিতর। আট-দশটা চীনেম্যান এসে ভিড় করে দাঁড়ালো সেই কামরার সামনে। সব-আগে ছিল মাথায় খুব বেঁটে, কিন্তু চওড়ায় মস্ত-বড় এক মূর্ত্তি। সে রক্তমাখা ছোরাখানা উঁচিয়ে ধরে ভিতরে এসে ঢুকলো। বিমল মারলো এক ঘুষি তার চোয়ালের উপরে—লোকটা ঠিকরে প'ড়ে গেল। ওদিকে আগেকার মৃতপ্রায় লোকটি অস্ফুট স্বরে ইংরেজীতে বললে, "আমি আর বাঁচবো না।...আমার গলায় ঝুলছে একটা লকেট—তুমি সেটা তাড়াতাড়ি বের করে নাও। লকেটটা লুকিয়ে রেখো। ছুন-ছিউ দেখতে পেলে তুমিও বাঁচবে না।"

ছুন-ছিউ কে? তাকে যে মেরেছে। যখন সে মরবেই তাকে কোনমতেই গুপ্তধন ভোগ করতে দেবে না।

গুপ্তধন ? সে কোথায় ?

কি-পিন ! কি-পিন ! যেও সেখানে, পাবে।

এই ব'লে লোকটা মারা গেল।

বিমল ও কুমার বাড়ী ফিরে এল। ধুক্‌ধুকিটা রুপোয় তৈরি তার উপরে খোদাই করা একটা বিধখুটে মূর্ত্তি। ধুক্‌ধুকির ভিতর ছিল ভাঁজ করা একটা পুরু কাগজ—নক্সার মতন—ফোঁটা ফোঁটা সাঙ্কেতিক চিহ্নে ভরা। বিমলের ঠাওর হোলনা। কি-পিন কোথায় কোন্ চীনে মুল্লুকে ? হদিশ সে পাবে কেমন ক'রে, এই নিয়ে তারা মাথা তালগোল পাকাচ্ছিলো এমন সময় বিনয়বাবু এসে হাজির হলেন। বিনয়বাবু হলেন জ্ঞান-সমুদ্রের ডুবুরি। তাঁকে এক কথায় "জীবন্ত অভিধান"ও বলা চলে। বিনয়বাবুর চোখে পড়লো সেই লকেটটি, দেখে তিনি বল্লেন যে, এটি হ'ল হিন্দু যক্ষরাজ কুবেরের মূর্ত্তি। আর কি-পিন হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর আগানিস্থানের কপিশ নামক স্থান। এক সময়ে গান্ধারকেও কি-পিন বলা হোত। এখন কি-পিনকে বলে কাফ্রিস্থান। বিমলের চোখে যেন আলো ঠিকরে পড়লো, সে দেখতে পেল সব আবছা আবছা। যত মুস্কিল ঠেকল তার ওই কাগজটি নিয়ে। বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়ে সহজস্বরে বললেন, "এতো দেখছি ব্রেল পদ্ধতিভে লেখা। এই পদ্ধতিতে এক থেকে ছয়টি মাত্র বিন্দুকে নানাভাবে সাজিয়ে বর্ণমালার সমস্ত কাজ সারা যায়।"

কৌতূহল-ব্যগ্র সবাকার মন। বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে হাত বুলিয়ে বললেন—"শা-লো-কা : পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ : কুবের মূর্ত্তি : গুপ্ত গুহা : ব্যাস্, আর কিছু নেই।"

ঐতিহাসিকেরা শা-লো-কা, কি-পিন, কা-পিন, কপিশ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উত্তর-পূর্ব্ব আফগানিস্থানকেই আখ্যাত করেছেন। আধুনিক নাম তার কাফ্রিস্থান। ভারতবর্ষের সীমারেখা হিন্দুকুশেই আবদ্ধ ছিল না, তার ওপারে আফগানিস্থানকেও জুড়ে' ছিল। বিমল ও কুমারের মন উদগ্র হয়ে উঠলো—ছুটলো তারা কাফ্রিস্থানের উদ্দেশ্যে আনাচ-কানাচে ঢুঁ মেরে। তাদের পথপ্রদর্শক হবেন বিনয়বাবু। নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতলবে তারা তাঁকে পুরোভাগে চায়, এটা তিনি ধরে নিলেন।

এমন সময় রামহরি এসে উপস্থিত। সে জানালো যে চারটে চীনেম্যান বিমলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

চীনেম্যান দেখা করতে চায়, কেন ?

ধুক্‌ধুকিটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে জামার পকেটে বিমল রেখে দিল। ছুন-ছিউ তবে কি—যে ছোরা হাতে ক'রে চীনে বুড়োটাকে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল ? বিমল প্রমাদ গনলো। ছুন-ছিউ সদলবলে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—"তোমার নাম কি ছুন-ছিউ ?"

ধাঁ ক'রে অমনি পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করলে সে একটা রিভলভার ! তার পিছনের তিন মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গেই এক-একটা রিভলবার বার ক'রে ফেললে। বিমলের চোখের সামনে স্থির হয়ে রইলো চার-চারটে রিভলবারের চক্‌চকে নলচে।

কিন্তু বিমলদের পুরাতন ভৃত্য রামহরির কৌশলে ছুন-ছিউ সদলবলে ধরা পড়ল। পুলিস এসে তাদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। কিন্তু ছুন-ছিউ অদ্ভুত উপায়ে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে পলায়ন করলে।

এদিকে বিমল ও কুমার, বিনয়বাবু, কমল, রামহরি ও বাঘা-কুকুরকে নিয়ে কাফ্রিস্থারের উদ্দেশে যাত্রা করলে ট্রেণে চ'ড়ে। এক দুর্য্যোগের রাতে ট্রেণ হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল। রামহরিকে কামরায় রেখে বিমলরা ট্রেণ থেকে নেমে শুনলে, লাইন সরিয়ে কারা গাড়ী উল্‌টে দেবার চেষ্টা করেছে। ভিজে মাটির উপরে পদচিহ্ন দেখে বিমলরা গার্ড প্রভৃতির সঙ্গে মাঠ দিয়ে এগুতে এগুতে অপরাধীদের অন্বেষণ করছে, এমন সময়ে সামনের বন থেকে বেরিয়ে বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে কারা করলে তাদের আক্রমণ !]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামহরির ধূলিশয্যা

একটা ঝোড়ো দম্‌কা হাওয়া আচম্‌কা জেগে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে টলোমলো গাছপালাগুলো কেঁদে উঠল আরো বেশী উচ্চস্বরে। তারপরেই আবার এল ঝেঁকে বৃষ্টি। গড়্-গড়্ গড়্-গড়্ বাজের ধমক—ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ বিদ্যুৎ-চমক !

একে মেঘের কাজল মাখা রাতের অন্ধকার, তার উপরে সেই ঘন বৃষ্টিধারার পর্দ্দা। চোখ আর এদের ভেদ ক'রে এগিয়ে যেতে পারলে না। শত্রুরাও নিশ্চয় এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না !

যে সায়েবটা শত্রুদের বন্দুকের ভয়ে পালায় নি সে বললে, "বাবু, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি নিরস্ত্র ?"

—"না, আমার কাছে রিভলভার আছে।"

—"তাহ'লে এই ঝোপের আড়ালে আমাদের মত হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়। শত্রুদের আমাদের রিভলভারের নাগালের ভেতরে আসতে দাও। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, আমরা নিতান্ত অসহায় নই।"

গার্ড বললে, "কিন্তু শত্রুদের কারুকেই তো দেখা যাচ্ছে না ! তারা—"

তার মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হতেই আবার শোনা গেল ছুটো বন্দুকের শব্দ ! কিন্তু সে হচ্ছে লক্ষ্যহীনের বন্দুক, গুলি যে কোন্ দিকে ছুটল আমরা তা টেরও পেলুম না।

কুমার বললে, "বন্দুকের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে ! ওরা বন্দুক ছুঁড়ছে আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে !"

বিনয়বাবু বললেন, "এই সুযোগে দৌড়ে আমাদের গাড়ীর দিকে যাওয়া উচিত।"

কুমার বললে, "পিছনে সশস্ত্র শত্রু নিয়ে গাড়ীর দিকে দৌড়োতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে আকাশের বুকে জ্ব'লে উঠল একটা সুদীর্ঘ বিদ্যুৎ এবং তারই আলোকে দেখা গেল, খানিক তফাতে একদল লোক দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে !

গার্ড ত্রস্ত স্বরে বললে, "ওরা ট্রেণের দিকে যাচ্ছে—ওরা ট্রেণের দিকে যাচ্ছে! ওরা ভেবেছে আমরা আর এখানে নেই!"

বিনয়বাবু বললেন, "কি সর্ব্বনাশ! ওরা কি ট্রেণ আক্রমণ করতে চায় ?"

কুমার বললে, "বিমল, বিমল ! ওদের দেখা যাচ্ছে ! ওদের নাগালের মধ্যে পেয়েছি!"

আমি বললুম, "ছোঁড়ো রিভলভার !"

প্রায় একসঙ্গে আমাদের পাঁচটা রিভলভার গর্জ্জন ক'রে উঠল—এবং পরমুহূর্ত্তেই জাগল একটা বিকট আর্ত্তনাদ !

আবার ডাকল বাজ—আবার জ্বলল বিদ্যুৎ-শিখা ! এবং আবার গর্জ্জন করলে আমাদের রিভলভারগুলো

কমল চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা পালাচ্ছে—ওরা পালাচ্ছে !"

আমি বললুম, "আবার ছোঁড়ো রিভলভার !"

আমাদের পাঁচটা রিভলভার আর একবার চীৎকার ক'রে উঠল।

রাত্রের শরীরী অভিশাপের মতন অস্পষ্ট মূর্ত্তিগুলো আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকার ও বৃষ্টিধারার অন্তঃপুরে।

বাঘার উৎসাহিত গর্জ্জনে কাণ পাতা দায় ! ভাগ্যে কুমার তাকে সজোরে নিজের দুই হাঁটুর ভিতরে চেপে, বাঁ-হাতে তার বগ্‌লোস্ টেনে ধ'রেছিল, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে শত্রুদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত !

কমল আহ্লাদে নৃত্য করতে করতে বললে, "জয়, আমাদের জয় ! বৎসগণ ! ভেবেছিলে ফাঁকতালে করবে কেল্লা ফতে ? হুঁ হুঁ, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ তো দেখ নি !"

তখনি কমলের একখানা হাত ধ'রে বিনয়বাবু তার নৃত্যোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিলেন।

আমি বললুম. "এই হচ্ছে স'রে পড়বার সুযোগ ! ছোটো সবাই ট্রেণের দিকে !"

অন্ধকার আর বৃষ্টিধারা কেবল শত্রুদেরই ঢেকে রাখে নি, তাদের আশ্রয় পেয়ে আমরাও নিরাপদে ট্রেণের কাছে গিয়ে পড়লুম।

যাত্রীরা কেউ বাইরে ছিল না। বন্দুক আর রিভলভারের শব্দ লুপ্ত ক'রে দিয়েছে তাদের সমস্ত কৌতূহল। প্রত্যেক কামরার দরজা ও খড়খড়িগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে তারা হয়তো তখন ইষ্টদেবতার নাম জপ করছিল।

আমাদের সঙ্গের সায়েব বললে, "ইণ্ডিয়া কি ক্রমে আমেরিকা হয়ে উঠল ? সশস্ত্র ডাকাত এসে ট্রেণ আক্রমণ করে, এদেশে এমন কথা কে কবে শুনেছে ?"

গার্ড বললে, "কামরায় গিয়ে ও-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো ! ইঞ্জিন এখনি গাড়ীকে পিছনের ইষ্টিশানে নিয়ে যাবে !" ব'লেই সে দ্রুতপদে চ'লে গেল।

এমন সময়ে হঠাৎ উপর-উপরি আরো কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবং কাঠ-ফাটা শব্দ শুনে বুঝলুম, একটা গুলি ট্রেণের কোন কামরার গায়ে এসে লাগল।

ডাকাতরা কি আমাদের উদ্দেশ্য ধ'রে ফেলেছে ? তারা কি আবার আমাদের আক্রমণ করতে আসছে ?

অন্য ক্ষেত্র হ'লে আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে আবার তাদের উচিতমত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতুম। কামরার ভিতরেই আছে আমাদের 'অটোমেটিক' বন্দুকগুলো। তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে পঁইত্রিশটা গুলি বৃষ্টি করতে পারে। সেগুলো হাতে থাক্‌লে আমরা পাঁচজনে দুইশত শত্রুকেও বাধা দিতে পারি।

কিন্তু সে সময় পেলুম না। দূর থেকে বেজে উঠল গার্ডের বাঁশী,—গাড়ী ছাড়তে আর দেরি নেই ! 'টর্চ্চে'র আলো ফেলে তাড়াতাড়ি আমাদের কামরা আবিষ্কার করতে বাধ্য হলুম। কোনরকমে গাড়ীতে উঠে পড়বার সময় মাত্র পেলুম।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই মাঠের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা উচ্চ কোলাহল। সে হচ্ছে মুখের গ্রাস পালিয়ে গেল দেখে ডাকাতদের হতাশার চীৎকার ! হতভাগারা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েছিল, সমস্তই ব্যর্থ হ'ল।

ট্রেণ পিছু হেঁটে চলছে—তার গতি খুব দ্রুত নয়। আমাদের কাম্‌রার ভিতরেও ঘুট্‌-ঘুট্‌ করছে অন্ধকার।

কুমার বললে, "ছি রামহরি, ছিঃ ! তুমিও ভয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ইঁদুরের মতন লুকিয়ে আছ !"

রামহরি কেমন যেন শ্রান্ত স্বরে বললে, "মোটেই নয় কুমারবাবু, মোটেই নয়। একবার আলো জ্বেলে দেখ না!"

কমল আলো জ্বাললে।

বিপুল বিস্ময়ে দেখলুম, কামরার মেঝের উপরে শুয়ে রয়েছে রামহরি, তার হাত-পা দড়ী দিয়ে বাঁধা!

বিস্ফারিত চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, "রামহরি, এ কি ব্যাপার!"

ম্লান হাসি হেসে রামহরি বললে, "খোকাবাবু, কামরা থেকে তোমরা বেরিয়ে যাবার পর আমি জানলায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ওদিকের জান্‌লা দিয়ে জন-তিনেক লোক কখন যে নিঃশব্দে কামরার ভেতরে ঢুকেছিল, আমি একটুও টের পাই নি। আমার অজান্তেই তারা আমাকে আক্রমণ করলে, আমি কোনরকম বাধা দেবার ফাঁক পর্য্যন্ত পেলুম না।"

—"কে তারা? চীনেম্যান?"

—"না, পশ্চিমের লোক, হিন্দুস্থানী।"

—"তারপর?"

—"একটা লোক ছোরা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'চ্যাঁচালেই মরবি!' আর দুটো লোক আমাদের মোটমাট, 'সুট্‌কেশ'গুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল।"

ফিরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, আমাদের অধিকাংশ মোটই মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে র'য়েছে। প্রত্যেক 'সুটকেশে'র তালা খোলা।

রামহরি বললে, "ভয় নেই তোমাদের, তারা কিছু নিয়ে যায় নি। তাদের ভাব দেখে মনে হ'ল, তারা যেন কোন বিশেষ জিনিষেরই সন্ধান করছে!"

কুমার বললে, "তবে কি তারা সাধারণ চোর নয়? তারা কি সেই ধুক্‌ধুকিখানার লোভেই কামরার ভিতরে ঢুকেছিল?"

বিনয়বাবু বললেন, "ধুক্‌ধুকিখানা তো চীনেম্যানদের সম্পত্তি! আর রামহরি বলছে যারা এসেছিল তারা হচ্ছে হিন্দুস্থানী।"

আমি রামহরির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বললুম, "বিনয়বাবু, এই চীনে ডাকতেরা বড় সহজ লোক নয়। তারা বেশ জানে, ভারতে এসে কাজ হাসিল করতে গেলে এদেশী লোকের সাহায্য না নিলে চলবে না। কারণ কোন ছদ্মবেশই চীনেদের মঙ্গোলীয় ছাচ ঢাকতে পারবে না, ভারতীয় জনতার মধ্যে তাদের দেখলেই সকলে চিনে ফেলবে। কাজেই তারা এদেশী গুণ্ডাদেরও সাহায্য নিয়েছে। তাদের

দলের লোক নিশ্চয়ই ট্রেণের মধ্যে ছিল, আমরা কামরা ছাড়বার পরেই সুযোগ পেয়ে এসেছিল রামহরির সঙ্গে আলাপ করতে।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, এবার থেকে আমাদের দেশী-বিদেশী দু-রকম শত্রুর সঙ্গেই যুঝতে হবে? ব্যাপারটা ক্রমেই সঙিন্ হয়ে উঠছে যে!"

কুমার বললে, "উঠুক্—আমরা থোড়াই কেয়ার করি! কিন্তু রামহরি, তোমার গল্পের শেষটা এখনো তো শোনা হয় নি।"

রামহরি উঠে ব'সে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, "গল্পটা আরো কিছু বড় হ'তে পারত, কিন্তু শেষ হবার আগেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল তোমাদের জন্যেই।"

আমি বললুম, "আমাদের জন্যেই?"

—"হ্যাঁ গো খোকাবাবু, হ্যাঁ। কামরার আলো নিবিয়ে 'টর্চে'র আলোয় তারা একমনে খোঁজাখুঁজি করছে, এমন সময়ে বাহির থেকে এল তোমাদের সাড়া। গার্ডের বাঁশীও শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে কামরার ভিতর থেকে তারাও তাড়াতাড়ি স'রে পড়ল। আর আমার কথাও ফুরুলো।"

বিনয়বাবু বললেন, "ধুক্‌ধুকিখানা তারা খুঁজে পায় নি তো?"

আমি হাসতে হাসতে নীচু-গলায় বললুম, "ধুক্‌ধুকিখানা আছে কলকাতায়।"

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি?"

—"ধুক্‌ধুকিখানা একেবারেই বাজে। আসল দরকার তার ভিতরের লেখাটুকু। আমি আর কুমার সেটুকু মুখস্থ ক'রে রেখেছি।"

কমল খুসি হয়ে ব'লে উঠল, "বাহবা কি বাহবা! ধুক্‌ধুকির লেখা পড়তে হ'লে চুন্-ছিউকে এখন বিমলদা আর কুমারদার মনের ভিতরে ঢুকতে হবে!"

আরো খানিকক্ষণ পরে ট্রেণ এসে ইষ্টিশানে ঢুকে বিষম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। চারিদিকে মহা হৈ-চৈ, লোকজনের ছুটোছুটি!

রামহরিকে নিয়ে আমরাও গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। গার্ড আর পুলিসের সঙ্গে ট্রেণের প্রত্যেক কামরা তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলুম, কিন্তু রামহরি সেই তিনজন লোককে কোথাও আবিষ্কার করতে পারলে না। নিশ্চয়ই তারা মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

সকাল-বেলায় একদল পুলিসের লোক ঘটনাস্থলে গেল খানাতল্লাস করবার জন্যে। কিন্তু মাঠ, জঙ্গল ও আশপাশের গ্রাম খুঁজে অপরাধীদের কারুকেই পেলে না। আমার বিশ্বাস, তারা কোন পাহাড়ে উঠে আত্মগোপন ক'রে আছে।

যথাসময়ে লাইন মেরামত হ'ল। ট্রেণ আবার ছাড়ল। দিন-রাত যক্ষপতির

রত্নপুরীর সমুজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ক্রমেই এগিয়ে চললুম, ভারতের উত্তর-সীমান্তের দিকে।

ভারতের উত্তর-সীমান্ত আমার মনে চিরদিনই জাগিয়ে তোলে বিচিত্র উত্তেজনা! আফগানিস্থান যখন ছিল হিন্দুস্থানেরই এক অংশ, তখন সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সেখানে হয়েছে কত না অদ্ভুত নাটকের অভিনয়! শক, তাতার, হুন্, মোগল, চীন, পারসী ও গ্রীক প্রভৃতি জাতির পর জাতি এই পথ দিয়েই মূর্ত্তিমান ধ্বংসের মতন ছুটে এসেছে সোনার ভারত লুণ্ঠন করবার জন্যে। দেশরক্ষার জন্যে যুগে যুগে ভারতের কত লক্ষ লক্ষ বীর ঢেলেছে সেখানে বুকের রক্তধারা! ওখানকার আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের শিখরে শিখরে আজ বাতাসে বাতাসে যে অশ্রান্ত গান জেগে উঠে, সে হচ্ছে এই প্রাচীন ভারতেরই অতীত গৌরব-গাথা! ঐতিহাসিক ভারতের সর্ব্বপ্রথম সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত ঐ পথ দিয়েই ভারতের শত্রু গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে! যে পার্ব্বত্য জাতির প্রচণ্ড রণোন্মাদ পৃথিবীজয়ী আলেকজাণ্ডারকেও ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল, তাদের সুযোগ্য বংশধররা আজও সেখানে বর্ত্তমান আছে। এই বিংশ শতাব্দীর উড়োজাহাজ আর কলের কামানও তাদের যুদ্ধোন্মাদ শান্ত বা তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারে নি। দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশ-সিংহ আজও সেখানে ঘুমোবার অবসর পায় না। আজ্‌কের ভারতে যারা সত্যিকার 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' খুঁজে বেড়ায়, ভারতের উত্তর-সীমান্ত পূর্ণ করতে পারে তাদের মনের প্রার্থনা!

বিনয়বাবুর মুখে শুনলুম, আফগানিস্থানের মধ্যে কাফ্রিস্থান হচ্ছে এক রহস্যময়, অদ্ভুত দেশ। ওখানকার লোকজন, আচার-ব্যবহার সমস্তই নতুন-রকম। আমাদের যক্ষপতির ঐশ্বর্য্য আছে ঐ কাফ্রিস্থানেই। ঐখানেই উঠবে পরের দৃশ্যের যবনিকা।

ক্রমশঃ

সরীসৃপদের কথা

শ্রীবিমল্ ঘোষ

মাঠে বেরিয়েই ঘাস মাড়িয়ে দিব্যি ফূর্ত্তি করে চলেছ, হঠাৎ কার সর্ সর্ আওয়াজে গাটা শিউরে উঠলো! কি বল্‌লে—'সাপ'!

শোন তবে এগিও না আর! সাপের কথাই বলি এবার। 'সাপ' জীবজন্তুদের মধ্যে কোন দলে পড়ে জান কি? ওরা পড়ে 'সরীসৃপ'দের দলে,—ইংরাজীতে যাদের বলা হয় Reptiles. শুধু সাপ নয়, কচ্ছপ, কুমীর, গিরগিটী, টিক্‌টিকি বা ঐ জাতের যারা তারাও ঐ সরীসৃপদের দলেই পড়ে। এই 'সরীসৃপ'দের দলে যারা পড়ে, তাদের সকলেরই রক্ত ঠাণ্ডা, অন্যান্য জীবজন্তুর রক্তের যেমন একটা তাপ আছে, এদের তা নেই। জিগ্যেস করতে পারো—আচ্ছা এদের 'সরীসৃপ' বলা হয় কেন? 'সরীসৃপ' বলা হয় এইজন্যে যে ঐ জীবগুলি 'সর্পন' করে বা বুকের ওপর ভয় করেই চলে, অর্থাৎ তুমি আমি অন্য অন্য জীবজানোয়ার যেমন পায়ের ওপর ভর করে চলে, তেমনি ওরা বুকে হেঁটে যায়।

যাক্ সে কথা, এখন ঐ সর্ সর্ শব্দ শুনেই তোমারই যে গাটা শিউরে উঠ্‌লো তা ভেবোনা, জন্তু জানোয়ার মাত্রেই অমনি ঘাসের ওপর 'সরসর্' শব্দ শুনলে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। না দেখেই সবাই ভয়ে আঁচ করে নেয় ওটা বোধ হয় 'সাপ'। এই যে ভয় এটা সব জীবজন্তুরই সহজাত প্রকৃতি জন্মাবার সঙ্গেই নিয়ে আসে, সাপের ভয় সবাই করে। বাঘ সিংহীর সামনেও পড়ে বড় বড় শিকারী ততটা ঘাবড়ায়না যতটা ঘাবড়ায় সাপের আশঙ্কায়।

ভয় করবার কারণও আছে যথেষ্ট, কারণ ঐটুকু জানোয়ারের মুখে আছে এমন ভয়ঙ্কর বিষ, যা রক্তের সঙ্গে মিশলেই মানুষ মরে। তবে শিক্ষিত ও সভ্য মানুষদের কাছে ততটা ভয় হয় না, যদি তারা সাপের সব খবর রাখে। সেইজন্যই তো বলছি সাপের কথা।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সাপ হচ্ছে পৃথিবীর আদিকালের প্রাচীনজীব ডিপ্লোডকাসের বংশধর। এই ডিপ্লোডকাস ছিল ভয়ঙ্কর এক জানোয়ার, মাটিতেও চরে বেড়াতো, জলেও ঘুরে বেড়াতো, সেকালের পৃথিবীর তারাই ছিল হর্ত্তা কর্ত্তা। মানুষ তখনও জন্মায়নি, তখন থেকেই ওদের ভয়ঙ্কর স্বভাবটা চলে আসছে, ওদের অত্যাচারে সেকালের বহু বড় বড় প্রাণী প্রাণ হারাতো বেঘোরে। তাই তাদের বংশধরদের মধ্যে সেই ত্রাস সঞ্চারের ভাবটা এখনও বজায় আছে। তাই বোধ হয় মানুষ দড়ি দেখেও সাপ বলে ভুল করে লাফিয়ে ওঠে, রবারের সাপ দেখেই অনেকের মাথা ঘোরে, গা ঘিন ঘিন করে ওঠে, এমন কি বমিও হয় শুনেছি।

কাজেই সরীসৃপের রাজা হচ্ছে 'সাপ' একথা অনায়াসেই বলা চলে। 'সরীসৃপ'দের কথা বলতে গেলে সাপের কথাই বলতে হয় আগে।

ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে যত লোক মরে, এমন আর কোথাও মরেনা। এদেশে সাপের কামড়ে বছরে গড়পড়তা লোক মরে ২০,০০০ হাজার। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া আর আমেরিকায় সাপের কামড়ে লোক মরে বলে শোনাই যায় না, উত্তর

আমেরিকায় অল্প দু' চার জাতের যে সব বিষাক্ত সাপ আছে, তাদের কামড়ে লোক যা মরে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই না। তাছাড়া ওদেশের কোরাল সাপ, মোকাসিন, কপার হেড্, আর র‍্যাট্‌ল্ সাপ সহজে মানুষকে কামড়ায়ও না। এটাও জেনে রাখো ভারতবর্ষে সাপে যত মানুষ মরে, তার পাঁচগুণ সাপ মরে সেখানকার মানুষগুলোর হাতে, শিকারকারীরা তো বন্দুক দিয়ে সাপের বংশ ধ্বংস করছে, সাধারণ লোকগুলোও সাপ না মেরে ক্ষান্তই হয়না, লাঠি, কাস্তে, কুড়ুল, ইঁট পাটকেল যা পাবে, তাই দিয়েই সাপের দফা রফা করবেই, তা সে বিষাক্ত হোক, আর বিষহীন সাপই হোক। তাছাড়া আছে সাপের যম—বেঁজী, ময়ূর, গোসাপ আর ব্যাঙ—তারাও সাপ ধরে ধরে খায়। এইভাবে মানুষ আর এই জানোয়ারদের হাতে রাশি রাশি সাপ মরে বলেই রক্ষে! নইলে সাপেরাই মানুষের বদলে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতো। মানুষের হাতে মরতে হবে বলেই বোধ হয়, প্রকৃতি তার মুখে দিয়েছে মারার সবসেরা বিষ। প্রকৃতির খেলাঘরে শত্রুদের হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিয়েছে হাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি যাবার মত শক্তি।

এখন ধরা যাক সাপ কতো রকমের আছে? প্রথমেই তোমরা বলে উঠবে দু' রকম: বিষাক্ত সাপ আর বিষহীন সাপ। সত্যিই তাই। তবে তার ভেতরেও আবার রকমারী রঙ রকমারী চেহারার সাপ আছে—এবং কমসে কম পৃথিবীতে প্রায় দু' হাজার রকমের সাপ আছে। কেউ থাকে সমুদ্রের গভীর জলে, কেউ বেড়ায় গাছে গাছে, কেউ বেড়ায় ধানক্ষেত আর নলঘাগড়ার বনে, কারুর বা আস্তানা পাহাড়ের ফাটলে, এমন কি মরুভূমির গরম বালির তলায় থাকে সাপ। সবদেশেই অল্পবিস্তর সাপ আছে; নেই শুধু উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুতে, আয়ার্ল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডেও সাপের সন্ধান মেলে না।

এইবার বলি সাপের বিষের কথা। সাপের কামড়ে মানুষের শরীরে জ্বলন আর যন্ত্রনার সৃষ্টি হয়,—কিন্তু ভেবোনা যে সাপে হুল ফোটায়, ওরা দাঁত দিয়ে কামড়ায়, তা সে বিষহীন সাপ হোক বা বিষাক্ত সাপই হোক। বিষহান সাপের মুখের ওপরের মাড়িতে থাকে চারটে দাঁত আর বিষাক্ত সাপদের মুখের মাড়িতে থাকে সাধারণতঃ দুটো দাঁত। এই দুটি দাঁতই বিষের ছুঁচ, ঠিক ঐ ডাক্তার বাবুদের ইন্‌জেকসনের ছুঁচের মতই আগাগোড়া ফাঁপা আর ছাঁদা করা, বিষের থলি থেকে বিষ ঐ দাঁতের সাহায্যেই মানুষের রক্তে মেশে। বিষাক্ত সাপদের কারও কারও ঐ বিষদাঁত দুটি থাকে তোমার আমার দাঁতের মতই মাড়ির ওপরে খাড়া, কিন্তু কারু কারু আবার ঐ মাড়ির ওপর দাঁতের গোড়ায় থাকে কব্জার ব্যবস্থা, যখন তারা কামড়ায় তখন কব্জা সোজা হয়ে মাড়ির ওপর দাঁত দুটি সোজা খাড়া হয়ে ওঠে, আবার কাজ মিটে গেলেই ভাঁজ হয়ে মুখের ভেতর শোয়ান অবস্থায় থাকে।

সব বিষাক্ত সাপের কামড়েই যে মানুষের মৃত্যু ঘটে তা ভেবো না, কোনও কোন বিষাক্ত সাপের কামড়ে বোলতা বা ভীমরুলের কামড়ের মত খালি জ্বলনই হয়। তাছাড়া আর একটা মজা এই যে সাপের খাঁটি বিষ মুখ দিয়ে গিলে খেলে কিছুই ক্ষতি হয় না, তবে কোনও রকমে রক্তের সঙ্গে মিশলেই মৃত্যু।

সাপের কামড়ে এই যে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা সেটা শুধু তার শিকার যারা পশু পাখীকে মেরে ঘায়েল করার জন্যে—শিকারটির মরণে তারা তারপর সেটি খেয়ে পেট ভরায়।

তবে সাপ যে মানুষকে কামড়ায়, সেটা তার ক্ষিদে মেটাবার জন্যে নয়। মানুষকে সাপ ভয় করে আর তার পরম শত্রু বলে জানে বলেই,—তা সে মানুষের মনে সাপ মারবার মতলব থাক বা না থাক। সাপের বিষ যে মানুষের মৃত্যুই ঘটায় তা ভেবোনা, আজ কাল সাপের বিষ থেকে নানা রকম ওষুধ তৈরী হচ্ছে।

ভারতবর্ষে ত অনেক রকমের সাপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে গোখ্‌রো আর কেউটের নামটা খুব বেশী, এদুটির বিষই ভয়ঙ্কর। এদের কামড়ে ভারতবর্ষে অনেক লোক মরে। গোখ্‌রো সাপের জাতকে ইংরাজিতে বলা হয় cobra আর কেউটেকে বলা হয় crait। ভারতবর্ষে এই গোখ্‌রো সাপ বা cobra আবার দু' তিন রকমের দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু পশুবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন cobra দশ রকমের হয়। আফ্রিকাতে ৭।৮ রকমের cobra দেখতে পাওয়া যায়। এই cobra বা গোখরো সাপই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

এই cobra জাতের সাপের মধ্যে 'হামাড্রিয়াদ' 'Hamadryad বা king cobra জাতের সাপ অতি ভয়ঙ্কর, ওরা বিষাক্ত সাপ মেরে মেরেই খায়, তাছাড়া মানুষকে তেড়ে গিয়ে ছোবল মারে, ভয়ডর করে না

এখন সাপের শরীর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার—সাপেদের পা নেই, কিন্তু ওদের মতো তাড়াতাড়ি চলতে পারে খুব কম সরীসৃপ। সাপ চলে প্রধানতঃ তার শরীরের গড়নের জোরে, সাপের শরীরে কমসে কম ৩০০ জোড়া গোল গোল চাকার মত পাঁজরা আছে। এই পাঁজয়াগুলো গাঁথা থাকে পর পর একটি হাড়ে—তাকে শিরদাঁড়া না বলে বলতে পারো বুকদাঁড়া—কারণ আমাদের পাঁজরাগুলো যে হাড়ের সঙ্গে জোড়া থাকে সেটা থাকে পিছন দিকে, তাকে বলা হয় Back bone বা শিরদাঁড়া—ওদের ঐ Back bone এর বদলে আছে Breast bone বা বুকদাঁড়া। এছাড়া সাপের শরীরে আছে সারি সারি রঙবেরঙ আঁশ। পেটের তলাতেও থাকে বড় বড় আর শক্ত শক্ত আঁশ, এইগুলোর সাহায্যে মাটিতে ঠেলা মেরে সে চলে। তাই জন্যে সাপ খস্‌খসে মাটি বা গাছের গায়ে যেমন তাড়াতাড়ি চলতে পারে তেমনি খুব সমতল বা মসৃন যায়গা দিয়ে একদম চলতে পারে না। সাপের শরীরের বৈশিষ্ঠ্য তাদের চামড়ার ওপর রঙীন আঁশের রকমারী বাহার।

সাপুড়েরা বড় বড় গোখরো আর কেউটে নিয়ে যখন খেলায় তখন তোমাদের তাক্ লেগে যায়, কিন্তু তাক্ লাগবার মত কিছু নেই, কারণ তারা করে কি জান? সাপের বিষ দাঁত দুটো উপ্‌ড়ে ফ্যালে। অবিশ্যি বিষদাঁত উপ্‌ড়ে ফেলার পরও আবার বিষ দাঁত গজায়, তবে তা অনেক দিন পরে।

যাক সাপ এখন কত জাতের হয় আর কোথায় কতরকম পাওয়া যায় মোটামুটি তারও একটা হিসেব জেনে রাখো,—এক উত্তর আমেরিকায় একশ এগার রকমের সাপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে দুজাতের সাপের একদম চোখ নেই, অন্ধ। এছাড়া 'বোয়া' বা বাঙলায় যাকে ময়াল সাপ বলি আমরা, তাও পাওয়া যায়। 'পাইথন' বলে এক জাতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ পাওয়া যায় আফ্রিকার জঙ্গলে, আর 'আনাকোণ্ডা' বলে যে ভয়ঙ্কর বিরাট সাপ তা পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার 'ডেথ্‌এ্যাডার' (Death adder) বা দ্রাতের সাপ,

কেউটে আর গোখরার বিষের তুলনায় এঁদের বিষ ঢের বেশী বিপদজনক। Cobra, Boa, Python ছাড়া আর এক জাতের বিষাক্ত সাপ আছে Viper, এদের মধ্যে আবার রকমারী আছে যেমন ধরো—Russels Viper, Horned Viper, Pit Viper, Sand Viper ইত্যাদি। Horned Viper সাপের মাথায় আছে দুটি শিং, এরা অতি ভয়ানক, থাকে সাধারণতঃ মরুর দেশের বালিতে গা ঢাকা দিয়ে। যখন সারি সারি উট জন্তু জানোয়ার বা মানুষ দল বেঁধে মরুভূমি পার হয়, তখন তারা বালির ভেতর থেকে শুধু মাথাটি বার করে ছোবল মারে ঐ জীবজন্তু বা মানুষের পায়ে। আমাদের দেশের ঢ্যাম্‌না আর বোড়া জাতের সাপের এই Viper জাতের সাপ, তবে এদের ঐ সব দেশের Viperদের মত বিষ নেই।

Viper জাতের সাপেদের রাজত্বে 'র‍্যাট্‌ল্‌' জাতের সাপেরও খুব নাম ডাক—এই 'র‍্যাট্‌ল' সাপও চৌদ্দ পনের রকমের হয়। 'র‍্যাটে্‌ল' মানে 'ঝুম্‌ঝুমি' তা জানতো? অর্থাৎ এই র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ যখন জঙ্গলের পথে সব সর করে যায়, তখন ইচ্ছামত ল্যাজনেড়ে ঝুম্ ঝুম্ করে বাজনাও বাজাতে পারে। ঘাবড়ে গেলে কথাটা শুনে? এই র‍্যাট্‌ল্‌ জাতের সাপরা সাধারণতঃ থাকে পাহাড়ে যায়গায় আর বালি কাঁকরের দেশে,—জলা যায়গায় এরা বড় একটা যায় না। র‍্যাটল্‌ সাপ চলার সময় বাজনা বা শব্দ হয়, কারণ তাদের ল্যাজের ডগায় কতকগুলি ফাঁপা নল, মেয়েদের হাত বালার মতো অবস্থাতে থাকে, ঐগুলো তাদের নড়া চড়ার ফলে একটা আর একটা গায়ে লেগে শব্দের সৃষ্টি করে, ব্যাপারটা আসলে এই। এদের ল্যাজে এই যে 'ঝুম্‌ঝুমী' বা শব্দের ব্যবস্থা, এর কারণ যে কি তা প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কেউ ঠাওর করতে পারেননি—তবে এটা দেখা গেছে, একটা র‍্যাটল সাপ যেই ল্যাজ নেড়ে শব্দ করে, অমনি আশপাশের 'র‍্যাটল' সাপ ল্যাজ নেড়ে শব্দ করে, হয়তো ওর ভেতর দিয়ে ভাবের আদান প্রদান হয়। 'র‍্যাটল' সাপ এদেশে মেলেনা—ওরা থাকে উত্তর আমেরিকায়।

'পাইথন' আর বোয়াদের কথা এবার কিছু বলা যাক্। 'পাইথন' সাপ এক একটা ৩০।৪০ ফুট লম্বা হয়, এরা অন্য অন্য সাপের মতো খোলস ছাড়ে না, কাজেই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের চামড়া কুমীরের চামড়ার মতোই মোটা হতে থাকে। এরা ছোট ছোট হরিণ, ভেড়া ছাগলের মত পশুকেও গিলে খেতে পারে, তবে তার আগে তারা ঐ জানোয়ার বা শিকারটিকে জড়িয়ে ধরে, শরীরের চাপ দিয়েই তাকে পিষে মারে। 'পাইথন' সাপকে আমাদের দেশে বলা হয়, 'ময়াল' বা 'অজগর'—আসাম ও নেপালের জঙ্গলে * এদের দেখতে পাওয়া যায়।

'অজগর' সাপ বলতে যা বোঝ তার চেয়ে বড় জাতের সাপ হচ্ছে 'আনাকোণ্ডা' সাপ, এরা ষাট পঁয়ষট্টি ফুট লম্বাতে হয়। ১৯১০ সালে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির মেজর ফসেট ৮৫ ফুট এক 'আনাকোণ্ডা' দেখেছিলেন আমেরিকার জঙ্গলে। এরা নড়তে চড়তে পারেনা বলে নাকি দূরের জানোয়ারকে হিপ্নোটাইজ করে টেনে আনে। আদিম কালের পুরানো বিরাটাকারের জানোয়ারদের বিরাটত্বের প্রমাণ এই আনাকোণ্ডা দেখেই খানিকটা পাওয়া যায়। সাপরা অনেককাল না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে—এইটাই সাপের জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত কথা, আর তাই এদের বলা হয় 'বায়ুভূক'।

* উড়িষ্যায় ঢেনকানাল রাজ্যেও অজগর সাপ দেখতে পাওয়া যায়।—সঃ।

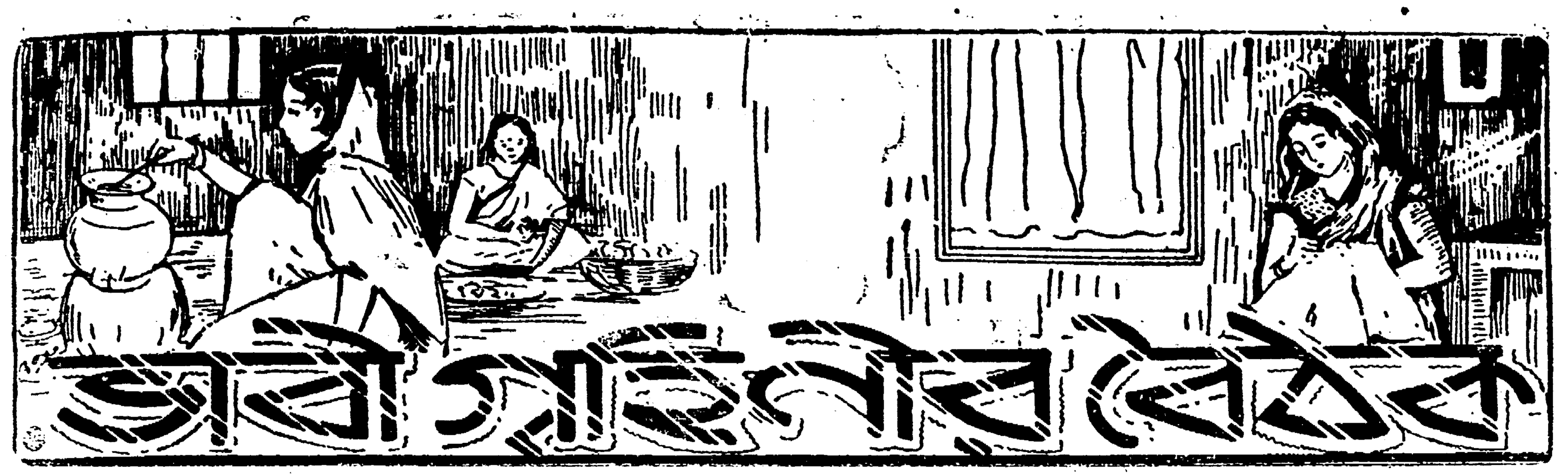

ভাবী গৃহিণীর বৈঠক

শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার ছোট্ট ছোট্ট বোনেরা!

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর ৺বিজয়ার প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে এলাম ভাবীগৃহিণীর বৈঠকে, ভাবী গিন্নিদের কাছে।

এই বিশেষ দিনে ৺বিজয়ার এই দিনটিতে অন্তরের নিষ্ঠা ও পবিত্রতা নিয়ে আমরা শত্রু মিত্র সবাইকে দিই আলিঙ্গন, জানাই অন্তরের প্রীতিশুভেচ্ছা, ভালবাসা। অন্তরের প্রীতিশুভেচ্ছা জ্ঞাপনের এই যে আদর্শ, সে আদর্শের গুরুত্ব ও পবিত্রতা তোমরা অন্তরে উপলব্ধি করো। প্রার্থনা করি ও আশীর্ব্বাদ করি তোমরা বাংলার ঘরে ঘরে প্রাণময় সজীবতা ও আনন্দ গানে ভরিয়ে তোলো।

তোমাদের কাছে থেকে কয়েকটী চিঠি আমি পেয়েছি এবং মধ্যে মধ্যে পেয়ে থাকি সে কথা তোমরা তোমাদের দিদিভাই মারফৎ জানতে পারো, স্থানাভাবে সব সময় আসতে না পারলেও সব খবরটুকু আমি পাই।

আজ কিন্তু আমি সেলাই বলবো না—সেটা পরের বারের জন্য রইল—আজ এসো অল্প সল্প খুঁটিনাটী নিয়ে আলোচনা করি। সেগুলো ছোট ছোট কাজ অথচ প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় প্রায়ই আমাদের কাজে লাগে।

ধরো, ছুটোছুটী করতে করতে অসাবধানতা বশতঃ তোমাদের জামা কাপড়ে আল্‌কাতরা লেগে গেল, অথবা রান্নাঘরে জল্‌দি জল্‌দি খাবার তাগাদা করতে গিয়ে অন্যমনস্কতায় শাড়ীটায় বা ভাল জামাটায় হলুদ লাগিয়ে ফেল্লে, তখন মনের দুঃখে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে তো? অন্ততঃ আমি যখন তোমাদের মত ছিলাম তাই কিন্তু করতাম—কিন্তু আমি তোমাদের উপায় বলে দিচ্ছি। আল্‌কাতরা যদি লাগে তাহলে মাখন দিয়ে ঘষে তাকে তুলবে আর মাখনের যে দাগ হবে সেটা অনায়াসেই সাবান জল দিয়ে তোলা যাবে। আর সাধারণ শাড়ী—অর্থাৎ যে কাপড় তোমরা জলে ধুতে পারবে—সেই কাপড়ে যদি হলুদের দাগ লাগে—মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে পরে সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই

হবে, আর যে সব কাপড় জলে ধোয়া যাবে না সেখানে জলের বদলে ইউক্যালিপটাস দিয়ে নিও। ঘি জাতীয় জিনিস যদি লাগে তাহলে ফ্রেঞ্চচক্ দিয়ে সাফ করে নিও। লোহার দাগ তুলতে হলে নুন আর লেবু দিয়ে তুলে পরে সোডার জলে দিলেই হবে। আইডিনের দাগ যদি লাগে, তাহলে ইউক্যালিপটাস অয়েল আর গরম জলের সাহায্যে তোলা যাবে, গরম কাপড়ের উপর যদি লাগে তাহলে গ্লিসারিণ আর গরম জলে তুলে ফেলবে।

বর্ষাকালে কাপড় জামা ভিজে থাকলে কালো কালো ছিট ছিট দাগ হয়, যাকে আমরা সাধারণ কথায় বলি মোষে ধরা। আচ্ছা বলো তো সেই বিশ্রী দাগগুলো কেমন করে তুলবে? শোনো তবে, যে সাবানে খুব তাড়াতাড়ি ফেনা হয় সেই সাবানের সঙ্গে সবেদা (দু'টীর ভাগ কিন্তু সমান সমান হবে) মিসিয়ে যা হবে তার অর্দ্ধেক নুন এবং পাতি লেবু এক চাকা—সবটুকু পেন্টের মত করে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পরে ব্রাস করে ঘাসের উপর শুকনো করতে দেবে।

তোমাদের চুল তো সোডা সাবান দিয়ে সাফ করো? তাতে জ্বালা করে—আচ্ছা, আমি একটা উপায় বলি: টক দই আর বেসন দিয়ে পরিষ্কার করে দেখো তো। চওড়া জরী পাড় বসান যে শাড়ী তোমরা পরো—তার জরী মাঝে মাঝে অপরিষ্কার হয়ে যায়, সেগুলি পরিষ্কার করার সহজ উপায় হচ্ছে পাড়গুলি শাড়ী থেকে খুলে সোডা বাইকার্ব্ব্ দিয়ে রোল করে রাখা, পরে তাকে ব্রাস করে নিয়ে আবার যথাস্থানে লাগাবে।

দাঁত যদি হলদে রং হয়ে যায় বিশ্রী দেখায়, দাঁত সর্ব্বদা পরিষ্কার ও ঝকঝকে রাখবে—কারণ দাঁত দেহের দুর্গ বিশেষ। হলদে দাঁত পরিষ্কার করার উপায় সোডা বাই-কার্ব্ব দিয়ে দাঁত ধুয়ে ফেলা।

পিকনিক করতে বসেছ সকলে—অথচ মাংস কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না—কি করবে তখন? আস্তসুপারি দু'খানা করে চূণ মাখিয়ে মাংসের ভিতর দিলে অথবা কাঁচা পেঁপের আটা দিলে তাড়াতাড়ি সুসিদ্ধ হবে। পিকনিকের সময়ই যদি ভাল করে রান্না করতে গিয়ে তরকারীতে হলুদ বেশী দিয়ে ফেলো চট করে খুন্তীটা উনানের ভিতর দিয়ে দেবে, বেশ টকটকে লাল হলে সেটা তরকারীর মধ্যে ডুবিয়ে দিলে গন্ধ কাটবে—লজ্জার হাত হতেও পরিত্রাণ পাবে।

এত কথা বল্লুম যখন, তোমাদের 'পিকনিক' এ নিশ্চয় আমায় ডাকবে—কি বল? আমি সেই আশায় রইলাম কিন্তু।

———

বি জ য়া-লি পি

রংমশালের মশাল ধারীরা সবে
জড় হলো আজ বিজয়ার উৎসবে।
প্রীতি ভালবাসা শতধারে আজ আনে
বাতাস ভরেছে অপরূপ কোন্ গানে!
লিপির আখরে সে কথা উঠেছে ফুটে
আলোর বারতা এসেছে আঁধার টুটে।
দানবে জিনিলা' শ্রীরামচন্দ্র, আজও সে মহিমা জাগে!
শত্রু মিত্রে দিয়েছিল প্রেম অপরূপ অনুরাগে।
ভুলি বিদ্বেষ হিংসা গরল সে দিনের কথা স্মরি'
অন্তরে নিয়ে অমলিন প্রেম, সবারে সাদরে বরি।
গুরুজনে দিই শ্রদ্ধা প্রণাম, বন্ধুরে দিই প্রীতি
ছোটদের দিই স্নেহাশীষ শুধু অপরূপ এই রীতি।
ক্ষণেকের তরে পাই যে আভাস দেব দুর্লভ ক্ষণে
অন্তর মধু অকৃপণ হাতে বিলাই যে জনে জনে।
এসেছো তোমরা একে একে সব ছোট ভাইবোনগুলি,
অন্তরে শুনি তোদেরি কণ্ঠ অযুত স্নেহের বুলি!

‘অমল’ শোভায় ‘দিবাকর’ জাগে এসেছে ‘জ্যোতির্ম্ময়’
‘অসীমেতে’ শুনি নাহি ভয় ওরে নাহি কিছু সংশয়।
‘বিনীতা’ আজিকে ‘রহিমা’র সাথে বিজয়া আশীষ মাগে,
‘রেখা’র মাঝারে ‘প্রীতি’র ‘বিকাশ’ ‘সন্ধ্যা’র অনুরাগে।
ভরিয়া উঠেছে অন্তর মোর আনন্দ ভরা ‘ছবি’
মুখর অন্তর মূক হয় আজ, অকবিও হয় কবি।
‘মণিমালা’ আজ ‘অতুল’ আনন্দে ‘প্রীতি’র ‘পুষ্প’ গাঁথে
‘কেশব’ এলো কি মণি ‘পান্না’য় ‘মীরা হীরকে’র সাথে।
‘মৃণাল’ এসেছে পদ্ম সুরভি ‘হিমানী’র শীতলতা
অন্তর মাঝে শুধু শুনি আজ অতীত দিনের কথা।
এলো ‘সুধীন্দ্র’ এলো ‘নৃপেন্দ্র’ ‘লালমোহন’ও আসে
‘গোপেশ্বর’ যে ‘সত্য’রে লয়ে এলো ভরা আশ্বাসে।
‘অশোক’ এনেছে মিলনের ‘বাণী’ এনেছে ভক্তি ‘গীতা’
একে একে আসে মশালধারীরা, ওরা যে মোদের মিতা।
প্রীতি শুভেচ্ছা আর স্নেহাশীষ তোমরা জানিবে সবে
ভাবিতেছি কবে বিজয়া মোদের বিজয়-চিহ্ন হবে।
তোমরা যাহারা পাঠাতে পারোনি লিপি দূত মোর কাছে
তাহাদের কথা সব চেয়ে আগে মোর কাছে আসিয়াছে॥

শুভাকাঙ্খিনী

দিদিভাই

চলন্তিকা

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা কত? এ বৎসর সেন্সাস রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারী এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা—৩৮৮,৮০০,০০০ অর্থাৎ ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ। ১৯৩১ সালে অর্থাৎ ১০ বৎসর আগে যখন লোক গণনা করা হয়েছিল তখন লোক সংখ্যা ছিল ৩৩৮,৮০০,০০ অর্থাৎ ৩৩ কোটি ৮৮ লক্ষ। তার মানে, গত ১০ বছরে লোক বেড়েছে ৫০,০০০,০০০ অথাৎ ৫ কোটি। তোমরা নিশ্চয় ভাবছ উঃ বাবা কত লোক! কিন্তু বিশাল ভারত এর তুলনায় লোক সংখ্যা কি খুব বেশী? শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হত, এর চেয়ে অনেক বেশী তার সন্তান সন্ততিকে অন্নদানে সুখী করে রাখতে পারত। আজকালকার বাজারে যে দেশের লোক সংখ্যা যত বেশী সে দেশের ততই ভাল। মনে করে দেখ এতগুলি লোক ভারতমাতার বিপদআপদে তাকে রক্ষে করবে, তার হয়ে অস্ত্রধারণ করবে! অবশ্য এই লোক-সংখ্যায় অনেক বিদেশী আছে সে কথা বলাবাহুল্য। আজ রবীন্দ্রনাথের গান একটু বদলে আমরা বলব—আটত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ।

গত ১লা অক্টোবর থেকে কলকাতার স্থানীয় সময় ৩৬ মিনিট এগিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তার নতুন নামকরণ হয়েছে—বেঙ্গল টাইম। ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত যখন ১২টা বাজল তখন কলকাতার সমস্ত ঘড়ি ১২-৩৬ করে দেওয়া হল। কলকাতার সময় ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড বা রেলওয়ে সময় থেকে ২৪ মিনিট এগিয়ে ছিল তাতে আরো ৩৬ মিঃ যোগ হল অর্থাৎ রেলওয়ে সময় থেকে কলকাতার সময় (যার নাম এখন বেঙ্গল টাইম) একঘণ্টা এগিয়ে গেল। এখন এই বেশী ৩৬ মিনিটের হিসেবের ঘরে শূন্য পড়ল, তার মানে, কোন হিসেবই এর রইল না! সেপ্টেম্বর রাত (বা ১লা অক্টোবর সকাল যাই বল) ১২টা থেকে ১২-৩৬ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে সব ঘটনা ঘটল তার সময়লিপি তোমরা কি রাখবে? কর্ত্তারা বললেন, যুদ্ধের বাজারে ব্ল্যাক-আউটে এ রকম ব্যবস্থা না করলে চলছিল না। অফিস আদালত থেকে বাড়ী ফিরতে

বাবুদের দেরী হয়ে যেত, ব্ল্যাক-আউট বলে বাজারটা করা যেত না, তাই তাঁদের সুবিধের জন্য তাঁদের পকেটে রোজ ৩৬ মিনিট বেশী খুচরো সময় দেওয়া হল।

দীপালী উৎসব সমস্ত হিন্দুস্থানের একটি অপূর্ব্ব উৎসব। গত দীপালীর রাতে সারা হিন্দুস্থান ঘরে ঘরে দীপালোকিত হয়ে উঠেছিল। ব্ল্যাক-আউটের আঁধারে কালো কলিকাতার রাত্রিগুলির মধ্যে সে আলোকময়ী রাত্রিটি আমাদের কাছে খুব ভাল লেগেছিল। এত শুধু দীপ জ্বালা নয়, অন্ধকার দূর করে আলো ও আনন্দ আনাই দীপালীর উদ্দেশ্যে। সমস্ত দুনিয়া ঘন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক না কেন, ভারতের ঘরে ঘরে এই রকম অন্ধকারনাশিনী আনন্দ উজ্জ্বল দীপালী উৎসব যেন আমরা প্রতি বছর আমাদের মধ্যে সগৌরবে জাগিয়ে রাখতে পারি। রংমশালের আলোয় প্রদীপ্ত ছেলেমেয়েদের সুন্দর মুখগুলি যেন আমরা প্রতি বছর দেখতে পাই। ফুলঝুরি, রংমশাল, নানা রংবেরং-এর আলো, আলোর ফুল, নানা রকম আতসবাজি নানা আনন্দ উৎসবের উপকরণে সমুজ্জ্বল এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ছেলেমেয়েদের একান্ত নিজেদের উৎসব।

ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতাই হল খেলাধূলার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, বিশেষ করে ফুটবল খেলার! কলকাতার এবছরকার ফুটবল খেলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল। প্রথমেই মহামেডানস্ স্পোর্টিং এর নাম করতে হয়। বম্বের রোভার্স কাপ ছাড়া এই দলটি ভারতের নাম করা প্রায় সমস্ত ফুটবল প্রতিযোগিতাতেই জয়লাভ করেছে। কলিকাতার লীগ (১ম বিভাগ), আই এফ এ শীল্ড ও পাওয়ার মেমোরিয়াল লীগ এরা পেয়েছে। দুঃখের বিষয়, রোর্ভাস কাপ এ ফ্যাইনালে এ দলটি ওয়েল্চ এর কাছে হেরে গেল। তা তাহলেও, মহামেডানস স্পোর্টিংকেই ভারতবর্ষের মধ্যে এখন ফুটবলের সেরা দল বলতে হয়। এরপর নাম করতে হয় চিরপরিচিত মোহন বাগান দলের। এই দলটি কুচবিহার কাপ, চণ্ডীচরণ শীল্ড, লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড, রাজা শীল্ড, কোহিনূর শীল্ড ও লক্ষ্মীবিলাস কাপ জয়লাভ করেছে। এতগুলি শীল্ড কাপ লাভ করা বিশেষ গৌরব ও কৃতিত্বের বিষয়!

মহামেডানস যেমন প্রথম বিভাগ লীগ পেয়েছে তেমনি অরোরা পেয়েছে দ্বিতীয় বিভাগ লীগটি। রবার্ট' হাডসন দলটি তৃতীয় বিভাগ লীগে প্রথম হয়েছে, তা ছাড়াও এই দলটি ট্রেডস্ কাপ পেয়েছে। ই বি আর ও নর্থ ষ্টাফর্ড্স্ ইয়ঙ্গর কাপ ও গ্রীফিথ শীল্ড পেয়েছে। কলেজীয় প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে, রিপণ কলেজ হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ও ইলিয়ট

শীল্ড পেয়েছে। বঙ্গবাসী কলেজ পেয়েছে হেরম্ব মৈত্র শীল্ড ও আশুতোষ কলেজ কলেজ-টুর্ণামেণ্টে ১ম হয়েছে। স্কুল প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে, প্রথম ডিভিসন লীগে খিদিরপুর একাডেমী ১ম ও মিত্র ইনষ্টিটিউসন (ভবানীপুর) ২য় হয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে কলিকাতা মাদ্রাসা ১ম ও কালিধন ইনষ্টিটিউসন ২য় হয়েছে আর তৃতীয় বিভাগে জগবন্ধু ইনষ্টিটিউসন ও বঙ্গবাসী স্কুল ১ম ও ২য় হয়েছে। মনোরমা কাপ পেয়েছে তীর্থপতি ইনষ্টিটিউসন ও মণ্টু কাপ পেয়েছে চেতলা বয়েজ স্কুল।

রুশ জার্ম্মাণ যুদ্ধ দিনে দিনে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গত কয়েকদিনের খবরে প্রকাশ, জার্ম্মাণীর অক্টোপাস সৈন্য ক্রমশঃ মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্চে। রুশ প্রাণপণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এতে রুশ সৈন্যের যত না ক্ষতি হচ্ছে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী ক্ষতি হচ্ছে জার্ম্মাণীর। লক্ষ লক্ষ সৈন্য মারা যাচ্ছে। রুশদেশে শীতের প্রকোপ নামবার আগেই জার্ম্মাণ সৈন্যদের এগিয়ে যেতে হবে এই সঙ্কল্পে জার্ম্মাণী বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালাচ্চে। কিন্তু অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্বে রুশ মস্কো রক্ষা করছে। সম্প্রতি প্রকাশ শত্রু সৈন্য মস্কোর সদর দরজার নিকটে নাকি হানা দিচ্ছে। রুশ বলেচে আমাদের অতি সুন্দর মস্কো দেশ চিরদিনই আমাদের থাকবে, কেউ তাদের নিতে পারবে না। আমাদের শেষ রক্ত দিয়ে আমরা মস্কো রক্ষা করব।

রংমশাল প্রতিযোগিতা

রংমশালের গত প্রতিযোগিতাগুলি সম্পর্কে আমাদের ঘোষণা মত নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাদের নাম-লেখা রৌপ্য পদক ও পুস্তক পুরস্কারগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—

ছোট গল্প : শিবানী সিংহ, গ্রাঃ নং ৪৮৪। অমিত রঞ্জন রায়চৌধুরী গ্রাঃ নং ১৪১২
হাসির কবিতা : হরিভূষণ মৈত্র, গ্রাঃ নং ১৫৩৫
রংমশালের শ্রেষ্ঠ লেখার লিষ্ট : আরতি মিত্র, গ্রাঃ নং ১৪২৪
চিঠি : চিন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রাঃ নং ১৪১০। রহিমা খাতুন, গ্রাঃ নং ৭৭৭
রবীন্দ্র সাহিত্য : সত্যব্রত বসু, গ্রাঃ নং ১৬১৩। সাধনা ও রেণু বিশ্বাস, গ্রাঃ নং ১৬৬২

গত আশ্বিনের 'পূজার ছুটি' প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ৭ই কার্ত্তিকএর পরিবর্ত্তে ২০শে কার্ত্তিক করে দেওয়া হল।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীইন্দিরা গুপ্তের সৌজন্যে)

১। কোন অক্ষর তরল ? ২। কোন অক্ষর শূন্য ? ৩। কোন অক্ষর অবাক হয়ে গেছে ? ৪। কোন অক্ষর যেতে বলছে ? ৫। কোন অক্ষর থাকতে বলে ? ৭। কোন অক্ষর হতে বলছে ? ৮। কোন অক্ষর সইতে বলে ?

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ—২৫শে কার্ত্তিক।

আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর

১। সাইকেল চালাচ্ছে, ২। ফুটবল 'কিক্' করছে, ৩। লাঠাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, ৪। সিঁড়িতে (ধাপে) উঠছে, ৫। ব্যায়াম করছে (ডাম্বেল ভাঁজছে), ৬। আরাম-কেদারায় শুয়ে আছে।

এবার ধাঁধার উত্তর আমরা এত বেশী পেয়েছি যে যদি সকলেরই নির্ভুল উত্তর হ'ত তাহলে আমরা তাদের নাম ছাপাতে কাগজে জায়গা পেতাম না। বেশীর ভাগ হয়েছে দু'টি ভুল আর একটি ভুল। অথচ ধাঁধা শক্ত ছিল না। কেবল নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাগণের উত্তর নির্ভুল হয়েছে। স্থানাভাবে একটি-ভুল উত্তরদাতাদের নাম ছাপা সম্ভব হ'ল না।

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছেঃ—

সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও তুষারকণা দেবী, বর্দ্ধমান ; অজিতকুমার দাস, মেদিনীপুর ; সুধীরকুমার সেন, বীরভূম ; দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নদিয়া ; সলিল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ; বিকাশ, রণজিত, অপরাজিতা, অনিতা, নমিতা, মমতা, সবিতা ও ললিতা, হাওড়া ; কৃষ্ণধন সরকার, মেদিনীপুর ; বটকৃষ্ণ মিত্র ও শান্তিকুমার ঘোষ, হাওড়া ; ধ্রুবেন্দ্রকুমার সেন, বালিগঞ্জ ; মহম্মাদ শামশের আলী, ছোট জাগুলিয়া ; কুমারী রাণু চক্রবর্ত্তী, রাজসাহী।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত যাঁদের চাঁদা দেওয়া ছিল তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে চাঁদা পাঠিয়ে দেন।

দস্যি মেয়ে

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

রংমশাল
ষষ্ঠ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ
১৩৪৮

দস্যি মেয়ে

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

নেডাঙ্গার রক্ষাকালী,
মা-মরা সে মেয়ে—
য়স হবে দশ কি বারো—
দুষ্টু সবার চেয়ে !

াড়ার যত ছেলেমেয়ে
সবাই তারে) করে বিষম ভয়,
ক্ষাকালীর মেজাজ ভারী--
যে সে মেয়ে সে নয় !

খেলার মাঠে, দৌড় ধাপে
সবাই মানে হার,
রক্ষাকালীর সাথে কারুর
পেরে ওঠাই ভার !

তালদিঘীতে সাঁতার দেওয়া
নিত্য কর্ম্ম তার ।
ছেলে বুড়ো সবার আগে
হয় সে দিঘী পার ।

ঘুষোঘুষি, মারামারি
সবেতেই ওস্তাদ,
সব কষ্‌রৎ শিখেছে সে
কিছুই দেয় নি বাদ !

ঠাকুরমা ক'ন্,—"ধিঙ্গী মেয়ে,
ওরে লক্ষ্মী ছাড়ি—
রান্নাবান্না শিখ্‌বি নে কি ?
(তোর) এ বড়ই বাড়াবাড়ি !

রক্ষাকালী চপল ভারি,
মুচ্‌কে হেসে কয়,
"রসুই বামুন করবে রান্না
—ও কাজ আমার নয় !"

ঠাকুরমা কন্, ভীষণ রেগে,
"হোকনা বিয়ে, বুঝ্‌বি তখন,
রান্নাবান্না, বাসন মাজা—
সব করতে হবে যখন ।

রক্ষাকালী ভীষণ রাগী !
বল্‌লে রেগে গিয়ে,
"পালিয়ে যাব বাড়ী থেকে
দাও যদি মোর বিয়ে ।

তার পরেতে, খানিক থেমে
একটু মুচ্‌কে হেসে
জড়িয়ে ধরে' ঠাকুরমাকে
বল্‌লে ভালবেসে,

"ওসব কথা রাখো এখন,
(একটা) মজার কথা শোনো—
পাড়ার বলু বুড়োধাড়ী
সন্দেহ নাই কোনো !

তারি সাথে, লাগাম দিয়ে
'ঘোড়াঘোড়া' খেলার কথা হ'ল,
আমায় প্রথম কর্‌লে ঘোড়া,
আমার কি দোষ বল ?'

রেগে আমি দৌড় লাগালাম
—যত জোরে পারি,
লাগাম ধরে' পাল্লা দেওয়া
কঠিন হ'ল তারই ।

তারপরেতে আমার পালা
(এবার) তাকে ঘোড়া ক'রে,
চাবুক মেরে, লাগাম নেড়ে,
খুব ছোটালুম জোরে !

হাঁপিয়ে মরে বলাইচন্দ্র
ঘাড়টি ক'রে নীচু ;
সবাই বলে, হেরেছে সে
সন্দেহ নাই কিছু !

গর্ব্বটি তার খর্ব্ব হ'ল
আমার কাছে হেরে,
সবার কাছে রক্ষাকালীর
মান্য গেল বেড়ে।

বিয়ের কথা তুলো না আর
বল্‌ছি খবরদার !
ইচ্ছে আছে হবার আমার
—ডাকাত-সর্দ্দার ॥

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগুন্তি বানর সেনা নিয়ে কি প্রকারে সাগর পারানো যায় এই চিন্তা হয়েছে রামের। 'ভাই লক্ষণ' করে বানর সেনা কত হবে তাই ক্রমাগত গণনা করছেন নামতা আউড়ে—

"শত লক্ষ বানরেতে এককোটী জানি ।
শত কোটী বানরেতে একবৃন্দ মানি ।
শত কোটী বৃন্দে এক অর্ব্বুদ
শত কোটী অর্ব্বুদে—কত দাদা ?"—"এক খর্ব্বুদ !"

লক্ষণ বল্লেন—শত কোটী খর্ব্বুদে ? রাম বল্লেন—ধর এক তর্ব্বুজ

লক্ষণের নামতা বিদ্যেয় আর কুলোয় না। দুই হাতের আঙুল চলছে যেন মালা জপছেন। রাম বলছেন—"কত হল ভাই ?" চমক ভেঙে লক্ষণ বলছেন—"শত কোটী তর্ব্বুজে এক মহা তর্ব্বুজ"। "তোমার মাথা" বলে রামচন্দ্র বল্লেন, "এক মহা তর্ব্বুজে যত কটা বিচী ততকটা বানর গিজগিজ করছে দেখে নাও, এদের নিয়ে সাগর পারে যাওয়া অসম্ভব।" লক্ষণ গণনা শেষ করলেন—"শতকোটী মহা তর্ব্বুজে এক সমুদ্র শত কোটী মহাসমুদ্রে এক অপার, অপারের অধিক গণনা নাই আর।" "বস্ !" বলে রামচন্দ্র হতাশ হয়ে বল্লেন—"অগণন বানর গণে ওঠা ভার এদের লয়ে কেমনে হই পার।" এই সময় লক্ষণের ফল রাখা তূণের মধ্যে থেকে শব্দ হল—

অপারের উপরে এক রাম,
কাষ্ঠবিড়াল ইহা গণে কইলাম।

রাম বল্লেন—"লক্ষণ, দৈববাণী হচ্ছে তূণের মধ্যে দেখ কোন দেবতা আছেন।" লক্ষণ আস্ত একটী কাষ্ঠবিড়াল তূণের মধ্যে থেকে টেনে বার করে রামের সামনে বসিয়ে দিলেন। রাম বল্লেন—"কস্তম্ ?" কাষ্ঠবেড়াল কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লেন—"যেমন রামচন্দরের তিনি হনুমান তেমনি ভাই লক্ষণের ইনি কাষ্ঠবিড়াল, মা জানকীর কৃপায় ; পঞ্চবটিতে থাকতে ফল গণণা করতে শিখেছিলাম মার কাছে।" লক্ষণ গজগজ

করে বল্লেন কাষ্ঠবিড়াল নয় জ্যেষ্ঠতাত বলা যায়। রাগত হন্ কেন্ "বলে কাষ্ঠবিড়াল" ঝাঁটা ল্যাজ ফুলিয়ে বল্লেন—

আগে শৃণু করেন ভাষ্য,
তবে করেন হাস্য।

রাম বল্লেন, "বদ রে কাষ্ঠবিড়াল বদ!" লক্ষণ একটী বদরী তার হাতে দিয়ে বল্লেন—"অভিমান ত্যজ।" কাঠবিড়াল তখন স্থির হয়ে বদরী খান আর বলেন—প্রভু আপুনি সাগর পার হবার চিন্তায় কাতর না হও। বলি শ্রবণ কর এক অপূর্ব্ব কথা ঃ—

পঞ্চবটীতে যখন ছিলাম তখন মা জানকীকে একা পেয়ে একদিন বল্লাম 'মা, আমাকে অনুমতি দাও আমি ওপার বনে আমার জন্মস্থানটা একবার দেখে আসি।' মা জানকী বল্লেন, 'অনুমতি না হয় দিলাম পরন্তু পঞ্চবটী আর পর্ককটী দুই বনের মাঝে যে দুস্তর গোদাবরী নদী সেটি পার হবা কি প্রকারে—গরুর যেখায় হেঁটো জল তোমার সেখায় ডুব জল! অনুমতি আজ থাক দেবর লক্ষণের কাঁধে চেপে অন্যদিন যাস।' আমি রোদন করছি দেখে জটাই পক্ষীর দয়া হল। তিনি বল্লেন, 'মা আমায় বল আমি খপ করে ওকে ছোঁ দিয়ে এপার ওপার করে আনি—তবে কাঠবিড়াল কৃষ্ণের জীব, আমার খপ্পরে পাছে মারা যায়, এই ভয় করি।' 'হায় মাতৃভূমি হায় জন্মমাটি' বলে আমি নিশ্বাস ফেলতে মুনিকন্যারা এসে উপস্থিত। তারা ব্যাপার শুনে বল্লেন—'ও জনকনন্দিনী বটপাতার ভেলা করে তাতে রাম নাম লিখে তোমার কুপুষ্যিটিকে ভাসিয়ে দাও ঠিক ওপারে গিয়ে উঠবে!'—

বটপাতার ভেলা তায় রাম নামের নিশান,
কাষ্ঠবিড়াল তায় সুখে পার পান।

এখন পারাবার পার হবার উপায় তো পেলেন আর ভাবনা কেন? রাম বল্লেন—বৎস, রাম নামের ভেলায় সবাই যেন পার হল কিন্তু এই হতভাগা রামের বেলায় কি হবে? সে তো আর নিজের নামের জোরে নিজে সাগর তরতে পারবে না, অন্য উপায় ঠাওরানো চাই। ভাই লক্ষণ মহাবীরকে একবার ডাক দাও, তারে শুধাই কি বলে!"

গুহার কাছেই এলা লতায় গা ঢাকা হয়ে হনুমান 'সীতারান সীতারাম' তিন লক্ষবার জপ করতে বসেছিলেন এমন সময় লক্ষণ ডাক দিলেন। জপ রেখে মহাবীর খপ্ করে গণ্ডাটো এলাচী গালে ভরে উপস্থিত রামের দোরে। রাম বল্লেন, "হনুমান বানরদের মধ্যে কোন কোন বীর আছেন যাঁরা সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কা যেতে পারেন?" মহাবীর একটু ভেবে উত্তর করলেন—

রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে
বানর পেলে রাক্ষস কাঁচাই গালে পুরে।
সেখানে যেতে পারে এমন শক্তি কার,
মাঝ পথে ভীষণ সাগর অপার।
সুগ্রীব যাইতে পারে বীর অবতার,
অঙ্গদ যাইতে পারে বালির কুমার।
যাইবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি,
আমিও যাইতে পারি অব্যাহত গতি।
আর সব বানর কেবল লাঙ্গুলধর,
বড়াই করতে মজবুদ্ লড়াই করতে অসার।

রাম হনুমানকে আদেশ করলেন জাম্বুবানকে মন্ত্রণা সভায় সকলতে ডাককে। জাম্বুবান নিদ্রা যাচ্ছিলেন হনুমান ডাকতে জেগে উঠে তিন ডাক ছাড়লেন—"মন্ত্রণা সুমন্ত্রণা, বিলম্বনা।" তিন ডাকে শাখাতে শাখাতে সব শাখামৃগগণ ঘুম ভেঙে' বিড়ম্বনা বিড়ম্বনা বলতে বলতে ঝুপ ঝাপ উপ্ আপ টুপ্ টাপ গাছ তলে নেমে পড়ে চক্কর করে বসে গেল পঞ্চায়েতে, দশে পাঁচে, যুক্তি ঠাওরাতে—

'বানরের যুক্তি ল্যেজে টানাটানি গা চুলকানি এংচে ভেংচে মুখটি' কলা তলে বেলা শেষ হয় যুক্তি আর শেষ হয় না। সুগ্রীব থেকে থেকে চেঁচান—"কি বল মন্ত্রী?"

বিঘৎ প্রমাণ মর্কট গোদাতে ভেঁদাতে মহারোল গণ্ডগোল লাগায়—সাগর অপার, কেবা হয় পার, কে যাবে তথায়, কি করে কথায়, ঠাওরাও উপায়, বেলা যায় যায়।

উপায় আর কেউ ঠাউরে পায় না—কলরব কিলাকিলিই চলে ক্রমানগুঞ্জন ক্ষিতিং নারায়ণ, শেষ সভা ভঙ্গ হয় হয় এমন সময়—"সন্ন্য পরিত্যাগ কর, সন্ন্য পরিত্যাগ কর," বলতে বলতে জহ্নু মুণি দেখা দিতেই সবাই চুপ!

রাম লক্ষণ মহামুনিকে প্রণাম করে শুধোলেন—কিমর্থে আগমন? মুনি আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—"বাপ, রামচন্দ্র কপিলাশ্রম থেকে আসছি তোমার কাছে আমার একটু নালিশ আছে, দেখ আমার পালিত দুটী বানর আমার সেবা কর্ম্ম ছেড়ে তোমার সেনাদলে ভর্ত্তি হয়েছে, তাদের একবার আমার সামনে আনাও।" রাম লক্ষণের দিকে চাইতে, লক্ষণ বল্লেন —"আজ্ঞে এত কোটী বানরের মধ্যে তাদের দুটিকে খুঁজে পাওয়া দায়, তাদের নাম জানা থাকে তো বলেন।"—"নল আর নীল!" এবারে লক্ষণ সুগ্রীবের দিকে, সুগ্রীব অঙ্গদের দিকে, অঙ্গদ জাম্বুবানের দিকে, জাম্বুবান হনুমানের দিকে চাইতে, মহাবীর খপ্ করে নল

নীলের লেজ ধরে মুনির সামনে হাজির করা। নল নীল তখন গুরু হাতে দাণ্ডা দেখে গুরু দণ্ড ভয়ে আধমরা হয়েছেন !

জহ্নু বললেন—আরে বানররা ওঠ। দাণ্ডা উঠতেই নল নীল দণ্ডায়মান !—"নে, দণ্ডবৎ করে পায়ের ধূলো !" নল নীল গুরুর পায়ের দিকে হাত বাড়ায় !—"আরে মূর্খ ! অগ্রে আমার না, অগ্রে রামচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ কর, স্বয়ং বিষ্ণু হইলেন রাম অবতার —এরে আগে কর নমস্কার।" নল নীল যত আগায় রামচন্দ্র তত পিছান আর বলেন "থাক থাক !" মুনি দাণ্ডা তুলতেই দুই বানরে রামের পদধূলি কুড়িয়ে বুকে মুখে লেপন। মুনি বল্লেন —ধূলো লেপন হল এখন ভাই লক্ষণের পদলেহন হোক।

রামের ভাই লক্ষণ অংশ অবতার,
এর কাছে কর বিত্যার প্রচার।

নল নীল পদলেহন করতে আসে দেখে লক্ষণ বল্লেন—"থাক্ থাক্, কামড়ে কুমড়ে দেবে !" মুনি দাণ্ডা উঠাতেই, দাণ্ডা টপকে দুই বানরের কিচ কিচ ধ্বনি মুনি হাস্য করে বল্লেন—"এরে বলে দণ্ড লম্ফন, এরপরে পত্রকর্ত্তন গাত্র মর্দ্দন উদরা বাত্ত খাত্ত-খাত্ত বিচার বিল্বভঞ্জন ইত্যাদি চতুর্ষটি কলাবিদ্যায় এরা পারগ হয়ে পেলিয়ে এসেছে। এত বুদ্ধি ধরে নীল আর নলে ইয়ত্তা কে করে। তোরা একবার শিলা ভাসায়ন বিদ্যাটা প্রকাশ কর।" নল নীল মুনিকে ইঙ্গিত করলেন—"ক্রমশ প্রকাশ্য। স্বজাতির মধ্যে বিদ্যা না না করে প্রকাশ হিংসার বশে করবে সর্ব্বনাশ !" 'বটে বটে'—বলে মুনি রামের কাছে বল্লেন—

নল ছুঁইলে ভাসে জলেতে পাথর,
নীল যদি ছোঁয় মিশে পাদপে পাথর।

বিত্তের কথা চাপা রইলো না ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়লো।

রাম সাগর বাঁধতে আদেশ দিলেন নল নীলকে। তারা গাছ পাথরে নবতি যোজন বান্ধিল একমাসে, লঙ্কার প্রাচীর ঘর ক্রমশঃ দেখি কাছে !

এই বলে চাঁইবুড়ো পুথি গোড়ালেন সেদিন।

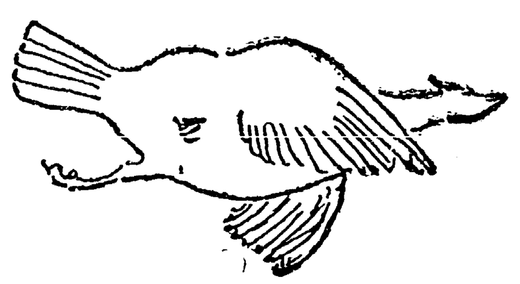

সরীসৃপদের কথা

শ্রীবিমল ঘোষ

সরীসৃপদের কথা বলতে বসে শুধু সাপের কথাই গত মাসে বলেছিলুম, গিরগিটি টিক্‌টিকী কচ্ছপ, কুমীর ওদের কথা তো একদম বলা হয় নি। শোন তবে ওদের কথাও কিছু কিছু বলি।

টিক্‌টিকী, গিরগিটী, তক্ষক ওরাও সরীসৃপ, ইংরাজীতে এদের বলা হয় Lizards—, এই Lizards অনেক রকমের আছে, কমসে কম আঠারো শো রকমের Lizards এই পৃথিবীতে লুকিয়ে বাস করছে। তার খবর কি কেউ জানো ? টিকটিকী গিরগিটির চেহারাটা সেকালের সেই প্রাগ ঐতিহাসিক জানোয়ারদের সঙ্গে খুব মিলে যায় ! ওদের হাল চাল, আদব কায়দা তাদের মতই অনেকটা। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, ভবিষ্যতে এই Lizards জাতের জানোয়ারদের শরীরের অনেক অদল বদল ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অদল বদল এর ফলে হয়তো ভাবীকালে এদের বংশধররা আবার নতুন ধরণের জানোয়ার হয়ে যাবে।

তোমরা তো ঘরের দেওয়ালে টিকটিকী আর দু' চার রকমের গিরগিটী বা তক্ষক দেখেছ, কেউ কেউ বা টিক্‌টিকী ছাড়া কিছুই দেখনি ? জান কি গোসাপ বা গাহাড়গিলে ...ই এক জাতের Lizards ?

গিরগিটি জাতের সরীসৃপরা কেউ কেউ উড়তে পারে; কেউ খাড়া দেওয়ালে হাঁসের মতো চামড়া দিয়ে জোড়া আঙুলওলা পা নিয়ে দিব্যি চলতে পারে। আমাদের দেওয়ালের টিকটিকীর আবার ভারী মজা, ল্যাজটি ছুঁলেই অমনি তখনই খসে যাবে। পরীক্ষা করে দেখতে চাও দেখ আমার কথাটা সত্যি কিনা ? টিক্‌টিকীদের এই ল্যাজ খসে যাবার ব্যবস্থাটাও তাঁর আত্মরক্ষার জন্যেই, কারণ সাধারণতঃ ওদের শত্রুরা ঐ ল্যাজটাই এসে ধরে চেপে, ঐ জন্য ওরাও ল্যাজটি রেখে ধড়টি নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বলতো কেমন মজা ? তোমাদের যদি কানটি ঐ রকম মাষ্টার মশাইয়ের হাতে রেখে পালাবার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে ভারী সুবিধে হোত না ? কেউ কেউ আবার শত্রুর হাত থেকে নিজেকে

বাঁচাবার জন্য গায়ের রঙও বদলাতে পারে। কোন কোন জাতের Lizards এর আবার সাপের মতো একদম কোন পা নেই।

আমাদের দেশের 'তক্ষক' জাতের গিরগিটীর এককালে খুব নাম ছিল। শোনা যায় রাজপুতনায় রাজপুতরা এদের পুরতো, কারণ এদের ল্যাজে দড়ি বেঁধে দিয়ে তার দুর্লঙ্ঘ দুর্গের গায়ে এদের ছেড়ে দিত এরা দূর্গের ওপরে উটে পাথরে নখ আটকে এমন আঁকড়ে শক্ত হয়ে বসতো যে সৈন্যরা সহজেই দড়িবেয়ে সটান ওপরে উঠে যেতো। এই 'তক্ষক' জাতের গিরগিটীই সবচেয়ে বড় জাতের Lizards এদের ইংরাজীতে বলা হয় Monitors.

এক জাতের গিরগিটী বা টিক্‌টিকী আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ে দেখা যায়, তাকে বলা হয় অঞ্জনী। এদের পা নেই বললেই চলে, অনেকটা দেখতে সাপের মতো, খুব চক্‌চকে লালচে বেগুনে রঙের গা। এই Lizards জাতের জানোয়ারদের দেখলে সাপ দেখার মতোই মানুষ ভয় করে। কিন্তু অতটা ভয়াবহ এরা নয়, সাপের বিষের মত এদের মানুষ মারার অস্ত্র কিছু নেই, তবে কামড়ালে জ্বালা যন্ত্রণা একটু আধটু হয়। তবে এরা সাধারণতঃ মানুষকে কামড়ায় না, এরা ভারী নিরীহ জীব।

Iguana বা Chameleon হচ্ছে আমাদের বহুরূপী জাতের গিরগিটি, এরাই রঙ বদলে শত্রুর চোখে ধুলো দেয়।

এই গিরগিটী বা টিকটিকী জাতের জানোয়ার আমিষ নিরামিষ দুইই খায়। পোকা, মাকড়, মাছি ফড়িং তো খায়, বড় বড় জাতের Lizards পাখীর বাচ্ছা, পাখীর ডিম তাও খায়, কারুর কারুর আবার সাপ খাওয়া অভ্যেস আছে। মোটামুটি টিক্‌টিকী, গিরগিটী সম্বন্ধে এইটুকই জেনে রাখো।

এইবার টিকটিকা গিরগিটীর মেশো খুড়ো ঐ কুমীরদের কথাই বলি কি বল? কুমীরের সঙ্গে টিক্‌টিকী গিরগিটীর সত্যি ঐ রকম কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ বলতে পারি যে কুমীরের চেহারার সঙ্গে গিরগিটী টিক্‌টিকীর চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। বহুকাল আগে স্প্যানিয়ার্ডরা যখন সবপ্রথম দক্ষিণ অ্যামেরিকায় যায় তখন তারা নদীর ধারে এদের দেখে, এদের বিরাটাকার Lizards বলেই ধরে নেয়। তারা তাদের ভাষায় এদের নাম দেয় 'Una Lagarta' যার ইংরাজী মানে হচ্ছে 'a Lizard'। এই 'Una Lagarta' কথার ইংরাজী অপভ্রংশ তৈরী হয়েই হয়েছে 'alligator'—এখন alligator বলতেও কুমীর বোঝায় আর Crocodile বলতেও কুমীর বোঝায়। কিন্তু তফাৎটা কি? Alligator আর Crocodile এ বিশেষ তফাৎ নেই, ছোট জাতের কুমীরকে বলা হয় alligater আর বড় জাতের কুমীরকে বলা হয় Crocodile আমাদের দেশে alligator বলতে বোঝায় মেছোকুমীর—অর্থাৎ যারা মাছ খেয়ে বেঁচে

সরীসৃপের রাজা

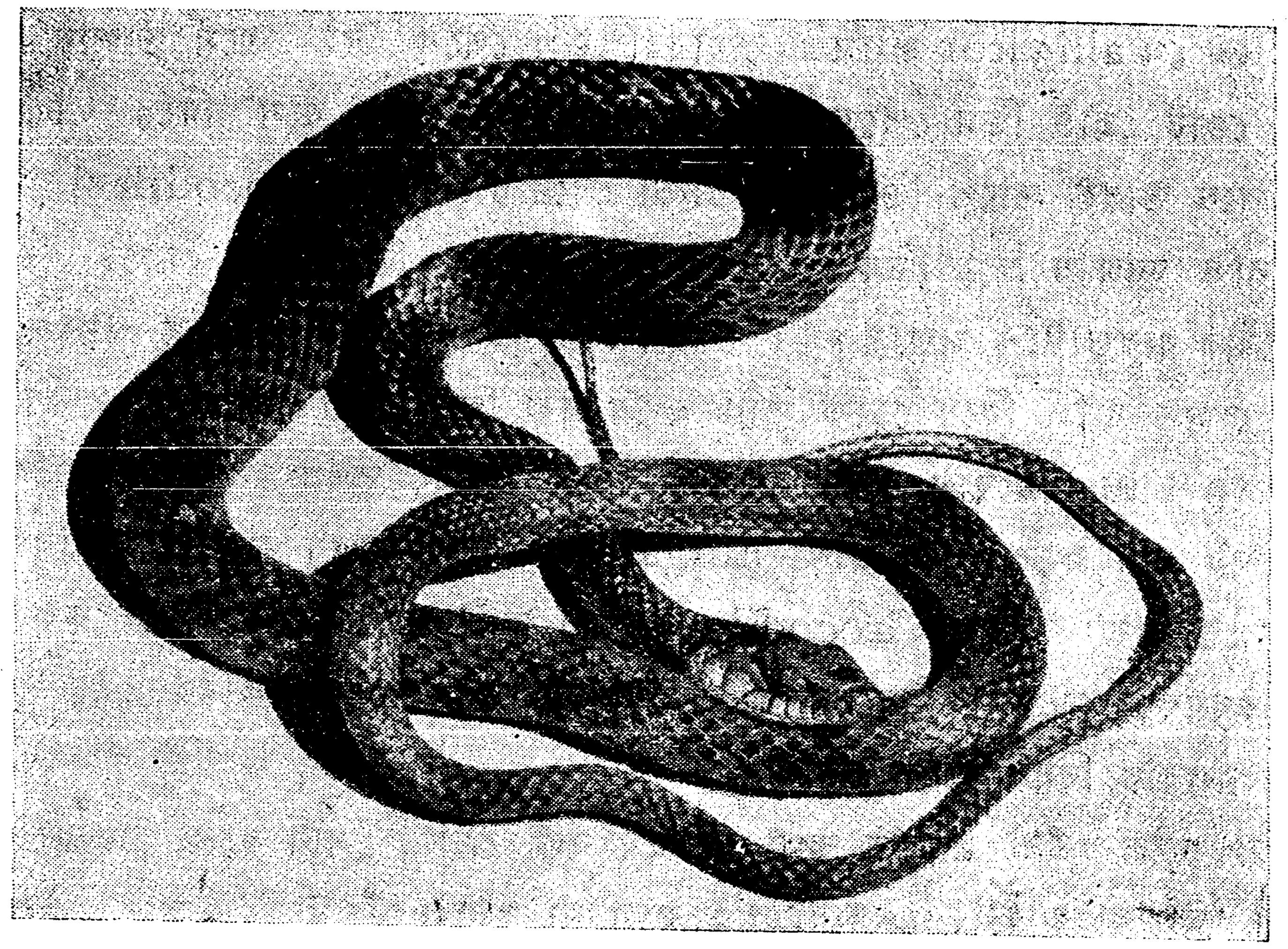

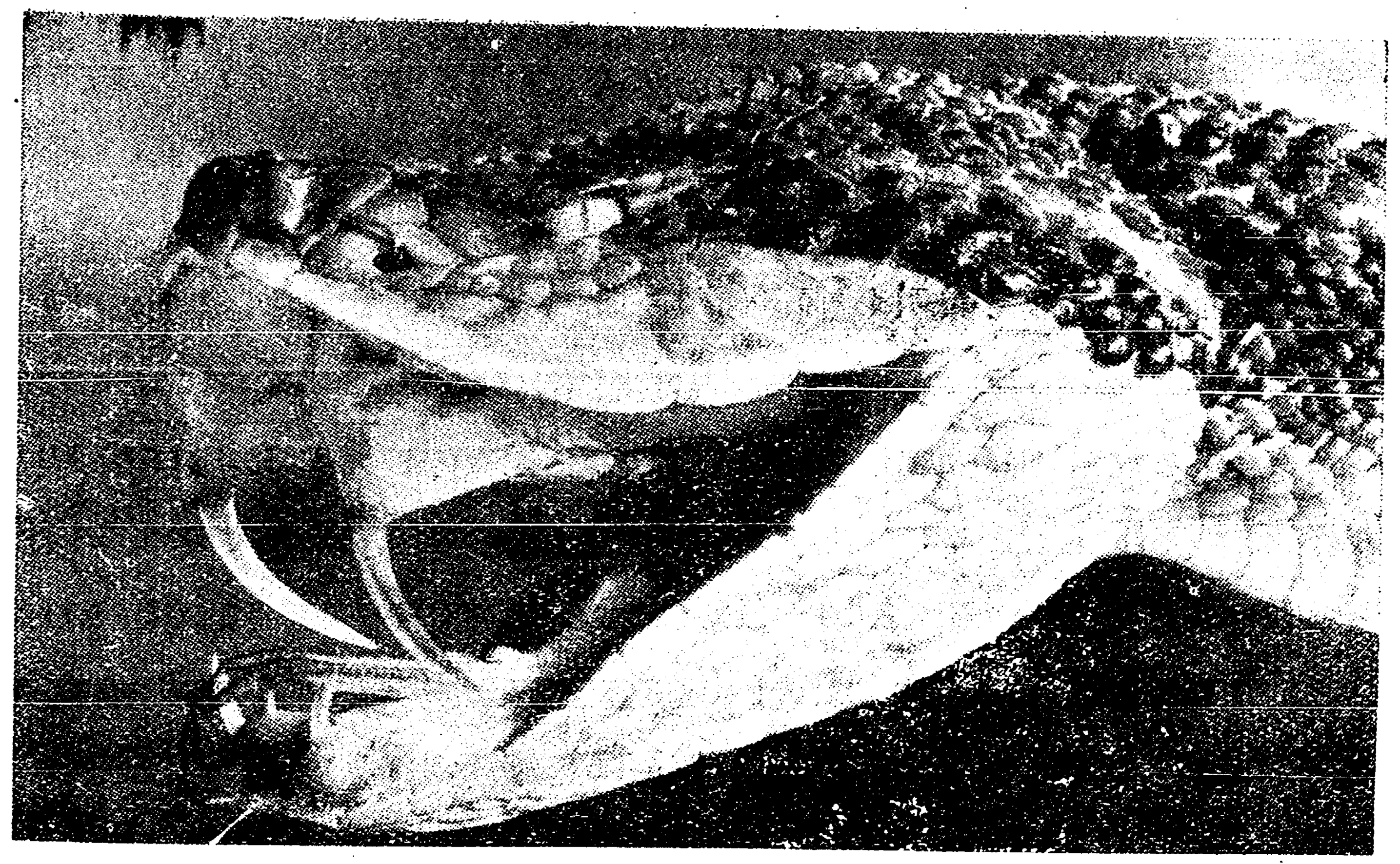

(গতমাসের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

থাকে, আর Crocodile হচ্ছে যারা মানুষ ধরে ধরে খায়। এ ছাড়া আরও একটা বিশেষ তফাৎ হচ্ছে এই যে alligator জাতের কুমীররা জল থেকে উঠে এসে ডাঙ্গায় এক সঙ্গে শ' খানেক ছোট ছোট ডিম পেড়ে সেগুলো গাছ পাতা আর ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখে। ঘাস পাতা পচে তারই তাপে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। আর crocodileরা করে কি জানো? তারাও ডাঙ্গায় উঠে ডিম পাড়ে। তবে তাদের ডিম হয় মোটে দশ বারটি। তার ফোটানোর ব্যবস্থাটাও অন্য রকম। তারা করে কি জানো? বালিতে গর্ত্ত করে তার ভেতর ডিম পেড়ে বালি দিয়ে ঢেকে তার ওপর বুক দিয়ে শুয়ে থাকে। বালির তলায় ডিম ফুটে যখন বাচ্ছা বেরোয় তখন বালিটা নড়তে থাকে, তখন কুমীর মা বালি সরিয়ে বাচ্ছাদের টেনে বার করে। এ ছাড়া alligatorরা জলে মানুষ নামলে সাধারণতঃ ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়। কিন্তু Crocodile জাতের কুমীররা মোটেই মানুষকে ভয় করে না। যাক্ এখনকার মতো কুমীরদের কথা এইটুকুই শুনে রাখো, কারণ এরাও 'সরীসৃপ' এবং আমার বলবার বিষয় আজ ওটাই।

সরীসৃপ দলের এক জাতের কথা একদম বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে 'কচ্ছপের' কথা —কি বললে 'অযাত্রা'? হ্যাঁ ঐ 'অযাত্রা'র কথা না বললে 'এ যাত্রা' আর রক্ষে নেই। কারণ তাঁরাও খুব নাম করা সরীসৃপ। কচ্ছপ আবার দু' জাতের। 'Tortoise' হলো 'কচ্ছপ' আর Turtles হচ্ছে কাছিম বা কেঠো। এ দু' জাতের তফাৎটা মোটমুটি জেনে রাখো। Tortoiseদের পাগুলি হচ্ছে হাতীর পায়ের মতো অর্থাৎ থ্যাবড়া একটা মাংসপিণ্ড, আর Turtleদের পা অনেকটা হাঁসের পায়ের মতো চামড়া দিয়ে আঙুলগুলো জোড়া। তার কারণ আর কিছুই নয়, 'Turtles' বেশীর ভাগই থাকে জলের, তলায় আর 'Tortoise' সাধারণতঃ থাকে ডাঙ্গার জলা যায়গায়।

Turtle বা কেঠো আবার বহুরকমের আছে। কেউ কেউ শুনেছি মাটির তলাতেও থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এই জাতের কেঠোর খুব আদর, কারণ এর মাংসের ঝোল নাকি ভারী উপাদেয়—অবিশ্যি আমার চেখে দেখবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। তোমরাও হয়তো এ কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে না, কারণ আজকাল বাজারে খুব কাছিমের মাংস বিক্রী হচ্ছে। সাধারণতঃ এ Turtle বা কাছিমের মাংসই মানুষে খায়, তবে 'কচ্ছপ' বা Tortoise এর মাংসও কারু কারু কাছে অচল নয়। Tortoise রা খুব বড় বড় হয় আর দুশো পাঁচশো বছর বাঁচে। Turtleরা হয় ঢের ছোট। বড় জাতের এই কচ্ছপরা সবই খায়, ঘাস পাতা থেকে সুরু করে ছোট ছোট পাখীর বাচ্ছা, পাখীর ডিম সবই খায়। সুবিধে মতো পেলে মানুষের আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেয়ে দেয়। কচ্ছপের কামড় অতি ভয়ানক, কারণ এদের চোয়াল ভারী মজবুত, কামড়ালে সহজে এরা ছাড়তে চায় না।

এছাড়া এদের শরীরের বিশেষত্ব হচ্ছে, এদের শক্ত খোলা, তার ভেতরই লুকিয়ে রাখে এদের নরম থল্‌থলে দেহটি। শত্রু যখন আক্রমণ করে তখন এরা হাত পা মাথা সবই খোলার ভেতর ঢুকিয়ে নিতে পারে। আরও কয়েকটা খবর জেনে রাখো, কচ্ছপ কখনও সন্ধ্যের পর নড়েনা চড়েনা, কারণ ওরা বোধ হয় 'রাতকানা'। দিনের আলোতেই ওরা নড়ে চড়ে বেড়ায়, আর এরাও সাপের মতো না খেয়ে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

সবচেয়ে বড় জাতের কচ্ছপ পাওয়া যায় সেবিলি আর গ্যালাপাগো দ্বীপে—এখানকার এক একটা কচ্ছপ কমসে কম ৬।৭ ফুট লম্বা হয় আর ওজনে হয় প্রায় ২৭।২৮ মন। বুঝে দেখো ব্যাপারটা! কিন্তু ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের Spider Tortoise আবার তেমনি ছোট—এরা ৪ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। কচ্ছপের খোলা নানারকমের কাজে লাগে, চশমার ফ্রেম, চিরুণী, বুরুশের হ্যাণ্ডেল আরও রকমারী জিনিষ এই কচ্ছপের খোলা থেকে আজকাল তৈরী হচ্ছে আর তার দামও ঢের! কাজেই কচ্ছপকে 'অযাত্রা' বলে আমরা দূরে সরিয়ে রাখলেও, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই 'অযাত্রা'র মাংস খেয়ে আর খোলা বেচে 'জীবন যাত্রা' চালাচ্ছে। অনেক দেশের ছেলেমেয়েরা আবার 'কচ্ছপ' পোষে—তারা মন দিয়ে তার সব খোঁজ খবর হাল চাল দেখে ডায়েরীতে লিখে রাখে, এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তারা একটা পরিচয় গড়ে তোলে। তাতে তাদের সাহস আর জ্ঞান দুইই বাড়ে। তোমরাও ঐ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় গড়ে নাও, এটাই আমার ইচ্ছা। সেই জন্যই তো তোমাদের কাছে এ সব কথা বলা। আজ এই পর্য্যন্ত। 'সরীসৃপ'দের কথা যা শুনলে মনে থাকবে তো?

মরণিং স্কুল

শ্রীইন্দিরা দেবী

'আজ তোমাদের গল্প শোনাতে এলাম, কিন্তু কি গল্প শুনবে বল তো?—রূপকথা? একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে 'না' বলতে নেই, আচ্ছা একে একে তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করি'—এই বলে রাণুদি আমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখন বিকেল হয়ে এসেছে!

আমরা সবাই রাণুদিকে ঘিরে, নিতান্ত উৎসুক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন রাণুদি'র গল্প শোনার দলে গিয়ে পড়ি। সেদিন রাণুদি যে গল্পটা বলেছিলেন আজকে তোমাদের সে গল্পটা বলছি।

"আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, রাণুদি বলতে সুরু করলেন—সুমিত্রাদি আমাদের হেডমিষ্ট্রেস, আমাদের সবাইকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি আমরা তাঁকে ভয় করতাম।

বনলতাদি আমাদের ভূগোল পড়াতেন, তাঁর ক্লাসে আমরা ভয়ানক গোল করতাম। তিনি ছিলেন ভারী গোবেচারা। লতিকাদি আমাদের ইংরাজী পড়াতেন—সর্ব্বদাই নাক উঁচু করে আছেন। তিনি বলতেন—'বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী উচ্চারণ করতে জানে না'। তাঁর ধারণা ছিল বাংলা দেশে তিনিই একমাত্র ইংরাজী উচ্চারণের স্তম্ভবিশেষ। আমাদের উপর তাঁর একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, আমরাও তাঁকে ভয় করতাম কিন্তু ভালবাসতাম না। আমাদের ক্লাসের এনা ভারী চমৎকার একটী কবিতা বেঁধেছিল, ইংরাজী ঘণ্টার শেষে আমরা কোরাসে সেটা নীচু গলায় গাইতাম। অবশ্য এ কোরাস গান লতিকাদির কাণে কোনও দিন পৌঁছয়নি, কারণ আমাদের সকলের ভিতর খুব একতা ছিল, ভাবও ছিল খুব। তাই কেউ কাউকে কোনদিন বিপদাপন্ন করিনি। আর সবচেয়ে মজার মানুষ ছিলেন সুবর্ণদি। তিনি স্বাস্থ্য পড়াতেন কিন্তু তাঁর সব চেয়ে স্বাস্থ্য খারাপ ছিল, ডিসপেপসিয়ায় ভুগতেন। স্কুলের কোনও খাবার খেতেন না, জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করতেন না, পাছে কোনও রকমে তাঁর শরীরে বীজাণু প্রবেশ করে। কোনও কিছু স্পর্শ করতে হয় এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই হাত দুটো একটু উঁচু করে রাখতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের হরি সংকীর্ত্তনের ছবি দেখেছ ? সেই রকম কতকটা।

আমরা সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লাম।

রাণুদিও এই অবসরে একটু হাঁফ ছেড়ে নিলেন।

কিন্তু আমাদের হাসির ঢেউ মিলিয়ে যেতেই রাণুদি আবার আরম্ভ করলেন ঃ— কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছিল আমাদের গরমের ছুটীর আগে। সেবার ভয়ানক গরম পড়েছে অথচ মরণিং স্কুল হবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, আমরা বিরক্ত হয়ে ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠলাম। আমাদের মন্ত্রণা সুরু হলো—কি করা যায় ? ঝুনু আমাদের দলের লীডার, তাকে পুরোভাগে রেখে আমরা সুমিত্রাদির ঘরের দরজায় 'নক' করলাম—'সুমিত্রাদি আসবো' ?

ঘরের ভিতর থেকে বজ্রগম্ভীর গলায় উত্তর পেলাম—'এসো'। দ্বিধা বিজড়িত পদে ঝুনু এগিয়ে যেতে আমরা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। ঘরে গিয়ে দেখি বনলতাদি, লতিকাদি, সুবর্ণদি, সকলেই হাজির আছেন—বল্লেন 'কি চাই তোমাদের' ?

—'মানে আমরা'—ঝুনু রীতিমত ঘামতে সুরু করেছে।

'বলো, ভয় কি ঝুনু' সুমিত্রাদি আমাদের আশ্বাস দিলেন।

একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ঝুনু বল্লে ঃ আমরা এসেছিলাম আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করতে।

'বাঙ্গালীর মেয়েরা বড় ঘুরিয়ে কথা কথা বলে', লতিকাদি একটু বিদ্রূপ করলেন।

ঝুনু দমলো না বল্লেঃ ভীষণ গরম পড়েছে তাই কাল থেকে মরণিং স্কুল যদি দেন—

তাহলে বড় ভালো হয়—আমরা সবাই কোরাসে বলে উঠলাম।

—কিন্তু মরণিং স্কুল দেবার সময় এখনও আসেনি, তাছাড়া তোমাদের ক্লাসে Fan রয়েছে তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ সুমিত্রাদি কিন্তু—ঝুনু ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বল্লে।

'আবার যদি 'কিন্তু' বলো তাহলে তোমাদের 'আইসল্যাণ্ডে' পাঠিয়ে দিতে হয়।

সুমিত্রাদির রসিকতায় ওঁরা অর্থাৎ সুবর্ণদি, লতিকাদিরা হেসে উঠলেন। আমার অবস্থা তখন ফ্লাণ্ডার্সের মিত্র বাহিনীর চেয়েও সঙ্গীন, কিন্তু মিত্রবাহিনীর মত এই সঙ্গীন অবস্থা আমরা কাটিয়ে উঠলাম।

বনলতাদি ভূগোলের ভাষায় বল্লেন ঃ আইসল্যাণ্ড হলো North Pole—কিন্তু তার কথাকে চাপা দিয়ে সুবর্ণদি স্বাস্থ্যকথা প্রয়োগ করে বল্লেন ঃ—বাংলা দেশের ছেলে মেয়ের এমন জলবায়ু সহ্য হবে না। লতিকাদি সুমিত্রাদিকে উদ্দেশ করে বল্লেন ঃ যাই বলুন মিস সরকার, আমাদের ইংলণ্ডের ছেলেমেয়ের ট্রেণিংই আলাদা।—সহস্র মন্তব্য পিছনে ফেলে আমরা সুমিত্রাদির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ঝুনু কেঁদে ফেল্লো।

স্কুল বসবার আগে রোজ আমাদের সমবেত ভাবে প্রার্থনা হতো—এবং প্রার্থনার শেষে আমরা সার বেঁধে যে যার ক্লাসে চলে যেতাম। একদিন হোলো কি—ঝুনু প্রার্থনা শেষ করে ক্লাসে যাবার পথে হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠে ধরে ফেল্লাম। সারা স্কুলে সাড়া পড়ে গেল, ঝুনুকে তখনি সিকরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। পরের দিন সেকেণ্ড ক্লাশের মিনতি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

সুমিত্রাদি মুস্কিলে পড়লেন। ওঁদের মন্ত্রণা সভা বসলো সুমিত্রাদির ঘরে। কি ব্যাপার হলো তা আমরা জানি না।

পরদিন নোটিশ বোর্ডে দেখলাম—মরণিং স্কুলের নোটিশ। তখন আমাদের যে কী আনন্দ তা বলবার নয়।

হ্যাঁ, গল্প এখনো শেষ হয় নি, ঝুনু আর মিনতিকে চাঁদা করে আমাদের খাওয়াতে হয়েছিল। কিন্তু কেন তোমরা বলতে পারো ? এই বলে রাণুদি চুল বাঁধতে চলে গেলেন।

আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, রাণুদিরা ঝুনু আর মিনতিকে কেন চাঁদা করে খাওয়ালে ?

অনেকদিন পরে বুঝেছিলাম—কিন্তু তোমরা বলতে পারো ?

কিন্তু এখন ত মোটে অঘ্রাণ মাস, মরণিং স্কুল হতে অনেক দেরী !

যাদুবিদ্যা

বালক যাদুকর—শ্রীঅশোককুমার সরকার

আজ আপনাদের নিকট যাদুবিদ্যা ও যাদুকর লইয়া আলোচনা করিব। যে কোন বিষয়ই হউক প্রথমে উত্তমরূপে অভ্যাস করিলে পর শেষে তাহা নিশ্চয়ই সফল হয়। কারণ খেলাটা কিছুই নয় দেখানতেই বাহাদুরী। যাদুবিদ্যা অথবা ম্যাজিক, চলতি ভাষায় যাহাকে ভোজরাজা অথবা ভানুমতী কা খেল বলে তাহা দেখেন নাই এমন লোক খুব অল্পই আছেন। এমন আশ্চর্য্য মনমুগ্ধকর কৌতুক আর কিছুতেই নাই, অন্তত এরূপ নির্দ্দোষ কৌতুক আর নাই। যাদুকর যখন সময় সময় তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে অভিনব ক্রিয়া কলাপ দেখাইয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতেছেন, এদিকে হাস্যরোলে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত ও ক্ষণে ক্ষণে করতালি শব্দে কম্পিত হইতেছে। উপস্থিত দর্শকগণ যাদুকরের খেলা ধরিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বারে বারে বিফল হইতেছেন। এই সকল খেলা দেখিয়া যুবক ও বালকদিগের মনের ভিতর নিশ্চয় মনে হয় যে "হায় আমি যদি ওরূপ লোককে প্রচুর আমোদ দিতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কত নাম হইত" ইত্যাদি। আমার বয়স যখন মাত্র ৮৯ বৎসর সেই সময় একজন যাদুকর আমাদের পাড়ায় আসিয়া তাঁহার খেলা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার খেলার মধ্যে একটী খেলা বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে কাঁচ চর্ব্বণ করতঃ ভক্ষণ করা। তখন আমি যাদুকরদিগের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না, সেইজন্য একটী কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গা টুকরা উত্তমভাবে চর্ব্বণ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার কিছু হইল না দেখিয়া খুব মজা পাইলাম ও শেষে আমাদের একটী দরজী ভাড়াটিয়া ছিল তাহাকে দেখাইলাম। সে আমায় খুব উৎসাহ দিল, তাহার ফলে আমি আমাদের এক পাশের বাড়ীতে এই খেলা দেখাইতে গেলাম কিন্তু সেখানে গিয়াই আমার সমস্ত ফাঁসিয়া গেল, অর্থাৎ তাহারা ভয় পাইয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া বলিয়া দিল। তাহার পর কি হইয়াছিল, তাহা বলিব না, কারণ পাঠকপাঠিকারা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পর হইতেই আমার ম্যাজিক শিখিবার জিদ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তখন হইতে তামি পয়সা পাইলেই আস, কালো সূতা, কাঁচের গ্লাস ইত্যাদ ক্রয় করিয়া পিতামাতা ও অন্য সকলের অগোচরে লুকাইয়া খেলা শিখিতে লাগিলাম। যাহা হউক এক্ষণে আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিব। প্রথমে আমাদের দেশীয় যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে

বলিতেছি। আমাদের দেশে কেহ কিছু শিখিলেই দেখাইতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে ভাল করিয়া না দেখাইতে পারিয়া হাস্যস্পদ হয় ও কৌতুকের রস নষ্ট হইয়া যায় ও শেষে পরিণাম মারাত্মকও হইতে পারে। কৌশল যতই সহজ হউক না কেন সর্ব্বদাই আসল জিনিষটী হইতেছে অভ্যাস। সবার আগে এই কথাটীই মনে রাখিতে হইবে। অবসর পাওয়া গেলে তখনই অভ্যাস করা দরকার। বিদেশে যাদুকরেরা তাহাদের খেলা দেখাইবার পূর্ব্বে দর্শকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভ্যাস করিয়া লয়, অর্থাৎ তাহাদের কৌশল, মুখের ভাব ও ভঙ্গী, শরীরের সঞ্চলন প্রভৃতি যাদুকর ঠিক করিয়া লন। ইহার ফলে তাঁহাদের খেলা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। কবি বার্ণস (স্কচ কবি) বলেন যে, "আমরা যেন অন্যের চক্ষুর ভিতর নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই. সেই গুণ আমাদের দেবতারা যেন দেন। তাহা হইলে আমাদের ভিতর যে সকল দোষ বা ত্রুটী থাকে তাহা সহজেই সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

Trick বা খেলাটী যতই ছোট হউক না কেন, তাহা সুন্দররূপে বাক্যবিন্যাস দ্বারাও প্রদর্শনের নিপুণতার জন্য, তাহা ছোট ও অকিঞ্চিতকর হইলেও দর্শকগণের মনের ভিতর বিপুল আনন্দ ও কৌতুহলের উদ্রেক করে। যাদুকর তাঁহার মনে যদি "ধরা পড়িয়া যাইব" এইরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলেই বিপদ। অর্থাৎ তখন তাহার ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে। কিন্তু তাহা যদি মনে না করিয়া ভাবা যায় যে "দর্শক অজ্ঞান বালকের সদৃশ,—আমি তাহাদিগকে নিশ্চই আমার কথামত চালাইব ও যাহা বুঝাইব তাহাই তাহারা বুঝিবে"—তাহা হইলে যাদুকরএর মনের বল বাড়িয়া যায় ও তাহার ফলে তিনি যাহাই দেখান না কেন তাহাতেই সফলতা লাভ করেন। আমাদের দেশে অপরের ও অন্য কোন খোলা স্থানে খেলা দেখাইবার রীতি নাই। একেবারে নাই বলিলে হইবে না, কারণ আমরা প্রায়ই রাস্তায় দেখিতে পাই বেদিয়ারা তাহাদের খেলা রাস্তায় রাস্তায় দেখাইয়া বেড়ায়। তাহাদের বেশী বাক্যবিন্যাস দ্বারা দর্শকের মন আকৃষ্ট করিতে হয়, "লাগ্ লাগ্ লাগ্ ভেল্কি লাগ"—এই গৎটী হইতেছে তাহাদের ধরা বাঁধা, তাহারা খেলা দেখাইবার প্রারম্ভে ডম্বরু বাজাইয়া এই সকল গদ্ মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করে। ইংরাজীতে বাক্যবিন্যাসকে বলে Patter—এইরূপ বাক্যবিন্যাস বৈঠকখানার খেলার বিশেষ অস্ত্র। আমার নিজের মতে বাক্যবিন্যাস ছাড়া ছোট ছোট খেলা দেখান একেবারে অসম্ভব। কিন্তু এই প্রকার কথাবার্ত্তার গর্ব্ব বা অন্য কোন জিনিষের লেশ না থাকে, কেবলমাত্র সাধারণ, আর যে খেলা দেখান হইবে সেই খেলা সম্বন্ধেই কতকগুলি সহজ আর সরল কথা। যে কথা সকলে সহজেই বুঝিতে পারে, মাঝে মাঝে একটু করিয়া তামাসা বা রঙ্গ। সকলের চেয়ে দুইটী লক্ষ্যণীয় বিষয় হইতেছে,—যাহাতে দর্শক স্তম্ভিত হয় ও নির্ব্বাক হইয়া যাদুকরের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকে এবং—যাদুকর যদি প্রথমটী না করিতে পারেন তাহা হইলে যাহাতে দর্শক অনবরত হাসিতে থাকে তাঁহার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং এই দুইটীর ভিতর যদি একটীও না হয় তাহা হইলে খেলা দেখান যাদুকরের পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়িতে পারে!

ইহা ছাড়াও আর একটী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বেশী আড়ম্বর করিয়া

খেলা দেখাইতে গেলে খেলার মাধুর্য্যটুকু একেবারে খারাপ হইয়া যায়। কোনো বাঁধাধরা সরঞ্জাম, বা ষড়যন্ত্রের ভাব থাকিলে চলিবে না। এইরূপ খেলাকে ইংরাজীতে Impromptu trick বলে।

এক্ষণে যাত্নকরদিগের পোষাক পরিস্থদ সম্বন্ধে কিছু বলিব ও শেষে বিদেশীয় যাতুকরদের বিষয় কিছু বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার এই মত যে শাড়ী পরিয়াও খুব উচ্চ ধরণের খেলা দেখান যাইতে পারে। আপনারা হয়ত আমার কথা শুনিয়া হাসিবেন কিন্তু সত্যসত্যই প্রকৃত গুণ আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে কোন রকম পোষাকেই উহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অনেক Trick আছে যাহাতে কাল রংয়ের কোর্ট বা পান্তলুন পরিধান করিয়া খেলা দেখাইলে বহু প্রকার সুবিধা হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা, কিন্তু পূরাকালে আমাদের দেশে যখন যাতুবিদ্যা আবিস্কৃত হইয়াছিল তখন যাতুকরদিগকে তাহাদের নিজ নিজ দেশীয় পোষাক পরিধান করতঃ খেলা দেখাইতে হইত এবং তাহা এখনকার খেলা হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি Rope Trick বা দড়ির খেলা হইতে। Rope trick যে কি সে বোধ হয় অনেকেই জানেন, তাহার আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে যাতুবিদ্যা আমাদের দেশ হইতে পাশ্চাত্যে গিয়া এই ব্যাপার ঘটিয়াছে অর্থাৎ তাহারা তাহাদের নিজ পোষাক যাতুবিদ্যায় ঢুকাইয়াছে। আর আমরা নকলপটু বাঙ্গালী কালো রংয়ের কোট আর পান্তলুন পরিধান করিতে আরম্ভ কয়িয়াছি।

আমাদের দেশের লোকের একটী ধারণা চিরকালই আছে যে যাতুকরগণ কোটের হাতার ভিতর জিনিষ সকল লুকাইয়া রাখে ও যাতু দেখাইবার সময় তাহা বাহির করিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমি ইহা একেবারে অস্বীকার করিতেও পারি না তবে বলিতেছি যে হাতার ভিতর অথবা মাথার চুলের ভিতর লুকাইয়া রাখে না। আপনারা হয়ত বলিতে পারেন যে উহা পুস্তকে লেখা আছে কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ইহাই গেল যাতুবিদ্যা সম্বন্ধে ও আমাদের দেশের যাতুবিদ্যার কথা।

এক্ষণে বিদেশীয় যাতুর কথা বলিয়া আমার অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

পোর্ট সৈয়দ বন্দর দিয়া যখন জাহাজ যায়, সেই সময় মিশরীয় যাতুকরেরা তাহাদের খেলা দেখাইতে জাহাজের ডেকের উপর উঠিয়া আসে ও তাহারা যে সমস্ত খেলা দেখায় তাহা সত্যই সুন্দর ও আশ্চর্য্য। তাহাদের খেলা ধরিবার জন্য বহু চেষ্টা জাহাজের যাত্রীগণ করেন কিন্তু তাহা পারেন না। এই সূত্রে বলিয়া রাখা ভাল যে যাতুবিদ্যা আমাদের দেশ হইতে প্রথমে মিশর দেশেই যায় ও তাহার পর হইতে পাশ্চাত্যের বহু দেশে স্থানান্তরিত হয়। ঐ দেশীয় যাতুকরগণ ভাল ইংরাজী জানে না। যখন ভারতীয় বা অন্য দেশ হইতে লোকেরা বেড়াইতে আসে, তখন তাহারা See magic, See magic অর্থাৎ "ম্যাজিক দেখুন" "ম্যাজিক দেখুন" বলিয়া আগন্তক যাত্রীগণের দৃষ্টি আকর্যণ করিয়া তাহাদের খেলা দেখায়। তাহাদের একটী খেলা বিশেষ দৃষ্টি আকর্যণ করে,

তাহা হইতেছে—শূন্য হস্তে জীবন্ত জীবজন্ত আনায়ন করা ও তাহাদের পুনরায় উড়াইয়া দেওয়া বা অদৃশ্য করা। মনে করুন যাতুকর প্রথমে দর্শকদিগকে দেখাইল যে তাহার হাতে কিছুই নাই। তাহার পরে Come Come করিয়া হাত দোলাইতে লাগিল, তাহার পর হঠাৎ একটী পাখীর আবির্ভাব। অতঃপর দর্শক হয়ত কহিলেন যে, উহাকে বাজ পাখীতে পরিণত কর। যাতুকর তৎক্ষণাৎ একবার হাতটী ঘুরাইয়া দিল ও সেই ছোট ছোট পাখী বিশাল ডানা মেলিয়া যাতুকরে হস্তের উপরেই ত্বারস্বরে ডাকিয়া উঠিল। এই সকল লেখা নিজ চক্ষু দ্বারা না দেখিলে ইহার স্বরূপ বুঝা যায় না।

আমাদের দেশে যেমন তোড়জোড় করিয়া সকলকে ডাকিয়া খেলা দেখাইতে আরম্ভ করি, আমেরিকার যাতুকরেরা সেরূপ করিয়া খেলা দেখায় না। ধরুন কোন স্থানে হয়ত চায়ের পার্টি (Tea Party) হইতেছে। যাহার উদ্যোগে এই চায়ের পার্টি—তিনি হয়ত একজন যাতুকরকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে পার্টি যখন বেশ জমিয়া উঠিবে তখন সে (যাতুকর) আসিয়া হঠাৎ তাহার খেলা দেখাইয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বে কোন নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিই জানিবেন না যে আজ কেহ magic দেখাইতে আসিবে। সকল স্থানেই যে এইরূপ অকস্মাৎ খেলা দেখায় তাহা নহে। প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গমঞ্চে যাহারা পয়সা খরচ করিয়া খেলা দেখিতে যান তাহারা আমাদের দেশের ন্যায় মঞ্চের উপরেই খেলা দেখেন। এইবার বলিব জাপানের কথা, পাঠকপাঠিকারা হয়ত অনেকেই জানেন সে বর্ত্তমাতে জাপান যাতুবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে। সেখানে Magic association, Magic club প্রভৃতি বহু আছে। ইহা ছাড়াও Women magicians' association আছে যথেষ্ট। জাপানের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা যাতুকর তাহার নাম কুমারী টেন কাট্ সু (Miss Tencut Soo) ইনি পাশ্চাত্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহার মাতাও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ যাতুকরী। এবার চীন দেশীয় যাতুবিদ্যার কয়েকটী কথা বলিব। আপনারা হয়ত প্রায়ই দেখিয়াছেন, পথে যে চীনা যাতুকরগণ তাহাদের খেলা দেখায় তাহা সত্যই অদ্ভুৎ। যেমন ঃ—একটী বেতের ঝুড়ির ভিতর যাতুকরের একটী সঙ্গী ঢুকিল, তাহার পর যাতুকর সেই ঝুড়িটীতে আগুন ধরাইয়া দিল। দর্শকগণ ভীত, আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া আগ্রহ সহকারে পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সমস্ত পুড়িয়া গিয়া যখন ভস্মে পরিণত হইল, তখন হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে যাতুকরে সঙ্গী একেবারে অক্ষত অবস্থায় নিজেই বাহির হইয়া পড়িল। দর্শকগণ দেখিয়া বাহবা দিল প্রচুর তাহার সহিত দর্শনীও। বিখ্যাত চীনে যাতুকর "চাঙ্গ" যখন কলিকাতায় আসিয়া তাহার যাতুবিদ্যা দেখাইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই পাঠকপাঠিকার ভিতর অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। এবং যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহারা চীনা যাতুবিদ্যার আসল পরিচয় পাইয়াছেন!

———

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—আট—

ছাগলদের রাজপথ পেরিয়ে

যেরকমটা ভাবা গেছল, শিশির যেটি আশা করেছিল, তাই ঘটে রয়েছে দেখা গেল। রাতারাতি এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এ রকম দৈবগতিক সহায়তা না থাক্‌লে বড় বড় ডিটেক্‌টিভ্‌কেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এই জাতীয় আশ্চর্য্য যোগাযোগ ঘটে বলেই শার্লক্ হোম্‌স্, রবার্ট ব্লেক্, শিশির প্রভৃতি গোয়েন্দারা সুবিধা করে নেয়, পদে পদে বিপদ হানা দিয়েও কিছু করতে পারে না—যৎপরোনাস্তি বাধা পেয়েও শেষমেষ তারা কার্য্যোদ্ধার করে' বসে।

স্বয়ং প্রকৃতিই ওদের—ওই বদ্‌মাইসদের বিরুদ্ধে। ওদের নিজেদের প্রকৃতি নয়—বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির কথাই বলা হচ্ছে।

তাই, ইতিমধ্যে বেশ একপশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এবং শিশির অন্ধকার ব্যূহ থেকে বার হবামাত্রই দেখ্‌ল, হ্যাঁ, যেমনটি তার প্রত্যাশা ছিল তাই বটে! বৃষ্টিও হয়েছে এবং তার ফলে ভেজা মাটির ওপরে বেশ গভীর হয়ে কার যেন পায়ের দাগ চেপে বসেছে।

পৃথিবীর ছোট বড় মেজ সেজ সব ডিটেক্‌টিভ যে সুবিধা পেয়েছে, বরাবর পেয়ে আস্‌ছে, শিশিরও যদি তার ওপরে নির্ভরতা পোষণ করে' থাকে, বিশেষ অন্যায় কিছু করেনি। এবং প্রকৃতিও আদৌ বিশ্বাসঘাতকতা করেননি—প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ করেননি কিছু।

এবং সেই পায়ের দাগ, মোটা মোটা পায়ের গোদা গোদা ছাপ চলে গেছে—তাদের বাড়ীর আনাচ পেরিয়ে, পাশের বাগানের কাণাচ ঘেঁষে, সেই দাগ্‌রাজি, পথের সেই দাগী পৃষ্ঠাটি বরাবর চলে গেছে—

কোথায় গেছে, সেইটাই তো শিশিরের এখন আবিষ্কার্য্য—তা ছাড়া আর কী?

শিশির মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে তার মামাকে জানিয়ে দিয়েছে: "কাল রাত্রে যে এসেছিল সে তোমার মামাই বটে। তোমার মামা ছাড়া আর কেউ নয় মামা।"

"বাঃ, মামাই তো! মামা ছাড়া আবার কে হতে যাবে?" ব্রজেশ্বর বিকৃতমুখে জবাব দিয়েছেন: "মামাই তো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে প্ল্যান্‌টা! নইলে আর কোনো মিঞার সাধ্য ছিল না—!"

"উঁহু, তার পরেও ফের আবার এসেছিল যে!"

"ফের এসেছিল? তুই কি স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?" ব্রজেশ্বর এবার একটু বিস্মিতই হন্: "ফের আবার কে আস্‌বে? ফের কেন আস্‌তে যাবে শুনি? প্ল্যান্ তো সে আগেই নিয়েছে—নিয়ে গেছে—এই হাত থেকেই হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছে! তবে?"

শিশির সে কথার জবাব দ্যায় না, শুধু বলে: "এবার তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো মামা! আর চব্বিশ ঘণ্টায় মধ্যে তোমার প্ল্যান্ যদি না আমি উদ্ধার করে' আনি তো কী বলেছি। সন্ধ্যের মধ্যেই এনে দিচ্ছি তোমায়।"

"হ্যাঃ, সে প্ল্যান্ আর উদ্ধার কর্‌তে হয় না।", ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসের হাসি হাসেন: "আমার মামাকে তো তুই চিনিস্ না! চিনি আমি। মামার খর্পর থেকে জিনিস বাগানো সহজ নয়।"

"আমার তো মামা না! আমি পারব।" শিশিরের সুদৃঢ় আস্থা।

"মামার মামা—সে আরো বড়ো কঠিন ঠাঁইরে। বলে আমি যাই সেয়ানা তাই পেরে উঠ্‌লুম না, পেয়েও হারালুম,—আর তুই তো কালকের ছেলে, সামান্য ভাগ্‌নে—ভাগ্‌নের ভাগ্‌নে মাত্র, তুই পার্‌বি! হ্যাঁ, থাক্‌তো যদি আমার মামার মামা—পারত সে! কিন্তু—কিন্তু সে—সে কোথায়?"

আকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে' ব্রজেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন দ্যান্।

"পারি কিনা পারি দেখে নিয়ো। লিলিকে সাথে নিয়ে এই আমি পা বাড়াচ্ছি।" উদাহরণ-স্বরূপ, তক্ষুনি তক্ষুনি শিশির পাড়ি দ্যায়, মাতুলালয়ের প্রাতরাশের জন্যেও প্রতীক্ষা করে না।

বাড়ীর পাশ ধরে, বাগানের ধার ঘেঁষে, ভেজা মাটির পিঠে তাজা পায়ের দাগ লক্ষ্য করে' শিশিররা এগিয়ে চলে। আরো সব কত বাড়ীর গা ঘেঁষে। অনেকখানি পথ বেয়ে, আরেকটা বাগানের ভেতর দিয়ে অনেকদূর ওরা চলে যায়। যেতে যেতে সহরের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছয় ওরা।

এবং তখনো—তখনো ওদের চোখে পড়ে--সেই পায়ের দাগ! সেই শ্রীপাদপদ্ম-রেখা আরো—আরো দূরে চলে গেছে।

যাক্, তাতে ওদের দুঃখ নেই। কেবল চিহ্ন রেখে গেলেই হোলো! পথে একটা রেস্তরাঁয় সামান্য কিছু ওরা খেয়ে নিয়েছে—এখন পদচিহ্নের পথ ধরে—ওই পদাঙ্ক অনুসরণ করে'—যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যেতে হয় তাতেও ওদের আপত্তি নেই। আর এই পায়াভারী ভদ্রলোক—পায়ের দাগের দাগী আসামী যেখানেই যান্ না কেন, যতদূরেই যান্ না,তাঁরও আর নিস্তার নেই ওদের হাতে,—শেষ অবধি যদি তিনি পা বজায় রেখে গিয়ে থাকেন—যেতে পেরে থাকেন—পায়ে পায়ে টিকে থাকেন শেষ পর্য্যন্ত—পা তাঁর ক্ষয়ে গিয়ে, কিম্বা খোয়া গিয়ে না থাকে তাহলে তাঁকে ওরা পাক্ড়াও করবেই।

নিশ্চয়ই।

"এধারটায় ভারী ছাগলের আম্দানি দেখা যাচ্ছে!" শিশির অদূরবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী এক পাল্ ছাগলের দিকে লিলির দৃষ্টি টানে।

"আমরা সহরের বাইরে এসে পড়েছি দাদা!" আসন্ন ছাগপালের দিকে তাকিয়ে লিলি বলে: "কি রকম মেঠো মেঠো এধারটা, দেখ্চ না!"

"হ্যাঁ, মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে ছাগলদের! একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ, আমরা পেরুবার আগে ওরা যদি এসে পড়ে তাহলেই পায়ের দাগের দফা রফা!—সব ওরা নিজের পায়ের ক্ষুরে কামিয়ে দিয়ে যাবে।"

"ও বাবা! কতো ছাগল! একশো—দুশো—তিনশো—না তারও বেশী?" ছাগল সম্প্রদায়ের সেন্সাস্ নেবার লিলি আগ্রহ দেখায়।

"এক হাজারের কম না! চ' চ'—চ' বল্ছি—" কিন্তু বল্তে বল্তে ছাগলের পাল এসে পড়ল। বাঁ ধারের মাঠ থেকে, রাস্তা ডিঙিয়ে, ডান দিকের মাঠে গিয়ে পড়তে লাগ্ল তারা—এই পারাপারের মুখে বিস্তর ছাগল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, মাঠে না নেমে, রাস্তার দুদিকে রওনা দিতে চেষ্টা করল। এবং এই উন্মার্গযাত্রায় নেতাদের পক্ষ থেকে ব্যাহত হয়ে—পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে—পালের সাথে সাথে লাঠি হাতে কতকগুলি রাখালও রয়েছে দেখা গেল—অবশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

রাখালদেরও যেমন হৈ হল্লা, ছাগলদেরও তেমনি চ্যাঁ ভ্যাঁ—সমস্ত মিলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে' এমন এক বিপর্য্যয় বেধে রইল আর চারধার দিয়ে সেই উন্মত্ত ছাগস্রোত যেভাবে অট্টরোল করে' ছুটে চল্ল, তাতে পাছে সেই ক্ষুরধার জনতার পায়ের তলায় পড়ে তারা নিজেরাই না শেষটায় চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হয়ে যায় সেই ভয়ে শিশির আর লিলি একটা উঁচু পাথরের ঢিবির ওপর গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হোলো। এবং যতক্ষণ না শেষ ছাগলটি ত্রিসীমানা থেকে নির্ব্বিঘ্নে অন্তর্হিত হয়েছে—ততক্ষণ তারা সেই ঢিবির ওপর থেকে নাম্ল না।

"দেখ্লি তো! সব পণ্ড! কোথায় আর পায়ের দাগ? বেবাক্ চারধারে ক্ষুর-বোলানো!" শিশির আপ্সোস্ করে।

"চলো একটু এগিয়ে দেখা যাক্।" লিলি আশার বাণী শোনাতে চায়: "ঘুরে ফিরে দেখা যাক্ না!"

"পায়ের দাগ যখন নেই তখন আর নাহক্ ঘুরে লাভ? কোনো সত্যিকার ডিটেক্টিভ্ এমন বাজে কাজ করে না। চ' ফেরা যাক্—কিন্তু মামাকে মুখ দেখাবো কি করে' তাই ভাব্চি।"

"আমার ভারী জলতেষ্টা পেয়েচে দাদা!" লিলি বলে। আশার বাণীর পরেই তার মুখে তৃষ্ণার বাণী।

"সাম্নের ঐ ছোট্ট বাড়ীটাতে গিয়ে জল চাওয়া যাক্!" শিশির লিলিকে নিয়ে এগোয়—"খুব দূরে নয় বোধহয়।"

খুব দূর বোধ না হলেও, ছোট্ট বাড়ীটা বেশ একটু দূরেই। ও ধারটা পাহাড়ের ঢালুর থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেছে, সেই জন্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে যত মনোরম আর কাছে বলে' মনে হয় আসলে বাড়ীটা তত কাছাকাছি নয়।

উপত্যকা উৎরে, উৎরাই বেয়ে ওরা বাড়ীর নিকটে গিয়ে পৌঁছয় সটান্ ভেতরে। ঢুকে যায় পর্য্যন্ত। কিন্তু বাড়ীর কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ নেই, জনপ্রাণী আছে বলে' মনে হয় না।

পা টিপেটিপে ওরা এগিয়ে যায়। একটু ভয়ে ভয়েই এগোয়!

সাম্নের ঘরটা থেকে হঠাৎ চাপা গলার ফিস্ফাস্ ওদের কাণে আসে: "পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে' নিয়েছ তো?"

পিস্তলের কথা কাণে যেতেই তার একটা গুলি যেন ছিট্কে এসে ওদের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হয়। য়্যাঁ? এখানেও পিস্তল? সেই পিস্তল আবার এখানেও? ছাগলের রাজধানী পার হয়ে এসেও ফের পিস্তল?—

একটা আধবোজা জানালার ধার ঘেঁষে ওরা দাঁড়ায়। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বাড়িয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দ্যাখে, চৌকানো একটা টেবিল ঘিরে জন পাঁচেক—ভীষণ চেহারার মানুষ, টেবিলের ওপর ছড়ানো কী একটা কাগজের ওপরে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেই পঞ্চ পাণ্ডবের এক জনকে দর্শন মাত্রেই চেনা যায়, তিনি হচ্ছেন আর কেউ না, তাদের সেই গ্র্যাণ্ড মামা! —

(ক্রমশঃ)

প্রতিশোধ

শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

নিশীথ রাত্রে পথিক জনেক আসিল সাধুর ঘরে
"আশ্রয় চাই"—দেবে নাক' তুমি ?" কহিল সে জোড়-করে,
"বড় পাপী আমি, ঘুরেছি অনেক—কেহ দিল নাক' ঠাঁই,
তুমি যে মহান্—জানি আমি দেব—আসিয়াছি আজি তাই।"
থামিল পথিক, কহিল ইসুফ "এস হে আমার ঘরে
নিশীথ সময়ে এসেছো যে তুমি, ফিরাব কেমন ক'রে !
নহেক এসব কিছুই আমার, বিধাতার দান রাজে,
সবাই আমরা তাঁহারি তনয়, 'না' বলিব কোন লাজে !"

সারাটি রজনী অতিথি সেবিয়া ইসুফ পরম সুখে
অতি প্রত্যূষে উঠাইয়া তারে, কহিল সে চুপে চুপে—
"হেথায় অর্থ, হেথায় অশ্ব, তব তরে আছে রাখা
সত্বর করি পলাইয়া যাও, নিরাপদ নয় থাকা।"

প্রদীপ যেমন জ্বালায় প্রদীপে, কমেনা দীপ্তি তার
মহৎ তেমনি করেগো অপরে—মহতের অবতার !

আননে তাহার উদিল দীপ্তি, নয়নে ভাতিল জ্যোতিঃ
বিনয়-নম্র বচনে পথিক করিল তাঁহারে ন'তি
"যা কিছু দিয়েছ এই অভাগারে, ফিরে লও তাহা স্বামী,
তোমার পুত্রে বধিয়াছে যেই —ইব্রাহিম সে আমি !"

ধীর সংযত কণ্ঠে ইসুফ কহিল তখন তারে—
"যা কিছু দিয়েছি, আরও কিছু নাও, চলে যাও একেবারে !
তোমারই সাথে গো বিদায় লইবে আমার ভাবনারাশি
বহু উপকার করিলে আমার—তোমা আমি ভালবাসি !

প্রতিশোধ আমি নিয়েছি পুত্র, না নিয়ে কাহারও প্রাণ
ধন্য তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার— ধন্য সে ভগবান !"

(ইংরাজী কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

আমি কে

শ্রীমতী জ্যোৎস্না লাহড়া

আজ অস্তাচলের কাছে এসে দীপ্ত প্রভাতের কথা মনে হচ্চে। মনে হচ্চে জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস। মন আবার ছুটে যেতে চায় দূর অতীতে। তখন আমার সারা অঙ্গে ছিল বিচিত্র বর্ণসুষমা, ছিল সজ্জার বিপুল বিলাস। মৃদুস্পর্শে আমার সারা অঙ্গে তখন জাগতো পুলকের চঞ্চল শিহরণ। গতি ছিল দুর্ব্বার আবার মলয়ের মত লঘু ও শব্দহীন। পথের নেশা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। তারপর মনে পড়ে নবারুণের মত আমার জীবন পথে যেদিন তুমি প্রথম এসে দাঁড়ালে। তোমার চোখে দেখলাম অভিযানের নেশা। কিন্তু তোমার অগ্নি পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হলাম অনায়াসে। তারপর তুমি আমাকে ঘরে আনলে পরম সমাদরে। তোমার বাড়ীতে আমার কি বিপুল সম্বর্দ্ধনা। আমাকে দেখে বাড়ীর সকলের কি অধীর উল্লাস। ছেলেরা তো সারাদিন আমার কোলে চড়ে থাকতে চায়। আমাকে পেয়ে তাদের কি গর্ব্ব ! আমার জন্য তৈরী হল নূতন ঘর। আমার পরিচর্য্যার জন্য লোক হল মোতায়েন। আমার প্রসাধনের জন্য আসতে লাগলো কত বিচিত্র উপকরণ। তারপর মনে পড়ে অসীম ঐশ্বর্য্য নিয়ে যেদিন তুমি আমাকে একটু একটু করে আয়ত্ব করে নিলে, সেদিন দেখলাম তোমার কি বিপুল উল্লাস। মনে পড়ে অভিমান ভরে কতদিন তোমার ডাকে সাড়া দিইনি—ঘুমের ভান করে পড়ে থেকেছি—আমায় জাগাবার জন্য দেখেছি তোমার কি কাতর প্রয়াস। একটু সাড়া পেলেই তোমার মুখে ফুটতো নিশ্চিন্ত তৃপ্তি। অবশেষে বিপদে সম্পদে আনন্দে উৎসবে আমি তোমার কাছে অপরিহার্য্য হয়ে উঠলাম। মনে পড়ে সেবার শারদ পূর্ণিমায় পশ্চিমের পথে দীর্ঘ পাড়ি। সেদিনের জ্যোৎস্না সত্যই এক মায়ালোক সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের পথ ধরে বুঝি অনায়াসে চন্দ্রালোকে পৌঁছান যেতো। সে দিনের, সে উদ্দাম গতিও ভোলবার নয়। কতবার দারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি আবার হেলায় তা কাটিয়েও গেছি। আর মনে পড়ে সেবার এক শুভ বিবাহে আমার যখন ডাক পড়লো। আমার সারা অঙ্গ ঘিরে সে দিন তুমি পরিয়েছিলে বিচিত্র ফুলসাজ। সেদিনের বর বধুকে আমি সাদরে কোলে নিয়েছিলাম।

আনন্দের পাশে পাশে আজ দুঃখের স্মৃতিও মনে পড়ছে। মনে পড়ে খোকার

সেই কাল ব্যাধি। শমনের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝেও শেষকালে পরাজয় বরণ করতে হ'ল। সময়ে অসময়ে ছুটেছি ডাক্তারের কাছে—এনেছি রাশি রাশি ঔষধ। এতকরেও খোকাকে বাঁচান গেলনা। তারপরে শব যাত্রার কি করুণ দৃশ্য। তাতেও আমাকে যোগ দিতে হল। ওরে পথহারা দেবশিশু! প্রভাতের উদয়াচলেই তোর সূর্য্যাস্ত হ'ল।

আমার জন্য তোমার খরচও কম হয়নি তা বুঝি। কিন্তু মনে করে দেখদেখি আমি তোমার উপার্জ্জনের কত সুবিধাও করে দিয়েছি। আমার সাহায্যে তুমি অনায়াসে কত বেশী কাজ করেছ। তুমি কত আরাম পেয়েছ। যারা তোমাকে চিনতো না, তারা আমাকে দেখে তোমাকে আপনা থেকে কত মর্য্যাদা দিয়েছে। তুমি যে আমাকে অযত্ন করেছ একথা বলিনা—অতটা অকৃতজ্ঞ আমি নিশ্চয়ই না। হঠাৎ নীরব হলে তোমার চোখে দেখেছি দারুণ উদ্বেগ। আমার ছোটখাট রোগে তুমি নিজেই কত চিকিৎসা করে আমাকে আরাম করেছ। রোগ কঠিন হলে আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছ। আমার বার্দ্ধক্য পীড়িত রোগ পাণ্ডুর দেহ সুস্থ করে তোলবার জন্য তুমি কত চেষ্টা আর কত অর্থব্যয় করেছ। যতই কর, কালের প্রভাবকে কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে বল? যে দুর্ব্বার গতিবেগ একদিন সকলের ঈর্ষার বিষয় ছিল আজ তা পঙ্গু। আজ আমার সারা অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়েছে। আজ একলা চলতে হলে আমার দেহ কেঁপে উঠে। বর্ষায় তো আমাকে একপা চলেই দাঁড়িয়ে যেতে হয়। শীতের দিনে আমার ঘুম ভাঙ্গান দায়। আজ তোমার মনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা আমার সামর্থ্যের বাইরে। আমি বলছি তুমি আমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে নূতনকে বরণ করে নাও। নূতনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পুরাতনের সরে দাঁড়াতে হবে এই তো জগতের নিয়ম।

কি বললে—আমি প্রলাপ বকছি? আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? এতকথা বলার পর আবার আত্মপরিচয় দিতে হবে? তবে শোন, আমি তোমার বহুব্যবহৃত পুরানো "মোটরগাড়ী।"

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হলে ১২ ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

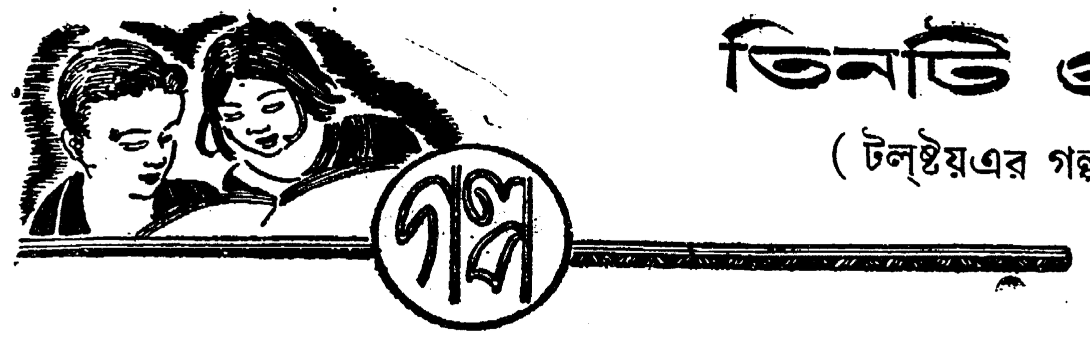

তিনটি প্রশ্ন

(টল্‌ষ্টয়এর গল্প)

শ্রীবিমল বসু

কোন এক রাজার হঠাৎ মনে হ'ল যদি তিনি জান্‌তেন—ঠিক কোন্ সময়ে কাজ আরম্ভ করা উচিৎ, যদি জান্‌তেন কাদের পরামর্শ তিনি শুন্‌বেন আর কাদের এড়িয়ে চল্‌বেন, যদি জানতেন সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ কোন্‌টা—তাহ'লে চমৎকার হতো। কোন কাজে হাত দিয়ে তিনি বিফল হ'তেন না।

আহা যদি জান্‌তাম.........

রাজা এই কথা সারা রাজ্যে প্রচার ক'রে দিলেন, যে তাঁকে বল্‌তে পারবে—কাজ আরম্ভ করার ঠিক সময় কোন্‌টা, কারু সবচেয়ে বিশ্বাস যোগ্য এবং সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ কি—এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে তাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

বহু পণ্ডিতজন এলো রাজার কাজে, এবং সকলেই তাঁর এই তিন প্রশ্নের উত্তর দিলো। কিন্তু প্রত্যেকের উত্তর হলো আলাদা, কারু সঙ্গে কারুর মিল নেই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বল্লো: কাজের ঠিক সময় জান্‌তে হ'লে আগে থেকে প্রত্যেক কাজের সময় ঠিক ক'রে নিতে হয় এবং সেই মতো কাজ করে যেতে হয়। অপর একজন বল্লো: কাজের ঠিক সময় কোন্‌টা তা বলা কঠিন—কিন্তু তা ব'লে অলস হ'য়ে বসে থাক্‌লে চলবে না—সব কিছুই করবে তবে যেটা সব চেয়ে দরকারী সেটা আগে করা উচিৎ অপর দল বল্লো: সব কাজ করতে গেলে কোন কাজই করা হয় না আর একটা মানুষের পক্ষে কাজের ঠিক সময় নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন, সেজন্য জ্ঞানী লোকদের নিয়ে একটা পরামর্শ সমিতি গঠণ করুন—ঠিক কোন সময়ে কোন কাজটা করা উচিৎ তা তাঁরা বলে দেবেন। তখন একদল আপত্তি তুলে বল্লো: এমন কাজ আছে যা সকলের সাম্‌নে উপস্থাপিত ক'রে বিলম্বিত করা চলে না—পরামর্শ সমিতির সাম্‌নেও না। যিনি কাজে প্রবৃত্ত হবেন তিনি ঠিক ক'রে নেবেন কাজে হাত দেবো কি না। তবে কাজ আরম্ভ করার ঠিক সময় কোনটা জান্‌তে গেলে—কি কাজ কখন ঘট্‌তে যাচ্ছে তা আগে থেকে জানা একান্ত দরকার। এ কেবল জান্‌তে পারে যাদুকররা, কাজেই কাজ আরম্ভ করবার ঠিক সময় কোনটা জান্‌তে হ'লে যাদুকরদের সাহায্য এবং তাদের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

দ্বিতীয় প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে এমনি গণ্ডোগোলর সৃষ্টি হ'ল, তর্কের ঝড় বইতে লাগ্‌লো। কেউ বল্লো: রাজার সব চেয়ে বিশ্বাস যোগ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিরা হচ্ছেন তাঁর সভাসদেরা। অপর দলে বল্লো: না, পুরোহিতেরা। অন্য এক দল বল্লো: ডাক্তারেরা। —আরো একদল বল্লো: যোদ্ধারা!

তৃতীয় প্রশ্ন—সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কি?—একদল এ প্রশ্নের উত্তরে বল্লো: এ পৃথিবীতে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে বিজ্ঞান। অপর দল বল্লো: না, যুদ্ধে কলা কৌশলই হচ্ছে সব চেয়ে দরকারী জিনিস। অপরে বল্লো: না, তাও না, ধর্ম্মে রত থাকাটাই এ জগতের সব চেয়ে বড় কাজ, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ।

রাজা কার কথা যে শুন্‌বেন আর কাকেই বা পুরস্কার দেবেন তা ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারলেন না।—এই তর্কের ভিতরে, বাদ প্রতিবাদের ভিতরে হয়তো তাঁর তিনটি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে—এবং কারা তাঁর প্রশ্ন তিনটির সদুত্তর দিতে পেরেছে তা ভাল ভাবে জান্‌বার জন্যে তাঁর রাজ্যের সব চেয়ে বড় সাধুর আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন।

সাধু আশ্রমে থাকেন। আশ্রম ছেড়ে তিনি কোথাও যান্ না, সাধারণ লোক ছাড়া তিনি অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। তাই রাজা সাধারণ বেশে শরীর রক্ষীদের পিছনে রেখে একা সাধারণ মানুষের মতো সাধুর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাধু তখন তাঁর পর্ণ কুটিরের সাম্‌নের জমিটুকু কোপাচ্ছিলেন, রাজাকে আস্‌তে দেখে স্বস্তি-বচন জানিয়ে আবার মাটি খুঁড়তে লাগ্‌লেন। সাধুটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল, প্রত্যেকবার তিনি কোদাল দিয়ে একটু ক'রে মাটি কোপান আর ভয়ানক ভাবে হাঁফাতে থাকেন।

রাজা তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে আজ আমি আপনার কাছে এসেছি। আমি জান্‌তে এসেছি: কাজ আরম্ভ করার ঠিক সময় কোনটা, কারা সব চেয়ে বিশ্বাস যোগ্য লোক আর কোনটা আমার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ?

সাধু রাজার কথা শুন্‌লেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, আপন মনে আবার মাটি কোপাতে সুরু করলেন।

আপনি ক্লান্ত হ'য়েছেন—আপনার কাজটা আমি খানিকক্ষণ ক'রে দি। রাজা বললেন।

ধন্যবাদ!—বলে রাজার হাতে কোদালটা দিয়ে সাধু মাটির ওপর বসে পড়লেন।

মাটির দু'টো চাবড়া কোদাল দিয়ে ওঠাবার পর রাজা আবার সাধুর কাছে তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। সাধু তাঁর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোদালটির জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন: তুমি এবার জিরোও, আমি একটু কাজ করি।

রাজা আর কোন প্রশ্ন না ক'রে মাটি খুঁড়ে যেতে লাগ্‌লেন। একটি ঘণ্টা কাট্‌লো তারপর আরো একটি ঘণ্টা—সূর্য্য গাছের পেছনে ঢলে পড়লো। তখন রাজা মাটি কোপাতে কোপাতে আবার বল্লেন,—আমার প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম—যদি আপনি আমাকে সদুত্তর না দিতে পারেন, তাহ'লে বলুন—আমি চলে যাই।

কে একজন দৌড়ে আস্‌ছে, কে ও?—সাধুর কথা শুনে রাজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন: বনের ভেতর থেকে দাড়ীওয়ালা একটা লোক ছুটে আসছে—দু'টো হাত দিয়ে সে তলপেটটা চেপে ধরেছে, তা থেকে অজস্রধারা রক্ত পড়ছে—রাজার কাজে এসেই লোকটি অজ্ঞান হ'য়ে মাটির ওপর পড়ে গিয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগ্‌লো। সাধু এবং রাজা তাড়াতাড়ি লোকটির কাপড় আল্‌গা ক'রে দিয়ে তার পরিচর্য্যা করতে লাগ্‌লেন—রাজা তাঁর রুমাল ও সাধুর একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন—কিন্তু রক্তপাত তবু বন্ধ হ'লো না। রাজা সেই রক্ত-মাখা রুমাল ও বস্ত্রখণ্ড জলে ধুয়ে আবার ভাল ক'রে বাঁধলেন—এমনি ক'রে পরিচর্য্যা করবার পর তার রক্ত পড়া বন্ধ হলো। তখন লোকটি ক্ষীণস্বরে একটু জল খেতে

চাইলো। রাজা জল এনে তাকে খাওয়ালেন। সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেলো। হিম পড়তে লাগ্‌লো। তখন রাজ ও সাধু ধরাধরি ক'রে সেই আহত লোকটিকে পর্ণ কুঠিরের ভিতর এনে তাকে শুইয়ে দিলেন। বিছানায় ওপর শুয়ে লোকটি চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলো। রাজা সারাদিন পথ পর্য্যটনে, কাজে কর্ম্মে এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন যে তিনি তার পাশে শোবা মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সারারাত্রি তাঁর ঘুমের ভিতর দিয়ে কেটে গেলো। ঘুম ভাঙ্‌লো সেই সকালে, ঘুম ভেঙ্গে তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন—কোথা হ'তে এলো এই দাড়ীওয়ালা লোকটি! কেন সে তার পাশে শুয়ে আর তিনিই বা এ ঘরে শুয়ে কেন! তিনি অনেকক্ষণ দাড়ীওয়ালা লোকটির দিকে তাকিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—তারপর আস্তে আস্তে তাঁর সব মনে পড়তে লাগ্‌লো। দাড়ীওয়ালা লোকটী জেগে রাজাকে তার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে ক্ষীণকণ্ঠে বল্লো: মহারাজ—আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুণ!

রাজা তো অবাক—অপরাধ আপনার হলো কোথায় যে ক্ষমা করবো।

—আপনি আমায় চেনেন না মহারাজ কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনি আমার ভাইকে কঠোরত অপরাধের জন্য ফাঁসী দিয়েছিলেন এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। —আমি জান্‌তাম আপনি সাধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন, সাধুর সঙ্গে দেখা ক'রে ফেরবার পথে আপনাকে হত্যা করতে আমি কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছিলাম। আমি যখন আপনাকে হত্যা করবার, জন্য আস্‌ছিলাম আপনার রক্ষীরা আমাকে দেখতে পায় ও চিনতে পেরে আমাকে আহত ক'রে। আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আস্‌ছিলাম, আপনি যদি আমার পরিচর্য্যা না করতেন তা হ'লে আমি আর বাঁচতাম না। আমি বেঁচেছি শুধু আপনার দয়ায় আপনার দয়ায় আমি প্রাণ পেয়েছি আর আপনারই প্রাণ আমি নিতে চেয়েছিলাম—আমি আপনার দাসানুদাস হ'য়ে থাক্‌বো, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ।

—দাড়ীওয়ালা লোকটি এই বলে করুণভাবে আর্ত্তনাদ করতে লাগ্‌লো।

তার কান্না আর কাতরতা রাজার অন্তরকে স্পর্শ করলো। রাজা তাকে শুধু ক্ষমা করলেন না, তাকে সেবা শুশ্রূসা করবার জন্য ডাক্তার ও চাকর পাঠিয়ে দেবেন বলে তাকে জানালেন এবং তাকে তার ভাইয়ের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজা সাধুর খোঁজে পর্ণকুঠিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। যাবার আগে তিনি আর একবার সাধুর কাছে তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর পাবার ইচ্ছা ক'রেছিলেন। দেখ্‌লেন, সাধু হাঁটু গেড়ে বসে জমিতে বীজ বপণ করছেন।

রাজা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন: শেষবার, আমি আপনার কাছ থেকে আমার প্রশ্নগুলোর সদুত্তর চাইছি!

—তোমার প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া হ'য়েছে! রাজার মুখের দিকে চেয়ে সাধু স্মিতহেসে এ কথা বল্লেন। রাজা তো অবাক! উত্তর দেওয়া হ'য়ে গেছে!—কখন?

সাধু আবার হাস্‌লেনও বললেন—উত্তর পাওনি? কাল যদি আমার দুর্ব্বলতা দেখে তোমার করুণা হ'তো—যদি তুমি আমার হ'য়ে জমি খুঁড়তে চলে যেতে তা হ'লে ঐ লোকটা তোমায় আক্রমণ করতো—আমার কাছে না থাকার দরুণ তোমায় অনুশোচনা করতে হ'তো। তাহ'লে দেখ্‌তে পাচ্ছ: যে সময় তুমি মাটি খুঁড়ছিলে সেইটাই তোমার পক্ষে ছিল সবচেয়ে দামী বা দরকারী সময়, এবং আমি ছিলাম সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য

এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক। আমার উপকার করা ছিল তোমার সব চেয়ে বড় কাজ। পরে যখন দাড়ীওয়ালা লোকটি দৌড়ে এসে হত চৈতন্য হ'য়ে পড়লো— যখন তুমি তাকে সেবা করছিলে, সেই সময়টা তোমার পক্ষে ছিল সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সময় কারণ যদি তুমি তাকে সেবা শুশ্রূষা না করতে, ক্ষতস্থান বেঁধে না দিতে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন না করেই সে মারা যেত। এ সময়ে সে-ই ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লোক এবং যে সেবা তুমি তাকে দিয়েছ সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। তা'হলে বুঝ্‌তে পারছ যে মুহূর্ত্তে তুমি কাজে হাত দেবে সেই মুহূর্ত্তই হচ্ছে সবচেয়ে দামী ও প্রয়োজনীয় সময়, যে তোমার সঙ্গে থাক্‌বে সে মুহূর্ত্তে সেই হবে নির্ভরযোগ্য লোক আর মানুষের সেবা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাজ।

ইস্পাতের মানুষ

শ্রীসমর সরকার

ইস্পাতের মানুষ বল্‌তে বোঝায় একজন লোককে : তিনি হচ্ছেন রাশিয়ার যোশেফ ষ্ট্যালিন। তাঁর আসল—নাম যোশেফ ভিসারিনোভিচ্ জুগাশ্‌ভিলি। গুজব আছে যে, লেনিন তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে তাঁকে 'ষ্ট্যালিন' অর্থাৎ 'ইস্পাতের মানুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন। লেনিনের দেয়া নাম সার্থক হয়েছে আমরা আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি। রাশিয়া আজ এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে এবং ষ্ট্যালিনের যোগ্য নেতৃত্বে রাশিয়া তুর্জ্জয় জার্ম্মাণদের প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিচ্ছে। রাশিয়া যে জার্ম্মানদের হটিয়ে দিতে পার্‌বে, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

তোমরা সবাই শুনে আশ্চর্য্য হবে যে ষ্ট্যালিন খাঁটি রাশিয়ান নন, তিনি জর্জিয়ান্। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে টাইফ্লিসের কাছাকাছি জর্জ্জিয়াতে গোরা সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে পর্ত্তুগীজ ভাষার যেমন পার্থক্য, তেমন পার্থক্য রুশ আর জর্জ্জিয় ভাষা; শুধু তাই নয় তুটি ভাষার হরফ পর্য্যন্ত তফাৎ। ষ্ট্যালিনের মা ত রুশ ভাষায় একটি কথাও বলেন না, এবং এমন কি এখনও পর্য্যন্ত ষ্ট্যালিনের রুশ কথার মধ্যে জর্জ্জিয় ভাষার টান দেখা যায়।

ষ্ট্যালিনের পিতা ছিলেন একজন চর্ম্মকার। তাঁরা ছিলেন খুব গরীব কিন্তু তবুও যোশেফ কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন, কারণ ১৫ থেকে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি টাইফ্লিসে এক সেমিনারীতে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। ষ্ট্যালিনের পিতা ছিলেন সাদাসিধা মানুষ। তিনি ছেলেকে নিজের ব্যবসায়ে দীক্ষা দিতে চাইলেন কিন্তু ষ্ট্যালিনের মাতা তাঁকে জোর করে স্কুলে পাঠালেন। বছর চারেক পরে ষ্ট্যালিন সেমিনারী ছেড়ে চলে

আসেন। সেমিনারীতে অভিজ্ঞতা আর নিজের দারিদ্র্য হতে ষ্ট্যালিনের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। সেমিনারী ছেড়ে দিয়ে তিনি মার্ক্স্‌বাদী বন্ধুদের দলে ভিড়্‌লেন ও সুরু হলো তাঁর বিদ্রোহী জীবন। তখন স্থানে স্থানে গড়ে উঠছিল মুক্তিকামী রাশিয়ানদের সঙ্ঘ। জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' সবাই জারের পতন ঘটিয়ে রাশিয়ায় সাম্যবাদ এনে দিতে চায়, কৃষক ও শ্রমিকদের এনে দিতে চায় প্রাধান্য, যাতে ধনিক সম্প্রদায় চূর্ণ হয়ে যাবে। ষ্ট্যালিন যোগ দিলেন এই দলে। লেনিন ছিলেন এই দলের নেতা। এই দলের নাম ছিল বলশেভিক দল।

১৮৯৮-১৯১৭ সাল : এই উনিশ বছর ষ্ট্যালিন একটি বিপ্লবী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এই সময়ে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট, অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য কর্‌তে হয়েছে। জারের কর্ম্মচারীরা তাঁকে যতবার ধরে নিয়ে গেছে প্রায় ততবারই ষ্ট্যালিন পালিয়েছেন। শেষবার তাঁকে ১৯১৩ সালে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময়ে তিনি মুক্তি পান। তখন সমগ্র দেশে চলেছে ভীষণ গোলমাল—মহাযুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধে লাঞ্ছিত হচ্ছে রুশ সৈন্যরা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এসেছে বিশৃঙ্খলা। এমনি সময়ে দেশে হলো খাদ্যাভাব—লোকে অন্নের জন্য জারের প্রাসাদ ঘিরে ফেল্‌লো। জার হুকুম কর্‌লেন—চালাও গুলি। কিন্তু সৈন্যরা গুলি চালালো না—পেটে ক্ষুধা নিয়ে গুলি চালানো যায় না। সমস্ত সৈন্য—অন্যূন পঁচিশ হাজার—ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসীর সঙ্গে যোগ দিলো। জার হলেন অসহায়। ঠিক্ এমনি সময়ে ডুমার (রুশ পার্লামেণ্ট) বিপ্লবী সকলেরা দাবী করলেন জারের সিংহাসন ত্যাগ। ডুমায় বিপ্লবীদের সংখ্যা বেশী—সুতরাং জারকে সিংহাসন ত্যাগ কর্‌তে হল। শাসনভার গ্রহণ কর্‌লেন বিপ্লবীরা। তখন বলশেভিক নেতারা রাশিয়ার বাহিরে—হয় নির্ব্বাসিত, নয় পলাতক। কয়েক মাস পরে নভেম্বরে বলশেভিকেরা হাতে ক্ষমতা পেলো। ১৯১৮ সালে জার নিকোলাস সবংশে নিহত হলেন।

এমনি করে ষ্ট্যালিনের বিপ্লবীদলের বহুদিনের আশা কুসুমিত হলো ও রাশিয়াতে রিপাব্‌লিক স্থাপিত হলো। এক শতেরও বেশী বিভিন্নজাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বধীন রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত হয়েছে। সমস্ত দেশকে একতাবদ্ধ করে একটি বিরাট 'ইউনিয়ন' গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরা সকলেই জান সোভিয়েট রাষ্ট্র কৃষক-শ্রমিকদের রাষ্ট্র। সোভিয়েটে ধনী সম্প্রদায় নেই—সকলেই কৃষক-শ্রমিক, কারণ এর ভিত্তি শ্রম ও সাম্যবাদের উপর। তাই এর নাম Union of Socialist Soviet Repubic—সংক্ষেপে U. S. S. R.

ষ্ট্যালিনের প্রতিভার এক নিদর্শন—রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Five Year Plan) তোমরা বড় হয়ে এ বিষয়ে পড়ো। পরিকল্পনাটি প্রথমে ১৯২৭ সাল হতে ১৯৩২—ঐ পাঁচ বছরের জন্য প্রচলিত হয়। এতে রাশিয়ার শিল্পগত, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার অদ্ভুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এতে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে এক করা হয়েছে। আরও তুটি পরিকল্পনা করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাটির দ্বারা রাশিয়াকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক প্রাথমিক শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে (১৯৩২-৩৭) আসল কাজের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাটি দ্বিতীয়েরই রূপান্তর—এটি ১৯৩৭ সালে আরম্ভ হয়েছে ও ১৯৪১ সালে সমাপ্ত হবে।

এর দ্বারা রাশিয়া সকল বিষয়ে যেরকম উন্নতি সাধন করেছে তা সমস্ত জগতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এইবার আমি ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে কিছু বল্‌বো। খবরের কাগজে ষ্ট্যালিনের ছবি তোমরা দেখেছো—গোঁফে ভরা একখানি হাসি মুখ। সব সময়ে তাঁর মুখে হাসিটি লেগে আছে! ভারী হাস্যপ্রিয়, রসিক মানুষ তিনি। অন্য কোন রাষ্ট্রনায়কের মুখে হাসি দেখা যায় না, কিন্তু ষ্ট্যালিনের হাসি প্রাণ-খোলা। কে বল্‌বে তিনি ইস্পাতের মানুষ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বেশভূষায় পর্য্যন্ত তাঁর আড়ম্বর নেই। তিনি কোন ইউনিফর্ম পরেন না। তাঁর পোষাক হচ্ছে—গলাবন্ধ একটি ঘোর সবুজ কোট, রাইডিং-ব্রিচেস্ এবং বুট। বাইরে বেরোবার সময়ে তিনি একটি টুপি মাথায় দেন—টুপীটি অনেকটা মিলিটারী অফিসারদের কপাল আড়াল-দেওয়া টুপীর মত।

ষ্ট্যালিন বাস করেন মস্কোতে ক্রেমলিনে। ক্রেমলিনের গল্প তোমরা শুনে থাক্‌বে। এটি কোন প্রাসাদের নাম নয়, এটাকে প্রাচীর-ঘেরা একটা দুর্গ বলা যেতে পারে। এর মধ্যে আছে খান পঞ্চাশেক বাড়ী, গির্জ্জা, ব্যারাক আর বাগান। ষ্ট্যালিন মাত্র তিনখানা ঘর নিয়ে বাস করেন। ষ্ট্যালিন সব সময়ে মস্কোতে থাকেন না। পল্লীগ্রামে তাঁর একখানা বাড়ী আছে। তার নাম হলো 'দাচা' (datcha)। মস্কো হতে ঘণ্টাখানেকের পথ মস্কভা নদীর কাছে ইউসোতা-আরক্যাঙ্গেল্‌স্‌কায়া অঞ্চলে তাঁর 'দাচা'টি অবস্থিত। এটি দশ একর জায়গা জুড়ে আছে। প্রকাণ্ড এক প্রাচীর দিয়ে জায়গাটি ঘেরা। এখানি আগে এক ধনকুবেরের অধিকারে ছিল।

ষ্ট্যালিন সাধারণতঃ সপ্তাহখানেক কঠোর পরিশ্রম করে দুতিনদিনের জন্য তাঁর 'দাচা'টিতে বিশ্রাম কর্‌তে যান। আমোদপ্রমোদের দিকে তাঁর খুব আগ্রহ নেই তবে তিনি অপেরা ও ব্যালে নাচ দেখ্‌তে ভালবাসেন এবং প্রায়ই 'বলশয় থিয়েটারে' (Bolshoi Theatre) যান। তিমি 'পিয়ানলা' বাজাতে ভালব্যসেন এবং খুব দাবা খেলেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে বন্ধুদের দাবা খেলার নিমন্ত্রণ করেন।

খাওয়াদাওয়া বিষয়ে ষ্ট্যালিনের কোন জাঁকজমক নেই। খাবার সময়ে তিনি পরিবারের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে ভালবাসেন। আর ধূমপান করা তাঁর একটা নেশা। সব সময়ে তাঁর মুখে একটা পাইপ ধরানো আছে। ডিনারের সময়ে তাঁর প্লেটের পাশে পাইপটি জ্বল্‌তে থাকে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে পাইপে দু একটা টান দেন। রাত্রে তিনি খুব কম ঘুমান।

ষ্ট্যালিন খুব খুব পড়াশুনা করেন। ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিশেব জ্ঞান আছে। লোকে হয়ত' ভাবতে পারেনা ষ্ট্যালিনের আবার বিদ্যা আছে! কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মধ্যে প্লেটো এবং ডন্‌কুইক্‌সাউট থেকে উদ্ধৃত লাইন শুন্‌তে পাওয়া যায়। তিনি সেক্স্‌পীয়র গ্যেটে অন্যান্য ক্লাসিকস্ ভালভাবে পড়েছেন।

ষ্ট্যালিন একজন উঁচুদরের বক্তা নন। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি বেশীরভাগ প্রশ্নোত্তর ধরণে বক্তৃতা দিতে ভালবাসেন। তাঁর বক্তৃতাগুলো খুব সরল কিন্তু কার্য্যকরী এবং সাধারণতঃ সেগুলো একটু দীর্ঘ হয়। সব সময়ে তাঁর লক্ষ্য থাকে যাতে সর্ব্বসাধারণ তাঁর বক্তব্য বুঝ্‌তে পারে।

বন্ধুবান্ধব ষ্ট্যালিনের খুব বেশী নেই। বন্ধুদের মধ্যে ভরোশিলভ এবং ক্যাগানোভিচ্ তাঁর খুব অন্তরঙ্গ। বাইরের লোকের সঙ্গে তিনি খুব কম দেখা করেন। কিন্তু যখন দেখা করেন তখন তিনি অত্যন্ত মিশুক। সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে তার আলাপ অত্যন্ত সরল ও অমায়িক হয় এবং সব সময়েই তিনি রসিকতা করেন। ষ্ট্যালিনের চালচলন দেখে অনেকে 'প্রাচ্য' আখ্যা দিয়েছেন। ষ্ট্যালিনও তাই স্বীকার করেন। একবার এক জাপানী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ষ্ট্যালিন তাঁকে অভ্যর্থনা করার সময়ে বলেন—"আমিও একজন এশিয়াবাসী।"

চিরপরিচিত ধর্ম্ম এবং তার অন্ধ অনুষ্ঠানের উপর তাঁর কোন আস্থা নেই। ষ্ট্যালিনের কাছে কর্ম্মই ধর্ম্ম। পোপের কাছে ভগবান্ যীশু যেমন, ষ্ট্যালিনের কাছে সাম্যবাদ তেমনি।

ষ্ট্যালিনের পরিশ্রম কর্‌বার ক্ষমতা অদ্ভূত এবং ধৈর্য্য তাঁর অশেষ। তাঁর অধ্যবসায় দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তাঁর কাজের মধ্যে দেখা যায় একাগ্রতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা। তাঁর মধ্যে আর একটা গুণ আছে, সেটা রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে দেখা যায় না। ভুল করে ফেললে তিনি ভুল স্বীকার করে ভুল শুধ্‌রে নেন। সামান্য জিনিসের প্রতিও খুব নজর আছে। কোন খুঁটিনাটি তাঁর চোখ এড়ায় না। তাঁর কাছে চিঠিপত্র যা আসে, প্রয়োজনীয় হোক্ অপ্রয়োজনীয় হোক্, ষ্ট্যালিন সমস্ত পড়েন। দেশবিদেশের সমস্ত খবর তাঁর জানা। রাশিয়ার মুখপত্র 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা যখন পড়েন, তখন পত্রিকার আরম্ভ থেকে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেন না। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করাতে তিনি ওস্তাদ!

তাঁর নিকট অর্থ বা সম্মানের মোহ নেই। তিনি রাষ্ট্র থেকে মাহিনা নিলেও সাধারণের মতই তিনি দরিদ্র। এতদিন তিনি শুধু তাঁর দলের সম্পাদক ছিলেন, কোন উঁচু পদাভিষিক্ত ছিলেন না; কিন্তু সম্প্রতি রুশ জার্ম্মান্ যুদ্ধ সুরু হবার কিছু আগে রাশিয়ার স্বার্থের জন্য প্রধান মন্ত্রী এবং পরে সম্প্রতি দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী হয়েছেন। রাশিয়া তাঁর জীবন মরণ। তাই রাশিয়া বল্‌তে বোঝায় ষ্ট্যালিন এবং ষ্ট্যালিন বল্‌তে বোঝায় রাশিয়া।

দিদি-হারা

শ্রীকালিকদাস রায়, বি, এ

সন্ধ্যা হ'য়ে এলো যেরে আঁধার এলো ঘিরে
ওমা কেন দিদিমণি আসছে না আজ ফিরে ?
ঝড় বাদলে যায় যদি মা সারা আকাশ ছেয়ে
কেমন ক'রে আসবে চিনে একলা এ পথ বেয়ে ?
কোথায় যাবে, কোথায় শোবে, কোনখানে কি খাবে
পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে কষ্ট কতই পাবে !
আঁধার দেখে ভয় যদি পায়, ডুকরে যদি কাঁদে
কেই-বা তারে চুপ করাবে মিষ্টি কথার ছাঁদে ?

খেজুর ডালের ফাঁকে ফাঁকে নিত্যি দলে দলে
মিটমিটিয়ে থোকাই থোকাই হাজার জোনাই জ্বলে,
লেবু ফুলের বাসনা নিয়ে হাওয়ার মাতামাতি
ঝিঁঝিঁর ডাকে ঘুম আসেনা—জেগে কাটাই রাতি।
শেয়ালগুলো 'হুক্কাহুয়া' ডাকে দূরের বনে
বুকের মাঝে হিম হয়ে যায়, ব্যথা জাগে মনে !
জানলা দিয়ে মাঠের আঁধার উপচে আসে ঘরে
এখনো মা দিদিমণি বাইরে কি-বা করে ?

কি হয়েছে বলনা মাগো কোথায় দিদিমণি
একলা যে আর দিন কাটেনা, ঘণ্টা মিনিট গণি,
কে ঘুরাবে তুলসী তলে দীপাম্বিতার থালা
বিনা সুতে কে গাঁথিবে শেফলী ফুলের মালা ?
কে শোনাবে গল্প শোলক কে গাহিবে গান
হাততালি দে' নাচবে কেবা খেলবে দিনমান ?
আদর ক'রে ডাকবে কেবা, কে পাড়াবে ঘুম—
কে-ই বা মোদের কোলে নিয়ে চোখে দেবে চুম ?

মাগো তোরে সুধাই যবে দিদিমণির কথা
মুখখানিতে কেন মা তোর ভ'রে উঠে ব্যথা !
ঘুমের ফাঁকে হঠাৎ যদি জেগে উঠি রাতে
দেখি তোরে ব'সে আছিস্ গালটী রাখি হাতে !
ধব্‌ধবে ঐ চাঁদের আলো দেখলে ছাদের 'পরে
কেন মা তোর চোখ দুটিতে নিথর বারি ঝরে !
নিঝুম রাতে তারার পানে কেন থাকিস্ চেয়ে—
ঐখানে কি গেছে মা তোর পাঁজর-ছেঁচা মেয়ে ?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কাফ্রিস্থানের কথা

মালাকান্দ্‌ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে আগে পড়লুম সোয়াট্‌, তারপর ডির মুল্লুকে ; তারপর উঠলুম লোয়ারি গিরিসঙ্কটের (দশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু) উপরে এবং তারপরে পৌঁছুলুম চিত্রল রাজ্যে।

এ-সব জায়গায় বেশী বর্ণনা দেবার দরকার নেই, কারণ আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে কাফ্রিস্থান। তবে অল্প দু-চার কথা বললে মন্দ হবে না।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে অপূর্ব্ব, সে কথা বলা বাহুল্য। আমাদের মতন সমতল দেশের বাসিন্দাদের চোখ আর মন এই অসমোচ্চ পর্ব্বত-সাম্রাজ্যে এসে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। নানা আকারের শৈলমালার এমন বিচিত্র উৎসব আমি আর কখনো দেখিনি। এই চিত্রল যে কি-রকম বন্ধুর দেশ, একটা কথা বললেই সকলে সেটা বুঝতে পারবেন। এ অঞ্চলে মোটমাট স্থানান্তরিত করবার জন্যে কেউ মালগাড়ী ব্যবহার করে না, কারণ তা অসম্ভব। চিত্রলীদের অভিধানে নাকি গাড়ীর চাকা বোঝায়, এমন কোন শব্দই নেই ! তবে চিত্রলের আধুনিক শাসনকর্ত্তার (Mehtar) দৌলতে আজকাল এখানে খানকয় মোটরের আবির্ভাব হয়েছে বটে।

এ হচ্ছে কেবল পনেরো-ষোলো-সতেরো হাজার ফুট উঁচু আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের দেশ—খালি চড়াই আর উৎরাই, খাদ আর উপত্যকা, শৈলশিখরের পর শৈলশিখরের নিস্পন্দ তরঙ্গ ! দূরে দূরে দেখা যায় আরো উঁচু শৈলমালার উপরে চিরতুষারের শুভ্র সমারোহ। আমাদের একমাত্র সহায় এদেশী পনি-ঘোড়া—অতি ভয়াবহ, উঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথেও এস-ব

ঘোড়ার পা একবারও পিছ্‌লোয় না—কিন্তু একবার পিছলোলে আর রক্ষা নেই, কারণ পরমুহূর্ত্তে তোমাকে নেমে যেতে হবে হাজার হাজার ফুট নীচে কোথায় কোন্ অতলে! ইহলোক থেকে একেবারে পরলোকে।

একদিন দুপুর-বেলায় নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে চলেছি, নির্মেঘ আকাশ পরিপূর্ণ রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করছে, আচম্বিতে দূরে জাগল ঘনঘোর মেঘগর্জ্জন!

আমার বিস্মিত মুখের পানে তাকিয়ে গাইড হাসতে হাসতে বললে, "বাবুজী, ও মেঘের ডাক নয়।"

—"তবে?"

—"পাহাড় ভেঙে পড়ছে।"

—"এদেশে প্রায়ই পাহাড় ভেঙে পড়ে নাকি?"

—"প্রায়ই। লোকজন হামেসাই মারা পড়ে। সময়ে সময়ে গ্রাম-কে-গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।"

এই হিংস্র পাহাড়ের দেশে মানুষদেরও প্রকৃতি রীতিমত বন্য। আমরা যে সোয়াট্ ও ডির দেশ পিছনে ফেলে এসেছি, সেখানকার মুসলমানদের ধর্ম্মোন্মাদ ভয়ঙ্কর। বিধর্ম্মীদের হত্যা করা বলতে তারা বোঝে, স্বর্গে যাবার রাস্তা সাফ্ করা।

সোয়াট আর ডির দেশের মধ্যে মারামারি হানাহানি লেগেই আছে। লড়তে মারতে ও মরতে তারা ভালোবাসে—রক্ত ও মৃত্যু যেন তাদের প্রিয় বন্ধু।

একদিন যেতে যেতে দেখি একজায়গায় দুই দল করছে মারামারি। বন্দুক গর্জ্জন করছে, বন্-বন্ লাঠি ঘুরছে আর ঝক্‌মক্ জ্বলছে তরবারি! দস্তুরমত যুদ্ধ! মাটিতে পড়ে কয়েকটা আহত দেহ ছট্‌ফট্ করছে এবং কয়েকটা দেহ একেবারে নিস্পন্দ—অর্থাৎ এ-জীবনে তারা আর নড়বে না!

কিন্তু তাদের কেউ তখন বিধর্ম্মী বধ ক'রে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে আগ্রহ দেখালে না, বরং আমাদের দেখে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের গাইড ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ছুটে এসে বললে, "বাবুজী, জল্‌দি এখান থেকে চ'লে আসুন। পাছে আমরা জখম হই, তাই ওরা লড়াই করতে পারছে না!"

মনে মনে ওদের সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। তারপর রাস্তার মোড় ফিরে একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে হৈ-চৈ শুনেই বুঝ্‌লুম, ওদের যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয়েছে।

কুমার বললে, "এরা লড়াই করছে কেন?"

গাইড বললে, "এক পয়সার পেঁয়াজের জন্যে!"

চিত্রলের পরেই হ'চ্ছে কাফ্রিস্থান। এদেশটি এখন আফগানিস্থানের আমীরের শাসনাধীন হয়ে মুসলমান-প্রধান হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু এখানকার মুসলমানরা খুব বেশী গোঁড়াও নয়, তাদের আচার-ব্যবহারও একেবারে অন্যরকম। কিন্তু এখনো এদেশে পুরানো কাফিরদের এমন এক সম্প্রদায় বাস করে, যারা পৈতৃক রীতিনীতি ও পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেনি। নানান দেবতার কাঠের মূর্ত্তি গ'ড়ে তারা পূজা করে এবং তাদের প্রধান প্রধান দেবতার নাম হচ্ছে: ইম্র, মণি, গিষ, বাগিষ্ট্, আরম, সান্‌রু, সাতারাম বা সুদারাম। ওঁরা হচ্ছেন পুরুষ-দেবতা। দেবীদের নাম দিয়েছে ওরা সঞ্জীরক্তী, দিজোন্, নির্ম্মলী ও সুমাই প্রভৃতি। অনুমানে বেশ বোঝা যায়, এদের দেব-দেবী হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীরই রূপান্তর।

'কাফ্রিস্থান' বলতে বুঝায় কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের দেশ। বলা বাহুল্য, এ নামটি মুসলমানদের দেওয়া। হিন্দুদের পরে এক সময়ে এখানে ছিল চীনাদের প্রভুত্ব। তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও এখানে পাওয়া যায়। আমাদের চোখের সামনে নাচছে যে গুপ্তধনের স্বপ্ন, তারও মালিক ছিলেন এক চীনা রাজপুত্র। সেই গুপ্তধন আছে এক বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। সুতরাং এ অঞ্চলে আগে বৌদ্ধদেরও প্রাধান্য ছিল। তারপর মুসলমানরা বারে বারে আক্রমণ করেছিল কাফ্রিস্থানকে। জেঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুর লং প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীরাও নাকি এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কারুর প্রাধান্যই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজের চারিদিকে মুসলমান প্রতিবেশী নিয়েও গত শতাব্দী পর্য্যন্ত কাফ্রিস্থান আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিল।

কাফিরা দেখতে সুন্দর। তাদের গায়ের রং প্রায় গৌর, দেহ লম্বা-মুখ চওড়া, চোখ গ্রীকদের মত। শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা ব'লে তারা স্নান করতে একেবারেই নারাজ। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হ'লে তাদের চেহারা যে আরো চমৎকার হ'ত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

কি মুসলমান ও কি পৌত্তলিক কাফির প্রত্যেকেই পরিবারের কেউ মারা পড়লে, গাঁয়ের প্রান্তে নির্দ্দিষ্ট এক ঢালু পাহাড়ের গায়ে উঠে চার পায়া ওয়ালা বড় সিন্দুকের ভিতরে মৃতদেহ রেখে আসে। তারা শবদেহ গোর দেয় না। এক একটি পারিবারিক সিন্দুকের ভিতরে পরে পরে দুটো, তিনটে বা চারটে মৃতদেহও রাখা হয়।

কাফিররা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অত্যন্ত নাচের ভক্ত। সামাজিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোন অনুষ্ঠানে তারা নাচের আসর বসায় এবং মেয়ে ও পুরুষরা একসঙ্গে দল বেঁধে সারা রাত ধ'রে নাচের আমোদে মেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গান ও দামামা। অনেকে দুই আঙুল মুখে পূরে তীব্র স্বরে শিস্ দেয়। পরীদের উপরে এদের অগাধ বিশ্বাস। নাচতে নাচতে কেউ কেউ পরী দেখে দশা পায়। তখন তারা নাকি ভাববাণী বা ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে। সবাই তাদের কাছে গিয়ে আগ্রহ-ভরে এইরকম সব প্রশ্ন করে—"এবারে কি-রকম ফসল হবে?"—"এ বছরে গাঁয়ে মড়ক হবে কিনা?"—"আমার খোকা হবে না খুকী হবে?"

পৌত্তলিক কাফিররা মুসলমানদের বিষম শত্রু। এর কারণ বোঝাও কঠিন নয়।

মুসলমানরা—অর্থাৎ আফগান প্রভৃতি জাতের লোকরা চিরদিনই তাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার ক'রে এসেছে, কাফিররাও তাই সুযোগ পেলেই ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের হত্যা করে। কেউ লুকিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মুসলমানকে বধ করতে পারলেও কাফির-সমাজে বীর ব'লে গণ্য হয়! তাদের মাথার পাগ্ড়ীতে গোঁজা পালকের সংখ্যা দেখেই ব'লে দেওয়া যায়, কে কয়জন মুসলমানকে হত্যা করেছে! আমরা যখন কাফ্রিস্থানে গিয়েছিলুম তখনই এ-শ্রেণীর মুসলমান-বিদ্বেষী পৌত্তলিক কাফিররা দলে যথেষ্ট হাল্কা হয়ে পড়েছিল। আজ তাদের সংখ্যা বোধ হয় নগণ্য, কারণ ওদেশে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভুত্ব বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

কাফিরদের প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় মৃত ব্যক্তিদের অশ্বারোহী কাঠের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। পৌত্তলিক হোক্, মুসলমান হোক্, পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা প্রত্যেক কাফিরই কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে। যার যেমন সঙ্গতি, সে তত-বড় মূর্ত্তি গড়ায়। কিন্তু এ-সব হ'চ্ছে নামেই প্রতিমূর্ত্তি, কারণ দেখতে সব মূর্ত্তিই অবিকল একরকম!

কাফিররা মাছ খায় না—মাছে তাদের ভীষণ ঘৃণা। ব্যাং বা টিকটিকি খেতে বললে আমাদের অবস্থা যে-রকম হয়, মাছ খেতে বললে তারাও সেইরকম ভাব প্রকাশ করে। কাফিররা মুর্গীর মাংসও অপবিত্র মনে করে—কারণ তা মুসলমানদের খাদ্য এবং কাফির নারীদের পক্ষে পুরুষ-জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ!

কাফিররা পরী মানে এবং কাফ্রিস্থানকে সত্যসত্যই পরীস্থান বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের দৃষ্টিসীমা জুড়ে দূরে বিরাজ করছে ২৫,৪২৬ ফুট উঁচু টেরিচ্-মির পর্ব্বত। বিরাট দেহ তার চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা এবং তার শিখর উঠেছে মেঘরাজ্য ভেদ ক'রে। নীচেও সর্ব্বত্রই অচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-প্রহরীর দল। এখন শীতকাল নয়, নইলে এ-সব পাহাড়ও পরত তুষার-পোষাক এবং তাদের উপত্যকা ও অলিগলি দিয়ে প্রবাহিত হ'ত তুষারের নদনদী। শীতকালে এখানকার অনেক গ্রাম বাহিরের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখতে পারে না—তাদের মাথার উপর দিয়ে বইতে থাকে বরফের ঝড়, তাদের চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বরফের স্তূপ!

কিন্তু গ্রীষ্মকালে সমস্ত কাফ্রিস্থান ছেয়ে যায় ফুলে-ফলে। কোথাও বেদানা ও আঙুরের ঝোপ, কোথাও মনোরম সবুজে-ছাওয়া বনভূমি—তাদের উপরে ঝ'রে পড়ছে নির্ঝরের কৌতুকহাসি এবং নীচে দিয়ে নেচে যাচ্ছে গীতিময়ী নদী। পাহাড়ের তলার দিক ঢেকে থাকে জলপাই ও ওক্‌গাছের শ্যামলতা এবং পাথরের ধারে ধারে ফলে আছে আখ্‌রোট, তুঁত, খুবানী, দ্রাক্ষা ও আপেল গাছ। আরো উপরে উঠলে দেখা যায় দেবদারু গাছের বাহার। ফুলও ফোটে যে কতরকম তার ফর্দ্দ দেওয়া অসম্ভব।

এই হ'ল গিয়ে কাফ্রিস্থানের মোটামুটি বর্ণনা। আসছে বার থেকে আবার গল্পের সূত্র ধরব।

ক্রমশঃ

চলন্তিকা

১৫ই নভেম্বর সমস্ত চীনদেশে বেতার যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সারাদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশে চীনদেশের সমস্ত বিজ্ঞান ও কলা সমিতি যোগদান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন চীনদেশকে ভালবেসে ছিলেন, চীনদেশও কৃতজ্ঞচিত্তে রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা দিয়েছে। বরীন্দ্রনাথ চিরদিন সোনার অক্ষরে চীনের বুকে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। চীন ও ভারতের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। সমস্ত চীনদেশ ব্যাপী বেতার যোগের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে আমরা সমস্ত ভারত ও সারাদিন ব্যাপী বেতার যোগে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-বাসরের এমন অনুষ্ঠান করিনি।

এই সম্পর্কে আর একটি খবরও উল্লেখযোগ্য: রেঙ্গুণে রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার্থ একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। তাঁরা স্থির করেছেন—(১) শান্তিনিকেতনে একটি বর্ম্মাগৃহ নির্ম্মাণ করে দেবেন সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা পড়াশুনা করবেন, (২) রবীন্দ্রনাথের বইগুলি বর্ম্মী ভাষায় অনুবাদ হবে, (৩) রেঙ্গুণ 'সিটি হলে' রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র রাখা হবে, (৪) সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নামে পুরস্কার দেওয়া হবে, (৫) সমস্ত পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথের বই থাকবে (৬) বর্ম্মায় প্রতি বৎসর একটি রবীন্দ্র-দিন প্রতিপালিত হবে।

আমরা চীন ও বর্ম্মার এই দৃষ্টান্ত যেন স্মরণ করি। আশা করি কবির জন্মদেশ এই ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলা দেশ কবির পূণ্য স্মৃতিরক্ষায় শীঘ্রই এমন ব্যবস্থাদি করবে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমস্ত লোকদের নিকট সহজে পৌঁছতে পারে।

জার্ম্মাণ ও রাশিয়ার যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ফলাফলের ওপর পূর্ব্ব-পৃথিবীরও বিশেষ করে চীন জাপান বার্ম্মা ভারতের অনেকখানি শান্তিঅশান্তি নির্ভর করচে। অন্ততঃ এই রকম অনেকের ধারণা কারণ এই ফলাফল ও পরিস্থিতির ওপর জাপান নিজের হালচাল সংযত করবে। শান্তি-অশান্তি সৃষ্টি করা অনেকটা নির্ভর করছে আমেরিকা ও জাপান উভয়ের ওপর। যুদ্ধের জন্য জাপান একরকম তৈরী হয়েই আছে। বিশেষ করে সাইবেরিয়া, চীন, ইন্দো-চীন, শ্যামদেশ ও বার্ম্মার বিরুদ্ধে তারা একরকম অস্ত্রধারণ করেই আছে। জেনারেল তোজো জাপানের নতুন প্রধান মন্ত্রী যুদ্ধপন্থী লোক। আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে যে অসন্তোষ ও গোলযোগ জমা হয়েছে তার জন্য অবশ্য আপোষে একটা মিটমাটের চেষ্টা চলছে।

তোমরা অনেকেই ইউরোপের মানচিত্রে দেখে থাকবে যে রাশিয়ার দক্ষিণে ও

'ব্ল্যাক-সী'র উত্তরে অবস্থিত রাশিয়া-অন্তর্গত ক্রিমিয়া নামে একটি ছোট দেশ আছে। এই দেশটি এখন জার্ম্মাণীর কোপে ও কবলে পড়েছে। কয়েকদিন আগের এক খবরে প্রকাশ যে ক্রিমিয়ার রাজধানী সিম্‌ফেরোপল্ জার্ম্মাণ সৈন্য দখল করেছে ও পশ্চিমে সেভাস্তপল্ ও পূর্ব্বে কার্চ্চএর দিকে আগুয়ান হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশ, জার্ম্মাণ সৈন্যরা কার্চ্চএর সদরে হানা দিচ্ছে। মানচিত্র দেখলে বুঝবে যে জার্ম্মাণদের হাতে কার্চ্চ পড়া মানে ককেসাসএর তেলের খনিগুলি (বাকু) অধিকার করার রাস্তা পরিষ্কার করা। আর সেভাস্তপোল বন্দর নেওয়া মানে সমুদ্রপথে নতুন সৈন্য এনে ককেসাস অভিমুখে চালান করা।

এই চেষ্টায় জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়াতে রাশিয়ার সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ সুরু করছে। কিন্তু রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভাগ্যদেবী আজও রাশিয়ার পক্ষই সমর্থন করছেন। শুধু দক্ষিণে ক্রিমিয়াতেই নয়, উত্তরে লেনিনগ্রাদের দিকে, মধ্যে মস্কো ও টুলার দিকেও অতি ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। রাশিয়ার অধিনায়ক ষ্টালিন সম্প্রতি বলেছেন যে এক বছরের মধ্যেই জার্ম্মাণীর পতন অবশ্যম্ভাবী। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে এই রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে কত লোক হতাহত হয়েছে! কয়েকদিন আগে ষ্টালিন বলেছেন, জার্ম্মাণ হতাহত ও কয়েদীর সংখ্যা—৪,৫০০,০০০ এবং রাশিয়ার হতাহত ও কয়েদীর সংখ্যা—১,৩৫৮,০০০! এই যদি যুদ্ধ হয় আর কয়েক বছর যদি এই যুদ্ধ চলে, তাহলে ইউরোপে ক'টা লোক আর বেঁচে থাকবে!

ইংরেজ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে একটি নিদারুণ ক্ষতির সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত এরোপ্লেনবাহী-জাহাজ 'আর্ক রয়াল্' জিব্রালটারের কাছে একটা জার্ম্মাণ সাব্‌মেরিণের টর্পেডো দ্বারা আহত হয়ে জলমগ্ন হয়েছে। ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় যখন 'আর্ক রয়াল' জিব্রালটারে ফিরে আসছিল সেই সময় জার্ম্মাণ সাবমেরিণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই 'আর্ক রয়াল' উত্তরমেরু থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত হানা দিয়ে জার্ম্মাণীর চক্ষে ধুলো দিয়ে শত্রু ধ্বংস করত। এই 'আর্ক রয়াল'ই জার্ম্মাণীর বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ 'বিসমার্ক'এর ধ্বংসে সাহায্য করে। প্রায় একশ'র ওপর জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান উড়োজাহাজও নষ্ট করেছে। জার্ম্মাণী বহুদিন থেকে চেষ্টা করেছে একে ধ্বংস করতে, এমন কি অনেকবার আগে মিথ্যে খবরে রটিয়াছে যে 'আর্ক রয়াল' ধ্বংস হয়েছে। 'আর্ক রয়াল'এর আগে ইংরাজদের আরো দুটি এরোপ্লেনবাহী-জাহাজ—'কারেজাস' ও 'গ্লোরিয়াস' জার্ম্মাণ সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা জলমগ্ন হয়।

বার্লিনে সুইডেনের এক সংবাদদাতা রাশিয়ায় হিট্‌লারের হেডকোয়াটার একটি 'তাঁবু

সহরের' ভারী মজার খবর পাঠিয়েছেন। রাশিয়ার কোন ঘন জঙ্গলের মধ্যে নাকি হিটলার তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে। তাঁবুগুলির কাছেই নাকি হিটলারের বিখ্যাত সাঁজোয়া ট্রেণ রাখা আছে। দরকার হলে যাতে তিনি চটপট তাঁবু তুলে অন্যত্র যেতে পারেন। এ ছাড়া একসার লরী ও মার্সেডস্ মোটরগাড়ীও মজুত আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটিতে শোবার ঘরের ব্যবস্থা আছে। হিটলারের সঙ্গে তাঁর শরীর রক্ষী ছাড়াও আছেন প্রেস-চীফ—যিনি একটি স্পেশাল লরীতে বসবাস করছেন ও সেই লরীতে রেডিয়ো, টেলিফোন ও নানা যন্ত্রপাতি আছে যাতে করে নাকি হিটলার যুদ্ধক্ষেত্র ও বার্লিনের মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আর একটি লরীতে ফিল্ম-ছবি ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম রাখা আছে যার দ্বারা হিটলার 'কি সুন্দর সে যুদ্ধ চালাছে' তার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়!

খেলাধূলার খবরের মধ্যে করাচী পেণ্টাগুলার ক্রীকেট খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই খেলায় মুসলীম দলকে হারিয়ে হিন্দুদল জয়ী হয়েছে। ১৯৩৯ সালে মুসলীম দল জয়ী হয়েছিল। গত বৎসর খেলাটির ফলাফল সমান-সমান হয়। লাহোরের একটি টেনিস প্রতিযোগিতার (ব্লেরেটন-চোপরা টুর্ণামেণ্ট) ফলাফলও উল্লেখযোগ্য। এই খেলায় ভারতের এক-নম্বর টেনিস খেলোয়ার ঘাউস মহম্মদ প্রেমপন্ধীর কাছে আশ্চর্য্যভাবে হেরে যান। আরো দু'টি আশ্চর্য্য ব্যাপার—মানমোহনের কাছে ইফ্‌তিকার আহ্‌মেদ এর হেরে যাওয়া আর তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় খসু সেনের (রংমশালে বিশেষ পরিচিত) কাছে মানমোহনের হেরে যাওয়া। খসু সেন টেনিস প্রতিযোগিতার খুব নাম করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রেমপন্ধীর কাছে খসু হেরে যান। এখন প্রেমপন্ধীকেই কি এক নম্বর খেলোয়াড় বলতে হয়?

আর একটি খেলারও বিশেষ নাম করতে হয়। এই খেলা হল কলকাতায় ছোটদের হাডু-ডু প্রতিযোগিতা। একটি বিশেষ হাডু-ডু প্রতিযোগিতা সেদিন শেষ হয়। এই প্রতিযোগিতাটির নাম হেমচন্দ্র শেঠ হাডু-ডু প্রতিযোগিতা। এর ফাইনালে ভারতীয় ক্লাব শঙ্করস্মৃতি সমিতিকে ৩০—২৮ পয়েণ্টে হারিয়ে দেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতার কথা বলে আমরা শেষ করি। এই প্রতিযোগিতাটি নূতন ও এই প্রথম। আমরা এলাহাবাদের নিখিল ভারত ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি জল-প্রতিযোগিতার কথা বলছি। এই প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৭ পয়েণ্ট পেয়ে সগৌরবে প্রথম হয়েছেন। পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ২২ ও ৫ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন। ৮০০ মিটার রেস ছাড়া কলিকাতা সব বিষয়েই প্রথম হয়েছে। ওয়াটার পোলো খেলায় কলিকাতা এলাহাবাদকে ৭ গোলে হারিয়েছে।

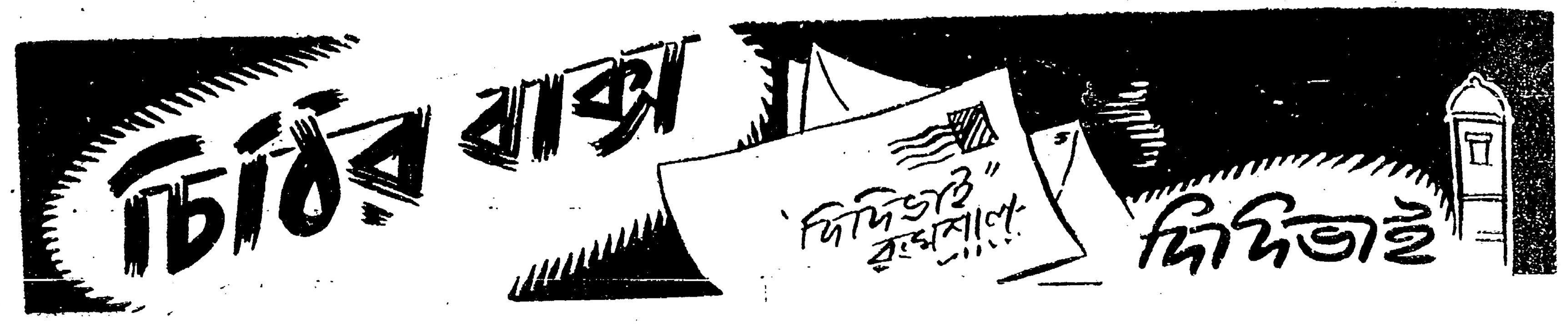

রংমশালের ভাইবোনেরা আমার !

এলো শীত, প্রকৃতির মাঝে তাই রুক্ষতার সমারোহ। চারদিকে খালি হারানোর পালা। ঋতু পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির দেহে পরিবর্ত্তনের ঢেউ, তাই যে গাছ একদিন ফলে ফুলে অজস্র সৌন্দর্য্য সমারোহে ভরে ছিল সেও আজ রিক্ত, শাখা তার পত্র পুষ্পহীন—শ্রীহীন...কিন্তু এই শ্রী ও সৌন্দর্য্য হীনতার ভিতর আবার জাগবে সৌন্দর্য্য, আবার আসবে সবুজের স্নিগ্ধ রূপ......।

এমনি করে প্রকৃতির ধারা বয়ে চলেছে। তোমাদের অনেকবার বলেছি প্রকৃতির সঙ্গে আছে মানুষের আন্তরিক যোগাযোগ তাই প্রকৃতির সব কিছু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে চলে। এই সামঞ্জস্য রাখা, এই খাপ খাইয়ে চলাটাই জীবনের ভিতর সব চেয়ে বড় কথা। এ সংসারে যে সামঞ্জস্য রেখে চলতে না পারে তাকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। গায়ক গান গায় সে যে পর্দ্দায় গাইবে তার হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী ইত্যাদি যন্ত্রগুলোকে ঠিক সেই পর্দ্দায় বেঁধে দেওয়া দরকার হয় এ তো তোমরা দেখেছ। যদি সেই পর্দ্দায় বাঁধা না হয়, গায়ক সুকণ্ঠ হলেও গান সেখানে সুরের, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি না করে অসুন্দরকে অভ্যর্থনা করে আনে।

তোমাদের জীবনে এখন থেকে এই সুর বাঁধা, এই সামঞ্জস্য রাখা যেন সুরু হয়।

তোমাদের কাছে থেকে গত মাসের রংমশাল প্রকাশের পরও বহু বিজয়ার চিঠি পেয়েছি—এখন তার উল্লেখ না করলে আশা করি তোমরা রাগ করবে না। আর একটা বহুবার বলা কথা তোমাদের বলি, প্রয়োজনীয় কথা না থাকলে অনর্থক ষ্টাম্প খরচ করে চিঠি দিও না, কেননা উত্তর দেবার কিছু না থাকলে শুধু চিঠি পাওয়ার স্বীকারোক্তি করে কি লাভ বলতে ? আজ আমি অনেকগুলি চিঠির উল্লেখ করছি

যার উত্তর দেবার বিশেষ কিছু নেই, যেমন নিখিলেশ নাথ ঘোষ, কণা মুখার্জ্জি, বাণী, বাসন্তী, শরৎশ্রী, যুঁই, নন্দরাণী চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি।

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাটা ভোগ) ১৭২২। তোমার গল্প ? বহুবার তো বলেছি ভাই মনোনীত হলেই সময় মত ও স্থান মত যাবে। **প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়** (জব্বলপুর) ১৪৯৬। তুমি বৈশাখ থেকে নিজেকে গ্রাহিকা করে নিলেই তো পারতে—সুবিধা হতো। এখন তাহলে যে কয়মাসের চাও—তার দাম রংমশাল অফিসে পাঠিয়ে দিও—কাগজ পাঠান হবে। গ্রাহক গ্রাহিকাদের 'লেখনীবন্ধু' দেওয়া হয়। তুমি যার সঙ্গে আলাপ করতে চাও তার নাম লিখে ষ্টাম্প পাঠাইলেই এখান থেকে তার ঠিকানা পাঠান হবে। **রবীন্দ্র মজুমদার** (খাগড়া) ১৫২৫। ব্যাজ তো এখন আমাদের তৈরী নেই সুতরাং ও সম্বন্ধে এখন আলোচনায় লাভ নেই। রংমশাল দলের সভ্য সভ্যাদের জন্য এই ব্যাজ তৈরী করা হয়েছিল। **লালমোহন ভট্টাচার্য্য** (কালীঘাট) ১৫৮৬। তোমার চিঠির সঙ্গে ষ্টাম্প ছিল না তাই লেখনীবন্ধু পাঠান সম্ভব হয়নি। **রেখা নন্দী** (সিলেট) ১৪২৮। তোমার বন্ধুদের শীঘ্র পাঠাবার ব্যবস্থা চলছে। **শিবরাণী ঘোষ** (সুগৌলী) ১৫৭৬। মেয়েদের ব্যায়াম সম্বন্ধে বলতে ২।১টী কথায় তা শেষ হয় না, বিস্তৃত ভাবে পরের বার আলোচনা করবো। **প্রদীপ সেন** (টালিগঞ্জ) ভারতে ২২৫টি ভাষা প্রচলিত। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে হিন্দুস্থানী (হিন্দী এবং উর্দ্দু) বাঙ্গালা, মারাঠা, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী। বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙ্গলা। এই কারণে এক ভাষাভাষীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা দেশেই বেশী। হিন্দুস্থানী—হিন্দি ও উর্দ্দু এই দু'টি ভাষাকেই বুঝিয়ে থাকে। কেননা এই দু'টি ভাষায়ই শব্দগত ও ব্যাকরণ অনেক মিল আছে, তবে তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে এরা আলাদা হয়েছে। প্রথমতঃ হিন্দির বর্ণমালা হচ্ছে দেবনাগরী, উর্দ্দুর বর্ণমালা আরবী ফারসী, দ্বিতীয়তঃ নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে হিন্দি হিন্দুদের সঙ্গে এবং উর্দ্দু মুসলমানদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তৃতীয়তঃ উর্দ্দু লেখকগণ ভাষার প্রসারের জন্য আরবী ও ফারসী থেকে শব্দ সংগ্রহ করেন, হিন্দী লেখকগণ করেন সংস্কৃত থেকে।

গিরীন রায়, মাহনূর বেগম, আব্দুল গাফার—তোমাদের চিঠি পেয়েছি, পরের মাসে উত্তর দেবো।

তোমরা সকলে আমার প্রীতি গ্রহণ করো।

ইতি—তোমাদের

দিদিভাই

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

আজ তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে। রাজি থাকো তো শোনো। সত্যিকার গল্প।

বয়সে আমি তখন তোমাদেরই অনেকের মতন। মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছি বৃন্দাবনে। গলির ভিতরে একটি দোতালা বাড়ীতে আমাদের বাসা।

বৃন্দাবনে রাব্ড়ি ভারি সস্তা। মা সের-খানেক রাব্ড়ি আনালেন। আমার ভাগে পড়ল পোয়া-খানেক। রাব্ড়ির ভাঁড়টি জানলার কাছে রেখে হাত ধোবার জন্যে ঘরের বাইরে গেলুম। মিনিট-খানেক পরে ঘরে ঢুকে দেখি, ভাঁড়-শুদ্ধ রাব্ড়ি অদৃশ্য!

হতভম্ব হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ চোখ গেল জানলার বাইরে। গলির ওপারে একখানা একতালা বাড়ীর ছাদের উপরে ব'সে একটা মস্তবড় গোদা বাঁদর,—তার হাতে আমার সাধের রাব্ড়ির ভাঁড়! করুণ চোখে চেয়ে রইলুম। বাঁদরটা ভাঁড়টা চেটেপুটে সব রাবড়ি খেয়ে, আমার দিকে একটা অবহেলা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

বাবা বললেন, "একটা সামান্য বাঁদরও তোকে ঠোকিয়ে গেল। তুই বাঁদরেরও চেয়ে বোকা!"

সেইদিনই বাবা ভাত খেতে বসেছেন, হঠাৎ কোথা থেকে দুটো বাঁদর এসে তাঁর ভাত-শুদ্ধ পাতা টেনে নিয়ে চম্পট দিলে।

বাবা বৃন্দাবনের বানর-জাতির সম্বন্ধে যে-সব কথা বললেন, তা ছাপবার জায়গা এখানে নেই।

আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলুম। কলকাতার মানুষের উপরে টেক্কা মারবে বৃন্দাবনের বানর,—এ দুঃখ অসহনীয়।

দুপুর-বেলায় বাজারে বেরিয়ে কিনে আনলুম দুই পয়সার হালুয়া এবং দুই পয়সার সিদ্ধি। হালুয়ার সঙ্গে বেশ ক'রে সিদ্ধি-বাটা মিশিয়ে একটা ভাঁড়ে ভ'রে জান্লার কাছে রেখে দিলুম।

ঘরের বাইরে গিয়ে আবার দুই মিনিট পরে ফিরে এলুম। জান্লার ধার থেকে ভাঁড় আবার অদৃশ্য হয়েছে!

মনের মধ্যে নেচে উঠল প্রবল আনন্দ! ছুটে জান্লার কাছে গিয়ে দেখি, একতালা বাড়ীর ছাদের উপরে আরো দশ-বারোটা বানরের মাঝখানে ব'সে সেই গোদা বাঁরদটা পরম পরিতৃপ্ত ভাবে হালুয়ার ভাঁড়টা খালি করছে। সে কারুকে এক কণা প্রসাদও দিলে না।

মিনিট-তিন পরে সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে খালি ভাঁড়টা বারংবার শুঁক্তে লাগল। মিনিট-পাঁচেক পরে সে ছাদের উপরে শুয়ে পড়ল। সাত-আট মিনিট পরে তার নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল। অন্য বানরগুলো ভীত ভাবে দূর থেকে তার দিকে তাকাতে লাগল, তারপর একে একে লম্বা দিলে।

দেখতে দেখতে আশপাশের সমস্ত বাড়ীর ছাদ ভ'রে গেল বানরে বানরে। বোধহয় বৃন্দাবনের সমস্ত বানর সেইখানে এসে জুটল। প্রত্যেকেরই বিস্ফারিত দৃষ্টি সেই অচেতন গোদা বাঁদরের দিকে। কিন্তু ভরসা ক'রে কেউ তার কাছে এলো না। তারপর এল রাতের অন্ধকার।

পরদিন সকালে উঠে গোদা বাঁদরকে আর দেখতে পেলুম না।

তারপর যে-কয়দিন বৃন্দাবনে ছিলুম, আমাদের বাসার ত্রিসীমানায় একটা বাঁদরকেও আবিষ্কার করতে পারি নি।

যেখানে বানর-হনুমানের উপদ্রব, তোমরা যদি সেখানে বেড়াতে যাও, আমার এই মুষ্টিযোগটি পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারো। ইতি,

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পূজোর ছুটি

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষাল গ্রাহক নং ১৭৭৮

কি দিদিভাই—
কাট্‌লো কেমন পূজোর ছুটি
জুট্‌লো কত মনের জুটি
জান্‌তে তোমার এতই কৌতূহল।
তারই তরে কষ্ট করে
কওনা কেন স্পষ্ট করে
মিথ্যে কর পুরস্কারের ছল।

কিন্তু শোন—
সত্যি আমি বল্‌ছি তোমায়
এমন কিছু নেইক জমায়
করব খরচ কালির আচড় টেনে,
স্বভাব ত নয় কুড়িয়ে এনে
পরের কাছে আসব জেনে
ধার করা ধন করব বিতরণ।
তাইত ভাবি লিখব কিবা
লিখতে গিয়ে কাঁপছে গ্রীবা
রাত্রি দিবস ভাবছি অনুক্ষণ।

শুন্‌বে তবে—
সত্যি কথা বল্‌ছি শোনো
লুকোছাপা নেইক কোনো

পূজোর ছুটি নয়ক সেত বিদেশ ছোটার তরে
নিজের মাকে একলা ফেলে
চাইনা হতে পরের ছেলে
স্বর্গ যদি থাকে কোথাও সেত নিজের ঘরে।
শেওলা পানায় ভরবে দেশের ডোবা
দেখব তখন দেশ বিদেশের শোভা
নিজের বাড়ী পড়বে ধ্বসে
বিদেশ গিয়ে আচ্ছা কসে
থাকব মেতে সুখে আর সম্ভোগে।

সঙ্গীরা মোর—
কেউবা গেল ওয়াল্টেয়ার
হাত নেড়ে দেয় ওয়েলফেয়ার
কাশ্মীরে কেউ, কেউবা হাসন্নাবাদে
কেউ পুরী, কেউ ছুট্‌ল রাঁচি
মনের ভাবটা গেলেই বাঁচি
'রোমান্স'এ কেউ নামল কয়লা খাদে।
কেউ বেরুল এক্সপিডিশন
কেউবা গেল এগ্‌জিবিসন
গরীব যারা গেল মামার বাড়ী
যেমন পড়ল পূজোর ছুটি
লাগ্‌ল যেন ছুটোপুটি
থাকলে দেশে ছিঁড়বে যেন নাড়ী।
বিদায় দিলাম বন্ধু ও ভাই সবে
মায়ের কাছে একলা থাকি তবে
নইলে মোদের দুঃখী মা যে কাঁদে—
মায়ের ছেলে দেখবে না'ক মা'কে
তারপরে আর দেখবে কেবা তাঁকে
সবাই মাকে একলা ফেলে যায়—
দেশের কি আর এ দুর্দ্দশা সাধে॥

প্রতিযোগিতার

নির্ব্বাচিত রচনা

পূজোর দিনগুলো

কুমারী বাসন্তী মুখার্জ্জি, গ্রাঃ নং ১৭২৭

এবার পূজার ছুটী কেমন ভাবে কাটিয়েছি তাই লিখতে হবে। মূস্কিল আর কি—প্রথমতঃ পূজার ছুটিই আমার নেই। দ্বিতীয়তঃ, যাইওনি কোথায়। কি লিখি তাহলে? ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে সির-সিরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে খুব ভোরে তো ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। বাগানের ঐ কোণের রাস্তার পাড়ে শিউলি ফুলের গাছ—অজস্র টুপ টাপ ঝরে পড়ছে আর পড়ছে বাগানে রাস্তায়, ওরা যেন মায়ের আসার পথে আঁকছে আল্পনা—শিউলি ফুল কি সুন্দর কি শুভ্র ওর রূপ—কি চমৎকার ওর মিষ্টি গন্ধটি। শুয়ে শুয়ে দেখছি—ভারি ভাল লাগছে। কিন্তু না বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা চলল না, ছোট বোনেদের ডাকা ডাকিতে উঠে পড়তে হ'ল—পূজোর ফুল তুলতে হবে। সারা সকাল কাটে ফুল তুলেই। দুপুর বেলা পাড়ার কয়েকটি মেয়েকে সেলাই শেখাতে হয়—যদিও ভাল সেলাই আমি মোটেই ভালো জানিনা—তবুও সবাই মিলে কাজ করার একটা আনন্দ পাই। বিকেলটা কাটে—লেকেও নয় পার্কেও নয়—বাড়ীর পাশে কাজলা দিঘীর পাড়ে। কাজ্‌লার স্বচ্ছ জলে ফুটেছে অজস্র লাল পদ্ম। দীঘির পাশে মাঠ যতদূর দেখা যায় শুধু সবুজ—কে যেন একটানা সবুজে কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। সর সর কোরে বয়ে যাচ্ছে বাতাস—বাতাসের ঢেউএ সবুজ ধানের শিষ মাথা নাড়ছে—দেখে মনে হয় ওরা যেন কাকে জানাচ্ছে নতি। কাজ্‌লার জলে আবির ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যি মামা গাছ পালার ফাঁকে মাঠের ওপারে ডুব দেন। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে—পাখীর গান যায় থেমে। নীল আকাশে তারার প্রদীপ জ্বলে—আর ওঠে সপ্তমীর চাঁদ। পূজো বাড়ীতে আরতির বাজনা বেজে ওঠে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ের দল যায় পথ বেয়ে—গায়ে রঙীন জামা কাপড়, মুখে উচ্ছল হাসি। ফুলের মত সুন্দর ওরা—মনে হয় ওরা না হলে পূজোর আধখানাই বাদ পড়ে যায়—আকাশে সুরু হয় চাঁদে মেঘে লুকোচুরি খেলা—দেখতে বেশ লাগে ক্রমে বাজনার শব্দ যায় থেমে। ধীরে ধীরে সমস্ত পল্লী যায় নিঝুম হয়ে—পশ্চিম গগনে ক্লান্ত চাঁদ পড়ে হেলে।

এমনি কোরেই কাটে আমাদের পূজোর দিনগুলো।

পূজায় ভ্রমণ

দুর্গা সেন, গ্রাঃ নং ১৬৮৬

কাকা বলেছিলেন, এবার পূজার ছুটীতে কাশ্মীর যাওয়া হবে। শুনেত আমরা সব ভাইবোন মিলে খুব আনন্দ করছি, জিনিষপত্র কিছু কিছু কেনা হচ্ছে, টাইম টেবিল ওল্টানো হচ্ছে, এমন সময়ে দেশ থেকে ঠাকুমার চিঠি এল পূজায় দেশে যেতে হবে। ঠাকুমার কথামত দেশে যাওয়াই ঠিক হল অবশেষে। কোথায় কাশ্মীর ভ্রমণ আর কোথায় দেশে

যাওয়া! অবশ্য গ্রামে পূজার সময়টা আমাদের খুবই আনন্দে কাটে, তবে সেটা ত প্রায় প্রত্যেক বারই ঘটছে; কিন্তু কাশ্মীর যাওয়া! কত দিন বসে কত কল্পনা জল্পনা করেছি শেষটা কি একেবারেই ভেস্তে যাবে! আমরা সকলে মিলে ত খুব চেঁচামেচি সুরু করলাম। কাকা শেষটা সান্ত্বনা দিলেন—পূজার পর কাশ্মীরে যাওয়া হবে। তবু মনটা কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ষষ্ঠির দিন রাত্রি ১০টার গাড়ীতে দেশে যাওয়া ঠিক হল। সারাদিন জিনিষপত্র গুছান ইত্যাদিতেই প্রায় কাটল। আমরা খুড়তুত জ্যাঠতুত ভাইবোন এবং সকলে মিলে জন ১৫ হবই ঠিক হয়েছিল। দুই কাকার গাড়ীতে সবাই ষ্টেশনে যাব, কাকারা যাবার রাস্তায় আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন। খাওয়াদাওয়া সেরে তৈরী হয়ে বসে আছি গাড়ীর অপেক্ষায়, সারাদিনের ছুটোপুটিতে কেমন ঘুমপেয়ে যাচ্ছিল, বোধহয় একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, মায়ের তাড়ায় জেগে দেখি, আমার ছোট বোন নোটন ডাকছে, "চল শীগ্‌গির গাড়ী এসেছে।"

ষ্টেশনে পৌছে দেখি বেজায় ভীড়, ভীড় ঠেলে ত কোনও রকমে গাড়ীতে উঠ্‌ছি, তাকিয়ে দেখি অবাক্‌ কাণ্ড, এটাত E. B. R. এর গাড়ী নয়, স্পষ্ট লেখা রয়েছে E. I. R. বাবুকে ঠেলে চুপি চুপি বল্লাম, "বাবু E. I. R. এর গাড়ীতে কোথায় যাচ্ছি?" বাবু মুচকি হেসে বল্ল, "বাঃ আমরা যে কাশ্মীর যাচ্ছি তুই জানিস না?" শুনে খুব মজা লাগল।

আমরা যে গাড়ীটা দখল করেছিলাম সেটাতে ভীড় বেশী ছিল না। গাড়ী ত ছুটে চল্ল, মাঝে মাঝে বড় বড় ষ্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু একাই জেগে আছি, সব ভাই বোনরা ঘুমে বিভোর। একা একা চুপচাপ বড্ড বিরক্ত ধরছিল, বসে থেকে থেকে আমারও ঘুম পেতে লাগল, হঠাৎ দেখি একটা জায়গায় গাড়ী থেমেছে। অনেক লোক সেখানে হৈ চৈ করে নেমে পড়ল, আমরাও সেখানেই তাড়াতাড়ি সবাই নেমে পড়লাম। এই নাকি শ্রীনগর। আমি ত অবাক্‌, সত্যিই এত তাড়াতাড়ি কী করে কাশ্মীরে এসে পড়েছি। চাঁদের আলো চারদিকের পথের বরফের গুঁড়োর ওপর পড়ে চিক্‌মিক্‌ করছে। যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকেই রাশি রাশি পেঁজা তুলোর স্তূপ। বড় বড় পাহাড়গুলি বরফে ঢাকা, চাঁদের আলোয় রূপার মত সাদা হয়ে গেছে। কী সুন্দর দৃশ্য! আমরা মোটরে চড়ে চলেছি, বরফের স্তূপ গাড়ীর চাকায় ছিটকে ছিটকে পড়ছে, উঁচু নীচু পথের পাশে আপেল নাসপাতি গাছ। হঠাৎ একটা খুব বড় লেক দেখে বাবু হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌ল,—ডাল লেক! ডাল লেকে কত যে পদ্ম পাতা জলে রঙীন আভা ফেলেছে। লেকের কাছেই বরফে ঢাকা পাহাড়, সবটা মিলে আশ্চর্য্য সুন্দর লাগছে। লেকে কত ছোট ছোট শিকারা বেয়ে চলেছে।

ঝিলাম নদীর ধারে এসে কাকাকে বল্লাম, আমরা 'হাউস বোটে' থাকব। বড়দের ভিতর আবার কে হাউস বোটে থাকতে আপত্তি তুলল। কিন্তু আমরা হাউসবোটে থাকবই। কাকা আমাদের কথাতে রাজি হয়ে হাউসবোটের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। মাঝির সঙ্গে দরদস্তুর হচ্ছে আমরা গাড়ী হতে নেমেছি, আমায় কে এমন জোরে ধাক্কা দিল আর পা মাড়িয়ে দিল যে আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম, আমাদের গ্রামের তিনকড়ি মাঝি বলছে, "শীগ্‌গির লন্‌ করতা দেরী হইলে বুড়া ঠাক্‌রাণ নাইস্ত হইবে!" আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম—এখানে তিনকড়ি মাঝি কি করে এল! চেঁচিয়ে বলে

উঠ্‌লাম, "তিনকড়ি—কাশ্মীরে কবে এলে ?" হাসির শব্দে চম্‌কে তাকিয়ে দেখি—দিদি, বাবু খোকা নোটন সবাই খুব হাসছে। মা বলছেন, "আর ঘুমোতে হবে না নৌকায় উঠে পড়।" দিদি হেসে বল্ল,—"বাবাঃ কাশ্মীর থেকে একেবারে—দৌলতপুরে পতন !!" ভাল করে চেয়ে দেখি, আমরা নৌকার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি—ভৈরব নদীর জলে আলোর ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

পুজোর ছুটী

সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গ্রাঃ নং ১৬০৮।

আমি জানি নিছক্ সত্যি কথার কোন আদর নাই। আজকালকার যুগটাই হচ্ছে বাড়িয়ে বলার যুগ। কাজেই এ প্রতিযোগিতার যাঁরা পরীক্ষক তাঁরাও আশা করছেন যে প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু বাড়িয়ে লিখেছে। আমার কাছে কিন্তু তাঁদের নিরাশ হ'তে হবে।

স্কুল যখন খোলা থাকে তখনিই দিনে পড়ি কি পড়ি না—তা আবার ছুটিতে! পড়ব না জানিই, কাজেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামাই কেন? মাথা ঘামাচ্ছিলাম কি করব তাই নিয়ে। মৎলব্ বাৎলালে রবুদা। সত্যিই তো বড় পুকুর, মাঝের পুকুর, গোপাল সায়ের মাছে ভর্ত্তি—আর আমি কি না!—

ছিপটিপ নিজেরাই তৈরী করলুম্। তারপর? তারপর আর কি, দিন দশ বারোর মধ্যেই আমি একটি অতুলনীয় বালক হ'য়ে পড়লাম—কারণ পিসীমার মতে আমার দ্বিতীয় নাকি দুনিয়ার আর কোথাও মেলে না।—কেন? সে কথাটা আর বল্‌ছি না!

শুনেছি নেপোলিয়ানও একদিন গোপনে নাকি বলেছিলেন যে মাছ ধরাটা তাঁর পক্ষে একদম "ইম্‌পশিবেল"। সে কথাটা কতখানি সত্যি তা এতদিনে বুঝলাম। পিসীমার জন্যেই হ'ক আর নেপোলিয়ানের জন্যেই হ'ক ওটা ছেড়ে দিলুম।

এইবার মাথা দস্তুর মত ঘামাতে হ'ল—আর কি করা যায়, ছুটির ত অনেকটাই বাকী এখনও। তাই তো!........

দুপুর বেলায় সেজদাদের আসরটা মন্দ জমে না। যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু যাবার উপায় নেই—মেজদার গাঁট্টাগুলো যা হজম করতে হয়, বাপস্। তবুও যাই। প্রথম দিন তাড়িয়ে দিলে, ওরা বল্‌লে, "সামনে একজামিন খেলা দেখতে এসেছে—যাঃ ডেঁপো কোতাকার।" মেজদা মারতে এলো বল্‌লে, "নিকালো"।

চলে আসি...আবার যাই। কিছুদিন পর এভাবে ক্রমশঃ তাদের সহনশীলতা বাড়িয়ে দিয়ে সেখানেই জমে পড়ি—

ব্যাস আর কথা নেই। নেশা ক্রমশঃ জমে আসে, কিন্তু বেশ পছন্দ হয় না। রবুদা বল্‌লে—আমরাও খেল্‌ব। পাশের ঘরটায় আড্ডা গাড়া হ'ল—চলল ডবল্ রিডবল। সকালে উঠেই মনে পড়ে কালকের ব্ল্যাক সেটের কথাটা,—গোলাম, নয়গুলো হরদম মাথায় চক্র দেয়—মাছ ধরা-ত ছেড়েই দিয়েছি—মানে ওটা ত হয় না—কাজেই সারা দুপুর বেশ চল্‌তে লাগল আমাদের আড্ডা.........।

বেশী দিন নয়—এই সেদিন একটা অঘটন ঘটল.. ...খেলাটা বেশ জমে উঠেছে—

হল্লা চলেছে, এমন সময় কাকাবাবু (তিনি কখন এসেছেন জানতুম না) পিঠে একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় কসিয়ে দিলেন। ..দিয়ে...

যাক সে দৃশ্য আর বর্ণনা করতে চাইনা। যবনিকা পতন আর কি।

রংমশালে দেখলাম, পূজার ছুটিতে কি করেছি তাই লিখে পাঠাবার একটা প্রতিযোগিতা। কিছুই করিনি অথচ লিখতে হ'বে।—আর যা সব কীর্ত্তি করেছি তা খুটীয়ে বল্‌তে গেলে মরি আর কি, কাশীরাম দাশকে দস্তুর মত প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা হ'বে। আর যে কিছুই করিনি এ বল্‌লে একটু গলদ থেকে যাবে—আর একটু একটু পড়েছি বৈকি—খুলেই যে পরীক্ষা।......বইগুলো এখন আমাকে ভয় করে।

এই লেখাটা প্রতিযোগিতায় পাঠাব শুনে কালুকা হেসে বল্‌লে, "বল্‌ছিস্ কি তুই। তোর মাথা খারাপ না, তুই সিভিকগার্ড ?"

আশ্বিনের

পূজোর ছুটি

—প্রতিযোগিতার ফলাফল—

আমাদের মনের মত লেখা, সত্যি কথা বলতে, আমরা এবার একটিও পাইনি। তবুও তোমাদের খুসী করবার জন্য আমরা তিনটি রচনা পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা করলাম। এই তিন রচয়িতাদের মধ্যে আমাদের ঘোষনামত দু'টি পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হবে। যারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছ সকলকেই মনে রাখতে হবে, আরো সুন্দর লেখা আমরা তোমাদের কাছ থেকে চাই।

পুরস্কারযোগ্য

পূজার দিনগুলো—কুমারী বাসন্তী মুখার্জ্জি, গ্রাঃ নং ১৭২৪।
পূজায় ভ্রমণ—দুর্গা সেন, গ্রাঃ নং ১৬৮৬।
পূজার ছুটি—সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গ্রাঃ নং ১৬০৮।

এই তিনটি রচনা এবার ছাপা হল।

উল্লেখযোগ্য

'পূজার ছুটি কেমন করিয়া কাটাইয়াছি'—চিরঞ্জীব সেন, গ্রাঃ নং ১৮৫০, পাটনা।
'পূজার একটি দিন'—মণিমালা দেবী, গ্রাঃ নং ৫৭৭, ভবানীপুর।
'পূজার ছুটি'—সন্দীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রাঃ নং ১৭১৬, বেনারস।
'বিকানেরে এক সপ্তাহ'—সাধনা ভট্টাচার্য্য, গ্রাঃ নং ১৭৮৭, নবদ্বীপ।
'পূজার চিঠি' (কবিতায়)—জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, গ্রাঃ নং ৯৩৭।

নূতন ধাঁধা

"——" চিহ্নিত স্থানগুলিতে গৃহ প্রচলিত আসবাবের নাম দিয়া চিঠিখানা সম্পূর্ণ কর :—

ভাই বাঁ—,

আমরা বর্দ্ধমানে এসেছি। দেশটা বড় নির্জ্জন। চোরের ভয়ে একটা — দার রাখা হয়েছে। বড্ড মশা, মশারী না —লে চলে না। একটা ভাল কুকুর পুষেছি। নাম রেখেছি —তিকা এখানে এসে সেরে গেছে। ওর দৌরাত্মে পিসীমার ঠা—কেয উঠেছেন। কাকা বাবু খুব পাখী শীকার করেন। আমি মধ্যে মধ্যে এক আধটা হরি —। এখানে ধান ক্ষেতে কি সুন্দর — দেখলে বোঝা যায় না। ছুটি হলে তুই ও চলে —এলে আড়ি করে দেব। ইতি — —

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ক, ২। খ, ৩। থ, ৪। চ, ৫। র, ৭। হ, ৮। স।

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছে ঃ—

দুর্গাপ্রসন্ন, পচু, জ্যোতি, মুক্তি, মায়া ও জয়া, নদিয়া : গীর্দ্দেবী কান্ত দাস, কালকাতা ; মমতা ও দীপেশ, বালিগঞ্জ ; তরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নিউ দিল্লী ; সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী ; মনি, পান্না, কেশব ও গোপাল দা, শালিখা ; বিজন, লীলা, কল্পনা ও শীলা চক্রবর্ত্তী, নওগাঁ।

(একটি বা দু'টি ভুল উত্তরদাতাদের নাম ছাপান স্থানাভাবে সম্ভব হল না)

দ্রষ্টব্য ঃ—

ছাপবার কাগজ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে ওঠার দরুণ আমরা রংমশালের পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কমাতে বাধ্য হয়েছি। ভবিষ্যতে রংমশাল প্রকাশ করা উপযুক্ত কাগজ পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে তবুও আমরা বিশেষ চেষ্টা করব যাতে প্রতিমাসেই নিয়মিত রংমশাল প্রকাশিত হয়।

রংমশাল
ষষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
পৌষ ১৩৪৮

অমর দিন

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

ক্ষমার মূর্ত্তি খ্রীষ্ট যখন
দীর্ণ বুকের রক্তে
অত্যাচারীর পাপের কালি
মুছিয়া দিলেন আপনা ঢালি
পবিত্র অলক্তে,

জগতের লোক জানিল তখন,
মহাপুরুষের সাথে
স্বর্গের মহা আলোর ধারা
আসিয়া ভাঙ্গিল কালোর কারা,
অমল সুপ্রভাতে।

নমে গৌরবে মানুষের মন
সেই তিথিটি স্মরি'
শিশু খ্রীষ্টের জন্ম যেদিন,
ধরণী ধন্য করি।

তাহারো আগে অমর দিন
ইতিহাসের ছত্রে
অমনি আরো অমর দিন
বাজাল আলোর অমিয়-বীণ্
পুষ্পে, সবুজ পত্রে।

সে সব দিন তারার মত
পৃথিবীর দু' পারে,
নিরাশারি আঁধার রাতে
কল্যাণ-দীপ তুলিয়া হাতে
জ্বলিছে বারে বারে।

সে সব দিন রাতের তারা,
দিনের ···সম্মান!
মানুষজাতির জন্মদিনের
জাগানো বীরের গান!

মানুষজাতির শিশু কিশোর,
এই সৃষ্টির অগ্নি।
সকল দেশের নিশান বয়ে
দু সারিতে চলছে, লয়ে
আলোর শতঘ্নী।

ভুল, ভ্রান্তি, ব্যথা, আঁধার,
যত ভীষণ কালি,
তাদেরি কেউ মুছায় এসে
বড় হয়ে! আনে হেসে
অমর দিনের থালি!

লক্ষ কিশোর চলেছি আজ
দিনের বন্দনাতে,
কোন্ অজানা অমর দিনের
বিজয় ঝঞ্ঝণাতে!

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শত যোজন সমুদ্র—একমাস লাগলো নবতি যোজন বাঁধতে। রাম্পোলের আর লঙ্কার মাঝে তখনো দশ যোজন সমুদ্র রয়েছে, সেইসময়ে সেতুবন্ধনে বাধা পড়লো। আজ বাঁধা যায় গাছ পাথরে পোস্তা, কাল যায় ভেঙে! কেউ বলে রাক্ষসেরা রাতারাতি এসে ভেঙেছে, কেউ বলে সিংহলের সিংগী মাছ শিংএর গুঁতোয় ধ্বসিয়ে গেছে পাথর। নল-নীলের বিদ্যেতে আর কুলোয় না দেখে জাম্বুবান, সুগ্রাব, রাম, লক্ষণ, অঙ্গদ সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হনুমান কোন কথা কন্ না দেখে সুগ্রাব হনুমানকে ডেকে বল্লেন—কি করা যায় হে রামচন্দ্রের বিশ্বাসী পাত্র; দশ যোজন সাগর যে আর বাঁধা পড়তে চান্ না! হনুমান গম্ভীর হয়ে বলেন—যা করেন নল-নীল, আমি লাফাতেই পারি, পোস্তা বাঁধতে অপারগ রামদাস!

সুগ্রীব বুঝলেন, হনু নল-নীলের বিদ্যে প্রকাশ দেখে চটেছেন। মন্ত্রী জাম্বুবান বল্লে—মহাবীর কুপিত হয়েছেন, তাই পবণদেব ঝড় দিয়ে জলের পাথর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন!

এই কথা হচ্ছে, এমন সময় নল-নীল ভীতচকিত হয়ে সুগ্রীবের পা জড়িয়ে বলছেন—এই জন্যেই বিদ্যা প্রকাশ করতে চাইনি!

জ্ঞাতির আগে বিদ্যার বড়াই করিলে মন্দ হয়
ও-দশ যোজন বাঁধা আর মোদের কর্ম্ম নয়।
আজ বাঁধবো বাঁধ—কাল ভাঙ্গা যাবে
হনুর নামে দোষ দিলে চাপড়ে প্রাণ লবে!

তখন সুগ্রীব হনুকে ডেকে বলছেন—কোপ আগ কর হনু, সেতু বাঁধা হোক।

—কোপ করবো কেন, আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলেম—এও কি হয়, শিলা জলে ভেসে রয়! এখন সমুদ্রের টান ধরে ভাঙ্গন লেগেছে ও মুখে সেতুর। দশ যোজন তো অল্প পথ, লাফ দিয়ে গিয়ে পড়েন সবাই লঙ্কায়!

—তুমি তো বল্লে ভালো, দশ যোজন কি কম হল! আর কার মুখ চাই, ফিরে ঘরে যাই !

সভামধ্যে হনুমান করুন অঙ্গীকার—
পাথর বইবেন—
তবে পারি বাকিটুকু সেতু বান্ধিবার ।
তিন যোজন করি বান্ধিব প্রতি দিন—
নয়, সাড়ে তিন দিনে কটক-পারে নিন্ ।

—সাড়ে তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে না—আমি এক দণ্ডে সেতু বেঁধে দিচ্ছি—বলেই হনুমান বাহ্বাস্ফোট করে জয়রাম বনে লম্ফ দিয়ে এক টানে বিশ-যোজনে একখান পাথর এনে নল-নীলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—ধর দেখি দশ যোজনের বহর !

কাণ্ড দেখে নল-নীল উঠে দিল রড় !

হনুমান তখন সেই বিশ যোজন পাথর ফেল্লেন জলে, বাঁধা ঘাটের চাতালের মত সেই পাথর আড় হয়ে রইলো লঙ্কাপারে ঠেসান দিয়ে ।

উত্তর কুলের সেতু ঠেকে অন্য পারে—
'জয়রাম' কপিগণ বলে বারে বারে ।
রাম রাম জয় রাম বল বার বার
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ।
এমন নামের গুণ কি দিব তুলনা ;
বান্দরে বান্ধল সেতু—
যেটা হবার নয়, পরে হয় কি না !
উত্তর কুলের সেতু ঠেকে অন্য পারে,
কোন রাজা করেনি, করবে না কোন কালে !

সব কপিগণ উৎসাহে লোমাঞ্চত, লাঙলাস্ফন । বগলবাদ্য করেন ও বলেন—

দাও উল্লম্ফন প্রোলম্ফন সোজা লম্ফন, বাঁকা লম্ফন, জোড়া লম্ফন, ঘোড়া লম্ফন, অল্প সল্প ছাগ লম্ফন, ঝম্পন, নর্ত্তন, কুর্দ্দন !

হনুমান হেঁকে চলেছেন, রামনাম ক'ন—জয়তি জয়রাম লক্ষণশ্চ মহাবল, কেউ বলে রাম, কেউ বলে লক্ষণ !

রাম-লক্ষণ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে স্নান তর্পণ করে উচুঝুঁটি করে নতুন ধুতি পোরে লঙ্কা যাত্রা করলেন। আগে চল্লো বোঝা বোঝা হরিতকী, আমলকী, খেজুর, শ্রীফল, তেঁতুল, গুবাক বহে গন্ধমাদন বানরের দল। তারপর চল্লো দারুচিনি, এলাচী এমনি নানা ওষুধের গাছগাছড় বয়ে সুষেণ বানরের দল। কপিসেনার রণ বাদ্যকর তারা চল্লো কপিনাস্ বাদ্য বাজাতে বাজাতে—

আরে সুন্দর সেতু বান্ধল রে—
নল-নীল বান্দরে—বৃক্ষ প্রস্তরে
সিন্ধু'জলে শিলে ভাসল বঙ্গ সাগরে—
গায়ক কপিদল জয়রাম জয়রাম সঙ্গীত ধরে।

সুগ্রীব চলেন, তারপর অঙ্গদ চলেন, তারপরে হনুমান ল্যাজে ধ্বজা মজা উড়িয়ে যেন রথ সেজে রাম-লক্ষণকে পার করলেন। জাম্বুবান সবশেষে আনন্দে নাচতে নাচতে যেতে এত ঘেমে উঠলেন যে একদম ফেন্টিং—সেতুতে পা দিয়েই। অনেক চাপড়ে চুপড়ে জল ছিটে দিয়ে যখন জাম্বুবানের দশা ভাঙ্গলো তখন সবাই চলে গেছে, কেবল নল-নীল পাঁজাকোলা করে মন্ত্রীকে ওপারে নেবার জন্য আছে। জাম্বুবান বল্লেন—ভাই শক্তি নাই আর রিঙ্গনে, আমার ভার সেতুটা টিকবে তো—কি হয় মনে ?—খুব টিকবে, বলে সাহস দিতে মন্ত্রীবর জাম্বুবান পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে কাবুলীওয়ালার মতো মধু আর মাছি শুদ্ধ মৌচাক মস্ত একটা থলী কাঁধে দুই কারিগরের সঙ্গে চললেন পার—পায়ে পায়ে পাথর মাড়িয়ে।

এক পা আগান দুই পা পিছান— এই ভাবে যান জাম্বুবান।
আর বলেন, ও নল—সাবধান সাবধান,
একপা আগাশে, একপা মাটিতে—
এইভাবে যান হাঁটিতে হাঁটিতে।

লাঠিতে ভর দিয়া থেকে থেকে দাঁড়ান আর বলেন, ও নীল, বেঁধেছো খাঁটি পাকা পোক্ত বাঁধান। আহা কি মনোরম দৃশ্য, দেখে চলতে চায়না প্রাণ।

এমনি খানিক চলেন, খানিক দাঁড়ান—গল্প করেন, কিছু জাম খান—এক খাবল মাছি শুদ্ধ মৌচাক খান আর ঘুমান ! জাগেন আবার চলেন—এই করতে করতে মন্ত্রী জাম্বুবান নল-নীল দুই বন্ধু সঙ্গে লঙ্কার বন্দরে ক্রমশঃ উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখেন রামচন্দ্র ঝাড়কাঠে ছাগল বেঁধে অকাল বোধনে বসে গেছেন !

অস্তর পূজো শস্তর পূজোর জোগাড় হচ্ছে। রাক্ষসে বানরে নরে যুদ্ধের উদ্‌যোগে

সবাই ব্যস্ত। জাম্বুবান লক্ষণকে শুধোলেন—ভাই লক্ষণ, ওটি কোন্ ব্যক্তি—মহাবল পরাক্রম, দোখতে ভীষণ? লক্ষণ বল্লেন—লঙ্কার বিভীষণ—রাবণের নাথি খেয়ে শ্রীরামের লয়েছেন শরণ। জাম্বুবান বল্লেন—বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং।

ঘরভেদী বিভীষণে দেখে হল ডর—
কি জানি হতেও পারে রাবণের চর।

লক্ষণ হেসে বল্লেন—ভয় নাই, বিভীষণ দেখতে ভীষণ, ওঁর মুখটা বিকট, মনটা নরম। রাম ওঁরে সখা বলে দেছেন আলিঙ্গন।

—তা দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু রাক্ষসের আহার জেনো নর-বানর দুইজন! আমি বনের পশু, সাবধান কচ্ছি—বুদ্ধিতে তোমরা নেহাৎ মনিষ্যি! শেষ-রক্ষে হলেই হল। এক-কুড়ি দু-কুড়ি করে আস্ত বানর সাবাড় করতে করতে বানর কূল ইনি নির্ম্মুল না করেন—দেখো দাদা।

তখন লক্ষণ বল্লেন—

রাবণের কনিষ্ঠ
চান মোদের ইষ্ট।
দুষ্ট ন'ন,—শিষ্ট সৎ
মনে নাই খল কপট।
আকারটা বটে রাক্ষুসে,
প্রকারটা মহাপুরুষে
—জেনো জাম্বুবান।

—ভাল হলেই ভাল, বলে জাম্বুবান গেলেন পাতে বসতে! লক্ষণ গেলেন নবমীর পাঁটা কাটতে।

এই বলে চাঁই বুড়ো সেদিনকে কথার ইতি করলেন।

পুতুল খেলার-বেলা

শ্রীসতীকান্ত গুহ

কেমন করে কাটবে আমার
পুতুল-খেলার বেলা!
খেলাঘরে ভাঙ্গা পুতুল
ছড়িয়ে আছে মেলা!
কোথায় আমার কাঠের সেপাই?
তুলোর হাতি তা'ও বুঝি নাই।
মাটির টিয়ের ঠ্যাংটা গলে'
ছোট্ট মাটির ডেলা।

আকাশ পারে ডাকছে কারে
উড়ো-মেঘের দল?
ওদের সাথে হয়না খেলা
ওরা যে চঞ্চল!
তার চে' ভালো ছোট্‌কু, নিমাই
তাঁতিপাড়ার দুষ্টু বলাই
তাদের সাথে যাব চলে'
জনাইতলার মেলা॥

হেগেনবেকদের এ্যাডভেঞ্চার

কাহিনী

শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়

হেগেনবেক সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যবিক্রেতা হয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ সুরু করেন। তাঁর জেলেদের জালে দৈবাৎ দুটা শীলমাছ ধরা পড়ে। এই ঘটনার পর থেকেই বন্য হিংস্র জীবজন্তু ধরার দিকে তাঁর মন পড়ে। হেগেনবেক্‌রা চার পুরুষ ধরে বনে বনে ঘুরে বন্য জন্তু সংগ্রহ করেছেন—তাদের পোষ মানিয়েছেন, খেলা শিখিয়েছেন এবং দেশবিদেশে চালান দিয়েছেন। সম্প্রতি হেগেনবেক্ সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর কার্লো হেগেনবেক্ তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষাতেই পাঠকগণ এই কাহিনী শুনুন—

যারা জন্তু ধরার ব্যবসা করে তাদের সবচেয়ে শক্ত কাজ হচ্ছে ধৃত প্রাণীকে জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় লোকালয়ে নিয়ে আসা, কারণ তাদের অনেক সময়েই অসহ্য উত্তাপের মধ্য দিয়ে গভীর অরণ্যানী ও বিপদসঙ্কুল জলাভূমি অতিক্রম করে আস্‌তে হয়।

হাতী ধরায় যথেষ্ট বিপদ আছে। কারণ কোন্ হাতীকে তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। বাচ্ছা ধরার চেষ্টা করলে তার বাপ মা অতি ভীষণভাবে শীকারীদের আক্রমণ করে। চার পাঁচ জন দক্ষ দেশী হাতী শীকারীকে হাতি ধরার কাজে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল দেশীয় শীকারীরা খুব বিশ্বস্ত। একজন বিপন্ন হলে অপর সকলেই তাকে সাহায্য করে এবং সময় সময় প্রাণও বিসর্জ্জন দেয়।

শীকারীদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই কালো ঘোড়ায় চড়ে, কেবল একজন চড়ে ছাই রংএর ঘোড়ায়। তারপর একটা হাতীকে বেছে নিয়ে একসঙ্গে তার পশ্চাদ্ধাবণ করে। হাতীটার মনোযোগ স্বভাবতই ছাই রংএর ঘোড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকেই সে আক্রমণ করে। ছাই রংএর ঘোড়ার শীকারী প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। অন্য শীকারীরা হাতীর পশ্চাদ্ধাবন করে। হাতীর কাছে যে আগে পৌঁছায় সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে হাতীর বাঁ পায়ের

একটা বিশিষ্ট শিরা (Achilleo tendon) কেটে দেয়। হাতী যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে ফিরে দাঁড়ায় ও তার নতুন শত্রুদের আক্রমণ করে। ছাই রংএর ঘোড়ার শীকারী ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে হাতীর ডান পায়ের শিরা কেটে দেয়। এইরূপে তাকে সম্পূর্ণ খোঁড়া করে শৃঙ্খলিত করা হয়। এইভাবে হাতী শীকারে যথেষ্ট বিপদ আছে। সুদানের হাতী শীকারীরা কখনও বিছানায় শুয়ে মরে না! হাতী দাঁতের আঘাতে অথবা পায়ের চাপেই তারা প্রাণ দেয়।

জিরাফ-শীকার অতটা বিপদজনক নয়। জিরাফের দলকে একদল শীকারী ভীষণভাবে তাড়া করে। বাচ্ছারা পিছনে পড়ে—তখন তাদের ঘিরে ফেলে বেঁধে ফেলা হয়।

এমন কি কুমীর শীকারও যতটা বিপদজনক বলে শোনায় ততটা বিপদজনক নয়। আফ্রিকার কুমীর শীকারীরা (Havati) সকলেই দক্ষ সাঁতারু। দুপুরের রোদে যখন কুমীররা ডাঙ্গায় উঠে আরাম করে, তখন দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করে হার্পুন ছোড়া হয়। হার্পুনে বাঁধা দড়িটি শীকারীর হাতে থাকে। জ্যান্ত কুমীর ধরতে হলে হার্পুন এমনভাবে তার গায়ে ছুঁড়তে হয় যাতে তার সামান্যই আঘাত লাগে এবং ক্ষত শীঘ্র শুকিয়ে যায়।

বেবুন শীকার কিন্তু লোকের যা ধারণা তার চেয়ে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ বেবুনরা সব সময়েই ১০০/১৫০ জন মিলে দল বেঁধে বাস করে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও হিংস্রপ্রকৃতির। নদীর ধারের তালশ্রেণীর জঙ্গলেই বেবুন ধরার উত্তম স্থান। এরূপ জায়গায় আটবারা নামক বেবুন দলে দলে বাস করে।

প্রথমে কাছাকাছি ডোবা ও অন্যান্য পরিষ্কার জলের আধারগুলি কাঁটা গাছ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কেবল একটা ডোবা পরিষ্কার রাখা হয় এবং এইটার কাছে ডালপালায় তৈরী একটা প্রকাণ্ড ফাঁদ পাতা থাকে, ফাঁদের দরজায় একটা দড়ি বাঁধা হয় এবং দড়িটা একজন লোক একটা উঁচু গাছে বসে ধরে থাকে। ফাঁদের ভেতর doura নামক একপ্রকার শস্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দুপুরে তৃষ্ণার্ত্ত বেবুনরা জল খেতে এসে শস্যের লোভে ফাঁদে ঢোকে এবং প্রত্যেক ফাঁদে দলে দলে বেবুন আটকা পড়ে। বন্দী হয়েই প্রথমে তারা হতভম্ব হয়ে যায় কিন্তু একটু পরেই কান-ফাটান চীৎকার করতে থাকে।

এইসময় অত্যন্ত তৎপরতার প্রয়োজন হয় কারণ একটু দেরী হলেই ঐ বলশালী বেবুনরা খাঁচা ভেঙ্গে ফেলে। ফাঁদের খুঁটির ফাঁক দিয়ে কাঁটাওলা ডাল দিয়ে বেবুনদের মাটীর সঙ্গে চেপে ধরা হয় এবং তালপাতায় তৈরী শক্ত দড়ি দিয়ে ওদের চোয়াল ও হাত পা

বেঁধে ফেলা হয়। তারপর সমস্ত বেবুনটাকে কাপড়ে জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে দু'জন লোক বয়ে নিয়ে যায়।

বন্দী অবস্থায় সহজেই ওরা অভ্যস্ত হয়ে যায়। পুরুষ বেবুনগুলো অত্যন্ত স্বার্থপর ও পেটুক। বাচ্ছা ও স্ত্রী বেবুনদের খাদ্য নিজেরাই উদরসাৎ করে। সেইজন্যে ওদের আলাদা খাঁচায় রাখতে হয়।

বেবুনরা অত্যন্ত বোকা। একবার একটা স্ত্রী বেবুন তিনবার পালিয়ে গিয়ে তিন বারই ধরা পড়েছিল। আমাদের শীকারীরা ওর মুখের একটা চিহ্ন দেখে ওকে চিন্‌তে পেরেছিল।

বেবুনদের মধ্যে আরব দেশীয় বেবুনই সবচেয়ে ভীষণ। এদের দাঁত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পায়েও অপরিসীম শক্তি। ওদের দু'একটাকে বন্দী করলে বাদবাকী সকলে দল বেঁধে বন্দী স্বজাতীদের উদ্ধার করতে আসে। সেইজন্য ওদের জন্য দু'দিকের দরজাওলা ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। প্রধান দরজায় সর্দ্দার-বেবুন দাঁড়িয়ে থাকে এবং বাছাই কয়েকজন বেবুনকে ভেতরে ঢুক্‌তে দেয়। ইতিমধ্যে বাকী বেবুনগুলো পিছনের দরজা দিয়ে দলে দলে ঢুকে পড়ে। খাঁচা যখন ভর্ত্তি হয়ে যায় তখন দুটো দরজা একসঙ্গে পড়ে যায়।

আমাদের একবার ৩০০০ বেবুনের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছিল। বেবুনরা একসঙ্গে আমাদের লোকেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলন্ত মশাল ও কুড়ুল নিয়ে আমাদের শীকারীরা খানিকক্ষণ আত্মরক্ষা করলে কিন্তু ওদের সংখ্যাধিক্যের জন্য শেষ পর্য্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হল। বিজয়ী বেবুনরা তাদের সমস্ত বন্দী স্বজাতিদের মুক্তি দিল। এই যুদ্ধে কতকগুলি মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছিল। একটা বাচ্ছাকে আহত দেখে একটা ধাড়ী পুরুষ বেবুন তাকে নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছিল। আর একটা স্ত্রী-বেবুন একটী বাচ্ছাকে—যার মা আমাদের গুলিতে মারা পড়েছিল—কোলে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল।

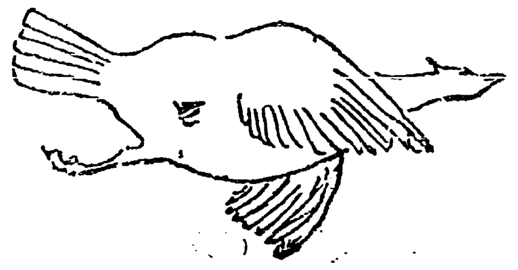

দিব্যজ্ঞান

বন্দে আলি মিয়া

প্রাচীন মিশরে মুসার ন্যায় জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি কেউ ছিলেন না, একথা সে সময়ের বিদ্বান মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার কর্‌তেন। মুসার মনেও যে এজন্যে কিছু অহঙ্কার না ছিলো এ কথা বল্‌তে পারা যায় না। এই অহমিকা বোধের জন্যই একদিন তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা পেতে হয়েছিলো সে কথা বল্‌ছি।

একদিন তিনি তাঁর অনুরাগী ভক্তদের সঙ্গে নানারকম শাস্ত্রালোচনা করছিলেন। তাদের জটিল প্রশ্নের এমন সহজ মিমাংসা করে দিচ্ছলেন যে উপস্থিত সকলে বিস্ময়বোধ না করে পার্‌ছিলো না। এদের মধ্যে থেকে একজন অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লে: আমাদের মনে হয় এঁর মতো পণ্ডিত দুনিয়াতে কেহ নাই।

কথাটা মুসার কাণে গেল। তিনি বিনয় প্রকাশের জন্যও কথাটার প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌তেন কিন্তু তাতো কর্‌লেন-ই না অধিকন্তু সায় দিলেন বলে মনে হলো।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মুহূর্ত্তেই দৈববাণী শুন্‌তে পাওয়া গেল: মুসা, না জেনে অহঙ্কার কোরো না, সমগ্র পৃথিবীর কতটুকু খবর তুমি রাখো। মহাত্মা খেযের ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কোনো বিষয়ই তাঁর অজানা নয়। তাঁর সাহচর্য্যে আসলেই একথা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মুসা নিরতিশয় লজ্জা পেলেন। উপরের দিকে চেয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে প্রশ্ন কর্‌লেন: কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাবো?

পুনরায় দৈববাণী হলো: পথে বের হলে আপনি সন্ধান মিল্‌বে।

মুসা অনুচরদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করে সেই দিনই তল্পীতল্পা গুটিয়ে খেযেরের দর্শনলাভের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

চলেছেন তো চলেছেন। তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম চল্‌বার পরে সুমুখে পড়্‌ল মস্ত বড়ো এক নদী। পিঠের বোঁচ্‌কা মাটিতে নামিয়ে মুসা নদীর কূলে বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌লেন। খানিকক্ষণ জিরোবার পরে ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে কিছু আহার কর্‌লেন। তারপর আবার পথ চল্‌তে সুরু কর্‌লেন।

কিছুদূর আস্‌বার পরে হঠাৎ তাঁর মনে হলো খাবারের পোঁট্‌লাটা ভুলক্রমে

সঙ্গে আনা হয়নি। যেখানে বিশ্রাম করতে বসেছিলেন সেইখানে ফেলে রেখে এসেছেন। মুসা নদীর দিকে ফিরে চল্‌লেন।

খাবারের পুঁট্‌লির সঙ্গে লবণ মাখানো শুক্‌নো মাছও ছিলো! মুসা ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে দেখ্‌তে পেলেন, মাছগুলো থলি থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়্‌ছে। মরা মাছ যে জীবিত হতে পারে এদৃশ্য তিনি চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করতে পারতেন না।

খানিকটা দূরে নদীর পাড়ির ওপরে একজন দিব্যকান্তি বৃদ্ধ উপাসনা শেষে তসবি (মালা) জপ করছিলেন। সেদিকে চেয়ে মুসা আর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। এমন সুপুরুষ তিনি জীবনে দেখেন নাই। দীর্ঘ সাদা দাড়ি—গৌরবর্ণ সুঠাম দেহ—সারামুখ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। ইনিই হয়তো দৈববাণী বর্ণিত মহামানব খেযের, নইলে লবণমাখা মাছ লাফিয়ে জলে যেতে পারে অপর কোন্ মহাপুরুষের উপস্থিতিতে!

মুসা দূর থেকে অভিবাদন করে বল্‌লেন: আমার অনুমান হয়তো সত্য—আপনিই বোধ হয় মহাত্মা খেযের?

খেযের হেসে সম্মতি প্রদান কর্‌লেন।

মুসা বল্‌লেন: আপনার অনুগ্রহ হলে কিছুকাল আপনার সেবা করে জীবন ধন্য করতে পারি।

খেযের বল্‌লেন: আমার কায বোধ হয় তোমার পছন্দনীয় হবে না—হয় তো সেই কারণেই আমাকে সহ্য করা তোমার কঠিন হবে।

মুসা বল্‌লেন: সে কি কথা! আপনি মহাপুরুষ—আপনি জ্ঞানী—আপনার কার্য্যকলাপ অপছন্দ হবার কী কারণ থাকতে পারে!

খেযের বল্‌লেন: তুমি বর্ত্তমান দেখে কাজের ভালোমন্দ বিচার করো, কিন্তু আমি ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করি। সুতরাং আমার কাছে যা ভালো—তোমার নিকটে তা অন্যায় বোধ হবে।

মুসা বল্‌লেন: হোক অন্যায় বোধ—আমি আপনার কোনো কাজেরই প্রতিবাদ করবো না।

খেযের হেসে বল্‌লেন: কথা তো দিলে কিন্তু রক্ষা করতে বোধ হয় পারবে না মুসা।

খেযেরের নিকটে মুসা রয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে খেযেরের অন্যত্র যাবার প্রয়োজন হলো। মুসাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি

রওনা হলেন। নদীর কূল ধরে দু'জনে চলেছেন, কিছুদূর চল্‌বার পরে খান কয়েক সুন্দর নৌকা নদীর ঘাটে বাঁধা রয়েছে দেখ্‌তে পেলেন। এদের মধ্যে একখানা নৌকা সাজসজ্জায় সকলকে হার মানিয়েছে। মুসা সেদিকে চেয়ে বল্‌লেন: বাঃ, কী চমৎকার নৌকা, এমন রূপসজ্জা সহজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

ইহার প্রত্যুত্তরে খেযের যা কর্‌লেন তা একেবারে পাগলের কাণ্ড। তিনি নৌকার কাছে গিয়ে তার কয়েকখানা নক্সাকাটা সুন্দর কাঠ ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌লেন। তারপর সেই জায়গা মেরামত করে পুনরায় যাত্রা সুরু কর্‌লেন।

মুসা তো অবাক। তিনি ভেবে পেলেন না খেযের কেন এরূপ কর্‌লেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লেন: আপনি অমন সুন্দর নৌকাটাকে ভেঙে শ্রীহীন কর্‌লেন কেন আর কেনইবা মেরামত করিয়ে দিলেন?

খেযের হাসলেন। বল্‌লেন: তোমাকে তো বলেছিলুম মুসা—আমার কাজ তুমি সইতে পারবে না।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ হতেই মুসা যথেষ্ট লজ্জা পেলেন তাই আর কোন কথা বল্‌তে পারলেন না—আপনার মনে নত মুখে পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন।

নদীর পথ ছেড়ে তাঁরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। পথের দু'পাশে গৃহস্থদের বাড়ী,—কোথাও মেয়েরা দল বেঁধে কলসী কাঁখে জল আন্‌তে চলেছে, কোথাও ছেলে মেয়েরা ছুটাছুটি করে খেল্‌ছে। কিছুদূর চল্‌বার পরে দেখ্‌তে পেলেন একপাল ছেলে পথের ওপরে চোখবেঁধে কানামাছি খেল্‌ছে। খেযের চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঐ দলের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ আর সুশ্রী চেহারার ছেলের দিকে খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হঠাৎ থলের মধ্যে থেকে একটা দড়ির ফাঁস বের করে ছেলেটির গলায় পরিয়ে দিলেন। দমবন্ধ হয়ে বালকটি কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল।

মুসা 'হায়' 'হায়' করে উঠ্‌লেন। তিনি এবারে রেগে আগুন হয়ে খেযেরকে বল্‌লেন: এমন সোণার চাঁদ ছেলেটিকে আপনি মেরে ফেল্‌লেন! আপনি কি পাষাণ! আপনার কি একটুও মমতা হলো না? ছেলেটি আপনার কী অন্যায় করেছিলো?

খেযের জবাব দিলেন: আমার কাজ তোমার পছন্দ হবে না একথা আগেই তোমায় বলেছি। আমার সঙ্গে থাকা তোমার পোষাবে না মুসা—তুমি ফিরে যাও।

মুসা কি আর করেন—অগত্যা নীরব হয়ে গেলেন। নিঃশব্দে পুনরায় পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন।

চল্‌তে চল্‌তে দিন শেষ হয়ে এলো। খেযের ও মুসা এইবার আশ্রয়ের সন্ধান

করতে সুরু করলেন। গ্রামের বাড়ী বাড়ী রাত্রির জন্য আশ্রয় ও খাবার প্রার্থনা করে ফিরতে লাগ্‌লেন—কিন্তু কেউ তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলে না। সময়টা শীতকাল। সারাদিনের পথচলার পরিশ্রম এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছ'জনে কাতর হয়ে পড়্‌লেন। খানিকটা দূরে একটা অতি পুরানো প্রাচীর প্রবলবাতাসের ধাক্কায় পড়ি পড়ি করছিলো। খেযের দেয়ালটার কাছাকাছি এসে মুসাকে বল্‌লেনঃ তুমি এইখানে বসে বিশ্রাম করো মুসা, আনার একটুখানি কাজ এখানে করবার আছে। কাজটা শেষ করে ছ'জনে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুবো। বলে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করে তিনি কাজে লেগে গেলেন। আশে পাশে থেকে ইঁট, কাদা, জল ইত্যাদি সংগ্রহ করে আন্‌লেন—তারপর ঐ জীর্ণ প্রাচীর ধ্বঁসে ছ'পাশে ছুটো থাম গাঁথতে সুরু করলেন।

খেযেরের কাণ্ড দেখে মুসা তো অবাক। সারাদিনের ক্লান্তি ও ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর অবসন্ন—শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় সুদ্ধ কাঁপ্‌ছে, এর কোনো ব্যবস্থা না করে এমন সময়ে থাম গাঁথ্‌বার সখ নিতান্ত বদ্ধ পাগল ছাড়া কারো হতে পারে না। খেযের সত্য কথাই বলেছেন, তাঁর সঙ্গে বাস সাধারণ মানুষের ধাতে সইবে না। মুসা আর সহ্য করতে পারবেন না—এবার বিদায় চাইবেন। থাম গাঁথা শেষ না হওয়া অবধি তিনি ঠোঁট কাম্‌ড়ে পড়ে রইলেন।

কাজ শেষ হতে রাত্রি ভোর হয়ে এলো। মুসা রেগে আগুন হয়ে খেযেরকে বল্‌লেনঃ আপনি মহাপুরুষ, আপনার সঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না একথা এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পেরেছি। আমায় বিদায় দিন কিন্তু যাবার আগে আশা করি আপনার এই কাজ তিনটির প্রকৃত কি উদ্দেশ্য তা প্রকাশ্‌ করে আমায় ধন্য করবেন।

খেযের হাস্‌লেন। বল্‌লেনঃ আমার কথা তা হলে এতদিনে সত্য হলো, কি বল মুসা? নিতান্তই যখন শুন্‌বার ইচ্ছা করেছ তবে শোনোঃ ঐ নৌকাটা ছিলো একজন ব্যবসায়ীর। সে যে দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে যাচ্ছিল—সে দেশের রাজা একজন অত্যাচারী আর খামখেয়ালী লোক। বিদেশীর কোনো ভালো জিনিস দেখলে জোর জুলুম করে সে কেড়ে নেয়। নৌকার মালিকের ঐখানি-ই একমাত্র নৌকা। এর থেকে যা আয় হয় তাই দিয়ে পরিবারের দশজনকে সে প্রতিপালিত করে—অতিথি অভ্যাগত সমাদর করে। ঐ নৌকাটি খোয়া গেলে দুর্দ্দশার তার অবধি থাক্‌তো না। তাই আমি কাঠগুলোকে ভেঙে জিনিসটাকে শ্রীহীন করে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করেছি।

মুসা বল্‌লেনঃ আপনি মহাপুরুষ, ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছেন।

খেযের বল্‌লেনঃ সেই ছেলেটির কথা শোনো এবার। এর পিতামাতা ছ'জনেই খুব ধার্ম্মিক,—ঐ ছেলেটিই তাদের একমাত্র সন্তান। এই ছেলেটি বড় হয়ে অতিশয়

দুষ্ট প্রকৃতির হতো—এতে তার পিতামাতার ধর্ম্ম ও সম্মান নষ্ট হতো। এর জন্যে তাঁরা মনোকষ্টে দিন কাটাতেন। ঈমানদার বাপমাকে খোদা একটি সৎপুত্র প্রদান করবেন।

মুসা বল্‌লেনঃ এতক্ষণে বুঝতে পার্‌লুম আপনি কেন বালকটিকে হত্যা করেছেন।

খেযের পুনরায় বল্‌লেনঃ ঐ দেয়ালের পাশে সারারাত কষ্ট করে থাম তৈরী করেছি এজন্যে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছো। কাশা নামক একজন সাধুলোক ঐ গৃহের মালিক ছিলো—সে ছুটি নাবালক পুত্র রেখে মারা গেছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে সে অনেক টাকা কড়ি সোণা-মোহর ঐ দেয়ালের নীচে পুঁতে রেখে গেছে। ছেলে ছুটি বড়ো হতে এখনো অনেক দেরী। দেয়ালটা পড়ে গেলে ঐ ধন রত্ন অপরে নিয়ে যেত সেই জন্যই আমি এর রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খেযের পুনরায় বল্‌লেন: আমি পূর্ব্বেই বলেছিলুম, তোমার পথ এবং আমার পথ পৃথক,—আমার সঙ্গ তোমার ভালো লাগ্‌বে না।

মুসা বল্‌লেনঃ আমরা প্রত্যেকে মনে করি, নিজে যা বুঝি এবং জানি অপরের চেয়ে তা যথেষ্ট বেশী,—এই অহঙ্কার যতদিন মনে থাক্‌বে অন্যের গুণ ঠিকভাবে ততদিন গ্রহণ করতে পার্‌বো না।

খেযের বল্‌লেনঃ আমি চল্‌লুম মুসা।

মুসা অভিবাদন করে খেযেরের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

শীত-বোধন

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

ঝরা পাতাদের বনে হিমেল্‌া ছাওয়া তুলে ধ্বনি মর্ম্মর মর্ম্মর,
মাঠে মাঠে দিকে দিকে ছড়ানো সোণা পৌষের পার্ব্বণ ঘর ঘর।
বেতসের বনে বাজি কাহার ও বাঁশি,
কৃষকের ওষ্ঠেতে জাগালো হাসি

লক্ষ আশার মধু সোণালী স্বপন অন্তর বুনিছে নিরন্তর
শরবনে দোল খায় হিমেলা হাওয়া তুলে ধ্বনি সরসর্‌ মর্ম্মর।

তুমি কি মা লক্ষ্মী গো শরৎ শেষে কুহেলির টানি অবগুণ্ঠন,
দেখা দিয়া ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে অমৃত কর সুখে বণ্টন।
দিব্য বিভা তব পল্লী প্রাণে,
নব নব উৎসব বার্ত্তা আনে

করি শ্রম সার্থক জননী আমার আসিয়ো গো বৎসর বৎসর
শাখীর প্রতিটি পাতে হিমেলা হাওয়া গুঞ্জরে মর্ম্মর মর্ম্মর॥

আমাদের অধিকার

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন

আজ আমি তোমাদের কাছে যা বলবো তা তোমরা শুনবে কেউ কলকাতায় বসে' কেউ বা বাইরে। তোমাদের মধ্যে কেউ থাকো সহরে, কেউ বা থাকো গ্রামে, সহরে এসেছো পড়াশুনা করতে কিংবা বেড়াতে। যেখানেই থাকো, নিশ্চয়ই কৌতূহল হয় সেখানকার সব বিষয় জানতে, এবং সেখানকার দ্রষ্টব্য যা কিছু আছে দেখতে; কিন্তু সব মানুষের ত চোখ থাকে না তাই সব জিনিষ চোখে ধরাও পড়ে না। না, না, আমি অন্ধমানুষদের কথা বলছি না, আমি বলছি তাদের কথা, যারা চোখ থেকেও দেখতে পায় না। আচ্ছা, তোমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করে' দেখেছো কি? জিনিষটা এই যে সব মানুষই মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে' থাকতে চায়। তোমরা হয় ত এখনি মাথানেড়ে বলবে, দূর, তা কেন, ওই ত ওবাড়ির ভূতো রয়েছে, ভা-রী ঝগড়াটে, ওর সঙ্গে আমরা কেউ মিশি না। তা হলেই ত বুঝতে পারছো ভূতো হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। যদি এমন হোতো যে ভূতোর মত তোমার সঙ্গেও কেউ মিশতো না, পথেঘাটে দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে চলে যেতো? ভা-রী খারাপ লাগতো তা হলে'—না?

এর কারণ কি জানো? এর কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সে চায় অন্য মানুষের সঙ্গ। সে চায় অন্য মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতে, একসঙ্গে ঘর বাঁধতে, তা সে আদিম কালেরই মানুষ বলো আর সত্যযুগেরই মানুষ বলো। আদিম কালের মানুষ দল বাঁধতো ছোট ছোট, আর আজকালকার মানুষের দল হয় কত বড়ো তার ঠিক নেই। এই কলকাতা সহরই ধর না। তোমরা কি জানো এখানে থাকে প্রায় ১৬ লক্ষ লোক? আবার লণ্ডন সহর কলকাতার প্রায় পাঁচগুণ বড়। আমাকে অনেক সময়ই ট্র্যামে করে' এসপ্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ আসতে হয়। যখন আসি মনে হয় ট্রেণে করে' সহর ছেড়ে অনেকদূর কোথাও যাচ্ছি। বাগবাজার বা বেলগাছিয়া থেকে টালিগঞ্জের সীমানায় পৌঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগে। কলকাতারই যখন এই অবস্থা, তখন লণ্ডনের মত সহরের পরিমাণ কত বুঝতেই পারছো!

অবশ্য কলকাতা বা লণ্ডন খুবই বড় সহর সন্দেহ নেই। কলকাতার বাইরের সহরে যারা থাকো—ধরো ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম—এমন কি বাংলার বাইরেও যারা আছো, ধরো দিল্লী, লাহোর, মোরাদাবাদ বা আর কোথাও—এই সব সহরে যারা দল বেঁধে আছো তাদের দলও কম ভারী নয়। এখন, কথা হচ্ছে, এই দল ভারী করে থাকার মধ্যে কি কোনো সার্থকতা আছে? আছে বৈকি। মানুষ আগে দল বাঁধতো হয় ক্ষুধার তাড়নায়, আহার সংগ্রহ করবার জন্য, নয় ত শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, লড়াইতে সাফল্য লাভ করবার জন্য। তা ছাড়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করবার জন্য ত দল বাঁধতে হোতোই। এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের ঘর-সংসার, পরিবার, গোষ্ঠী, গোত্র, উপজাতি—একই রক্তের বন্ধন ছিল তাদের যোগসূত্র। তারপর এই উপজাতিদের সঙ্গে মিললো অন্য উপজাতিদের রক্ত, বিদেশী দলের আক্রমণে হোলো বিভিন্ন জাতির সমন্বয়, সৃষ্টি হোলো গ্রাম, সহর, জনপদ, দেশ, মহাদেশ। পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদানের গণ্ডী বেড়ে চললো। দল বাঁধবার কত নূতন কারণের সৃষ্টি হোলো। কত রকম প্রতিষ্ঠান, সভা, সমিতি, সঙ্ঘের উদ্ভব হোলো। কত রকম তাদের উদ্দেশ্য। কোনোখানে দেওয়া হয় শিক্ষা, কোনোখানে আনন্দ, কোনোখানে হয় খেলাধুলা, কোনোখানে হয় নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদি। এইরূপ নানাপ্রকারের উদ্দেশ্য ও সেই সকল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, তার মধ্যে দিয়েই হয় মানব প্রতিভার উন্মেষ ও তার বিকাশ। তা না হলে শুধু খাওয়া-পরা, লড়াই ও বংশবৃদ্ধি করা—এতো জন্তুজানোয়াররাও করে। তারাও দল বাঁধে, কিন্তু সে দলের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। খাওয়া পরা, লড়াই ও বংশবৃদ্ধির মধ্যেই তাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। মানুষ কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হয় না। তাই সে নানাদিক থেকে সামাজিক উপকরণ সংগ্রহ করছে। এই ধর বেতারে যে কথা বলছি, এও আমাদের সামাজিকতার একটা অঙ্গ। এই সামাজিকতার পরিপুষ্টির জন্য এখন আর দরকার হয় না তোমাদের আমার কাছে পেতে। আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি—তোমরা আছ কত দূরে। তোমরা যদি এখন কেউ চুপি-চুপি এই ঘরটিতে এসে আমাকে দেখে যেতে পারতে, দেখতে আমি একা বসে আছি, নিঃসঙ্গ। অথচ আমি অনুভব করছি তোমরা সব দল বেঁধে শুনছো আমার কথা। এমনি করেই দূরের মানুষ কাছে আসে যেমন অনেক কাছের মানুষ দূরে চলে যায়। এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়েই জেগে উঠছে সমাজের আত্ম-চেতনা। আমার তোমার হাসিকান্নায় ভিতর দিয়েই চলেছে সমাজের জীবনপ্রবাহ অবিশ্রাম স্রোতে। যাদের আমি ভালোবাসি তাদের আমি কাছে পেতে চাই—যারা আমায় ভালোবাসে না তারা দূরে চলে যায় [তা]ই প্রেম ও বৈরী ভাবের মধ্যে দিয়েই সমাজের জীবনপ্রবাহ দুটি সমান্তরাল ধারায় [ব]য়ে চলেছে। একধারে হচ্ছে সংহতি, অপরধারে হচ্ছে বিরোধ।

এই সমাজবদ্ধ জীবনকে রূপ দিয়েছে আমাদের জনপদগুলি। গ্রামই বলো, সহরই বলো বা দেশই বলো, একটা আস্তানা ত চাই সকলকার? মানুষ যখন থেকে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য শিখলো, তখন থেকেই তার যাযাবর জীবনের নিবৃত্তি হোলো, দেশের মাটির সঙ্গে তার হোলো নিগূঢ় সম্বন্ধ। তারপর সৃষ্টি হোলো নানাপ্রকার শিল্পের, ব্যবসাবাণিজ্য, রাষ্ট্র, অফিস, স্কুল কলেজ ইত্যাদি। গ্রামে শস্য উৎপন্ন হোলো, বিক্রয় করবার জন্য ব্যবসায়ীরা এলো সহরে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আইন তৈরী হোলো। ক্রমশঃ, সহরের ভিড় বাড়তে লাগলো। ভিড় বাড়লেই হয় সুবিধার সঙ্গে নানাপ্রকারের অসুবিধা, নানাপ্রকারের দাবী দাওয়া অধিকার নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়। এ যেন সেই আদিম কালের লড়াইর যুগ আবার ফিরে এলো, কেবল অন্যরূপে। সমাজ যদি সাবধান না হয়, সম্ভাবনা রইলো সেই "জোর-যার-মুল্লুক তার" যুগে ফিরে যাবার। তাই সমাজ-মন আবার জাগ্রত হোলো, সৃষ্টি হোলো নানারূপ অনুশাসনের। পারস্পরিক অধিকারের সীমানা নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করা হোলো। মানুষ এই অনুশাসনগুলি মানতে বাধ্য হোলো, কারণ তা ছাড়া উপায় নেই। তা না হলে সামাজিক জীবনের পরিপুষ্টি হয় না। অর্থাৎ একধারে যেমন রইল অধিকারের লড়াই, অন্যদিকে তেমনি রইল অনুশাসনের পাহারা।

পাহারা কথাটা শুনে ভয় পেওনা। এ পাহারা স্বাধীনতা খর্ব্ব করবার জন্য নয়, তাকে বাঁচাবার জন্য। তাই সমাজ যখন তোমাকে-আমাকে অধিকার দিল, বলে দিল এই অধিকারের সঙ্গে তোমাকে কতকগুলি দায়িত্বও দিলাম। সে দায়িত্বগুলি না মানলে অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। যেমন ধরো, তোমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রী, ক্লাশে বসে পড়া শুনছো, এটা তোমাদের অধিকার। কিন্তু ধরো ক্লাশে যদি কোন ছেলে বা মেয়ে কথা বলে বা গোলমাল করে তাতে তোমাদের পড়া শোনবার অধিকার খর্ব্ব হয়। তাই তোমাদের টীচার সেই দুষ্টু ছেলে বা মেয়েকে শাসন করেন। এই শাসন তোমাদের ভালোর জন্যই, যাতে একজনের দোষে অনেকের অধিকার খর্ব্ব না হয়। এখানে তোমাদের অধিকার—পড়া শোনা—এবং দায়িত্ব গোলমাল না করা ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকা।

কাজেই সব সময়ে মনে করে রাখতে হবে যে যেমন আমরা নানাপ্রকারের অধিকার দাবী করি, সেই অধিকারের দায়িত্বগুলি ভুললে চলবে না। অর্থাৎ আমরা যেমন তোমাদের কাছে নানাপ্রকারের অধিকার দাবী করি, সমাজও তেমনি আমাদের কাছ থেকে দাবী করে সেই অধিকারগত দায়িত্ব। একধারে অধিকার, অন্যধারে তার দায়িত্ব, এর উপরই সামাজিক জীবনের ভিত্তি ও পরিপুষ্টি।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব সমাজের কাছে। মনে রাখতে হবে যে আমাদের স্বকীয় প্রতিভার বিকাশই বলো বা স্বাধীনতার আদর্শই বলো, সমাজ ব্যতিরেকে তার পরিণতি হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য সভ্যজগতে অহোরহ চেষ্টা চলছে কিভাবে সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। এই উন্নতির মূলে আছে, আমাদের মধ্যে যে প্রতিভা আছে, সেই প্রতিভার পবিপূর্ণ স্ফুরণ। এখনও আমাদের সমাজ সে পরিণতি পায় নি যখন বলতে পারি যে সমাজের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্ত প্রয়োজনের সামঞ্জস্য ঘটেছে। কারণ সমাজ এখনও আদর্শের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না। এই যে কলকাতা সহর, একি আমাদের গৌরবের বস্তু? দেখেছো কি এখনও কতলোক খালি গায়ে রাতের কালো আকাশের তলায় ফুটপাথের উপর শুয়ে থাকে, কত অন্ধ খোঁড়া আতুর ভিক্ষালব্ধ অন্নের উপর বেঁচে আছে! দেখেছো কি কত নরনারী এখনও নির্য্যাতিত নিপীড়িত জাবন নিঃশব্দে বহন করছে? এই কি আমাদের সমাজ, এই আমাদের ভারতবর্ষ? তাই তো আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখে বলেছেন—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়'
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;

যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালিরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্বকর্ম্মচিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি', পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের সমাজ কবে সেই স্বর্গের মহিমায় মাহমান্বিত হবে, অধিকারের কলহের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করবে কর্ত্তব্যের আলো?

(—রেডিওতে পঠিত)

বলি

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রপতি ভীমদেবের একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়। একমাস ধরে' মানুষে ও যমে যুদ্ধ চলেছে...কিন্তু জয়-পরাজয় কোন দিকে হচ্ছে না। রাজবৈদ্য তাঁ'র আয়ুর্বেদ ভাণ্ডার শেষ করে' বিষন্ন বদনে বসে' আছেন। মহারাজ বলেছেন, যদি তাঁ'র বংশের দুলাল মারা যায়, তা' হ'লে রাজ্যের বৈদ্যবংশ ধ্বংস করবেন। যত বৈদ্য সকলে কারারুদ্ধ...এক প্রাণের দায়ে শত শত প্রাণ বলি যাবে...এই আদেশ ঘোষণা করা হ'য়েছে চারিদিকে হাহাকার উঠেছে।

রাজবৈদ্য শুধু যে বৃদ্ধ তা' নয়, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তিনি ভাবলেন, এই ব্যাপারে আর কাউকে দলে টানা সম্ভবপর কি নয়? করযোড়ে মহারাজের কাছে নিবেদন করলেন, "মহাপট্টনায়ক, শুধু কি বৈদ্যরাই দোষী? চিরকাল শুনে আসছি গ্রহ বৈগুণ্যে শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করে, স্বস্তেন শান্তিতে উপসম হয়। গণক ও পুরোহিত ত' মহারাজের বৃত্তিভোগী; কুমার যদি আরোগ্য না হয়, তা' হ'লে আমাদের সঙ্গে তাদেরও শূলে আরোপ করা উচিত।"

তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা সভা বসলো এবং পরওয়ানা জাহির হ'ল: ধরে নিয়ে এস যত গণক ও পুরোহিত।

আবার চারিদিকে হাহাকার উঠলো। দলে দলে গণক ও পুরোহিত প্রহরী বেষ্টিত হ'য়ে রাজসভায় এল। মন্ত্রী বললেন, "আপনারা মহারাজের বৃত্তিভোগী কিনা?"

"হ্যাঁ।"

"প্রতিদান দিতে প্রস্তুত আছেন?"

"আছি।"

"কুমারের জীবন সংশয়, তাঁ'কে রক্ষা করুন।"

"আমরা চেষ্টা করতে পারি...রক্ষাকর্ত্তা ভগবান।"

মহারাজ ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বললেন, "ও কথা শুনতে চাই না...প্রতীকার চাই যদি না পারেন সকলেরই মৃত্যুদণ্ড হবে।"

সে রাজ্যের যত গণক ও পুরোহিত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত রাজ-অন্তঃপুরের পূজামণ্ডপে নীত হ'ল। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী রইল।

গণক-শ্রেষ্ঠ বজ্রপাণি, প্রধান পুরোহিত পুণ্ডরীকের সহিত চার প্রহর ব্যাপী পরামর্শ করলেন। অনেক পুঁথি দেখা, অনেক বচন আওড়ান, অনেক অঙ্ক কষা প্রভৃতি অনেক কিছু হ'ল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারলেন না। ক্ষণেক বিশ্রাম করে' আবার পরামর্শ চলল। দিন গেল. রাত এল, ক্রমে রাতও কাটল...তবুও এই দু'জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কোন কিছুই স্থির করে উঠতে পারলেন না।

প্রভাত হ'তেই মন্ত্রী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি স্থির করলেন?" নতমুখে বজ্রপাণি উত্তর দিলেন, "মৃত্যু।" মন্ত্রী বলবেন, "বেশ, প্রস্তুত হ'ন।"

মন্ত্রী মহারাজের আদেশ আনতে গেলেন। মহারাজ সব শুনে আদেশ দিলেন, "বৈদ্যরা তবু ঔষধ ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এই অপদার্থেরা কোন কিছু করতে সাহস করলে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে তাদের শূলে দাও আজ বেলা দ্বিপ্রহরের আগে শুনতে চাই, আমার রাজ্যে গণক ও পুরোহিত বলে কেউ নাই।"

রাজাজ্ঞায় তাঁ'রা বধ্যভূমিতে নীত হ'লেন। যত লোক, তত শূল, তত ঘাতক। সকলকে বধ্যমঞ্চে তোলা হ'ল, এবং একই সময়ে যাতে সকলকে শূলে-চড়ান হয়, এইজন্য একটি সঙ্কেত করা হ'বে স্থির হ'ল। ঘাতকেরা এই সঙ্কেতটির অপেক্ষায় দমবন্ধ করে' অপেক্ষা করছে—এমন সময় যুগপৎ সঙ্কেত ধ্বনি ও চীৎকার শোনা গেল! সকলে বিস্মিত হ'য়ে দেখলে চীৎকারকারী একটি যুবা, দূর হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে! বধ্যভূমিতে উপনীত হ'য়ে সে মঞ্চোপরি গণকাচার্য্য বজ্রপাণির চরণে লুণ্ঠিত হ'ল। কি ব্যাপার?

যুবকটির নাম পদ্মনাভ, বজ্রপাণির প্রিয় শিষ্য, বয়স সবে ষোড়শ বৎসর। বজ্রপাণি বললেন, "বৎস, এই বিপদের সময় তুমি বিদেশে ছিলে, ভালই হ'য়েছিল। প্রাণ দেবার জন্য তুমি এই বধ্যভূমিতে ছুটে এলে?"

"প্রাণ দেবার জন্য নয়, প্রভু, সকলের প্রাণ রক্ষা করবার জন্য।"

"সে কি?"

"এখন এখানে বলবো না; আমায় মহারাজের নিকট নিয়ে চলুন।"

মহানায়ক পদ্মনাভকে নিয়ে ভীমদের সমক্ষে উপনীত হ'ল। শূল-পর্ব্ব কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হ'ল।

মহারাজ প্রথমে ক্রুদ্ধ হ'লেন; পরে যুবকের কমনীয় মুখশ্রী, সুন্দর গৌরবর্ণ দেহ, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু দেখে কিঞ্চিত শান্ত হ'য়ে পদচারণা করতে লাগলেন।

পদ্মনাভ বললে, "মহারাজ এ রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ভীমাভৈরবী আমায় স্বপ্নাদেশ করেছেন। তাঁর আদেশ পালন করলে, কুমারের জীবন রক্ষা হ'বে। দ্বিধা করবেন না মহারাজ, আমায় এ কার্য্যে বরণ করুন। যদি অক্ষম হই, ঘাতকের সামনে দাঁড়াতে বলবেন, আগে আমার মস্তক নিয়ে তারপর আমার গুরু ও স্বজনবর্গকে শূলে দেবেন।"

—"বেশ তোমায় বরণ করলাম। মহানায়ক, ব্রাহ্মণগণকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখ—শূলের কথা পরে বিচার হ'বে। এখন কি করতে হ'বে বল।"

—"চলুন, ভৈরবী মন্দিরে যাই...আগে পট্টমহাদেবী মায়ের পায়ে একটি অর্ঘ্য দেবেন, তারপর দেবেন আপনি। যদি মা অর্ঘ্য গ্রহণ করেন, তা' হ'লে আপনা হ'তেই মন্দির ছুয়ার বন্ধ হ'বে। তারপর অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা।"

প্রহরী বেষ্টিত হ'য়ে পদ্মনাভ ভৈরবী মন্দিরে নীত হ'ল। তার পশ্চাতে তীক্ষ্ণখড়্গধারী ঘাতক। ইতিমধ্যে মহারাজ ভীমদেব ও কুমারের মাতা পট্টমহাদেবী মন্দিরে এসেছেন। লোকমুখে এই ঘটনা প্রচার হ'য়ে জনস্রোত মন্দিরাভিমুখে প্রবাহিত হ'তে লাগল এবং ক্ষণকালমধ্যে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল।

—"তা' হ'লে মা, সন্তানের জীবন ভিক্ষা করে' কায়মনোবাক্যে একাগ্র হ'য়ে মায়ের চরণে এই পূত অর্ঘ্য দিন।" মহারাণী গলদশ্রুলোচনে তন্ময়ভাবে অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করলেন।

"মহারাজ, এইবার আপনি দিন।"

মহাপট্টনায়ক মহারাজ ভীমদেব ব্যাকুল প্রার্থনার সহিত অর্ঘ্য অর্পণ করলেন। পদ্মনাভ মূহুর্তমধ্যে আত্মস্থ হ'য়ে দেবীর আবাহন স্তোত্র মনে মনে গান করতে লাগল।

সমগ্র জনতা স্তব্ধ...সূচী পতনের শব্দও বোধ হয় শোনা যেত। নিথর, অচঞ্চল, জনসমূদ্র নিশ্বাস বন্ধ করে' অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময়ে পদ্মনাভ উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠল, "মহারাজ, স্থাপিত অর্ঘ্য দেবী গ্রহণ করেছেন—জয়, ভীমাভৈরবী দেবীর জয়।" লক্ষকণ্ঠে অমনি জয়ধ্বনি নিনাদিত হ'ল—আকাশ বাতাস ভরে গেল। আর...ছুইলক্ষ চক্ষের সামনে মন্দিরের গুরুভার লৌহময় ছুটি কপাট ধীরে ধীরে বন্ধ হ'য়ে গেল। আবার উন্মত্ত জয়ধ্বনি উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম স্বরে, আকাশ মুখরিত করে' তুললে। উত্তেজনা এত অধিক হ'য়ে উঠল যে, মহারাজ মনে মনে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। পদ্মনাভ তখন কৌষেয় উত্তরীয়খানি যথাস্থানে সংস্থাপন করে, আম্রপল্লব হস্তে, মন্দিরসংলগ্ন মঞ্চে আরোহণ করে', বিপুল জনতাকে সম্বোধন করে' বলল, "ভাই সব, আমরা দেবীর কৃপালাভ করতে সমর্থ হ'য়েছি! প্রথম পরীক্ষা পার হ'য়েছি কিন্তু আরও বাকী আছে। এখন যাতে সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষাটি উত্তীর্ণ হ'তে পারি তার উপায় তোমরা কর। শোন, দেবীর আদেশ—ভক্তিভরা সরল অন্তকরণে তাঁর নিকট বলি দিতে হ'বে নিজের প্রিয়তম স্বার্থকে। তা' পেলেই...মন্দির ছুয়ার আপনা হ'তেই খুলে যাবে এবং রাজকুমার রোগমুক্ত হ'য়ে শয্যায় উঠে বসবেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও, তবে সন্ধ্যার আগে নিয়ে এস ভাই, নিজের নিজের যা' কিছু শ্রেষ্ঠ আছে।"

জনতা ভেঙে গেল, যেন গলে গেল। যে যার শ্রেষ্ঠ জিনিষ সংগ্রহ করে আনবার জন্য ছুটে চলে গেল। রইল না কেউ...একাকী পদ্মনাভ উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রথমে ফিরলেন মহারাজ ভীমদেব। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁরই হাতে রয়েছে—ছুটি নীল পদ্ম। এই পদ্ম তিনি কাউকে দেন না—যে নেবে হয় সে মরবে নয় তিনি। এই পদ্মের জন্য তাঁর জীবন পণ। অতি সুরক্ষিত এক দীঘিতে এ পদ্মের স্থান। পদ্মনাভ মান্দর-দ্বারে পদ্ম রাখতে বলল। রাখা হল; কিন্তু ছুয়ার যখন খুলল না, তখন রাজা কেঁদে ফেললেন। এলেন রাণী, বিল্বপত্রে তাঁর বুকচেরা রক্ত নিয়ে। এতেও খুলল না ছুয়ার। এলেন মন্ত্রী তাঁর অষ্টমবর্ষীয় একটি বালককে নিয়ে। গদগদস্বরে বললেন, "মা, আমার বংশের ছুলাল একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে নিয়ে এসেছি। নাও মা এ বালককে, রক্ষা পাক কুমার।"

ছুয়ার ছুটি জোরে নেড়ে উঠলো কিন্তু একেবারে খুলে গেল না। মন্ত্রী বিমর্ষ হলেন। রাণী সেই বালককে বুকে নিয়ে মুখ চুম্বন করে' তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। সেনাপতি এসে তলোয়ার তুলে বললেন, "মা, আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি এই আমার ডান হাতটি—আমি কুমারের কল্যাণে তা' কেটে ফেলতে রাজী আছি।"

ছুয়ার ফের নেড়ে উঠল কিন্তু খুলল না। ক্রমে ক্রমে ছুয়ার সম্মুখে জিনিষের স্তূপ হ'ল। শ্রেষ্ঠ জিনিষ অর্পণের অসংখ্য বৈচিত্রে পদ্মনাভ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল। বেলা বেড়ে গেল...জনতা বাড়তে বাড়তে আবার পূর্ব্বের আকার ধারণ করল। সকলেই নিরাশামলিন, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে...ক্রমে গোধূলি...তার একটু পরে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সকল আশা ভরসা শেষ হবে...রাজকুমার প্রাণ হারাবে...ওই একটি প্রাণের জন্য কত লোক শূলে প্রাণ দেবে।

আর ঐ ষোড়শবর্ষীয় পদ্মনাভ। এ কি মানুষ না দেবতা...ওর কাছে খাঁড়া হাতে যমদূত দাঁড়িয়ে...সকলের আগে যাবে ওর মাথা।

গোধূলি শেষ হয় হয়...এমন সময় দেখা গেল জনতা ভেদ করে' আসছে একটি

অশীতিপর বৃদ্ধা...অন্ধ...তাকে ধরে নিয়ে আসছে একটি দু'বছরের বালক, তারি মরা ছেলের বংশধর। যার যা' ছিল দিয়ে গেছে...কারুর শ্রেষ্ঠ দানে দুয়ার খোলে নি; আর কেউ আসছে না—বাকি বোধ হয় কেউ নেই। রাজ্যের লোকের যার যা' ছিল তা' দিয়ে পরখ হয়ে গেলে....কিছুতেই দেবী প্রসন্না হন নি। এই বুড়ীর কি আছে যে তাই দিয়ে কুমারের জীবন রক্ষা হ'বে? জনতার মনের ভিতর এই রকম তর্ক হ'তে লাগল।

জনতা কিন্তু এই দুটি প্রাণীকে পথ ছেড়ে দিলে। তারাও অতি ব্যস্তভাবে পদ্মনাভের কাছে এল।

—"বাবা, আমরা বড় গরীব ভিক্ষে করে' খাই, মা কি আমাদের দান নেবেন?"

—"দাও না মা—কি এনেছ...আর দেরী কোরো না।"

—"শোন বাবা, দুটি বিচী পুঁতেছিলাম, একটি লাউয়ের, একটি কুমড়োর। জায়গা জমি নেই, যে কুঁড়েতে থাকি তারির ছেঁচেতে দুটি গাছই বেরুল...কোন রকমে গাছ দুটি বেঁচে ছিল। তা'তে একটি লাউ ও একটি কুমড়ো হয়েছিল। সারা বছর ভিক্ষে করে খাই। আজ ভাবলাম, ভিক্ষে করবো না...নিজের পরিশ্রমের লাউ-কুমড়ো বিক্রি করে' যা পাই, সেই পয়সায় খাব। বাজারে বসেছিলাম.. শেষ বেলায় একটি কালো মেয়ে এসে পাঁচ পয়সায় দুটিই কিনলে। তারির মুখে শুনলাম এখানে এই কাণ্ড। আমার এই ক্ষুদে দাদামণি বললে, 'ঠাকুমা...আজ আজ আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই. চল এই পাঁচ পয়সা মন্দিরে দিয়ে আসি...রোজই ত' খাচ্ছি।' তারি কথায় বাবা, এখানে এসেছি...দাও দাদু, পয়সা পাঁচটি।"

বালক পয়সা পাঁচটি পদ্মনাভের হাতে দেবামাত্র মন্দির দুয়ার খুলে গেল আর রাজকুমারও নীরোগ হ'য়ে শয্যায় উঠে বসলেন!

কি বিপুল জয়ধ্বনি যে উঠল তা'র আর বর্ণনা করা যায় না। রাজা বৃদ্ধার পদতলে পড়ে রইলেন। রাণী বালককে বুকে চেপে ধরে' চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

———

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবম পরিচ্ছেদ

পাহাড়ে মেয়ে

চিত্রল থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে আড্ডা গেড়েছি। এখানে দিন-দুই-তিন থাকব স্থির করেছি—কেবল বিশ্রামের জন্যে নয়, দরকারি খবরাখবর নেবার জন্যেও।

এ গ্রামের বাড়ীগুলোর অবস্থান বড় অদ্ভুত। দূর থেকে বাড়ীগুলোকে দেখায় গ্যালারির মত। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাড়ীগুলো থাকে থাকে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে।

এখানে বাড়ী তৈরির নিয়মও আলাদা। তার প্রধান উপাদান হচ্ছে কাঠ, পাথর আর কাদা। কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসানো হয় বড় বড় পাথরের পর পাথর এবং কাদা দিয়ে সারা হয় সুরকির কাজ। ছাদ মাটির। রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ারেও আমি পাকা বাড়ীর মাটির ছাদ দেখেছি। এর কারণ জানিনা।

যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে সে হচ্ছে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক, নাম গুমলী। বিধবা। এ গ্রামে তার পসার-প্রতিপত্তি বড় কম নয় দেখলুম।

রামহরি মুসলমানের বাড়ীতে অতিথি হ'তে রাজি নয়—জাত খোয়াবার ভয়ে।

সেইই খুঁজে খুঁজে গুম্‌লীকে আবিষ্কার করেছে। গুম্‌লী পুরাণো কাফির-ধর্ম্ম—অর্থাৎ পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নি।

গুম্‌লী লোক ভালো, অতিথি-সৎকার করতে খুব ভালোবাসে। আমাদের প্রধান খাদ্য হয়েছে ঘী-জব্‌জবে চাপাটি আর খাসীর মাংস। তার উপরে পিঠা ও অন্যান্য খাবারেরও অভাব নেই।

কমল জানতে চাইলে, এখানে মুর্গী পাওয়া যায় কিনা?

গুমলী ঘৃণায় নাক তুলে থুতু ফেলে বললে, "ছি ছি, মুর্গী খায় মুসলমানরা, আমার বাড়ীতে মুর্গী ঢোকে না।"

সে পুস্তো ভাষায় যা বললে, বিনয়বাবু তা বাংলায় তর্জ্জমা ক'রে আমাদের শোনালেন। এদেশে তিনিই আমাদের দোভাষীর কাজ করছেন।

রামহরি পরম শ্রদ্ধাভরে বললে, "গুম্‌লী বড় পবিত্র মেয়ে, সে তোমাদের মতন ম্লেচ্ছ নয়।"

গুম্‌লী বললে, "বাবুজীরা যদি গরুর মাংস খেতে চান, আমি খাওয়াতে পারি।"

রামহরি দুই চোখ ছানাবড়ার মত ক'রে বললে, "কি সর্ব্বনাশ, এরা মুর্গী খায় না, কিন্তু গরু খায় নাকি? অ্যাঁঃ, তবে তো এদের হেঁসেলে খেয়ে আমার জাত গিয়েছে! হে বাবা ভগবান, এ তুমি আমার কি করলে? লুকিয়ে লুকিয়ে জাতটি কেড়ে নিলে?"

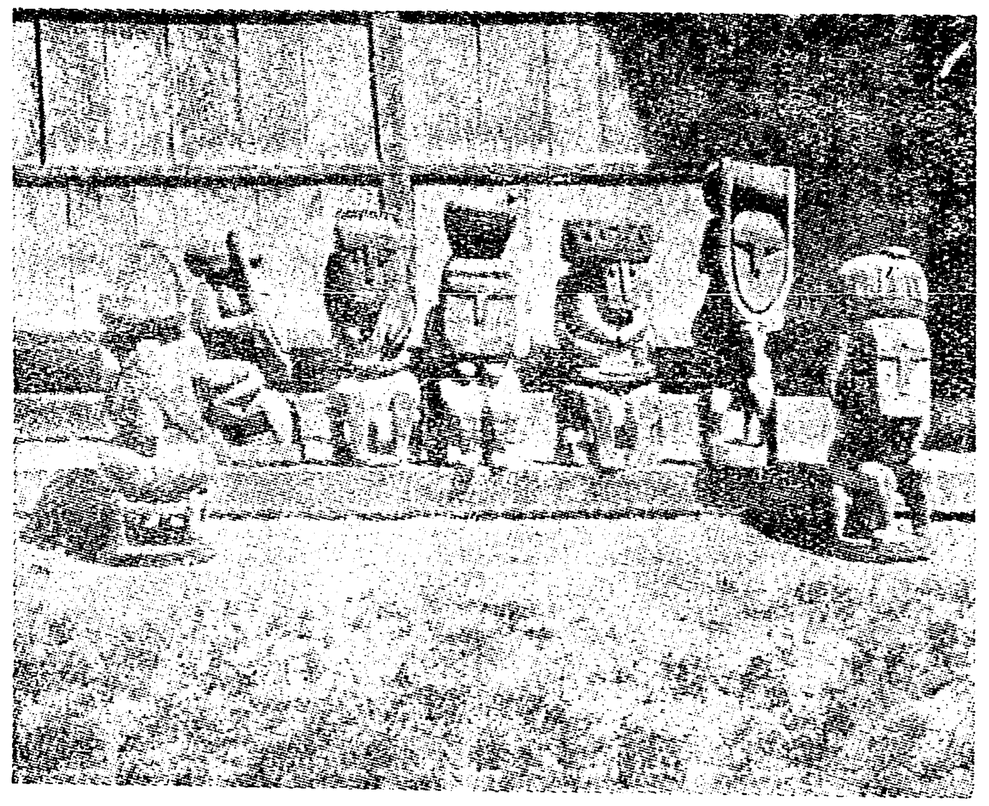

কাফ্রিস্থানে দেবতাদের কাঠের মূর্ত্তি

'বাবা ভগবানে'র কাছ থেকে প্রশ্নের কোন উত্তর বা সান্ত্বনা না পেয়ে রামহরি কাঁদো কাঁদো মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে সে ফিরে এল বটে, কিন্তু গুম্‌লীর বাড়ীতে আর জলগ্রহণ করলে না।

কাফিররা দশজনকে খাওয়াতে ভারি ভালোবাসে। শুনলুম, বড় বড় ভোজ দিয়ে অনেকে ফতুর হ'তেও ভয় পায় না। অতিথি-সৎকারের আইনও এখানে বেজায় কড়া। যে ভোজ দেয় সে যদি ভালো খাবার না খাওয়ায়, তাহ'লে তার জরিনানা হয়!

সন্ধ্যার আগে সবাই মিলে বেড়াতে গেলুম। সেদিন কাফিরদের কি-একটা উৎসব

ছিল, তাই মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচের আমোদে মেতেছে। খানিকক্ষণ নাচ দেখে চললুম নদীর ধারে। আমি আগে আগে এগিয়ে গিয়ে নদীর জলে হাত দিলুম। উঃ কী কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল! বুঝলুম কোন বরফের পাহাড় থেকে নেমে আসছে এই নদী।

আচম্বিতে পিছনে দূর থেকে কুমারের চীৎকার জাগল—"বিমল, বিমল! পালিয়ে এস --শীগ্‌গির পালিয়ে এস।"

চম্‌কে ফিরে দেখি, কোথা থেকে গুম্‌লী আবির্ভূত হয়ে হাত-মুখ নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা কইছে! সে কি বলছে শুনতে পেলুম না, কিন্তু তারপরেই দেখলুম, বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার, কমল ও রামহরি বেগে দৌড় মারলে! বোঝা গেল ভয়েই তারা পালাচ্ছে, কিন্তু কেন পালাচ্ছে বোঝা গেল না।

তারপরেই শুনলুম বহু নারী-কণ্ঠে বিষম চীৎকার! দেখি দলে দলে কাফির নারী চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ও ছুটতে ছুটতে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

তবে কি এই নারীদের ভয়েই ওরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল? কি আশ্চর্য্য, এরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়? আমাদের শত্রুরা কি নিজেরা আড়ালে থেকে এই নারী-সৈন্য নিযুক্ত করেছে? এখন আমার কি করা উচিত? পালাব? নারীর ভয়ে পালাব? ... ... হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই! আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের গায়ে তো আর হাত তুলতে পারি না!

কিন্তু এখন আর পালানোও অসম্ভব! সেই বিপুল নারী-বাহিনী তখন পঙ্গপালের মত চারিধার থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে! আর নারী ব'লে তাদের কারুকে তুচ্ছ করবারও উপায় নেই! তাদের কেহই বাংলাদেশের ভেঙে-পড়া লতার মতন মেয়ে নয়, তাদের অধিকাংশই সাধারণ বাঙালী পুরুষেরও চেয়ে মাথায় উঁচু—শক্ত ও বলিষ্ঠ তাদের দেহ!

আমি রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম—এমন অদ্ভুত সমস্যায় কখনো আর পড়ি নি! বিকট স্বরে চেঁচিয়ে মেয়ের দল সবেগে আমাকে আক্রমণ করলে! আর সে এমন বিষম আক্রমণ যে, স্বয়ং ভীমসেন তাঁর বিরাট গদা ঘুরিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারতেন না!

ভীতু ভেড়ার মতন আমি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলুম। তারা ছিনেজোঁকের মতন আমাকে চেপে ধ'রে হিড়্‌-হিড়্‌ ক'রে টানতে টানতে নিয়ে চলল এবং তারপর আমি কিছু বোঝবার আগেই আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে একেবারে নদীর ভিতরে ফেলে দিল!

ঝুপ্‌ করে জলে পড়লুম। নদী সেখানে গভীর নয় বটে, কিন্তু সেই বরফ-গলা জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল। নাকানি-চোবানি খেয়ে অসাড় দেহটাকে কোনরকমে টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, মেয়ের পাল সকৌতুকে হাসতে হাসতে আর একদিকে চ'লে যাচ্ছে! তবে কি এটা হ'চ্ছে ওদের ঠাট্টা? মেয়েমানুষ তেড়ে এসে জোয়ান পুরুষকে ধ'রে বেড়াল-

ছানার মতন জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—এ কি-রকম সৃষ্টিছাড়া দেশ? প্রাচীন গ্রীক সৈনিকরা নাকি এক-জাতের বীর-নারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে প্রাচীন কাফির নারীদের কোন সম্পর্ক নেই তো?

কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে চললুম। পথের চারিদিকেই মেয়ের দল হুড়োহুড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে, পাছে আবার তাদের পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে মানে মানে আমি পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে লাগলুম—কিন্তু তারা কেউ আর আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে না।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। আজ যেন এ দেশটা দস্তুরমত মেয়ে-রাজ্যে পরিণত হয়েছে—পথে পুরুষ খুব কম, কেবল মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে! যে-কয়জন পুরুষের সঙ্গে দেখা হ'ল তাদের প্রত্যেকেরই জামা-কাপড় ভিজে সপ্-সপ্ করছে! একটু পরেই সব রহস্য বোঝা গেল।

বাসায় ঢুকতেই কুমার, কমল আর রামহরি অট্টহাস্য ক'রে উঠল। বিনয়বাবু বোধহয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা হেসে নিলেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "যত-সব কাপুরুষ! ভয়ে পালিয়ে এসে আবার দাঁত বার ক'রে হাসতে লজ্জা করছে না?"

কুমার বললে, "স্বীকার করছি ভাই, আমরা হচ্ছি পয়লা নম্বরের কাপুরুষ! এই সব পাহাড়ে-মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করবার শক্তি আমাদের নেই! কিন্তু হে বীরবর, তোমার চেহারা এমন ভগ্নদূতের মত কেন?"

কোন জবাব না দিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি কাপড়চোপড় বদ্‌লাতে লাগলুম।

বিনয়বাবু বললেন, "ভায়া বিমল, কুমার তোমাকে সাবধান ক'রে দিলে, তবু তুমি আমাদের সঙ্গে পালিয়ে এলে না কেন?"

—"কেমন ক'রে আমি বুঝব যে ঐ দজ্জাল্ মেয়েগুলো আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে?"

—"আমরাও আগে বুঝতে পারিনি। ভাগ্যে গুম্‌লী এসে সাবধান ক'রে দিলে, তাই আমরা মানে মানে মাথা বাঁচাতে পেরেছি।"

—"কিন্তু এ প্রহসনের অর্থ কি?"

—"আজ এখানে যে উৎসবটা হয়ে গেল, এর শেষে এখানকার মেয়েরা পুরুষদের ধ'রে নদীর জলে হাবুডুবু খাইয়ে দেয়। এটা হচ্ছে কাফিরদের লোকাচার—এর বিরুদ্ধে পুরুষদের কোন জারিজুরিই খাটে না।"

—"তাই নাকি? তা'হলে গুম্‌লীর কাছ থেকে জেনে রাখবেন, ওদের এ-রকম আরো লোকাচার আছে কিনা?"

*   *   *   *

অজানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের ও নিত্যনূতন দৃশ্য-সমারোহের মধ্যে আমরা ছুন্-ছিউ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। এবং তারা যে এখনো আমাদের পিছনে লেগে আছে, এমন সন্দেহ করবার কোন কারণও পাই নি। অন্তত তারা যে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, এ বিশ্বাস আমার ছিল।

কিন্তু হঠাৎ বোঝা গেল, আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত।

আজ বৈকালে মুখ অন্ধকার ক'রে গুম্‌লী এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর যেন আপন মনেই বললে, "বামুর্ক লোকটা মোটেই সুবিধের নয়!"

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বামুর্ক? সে আবার কে?"

—"সে হচ্ছে এই গাঁয়ের 'জাষ্ট্'।" *

* 'জাষ্ট্'—অর্থাৎ সর্দ্দার।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হলে ১২ ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

শ্রীসমর সরকার এম-এ

ঠাকুরদার বিয়ে হবে সাজের বহর তাই।
বিয়ে করতে গেলেই আগে বর ত' সাজা চাই॥
মাথায় মেখে ভালো কলপ চুল হয়েছে কালো।
তোবড়া-মুখে বর-চন্দন মুখ করেছে আলো॥
টোপর ঠিক্ পরা আছে ; গলায় গোড়ের মালা।
পাঞ্জাবীতে ভালো করে আতর আছে ঢালা॥
ফরাসডাঙ্গার কাঁচি ধুতি লুটায় মাটী'পরে।
ফোক্‌লা-মুখে ঠাকুরদার হাসি না আর ধরে॥
ঠাকুরদার ন্যুব্জদেহ বিয়ে নামে সোজা।
ঠাকুরদাকে 'বর' বলে কি যাচ্ছে না'ক বোঝা ?
ঠাকুরদার বিয়ে হবে সঙ্গে চলো সব।
ঠান্‌দিকে আন্‌বো মোরা, কর্‌বো কলরব॥

কিন্তু মোদের মন্দ বরাত ঠান্‌দি এলো না।
তার জন্য ঠাকুরদাদার দোষ ত' ছিলো না॥
বিয়ের নামে সবার মুখে অমন হাসি হাসে।
ছাঁদনাতলে যখন কনে আসে বরের পাশে॥
ঠাকুরদাও হেসেছিলো শুভদৃষ্টির কালে।
ফোক্‌লা-দাঁত বেরিয়েছিলো তুব্‌ড়ে-যাওয়া গালে॥
ঠান্‌দি যেই নয়ন তুলে বরের পানে চায়।
ঠাকুরদার ফোক্‌লা-দাঁতে নজর পড়ে যায়॥

সম্পর্কে ঠান্‌দি হলেও বয়স বলো কত।
বয়স তার নয়ক বেশী, আমাদেরই মতো॥
ফোক্‌লা বর দেখেই তাই ঠান্‌দি খেলো ভীর্মি।
সবাই বলে—ও কিছু নয়, শুধুই সর্দিগর্মি॥
মুখে চোখে জলের ছিটা, পাখার বাতাস গায়।
ঠান্‌দি আর উঠ্‌লো নাকো, লগ্ন বয়ে যায়॥
লগ্ন বয়ে গেলই যখন, লাভ কি করে দেরী।
ঠাকুরদাদা ছিঁড়্‌লো মালা, হাঁটকে দিলো টেরি॥
ফিরতি বাসে মনের শোকে ফেরে নিজের ঘর।
ঠাকুরদা পণ করেছে সাজ্‌বে না আর বর॥

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

—নয়—

বেড়ালেরা ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ!

টেবিলের ওপরে শায়িত সেই কাগজখানাও আর কিছু না, দূর থেকে ভ্রূক্ষেপ করেই তারা বুঝতে পারে, সেই মোক্ষম্ প্ল্যান্। মামার ওপরে টেক্কা মেরে, কেড়ে নিয়ে আসা গুপ্তধন আবিষ্কারে নির্ঘাত নক্সা!

শিশির লোলুপনেত্রে প্ল্যানটার দিকে তাকায় আর লিলির কানে কানে জানায়: "লোকগুলো কোন ছুতোয় একবার এঘর থেকে সরলে হয়। আমি টেবিলের ওপর থেকে ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে আসি।"

"আমি ভাবছি ওদের কেউ যদি এই বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে—!" লিলি তার ভয়াবহ আশঙ্কাটা ব্যক্ত করে: "বেরুবার চেষ্টা পায় যদি—?"

"তাহলে ভাবনার কথা বটে!" ঘাড় নাড়ে শিশির। "একটু ভাবনার কথাই!"

বাস্তবিক, এদিকটা ওর চোখে পড়েনি, পালাবার পথ পরিষ্কার রেখে তবে এগুবার দিকে ঝোঁক দিতে হয়—তানইলে দুঃসাহসিকদের আর দ্বিতীয়বার অভিযানে বেরুবার সুযোগ জীবনে আসে না—সেই মহাযাত্রাতেই তারা চলে যান!

'কোথ্ দিয়ে পালাবো আমরা?" লিলির মুখে সেই জিজ্ঞাসা—মহা মহা বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনের যা প্রথম ও শেষ প্রশ্ন।

"পালাব কেন? প্ল্যান্ না নিয়েই পালাবো!" শিশিরের মৃদু আপত্তি: "প্রাণ দিয়ে যেতে হয় তাতেও রাজি কিন্তু প্ল্যান্ না নিয়ে নড়ছিনে!"

তাদের জানালাটার পরবর্ত্তী জানালার পাশে একগাদা খালি প্যাকিং বাক্স খাড়া করা ছিল—সেই কাঠের বাক্সগুলোর চূড়ায় বসে একটা বেড়াল ঝিমুচ্ছিল বলেই বোধ হয়।

"আমরা ছদ্মবেশে এলেই পারতাম !" বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে লিলি জবাব ছায় : "ভালো হোতো তাহলে !"

"তুই কি বলতে চাস্ আরেকজন কেউ ছদ্মবেশে এখানে এসেছে ? ওই বেড়ালের ছদ্মবেশে ? অপর কোনো ডিটেক্‌টিভ ?"

শিশির লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে' সন্দিগ্ধ নেত্রে বেড়ালটার দিকে তাকায়।

শিশিরের প্রশ্নে লিলি ভালো করে' বেড়ালটাকে লক্ষ্য করে এবার।

"বেড়ালটার হাবভাব কেমন যেন। ঘুমোনোটা যে ওর ফাঁকি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝিমুনোর ফাঁকে ফাঁকে দেখ্‌চনা, ও মাছে মাঝে চারধার বেশ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর চেয়ে ছাখো দাদা, ওরও নজর ওই ঘরটার ভেতরে।"

"দেখছি।" শিশির গম্ভীর গলায় বলে। অনেকক্ষণ দেখেছি।"

"কিন্তু তাহলেও ওকে বেড়াল ছাড়া আর কিছু বলে' আমার মনে হয় না।' লিলি তার তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

"আমারও তাই মনে হয়। একটা ব্যাপারে দুটো গোয়েন্দা লাগা ঠিক নয়। আর তা লাগেও না কখনো।"

"কিন্তু আমরা ওই বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয় ? ওখান থেকেও ঘরটার ভেতরে নজর দেখা যায় তো ? আর বেশ লুকিয়েও থাকা যায় ?"

এ-প্রস্তাব সমীচীন বলে' মনে হয় শিশিরের। তারা দুজনে সেই প্যাকিং বাক্সগুলোর আব্‌ডালে গিয়ে খাড়া হয়।

বেশিক্ষণ ওদের দণ্ডায়মান থাকতে হয়না। তপস্যা, বড়ই কি আর ছোটই কি, বরলাভ তাতে অব্যর্থ! অচিরেই তাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। নিজেদের রিভলভার বার করে', খুব সম্ভব ভরাট্ করবার মৎলবেই ওরা পাশের ঘরে যায়। সেই পার্চ্চমেণ্ট কাগজের প্ল্যান্‌টিকে টেবিলের ওপরে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই যায় ওরা। "লিলি, এই সুবর্ণসুযোগ ! তুই দাঁড়া !"

শিশির সেই জনবিরল ঘরে একক এগিয়ে গিয়ে টেবিলটা হস্তগত করে—টক্। প্ল্যান্‌টা প্রায় বাগিয়েও নিয়েছে—এমন সময়ে অঘটন—।

শিশিরের আকস্মিক গৃহপ্রবেশে বেড়ালটা ততটা বিচলিত হয় নি, একটা চোখ খুলে আরেকটা চোখ বোজা রেখেই, নিরুদ্বেগে, ওর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিল, কিন্তু টেবিলের ওপরে শিশিরের হস্তক্ষেপ দেখবামাত্রই তার ভাবান্তর ঘট্‌ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয় ঘটে গেল। প্যাকিং বাক্সের মাথার থেকে সে একলাফ মারল—ঠিক লিলির মাথায় নয়—লিলির মাথা বাঁচিয়ে জানালার গোড়াতেই লাফটা দিল, কিন্তু তার এই কক্ষ

পরিবর্ত্তনের তৎপরতায়—ধূমকেতুরা যেমন সুযোগ পেলেই সমাদরে পৃথিবীর ওপর দিয়ে ল্যাজ বুলিয়ে চলে যায়,—সেও তেম্‌নি লিলির মুখের ওপর নিজেরটা বুলিয়ে নিয়ে গেল।

লিলি হাঁউ মাঁউ করে' এক দারুণ চীৎকার ছাড়ল। এবং কেবল চীৎকার ছাড়াই নয়, সেই সঙ্গে চতুর্দ্দিকে এমন হাত পা ছুঁড়ল যে তার প্রতিক্রিয়ায় উঁচুকরে খাড়া করা সমস্ত প্যাকিং বাক্স, যেন অকস্মাৎ ভূমিকম্পে, ভয়ানক সশব্দে একটার পর একটা—এবং সবগুলো পিঠোপিঠি ধুপ্ ধাপ্ করে' পড়তে সুরু করল।

শিশির অবশ্যি ততক্ষণে খস্‌ড়াটা হাতিয়ে বেগে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেচে। বার হয়েই, লিলিকে সে পতিত এবং পতনোন্মুখ প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে এক হ্যাচ্‌কায় উদ্ধার করে' তিন লাফে পগারপারের দিকেই ছিল কিন্তু এদিকেও তখন গ্র্যাণ্ডমামার দল, পিস্তলদের ভর্ত্তি করে' প্যাকিং বাক্সদের আর্ত্তনাদ শুনে মার্ মার্ শব্দে হুদ্দাড় করে' বেরিয়ে পড়েচে।

"ঐ—ঐ পালাল! প্ল্যান্ নিয়ে পালাচ্ছে ঐ!—" গ্রাণ্ডমামা নিজেই এবার আর্ত্তনাদ করে' ওঠেন।

অম্‌নি সবার পিস্তল থেকে তাদের উদ্দেশ্যে ঝম্‌ঝম্ গুলিবৃষ্টি হতে সুরু হয়। কিন্তু হলে কি হবে, তারা এতক্ষণে রিভলভার রেঞ্জের বাইরে।

"দেখচ কি! বন্দুক নিয়ে এসো! পালালো যে—পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি সব ?" বক্কেশ্বর আইচ্ চীৎকার করে ওঠেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন্দুক এসে পড়ে।

"দুড়ুম্—দুড়ুম্—দুম্—!" বন্দুকের গর্জ্জন করে' ওঠে। একাদিক্রমে এবং একসঙ্গে দুম্‌দুম্ লাগায়।

"লিলি, ঘাব্‌ড়াস্‌নে। বন্দুকে আমাদের ভয় নেই।" দৌড়তে দৌড়তে ছোটবোনকে আশ্বাস ছায় শিশির।

"হুম্।" লিলি বলে শুধু—ছোটার তাড়নায় তার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

শিশিরের কথা মিথ্যে নয়—বন্দুকের দুড়ুম্ দুড়ুম্ দুম্ দুম্ আওয়াজই সার! ওদের আগা পাশতলার কোথাও লাগা দূরে থাক—গুলিগুলো ওদের দেহের সীমান্ত দেশ ঘেঁষে শীস্ দিতে চলে যায়।

গুলির উপদ্রব শেষ হলে, শিশিরা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁপ্ ছাড়ে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতা ফিরে পাবার পর লিলি বলে: "বুঝেচ দাদা, সেই বেড়ালটাই যত নষ্টের গোড়া! সেই তো আমাদের ধরিয়ে দিলে! প্যাকিং বাক্সগুলোও ফেলে ওই!"

"হুঁ, এখন আমার বোধ হচ্ছে বেড়ালটা খুব সুবিধের ছিল না।" শিশির মাথা নাড়ে: "আসলে বেড়ালই ছিল কি না কে জানে!

"তোমার কি ধারণা তাহলে কোনো ডিটেক্‌টিভ্? পুনরায় ওদের পুরাণো সন্দেহোদ্রোক: "ছদ্মবেশী গোয়েন্দা কোনো?"

"আমার তাই বিশ্বাস। আমি প্ল্যান্‌টায় হাত দেবার সাথে সাথে ও লাফ মেরেছিল। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে।"

"আমাকে এমন একটা ল্যাজের ঝাপ্‌টা লাগালো যে—!" লিলি নিজেয় নাকে হাত বুলায়: "যদিও ওর ওটা সত্যিকার ল্যাজ্ নয় নিশ্চয়। অনেকটা পর্‌চুলার মতো পর্‌ল্যাজা ব্যাপার যদিও, কিন্তু তবু ভাব্‌তেই এখনো আমার গা শির্‌শির্ কর্‌চে!"

"ও-লোকটা একটা পাকা ডিটেক্‌টিভ্। উঃ, কিরকম নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে! এ রকম প্রায় দেখা যায় না। ভাবতেও পারা যায় না।" শিশির বলে: "কিন্তু ডিটেক্‌টিভ্ হলেও ওদের দিকের ডিটেক্‌টিভ্। ডিটেক্‌টিভের ওপরে ডিটেক্‌টিভ্।"

এমন সময়ে দূরে: "ভৌ—ভৌ—ভৌ—-ঔ-ঔ-ঔ-ঔ-উ—!" একাধিক কুকুরের সমবেত ঐক্যতান এক সাথে শোনা যায়।

শিশির ব্যস্ত হয়ে ওঠে: "দৌড়, দৌড়! ডালকুত্তাদের ছেড়ে দিয়েছে দেখ্‌চিস্ কি! গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের পিছু পিছু ওরা ছুটে আস্‌বে। হাতে পাবা মাত্রই ছিঁড়ে খাবে আমাদের।—ভারী ভয়ানক এইসব ডালকুত্তারা!"

এবং বল্‌তে না বল্‌তে—-

ক্রমশঃ

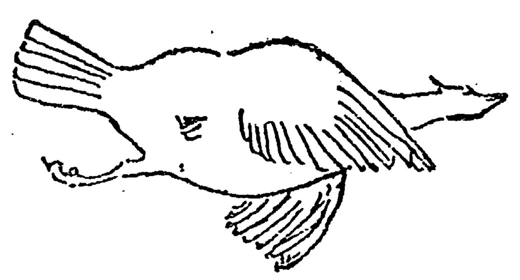

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

ঠাণ্ডা হাওয়ার দিন এসেছে, দুনিয়া তো নয় ঠাণ্ডা,
প্রাণ নিয়ে আজ ছিনিমিনির চল্‌ছে 'প্রপাগাণ্ডা'।
মুসোলিনী ঘুসো ঘোরায়. হুম্‌কি ছোঁড়ে হিট্‌লার,
চা-পানি-খোর জাপানীরাও করছে ভীষণ চীৎকার!
আকাশ কালো বারুদ-ধোঁয়ায়, রক্তপিছল মৃত্তি,
বোমাবাহক উড়োজাহাজ গুঁড়োতে চায় পৃথ্বী।
হাজার হাজার বছর আগে মানুষ ছিল জন্তু,
সভ্য হয়ে হ'ল সে আজ হিংস্র অধিকন্তু।
হয় মারো নয় নিজেই মরো—তার অরণ্য-তন্ত্র,
মানুষকে তাই থেঁৎলে পায়ে লম্ফ মারে যন্ত্র!
গগন-ছাওয়া যন্ত্র দেখে ম্লানমুখে চায় ইন্দু,
যন্ত্রদানব কাঁপিয়ে মাটি, দেয় ভরিয়ে সিন্ধু।
যন্ত্রপূজার উৎসবে হায় রূপকথিকার প্রাণ যায়,
বিজ্ঞানেরই আজ্ঞা শুনে কলের কামান গান গায়।
সাত-ভাই-চাঁপা ফুট্‌বেনা আর, পক্ষীরাজও উড়বে না,
রাজার ছেলে রক্ষোপুরে ধনুকে বাণ জুড়বে না।
কুচবরণ সেই কন্যা ছিল, মেঘের বরণ কেশ যার,
তার চিবুকের টোল্ দেখে হায় গাইবেনা আর বীণকার।
স্বপ্ন যেদিন সত্যি হয়ে রচ্‌ত রূপের ছন্দ,
বিজ্ঞান আর যন্ত্রদানব করেছে তা বন্ধ।
বোকা মানুষ প্রথম যখন করলে যন্ত্র-সৃষ্টি,
ভাব্‌লেনাকো যন্ত্রদানব আন্‌বে কি যে রিষ্টি!
জগৎ-জোড়া লড়াই যে আজ মানুষ এবং যন্ত্রে,
মানুষ হারে, যন্ত্র জেতে বিজ্ঞানেরই মন্ত্রে।
যন্ত্রদানব ভুলিয়ে দিলে বুদ্ধ, নিমাই, খৃষ্টে,
গোলাম হয়ে স্রষ্টা মানুষ যন্ত্র বহে পৃষ্ঠে।
'রংমশালে'র আলোকে তাই দেখছি করুণ দৃশ্য,
যন্ত্রযুগের যন্ত্রণাতে কবির কলম নিঃস্ব।

ইতি

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চলন্তিকা

তোমরা সকলেই শুনে নিশ্চয় খুব সুখী হবে যে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বিশ্বভারতীর গুরুভার যোগ্যতম পুরুষের হাতেই ন্যস্ত হয়েছে। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ সমস্ত ভারতের শিল্পগুরু, তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী এ তোমরা জানো। আরো তোমরা জানো তিনি শিশু কিশোরদের অপরূপ গল্পের ও কথাচিত্রের কত বড় পাকা কারিগর। ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর লেখা বইগুলি শিশুসাহিত্যের রত্নবিশেষ। তোমরা কিন্তু অনেকে জানো না তাঁর আর একটি বড় গুণের কথা। তিনি খুব চমৎকার গল্পের আসর জমাতে পারেন—গল্প যেমন লিখতে তেমনি গল্প বলতে তাঁর জোড়া কেউ নেই। আমরা সকলে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

রেডিয়োতে তোমরা হরেক রকমের গান বাজনা শোন কিন্তু সুদূর আকাশের ছুট্‌তারা-দের গান কখনও শুনেছ কি? সম্প্রতি ভারতীয় রেডিয়োর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ছুট্‌তারাদের গান রেডিয়োতে শুনতে পেয়েছেন। তোমরা হয়ত অনেকেই দেখেছ আকাশে ছুট্‌-তারাগুলি কি ভীষণ ছুটে দূরে মিলিয়ে যায় বা ফেটে পড়ে। তাদের এই ভীষণ ছুটে যাওয়া বা ফেটে পড়ার যে অদ্ভুত শব্দ তাই ভারতীয় রেডিয়ো আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কার বিজ্ঞান রাজ্যে নতুন যুগ আনবে। আমরা আকাশ-রহস্যের অনেক খবর তখন জানতে পারবো। এই ছুট্‌তারাদের শব্দ থেকে রাতের আকাশের নানা আলো ও শব্দ তরঙ্গের নানা বার্ত্তা আমরা জানতে পারবো। এমন সময় আসবে যখন আমরা সকলে ঘরে বসে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের আকাশবাসীদের আসাযাওয়ার খবর পাবো। হয়ত এমন একদিনও আসবে যখন পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ আছে তাদের নানা বার্ত্তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তখন আমরা রেডিয়োতে কেবল লণ্ডন লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনগুলিই পাবো না, মঙ্গল গ্রহ বুধগ্রহ থেকেও গানবাজনা শুনতে পাবো। আমাদের পৃথিবী ও বাইরের জগতের তখন সুমধুর আদান প্রদান চলবে!

তোমরা সকলেই নিশ্চয় শুনেছ জাপান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ চালিয়েছে। জাপানই প্রথম আক্রমণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের বন্দর

দ্বীপগুলি বিশেষ করে পার্ল বন্দর ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। এদিকে থাইল্যাণ্ড জাপানের চাপে জাপানী সৈন্য ও এরোপ্লেনের যাতায়াতের রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অফ্‌ ওয়েলস' ও 'রিপাল্‌স্‌' জাপানী টর্পেডো প্লেনের দ্বারা জলমগ্ন হয়েছে। ইংরেজ ও আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে উপযুক্তভাবে যুদ্ধচালনা সুরু করে জাপানের ধৃষ্টতার জবাব দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই জাপানের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু জাপানের নৌবহর ও এরোপ্লেন বাহিনীকে এখনও ইংরেজ আমেরিকা জব্দ করতে পারেনি। ফলে অনেক জায়গায় বিশেষ করে মালয় উপদ্বীপ ও বর্ম্মার দক্ষিণ সীমান্ত জাপানী সৈন্যরা আক্রমণ করেছে। কিন্তু প্রকাশ যে জাপান গোড়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধাবার ফলে কিছু সুযোগ সুবিধে করে নিলেও শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড আমেরিকার যৌথ যুদ্ধ বাহিনীর মুখে টিকে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেছেন যে জাপান প্রথম গুলি ছুড়েছে বটে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শেষ গুলি কারা ছুড়বে। পৃথিবীর স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশগুলি একান্ত মনে কামনা করছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেন যেন শেষ গুলি ছুড়ে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা থেকে পৃথিবীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই নতুন অগ্নিময় যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষও এক প্রচণ্ড যুদ্ধের নিষ্ঠুর এলাকার মধ্যে এসে পড়েছে। মালয়ে ও বর্ম্মা প্রদেশের দক্ষিণে ইতিমধ্যেই বোমা বর্ষণ সুরু হয়েছে বলে প্রকাশ। কলিকাতা বন্দরে বোমা বর্ষণ হবে কিনা ভগবান জানেন। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি জায়গাগুলি কলিকাতা থেকে দূরে নয়। এই আশঙ্কার ফলে কলিকাতার সকলকে তৈরী ও সাবধান করা হয়েছে এবং কলিকাতা ও তথা ভারত রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। ভারতের নিরাপদ হওয়া অনেকটা নির্ভর করছে সুদূর ব্রিটিশ নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুরের ওপর। সিঙ্গাপুর সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত ও সুবিরাট ব্রিটিশ নৌবহর ও এরোপ্লেন বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর ইতিমধ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ও এরোপ্লেন জাপানীদের অনেক জল জায়গা থেকে হটিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও ভারত আক্রমণের বিপদ কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষ করে যখন এই ভীষণ যুদ্ধে জার্ম্মানী জাপানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। রুশিয়ার কাছে হটে গিয়ে জার্ম্মানী নতুন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ সুরু করতে পারে। আর জাপানের সহযোগিতায় এই যুদ্ধ এখন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে।

———

রংমশালের ভাই বোনেরা,

একটী মাস এলো এগিয়ে—পৌষমাস। শীতের হাওয়া বনে বনে পাতা ঝরানোর কাজ স্নুরু করে দিলো। অরণ্যে অরণ্যে যে ফুল যে কিশলয় ছিল আনন্দে মাথা জাগিয়ে, শীতের নিষ্ঠুর বাতাসে তাদের সে হাসি, সে আনন্দ হয়ে উঠলো ম্লান, পাণ্ডুর বিষন্ন। চারিদিকে শুধু রিক্ততা আর হাহাকার।

এমনি রিক্ততা, হাহাকার পৃথিবীর চারিদিকে। চারিদিকে মৃত্যু-ম্লান ছবি, পৃথিবীর দেশে দেশে শক্তি মদমত্ত ভীষণ দৈত্য যেন তার হাত বাড়িয়েছে—তাই দেশে দেশে এই বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, হানাহানি—তাই মানুষের রক্তে মাটির বুক কলঙ্কিত, দুঃসহ বেদনা, অভাব, ভীষণতম বিক্ষোভ। পৃথিবী যেন নিঃশ্বাস ফেলতে পায় না, এমনি সে বিপন্ন। সারা পৃথিবীর বুকে শীতের হাওয়ায় অরণ্যের রিক্ততা। মানুষের সভ্যতা, কৃষ্টি তার জ্ঞান বুদ্ধি, প্রতিভা আজ যেন সব দিক থেকে বিপন্ন রোগ জর্জ্জর ক্লান্ত পৃথিবীর এ রূপ কি পৃথিবীর আসল রূপ?

পৃথিবীর এই দুঃসহতম দিনে, মানুষের প্রতি মানুষের এই নিষ্ঠুরতম আঘাতে ও প্রতিঘাতে আগামী নতুন দিনের আশায় আমরা তাকিয়ে থাকবো প্রকৃতি যেমন অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে বসন্ত আগমনের পথের দিকে। আমাদের চোখে ভাসবে প্রকৃতির মৃত্যু ম্লান চোখের স্বপ্নছায়া। পৃথিবীতে আসবে শান্তি, নতুন করে জাগবে মানুষ। নতুন দিনের স্বপ্ন জাগছে মানুষের চোখে।

শিবাণী ঘোষ (সুগৌলী) ১৫৭৮। মেয়েদের ব্যায়াম করা উচিত বইকি, অন্যান্য দেশের লোকেরা মেয়ে পুরুষ নির্ব্বিশেষে খেলাধুলা, ছুটোছুটী, সাঁতার ইত্যাদিতে নানারকম ব্যায়াম করে। সেইজন্য আমাদের দেশের মেয়েছেলেদের চেয়ে তারা যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী—। তোমরা যখন বড় হবে প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখবে গ্রীস দেশে মেয়ে পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে ব্যায়াম করতো—সেইজন্য তারা জগতের মধ্যে বেশী দীর্ঘায়ু বলশালী ও সুন্দর দেখতে ছিল। এখনও ওদেশের ভাস্কর্য্য তার সাক্ষী দেয়। কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে লোকের ধারণা ছিল মেয়েরা ব্যায়াম করলে তাদের সহজাত সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু তাঁদের সে ভুল ধারণা এখন আর নেই।

গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের যাদের প্রত্যহ কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় তাদের অন্যকোনও বিশেষ ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই—কেবল একটু করে প্রত্যহ মুক্ত বাতাসে বেড়ান দরকার। আর যাদের অধ্যয়ন ছাড়া বিশেষ কোনও কাজ নেই তাদের ব্যায়াম অবশ্যই দরকার, কারণ দৈহিক পরিশ্রমের অভাবে নানারূপ রোগ দেখা দেয়। অনেকের মুখে শুনেছি—ব্যায়াম করলে অধিক আহার করতে হয়; কিন্তু ব্যায়ামে যাঁরা পারদর্শী তাঁরা একথা স্বীকার করেন না—এবং এও বলেন—যে তাঁদের মনে রাখা উচিত We eat to live and not live to eat. সাধারণ লোক যেমন আহার করে ব্যায়াম যারা করে তাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী প্রভৃতি। অর্থাৎ ক্ষুধা অনুভব করলেই কিছু খাওয়া দরকার এবং ক্ষুধা না বোধ করলে কোমও সামগ্রীই আহার করবে না।

উমা ও নিলীমা (রাজসাহী) ১৬১৫। রেডিওর সম্পর্কে কি বলতে বলেছ? রেডিও আবিষ্কার না রেডিও ষ্টেশন স্থাপনা? ভাল করে জানালে উত্তর দেবো। **অরুণা দাশগুপ্তা** (বারপেটা) ১৩২৩। চিঠির বাক্সে যোগ দিতে পারে রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকারা, সকলেই, পৃথক ভাবে সভ্য হতে হয় না। **বিমল চক্রবর্ত্তী** (জব্বলপুর) ১২০৫। চিঠি ভরা তোমার অনুযোগ কিন্তু কারণ কিছুই বুঝলাম না। চিঠির ভিতর উত্তর দেবার কিছু না থাকলে কি উত্তর দেওয়া হবে! ছবি বা লেখার তো আমি বিচারক নই—সুতরাং এ সম্বন্ধে জবাব দেওয়া সব সময় আমার সম্ভব হয় না। এখানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভেদাভেদের কথা কিছু আসে না। **আব্দুল গাফ্ফার** (উলানিয়া) ১৫৫৬। তুমি সমশের আলির ঠিকানা চেয়েছ—ষ্টাম্প পাঠালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। **দিলীপকুমার দে চৌধুরী** (রাণাঘাট) ১৫০৬। রংমশাল নিতে যে ষ্টাম্প পাঠিয়েছিলে সেটা তো পাওয়া যায়নি—চিঠিও পাইনি। এইসব সংক্রান্ত কাজ সব পরিচালক মহাশয়ের নামে পাঠাবে বা করবে। বইএর লিষ্ট পৃথক ভাবে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু রংমশালে ছাপা সম্ভব নয় অনেক কারণে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ভিন্ন পৃথক ভাবে কাউকে চিঠি লেখা হয় না। তোমার হাতের লেখা প্রশংসনীয়। **প্রতিমা সেন** (শ্রীসমোন) ১৩৩০। আগের চিঠি পাইনি। ওখানকার সম্বন্ধে ছোট করে লিখে পাঠাতে পারো—তুমি যা লিখেছ পড়ে আমার ভাল লাগলো। **গিরীন্দ্রনাথ রায়** (নৈহাটী) নাম জানিয়ে ষ্টাম্প পাঠালে লেখনীবন্ধু পাঠান হবে। তোমার প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে জানাবে। **লালমোহন ভট্টাচার্য্য** (কালীঘাট) ১৫৮৫। ষ্টাম্প পূর্ব্বে আমরা পাইনি—এবারে এনভেলাপ পাঠিয়েছ বন্ধু পাঠান হচ্ছে। **বিনীতা ঘোষ** (রাঁচী) ৪৮৯। ব্যাজ আমরা এখন দিতে পাচ্ছি না—যতদিন না যুদ্ধের হাঙ্গামার মিটমাট হয় সুতরাং

ব্যাজের টাকা এখন পাঠিও না। **সত্যব্রত বসু** (আখাউড়া) ১৬১৩। নাটক তুমি পরিচালক মশাইকে পাঠিও যদি পছন্দ হয় অবশ্যই ছাপা হবে। **মাণিকচন্দ্র দাস** (বাণীবন) ১৩১৮। তোমার চিঠি দেরীতে পৌছনর জন্য আমি ব্যবস্থা করতে পারিনি—আর আমি কি লিখব বলো তো? প্রবন্ধ? গল্প? কবিতা? কিছুই লিখতে পারি না যে! **বাবু বসু** (কুমিল্লা) ১৩৫৯। তুমি যদি দু' বছরের রংমশালই নাও—তোমার ইচ্ছামত বাঁধিয়ে দেওয়া হবে—একত্র বা পৃথক ভাবে। এ সম্বন্ধে পরিচালক মশাইকে লিখলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। রংমশালের প্রথম গ্রাহক প্রদীপ সেন। **মীরা ও হীরক সান্যাল** (রাজসাহা) ১২৮৩। আমার উপর ভার দিলে ভারী মুস্কিল হয়—নাম নির্ব্বাচন করে ষ্টাম্প পাঠালেই বন্ধুর রথ গিয়ে পৌছবে। ইন্দিরা দি'র সঙ্গে কি করে আলাপ করিয়ে দেবো? তোমরা চিঠি লিখো তাহলেই তিনি আলাপ করবেন। **সুনালকুমার দত্ত** (দার্জ্জিলিং) ১২৯৯। তুমি এমন লেখনীবন্ধু চাইছ যার ডাকটিকিট জমান Hobby. আমি সে কথা জানালাম—আরও জানাচ্ছি যে তার যেন Duplicate Stamp থাকে। **রেখা নন্দী** (সিলেট)। কৃষ্ণা ও রহিমার ঠিকানা পাঠান হয়েছে এবং আর যা চেয়েছিলে তাও। **ছবি দেব** (রায়নগর) ১৭৬৪। ব্যাজ তো এখন পাওয়া যাবে না ভাই—সুতরাং টাকা পাঠিও না। কার নামের লিষ্ট? কিছু বুঝলুম না।

বাগেরহাট থেকে কে চিঠি লিখেছ—তার শেষের অংশ নেই।

রবীন্দ্রনাথ মজুমদার, নারায়ণকুমার দত্ত, ধ্রুবরঞ্জন সরকার, শ্যামসুন্দর মাইতি—তোমাদের প্রশ্নোত্তর পরেরবার যাবে। জ্যোতির্ম্ময়, মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা ঘোষ, চিন্ময়কুমার গঙ্গোখাধ্যায়, নিখিলেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাহনূর বেগম তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

তোমরা সকলে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

ইতি—তোমাদের

দিদিভাই

নূতন প্রতিযোগতা

(কেবলমাত্র রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের জন্য)

"রবন্দ্রী স্মৃতি রৌপ্য-পদক"

দাতা—শ্রীবিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিষয়—**শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান**

রংমশালে এবারের নতুন প্রতিযোগিতায় 'শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান'—এই বিষয়টি নিয়ে একটি নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। প্রবন্ধটি পাঠাবার শেষ তারিখ ৭ই মাঘ। যে গ্রাহক বা গ্রাহিকার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে তাকে 'রবীন্দ্রস্মৃতি রৌপ্য পদক' উপহার দেওয়া হবে।

এই পদকটির দাতা শ্রীবিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নূতন ধাঁধা

শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্তের সৌজন্যে

এক ভদ্র লোকের মাথায় একটু ছিল, তাঁর হঠাৎ খেয়াল হল—কথা কইবার সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করব না। নীচের কথাগুলি তিনি ব্যবহার করতেন। বলত কোন্‌টি কোন্ কথা?

১। কব্জী ঘড়ী। ২। ঝরণা কলম। ৩। পোষাক মামলা। ৪। আনন্দ প্রস্থর থলি। ৫। কাগজ ওজন। ৬। কি নয়। ৭। ইস্পাত গুঁড়ি। ৮। কোমর জেদ। ৯। টানা ওপর। ১০। সহজ কেদারা।

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর

টুল, চৌকি, খাট, টেবিল, কুরসী, আলমারী, আলনা, আয়না, কুলো, দা।

এবারকার ধাঁধার নির্ভুল উত্তর ক'রো হয় নাই।

যাদের একটিমাত্র ভুল হয়েছে ঃ—

বেলারাণী গাঙ্গুলী, আসাম ; অরুণা, নিতু ও পোরা দাসগুপ্ত, বড়পেটা ; গীর্দ্দেবীকান্ত দাস, কলিকাতা ; কুমারী শিবানী ঘোষ, কবিতা, মাষ্টার বিরু, স্নুগোলী ; দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দাদু, নিতু, কাল, ভুকু, শোভন, কল্যানী, অসিম ও পচু, নদিয়া ; বিকাশ, রণজিত, নবনী, মমতা, সবিতা ও ললিত, হাওড়া ; গিরীন্দ্র নাথ রায়, নৈহাটী ; মায়া ও দিলিপ গুপ্ত, কলিকাতা।

বাঙলার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে খুশী হয়েছে
আমাদের প্রকাশিত—সুলেখক বিমল ঘোষের

'মনীষীদের ছোটবেলা'

আর

'শিশু রবি'

পড়ে

আবার আমরাই প্রকাশ করেছি। তোমাদের 'মৌমাছি'র লেখা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

(বাজারের সবসেরা আর অভিনব সাধারণ জ্ঞানের বই) যে সব প্রশ্নের জবাব কোথাও খুঁজে পাওনি, তা' এ বইটিতে পাবে। প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে—দাম দশ আনা, ভিঃ পিঃতে পনের আনা লাগবে। দেরী করো না, কারণ কাগজের অভাবে শেষ পর্য্যন্ত সবাইকে যোগানোর মত অত বই ছাপানো সম্ভব নাও হতে পারে।

মধুচক্র

৯০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সব সহরের বড় বড় বইয়ের দোকানে আমাদের প্রকাশিত বইগুলি কিন্‌তে পাবে।

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
দশমসংখ্যা

মাঘ
১৩৪৮

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে,
সেই মতো লঙ্কাপুরী শোভা পায় আগে

আজ পাঁচদিন বসে আছেন রাম লঙ্কাপুরী ঘিরে, যুদ্ধ দেবার নাম করে না লঙ্কেশ্বর। লঙ্কাদ্বার, তেজপাতদ্বার, প্যাজীদ্বার, স্কন্ধাবার দ্বার, ধুন্ধুমার দ্বার খাক্‌ছার। সদর, অন্দর, হাটের দ্বার, বাটের দ্বার সব বন্ধ করে বসে আছেন রাবণ। পুরীতে ঢোকে সাধ্য কার! থেকে থেকে যুদ্ধের বাজনা বাজছে দুইপক্ষে, রাক্ষসেরা হাঁকছে—শমন দমন রাবণ রাজা, বানরেরা হাঁকছে—রাবণ দমন রাম।

শ্রীরাম বলছেন বিভীষণকে—

কি কারণে যুদ্ধ নাহি দেয় দশানন!

বিভীষণ বলছেন—

বানর সেনার ভয়ে স্তব্ধ দশানন !

—এ ছাড়া তো অন্য কারণ দেখছি না।

সুগ্রীব বল্লেন—যুদ্ধাহ্বান দিয়ে একজন দূত পাঠানো দরকার রাবণের সভায় !

যাও বাছা হনুমান পবন নন্দন—
লঙ্কায় জানিয়া আইস কি করে রাবণ।

বারে বারে একজন গেলে রাবণ ভাবতে পারে এদের দলে এক হনুমানই আছেন আর কেউ বীর নেই।

হনুমান একবার কপি-পোড়া হতে হতে বেঁচে এসেছেন, এবারে জোড়হাতে বল্লেন—

একবার গিয়াছিল বীর হনুমান,
এবারে দূত হয়ে আর কেউ যান।

রাম জাম্ববানের দিকে চাইতে জাম্বুবান বললেন—

হনুমান হতে অঙ্গদবীর বড়
তাহারে পাঠাও যে বলতে কইতে দড় !

তখন রাবণকে যুদ্ধাহ্বান দিতে অঙ্গদ চল্লেন।

প্রকাণ্ড শরীর বীর মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হইতে যেন আইল দিনপতি।
আকাশ দেউটি যেন দুইচক্ষু জ্বলে,
মস্তক ঠেকেছে বীরের গগনমণ্ডলে !
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা,
অঙ্গদের অঙ্গ দেখি ভঙ্গ দিল তারা !
তক্ষকে দেখিয়া যেন পলায় মুষিক,
রাক্ষসেরা পলায় এদিক সেদিক।
দুয়ারে দুয়ারী সব উঠে দিল রড়—
লাথির চোটে দ্বার ভাঙ্গি অঙ্গদ ঢোকেন গড়।

—ওরে ঘরপোড়া এলো রে ঘর পোড়া—বলে, আর পালায় বাজারের লোক লঙ্কার ঝোড়া বয়ে যে যেমনে পায়। কেউ বলে, ওরে ঘরপোড়া নয়—এটা আর কেউ. কেউ বলে, ওরে তারি কেউ হবে। কেউ বলছে—

আরে ধরনা দিয়ে গলায় ফাঁস
ঘাড়ের রক্ত খাই কামড়ে মাস !

কেউ বলে—

বনের পশু ওটাতো বানর
রসুন লঙ্কা দিয়ে খাবো, ভেড়ে ল্যেজটা ধর।

আর কেউ রাক্ষসী বলছে—

জন্মে যা না দুঃখ পাই ঘরপোড়া তা দিলে
চাল পুড়ায়ে শেষে কিনা গালটা কেমড়ে নিলে।

কেউ বলছে—

চাল পোড়ায়ে গেল সেটা রাতারাতি এসে,
দিনে এসেছে এটা, কিবা করে শেষে,
চুলোর দোরে পাঠায় বা ছিঁড়ে গোঁপ দাড়ি
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলে বা উপাড়ি !

একজন বলে—

দূর তোরা কোথাকার মূর্খ
বানর দেখে পাস ডর এই লাগে দুঃখ।
বাঁ হাতে আনিতাম ওর লেজটা ধরে,
সব মাটি করলি তোরা গোলমাল করে !

অঙ্গদ কাউকে কিছু না বলে হেলতে দুলতে রাবণের সভায় গমন করছেন। তাড়াতাড়ি মহোদর সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে খবর দিচ্ছেন রাজাকে—

—মহারাজ আসছেন!

—আরে কোথাকার মহারাজ ?

—আজ্ঞে মহারাজ নয়, যুবরাজ।

—আরে কোথাকার যুবরাজ ?

—আজ্ঞে কিষ্কেন্ধ্যার অঙ্গদ যুবরাজ।

—আসতে দাও হে, আসতে দাও। কিছু রঙ্গ করা যাক্ বানরটাকে নিয়ে।

এই না বলে রাবণ আরসী মায়া পাতে,
শত শত রাবণ হয়ে বসল সভাতে।
যে দিকে ফিরে চাই সেদিকে রাবণ—
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন।

আরসি-মোড়া শিশ্‌মহলে ফারসী টুপি পার্সি কোট পরে অগুন্তি রাবণ রাজা বসে আছে দেখেছুপ্‌ করে ঘরে প্রবেশ করে অঙ্গদ রায় হক্‌চকিয়ে গেল! সভায় রাবণে রাবণে ছয়লাপ্‌, দশমুণ্ড কুড়ি হাতের বাজার বসে গেছে, ন স্থানং তিল ধারণে, সব চৌকি দখল!

উঁচু উঁচু সিংহাসনে বসেছে সবাই—
দশানন ছাড়া আর একজন নাই!

আর একটি আসনও নেই যে কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ বসেন। তখন-কি করেন অঙ্গদ না—লেজ কুণ্ডলী পাকালেন এক প্যাঁচ, দুপ্যাঁচ, দশবিশ পঁচিশ তিরিশ প্যাঁচ, প্যাঁচের পর প্যাঁচ তারপর প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে এক কুর্সি মোড়া তৈরি করে তারি ওপর চেপে বসলেন 'জয়রাম' বলে সবার উঁচু আসনে।

যত কেউ বসে ছিল রাবণের সাজে
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ হয়ে আছে!
দেখি সুমের-পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ
রাক্ষসেরা ভাবে বাপ্‌ এটা বটে কেহ।

কথা কেউ কয় না, চিত্রপুত্তলিকাবৎ সবাই বসে।

শীতের বাণী

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

শীত সে' কাঁপুনি আনে এ ধার ও ধার
ছুটি নাই তার!
কুসুমের বনে বনে
খেলা করে ক্ষণে ক্ষণে
শিশিরের জলে ধোয় ধুলা বার বার;
ছুটি নাই তার।

ভোর-বেলা কুয়াশার শয়ন ছাড়ি'
ওঠে তাড়াতাড়ি
ঘুম-ভাঙা রাঙা-আঁখি
সবিতা সে লয় আঁকি'
ত্বরা করি নদীতীরে দেয় সে' পাড়ি
ওঠে তাড়াতাড়ি।

ঝাউঝোপে বাঁশ ঝাড়ে ছোট ফুর্ ফুর্
আনে নব সুর—
মাঠে মাঠে চলে ছুটে
সন্ধ্যায় ঘুটঘুটে
ভয়-হীন সাথী সে যে ধরা-বন্ধুর
আনে নব সুর।

চঞ্চল ছট্‌ফটে শীতের বাণী—
আমি তা' জানি ।
ঝিঁঝিঁদের একতানে
তার কথা মোর কানে
রোজ সাঝেঁ ব'লে যায় সন্ধ্যারাণী—
আমি তা' জানি।

আনি শুনি বাণী তা'র কুয়াশা করুণ
উঠিলে অরুণ।
ধারালো রোদের মাঝে
ভালোবাসা ঢাকা আছে
ওরি মাঝে হেরি' তা'র তনু অতনুর
উঠিলে অরুণ।

গাঁদাফুল ফোটা গ্রাম, রোদ্‌রাঙা ভোর
কাঁপে মন মোর।
শুনি যেন রাতি দিন
সুদূরের সাধা বীণ
খুলে যায় পরাণের পিছনের দোর
কাঁপে মন মোর।

জাগরণী বাণী তা'র শুধু জাগরণ
শুনি সারাক্ষণ।
পথে পথে শীত আসি'
আমাদের ভালোবাসি'
দিয়া যায় শুভাশীষ-ভরা শত মন
শুনি সারাক্ষণ ॥

———

রুশীয় রূপকথা

শ্রীইন্দিরা দেবী

তিনজন নিয়ে সংসার। দুটি মেয়ে আর তাদের মা। বড় মেয়েটির নাম হেলেন, যেমন কুড়ে যেমনি হিংসুক আর কুশ্রী। কারুর ভালো সে দেখতে পারে না—বদ্‌মেজাজী আর রেগেই আছে। মা তাকে আদর দিয়ে মাথাটি একেবারে খেয়েছেন।

ছোট মেয়েটির নাম মারুচেকা। দেখতে সুন্দর আর তেমনি মিষ্টি স্বভাব। সংসারের সব কাজই সে করে। ঘর দোর পরিষ্কার, ঝাড়ামোছা, রাঁধা, বাসন মাজা কাপড় সেলাই, গরুর দুধ দোয়া সব কাজই সে হাসিমুখে করে যায়। হেলেন বসে বসে খায় আর মেজাজ দেখায়, সাজে গোজে এখানে ওখানে গিয়ে আমোদ করে বেড়ায়।

তখন শীতকালের মাঝামাঝি। একদিনের কথা—হেলেন রাগে চীৎকার করে ডেকে উঠলো—মারুচেকা! মারুচেকা!!

মারুচেকা হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে: কি দিদি?

—আমার কতকগুলো ভায়লেট ফুল চাই, জামায় লাগাতে হবে, এখুনি যা পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে নিয়ে আয়। হ্যাঁ, দেখবি—ফুলগুলো যেন বেশ তাজা আর সুগন্ধি হয়—বুঝলি?

—বলো কি দিদি? এই শীতে ভায়লেট ফুল কি ফোটে?

—আমি কোনকথা শুনতে চাই না, ফুল আমার চাই, যেখান থেকে হোক আর যে করে হোক। ফুল না নিয়ে তুই বাড়ী ফিরবি না।—হেলেন রাগে ফেটে পড়লো।

মারুচেকা কি আর করবে, পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলো। তুষার পড়ে রাস্তার চিহ্ন হারিয়ে গেছে। অসহায়ের মত পথ হারিয়ে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, শীতে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে কিন্তু ফুল না নিয়ে সে বাড়ী যাবে কি করে?

হঠাৎ সে দেখতে পেলো দূরে একটা আলোর শিখা। আলো লক্ষ্য করে চলতে চলতে পাহাড়ের চূড়ায় এসে সে পৌছল। চুড়ার কাছে একটা আগুণ জ্বলছে, সেই আগুণের চারিধারে বারোটা পাথরের ঢিবি, তার উপর বারোজন অদ্ভুত ধরণের লোক বসে। প্রথম তিনজনের মাথার চুল একেবারে সাদা আর পরের তিনজন ঠিক তারা বুড়ো নয়. আর তিনজন সুন্দর যুবা, বাকী তিনজন ঠিক যুবাও নয়। তারা সবাই আগুণের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে ছিল।

এই বারোজন হলো বছরের বারোটি মাস। জানুয়ারা সকলের বড়—সে তাই একটা উঁচু পাথরের উপর বসে আছে, তার মাথার চুল আর দাড়ি তুষারের মত সাদা, হাতে একটা রূপালি দণ্ড! ব্যাপার দেখে মারুচেকা ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বল্লেঃ ভারী শীত করছে আমার—তোমাদের আগুণের ধারে একটু দাঁড়াবো? জানুয়ারী মাথা তুলে বল্লে; নিশ্চয়ই! কিন্তু বাছা কি জন্য তুমি এখানে এসেছ? তুমি কি খুঁজছ?

কোমল কণ্ঠে মারুচেকা বল্লেঃ ভায়লেট ফুল খুঁজতে এসেছি।

—ভায়লেট ফুল? জানুয়ারী হাসলো, তারপর বল্লে: দেখছ না চারিদিকে কি ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে, এমন শীতে কি ভায়লেট ফুল ফুটতে পারে?

—জানি, কিন্তু আমার বোন হেলেন সে কথা কিছুতেই বুঝতে চায় না, ফুল তার চাইই, তাই পাহাড়ে এসেছি ফুল খুঁজতে—ফুল না নিয়ে কেমন করে বাড়ী যাবো—তোমরা বলে দেবে ফুল কোথায় পাবো?

তার কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাষ।

জানুয়ারী খানিক তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অপর জনের কাছে গিয়ে বল্লে, ভাই মার্চ্চ, আমার আসনটা তুমি নাও।

মার্চ্চ এগিয়ে এলো—দণ্ডটী হাতে নিয়ে আগুণের উপর ক'বার ঘোরালো। অগ্নিশিখা যেন আকাশ স্পর্শ করলো, তুষার গলে যেতে লাগলো, গাছ মাথা জাগাতে সুরু করলো, সবুজ ঘাসে মাঠের বুক ভরে উঠলো—এলো বসন্ত। আর ভায়লেট ফুলে সমস্ত মাঠ নীল হয়ে গেলো।

—ফুলগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নাও, মার্চ্চ তাকে বল্লে।

মারুচেকা একরাশ ফুল তুলে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো।

হেলেন আর তার মা অসময়ে এই ফুল দেখে অবাক হয়ে গেলো। ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাড়ী ভরে উঠলো।

এগুলি পেলি কোথায়? হেলেন জিজ্ঞাসা করলো।

পাহাড়ের ওপরে ফুলগুলো পেলাম—মারুচেকা উত্তর দিলো।

তারপরদিন হেলেন তাকে আবার হুকুম করলোঃ শীগ্‌গীর পাহাড় থেকে ষ্ট্রবেরি নিয়ে আয়, দেখিস ষ্ট্রবেরিগুলো যেন পাকা আর মিষ্টি হয়।

—সে কি দিদি, এই শীতে কি ষ্ট্রবেরি পাওয়া যায়?

—কোনকথা শুনতে চাই না—ফল না নিয়ে যদি ফিরবি......

বাকী কথা শুনবার প্রবৃত্তি তার হলো না, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে মারুচেকা সুরু করলো। তুষারে পাহাড় ভরে গেছে, বাতাসে যেন ছুরীর ফলক গোঁজা, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, হাড়ে কাঁপুনী ধরছে, ক্ষিদেয় সে মরে যেতে বসেছে, এমনি সময় সে আগের মত দেখতে পেলো অগ্নিশিখা। সানন্দে সে আগের মত ঐ অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে চলতে চলতে এলো সেই অগ্নিকুণ্ডের কাছে, আবার দেখা হলো সেই বারোজনের সঙ্গে। তারা ঠিক আগেকার মতই আগুণের চার পাশে চুপচাপ বসে আছে।

—শীতে আমি মরে যেতে বসেছি, তোমাদের আগুণের ধারে একটু দাঁড়াবো? জানুয়ারী মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে বল্লেঃ কি জন্য এখানে আবার এলে বাছা, তুমি কি চাও?

—ষ্ট্রবেরি খুঁজতে এসেছি।

—কিন্তু এখন তো ষ্ট্রবেরির সময় নয়, এই শীতে কি ষ্ট্রবেরি পাওয়া যায়? তা আমি জানি কিন্তু আমার বোন হেলেন ষ্ট্রবেরি আনতে আমায় বলেছে, আমায় বলে দেবে কোথায় গেলে ষ্ট্রবেরি পাবো? তার চোখে দুঃখে ক্ষোভে জল এসে গেল, কণ্ঠস্বর ভারী হায় উঠলো।

জানুয়ারী উঠে দাঁড়ালো—জুনের হাতে তার দণ্ডটী দিয়ে বল্লেঃ ভাই জুন, আমার আসনটা তুমি নাও।

জুন দণ্ড নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের উপর দোলাতে লাগলো, অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করতে লাগলো। তুষার গলে গেল—সবুজ আভায় মাটির বুক উঠলো ভরে পাখীরা গাইতে সুরু করলো—বনে বনে অজস্রধারে ফুল ফুটতে লাগল—আর একটি গাছে পাকা ষ্ট্রবেরি দেখা দিল।

—মারুচেকা! ষ্ট্রবেরি সংগ্রহ করে নাও—জুন বল্লে।

আনন্দে অধীর হয়ে একদৌড়ে সে সেই গাছটার তলায় গেল। ছোট্ট ফ্রকটায় ষ্ট্রবোর আর ধরে না। আসবার সময় কিন্তু তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আসতে মারুচেকা ভুললা না।

হেলেন তো এই পাকা মিষ্টি ষ্ট্রবেরিগুলো পেয়ে অবাক !

—এগুলো পেলি কোথায় শুনি ? মোটা গলায় হেলেন বল্লে।

—পাহাড়ের উপর একটা বীচগাছের কাছে—নরম গলায় মারুচেকা বল্লে।

হেলেন একাই সবগুলো খেলে—ছোট্ট বোন্ মারুচেকাকে একটুও দিলে না।

এর দিন তিনেক পরে আবার মারুচেকার উপর হেলেনের হুকুম জারী হলো : পাহাড় থেকে লাল আপেল নিয়ে আয়।

—শীতকালে আপেল ? গাছে এখন পাতা নেই আর ফলই বা এখন হবে কি করে ?

—ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না, আপেল আমার চাইই, আর আজই।

মারুচেকা আবার পাহাড়ের দিকে যেতে সুরু করে, আবার সে এসে পৌঁছল বারো মাসের কাছে, তারা ঠিক তেমনি ভাবেই আগুণের ধারে বসে।

—এবার কি চাই ? জানুয়ারী পূর্ব্বকার মত প্রশ্ন করলো।

—লাল আপেলের জন্য এসেছি।

কিন্তু আপেলের সময় তো এটা নয়।

তাতো আমি জানি—কিন্তু আমার দিদি যে কোনও আপত্তি শুনবে না, লাল আপেল না পেলে আমার যে কি হবে !......

মারুচেকা এবার সত্যই কেঁদে ফেল্লে।

জানুয়ারী তার দণ্ড সেপ্টেম্বরের হাতে দিয়ে বল্লে : ভাই তুমি আমার আসনটা এবার নাও।

সেপ্টেম্বর সেই রাজদণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ওপর দোলাল। অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করলো। তুষার মিলিয়ে গেলো, পাতাগুলি বাতাসে উড়ে গেল, এখানে ওখানে দু'একটা গাছে গাছে ফুল দেখা দিলো, মারুচেকা দেখলো একটি আপেল গাছ, রাঙ্গা টুকটুকে আপেলে একেবারে ভরা।

—তাড়াতাড়ি আপেল সংগ্রহ করে নাও—সেপ্টেম্বর বল্লে।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সে গাছ ধরে নাড়া দিল। প্রথমে একটা আপেল পড়লো তারপর আরো একটা।

ঐ যথেষ্ট, এবার তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও—সেপ্টেম্বর বল্লে।

হেলেন তো অবাক !—এ আপেল পেলি কোথায় ?

—পাহাড়ের উপর অনেক আছে।

—তাহলে বেশী করে আনলি না কেন ? নিশ্চয়ই তুই পথে খেয়েছিস।

—না, আমি একটুও দাঁতে কাটিনি, আমি দু'বার গাছ ধরে নাড়া দিয়েছি, প্রত্যেক বারে একটা করে ফল পড়েছে, তারপরই আমাকে তাড়াতাড়ি করে বাড়ী ফিরে যেতে বলা হলো।

এমন আপেল হেলেন জীবনে কখনও খায়নি। দুটোই সে খেয়ে ফেল্লে। খেয়ে তার এত লোভ বেড়ে গেল যে সে নিজে গিয়ে কতকগুলো আপেল পাহাড় থেকে নিয়ে আসবে ঠিক করলো।

তার মা কত বারণ করলেন কিন্তু কারুর কথাই সে কাণ দিল না। গরম পোষাক পরে মাথা ঢেকে সে পাহাড়ের পথ ধরলো। চারিদিক তুষার আর তুষার—হেলেন পথ হারিয়ে ফেল্‌লো, শীতে তার হাড়ে কাঁপুনী ধরলো। হঠাৎ সে দেখলো এক অগ্নিশিখা—অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে সে চলতে লাগলো অবশেষে দেখতে পেলো—প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বারোটা পাথরের উপর বারোজন লোক বসে আছে। সে কোন কথা না বলে আগুণের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের হাত পা গরম করতে লাগলো। কারুর অনুমতি সে নিলো না, একটা মিষ্টি কথাও সে বল্লে না।

—কি জন্য এসেছ ? জানুয়ারী জিজ্ঞাসা করলো।

—তাতে তোমার দরকার কি ? একথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কি অধিকার আছে ?

রুক্ষকণ্ঠে হেলেন তাকে বল্লে। তারপর সে বনের ভিতর প্রবেশ করলো। জানুয়ারীর কপাল কুঁচকে উঠলো, রাগে মুখখানা কালো হয়ে গেল। কোন কথা না বলে সে দণ্ডটী মাথার উপর দোলাতে লাগলো। আকাশ কালো মেঘে ভরে গেল, আগুণ গেল নিভে, ভয়ঙ্কর তুষারপাত হতে লাগলো, ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস বইতে লাগলো। পাহাড়ের চারিধার ঘিরে নামলো ভীষণ ঝড়।

সেই ঝড়ে সেই তুষারপাতের ভিতর হেলেন পথ হারিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

মারুচেকা আর তার মা হেলেনের আশাপথ চেয়ে রইল।

—কিন্তু হেলেন আর ফিরলো না।

মেরুজ্যোতিঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আচ্ছা, সূর্য্যিমামা যদি একদিন উঠতে ভুলে যান, তাহলে কি হবে? তাহ'লে সারাদিন ধরেই অন্ধকার হয়ে থাকবে এবং তখন দিন ও রাত্রির মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পাবে না। দিনরাত্রি তখন হবে একটানা অন্ধকার—কি মুস্কিলটাই হবে ভাবত একবার! দিনের কাজে কত অসুবিধা হবে! আর তখন কত তেল পোড়াতে হবে!

কিন্তু গোটা দিন ও রাত অন্ধকার এমন দেশও অছে। ছমাস সেখানকার লোকে সূর্য্যিমামার মুখদর্শন করতে পায় না। বুঝতেই পাচ্ছ, উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর কথা বলছি। বাংলাদেশের শীতের সকালে সূর্য্যমুখদর্শন না করলে তোমরা বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাক আর সেই মেরুবাসীরা ছয়মাস মোটেই সূর্য্য দেখতে পায় না, তাদের কথা ভেবে দেখ।

সেই অন্ধকারে তারা কি করে কাজ চালায় সেইটা এখন দেখা যাক্। মেরুবাসীরা খাবার জন্য, বল্গা হরিণ, শ্বেত ভল্লুক, শীল মাছ ইত্যাদি শিকার করে থাকে। সেই সব পশুর চামড়া তারা পোষাক হিসাবে ব্যবহার করে এবং সেগুলি থেকে প্রাপ্ত তৈল জাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন করে তাথেকে বাতি জ্বালায়। কিন্তু বাইরের কাজে সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয় আকাশে এক ভগবানের দেওয়া আলো—তার নাম দেওয়া হয়েছে মেরুজ্যোতিঃ (Aurora Borealis)। তার কথাই আজ তোমাদের বোলবো।

মাঝে মাঝে আকাশের প্রান্তে হাওয়ায় শুকনো করতে দেওয়া একখানি চাদরের আকারে এর আবির্ভাব হয়। এই অরোরার আলোকে এত রংয়ের বৈচিত্র্য থাকে সেটা পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর পদার্থের মধ্যেও তাকে সুন্দরতম করে তোলে। অরোরার আলোর খেলায় যেন ভোজবাজীর মত মুহূর্তে মুহূর্তে লাল হতে নীল, সবুজ হতে হলদে বা বেগুনী হতে গোলাপী হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার যেন কোথা হ'তে একটা বাতাস এসে 'অরোরা'কে দিল নাড়িয়ে তাতে দেখা গেল তার ভাঁজে ভাঁজে অসংখ্য রামধনুর ভিড়!

আবার এক এক সময় আকাশের গায়ে দেখা দেয় পর্ব্বতের চূড়ার মতো একটা 'অরোরা' আর মাথার দিকটা হয়ত রক্তবর্ণ আর নীচের দিকে নীলের পর হল্‌দে, হলদের পরে বেগুনী আর তারও পরে সবুজ। মনে হবে যেন কোন বিরাট অগ্নিশালা হতে নেমে আসছে বিভিন্ন গলিত ধাতু স্রোত আর তার বিভিন্ন ধারায় রয়েছে অদ্ভুত রংয়ের সংমিশ্রণ।

বিখ্যাত মেরু আবিষ্কারক ডাঃ ন্যানসেন একটী অরোরার বর্ণনায় বলেছেন, "জাহাজের ডেক 'অরোরা'র আলোকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়েছিল এবং তার বিক্ষিপ্ত রশ্মিজাল যেন বরফের উপরে একটা মায়ার সৃষ্টি করেছিল; সেই সুন্দর দৃশ্য কোন কবিরও ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে না।"

আরও একস্থানে তিনি বলেছেন "আলোটা (অরোরার) প্রথমে ছিল হলদে, কিন্তু ক্রমশঃ একটী সবুজের আভা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল; হঠাৎ আবার নীচের দিকটা অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করলে এবং সেই রংটা সমস্ত অরোরাকে রঞ্জিত করে তুলল।"

মায়ার তুলিকায় রঞ্জিত মেরুজ্যোতিঃ যেন একটী কল্পলোকের আলো যা তোমাদের অপূর্ব্ব আনন্দ দান করতে পারে।

যাই হ'ক আবিষ্কারক 'অরোরার' মায়ার মুগ্ধ হলেও বৈজ্ঞানিক তাঁর কাজ ভোলেননি। তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন এর কারণ আবিস্কারে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সূর্য্যের কলঙ্ক (sun spot) আর চুম্বক ঝড়ের (magnetic storm) প্রাদুর্ভাবের সঙ্গেই সাধারণতঃ মেরু-জ্যোতিঃর আবির্ভাব হয়ে থাকে।

সূর্য্য কলঙ্ক (sun spot) হচ্ছে মোটামুটি এই: সূর্য্যে চারিদিকের উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ সমূহের একটী আবরণ আছে (photosphere)। মাঝে মাঝে হঠাৎ গরম বাষ্পের ঝড়ে এই বাষ্পীয় আবরণ কিছুটা সরে গেলে আমরা সূর্য্যের জ্বলন্ত আকার কিছুটা দেখতে পাই এবং বলি যে সূর্য্য কলঙ্ক দেখা গেল। আর উত্তর দক্ষিণমুখী চুম্বকের কাঁটার হঠাৎ ভিন্নমুখী হওয়াকে বলে চুম্বক ঝড় (magnetic storm)

লামারষ্ট্রোঁ ত ছুটলেন একেবারে ল্যাপল্যাণ্ডে মেরুজ্যোতিঃর কারণ আবিস্কার করবার জন্য। বহু পরীক্ষার পরে তিনি স্থির করলেন যে সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচলের ফলেই এটা ঘটে থাকে। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণও সেই মতের সমর্থন করেন এবং বলেন যে সূর্য্য হতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা (electron) সর্বদা ভীমবেগে বেরিয়ে আসছে এবং এই বিদ্যুৎকণাগুলিই পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের পাল্লায় পড়ে উর্দ্ধদেশের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বায়ুর মধ্যে দিয়া আসবার সময় তাদের পথকে আলোকিত করে জন্ম দেয় মেরুজ্যোতিঃ।

আশা করি তোমরা কেউ কেউ বড় হয়ে মেরু প্রদেশের অভিমুখে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরুবে এবং সেখানে মেরুজ্যোতিঃর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারবে।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হলে ১২ ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

ভাগের ভাগ

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক ছিল বামুন আর এক ছিল বাম্‌নী—
ভারী লোভী ছিল তারা তাই নাকি নাম্ নিই।
ছেলে পিলে ছিল নাকো, তুজনার সংসার।
একদিন হ'লো এক ব্যাপার চমৎকার—
ব্রাহ্মণ কোত্থেকে কই মাছ পাঁচটা
নিয়ে এসে বামনীরে বল্ল—"এ মাছটা
ভাল ক'রে রাঁধ দেখি—আর দেখ শুনছ—
তিনটাই বড় আছে, বাকী সব উঞ্ছ।
আমি খাব বড় বড় ওই মাছ তিনটা।"
বাম্‌নী না তাই শুনে রেগে হ'লো তিনটা

বলে, "মর মুখপোড়া, নচ্ছার, মিন্‌সে—
বিয়ে থেকে জ্বালা দেয় মোরে রাত দিন সে—
কোন মুখে বল্লির‍্যা তুই খাবি তিন্‌টে ?
আমি বুঝি খাবি খাব রেঁধে সারা দিনটে ?"
ব্রাহ্মণ বলে—"কেন ? তুটো তুমি পাচ্ছ—
চিরদিন কি স্বভাব তবুও চেঁচাচ্ছ ?"

"চেঁচাবে না, পুজো দেবে! বয়ে গেছে রাঁধতে।"
এই ব'লে বামনী না বসে গেল কাঁদতে—
"পোড়াকপালী আমারে নেয়নাকো যোম্‌রা!
হায় মাগো! হায় বাবা! কোথা আছ তোমরা ?
মোরে তুলে দিয়ে গেছ রাক্কস হস্তে
নিজে আনে নিজে করে পেটায় নমস্তে।"

ব্রাহ্মণ বলে—"আহা! কি মধুর বাক্যি!
তোরে খেতে দিই কিনা লোকে আছে সাক্ষ্য।
এসেছিলি লিক্‌লিকে এই সরু হাড্‌ডী
কার খেয়ে হলি বল ধর্ম্মের ষাঁড়ড়ি ?
রাঁধবি কি রাঁধবি না—তাই বল পষ্ট ?
আমি তিনটেই খাব—বলে কত কষ্ট
যোগাড় করতে মাছ।" বাম্‌নীটা বল্ল—
"যোগাড়েই এত ক্লেশ ? রান্নাযে কল্ল
তার বুঝি শ্রম আর কিছুইগো হয়না ?
বুঝতাম দিতে যদি খানকত গয়না।
যাই বল তাই বল, দাও খেতে তিনটে
তবে যাই পাক্‌শালে ধরি কড়া চিম্‌টে।
নয় মোর শেষ কথা মাছ যাক্ চুলোতে।"
এই ব'লে লাগলো সে চোখমুখ ফুলোতে।

ব্রাহ্মণও কিছুতেই ছাড়বে না অংশ
তিনটাই চাই তার—নেহাৎ নৃশংস!
বামুনটা যদি ভাই রেঁধে নিতে জান্‌তো
তাহলেই হেথা হ'তো গল্পটী ক্ষান্ত।
নিজে রেঁধে খেয়ে নিত যতগুলো ইচ্ছে—
যাক্ তা হয়নি, শোন, এখন যা হ'চ্ছে।

অনেক অনে-ক খোন ক'রে ক'রে ঝগড়া
ঠিক আর হ'লো নাকো তুজনার বখরা।
সারাদিন তুজনেই নায়নি কি খায়নি,
কেউ কারো চোখে চোখে ভাল ক'রে চায়নি।
বিকেলে বামুন বলে—"এ করা তো লাভ না—
এক কাজ করি এসো ঘুচে যাবে ভাবনা।
বিছানায় তুজনেতে শুয়ে পড়ে থাক্‌বো
চুপচাপ, কেউ কাকে ভুলেওনা ডাবেক্য।

ভুলে গিয়ে যেইজন আগে কথা কইবে—
ছোট কই মাছ দুটী তার ভাগে রইবে।"

বেশ কথা; মাছ ঢেকে শুতে গেল দুইজন—
আগে কথা কইবে না কর্ল জীবন পণ।
দুইদিন দুইরাত কেটে গেল এম্নি
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পড়ে আছে তেম্নি।
কথা কইলেই ভাগে মাছ কম পড়বে—
তাই দাঁতে দাঁত চেপে না খেয়েই মরবে।

প্রতিবেশী বহুজন গাঁয়ে ছিল সব তো
বলে—"এরা গেল কোথা নাই সাড়া শব্দ ?
ব্রাহ্মণ হাটে ঘাটে ফেরে নাকো কইতো ?
বন্ধ ভিতর হতে দরজাও ওইতো!"
তিনদিন কেটে যায় তবু কিছু কিন্‌তে
বামুন বেরোয় নাকো—হল বড় চিন্তে।
গাঁয়ের মোড়লটীরে সাথে নিয়ে কয়জন
দরজার কাছে গিয়ে চীৎকার তর্জ্জন
ক'রে ডাকে বামুনেরে—সাড়া তবু নাইকো
সবে বলে—"দোর ভাঙো! খবর যে চাইগো!
তাদের হয়েছে বুঝি কোন ভালমন্দ—
দোর ভাঙো! ভাঙো!! মোরা মিটাইব সন্দ।"

দোর ভেঙে দেখে—একি!—একেবারে নির্জীব—
মরে গেল নাকি এরা—আহা, কৃষ্ণের জীব!
যতো হাঁকে, ডাকে তবু উত্তর পায় না।
বামুন শুনতে পায়, চোখ মেলে চায় না—
পাছে কথা ক'য়ে ফেলে সেই তার ভয় গো—
তিন্‌টার জায়গায় দুই পাছে হয় গো।
বাম্‌নীরও সেই ভয়—দুজনেই তাইতে
মোটে ইচ্ছুক নয় কইতে কি চাইতে।

দেখে শুনে যত সব প্রতিবেশী বল্ল—
"দুজনেই দেখি এরা একসাথে সরল।
ভাল ভাল"—বলে সবে দুজনার ভাগ্যে!
বলে, "ওরে, নে যাবার লোকজন ডাক্‌গে।"
ক্রমে ডাকাডাকি শুনে আরো লোক আস্‌ল—
কেউবা কাঁদলো দেখে কেউ ফের হাস্‌ল।

বাঁশ আর দড়ি এনে, লেগে গেল বান্‌তে
বামুণবাম্‌নী দু'য়ে—কি শাস্তি জ্যান্‌তে
সামান্ত কই মাছ তারি লাগি হায়রে—
বাম্‌নী বামুন বুঝি প্রাণে মারা যায়রে!
শ্মশানে সাজায়ে চিতা প্রতিবেশীবর্গ
তুলে দিল দুজনারে। "অক্ষয় স্বর্গ
পাক তারা"—বলে যেই ছোঁয়ায়েছে অগ্নি—
থাকিতে না পারি আর ব্রহ্মণ পত্নী
চেঁচায়ে উঠিল জোরে—"খাব দুটো খাবরে!"
অম্‌নি বামুন বলে—"তিনটাই পাবরে!!"

পোড়াতে গেছিল যারা তারা বলে—"বাপরে!
দুজনেই দানা পেয়ে উঠেছে কি পাপরে!
পালা পালা ওরে ভাই, নয় দফা সারবে—
ভূতে পেত্নীতে মিলে আজ প্রাণে মারবে।"
যত বলে তত ছোটে প্রাণভয়ে ভাইরে—
দিক্ কি বিদিক জ্ঞান তাদের যে নাইরে!
ওদিকে বামুনও ছোটে বাম্‌নীর সঙ্গে—
"খাব খাব" রব তারা করে নানা রঙ্গে।

বাড়ী ফিরে এসে দেখে—কই মাছ কইরে?
বেড়ালে খাইয়া গেছে—দুখ কারে কইরে!!!

অপদেবতা

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সরাইখানাটা ঠিক সহরের বাইরে। কাছেই প্রকাণ্ড একটা বন। এই বনে নানারকম জন্তু জানোয়ারের বাস। স্থতরাং শিকারীদের আগমন প্রায়ই হয়ে থাকে। যারা শিকারে আসে তারা এই সরাইখানাতে রাত্র কাটায়। সরাইখানার ব্যবস্থা মন্দ নয়।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তিনজন ভদ্রলোক সরাইখানার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন এরা তিনজনই শিকারী। প্রত্যেকের পিঠে একটী করে ঝোলা। একজনের হাতে একটী প্রকাণ্ড মরা হরিণ।

দরজা খুলে গেলে প্রথম ভদ্রলোক সরাইখানার মালিককে উদ্দেশ করে বল্লেন, "আজকের রাতটা আমরা এইখানে কাটাতে চাই।"

সরাইখানার মালিক বল্ল, "স্বচ্ছন্দে! আপনাদের কৃপাতেই ত এই জনমানবশূণ্য স্থানে কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছে।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বল্লেন, "দেখ, আমাদের আজকে এই মরা হরিণের সুস্বাদু মাংস খেতে বড় সাধ হয়েছে। তুমি একে নিয়ে গিয়ে বেশ ভালরকম মাংস তৈরী কর।"

সরাইখানার মালিক প্রস্থানোদ্যত হলে দ্বিতীয় ভদ্রলোক তাকে বাধা দিয়ে বল্লেন, "......আর পারত এক্ষুনি তিন কাপ চা পাঠিয়ে দাও।"

বাইরে তখন উত্তুরে হাওয়া বইছে। নীল আকাশে ধীরে ধীরে কালো মেঘের আবির্ভাব হচ্ছে—যেন কালো পিচ্ ঢালা রাস্তা। আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় ভাঙা-তলোয়ারের মতো একটুখানি চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তার নরম আলো গলে' গলে' পড়ছে সেই সরাইখানার নীরব মৌনতার ওপর, কিন্তু সেটা যেন ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই বোধ হয় জোর বৃষ্টি নামবে!

গরম চায়েয় পেয়ালায় চুমুক্ দিতে দিতে প্রথম ভদ্রলোক বল্লেন, "আজকের 'ওয়েদারটা' বেশ ল্যাগ্‌ছে। এমনি দিনে গল্প জমে ভাল।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি সমস্বরে বলে উঠ্‌লেন, "সত্যি, এমন দিনে খোস্ গল্প না ক'রে এমন কিছু শুন্‌তে চাই যাতে 'ডিনারে'র সময় না হওয়া পর্য্যন্ত চমকপ্রদ হয়ে থাকতে হবে।"

কিছুদূরে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ ও ষাটের মাঝামাঝি হবে। এতক্ষণ তিনি একটী কথাও বলেননি। তাঁকে দেখেই বোঝা যায় যে তিনি জাতিতে ইংরাজ বা ফরাসি ন'ন। কিন্তু তিনি যে কোন্ জাত তা' বলাও শক্ত। বেঁটে বেঁটে মোটা আঙ্গুল—দড়ির মতো শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দাড়ির নীচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে।

এই ষাট বৎসরে তিনি যে পৃথিবীর প্রায় সবরকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা' তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। নানারকম ঝড় ঝঞ্ঝাও বোধ হয় তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

প্রথম ভদ্রলোক সেই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "মঁসিয়ে, আপনিত এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে একটা কথাও বল্লেন না! আপনাকে দেখে মনে হয় শিকারেই আপনি এতদিন জীবন কাটিয়েছেন।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রশ্ন কর্‌লেন, "মঁসিয়ে, কিছু যদি মনে না করেন, তা'হলে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি জাত এবং আপনার নামই বা কি?"

সেই বৃদ্ধের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মিশানো অদ্ভুত ধরণের হাসি দেখা গেল। লোকটা বল্লে—"সরে এসো কাছে। আগেকার মতো চেঁচিয়ে কথা বলার সামর্থ্য আর নেই।"

তিন বন্ধু তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে তিনি বল্লেন, "ইয়্যাং মেন, তোমরা জানতে চেয়েছ আমার নাম কি ও আমি কি জাত। আমার নাম ভিয়েগোভিন্‌ডিসি। আমি জাতিতে "পর্ত্তুগীজ্"।"

তৃতীয় ভদ্রলোক বল্লেন, "এমন জমকালো দিনে আমরা আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের কাছে এমন কিছু শুন্‌তে চাই যা আমাদের মনে রেখাপাত কর্‌বে।"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বল্লেন, "কিসের বিষয় শুন্‌তে চাও?"

"শিকারের ঘটনাই আমাদের বেশী ভালো লাগে;"—তিন বন্ধু বলে উঠ্‌লেন।

ভিন্‌ডিসি বল্লেন—"দেখ বাপু. তোমরা আমাকে শিকারী ভেবে ভুল করেছ। আমি বন্দুক ছুঁড়তে জানি বটে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তোমাদের মতো পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে জন্তু জানোয়ার শিকার করতে বেরুইনি। কি জানি কেন, ও কাজ আমার মোটেই ভালো লাগে না। তবে মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে কর্‌তে হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে প্রাচীন যুগের 'টেরোড্যাক্টিলের' কিম্বা তা'দের সুদূর বংশধরদের বিষয় কিছুই বল্‌তে পারবো না। তোমাদের আমি যে ঘটনার কথা বল্‌ব তা' আজও আমার কাছে একটা রহস্য।"

ভিন্‌ডিসি বল্‌তে লাগ্‌লেন।

"ইয়্যাং মেন, তোমাদের বয়স কত হবে? কুড়ি কিম্বা বাইশ?......আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা, ১৮৮৯-৯০ সালের দিকে আমি ও আমার এক বন্ধু কেপ্ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়স ছিল কম, দুনিয়ার কোন বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য কর্‌তাম না। আপিংটন সহর থেকে জিনিষপত্র কিনে দুজনেই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল একজন কাফ্রী ভৃত্য ও দুটী গাধা, জিনিষপত্র বইবার জন্য।

" 'ভাল' নদী পার হয়ে চলেছি, পথ ও দেশ সম্পুর্ণ অজ্ঞাত। শুধু ছোটখাটো পহাড়, ঘাষ, মাঝে মাঝে কাফ্রীদের বস্তি।

"চমৎকার লাগ্‌ছিল দিনগুলি। মাথার ওপরে পাৎলা নীল সিল্কের মতো আকাশখানি পতাকার মত যেন হাওয়ায় কাঁপছিল। আকাশকে আমি চিরকাল দেখে এসেছি কিন্তু সেদিনকার মতো তাঁকে আর কোনদিন আমলে আনতে পারিনি। তার কারণ বোধ হয়

কদিন পরে আকাশকে আর দেখ্‌তে পাবনা বলে। আমাদের চতুদ্দিকে ঘিরে থাকবে গভীর 'ইকিউটোরিয়ান' অরণ্যের 'ইউকা' গাছের লম্বা লম্বা পাতাগুলি।......

"কিছুদিন পরে সত্যিই আমরা ঘোর বনে প্রবেশ কর্‌লাম। কত বড় বড় গাছ, বড় বড় ফার্ণ, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বন নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। বড় বড় গাছের নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন। বঁড়শির মতো কাঁটাগাছের গায়ে, মাথার ওপরকার পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্য্যের আলো প্রবেশ কর্‌তে পারে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। বেবুনগুলোর উৎপাত জঙ্গলের সর্ব্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানারকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখ্‌লাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—দু' একটা বুড়ো সর্দ্দার বেবুন সত্যই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাক্‌লে তারা অনেকেই আমাদের আক্রমণ কর্‌ত। সঙ্গী বল্লে—অন্ততঃ আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

"দিন বেশ কাট্‌ছিল। সকালবেলায় বেবুন বা হরিণ মেরে আনতাম তাঁবুতে। সঙ্গে যে চাকরটাকে এনেছিলাম সে যদিও এদেশের অধিবাসী, কিন্তু সহরের সভ্য লোকের সংস্পর্শে এসে রান্নার কাজ কিছু শিখেচে। সে শিকারগুলিকে সুস্বাদু করে তুল্‌ত চমৎকার ভাবে রেঁধে। সুতরাং কিছুমাত্র অসুবিধা আমাদের ভোগ কর্‌বার কথা নয়, করিওনি। সমস্ত সকাল ও বিকাল আমরা এগিয়ে চল্‌তাম এবং সন্ধ্যা হলেই তাঁবু ফেলেই বিশ্রাম নিতাম। কিন্তু হঠাৎ—"

কথা শেষ না করেই ভিন্‌ডিসি চুপ কর্‌লেন। তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। তাঁর মুখ দেখে তিন বন্ধু অবাক হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন মরা মানুষের মুখ।

তারা তিন জনেই অস্বস্তি বোধ করলে। বল্‌ল, "তারপর?"

ভিন্‌ডিসি আবার ভাল করে ঝেড়ে বস্‌লেন। বল্‌লেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম?"

তিন বন্ধু বল্ল, "অভিযানের কথা।"

ভিন্‌ডিসি বল্‌তে লাগ্‌লেন:

" 'ইকিউটোরিয়ান' অরণ্যে বছরের সব সময় বৃষ্টি পড়ে। সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। পর্ব্বতের ঢালু বেয়ে যেন হাজার ঝরণার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নীচে নাম্‌ছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। এতটা উঠেছি আমরা, কিন্তু প্রতি হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতল ভূমির অরণ্য ভূমি বলে মনে হচ্ছে। কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কত টুকুই বা উঠেছি, ঐটুকু তো।

"অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন আমরা সারাদিন উঠ্‌লাম। উঠ্‌ছি, উঠ্‌ছি, উঠ্‌ছি—আমি আর পারি না। কাপড়-চোপড় জিনিস-পত্র, তাঁবু, ভিজে একশা, একখানা রুমাল পর্য্যন্ত নেই কোথাও—আমার কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্ব্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা, আমার তখন মনে হ'ল—এই অজানা দেশের অজানা পর্ব্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্র জন্তু সঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি মুখর সন্ধ্যায় কোন অনির্দ্দেশ্য সোনার খনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে আমি চলেছি কোথায়?

"কিন্তু আমার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে যখন নির্ম্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠ্‌ল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নামগ্নী রজনীর বর্ণনা নেই। আমি আর পৃথিবীতে নেই, পর্ত্তুগাল বলে কোন দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে—আমি আর কোথাও ফিরতে চাই না, স্বর্ণ চাই না, অর্থ চাই না—পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বহু উর্দ্ধে এক কৌমুদীশুভ্র দেবলোকের এখন আমি অধিবাসী। কোন মানুষ চোখে এর আগে তা কখনো দেখেনি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোন মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল ঐ পাহাড় ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্কচিৎ ঘটে।

"সেই রাত্রে ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠলাম বন্ধুর ডাকে। বন্ধু ডাক্‌ছে—ভিন্‌ডিসি, ভিন্‌ডিসি, বন্দুক বাগাও—

"—কি-কি—বলে আমি উঠে বস্‌লাম। তারপর কাণ পেতে শুনলাম—তাঁবুর চারিপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোর নিশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশী, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলছে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

"হুড়মুড় করে একটা শব্দ হ'ল—গাছপালা ভেঙ্গে একটা জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। যেন তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেচে, এখন আর অতর্কিত শিকারের সুবিধা হবে না, বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝ্‌তে পেরেছে। জানোয়ারটা যাই হোক না কেন তার যেমন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।...

"পরের দিন প্রাতে দেখি বন্ধু তাঁবুর চতুর্দিকে ঘুরে মাটির ধূলোয় কি যেন দেখ্‌ছে। জিজ্ঞেস কর্‌লাম, কি দেখ্‌ছ?'

"বন্ধু বল্‌লেন, দেখতো এই পায়ের ছাপটা কিসের? এই ছাপটা সিংহের থাবার চেয়ে ঢের বড়। অথচ আর কোন জন্তুরই বা হতে পারে? আমার মনে হয় গত রাত্রের অজানা অতিথির পদচিহ্ন।

"বাস্তবিক তাই। পর পর কটি বড় বড় থাবা তাঁবু থেকে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। তিনটী মাত্র আঙ্গুলের দাগ মাটির উপর সুস্পষ্ট। এতবড় দাগ স্বচক্ষে না দেখ্‌লে আমি জীবনেও তা' কল্পনা কর্‌তে পারতাম না। চাকরটাকে ডাকলাম। থাবার চিহ্ন দেখা মাত্র লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগ্‌ল। তা'র মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিলে। আমরা তাকে ধরে ফেল্‌বার আগেই সে আছাড় খেয়ে পড়্‌ল আমার পায়ের উপর। তারপর পা চেপে জড়িয়ে ধরে কাটা জন্তুর মতো কাৎরাতে লাগ্‌ল আর তাদের দিশি ভাষায় অনর্গল কি যে বল্‌তে লাগ্‌ল তার এক বর্ণও বুঝ্‌লাম না।

"হাত ধরে তাকে দাঁড়করালাম, বল্‌লাম, 'কি ব্যাপার'? কোন রকমে বল্‌লে, আর এক মিনিটও এখানে থাকা উচিত নয়। চলুন পালাই।"

"—কেন?—আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম। লোকটা থাবার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিলে।

"—কিসের থাবা ওটা?

"লোকটী কেবল বল্‌ল, বুনিপ !

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'বুনিপ ? সে কি ?' লোকটী বল্‌ল, 'দেবতা।' আমরা হো হো করে হেসে উঠ্‌লাম। আমাদের হাসি শুনে লোকটা সভয়ে চারিদিকে চাইলে যেন হাসিটা দেবতার কানে গেল কিনা দেখে নিলে। ব্যাকুল ভাবে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, 'চলুন পালাই। এখানে থাক্‌লে মারা যাব।'

"আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লাম, ভয় নেই। আমদের কাছে রাইফ্‌ল্‌ আছে। তুমি বল, বুনিপ্‌ কেমন দেখ্‌তে ?

"লোকটী ঘাড় নেড়ে বল্‌ল, 'তা কেউ জানে না।'

"আমরা অবাক হয়ে বল্লাম, 'কেউ দেখেনি ?' সে বল্‌ল, 'দেবতাকে দেখা যায় না।' আরো কিছু বল্‌বার তা'র ইচ্ছা ছিল কিন্তু অকস্মাৎ থেমে গিয়ে ভয় ব্যাকুল চীৎকার করে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখি আমার বন্ধু ইতিমধ্যে কখন ভিতর থেকে রাইফ্‌ল্‌ এনে লক্ষ্য করছে। সুমুখের পাঁচ ছয় হাত উঁচু ঘন ঘাসের জঙ্গলের মাঝখানে ঘাসগুলো কার স্পর্শে নড়্‌ছে।

"এক মুহূর্ত্তও নয়। চক্ষের পলকে বন্ধুর হাতের রাইফ্‌ল্‌ গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, গুড়ুম, গুড়ুম......। আমাদের চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুও ছুটল জঙ্গলের দিকে। কিন্তু তাকে জঙ্গলের কাছ পর্য্যন্ত ছুটতে হ'লনা। ঘাসের জঙ্গল দু' ফাঁক করে একটী অদৃশ্য রেখা তীরের মতো বেগে বাইরের দিকে বেরিয়ে এল। বন্ধুর একটা অস্ফুট চিৎকার শুনতে পেলাম, 'সাক্ষাৎ শয়তান—পালাও, পালাও। তারপর আমার চোখের সামনে, খোলা মাঠে কার সঙ্গে যে তা'র মল্লযুদ্ধ বাধ্‌ল কিছুই বোঝা গেলনা। কিন্তু বোঝা গেল, কি যেন একটা অদৃশ্য জন্তু তাঁকে জাপ্‌টে ধরেছে। কার একটা দুরন্ত ফোঁসফোঁসানিও শোনা যাচ্ছে। কে যেন তাকে একবার আকাশে ওঠাচ্ছে, একবার মাটীতে ফেলছে, একবার বন্‌বন্‌ করে চারিদিকে ঘোরাচ্ছে।

"আমি বিস্ময় ও আতঙ্কে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসতে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম রাইফ্‌ল্‌। কিন্তু যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। রণভূমি শান্ত, নীরব।

"বন্ধুর কাছে পেলাম। তা'র দেহে জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। বুনিপ্‌ তার বুক চিরে দিয়ে গেছে। পড়ে রয়েছে ময়দার তালের মতো তার প্রাণহীন দেহটী।

"সেই দিনই আমি আপিংটন অভিমুখে যাত্রা কর্‌লাম।"

ভিনডিসি ধীরে ধীরে তিন বন্ধুর দিকে চাইলেন। অনেকদিন পরে হারানো বন্ধুকে স্মরণ ক'রে অথবা যেই কারণেই হোক তাঁর চোখে একটী বিন্দু জল টল্‌ টল্‌ কর্‌ছিল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বল্‌লেন আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। এ নিয়ে আমি অনেক গবেষণা করেছি। আমার দৃঢ় ধারণা, বুনিপ্‌ দেবতা নয়, অশরীরী ভূতপ্রেতও নয়, আস্ত রক্তমাংসের দেহধারী জন্তু।

তিনবন্ধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "সেকি ! রক্তমাংসের শরীর দেখা গেল না কেন ?"

ভিনডিসি দেশলাই জ্বেলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বল্‌লেন, "এই জন্যে দেখা

গেলনা যে, অনেক রঙই আমাদের চোখে পড়ে না। যে ক'টা রঙ আমরা জানি তা ছাড়াও রঙ আছে, কিন্তু আমাদের চোখ তা ধরতে পারে না। এ জগতে শব্দের তরঙ্গও চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান এবং তা, শাশ্বত। কিন্তু আমাদের কাণ সব শব্দ শুনতে পায়না। তোমরা মনে কোর না, হারমোনিয়ামের পর্দ্দায় যে কটা স্বর আছে তা ছাড়া আর সুর নেই। আরও আছে। খাদের দিকেও আছে চড়ার দিকেও আছে। কিন্তু আমাদের কাণ এমন একটী পর্দ্দায় ঢাকা যা'র জন্য সে সব রকম শব্দ ধরতে পারেনা। এখন কত শব্দই আমরা শুনতে পাইনা। কত রঙই যে দেখতে পাইনা তার ইয়ত্তা নেই। যে অদৃশ্য বুনিপের কথা তোমাদের কাছে বল্‌লাম, তারও এই রকম কোন একটা রঙ হবে। নইলে মাটিতে যার থাবার সুস্পষ্ট চিহ্ন, যার পেষণে একটা বলিষ্ঠ মানুষ মারা পড়ে, তাকে দেখতে পেলাম না কেন ? আমার কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে তোমাদের বোধ হয় কষ্ট হবে, কিন্তু ভেবে দেখ।"

খানিক পরেই ডিনারের সময় সঙ্কেত হ'ল। তিন বন্ধু নীরবে উঠে গেল সেখান থেকে।

বাইরে তখন আকাশ পরিষ্কার। সেই গ্রীষ্ম রাত্রির সঙ্গে দূরের মর্ম্মরিত পাইন্‌ গাছগুলির রঙ্গে কোথাও অসামঞ্জস্য নেই। বড় মিষ্টি, বড় করুণ সে সুর। করুণ কান্নার ঢেউ তুলে' তা' যেন এই নিঝুম প্রকৃতির বুকে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে! কখনো সে সুর উঠেছে চড়ায়——সমস্ত প্রকৃতি তখন যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর নামছে সে সুর কোমল হয়ে, মৃদু থেকে মৃদু হয়ে ত' যেন মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের বুকে তার সেই সঙ্গে হাওয়ায় ভরা গ্রীষ্মের রাত্রি গভীর বেদনায় যেন ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস !*

ম্যাজিকের কারসাজি

যাদুকর—শ্রীঅশোক কুমার সরকার

(১নং খেলা)

গতবারে শুধু যাদুবিদ্যা নিয়েই অনেক কথা বলেছি, এবার থেকে তোমাদের মাসে, মাসে একটা করে মজার ম্যাজিক শিখিয়ে দেব। প্রথমে শেখ, তারপর দেখানো, বুঝেছ! ম্যাজিক দেখতে হলে প্রথমে একটা জিনিষ করাতে হবে। কি ? এক স্যুট কালো রংয়ের পোষাক, নাহলে ম্যাজিক হবেও না। গত প্রবন্ধে Improptu Trick সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেছিলুম, আজ তোমাদের ঐ Trick এরই কৌশল শিখিয়ে দেব।

Magic শিখতে গেলে প্রথমে তাসের খেলা বা Card Tricks শিখতে হয় হাওয়ার্ড

*বিদেশী গল্পের অনুবাদ।

থার্স্টন (Howard Thurston) নামে একজন সাহেব এই তাসের সব রকমারি খেলা আবিষ্কার করেছিলেন বলে তাঁকেই "তাসের রাজা" বা King of Cards বলা হয়। এছাড়াও আমাদের দেশে কোন যাতুকরের কাছে ম্যাজিক শিখতে গেলেই প্রথমেই তিনি শেখান তাসের খেলা সুতরাং আমিও আজ তাসের একটা খেলা নিয়েই আরম্ভ করব।

তাসের খেলা যখন আমরা শিখেছিলুম তখন ধরাবাঁধা ১০৮টী খেলা মন দিয়ে শিখতে হত—ভয় নেই! তোমাদের তা বলে ১০৮টায় নিয়ে যাব না আমারও তো ভয় আছে, সব শেখালে! এখন Card Tricks বা তাসের খেলা শিখতে গেলে কিনতে হবে একজোড়া খুব ভাল মসৃণ আর মাঝারি সাইজের তাস। প্রথমে Packটী নিয়ে বেশ করে ফাঁটাতে শিখতে হবে আর তাসটাকে খুব Handy অর্থাৎ সেটী ঘেঁটে ঘেঁটে বেশ ছট্‌পটে করে' তুল্‌তে হবে। তাড়াতাড়ি তাস দেওয়া, ফাঁটান প্রভৃতি চলনসই হলে তারপর খেলা। এখন একটা খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি—এর নাম হচ্ছে Wonderful Card Trick অথবা "আশ্চর্য্য তাসের ম্যাজিক।" খেলাটী হচ্ছে এই রকম:— যাতুকর প্রথমে এক প্যাকেট তাস নিয়ে সকলের সামনে এলেন, একখানা তাস সেই প্যাকেট্‌টীর ভিতর থেকে নিতে বল্‌লেন, যাঁরা দেখছিলেন তাঁদের ভিতর থেকে একজন মহাউল্লাসে ছুটে এসে প্যাকেট্‌টীর ভিতর থেকে একখানি তাস অতি সন্তর্পণে বের করে নিলেন। ম্যাজিসিয়ান কোন রকমেও সেটা দেখ্‌তে পেলেন না, যাতুকর চোখ খুলে নিলেন বলে তাঁকে আবার চোখ বন্ধ করার জন্য বলা হল, তিনি বেচারী চোখ বন্ধই করলেন। এত হৈচৈ করে একখানি তাস টেনে নেওয়া হল। খুব সাবধানে সেটা কয়েকজনকে দেখান হল—অবশ্য হাত আড়াল করে, নয়ত যাতুকর দেখে নিতে পারেন! তারপর এল তাসটীকে প্যাকেটে ঢোকাবার পালা। এবারও খুব সন্তর্পণে যাতুকরকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বলা হল, তিনি তাড়াতাড়ি চোখ বুজলেন তাসও ঠিক মাফিক ঢোকান হল। এইবার যাতুকরের তাসটী বের করে দেওয়া পালা। তিনি কয়েকবার তাসগুলিকে কাঠের ওপর চেপে ধরে—হ্যালো? হ্যালো? করে বলে দিলেন যে লোকটী হরতনের তু'ফোটা টেনেছিল।

এ খেলাটীর কায়দা অনেক রকম আছে, অর্থাৎ, বহু প্রকারে ঐ খেলাটী দেখান যেতে পারে। ১নং উপায় তাসটী আগে থেকে দেখে নিয়ে force করা যেতে পারে। ২নং হচ্ছে প্রথমে যখন লোকটী তাস টেনে নিলেন, ও তারপর ঢোকালেন সেই সময় আঙ্গুল দিয়ে একটু ফাঁক করে রেখে সেটাকে ফাঁটাবার সময় নিচে এনে দেখে নিতে পারেন। ৩নং কায়দা হলো প্যাকেটের সব তাসগুলি হরতনের তুই হলে হয় অর্থাৎ অনেক প্যাকেট থেকে একখানি করে হরতনের তুই তুলে নিলে আলাদা Pack করা যেতে পারে, এবং তার যেখান থেকে খুসী নিলেই সেটা হরতনের তুই হবেই!

৪নং কায়দায় আরও সহজ পন্থায় করতে পার, যেমন—প্যাকেট থেকে একখানা তাস দর্শক টেনে নিলেন তারপর তিনি যখন তাসটীকে ঢোকাতে যাবেন সেই সময় একখানি চিহ্নিত তাস সেই টেনে নেওয়া তাসটীর ওপর রাখলেই হবে। তারপর সুবিধা মত সেটা বের করে নিয়ে দেখালেই চল্‌বে।

এইত গেল একটা খেলার কৌশল। এবারে আরো একটা খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি। এটীতে একটু বুদ্ধি খাটাতে হয়।

প্রথমে কুড়ি খানা তাস নিয়ে দশ জোড়া করে সাজিয়ে রাখ। তারপর দর্শকদের সেই দশ জোড়ার ভিতরে যে কয় জোড়া খুসী মনে করতে বল। তারপর সমস্ত তাসগুলিকে জোড়া জোড়া করে একসঙ্গে গুছিয়ে নিয়ে নীচের কবিতা অনুযায়ী সাজাও,—

বাঙ্গালা কবিতা:—

কবে যাবে রে
সেই সমাজে,
ছাড় কু-ইচ্ছা
পোড়া পামরে।

১ ক	২ বে	৩ যা	৪ বে	৫ রে
৬ সে	৭ ই	৮ স	৯ মা	১০ জে
১১ ছা	১২ ড়	১৩ কু	১৪ ই	১৫ চ্ছা
১৬ পো	১৭ ড়া	১৮ পা	১৯ ম	২০ রে

প্রথম জোড়ার প্রথম তাসখানি ১ চিহ্ন দিয়ে 'ক'তে দ্বিতীয়খানি ১৩ চিহ্ন দিয়ে 'কু'তে রাখবে। তারপর তার নিচের দ্বিতীয় জোড়া থেকে একখানা তাস নিয়ে ২ চিহ্ন 'বে'তে তারপর ৪নং 'বে'তে রাখ। তৃতীয় জোড়া থেকে প্রথম তাসখানা ৩নং 'যা'তে এবং দ্বিতীয় খানা ১০নং 'জে'তে রাখ এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে সমস্ত তাসগুলো সাজাও। এইবার দর্শকদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, তাঁদের তাস কোন্ কোন্ লাইনে আছে। তিনি যে যে লাইনে বা যে কোন একটী লাইনে বলবেন, সেই সেই লাইনে বা সেই একটী লাইনে যে তু'টো এক রকমের অক্ষর আছে, সেই সেই অক্ষরের তাস তু'খানি মনে করছেন জানবে। মনে কর, যদি তিনি বলেন, আমার তাস তু'খানি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে আছে।"—তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭নং 'ই' এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ১৪নং 'ই'তে যে যে তাস আছে সেই তাস তু'খানি তিনি মনে করেছেন। আবার যদি কেউ বলেন, "আমার তাস কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে আছে, তাহলে ১৬নং 'পো' আর ১৮নং 'পা'তে যে তু'খানি তাস আছে, সেই তুটোই তাঁর মনে করা। এ খেলাটীর নাম thought reading by card বলতে পার।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

—দশ—

শিশিরের লম্ফ ঝম্ফ

এবং বল্‌তে না বল্‌তে—

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—ভো-ও-ও-ও-ও ঔ।

সেই ডালকুত্তারা সদলে, ভয়ানক হৈ চৈ ক'রে' এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

এবং শিশির আর লিলি আবার ভোঁ-দৌড়!

"জানিস্ লিলি, যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কখনো কাম্‌ড়ায় না।" দৌড়তে দৌড়তেই শিশির জানায়।

লিলি শুধু বলে: "উঁহু।" এর বেশি বাক্যব্যয় করে' নিজির অভিমত জানাতে সে অপারগ। দৌড়তে দৌড়তে কথা বলা কেবল তার দাদার পক্ষেই সম্ভব। এবং কুকুরদের পক্ষেও অসম্ভব নয় দেখা যাচ্ছে।

"এসব ডালকুত্তারা কাম্‌ড়াবে কিনা কে জানে?" শিশির বলে।

দৌড়তে দৌড়তেই সন্দেহটা ব্যক্ত করে, দাঁড়াবার তার সাহস হয় না।

কুকুরদের মধ্যে যারা বাক্‌পটু, বিবৃতি দিতে বিশারদ, কাম্‌ড়াবার তাদের উৎসাহ কম, একথা অনেকদিনকার জানা কথা। কিন্তু সে কথা কাজের কথা কিনা, রচনার খাতায় ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগানো যায় কিনা, এই সঙ্কটাপন্ন সুযোগে পরীক্ষা করে' দেখতে তাদের ভরসা হয় না।

এরাও—এই সব কুকুররাও—বক্তৃতা ছড়াতে ছড়াতে—ইস্তাহার বিলি করতে করতেই আস্‌ছে বটে—কিন্তু এদের মুখের কথায় কি আস্থা স্থাপন করা যায়? এরা যদি ততটা ভদ্রলোক না হয়?

"তুই কি বলিস্ লিলি? এই সব কুকুরদের—?"

এদের অভিভাষণে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না, এই কথাটাই শিশির জান্‌তে চায়।

লিলি কিছুই বলে না, বল্‌বার তার শক্তিই নেই—কিম্বা এবিষয়ে বলা বাহুল্য মাত্র,

এই হয়ত তার বক্তব্য। সে আরো জোরে পা চালাবার চেষ্টা করে, যা বল্‌বার মুখে না বলে, পায়ের সম্মুখেই ব্যক্ত করতে চায় বোধ হয়।

"উঁহু যেরকমধারা চেঁচাচ্ছে, এরা যেন কাম্‌ড়ে দেবে বলে' মনে হচ্ছে। এসব ডালকুত্তাদের কাছে ডাল গলানো যাবে না।" লিলির মতের অপেক্ষা না রেখেই শিশির নিজের অনাস্থা-জ্ঞাপন করে।

"আর কাম্‌ড়াতে আরম্ভ করলে—সুরু করলে একবার—বাব্‌বাঃ—"

সেই ভয়াবহতা শিশির ভাষায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে না, তার মানসনেত্রের সাম্‌নে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়,—তার প্রতি পদক্ষেপে, দ্রুতগাতর সঙ্গে তাল রেখে, সেই একান্ত আসন্ন দুর্ঘটনা, সিনেমা ফিল্‌মের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পরিস্ফুট হতে থাকে।......

এক ডজন বুভুক্ষু ডালকুত্তা খাই খাই করতে করতে তাদের দুজনের ঘাড়ে এসে পড়েছে—ছজন করে' পার্ হেড্—ভালো করে'—খতিয়ে হিসেব করলে তিনজন করে' পার্ লেগ্—কেননা হাতের নাগালে পাওয়া মাত্রই ওরা পায়েই এসে কামড় বসাবে—পলায়নের যন্ত্রটাকেই ধ্বংস করবে সব আগে—পা থেকেই উদরস্থ করতে সুরু করবে। তারপর পা থেকে হাতে—হাত থেকে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে! নাক কাণ চোখ মুখও তারা বাদ দেবে না, অবহেলা করবেনা নিশ্চয়, তাদেরকেও ছিঁড়ে খুঁড়ে খুব্‌লে খাব্‌লে পেটের মধ্যে পাচার করে' দেবে সন্দেহ নেই—কিন্তু ওগুলো তারা খুব সম্ভব, শেষের দিকে, চাট্‌নি কিম্বা সন্দেশের মত আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়েই খাবে—ভোজনের প্রোগ্রামটা খাদ্যপরাম্পরা এই ভাবেই অগ্রসর হয়ে সমাপ্তিতে গিয়ে পৌছনো উচিত—তবে আহার্য্য বস্তুর অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধে ডালকুত্তাদের কতটা বাছবিচার, খাদ্যদ্রব্যের কোন্‌টা স্থূল তার কতখানি ওদের বোধশক্তি, এবিষয়ে ওদের সুরুচি বা সৌখীনতা কদ্দুর দৌড় তার কোনই ধারণা শিশিরের নেই। হয়তো ওরা প্রথমেই এসে, উঁচু দেখে, শিশিরের নাকটাকে ঘেউ করে' কাম্‌ড়ে দেবে, প্রথম-দর্শনেই সাব্‌ড়ে দেবে এক কামড়ে—ঠিক আচারের মতো আচরণ করবে কিনা কে জানে! ভাব্‌তেই শিশির শিউরে ওঠে!

কিন্তু কতক্ষণেরই বা ভাবনা? ওদের দুজনকে পিক্‌নিক করে' ফেল্‌তে বারো জনার পক্ষে আর কতক্ষণ?

তারপর আহার সমাধা করে' বিজয়গর্ব্বে ওরা ফিরে যাবে—প্রত্যেকে এক একখানা হাড় মুখে করে'—ওদের দুই ভাই বোনের ভগ্নাবশেষ! ওদের চোখে দীপ্ত চাহনি, এবং হয়ত বা, মুখের কোণে মুচ্‌কি একটু হাসি!

তখন নিঃশব্দে ওরা ফিরে চলেছে—যদিচ তখনো ওদের মুখে বিবৃতি—সেই হাড়!

সিনেমার একেবারে সামানায় এসে, The End কল্পনা করতেই শিশিরের রোমাঞ্চ হয়।

ডালকুত্তারা তখন খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—তাদের হাঁক ডাক প্রায় ওদের কান ধরে, টান্ লাগাচ্ছে বল্‌তে গেলে!

ভৌ—ভৌ—ভৌ—!

সংস্কৃত ভাষায় ওর মানে দাঁড়ায় : "ভো ভো! ওহে—অত দৌড়চ্ছ কেন? আরে শোনো শোনো! একটু দাঁড়িয়ে যাও!"

শিশিরের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে তড়াক্ করে' এক লাফ মারে—নিজে লাফিয়ে উঠে, তারপরে লিলিকে টেনে তুলে নেয়।

—এগারো—

কুকুর আর মুকুর

উঁচু রোয়াক-ওয়ালা ছোট্ট একখানি ঘর। তাদের জন্যেই পথের ধারে অপেক্ষা করছিল যেন! একখানিই মাত্র ঘর, গৃহস্বামী কেউ নেই ,হয়তো কোনো কাজেই কোথাও বেরিয়ে থাক্‌বেন—তা যেখানে খুসি তিনি যান, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার শিশিরদের কোনো অত্যাবশ্যকতা ছিল না। অন্ততঃ, তদ্দণ্ডেই ছিল না।

উঁচু রোয়াক্‌টা দেখ্‌বা মাত্রই শিশির লাফিয়ে উঠেচে। এক লাফে আগে নিজে উঠে, তারপর লিলিকেও সে টেনে তুলে নিয়েছে।

"উঃ! বাঁচা গেল এতক্ষণে! ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয়া যাক্ এবার।" দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করতে করতে সে বলে।

লিলি শুধু বলে : "উঃ"। সে দম ছাড়ছে তখন।

"অবশ্যি, বাঁচা যেতই! মারা যেতুম না অবশ্যি।" হাঁপ ছেড়ে শিশির জানায় : "আমরা যে মারা যাবার নই তা আমি জান্‌তুম। কেবল কি করে' যে বাঁচব এইটেই আমার জানা ছিল না।"

"তুমি বলো কি দাদা?" লিলি বিস্মিত না হয়ে পারে না।

"বাঃ আমরা কখনো মরতে পারি? এত সহজে মারা যাবো? কেন বন্দুকের গুলিদের ব্যবহারে তুই কি বুঝ্‌লি—কানের আশপাশ দিয়ে সোঁ সাঁ করে' সব চলে গেল? কুকুরের পেটের ভেতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ এ কখ্‌নো ভাবতে পারা যায়?" শিশির ততোধিক বিস্মিত হয় : "কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বইয়ে এরকম পড়েছিস্ নাকি? বইয়ের বীরবরতা মারা পড়ে কখনো?"

"ওঃ, তাই বলো।" এতক্ষণে লিলির কাছে বক্তব্যটা বিশদ হয় : "কিন্তু এখনো আমাদের বেঁচে উঠ্‌তে দেরি আছে দাদা! ডালকুত্তারা এসে পড়ল বলে'! তুমি ভাব্‌চ দরজায় খিল এঁটে বাঁচবে? যদি খিল ভেঙে ঢুকে পড়ে? ওরা অতগুলো আর আমরা দুজন! ওদের গায়ে কি জোর নেই তুমি বল্‌চ?"

"এই যে!" হঠাৎ শিশির চেঁচিয়ে ওঠে; "ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আয়না রয়েছে দেখ্‌চি যে!" চেঁচানর সঙ্গে সঙ্গে এবার সে লাফাতে সুরু করে' দ্যায় : "আর আমাদের পায় কে!"

"আয় দুজনে মিলে এটাকে ধরাধরি করে' দোরের বাইরে রেখে দিয়ে তার পর ভিতর থেকে খিল এঁটে দি!" শিশির বলে : "তারপরে মজা দেখিস্।"

দুজনে মিলে সেই লম্বা চওড়া আয়নাটাকে পাঁজাকোলা ক'রে' বাইরে এনে ওরা

স্থাপিত করে—লম্বা আয়নাটাকে চওড়া করে' দেয়াল ঠেস্ দিয়ে রাখে দরজার ঠিক সুমুখটাতেই। তারপর ভেতরে ঢুকে খিল্ এঁটে দিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে নিঃশব্দে ডালকুত্তাদের আগমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তারা এসে পড়ে। হৈ হৈ করে' সব এসে যায়।

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—! (সাদা বাংলায় ওর মানে, সব ভোঁ ভাঁ দেখ্‌ছি যে! এর মধ্যেই ওরা সট্‌কালো কোথায়?"

প্রশ্নপত্র মুখে করেই, ওরা রোয়াকের ওপর টকাটক্ লাফিয়ে উঠ্‌ল এবং ওঠবামাত্রই ওদের চক্ষু স্থির। ওদের প্রশ্নের যে এত বড় প্রত্যুত্তর ওখানেই অপেক্ষা করে' রয়েছে তা ওরা ভাবতেই পারেনি। য়্যাঁ, একিরে বাবা, ওদেরই সগোত্র আর একপাল ডালকুত্তা মহড়া নিয়ে দরজা আগ্‌লাচ্ছে যে!

ওদের পিলে চম্‌কে গেল, জয়ধ্বনি আপ্‌না থেকেই থম্‌কে থেমে গেল।

কেবল যে ঐ পালের মধ্যে মোড়ল গোছের, তার গলা দিয়ে এক বেসুরো আওয়াজ গলে' এল : "ও-ও-ও- য়্যা-য্যা-য্যা—?

অর্থাৎ কিনা, "এ আবার কি হ্যা? এরা কারা হ্যা?"

দু ভাই বোনে খড়খড়ির ছোট্ট ফাঁক দিয়ে সব দেখ্‌ছিল—শিশির লিলির কানের গোড়ায় ফিস্ ফিস্ করে : "দেখলি তো! দেখ্‌ছিস্ তো! আর সে ঝাঁউ ঝাঁউ নেই! একেবারে ভ্যা-ভ্যা ডাক বেরিয়ে গেছে!"

"হুঁ-উ-উ!" লিলি এক সুরে সায় দ্যায়।

"ওদের মধ্যে জাতীয় কবি কেউ থাক্‌লে এই সময় এদের প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চারের মস্ত এক সুযোগ পেত! কুকুর আমরা, নহিত মেষ—এই কথাটা এখন ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারলে কত বড় কাজ হতো!"

লিলি কোনো জবাব দেয় না, ছোট্ট ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে কতদূর চোখ বিস্ফারিত করে দেখা যায় সেই চেষ্টা করে।

"অন্তত একজন সত্যিকারের দার্শনিক থাক্‌লেও চল্‌ত! আসল নকল সম্‌ঝে দিয়ে ঠিক পথ বাৎলে দিতে পারত এখন!"

"ঠিক পথ তো আমাদের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়া?" অপর পক্ষে দার্শনিকতার অভাবের জন্যে দাদার কেন মাথা ব্যথা লিলি বুঝতে পারে না।

"তা সে যাই হোক্!" শিশিরের নিষ্কাম পরহিত চিকীর্ষা।

কুকুরদের ঘাব্‌ড়ে যাবার কথাই বইকি! নিজেদের প্রত্যেকের আশেপাশে ওরা মাত্র দুজনকে দেখতে পাচ্ছিল, এবং এধারে ওধারে আরো কয়েকজনকে কেবল—কিন্তু সাম্‌নে একেবারে গোটা বারো—সে যে কতগুলো ওদের আঙুলের ডগায় গোণা যায় না! ভয়ের বশে ওদের লেজ আপ্‌না থেকেই নেমে এল।

এবং আশ্চর্য্য, প্রতিপক্ষরা, দলেবলে ভারী হয়েও, নিজেদের পতাকা নামিয়ে ফেল্‌ল। ওরাও তাহলে ভয় পেয়েছে—ওধারের ওরাও! এতক্ষণে এদের প্রাণে আবার সাহস ফিরে এল, আবার এধারের জয়পতাকরা খাড়া হতে লাগ্‌ল একে একে।

শিশির লিলির কানে কানে বল্ল : "তোমার পতাকে যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি! রবিবাবুর সেই গানটা জানিস্ তো ? গানটা কানেতো শুনেছিস্ এখন স্বচক্ষে দেখে নে !"

লিলির জবাব—"হুঁউউ !" সে সেই একবাক্যে ! রুদ্ধ নিশ্বাসে বেশী কথা বলা ওর পক্ষে কঠিন !

অন্যপক্ষের পুনরায় লাঙ্গুল উঁচানো দেখে এরা এবার চটে গেল—য়্যা, একি রসিকতা নাকি ! নতুন সাহসে, নবদ্যোমে, এরা ওদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল এবার । এবং সেকি ঘোরতর লড়াই ! আঁচ্ড়া আঁচ্ড়ি—চেঁচামেচি—কামড়া কামড়ি—আয়নার কাছে সেকি ভয়ানক বায়না ! এবং বলা বাহুল্য, প্রতিপক্ষও যুদ্ধ করতে কিছুমাত্র কসুর করল না !

খানিকক্ষন সংগ্রামের পর ডালকুত্তারা কাতর হয়ে জিভ বার করে ফেললে। অপর পক্ষেরও সেই দুর্দ্দশা দেখা গেল। পরস্পরের একই হাল্ দেখে এবার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগ্‌ল ওদের। সাময়িক সন্ধি ঘোষণা করে, উভয় পক্ষের সামরিক ক্ষতির ক্ষতিয়ান্ নেয়া স্থুরু হোলো তখন। দুদলের মধ্যে মুটামুটি আলাপ আরম্ভ হোলো ! আয়নারূপ দোভাষীর মধ্যবর্ত্তিতায় তাকে প্রথম শান্তি বৈঠক বলা চলে।

"যেমন কুকুর তেমনি মুগুর !" লিলি এতক্ষণে কথা বলে। একটি প্রবচন দান করে এতক্ষনে।

"মুগুর ? মুকুর বল্ ! যেমন কুকুর তেমনি হচ্ছে মুকুর। মুকুর মানে আয়না জানিস না ?"

"কথাটা মুকুর নাকি ? আমি জানতাম মুগুর !" লিলি নিজের এত দিনের অজ্ঞানতায় একটু অবাক্ হয়।

"আরে মুগুরই তো ! মুগুর আর মুকুর এক ! আয়নায় নিজেকে দেখতে মিষ্টি লাগে না ? গুড়ের মতো মিষ্টি লাগে না কি ?" শিশির ব্যাখ্যা করে' দ্যায়।

এই বিপদের মাঝখানেও লিলির মুখে হাসি খেলে যায়। সে বলেঃ "ঠিক দাদা !" এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দ্যায়, হায়, সামনে এখন একটা আয়না নেই যে একবার যাঁকে নিজেকে একটু দেখে নেয়। কিন্তু ভারী দুর্লক্ষন ! মুখ শোঁকাশুঁকি করে' ওরা একটা বোঝা পড়ায় আস্‌তে চাইছে ! কন্‌ফারেন্স বসে' গেছে দেখ্‌ছিস্ না ? এধারে জান্‌লা টপ্‌কে এইবেলা এখান থেকে পাল্লাইচ।" শিশির বলে—ওর মুখে কোন হাসি নেই।

ক্রমশ:

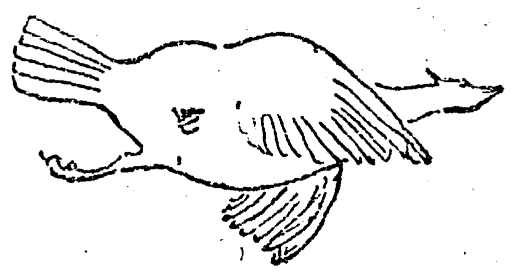

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দশম পরিচ্ছেদ

বেড়া-জালে

গুম্‌লীর মুখের ভাব দেখে আমাদের সকলেরই মনে খট্‌কা লাগল। কিন্তু এই অজানা গাঁয়ের অচেনা সর্দ্দার যদি সুবিধার লোক ও না হয়, তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে ?

বিনয়বাবু জিজ্ঞেসা করলেন, "লোকটা সুবিধের নয় বলছ কেন ?"

—"আজ দুপুর-বেলায় আম ভিন্-গাঁয়ে গিয়েছিলুম। ফেরবার পথে দেখলুম, পাহাড়ের একটা ঝোঁপের ছায়ায় ব'সে আছে বার্মুক আর দুটো চীনেম্যান।"

বিনয়বাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, "চীনেম্যান ?"

—"হাঁ বাবুজী। তারা চুপিচুপি কি বলাবলি করছিল, আমাকে দেখেই একেবারে চুপ মেরে গেল। আমি কোন কথা না ব'লে এাগয়ে এলুম। খানিক দূর এসেই ফিরে দেখলুম, বার্মুক আমাকে আঙল দিয়ে দেখিয়ে চীনেম্যান দুটোকে কি যেন বলছে।"

—"তারপর ?"

—"তারপর তখন আর কিছু হ'ল না। কিন্তু এইমাত্র বার্মুক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

—"কেন ?"

—"হতভাগা আমাকে কি বলে জানেন বাবুজী ? আজ রাত্রে আমি যদি আপনাদের খাবারের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে আর আমার সদর-দরজা খুলে রাখতে পার,

তাহ'লে সে আমাকে পাঁচশো টাকা বখ্‌সিস্ দেবে। অর্দ্ধেক টাকা সে এখনি দিতে চায়।"

—"বখ্‌সিসের লোভ তোমার আছে, নাকি ?"

—"আছে বাবুজী, আছে!"

—"মানে ?"

—"মুখপোড়া বামু্‌কের কাছ থেকে বখ্‌সিসের আগাম আড়াই-শো টাকা আমি আদায় ক'রে নিয়েছি।"

—"গুম্‌লী!"

—"ঘাব্‌ড়াবেন না বাবুজী, ঘাব্‌ড়াবেন না! বামু্‌ক হ'চ্ছে পাজীর পা ঝাড়া, মানুষ মারতে তার হাত একটুও কাঁপে না। সে কাফির হ'লেও আমাদের ধর্ম্ম ছেড়েছে, তাই তাকে আমরা পরম শত্রু ব'লেই মনে করি। তাকে ঠকিয়ে যদি আড়াই-শো টাকা লাভ করতে পারি, তাহ'লে আমার কোন পাপ হবে না।"

—"গুম্‌লী, আমরা এখনি তোমার বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে চাই।"

—"ভয় নেই বাবুজী! যখন সব কথা প্রকাশ করলুম, তখন আপনাদের খাবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি বিষ মিশিয়ে দেব না। বামু্‌কের মৎলোবটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, তবে তার অর্দ্ধেক টাকা যখন নিয়েছি, অর্দ্ধেক কাজও আমি করব।"

—"অর্থাৎ ?"

—"আজ রাত্রে সদর দরজাটা খুলে রাখব।"

—"তারপর ?"

—"তারপর রাত্রে কেউ আমার বাড়ীতে ঢুকলে ভালো ক'রেই তাকে আদর-যত্ন করব। গরক্, বাচিক্, কারুক্ আর মাল্কানকে খবর দিয়েছি, তারা এল ব'লে।"

—"তারা আবার কে ?"

—"আমার বিশ্বাসী লোক—আমার কথায় তারা ওঠে-বসে। আজ রাত্রে তারা আমার বাড়ীতে পাহারা দেবে।"

বিনয়বাবু যখন সব কথা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তখন আমিও বললুম, "আমিও গুম্‌লীর মতে সায় দি। শঠের সঙ্গে শঠতা করতে কোন দোষ নেই। আসুক ছুন্-ছিউ, আসুক বামু্‌ক! এখানে এলেই তারা দেখতে পাবে, মড়ারা জ্যান্তো হয়ে বন্দুক ধ'রে ব'সে আছে!"

কুমার কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, "গুম্‌লী-ঠাকৃরোণ! তোমার বাকি আড়াই-শো টাকাও মারা যাবে না। ও-টাকাটাও আমরা নিজেদের পকেট থেকে তোমায় দেব!"

গুম্‌লী একগাল হেসে সেলাম ক'রে বললে, "বাবুজী মেহেরবান্!"

পাহাড়ের টঙে ফকিরদের ছোট্ট গাঁ, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল প্রথম রাত্রেই। রাত যত গভীর হয় স্তব্ধতা যেন ততই থম্‌থমে হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন বোবা দুনিয়ায় জেগে আছে কেবল গোটাকয়েক বদ-রাগী কুকুর।

সদর দরজার পাশেই একটা ঘর তার মধ্যে আলো নিবিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কুমার, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে একটা ক'রে রিভলভার। এই সংকীর্ণ স্থানে বন্দুকের সাহায্য দরকার হবে না।

গরক্, বাচিক্, কারুক্ আর মাল্কানও এসেছে। তারা সবাই হচ্ছে কাফিরদের পুরাতন ধর্ম্মের লোক। প্রত্যেকেরই দেহ প্রায় ছয় ফুট ক'রে লম্বা, সারা গায়ে কঠিন মাংসপেশীর খেলা। তারা কথা কয় কম, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বেশ বোঝা যায়, আমাদের সাহায্য করবার জন্যে তারা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গরক্ ও বাচিক্ বাড়ীর ছাদের উপরে ব'সে আছে, পাহারা দেবার জন্যে। কারুক্ আর মাল্কান অপেক্ষা করছে গাঁয়ের পথে, শত্রুরা দেখা দিলেই তারা আমাদের সাবধান ক'রে দেবে। প্রথমে তারা আমাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি বাড়ীর ভিতরে পাঁচটা রিভলভারই যথেষ্ট, তারা যদি যথাসময়ে শত্রুদের আগমন সংবাদ দিতে পারে, তাহ'লেই আমাদের যথার্থ উপকার করা হবে

রাতের অসাধারণ নীরবতার মাঝে আমাদের হাতঘড়ীগুলোর টিক্-টিক্ শব্দ যেন রীতিমত কোলাহল ব'লে মনে হচ্ছে!

বাঘা পর্য্যন্ত বুঝতে পেরেছে, আমরা কোন অযাচিত ও অনাহুত অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে আমার কোল ঘেঁষে কাণ খাড়া ক'রে ব'সে আছে।

আচম্বিতে দূর পথ থেকে ভেসে এল একটা বিড়ালের ম্যাও-ম্যাও চীৎকার! তারপরেই ছাদের উপর থেকে সাড়া দিলে আর একটা বিড়াল!

এই হ'ল আমাদের সঙ্কেত-ধ্বনি! এর মানে, এখনি হবে শত্রুদের আবির্ভাব!

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

বিনয়বাবু চুপি চুপি বললেন, "আমরা কি করব ?"

—"বিশেষ কিছু না। এখানে সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলে পুলিস হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে। বদমাইসগুলোকে কিছু ভয় দেখাতে বা সামান্য জখম করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রামহরি, বাঘাকে সাম্‌লে রাখো। কুমার, শত্রুরা যখন পালাবে তখন তোমরা সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে তাদের পেটের পিলে চম্‌কে দিতে পারো।"

এক, দুই ক'রে প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট কাটল। তারপরেই একটু-একটু ক'রে সদর দরজাটা ফাঁক হয়ে ভিতরে ক্রমেই বেশী চাঁদের আলো এসে পড়তে লাগল।......... সদর দরজা একেবারে খুলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো পোষাক পরা তিন-তিনটে মূর্ত্তি।

প্রথম মূর্ত্তিটার পা লক্ষ্য ক'রে আমি রিভলভার ছুঁড়লুম। লোকটা বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে মাটির উপরে ব'সে পড়ল।

আমার রিভলভার আরো দুইবার গর্জ্জন করলে—কিন্তু এবারে আমি আর কারুকে লক্ষ্য করি নি।

যে পায়ে চোট্ খেয়ে ব'সে প'ড়েছিল, সে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে প্রাণের ভয়ে ছুটতে সুরু করলে। অন্য দুজনও দাঁড়াল না।

ছাদের উপর থেকে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হ'তে লাগল—নিশ্চয় গেরক্ ও বাচিকের কীর্ত্তি। কুমার প্রভৃতিও ঘর থেকে বেরিয়ে ঘন ঘন রিভলভার ছুঁড়তে লাগল—আর বাঘার চ্যাঁচামেচির তো কথাই নেই। শান্তিপূর্ণ মৌন রাত্রি যেন কর্কশ শব্দের চোটে হঠাৎ বিষাক্ত হয়ে উঠল!

তারপরেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল, দুজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকেই আসছে। প্রথমটা তাদের শত্রু ভেবে আমি আবার রিভলভার তুললুম, কিন্তু তারপরেই দেখি তারা হচ্ছে আমাদেরই লোক—কারুক্ আর মাল্কান।

মাল্কান কাছে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "পশ্চিম দিক থেকে অনেক লোক এই দিকেই এগিয়ে আসছে!"

—"অনেক লোক! কত?"

—"তা বিশ বাইশ জনের কম হবে না!"

—"তারাও কি আমাদের শত্রু?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে বাবুজী! এত রাতে ভালো লোকরা দল বেঁধে কখনো পাহাড়-পথে চলে না!"

এমন সময়ে ছাদের উপর থেকে গরক্ চীৎকার ক'রে বললে, "হুঁসিয়ার বাবুজী, হুঁসিয়ার! পূর্ব-দিক থেকে অনেক আদ্‌মি আসছে!"

কারুক্ সভয়ে বললে, "কি মুস্কিল! দুষমনরা কি বাড়ীখানা ঘিরে ফেলতে চায়?"

কারুক্ বোধ হয় ঠিক আন্দাজই করেছে। হয়তো আমাদের বেড়া-জালেই ধরা পড়তে হবে।

ক্রমশ

প্রবন্ধ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

আদিম মানুষের জীবন

আজকাল যে সভ্যতা লইয়া আমরা এত গর্ব্ব করি, আদিমকালে তাহার অস্তিত্বই ছিলনা। সে যুগের কোন লিখিত ইতিহাস নাই, তাই এই যুগকে 'প্রাগৈতিহাসিক' বা ইতিহাস রচনার পূর্ব্ব যুগ বলা হয়। তখন মানুষের বংশধরেরা পৃথিবীর উপর সবে মাত্র তাহাদের লীলাখেলা আরম্ভ করিয়াছে। আদিম মানুষ বনে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত, কাপড় তৈয়ার করিতে জানিতনা বলিয়া গাছের ছাল ও পাতার আবরণী পরিত—লজ্জা-নিবারণের জন্য নয়, শীতের তাড়নায়। আগুনের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়া সে শিকারলব্ধ কাঁচা মাংস খাইত। কিন্তু মানুষের এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহা অন্য প্রাণীর নাই। সে দল বাঁধিয়া বাস করে, পরস্পরের সুখদুঃখে সহানুভূতি দেখায় এবং বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগ করিয়া নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ গড়িতে পারে।

প্রকৃতির পরিবর্ত্তন

পৃথিবীর নানাস্থানে এই আদিম মানুষজাতির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে সব মানুষ একই সময়ে সভ্যতা লাভ করে নাই। যে-যে দলের বুদ্ধি বৃত্তি প্রখর ছিল, তাহাদের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। যাহারা বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগ করিতে পারে নাই, তাহারা জীবন সংগ্রামে পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই পিছাইয়া পড়ার অবশ্য অন্যান্য কারণও ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ভৌগলিক সংস্থান বশতঃ কোন দেশ বিশেষ কিছুই উন্নতি করিতে পারে নাই। কোন দেশের ভৌগলিক সংস্থান চিরস্থায়ী নয়। মানুষের জীবনের উন্নতি অবনতির মত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশেও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এই পরিবর্ত্তন সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। আজ যে শস্যশ্যামল বাংলা দেশ, একদিন তাহা সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার যে ইজিপ্ট পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতার চরমোৎকর্ষ লাভ করে, আজ তাহার অধিকাংশ স্থান বিরাট মরুভূমি। সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো আজ বিরাট বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে;- কিন্তু একদিন এই স্থানে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা জন্মলাভ করে।

জীবসৃষ্টির পাঁচটী যুগ

জীবন সৃষ্টির ক্রমানুসারে বৈজ্ঞানিকেরা পাঁচটী কাল-বিভাগ করিয়াছেন:

(১) অন্তঃসৃষ্টির যুগ (Archæozic বা Larval Age)
(২) মেরুদণ্ডহীন জীবের যুগ (Proterozoic Age)
(৩) মেরুদণ্ডী প্রাণী যুগ (Palæozoic Age)

(৪) সরীসৃপ ও বিহঙ্গ যুগ (Mesozoic Age)
(৫) স্তন্যপায়ী প্রাণী যুগ (Cenozoic Age)

স্তন্যপায়ী প্রাণীসৃষ্টির যুগে মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে আদিম মানুষের সৃষ্টি হইতে কোটী কোটী বৎসর লাগিয়াছিল। ইহারও পাঁচটী পর্য্যায় আছে। প্রথমযুগে সৃষ্ট হইল গর্ভপোষণী প্রাণী, দ্বিতীয় যুগে—বানর জাতীয় জীব। তৃতীয় যুগে—স্তন্যপায়ী ও স্থলজাত বৃক্ষাদি। চতুর্থ যুগে—আদিম মানুষের বংশ সৃষ্টি এবং পঞ্চম যুগে মানুষ প্রতিবেশ প্রভাবজয় করিতে শিখিল।

আদিম মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল

এই পঞ্চম যুগের মানুষের কয়েকটী প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ইয়োরোপে ও এশিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে পর্ব্বতগুহায় ও বালুকাগর্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইউজিন ডুবোয়া নামক হল্যাণ্ডের একজন পণ্ডিত জাভাদ্বীপে কঙ্কালের অংশ আবিষ্কার করেন (১৮৯১-৯২), তাহা প্রায় ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মানুষের। আণ্ডারসন সাহেব চীনে পাইপিং শহরের সন্নিকটে চাউ-কাট্-টিয়েন নামক এক পর্ব্বত-গহ্বরে আর একটী নরকপাল আবিষ্কার করেন (১৯২১)। জার্ম্মান পণ্ডিত অটো শোয়েটেন সাক্ হাইডেল্বার্গের নিকট একটী বালুকাস্তূপের ৮২ ফিট নিম্নে আর একটী নর কপাল আবিষ্কার করেন (১৯০৭)। ফ্রান্সে ল্য-জিজি গ্রামে ক্রো-মাগ্নঁ পর্ব্বতগুহার মধ্যে একেবারে পাঁচটী কঙ্কাল দেখা যায় (প্রায় ১৮৭৭)। কঙ্কালের সহিত পাথরে নির্ম্মিত অনেকগুলি যন্ত্র পাতিও পাওয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানির ডুসেল্ডফ্ শহরের কাছে নিয়াণ্ডারথাল্ গ্রামে মানব জাতির আদি পুরুষের যে নর কপাল পাওয়া যায় তাহা ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। স্পেন দেশের অনেক স্থানে আদি মানুষের নানারূপ যন্ত্র পাতি ও গহ্বর-চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে আদিম কালে পৃথিবীর বাসয়োপযোগীর সকল স্থানে মানুষের বাস ছিল। পরের জীব যুগে যাহারা টিকিয়া গেল তাহারাই পরবর্ত্তী যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে।

নিয়াণ্ডারথাল্-মানব

নিয়াণ্ডারথালে প্রাপ্ত নরকপালকে পণ্ডিতেরা আদিম যুগের মানবের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করেন। এই যুগের মানবের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জিব্রাল্টার প্রণালীর নিকট পাওয়া যায়; ইহার সন্নিকটে অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে এইগুলি যে-যুগের মানুষ সেই যুগের পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে বিরাট বরফের স্তূপ ছিল। তখন দীর্ঘ রোমযুক্ত অতিকায় প্রাণীগণ ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিয়াণ্ডারথাল্-মানব গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা আগুনের ব্যবহার জানিত ও পাথরে নির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ করিত। তাহারা আধিভৌতিক শক্তিকে ভয় করিত। জিব্রাল্টার নিয়াণ্ডারথাল্-যুগের মানুষের ব্যবহৃত কয়েকটী অগ্নিকুণ্ডও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ

করিলে তাহারা কিরূপ প্রাণী অগ্নিদগ্ধ করিত, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। এই সব নর-কপালের ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তরাজি ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয় যে ইহারা জীবিত অবস্থায় খুব কঠিন বস্তু চর্ব্বণ করিত। ইহাদের দৈর্ঘ ছিল প্রায় পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড়গুলি বেশ পুরু ছিল, তবে ইহারা বোধ হয় আধুনিক যুগের মানুষের-মত অত সোজা হইয়া হাঁটিতে পারিত না। ইহাদের বাহুদ্বয় বেশ দীর্ঘ ছিল না এবং পৃষ্ঠদেশের কুঞ্চন ও আজ-কালকার মানুষের মত ছিল না। তবে দৈহিক শক্তি ইহাদের অসাধারণ ছিল। ইহাদের মাথার খুলি অদ্ভুত গঠনের ছিল। এইগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা আদিম মানুষের সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণামূলক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপ নরকপাল গুলি দেখিলে মনে হয় যে আদিম মানুষ নানা স্তর পরম্পরায় স্বকীয় গঠন প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সব স্তরের তুলনামূলক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যখন পাওয়া যাইবে, তখন আদিম মানুষের উৎপত্তি ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিত হইবে।

আদিম মানুষের বসতি বিস্তার

আদিম মানুষের একটি দল এশিয়ার মধ্যস্থলে প্রথমে বসবাস করে। পরে সংখ্যাবৃদ্ধি ও জীবন সংস্থানের প্রয়োজন বশতঃ তাহারা নানা বিভিন্ন স্থানে বসতি বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে এক দল চলিয়া আসে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদের দিকে; আর এক দল চলিয়া যায় বর্ত্তমান ইরাকের দিকে ও অন্যান্য দল বিভিন্ন যুগে গ্রীসে ও মধ্য ইয়োরোপে চলিয়া যায়। ইহাদের সাধারণতঃ ইন্দো-জার্ম্মাণ জাতি বলা হয়। যাহারা ইরাণ ও ভারতের দিকে আসে, তাহাদের নাম ইন্দো-এরিয়ান্। তবে এই উপনিবেশ-বিস্তারের সময় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও যে মানব-বসতি ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আফ্রিকায়, ভারতের দাক্ষিণাত্যে ও আমেরিকায় অন্যান্য জাতি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি এখনও বর্ব্বরতার গণ্ডী পার হইতে পারে নাই। আনুমানিক দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের যে জীবন প্রণালী ছিল, এখনও সেই-ভাবে তাহারা দিন কাটাইতেছে।

সভ্যতার মুলসূত্র

মানুষ সভাবতঃই সমাজধর্ম্মী। তাহার মনে এমন একটী স্বাভাবিক প্রেরণা আছে যে সে অন্যান্য প্রাণীর মত আহার বিহারেই কালক্ষেপ করিতে চায় না। এই প্রেরণা তাহাকে সর্ব্বদাই নূতন কাজে—নূতন সৃষ্টির পথে চালাইতেছে। এই সিসৃক্ষার মূলে কয়েকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ—দুঃখ মোচন ও সুখ বিধানের পরম চেষ্টা। এপর্য্যন্ত সভ্যতার যে যে স্তরের মধ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি, প্রত্যেক স্তরেই ঐ এক প্রচেষ্টা নিহিত। আর একটী কারণ—মানুষ কোন অবস্থায় তৃপ্ত নয়। সে কোন কালেই একভাবে এক অবস্থায় থাকিতে চায় না। নব নব রূপে, ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে জ্ঞানে সে সকলের বড় হইতে চায়। আদিম মানুষ প্রায় ছয় হাজার খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে এশিয়া ও ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ উপকূলে এই প্রেরণাবশতঃ কয়েকটি সভ্যতার ধারা সৃষ্টি করে। এখন তারা লুপ্ত। প্রাগৈতিহাস সেই লুপ্ত স্রোতোধারা বালুকাস্তূপের তলদেশ হইতে আবিষ্কার করিয়াছে।

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

রোজ আমি যেখানে ব'সে লিখি, তার বাঁ-দিকে তাকালে দেখা যায়, গঙ্গার নীলাভ জল-রেখা বিপুল এক ধনুকের মতন বেঁকে বালি-'ব্রিজে'র তলা দিয়ে চ'লে গিয়েছে দূরে দূরান্তরে এবং ডানদিকে মুখ ফেরালে দেখি, নীলাকাশের আলো-মাখা ছোট্ট একটি ছাদ।

ঐ ছাদের উপরে একটি বাগান রচনা করেছিলুম, রোজ সেখানে ফুটত পাঁচ-ছয় শো নানা জাতের নানা রঙের ফুল। বন্ধুদের চোখে-মুখে বাগানটি জাগিয়ে তুলত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়।

সে বাগান আর নেই—আছে তার ধ্বংসাবশেষ। নিতান্ত কড়া-জান, এমন গুটিকয় ফুলগাছ আজও একেবারে মরতে রাজি হয় নি। বাকি টবগুলো ও কাঠের বাক্সের মধ্যে আসর পেতেছে বুনো আগাছার এলোমেলো জঙ্গল। একটা মস্তবড় লোহার টবের ভিতরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক নিমগাছ। প্রায় সাত-আট ফুট উঁচুতে মাথা তুলে হাওয়ায় তুলতে তুলতে সে এই জঙ্গল-সভায় করে সভাপতিত্ব।

আজ সকালে শীতের কাঁচা রোদ এসে ছাদটিকে যখন ধুয়ে দিচ্ছে সোনার জলে, তখন তোমাদের জন্যে কলম নিয়ে বসলুম।

হঠাৎ পোড়ো ছাদ-বাগান থেকে ভেসে এল বিষম কলরব। উঁকি মেরে দেখি, সেখানে বেধেছে তুই শালিকের তুমুল লড়াই। তারা প্রথমে ঘন ঘন মাটির দিকে মাথা নামিয়ে ঠিক যেন পরস্পরকে সেলাম করে, তারপর টপাটপ্ লাফ মারতে মারতে করে এ ওকে ঠুক্‌রে বা আঁচড়ে দেবার চেষ্টা। মাঝে মাঝে কী প্যাচ্ ক'ষে তারা পরস্পরের পা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে থাকে এবং থেকে থেকে পরস্পরকে ঠুক্‌রে দেয়।

একটা মেয়ে শালিক অনবরত চীৎকার করছে, মাঝে মাঝে ছাদের পাঁচিলে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে কোনদিক থেকে নতুন কোন বিপদ আসবার সম্ভাবনা আছে কিনা। মাঝে মাঝে আবার তুই যোদ্ধার কাছে নেমে এসে শালিক-ভাষায় যা বলছে তার অর্থ হবে বোধ হয় এই: "নাঃ, পুরুষদের নিয়ে আর পারি না বাপু! খালি মারামারি, খালি ঝগড়াঝাঁটি! এ কী মুস্কিলে পড়লুম গো।"

এদিকে এই লড়াইয়ের খবর র'টে গিয়েছে দিকে দিকে। ঘটনাস্থলে নানান্ দর্শক এসে জুটতে লাগল। ছাদের উপরে ছায়া ফেলে ফেলে চক্র দিয়ে হেঁট মুখে ঘুরতে লাগল চার-পাঁচটা শঙ্খচিল ও গোদা চিল। পাঁচ-সাতটা কাক কা-কা করতে করতে ছাদের পাঁচিলে এসে ব'সে পড়ল। তাদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গি দেখলে সন্দেহ হয়, তারা যেন

শালিক-যোদ্ধাদের উপরে গুণ্ডামি করতে চায়—যদিও তারা অতখানি আর অগ্রসর হ'ল না, কেন তা জানিনা।

গঙ্গাতীরে খোড়ো-নৌকোর উপর থেকে খবর পেয়ে উড়ে এল একঝাঁক ফচ্‌কে চড়াই পাখী! তারা যোদ্ধাদের চারিপাশে নেচে নেচে বেড়ায় আর যেন কিচির-মিচির ক'রে বলতে থাকে—"নারদ, নারদ, বাহবা-কি-বাহবা।" তিনটে পায়রা লোহার রেলিংয়ের উপরে ভীত স্তম্ভিতের মতন ব'সে দেখছে এই কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড।

একটা কাঠবিড়ালীও শিস্ দিতে দিতে ছুটে এল। তার আগ্রহ আবার সবচেয়ে বেশী! সে সুড়্-সুড়্ ক'রে যোদ্ধাদের খুব কাছে এগিয়ে গেল। অমনি মাদী শালিকটা চট্ ক'রে তার সামনে এসে বললে— কোঁ-কটর্-কটর্, কোঁ-কটর্-কটর্, কোঁ-কটর্ কটর্! অর্থাৎ—"হট্ যাও, নইলে মারলুম এই ঠোকর।"

কাঠবিড়ালী ল্যাজ তুলে লোহার টবের উপরে লাফ মারলে, তারপর চট্‌পট্ নিমগাছটার মগ্‌ডালে উঠে কিচ্-কিচ কিচ্-কিচ্ ক'রে বলতে লাগল—"আয়না দেখি পোড়ারমুখী! আয়না দেখি শালিক-ছুঁড়ী!"

শালিখ-বউ কিন্তু তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না।

পনেরো মিনিট কাটল, তবু লড়াই থামবার নাম নেই। তুই যোদ্ধা বেজায় হাঁপাচ্ছে, তাদের গা থেকে পালোক খ'সে পড়ছে, তু-চার ফোঁটা রক্তও ঝরল—তবু তারা কেউ পিছপাও হ'তে রাজি নয়। যুদ্ধের কারণ নিশ্চয় গুরুতর।

লেখা ভুলে নিশ্চল অবাক্ হয়ে লড়াই দেখছি। আমি একটা মনুষ্য-জাতীয় ভয়াবহ জীব যে এত কাছে ব'সে আছি, ওরা প্রত্যেকেই যেন সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু তারপরেই বুঝলুম, না, আমার সম্বন্ধে ওরা রীতিমত সজাগ। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে দেখে আমি যেই সশব্দে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়ালুম, অমনি এই নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রীরা ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে যে যেদিকে পারলে স'রে পড়ল।

ছাদ আবার স্তব্ধ। আগাছার জঙ্গলে ফুটে আছে সাদার সঙ্গে বেগুনী রং-মিশানো ছোট ছোট নামহীন ফুল। একটা একরত্তি হল্‌দে প্রজাপতি তাদের কাছে গেল মধু আহরণের চেষ্টায়। কিন্তু তারপরেই নিজের ভুল বুঝে একদিকে উড়ে গেল ক্ষুদে পাখনা নাড়তে নাড়তে—রোদ-সায়রে ভাসন্ত পরীশিশুদের খেলাঘরের পাল-তোলা নৌকার মত।

আমি দেখলুম যে-জগৎ আমাদের নয় সেখানকার এক চলচ্ছবি। এমন ছবি তোমরা কোন সিনেমা-প্রাসাদে গেলেও দেখতে পাবে না। অথচ প্রকৃতির চিত্রজগতে আমাদের আশেপাশেই এমন কত ছবির বাজার নিত্যই খোলা থাকে। আমাদের দেখবার মতন চোখ আর বোঝবার মতন মন নেই ব'লেই এমন সব বিচিত্র ছবির রস আমরা উপভোগ করতে পারি না। ইতি,

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চলন্তিকা

রেসিং পায়রা সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতায় পায়রা-দৌড়ের ফ্যাইনাল পর্ব্ব শেষ হল। ডেরী অফ্-শোন্ থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রায় ৩৪৫ মাইল ছিল দৌড়ের পরীক্ষা। রাস্তায় পায়রাগুলি ঝোড়ো হাওয়ার মুখে পড়েছিল এবং তারা প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে উড়েছিল। এই পায়রা দৌড়ের ফলাফল হল ঃ ১ম—'মৌরীন্', মিনিটে ৯৮৯ গজ। ২য়—'বুলেট্', মিনিটে ৯৮৬ গজ। ৩য়—'গ্লোরিয়া জিন' মিনিটে ৯৭৯ গজ।

এই সোসাইটীর উদ্যোগে প্রথম পায়রা দৌড় হয়েছিল মোগলসরাই থেকে কলিকাতা। সকাল আটটার সময় পায়রাদের ছাড়া হয়েছিল এবং প্রথম পায়রা "সুইটনেস" কলিকাতায় ৫—৪৬ মিনিটে পৌঁচেছিল। "সুইটনেস" এর দৌড়ের গতি ছিল মিনিটে ১, ১৪৩ গজ।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব বিভাগ ফ্যাইনালে বেনারসে যুক্ত-প্রদেশকে হারিয়ে বাঙ্গলী দল সগৌরবে জয়ী হয়েছে। বাঙ্গলার মোট রাণ—৪৭৩ আর যুক্ত প্রদেশের ৪২৬ মাত্র। বাঙ্গলা দলে মুস্তাফি ও দেব এঁরা দুজন 'সেঞ্চুরি' পার করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। যুক্তপ্রদেশের সেলিম ৯২ রাণ করে নিজের দলকে প্রায় জিতিয়ে আনছিলেন। রঞ্জি ক্রিকেটের বিভাগীয় ফ্যাইনালগুলি সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এখন প্রতিযোগিতার চারটি দল রইলেন। বাঙ্গলাদল খেলবেন মহীসূরের সঙ্গে এবং বম্বে দল খেলবেন উত্তর-ভারত ক্রিকেট দলের সঙ্গে। এই দুটি সেমি-ফ্যাইনাল খেলাই বোধ হয় এমাসের শেযে হবে. বাঙ্গলা-মহীসূর খেলাটি কলিকাতায় হবে।

প্রশান্ত মহাসাগর দিনে দিনে ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছে। তার শান্তিময় দ্বীপপুঞ্জ আজ দুষমনদের আস্তানা ও বোমা বারুদের কারখানা। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে দিকে শত্রুদের বিমান মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলচে। জাপানীদের ভীষন আক্রমনে দ্বীপ উপদ্বীপ আজ ধ্বস্তবিধ্বস্ত। মালয় উপদ্বীপে জাপানীরা এসে পড়েচে ও কুয়ালালামপুর অধিকার করেছে। এদিকে ব্রহ্মপ্রদেশেও তারা হানা দিয়েছে ও মৌলমিন রেঙ্গুন প্রভৃতি সহরে বোমা বর্ষন করেছে। বর্ম্মায় ইংরাজ, বর্ম্মী, ভারতীয় ও চীনে সৈন্যদলে একত্র হয়ে প্রাণপণ দেশরক্ষা করছে. সুদৃঢ় ব্রিটিশ নৌঘাটি সিঙ্গাপুর আজও টিকে আছে। এ কথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে ভারতের বিশেষ পূর্ব্বভারত তথা কলিকাতার বিপদ সম্মুখীন। হয়ত কলিকাতার কোন বিপদ নাও হতে পারে। কিন্তু সকলকেই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। সব চেয়ে দরকারী কথা, আসন্ন বিপদে ভয় পেলে চলবে না। স্থিরবুদ্ধি হয়ে সকলকে কাজে লাগতে হবে। কলিকাতার সবচেয়ে বড় সমস্যা ঃ স্কুল কলেজগুলি খোলা রাখা না আপাততঃ বন্ধ রাখা হবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যাতে না একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তার সঙ্গে তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

চিঠির বাক্স

দিদিভাই

রংমশালের ভাই বোনেরা আমার!

নতুন মাঘ এলো, গেল পৌষ এলো মাঘ।
এমনি করে আসবে আরো কত মাস।
নতুন করে বলার কী আছে তোমাদের?
রক্তাক্ত এ পৃথিবীর মাটি, আকাশ অন্ধকার
বোমা ও বারুদের স্তূপে।
ভারতবর্ষ বিপন্ন হয়ে নিরীক্ষণ করছিল এ যুদ্ধ।

কিন্তু যুদ্ধের আগুন এসে প্রবেশ করলো ভারতবর্ষের মাটীতে। কোলকাতা মুখ ঢেকে আছে অন্ধকারে, বাংলা দেশ জরুরী এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সভ্যতা ও কৃষ্টির মূলে লেগেছে পরিবর্ত্তনের আঘাত। তবু দেখছি তোমরা, ভারতের কিশোর কিশোরীরা, একটি শুভদিনে বেদমাতাকে স্মরণ করে হৃদয়ের অর্ঘ্য রচনা করছো রক্তাক্ত পৃথিবীর মাঝে, হাহাকার ও হননের মাঝে—শ্বেত পদ্মাসনা, স্মিত হাস্যময়ী বেদমাতাকে ঘিরে আছ ঃ সমস্বরে বলছো—এ অবিদ্যার অন্ধকার থেকে—এ পৃথিবীকে ত্রান কর মা, আমাদের বিদ্যা ও জ্ঞান দান করো। প্রার্থনা করি তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হোক।

উমা ও নীলিমা (রাজসাহী) ১৬১৫ তোমার বেতার ষ্টেশন স্থাপিত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে এই জানাচ্ছি—মাদ্রাজে ১৯২৪ সালে 'রেডিও ক্লাব' সৃষ্টি হয়—তখন পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে বেতার শোনা বা বেতার সাহায্যে গান বাজনা বক্তৃতা ও খবরাখবর প্রচার কোন ব্যবস্থা হয়নি। নিয়মিতভাবে বেতার প্রতিষ্ঠান চলতে সুরু করে সর্ব্বপ্রথম বোম্বাইয়ে ১৯২৭ সালের ২২শে জুলাই, এই বছরেই ২৭ আগষ্ট কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের জন্ম। কিন্তু কিছুকাল চলার পর দেনা ও ব্যয় বাহুল্যের জন্য সে সময়ে এই বেতার প্রতিষ্ঠান 'লিকুইডিসানে' চলে যায়। কিন্তু জনসাধারণ তখন বেতারকে খুব সমাদর করেছেন এবং বিশেষ করে এদেশের ছেলেমেয়েরা তখন তাদের—'ছোটদের আসরের' বেতার ভক্ত ছিল ভয়ানক। গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা মূলক ভাবে বছর দুই বেতার প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন এবং শেষে ব্যয় বাহুল্যের জন্য বেতার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে কৃত সঙ্কল্প হন। এদেশের জনসাধারণের আগ্রহে, বেতার ব্যবসায়ীর উৎসুক্যে, সরকারী ও বেসরকারী বেতার বন্ধুদের

কৃপায় বেতার পুনঃর্জীবন লাভ করে। বেতারে কি করে কথা শুনতে পাও এতো একটী কথায় বোঝান সম্ভব নয় সুতরাং এ সময় মত প্রবন্ধে বা চিঠির বাক্স মারফং জানাবো। রংমশাল অফিসেই চিঠি লিখলে ইন্দিরাদি পাবেন, পৃথক ঠিকানা আমি কিছু জানিনা। আমার কাছে চিঠি দিলেও পৌঁছে দিতে পারবো।

গোপেশ্বর লহরি (শান্তিপুর) তোমার প্রশ্নের উত্তর উটপাখী।

শিবানীঘোষ (সুগোলী) ১৫৭৬ যাঁর নাম জানতে চেয়েছ তা আমি বলতে পারবো না, কারণ জানতে চেয়োনা। বিমানপোত ৩০ হাজার ফুট উঠেছে বলে শোনা যায়—সাধারণতঃ ২০।২৫ হাজার ফুট। ঘুমিয়ে পড়লে বোধশক্তি লোপ হয় না কমে যায়। যে কোনও গ্রাহিকা বোনের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করতে পারো। **রহিমা খাতুন** (যোলোঘর) ৭৭৭ আশাকরি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ। তুমি প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব প্রথম হয়েছো জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। **প্রেনা ভট্টাচার্য্য** (নবদ্বীপ) ১৭৮৭ তোমার কি অনুরোধ ছিল তা জানিনা বলে উত্তর দিতে পারিনি কেননা চিঠিগুলি পাইনি, তুমি ভুল করেছ বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কথা বলেছ, কি জানতে চাও নিশ্চয় জানিও। **প্রবোধ চন্দ্র বসু** গ্রাহক নম্বর বা ঠিকানা নেই কেন? লেখা ভাল হলেই গ্রহণ করা হবে যাঁর ঠিকানা চেয়েছ তা আমি জানি না—এবং জানবার বা জানাবার উপায় নেই, অফিস থেকে নিয়ে যেতে পারো। লেখা তুমি যা পাঠিয়েছ সম্পাদকীয় দপ্তরে চলে গেছে, তাছাড়া ওসব পরিচালক মশাইরা দেখেন, আমি ওসম্বন্ধে কোন কথা তো বলতে পারিনা ভাই। **সুজাতা চৌধুরী** (সিলেট) তোমার ধারণা ঠিক কিনা আমি বলতে পারিনা। 'সাধনার' জন্য লেখা চেয়েছ, সত্যিই আমি লিখতে জানিনা তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি অর্থাৎ হাত পাকাতে পারি যদি দেরীতে হলে চলে। তাড়াতাড়ি হবে না ভাই এখন একটু কাজে ব্যস্ত আছি। আমার নাম এত পৃথক ভাবে কি লিখে দেবো—এই সব চিঠির উত্তরের শেষে লেখা থাকে কেটে নিও। নন্দিতাকে বলো সে যা জানতে চায় লিখে পাঠায় যেন, কোলকাতায় যে ভীতি আসন্ন হয়েছে এবং সে কথা ভেবে যে আমন্ত্রণ সে পাঠিয়েছে তা আমি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছি। **সাধনা ও রেণু বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম) ১৬৬২ লেখা সম্পাদকীয় বিভাগে গেছে ভাই। বোনদের সঙ্গে বোনেরা, ভাইদের সঙ্গে ভাইরা লেখনী বন্ধু করতে পারে এর অন্যথা হয় না। আমাকে ষ্ট্যাম্প পাঠিয়ে আবার নিয়ে যাওয়া এতো অনেক হাঙ্গাম এবং হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। লেখনী বন্ধুর নাম জানিও। সম্পাদক মহাশয় বা মধুদি'র অটোগ্রাফ যোগাড় করে দেওয়া আমার বড় অসুবিধা, সম্পাদক মহাশয়ের দেখা পাওয়া মুস্কিল আর মধুদি'র সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। **প্রতিমা সেন** (গ্রাসমোর) **প্রফুল্লকুমার কর** (গৌহাটী) **বিকাশকুমারপাল, রেণু বিশ্বাস** দ্বিতীয় চিঠি পেয়েছি। প্রীতি শুভেচ্ছা সকলে গ্রহণ করো।

ইতি—শুভার্থিণী

দিদিভাই

নূতন ধাঁধা

কুমারী অলকা ঘোষের সৌজন্যে (গ্রাঃ ৮৫১)

১। কোন বাড়ীর ল্যাজ আছে? কোন মাছ জুতার ভিতর আছে? ৩। কোন সহরকে উঁচুতে তুলে দিল? ৪। কোন দেশ পৃথিবীকে টানে? ৫। কোন দেশ একটা অক্ষরের ½ ভাগ? ৬। কোন নদা ডাক দেয়? ৭। কোন নদীতে সন্ধ্যা হয় না।

পৌষ মাসের ধাধার উত্তর

১। রিষ্ট ওয়াচ। ২। ফাউন্টেন পেন। ৩। সুটকেস। ৪। গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ। ৫। পেপার ওয়েট। ৬। হোয়াট নট। ৭। ষ্টিল ট্রাঙ্ক। ৮। ওয়েষ্ট কোট। ৯। পুল ওভার। ১০। ইজি চেয়ার।

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছে—

বাসন্তি, শরৎশ্রী, জুঁই, বাণী ও কল্যানী মুখার্জ্জি, দক্ষিণ বারাসত; রথীন্দ্র, সেজদা, রেণু, সতী, লক্ষী, করুণা ও গিতিন মৈত্র, রাজসাহী; অমিয় কুমার ঘোষাল, এরিয়াদহ; নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পাটনা; শান্তি, পিকু, ইরা, গনসা, তুম্যা, গয়া; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বাঁকুড়া; সুজাতা, নন্দিতা ও দিলীপ চৌধুরী, শ্রীহট্ট; শিশির, অমিয়, অরুণ, মীরা, বাবু, দীপু, দাদা ও দিদি, কলিকাতা; সোমেশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, কলিকাতা; জামাইবাবু, চিনিদা ও গনেশ মুখোপাধ্যায়, পাটাভোগ; দিদি, দাদা, সেজদি, মেজদি, ছোটদি, বাদল ও জয়ন্তি সেন মজুমদার, আটালিয়া; কুমারী প্রতিমা চ্যাটার্জ্জি, জব্বলপুর; গুরুপ্রসাদ ও দেবী প্রসাদ বসু চৌধুরী, কলিকাতা।

If You Want Quick Service ══
══ And the Right Thing
Please write to :—
BIEN ARTIUM
HATKHOLA P. O.
CALCUTTA
Dealers in all kinds of :—
SCIENTIFIC, CHEMICAL AND BIOLOGICAL APPARATUS, GEOGRAPHICAL PICTURES AND INSTRUMENTS

অর্গ্যান কোং
৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

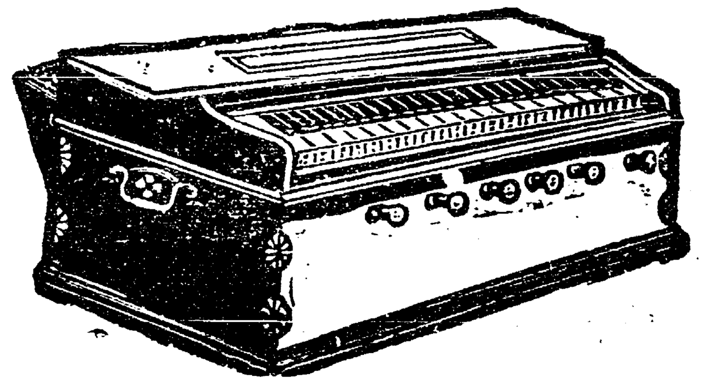

সুর সাধনায় অরগ্যান কোংর
হারমোনিয়ামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বাদ্য যন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।
ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন

রংমশাল
ষষ্ঠ বর্ষ ১১শসংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৪৮

কবিতা

শিশুর সওয়াল

শ্রীপৃথ্বীনাথ রায়

স্বর্গটা সব তৈরি সোনা দিয়ে ?
আর যা কিছু সবই সোনায় গড়া ?
কুল গাছেতে সোনার কুলই তবে ?
আম গাছেতে সোনার আমের ছড়া ?
ছুরি দিয়ে কাট্‌তে গেলেই আম
সোনার টুক্‌রো হাতের 'পরে রবে !
আম বল্‌তে রবেনা তো কিছুই—
কেমন ক'রে সে দেশ মজার হ'বে !

ফল-গুলো সব সদাই নাকি পেকে
ঝুল্‌ছে ডালে মিষ্টি রসে ভরা,
পাকা যে ফল খেতে ভালোই বাসি
দেখ্‌তে পেলেই ঢিলটি মারি কড়া ;

তার চাইতে যে অনেক ভালো লাগে
মুন লঙ্কা দে’ বেরোয় যে আম সবে ;
নাইবা যদি পেলেম তাহা খেতে
কেমন ক’রে সে দেশ মজার হ’বে !

সকল সময় স্বর্গ উপর নাকি
হাসছে কেবল মস্ত বড় চাঁদ;
লাগ্‌বে আমার সত্যি খুবই ভালো,—
দুঃখ শুধু্‌ থাক্‌বে সেথা রাত !
চাইনা বটে আগুন দুপুর বেলা
তাড়া কি খাই সোজা ঘুমের তরে—
সকাল সাজের এমন হাসিটাকে
স্বর্গে গিয়ে ভুলবো কেমন ক’রে—
গাছের আগায় ঝিলিক মারা আলো
নাইবা যদি সেই দেশেতে রবে,
চাঁদের আলো রইলো না হয় মেলা—
কেমন ক’রে সে দেশ মজার হ’বে !

আকাশ নাকি সবই সময় নীল
নাই এতটুক্‌ মেঘের কোন রেখা,
তারি মাঝে মস্ত চাঁদের হাসি—
সত্যি মধুর অবাক হ’বে দেখা।
তাই বলে কি সাদা মেঘের খেলা
নীল আকাশে মধুর কিছু কম,
কালো মেঘটা না রয় যদিই ভালোই—
আকাশ ঘিরে আসে যেন যম !
তবু যদি কালো মেঘেই লেগে
রংয়ের খেলা আকাশে না রবে,
সিঁদুর-মাখা মেঘের পাহাড় বিনে
কেমন ক’রে সে দেশ মজার হ’বে !

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঙ্গদ বুঝলেন—

ছল পেতেছে রাবণ করতে পরিহাস—
চেনা দায় কোনটা আসল, কোনটা নকল রাক্ষসের রাজ।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ইতি উতি চেয়ে দেখেন

পুত্র হয়ে পিতার মুর্ত্তি ধরে কোন লাজে
ইন্দ্রজিত বেটা আছে বসে আপন সাজে !

ব্যাস্‌, রূপ-বিদ্যে ফাঁস। অঙ্গদ বল্লেন—ওরে মেঘনাদ, অনেকগুলো রাবণ দেখি—, কোন রাবণ তোর বাপ্‌ !

হারে, কোন রাবণে মোর বাপ্‌ বেঁধেছিল লেজে—
কোথা সেই বাপ্‌টি তোর মোরে দেখায়ে দে !
নকল রাবণে আমার কাজ নাই—
সীতা-চোর বাপ্‌টি তোর, আমি তারেই চাই।

লজ্জিত হয়ে ইন্দ্রজিত হেঁট করে মাথা—
অঙ্গ জ্বলে শুনে অঙ্গদের কথা।

রাবণ তখন ক্রোধিত হয়ে মায়া ভঙ্গ করে কথার তরঙ্গ ছুটিয়ে দিলেন দশমুখে—

শোনরে বানর বলি তোরে—মরিতে আলি কেন বেঘোরে !
যা যা বেটা সরে পালা—এখনি বুঝবি লেজের জ্বালা !
জানিস আমি রাক্ষসের রাজা—উপায় করে খাই বানর ভাজা।
বানর সহায় করে কাড়তে আসে সীতা—এতেই বোঝা গেছে রামের যুগ্যতা।
আজ যদি কুম্ভকর্ণে দিই জাগাইয়া—খাইবে বানর-সেনা এখনি উঠিয়া।
শিশু-রাম পশু-কপি না জানে আমায়—তেঁই সে আমার সাথে যুদ্ধ দিতে চায়।
বাটা ভরে পান দিব আড়নে আড়ন—যে জন মারিবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
খদ্যোৎ উদয়ে যদি হয় চন্দ্রপাত—রাম জিতে সীতা রাখিতে নারবে লঙ্কানাথ।

তখন অঙ্গদ বল্লেন—

পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন—
হাত বুলায়ে দেখ গালে আছে লেজের চিন্।
সেই বালির পুত আমি, রামের কিঙ্কর—
কি হলে সীতা দিবি খুলে তাই বল।
কচ্কচিতে কাজ কি, দেশে চলে যাই—
তোর দশটা মুখের কথা রামকে জানাই—

তখন রাবণ রেগে বলছেন—

কিষ্কিন্ধার বানরা রে—
বল গিয়া তোর খুড়াটারে—
বল গিয়া বানরাধম রঘুনাথে—
সেতুবন্ধ ভেঙে দিক আপন হাতে,
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানেতে থোবে,
উপাড়িল যত বৃক্ষ পুনরায় রোবে;
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরবে কেঁদে,
ঘর-পোড়াকে এনে দেবে হাতে-গলে বেঁধে;
ধনুর্ব্বাণ ফেলে রাম খত্ দেবে নাকে—
তবে যদি কৃপা করি ছাড়ি মিথিলার সীতাকে!

অঙ্গদ বল্লেন—"সব হতে পারে—যেখানকার পর্ব্বত সেখানে নড়ে যেতে পারে; এক লেজের ঘায়ে বাঁধও ভাঙতে পারে, বিভীষণও আসতে পারে দাঁতে কুটো ধরে; কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ নাকে খত দেবে না, সূর্পনখার নাক কাণও জোড় লাগবে না আর ঘরপোড়াকেও আনা যাবে না।"

—"কেন?" বলে রাবণ কট্মট্ করে চাইতে অঙ্গদ বলছেন—"ঘর-পোড়া এনে দিতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু তারে দূর করেছেন খুড়া মহাশয়। সে ঘর পুড়িয়ে যাবার পরই বরখাস্ত হয়ে গেছে।"

—"কেন, কেন ঘর-পোড়াকে বরখাস্ত করা হল কোন দোষে? লেজ-পোড়ার গন্ধ বুঝি বরদাস্ত হলনা তোর খুড়োর?"

—"আজ্ঞে না—সেবারে তার উপর ভার ছিল—

কুম্ভকর্ণের মাথাটা নেবে নখে ছিঁড়ে,
লঙ্কা সহর উপড়ে ফেলবে সাগর নীরে,

অশোক বন শুদ্ধ সীতায় পৌছাবে মাথায় করে,
রাম হাতে নেবে রাবণকে জটা ধরে।

এই চার কার্য্যের একটাও করেনি হনুমান, শুধু নিজের বদনখানি পুড়িয়ে গেছে। সুগ্রীব খুড়ো মাথা কাটছিলেন, দয়াময় রাম কৃপা করে প্রাণদান দিয়েছেন।

না মারিল খুড়া রেখে রামের কথা—
দূর করে দিল মুড়াইয়া দাড়ি গোঁফ মাথা।
কোন দেশে পলাইল, আছে কিবা নাই,
এবারে দূত হয়ে আমি এলাম তাই।"

শুনেই রাবণের বিংশ চক্ষু স্থির, উপস্থিত হৃদ্‌কম্প! অঙ্গদের দিকে চায় আর ভাবে—ঘর-পোড়া করেনি যা লেজ-মোড়া বা করে যায়!

অঙ্গদ তখন হাস্য করে ভাষ্য করছেন—

গেলিরে রাবণ তুই গেলি এতদিনে,
উপায় না দেখি তোর রাম নাম বিনে!
যদি জীতে বাসনা থাকে. গলবস্তর হয়ে
কান্ধে দোলা করে সীতা রামে দেগা বয়ে।
তবু যদি সীতানাথ তোরে করেন রোষ
শ্রীচরণ ধরে মোরা মেগে লবো দোষ!

—আঁ এত বড় কথা!—বলে রাবণ তখন দশমুখ ব্যাদান করে চীৎকার—

বানরারে তোর মুখে পড়ক ছাই
যুদ্ধ করে, মরিব তাতে না ডরাই
বানরারে তোর জীবনেতে ধিক,
বালির বেটা হয়ে হলি নফরের অধিক!
বিভীষণটা হয়েছে রাক্ষসের অধম
লাথি খেয়ে তাই নরের নিয়েছে শরণ।
বিভীষণ আমি নই কুম্ভকর্ণের দাদা,
ত্রিলোক বিজয়ী আমি জেনে রাখ গাধা!

অঙ্গদ তখন কটাক্ষ করে বলছেন—নিজেরে নিজে গাধা বল্লি তুই অতি গরু!!

জলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে
আগুন হয়ে রাবণ রাজা হল বেগুনে তেলে।!

কুড়ি চক্ষু রক্ত, রাঙা হয় কর্ণ, আগুণ যেন জ্বলে—
কুড়ি হাতে দশ জোড়া গোঁফ মুচড়ে বলে
—কোথাকার বানর বর্ব্বরের দূত,
গাল পাড়ে যাতা! ধরতো ধর পূত!

অঙ্গদ তখন অঙ্গভঙ্গী করে বলছেন—

আগে গালাগাল পরে হাতাহাতি
তারপরে চড়চাপড় ঘুসাঘুসি লাথি।

এই বলতে বলতে বিদ্যুৎ না বাজ—চড়চাপড়ের ঝড় বইয়ে রাবণকে ফাঁপর করে সিংহাসন শুদ্ধ আছড়ে ফেলে মাথার দশমুণ্ডি মুকুট কেড়ে প্রস্থান! লঙ্কার পাঁচীল ভেঙে পড়ল, যে কটা রাক্ষসের পুত তার লেজ চেপে ধরেছিল তাদের কারু ভাঙ্গল মাথার খুলি কারো ভাঙ্গল হাড়! রাবণের সভার ঝাড় লণ্ঠন চূরমার, দুর্গতির একশেষ, রাবণ অধোমুখে গায়ের ধূলা ঝেড়ে বারবাড়ি ছেড়ে অন্দরে যান।

লঙ্কার মুকুটখান বিভীষণে দিলেন রাম! অঙ্গদ রায় বীর এইখানে সমাধান।—এই বলে কাণ ঢাকা টুপি, লাল বনাত গায়ে, চটী পায়ে, পুঁথি বগলে সেদিনের মত কথা রেখে চাঁইবুড়ো বাসায় গেলেন।

হেগেনবেকদের এ্যাড্‌ভেঞ্চার — কাহিনী

শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়

কার্লো হেগেনবেকের কাহিনী

[এই কাহিনীর একটি অধ্যায় পৌষের রংমশালে প্রকাশিত হয়েছে—সঃ]

জেব্রা-শীকার অনেক সময় বেবুন-শীকারের চেয়েও বিপদজক, কারণ জেব্রাদের পোষ মানানো অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার এবং ওরা ভারী বদ্‌মেজাজী ও দুষ্ট।

আবিসিনীয়ায় জেব্রাদের ঘিরে ফেলে বন্দী করা হয়। কোন শুষ্ক নদী, যার দু'পাশে উঁচু পাহাড় থাকে, এমন একটা জায়গায় ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রায় দু'হাজার শীকারী ওদের চক্রাকারে ঘিরে ফেলে। তারপর বৃত্তটী ক্রমে ছোট করে আনা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত জেব্রার দল শুষ্ক নদীটিতে আটকা পড়ে। এরূপ অভিযানে বিপদ যথেষ্ট, আমার বেশ মনে

আছে এরূপ একটী শীকারে আমাদের তেত্রিশ জন লোক হত অথবা সাংঘাতিক আহত হয়েছিল।

'এল্যাণ্ড'র বা দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃহৎকায় কৃষ্ণসার মৃগ ধরার কৌশল বুয়োর ও নিগ্রোদের কাছে শেখা। প্রায় ত্রিশজন অশ্বারোহী চারিদিক থেকে হঠাৎ তাদের ঘিরে ফেলে, বয়স্ক কৃষ্ণসার ধরা প্রায় অসম্ভব কারণ এই দৈত্য হরিণগুলির ওজন এক টনেরও বেশী এবং ওরা ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও দ্রুতগামী, ঝড়ের বেগে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবলমাত্র বাচ্ছাগুলিকেই পিছন থেকে ল্যাজ পাকড়ে বন্দী করা হয়। ধরার পরই বাচ্ছা-গুলিকে এক রকম ঔষধ Inject করে দেওয়া হয়। ঔষধগুলি কি দিয়ে তৈরী তা দেশীয় শীকারীরাই জানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঔষধের ক্রিয়া সুরু হয় এবং হরিণগুলি ২৪ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। Injection না দিলে ভয়ে ও উত্তেজনায় বাচ্ছাগুলি মারা পড়তে পারে। প্রচুর নিদ্রার পর বাচ্ছাগুলি সুস্থ হলে এক একটী দুগ্ধবতী গাভীকে দেওয়া হয়। গাভী নিজের সন্তানের মতই তাকে পালন করে।

আমাদের পরিবারের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিযান হচ্ছে—আমার ঠাকুর্দ্দার মঙ্গোলিয়ায় বন্য ঘোড়া ধরা। রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার পশ্চিম অংশ দিয়ে তাদের মঙ্গোলিয়ার অরণ্যে ঢুকতে হয়েছিল। টাকা নিয়েও তাঁরা মহামুস্কিলে পড়েছিলেন। তাঁদের কাছে ইংলণ্ডীয় মুদ্রা ছিল যা সেখানে একদম অচল। শেষে তাঁরা ছোট বড় নানারকম ধাতুর টুকরো, চা, এমন কি রঙ্গীন পশম পর্য্যন্ত টাকা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

বসন্তকালই ঘোড়া ধরার প্রকৃষ্ট সময়। মঙ্গোলিয়ায় বসন্তকালে পৌছবার জন্য তাঁদের শীতকালে সাইবেরিয়া অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং রাশিয়ার শীতকাল যে কি চীজ তা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ঠাণ্ডায় দুধ জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে যেত।

মঙ্গোলিয়ার প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে অভিযান সুরু হল এবং যা হুকুম হয়েছিল তার ছেয়ে অনেক বেশী ঘোড়া ধরা হল। অতিরিক্ত ঘোড়াগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে কি ছেড়ে দেওয়া হবে তার জন্য উপর ওয়ালাদের টেলিগ্রাম করতে হল। সবচেয়ে নিকটস্থ টেলিগ্রাফ ষ্টেসন তিন সপ্তাহের পথ। অনুমতি নিয়ে লোক যখন ফিরে এল তখন উৎসাহী মঙ্গোলীয় শীকারীরা ঘোড়ার সংখ্যা দ্বিগুণ তরে ফেলেছে।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক বোধ হয় সিন্ধুঘোটক ধরা। আমাদের সিন্ধুঘোটক-শীকারে প্রায় প্রতিবারেই দু'একজন শীকারী প্রাণ দিয়েছে। একবার একটা বাচ্ছা সিন্ধুঘোটককে নৌকায় তোলা হলে সে এমন চীৎকার জুড়ে দিলে যে তার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আর একটী বৃহৎকায় পুরুষ সিন্ধুঘোটক আমাদের নৌকা আক্রমণ করে নৌকার তলায় তিনটে প্রকাণ্ড ফুটো করে দিলে। কিন্তু তাহলেও সেবার সকল শীকারীই প্রাণ নিয়ে পালাতে

সমর্থ হয়েছিল। আর একবার কিন্তু দলের প্রত্যেককেই নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। একজন শীকারী হাপুর্ণ ছুঁড়ে দড়িটা তার নির্দ্দিষ্ট খাঁজে না ঢুকিয়ে নৌকার ওপর ফেলে রেখেছিল। ফলে আহত সিন্ধুঘোটকটা সহজেই নৌকা উল্টে দিলে এবং ভীষণ গর্জ্জন করে শীকারীদের আক্রমণ করলে। প্রথম যাকে পেল তার বুকে ওর বৃহৎকায় দাঁতদুটি এফোঁড় ওফোঁড় ঢুকিয়ে দিলে। মোট চারবার রাক্ষসটা জলে ভেসে উঠল এবং প্রত্যেক বারই এক একজন হতভাগ্য শীকারীকে হত্যা করলে। এইভাবে সমস্ত দলটী নির্ম্মূল হল।

জন্তুদের বন্দী করে সুস্থ রাখাও এক হাঙ্গামের ব্যাপার, এসময় তাদের খাদ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে অত্যধিক যত্নের প্রয়োজন হয়।

একবার একজন হিন্দু অদ্ভুতভাবে আমাদের একটা প্রকাণ্ড মোষের নাকের ফোড়া সারিয়ে দিয়েছিল। যখন সব রকম ওষুধ বিফল হল, তখন লোকটী এসে বললে যে সে একদিনে ফোড়া সারিয়ে দিতে পারে। লোকটী একটা অদ্ভুত লতানে গাছের ডাল এনে মোষের ল্যাজে বেঁধে দিলে। লতাটার বিশ্রা গন্ধে মোষটা এত বিরক্ত হল যে ল্যাজ দিয়ে নিজের ফোড়ার উপরই সে ঘা মারতে লাগল। আশ্চর্য্য ব্যাপার মোষটার ফোড়া একদিনেই সেরে গেল। বোধ হয় লতাটার তীব্র গন্ধে ফোড়ার বীজাণুগুলি মরে গিয়ে থাকবে।

মেরুদেশীয় ভাল্লুকের নখ কাটাও এক বিষম ব্যাপার। একবার একটা সাদা ভাল্লুকের নোখ এত বড় হয়ে গিয়েছিল যে নোখগুলি বেঁকে আঙ্গুল ফুঁড়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল! হতভাগ্য জন্তুটা বেশ খানিকটা যন্ত্রণা ভোগ করেছিল।

এই রোগ সারান ব্যাপারে আর একটা ভয়ানক মজার ব্যাপার ঘটেছিল। একবার একটা হাতীর শূল বেদনা সারাবার জন্য তাকে মদ খাওয়ানো হয়েছিল। শেষ মাত্রা খাবার পর সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল যে পশুশালার সমস্ত জন্তুকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। শান্ত করবার জন্য তাকে আরও অনেকটা মদ গিলিয়ে দেওয়া হল!

ইংরাজী হইতে—

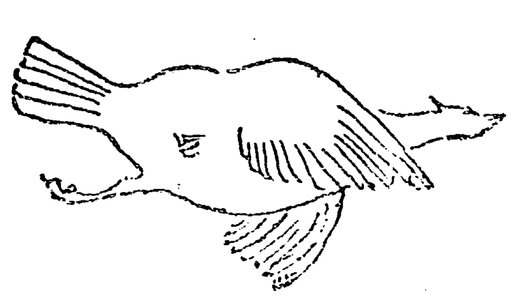

তাইত!

শ্রীইন্দিরা গুপ্ত

বিরাট রাজ সভা। সজ্জিত! সুন্দর! জনাকীর্ণ! মুক্তার মত ঝুরি দেওয়া সুদৃশ্য কিঙ্খাবের চন্দ্রাতাপ—তার তলে স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন রাজাধিরাজ বিজয়াদিত্য। রাজ সিংহাসন ঘিরে পাত্র মিত্র সেনাপতি মন্ত্রী পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ। এমন সময়ে প্রবেশ পথে একটা শব্দ ঝঙ্কার শোনা গেল।

"—নচ দৈবাৎ পরং বলম্—"

"আঃ রেখে দাও তোমার দৈবাৎ—বলং বলং বাহু বলম্—বাহু বলের তুল্য আর বল নেই—"

পর মুহূর্ত্তে খুব উত্তেজিত ভাবে দুটি লোক রাজ সভায় প্রবেশ করল।

প্রথম জন রঘুনাথ মিশ্র, গৌরবর্ণ দীর্ঘ নাসা ছোটখাট লোকটি। পরিধানে কৌষেয় বসন উর্দ্ধাঙ্গ রেশমী উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত—শিখায় একটি ফুল আর করালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা।

অন্যজন ভাস্কর রাও। প্রকাণ্ড জোয়ান—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘবপু উন্নত ললাট—মালকোছা দিয়ে কাপড় পরা, বিশাল দেহে শুভ্র সাটিনের আঙরাখা, মাথায় রক্ত রাঙা উষ্ণীব। দুইজনে রাজাকে অভিবাদন করে যথা যোগ্য আসন গ্রহণ করবার পর মহারাজ সহাস্যে প্রশ্ন করলেন—

"কি—তোমাদের আজকের তর্কটা কি নিয়ে?"

দুইজনে একযোগে নিজ নিজ বক্তব্য বলবার উপক্রম করতে রাজা বললেন, "প্রথমে মিশ্র ঠাকুর আপনি বলুন কি হল আজ?"

ঠাকুর মশায় এক টিপ নস্য নিয়ে সুরু করলেন, "দেখুন মহারাজ! বল বিক্রম পুরুষকার ও যা কিছু বলুন, অদৃষ্টের কাছে সকলেই পরাজিত। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবার সাধ্য কারো নেই। দেখুন—স্বয়ং যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র অদৃষ্টবশে কত দুঃখই পেলেন। লক্ষ্মীরূপা সাধ্বী সতী সীতাদেবী দৈব দোষে রাক্ষসের হাতে অমন ভাবে নির্য্যাতিত হলেন।"

ভাস্কর রাও বলে উঠল—"কিন্তু ঠাকুর রামচন্দ্র যদি অত কাণ্ড করে যুদ্ধ বিগ্রহ করে তাঁকে উদ্ধার না করে অদৃষ্টের দোহাই পেড়ে বসে থাকতেন, তা হলে যে তাঁকে সেই অশোক বনে পড়ে চিরকাল শোক করতে হত।"

"না, না, তাঁর কপালে আছে অন্যরকম, রামচন্দ্র উদ্ধার না করলেও অন্য কোনও রকমে তাঁর মুক্তি হতই। অদৃষ্টে থাকলে কি না হতে পারে! অদৃষ্টে লেখা থাকলে—"

অসহিষ্ণু ভাস্কর বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আহা ঠাকুর কি কথাই বোঝাচ্ছ! তোমার কথা মত সকলে হাত পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকুগ, কারু কিছু করে কাজ নেই, তা হলে অদৃষ্ট ছুটে এসে আপনি সকলের মুখে খাবার গুঁজে দিয়ে যাবে'খন।"

ঠাকুর তেড়ে উঠলেন—"কী যে অর্ব্বাচীনের মত কথা কও ভাস্কর—মানে হয়না। অদৃষ্টে যদি থাকে তা হলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও খাবার আপনি আসবে মুখে—"

ভাস্কর মেজেতে একটা প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত করে বলল—"এর প্রমাণ কই ?"

মিশ্রঠাকুর টিকি নেড়ে কি একটা বলবার আগেই মহারাজা বল্লেন—"থামো, থামো, তোমাদের ছুই জনকে দিয়ে এর একটা পরীক্ষা হোক আজ—কাল ঠিক মীমাংসা হবে।"

মহারাজের ইঙ্গিতে একজন রক্ষী এসে আভূমি প্রণত হয়ে দাঁড়ালে, রাজা আদেশ দিলেন—"এঁদের ছুই জনকে তয় খানার পাশে ছোট চোর কুঠুরীতে বন্ধ করে দাও গে, কাল সকালে খোলা হবে।" পরে সকলের অলক্ষ্যে নিম্নস্বরে আরও যেন কি বলে দিলেন—। রক্ষী সসম্ভ্রমে ছুই জনকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে চলে গেল।

বেলা হয়েছিল সে দিনের মত রাজ কার্য্যে ক্ষান্তি নিয়ে মহারাজও সভা ভঙ্গের আদেশ দিলেন।

পরদিন। তেমনি সাজান সভা। মহারাজ তেমনই সিংহাসনারূঢ়! প্রশান্ত—সৌম্য—সহাস! শুধু একটু যেন চিন্তার কালিমা তাঁর উজ্জ্বল ললাটে—

ভাবছিলেন কাজটা কি ভাল হয়েছে, কাল তাদের ছুজনকে অমন ভাবে বন্দী করে—ব্যবস্থা অবশ্য করা হয়েছিল গোপনে, কিন্তু ওরা যদি হদিস না পায়।"

অবিলম্বে রাজ আজ্ঞায় ভাস্কর ও মিশ্র ঠাকুরকে সভায় উপস্থিত করা হল। সভাশুদ্ধ সকলেই সাগ্রহে তাঁদের মুখের পানে চাইল।

তা কই! তাঁদের ক্ষুৎপিপাসাতুর বলে ত মনে হয় না। দিব্যি তাজা ঢল ঢলে মুখ ছুটি—

মহারাজ প্রথমে ভাস্করকেই সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—"কি হে তোমার কালকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।"

ভাস্কর প্রণাম করে বলল, "মহারাজ! কাল রক্ষী ত একটা অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করল—খানিকক্ষণ রইলাম বসে চুপ চাপ—শেষে মনে হল 'ঠাকুর মশায়ের 'অদৃষ্ট' ত আমায় চেনে না যে আমার কাছে আসবে, দেখি একটু চেষ্টা চরিত্র করে,' এই ভেবে পাগড়ীটা খুলে তারই এক প্রান্তে একটা গিট বেঁধে ছুড়তে লাগলাম। হঠাৎ তাইতে বেধে একবার কি একটা ঝুড়ি মত আমার পায়ের কাছে ঝপাং করে এসে পড়ল। হাত বুলিয়ে দেখি তাতে অনেক কিছুই রয়েছে। সন্দেহ হল, খাবার নয়ত! সন্তর্পণে একটা তুলে মুখে দিলাম—কি বলব মহারাজ জীবনে এমন উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন কখনও খেয়েছি বলে মনে নেই। পেট ভার রাজভোগ খেয়ে—ভাবলাম জল পাই কোথায়? আবার পূর্ব্বের পন্থা অবলম্বন করলাম, ধাঁ করে এক কলসী জল এসে পড়ল আমার পায়ের গোড়ায়—আঁজলা করে খেয়ে সুস্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হতে প্রহরী নিয়ে এল। আচ্ছা বলুন মহারাজ আমারই জিত ত? 'পুরুষকার'কে প্রথম না করলে আজ আমায় 'চিংড়িপোড়া' হয়ে মরতে হত কিনা?"

মহারাজ হাত তুলে বললেন—"সবুর! এবার মিশ্র ঠাকুর আপনি কি বলেন?"

ঠাকুর একটা সুদীর্ঘ হাই তুলে তিনবার তুড়ি দিয়ে বললেন, "হরি হে তুমিই সত্য।" তারপর মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "কি আর বলব প্রভু, কাল ভুরি ভোজনই হয়েছে।

আমি ত জানিই অদৃষ্টে যদি লেখা থাকে উপবাস তাহলে কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তাই স্থির হয়ে বসে হরিনাম জপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি কতকগুলি মিষ্ট দ্রব্য আমার কোলের মধ্যে এসে পড়ল, শ্রীহরিকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করলাম। পরে জলও এসে পড়ল, ঠাণ্ডায় ঘুমটিও ভাল মতই হয়েছে, অদৃষ্টগুণে কোন কষ্টই আমার হয়নি।"

অমাত্য ছুইজনের এজেহার শুনে মহারাজকে সুধালেন—

"তাহলে জয়ী হল কে?"

চিন্তান্বিত মহারাজ কেবল বল্লেন—"তাইত।"

তিন-কুড়ে

শ্রীঅনামি মিত্র

অনেক দূরের এক দেশের এক রাজার তিন পুত্র ছিল।

রাজা সকলকেই সমান ভালবাসতেন, তাঁর মৃত্যুর আগে তাই কার হাতে রাজ্যভার দিয়ে যাবেন স্থির করতে পারছিলেন না। মৃত্যুর দিন তিনি তাঁর তিন ছেলেকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, "প্রিয় পুত্রগণ, তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা কুড়ে তার হাতেই আমার রাজ্য দিয়ে যাবো।"

বড় ছেলে বল্ল, "পিতা, তাহলে রাজ্য আমার; কারণ আমি এত বড় কুড়ে যে যখন আমি ঘুমতে যাই, তখন এমন যদি কিছু আমার চোখের ভেতর পড়ে যে আমি চোখ বন্ধ করতে পারছি না, তা সত্ত্বেও আমি ঘুমতে থাকবো।"

মেজ ছেলে বল্ল, "পিতা, রাজ্য আমার; কারণ আমি এত বড় কুড়ে যে যখন আগুনের ধারে বসি নিজেকে গরম করবার জন্য, তখন আমার পা যদি পুড়েও যায়, তাহলেও কষ্ট করে আমার পা আমি সরিয়ে নিতে পারব না।"

ছোট ছেলে বল্ল, "পিতা, রাজ্য আমার; কারণ আমি এত বড় কুড়ে, যে আমি যদি ফাঁসি যাই, আর আমার হাতে কেউ একটা ধারাল ছুরি দেয় গলার দড়িটা কেটে ফেলবার জন্য, আমার ফাঁসিই হোক সেও ভালো, কিন্তু হাত তুলে আমি দড়ি কাটতে পারব না।"

ছোট ছেলের কথা শুনে রাজা তখনই বল্লেন, "তুমিই রাজা হবে; উপযুক্ত লোক তুমি।"

[গ্রিম্ ব্রাদার্সের অনুবাদ

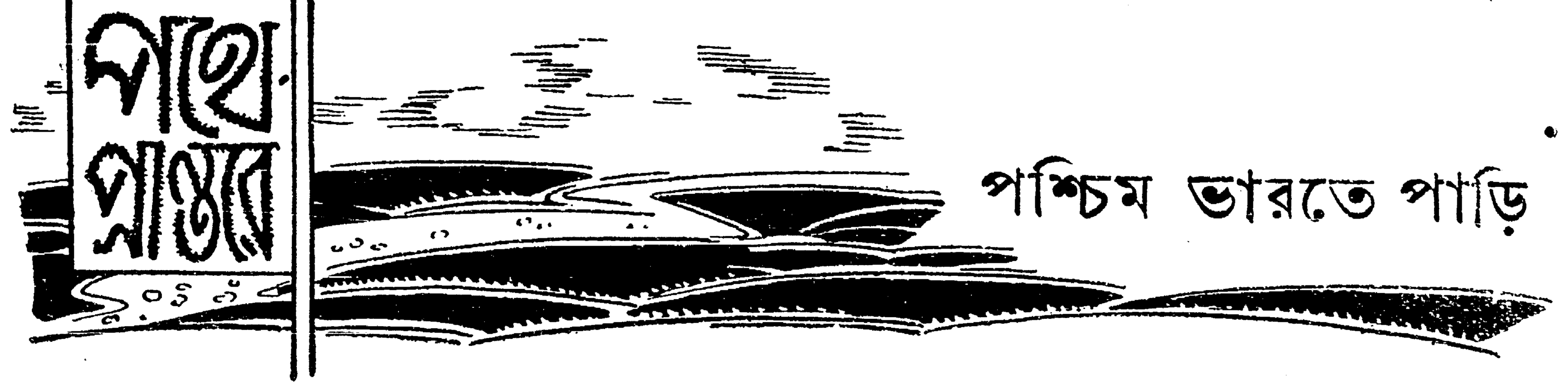

পশ্চিম ভারতে পাড়ি

শ্রীধরণী সেন

গত ২৩শে ডিসেম্বর বিকেলে হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছে দেখি আমাদের অনেক আগেই যুদ্ধক্ষেত্রের পলাতক বীর বাহিনীরা পঙ্গপালের মত গিজগিজ করছেন। অনেক ঠেলাঠেলি ও 'ইধার যাও' 'উধার যাও' করতে করতে ৭নং প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছলাম। এক ঘণ্টা 'লেট' করে বম্বে মেল ছাড়ল এবং আমরাও (অর্থাৎ আমি ও আমার ছোট বোন) নিঃশ্বাস ছাড়লাম না, না, ভেবো না কলকাতা থেকে পলাতক হলেও অন্য যাত্রীদের মত আমরা ভয়ে পালাচ্ছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ; আগে পশ্চিম-ভারত ভ্রমণ, পরে যুদ্ধে গমন।

পরদিন বিকেলে আমরা নাগপুর পৌঁছলাম এবং সেখানেই নেমে পড়লাম। কারণ, আমাদের প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল জালগাঁও যাওয়া—জালগাঁও থেকে 'অজন্তা' যাওয়া। জালগাঁওতে মেল থামেনা, তাই আমরা রাত্রে নাগপুর এক্সপ্রেস নেবো ঠিক করলাম আর ইতিমধ্যে নাগপুরে আরাম করে স্নান খাওয়া দাওয়াও সেরে নিতে পারব।

রাত্রে উঠে পরদিন ভোরে আমরা জালগাঁও পৌঁছলাম। ট্রেনেই এক ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম যে জালগাঁও ষ্টেসনের কাছেই 'বম্বে লজ' বলে একটি হোটেল আছে এবং সেই হোটেলের কাছ থেকেই অজন্তা যাবার বাস ও ট্যাক্সি দুই-ই পাওয়া যায়। হোটেলে পৌঁছে দেখলাম, মন্দ নয়, জন পিছু দিন চার্জ্জ ২৲। স্নান করে কিছু খেয়ে নিয়ে তৈরী হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলাম আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি বাস ছাড়বে। জন পিছু ২॥০ টাকা যাওয়া আসা খুব সস্তাই বলতে হবে। ট্যাক্সিও আছে, ২৫৲ নেয় (৪ জন যাত্রী), অজন্তা দেখার জন্য সেও কিছু বেশী নয়। হোটেলে অজন্তা-যাত্রী আরো দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁরা দুজনেই বেরার প্রদেশের সাব-জজ্। দুই মানিক-জোড় ও ভারী মজার লোক। আমরা তাঁদের নাম দিলাম নিঃ লরেল ও হার্ডি। অবশ্য এ নামটা তাঁদের আর বলিনি।

'অজন্তা' জালগাঁও থেকে ৩৫ মাইল এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত। ৯টার সময় আমাদের বাস ছাড়ল। (লরেল্ ও হার্ডি বলেছিলেন, কেন মশায় ট্যাক্সির দরকার কি?) এবং ১১টায় আমরা অজন্তায় পৌঁছে গেলাম।

এই অজন্তা গুহাগুলি সেদিন আমরা দুই চক্ষু ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখেছিলাম তা কোনদিন ভুলব না। এই গুহাগুলি, তাদের ভেতরের নানা চিত্র, নানা মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য পৃথিবীর পরম বিস্ময়। অজন্তায় সবশুদ্ধ ২৯টি গুহা, তার মধ্যে ৫টি চৈত্য ও বাকিগুলি

বিহার। প্রায় প্রত্যেক গুহার দেওয়ালে, ছাতে থামে নানা রঙে অঙ্কিত চিত্র। চিত্রের দৃশ্যগুলি ও বিষয় বস্তু জাতক ও বুদ্ধের নানা জীবন চরিত নিয়ে, বৌদ্ধ যুগের নানা ঘটনা অবলম্বন করে আঁকা। এই গুহাগুলি দেখে প্রফেসর রথেনষ্টাইন বলেছিলেন যে চোখের সামনে এক সুবিরাট নাটক যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! রাজা রাজপুত্র, ঋষি মহর্ষি, বীর, পুরুষ নারী উপবনে বনে, উপত্যকায় উদ্যানে, নগরে সহরে, পথে প্রাসাদে লীলাখেলা করছেন আর ওপরে আকাশপথে স্বর্গের পরীরা বিহার করছেন। গুহাগুলি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন পৃথিবীর কোলাহল থেকে ভিন্ন এক আনন্দের রাজ্যে এসে পড়েছি, এক রূপের রসের রঙের রাজত্ব আমরা যেন প্রত্যক্ষ করছি। সমস্ত গুহার চিত্রগুলি আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব, তার সমস্ত বর্ণনা করতে গেলে ২।৫ খানা বই শেষ হয়ে যাবে। আর এগুলি সহজ করে উপভোগ করতে ও বুঝতে গেলে, এদের প্রত্যক্ষই দেখা উচিৎ। যা হোক, আমি তোমাদের একটি গুহা—১নং গুহাটির সম্বন্ধে কিছু বলছি। তোমাদের একটি কথা আগে বলে রাখি যদি অজন্তায় কেউ তোমরা যাও, নিশ্চয় যাবে একদিন, খুব শক্তিশালী বড় রকমের একটি টর্চ্চ নেবে কারণ গুহাগুলির ভেতর বেশ অন্ধকার। ১নং গুহাটি বেশ বড় এবং এর চার দিকের দেওয়ালই নানা রঙীন চিত্রে পরিপূর্ণ। এই গুহাটিতে আমরা কয়েকটি বোধিসত্ত্বর দেখা পেলাম, বিশেষ করে অবলোকিতেশ্বর ও পদ্মপাণি—তাঁদের সাজসজ্জা, ভঙ্গিমা, চাহনি, দেহাবয়ব অতি অপরূপ। তারপর আরো অনেক দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ করে দেখলাম—রাজ প্রাসাদের একটি দৃশ্যে মেয়েদের মজলিশ ও অন্যত্র একটি অপরূপ নাচের দৃশ্য চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারপর রাজপ্রাসাদ দ্বারে ভিক্ষুকের দৃশ্য ও আরো নানা দৃশ্যাবলীতে এ গুহাটি পরম রমনীয় তীর্থ স্থানের মত।

'অজন্তা' নামটি কিন্তু হচ্ছে এ গুহাগুলির নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামের নাম। ঐ অজন্তা গ্রামের নাম থেকেই এই গুহাগুলির নাম। সমস্ত গুহাই পাহাড় খোদাই করে গড়া। অর্দ্ধ চন্দ্রকার পাহাড়ের কোলে প্রায় ২৫০ ফিট উচুতে গুহাগুলি পাশাপাশি একটার পর একটা সাজান। গুহাগুলি থেকে আশে পাশে ও নীচের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। নীচে দেখা যায় একটি পাহাড়ী নদী লাফ দিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বৌদ্ধদের শিক্ষা ও সাধনার যে এটি একটি পরম রমণীয় পীঠস্থান ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে আশ্চর্য্য শিল্পীদল পৃথিবীর চির বিস্ময় এই চৈত্য, বিহার, মূর্ত্তি ও চিত্র অজন্তায় অমর করে গিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে। সেদিন আর আমাদের ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা আগত, শেষ প্রণতি জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

'অজন্তা' থেকে যখন আমরা আবার জালগাঁও 'বম্বে লজে' ফিরে এলাম, তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে! তাহলেও আমরা ঠিক করলাম সেই রাতেই জালগাঁও থেকে আমরা মানমাদ যাবো এবং মানমাদে গাড়ী বদলে আওরাঙ্গাবাদের উদ্দেশে নিজাম রাজ্যের ছোট গাড়ীতে উঠব। মুখ্য উদ্দেশ্য আওরাঙ্গাবাদ থেকে 'এলোরা' দেখতে যাওয়া। তাহ'লে এলোরা ও অজন্তা শিল্পীদের এই জোড়া তীর্থ আমাদের একযাত্রায় দেখা হবে। কিন্তু আমাদের দুই বন্ধু লরেল ও হার্ডি অন্য রকম ঠিক করেছেন; তাঁদের ইচ্ছে এলোরার উদ্দেশ্যে পরদিন যাত্রা করবেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম, তাই তাঁদের বললাম, 'কিন্তু আমরা যে ঠিক করে ফেলেছি, চলুন না? আলাপ হল, একসঙ্গে অজন্তা দেখা হল, একসঙ্গে

এলোরাও দেখা যাক।' তাঁরা বললেন, 'আচ্ছা দেখি, আপাততঃ দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে এবং এই হোটেলের ব্রাহ্মণী শাক্‌শবজী খেয়ে আর পোষাচ্ছে না, আগে আমরা একটা মোগলাই হোটেলে কিছু পরমাংস খেয়ে আসি।'—এই বলে তাঁরা সেই যে অন্তর্ধান করলেন আর আসেন না। খাওয়াদাওয়া তৈরী হওয়া আমাদের অনেকক্ষণ হয়ে গেল। লরেল হার্ডির জন্য অপেক্ষা করে করে শেষে নিরুপায় হয়ে বম্বেগামী পেশাওয়ার এক্সপ্রেস ধরতে আমরা ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলুম। একযাত্রায় এলোরা আমরা দেখবই। কিন্তু ষ্টেশনে এসে দেখি দুই মানিক-জোড় হাজির ও আমাদের দেখে হেসে অস্থির। মিঃ হার্ডি বললেন, 'যা কুল্‌কুলেসন্ (calculation) করা যায়, দেখছেন তা হয় কি হয় না।' 'কুল্‌কুলেসন্' শুনে আমাদের 'খিল্‌খিলেসন' হবার যোগাড়। যাক্ ট্রেন এসে পড়ল।

রাত দুটোর সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে মানমাদ জংসন গাড়ী বদলে নিজামের ছোট গাড়ীতে চেপে ভোর রাতে আমরা আওরঙ্গাবাদে পৌঁছলাম। আমরা 'রয়েল' ক্লাশে ট্রাভল করছিলাম, তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে এদের রয়েল ক্লাশ সত্যিই, বৈদ্যুতিক পাখা আছে। কিন্তু এই শীতে মরতে পাখা আর কে খুলবে বল? যাহোক, আওরঙ্গাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি দুতিনখানা মোটার আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের একটিকে আমরা ১০৲ টাকায় ঠিক করলাম। স্থির হোল আমাদের আওরঙ্গাবাদের দ্রষ্টব্যগুলি, দৌলতাবাদ ফোর্ট ও এলোরা দেখিয়ে আনবে। আমরা এখানকার ডাকবাংলোয় এসে উঠলাম (এখানে একটা ভাল সরাই আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জায়গা ছিল না) এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে চা জলখাবার খেয়ে একে একে তৈরী হতে লাগলাম। সারাদিন ঘুরতে হবে তাই সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়া স্থির হল।

প্রথমে আমরা দেখলাম তাজমহলের অনুকরণে তৈরী 'বিবিকা মাকবারা' অর্থাৎ আওরঙ্গাবাদের বেগম বারি দৌরাণীর স্মৃতি সৌধ। তাজমহলের সঙ্গে তুলনা হয় না কিন্তু দেখবার মত এর নিজের বিশেষত্বও আছে। এরপর থেকে সুরু করে আমরা দেখে চললাম অনেক জিনিষ, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সাহ্ মুসাফিরের সৌধ-পানচাকি ও মোগলযুগের কিলা-আর্ক বা দুর্গপ্রাসাদ এবং দৌলতাবাদ ফোর্ট। এই কেল্লাটি অদ্ভুত ও একেবারে দুর্ভেদ্য। এর ভেতরের অস্ত্রাগার, সৈন্যদের থাকার ঘরদোর, যাওয়া আসার গোপন পথঘাট, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ ইত্যাদি দেখে মনে হল এটি সে যুগের একটি পয়লা নম্বরের কেল্লা ছিল। এই কেল্লা দখল নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে অনেক কথা লেখা আছে। এই কেল্লার ভেতরে চাঁদ-মিনার ও চিনি-মহল দেখবার মত। চিনি-মহলে গোলকণ্ডার এক রাজা আবুল হাসান ১৬৮৭ সালে বন্দী হয়েছিলেন। এমনি অনেক ঐতিহাসিক এ্যাডভেঞ্চার এই কেল্লাটির সঙ্গে বিজড়িত।

দৌলতাবাদ থেকে আমরা বিখ্যাত এলোরা গুহাগুলিতে এলাম। একটি ঢালু পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি গুহা। এতবড় গুহা অজন্তায় নেই, বিশেষ করে কৈলাশ গুহাটি। পাহাড় কাটা বিরাট মূর্ত্তিগুলি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। শুধু দেব দেবী দানবদের মূর্ত্তি নয়, নানা জীব জন্তুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। সুবিরাট কৈলাশ গুহাটি একটি যেন প্রকাণ্ড দ্রাবাড়দের মন্দির। এক জায়গায় দশানন রাবণ শিবপার্ব্বতী ও সাঙ্গপাঙ্গ শুদ্ধ সমস্ত কৈলাশ মাথায় নিয়েছেন দেখলাম। তোমরা জানো রাবণের দুঃসাহসের

কাহিনী। এমনি অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পৌরাণিক গল্পের ঘটনা পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এই কৈলাশ গুহা মন্দিরটি ও তার অতি বিরাট কিন্তু অপরূপ মূর্ত্তি দেখে হতবম্ব হতে হয়। কি করে এই জিনিষ এত নিখুত ভাবে করা সম্ভব হয়েছে! এলোরার সমস্ত গুহাগুলি তিনভাগে ভাগ করা যায়—বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণী ও জৈন যুগের। সমস্ত গুহাগুলি তন্ন তন্ন করে আমরা দেখলাম। আমরা যেন বর্ত্তমান যুগ থেকে সেই সুপ্রাচীন যুগগুলির বিরাট অন্তরে মিশিয়ে গিয়ে তার রোমান্স তার জীবন্ত কাহিনীগুলি একের পর এক প্রত্যক্ষ করলাম। আজকালকার যুগে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না।

এলোরা থেকে যখন আমরা আওরঙ্গাবাদে ডাক বাংলোয় ফিরে এলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর বোম্বাইর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হবে। লরেল-হার্ডি হায়দ্রাবাদ যাবেন, তাই বিদায় সঙ্কল্পে রাতের খাওয়ায় তাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন।

পরদিন ভোরে আমরা ইলেট্রিক ট্রেণে ভারতের সদর বোম্বাই (ভিক্টোরিয়া বা ভি টি ষ্টেশনে) পৌঁছলাম। আগেই খবর নিয়েছিলাম যে ভি-টি'র কাছেই হর্ণবি রোডে একটি বাঙ্গালীর হোটেল—'বেঙ্গল লজ্' আছে। সেখানে গিয়েই আমরা উঠলাম। কয়েকজন তরুণ বাঙ্গালী বোর্ডার ছিলেন, বম্বেতেই চাকুরী বা ব্যবসা করেন—তাঁদের সঙ্গে আলাপ হতে এক মিনিটও দেরী হল না। বহুদিন পরে মাছের ঝোল খেয়ে মন খুসী হয়ে উঠল। বোম্বাই একেবারে কাজের দেশ স্থির হয়ে এখানকার লোকেদের বসবার সময় নেই। কলকাতার মত ট্রাম বাস ট্যাক্সি গাড়ি ঘোড়া ও লোকের ভীড়। কিন্তু ব্যবস্থা ও লোকেদের ব্যবহার অনেক ভাল। লোকাল বৈদ্যুতিক ট্রেণগুলি অনঃবরত যাওয়া আসা করছে। অনেক লোকেরা এই ট্রেনে করে অফিস করতে যায়। আমরা বিকেলে হোটেলের এক বাঙ্গালী বন্ধুকে (এঁর নাম মিঃ মিত্র, ইনি ৭ বছর দেশ ছাড়া ও এঁর জীবন খুব এ্যাড্‌ভেঞ্চার-ময়) সঙ্গে করে 'মালাবার হিল্', সমুদ্র ইত্যাদি দেখতে বেরলাম। মালাবার হিলে বিখ্যাত বাগানটিকে আমরা দেখলাম—ভারী চমৎকার ফলফুল লতাপাতায় কেয়ারি করা সাজান বাগান। এখান থেকে নীল আরব সমুদ্রের দৃশ্যটি ছবির মত সুন্দর। বম্বে সহরের দৃশ্যটিও এখান থেকে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। 'মালাবার হিল' থেকে নেমে বাসে করে আমরা গেলাম 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মিউজিয়ম' দেখতে। মিউজিয়মটি দেখে শেখবার মত এবং খুব সুন্দর করে সমস্ত বিভাগগুলি সাজান। কলকাতার মিউজিয়মের চেয়ে এই মিউজিয়মটি ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগবে। আমাদের এক বন্ধু একজন বাঙ্গালী মিঃ চক্রবর্ত্তী এই মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিউরেটার। তিনি আমাদের দেখে ভারী খুসী হলেন, নানা গল্প করলেন ও আমাদের চা খাওয়ালেন। এরপর আমরা বন্দরের দিকটা ও 'গেট্ অফ্ ইণ্ডিয়া' দেখলাম। সমুদ্রে জাহাজগুলি দেখা যায়, কোথাও পালতোলা নৌকা। বেশ শান্তশিষ্ট সমুদ্র, অনেকে দেখলাম 'লঞ্চে' সমুদ্র বক্ষে একটু বিহার করে আসছেন।

সে রাত্রে বোম্বাইতে আমরা ৩।৪ দিন থাকব স্থির করে, হোটেলে জিনিষপত্র রেখে আমরা ইতিমধ্যে পুণা দেখে আসার মতলব করলাম। পরদিন ভোরে আমরা পুণা এক্সপ্রেসটী ধরলাম। ১১৯ মাইল কিন্তু মাত্র ২॥০ ঘণ্টার রাস্তা। খুব জোরে এই ইলেকট্রিক ট্রেনগুলো যায় এবং ধোঁয়া ধুলো কিছু নেই। গাড়ীগুলি যেমন পরিচ্ছন্ন, গাড়ীর যাত্রীরাও তেমনি খুব পরিষ্কার, ভদ্র ও আলাপী। আর এই ১১৯ মাইল রাস্তার দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত

সুন্দর, যে বর্ণনা করা যায় না। সমুদ্রের ধার দিয়ে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কোল দিয়ে, তল দিয়ে, লম্বা লম্বা ৭।৮ টি টানেলের ভেতর দিয়ে পশ্চিম ঘাটের 'ভোরঘাট' গিরিপথ ধরে বম্বে-পুণা এই রেলপথটি চলে গিয়েছে। পশ্চিম ঘাটের আর একটি গিরিপথ 'থালঘাট' দিয়ে জি, আই, পি লাইন (নাগপুরের দিক থেকে) বম্বে প্রবেশ করেছে।

পুণা ষ্টেশনে দেখি আমাদের পরিচিত ডেকান কলেজের একটি ছাত্র মিঃ বালকৃষ্ণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা ষ্টেশনের নিকটেই দাভে (Dave) হোটেলে উঠে স্নানাহার সেরে বালকৃষ্ণর সঙ্গে টাঙ্গা করে পুণা সহর ও সহরতলী দেখতে বেরলাম। পশ্চিম ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে পুণা সহরটি অগ্রণী। এখানে অনেকগুলি কলেজ ও গবেষণা মন্দির আছে। মেয়েদের শিক্ষার বিলি বন্দোবস্ত খুব ভাল। আমরা মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়, হোষ্টেল-গুলি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি দেখলাম। কলেজের মধ্যে ফার্গুসন্ কলেজ, ওয়াদিয়া কলেজ, ডেকান কলেজ প্রভৃতি শিক্ষামন্দিরগুলি দেখলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলেজের বাড়ী, হোষ্টেল, ক্লাসরুম,গবেষণাগার, লাইব্রেরী ও নাটমন্দির দেখে মনে হল এখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সকল সুব্যবস্থাই আছে। কলেজ ও কতকগুলি স্কুল দেখে আমরা পুণার হাওয়া-অফিস দেখ-লাম। এখান থেকে সমস্ত ভারতবর্ষের আবহাওয়ার খবরাখবর সংগ্রহ করা ও পাঠান হয়। আবহাওয়া মাপজোপের নানা যন্ত্রপাতি দেখলাম। তারপর এখানকার বাগান, বাজার ইত্যাদি ঘুরে সবশেষে পুণার প্রভাত ফিল্ম ষ্টুডিয়ো দেখে আমরা সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সকালে পশ্চিম-ভারতের বিখ্যাত শৈলাবাস মহাবালেশ্বর (৪৫০০ ফিট উঁচু) ঘুরে আসার উদ্দেশ্যে আমরা একখানি ট্যাক্সিতে রওয়ানা হলুম। পুণা থেকে মহাবালেশ্বর ৭০ মাইলের ওপর ও রাস্তা খুব পাহাড়ী। এখানকারও দুধারের পাহাড় ও মালভূমির দৃশ্য অতি সুন্দর। থাকে থাকে মালভূমি ছবির মত সাজান। ঘণ্টা তিনেক বাদে আমরা মহাবালেশ্বর পৌঁছলাম। জায়গাটা অনেকটা কাসিয়ঙ এর মত। মহাবালেশ্বরে অনেকগুলি 'পয়েণ্ট' (point) আছে যেখান থেকে নীচে চারিদিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখা যায়। আমরা 'উইল্‌সন পয়েণ্ট' থেকে বিরাট মালভূমির অতি মনোরম দৃশ্য দেখতে পেলাম। ভারতবর্ষের আর কোথাও এক জায়গা থেকে একসঙ্গে মালভূমির এতটা বিরাট দৃশ্য চোখে পড়ে কিনা জানিনা। এখানে ছোট বড় অনেকগুলি জলপ্রপাতও আছে, তাদের মধ্যে চায়না-ম্যান্ ফল্‌স্ উল্লেখযোগ্য। একটু দূরে মহাবালেশ্বর মন্দিরটিও দ্রষ্টব্য।

মহাবালেশ্বর থেকে মেল্-বাসে করে যখন আমরা পুণায় ফিরে এলাম তখন রাত প্রায় ৯টা। সে রাত্রি আমরা পুণা ষ্টেশনের ওয়েটীং-রুমেই কাটালাম। পরদিন সকাল ৮টায় সুদৃশ্য দ্রুতগামী ট্রেন 'ডেকান কুইন'এ অতি আরামে ও রাস্তার রমনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে বোম্বাই ফিরে এলাম।

বোম্বাইতে এসে আরো তিনদিন আমরা ছিলাম ও নানা জায়গায় হেঁটে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, বাসে ঘুরলাম। বোম্বাইয়ের সুদৃশ্য কলেজ স্কুলগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়, আর্টস্কুল, ভিক্টোরিয়া গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা, বড় ডাকঘর, মার্কেট, মেরিণ লাইন (সমুদ্রের ধার) ইত্যাদি ইত্যাদি সবই দেখা গেল। বোম্বাইর দুটি চারটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার—যেমন এখানকার বড় বড় ব্যবসা কারবার সমস্ত ভারতীয়দের হাতে; সাহেব ঘেঁষা হালচাল নয়; রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন; কলেজ স্কুল ডাকঘর বিল্ডিংগুলি দেখবার মত; বাড়ী ঘর দোর নতুন আদব কায়দায়

তৈরী; ট্রামে বাসে রাস্তায় লোকেরা অর্থাৎ ভীড় অভদ্র নয়; ট্রাম বাসের কণ্ডাক্টাররাও বেশ ভদ্র ও বিনয়ী; আর পুলিশদের দেখলে ভয় হয় না।

বোম্বাইর সমুদ্রের ধারগুলি আমাদের খুব ভাল লাগল, বিশেষ করে 'মেরিণ্ লাইন্'—সমুদ্রের ধার ঘেঁসে অনেক দূর গিয়েছে। বিকেলে এখানে যেন মেলা বসে যায়। এ সময়টা ভারী চমৎকার—সমুদ্রের হাওয়া ফুরফুর করছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রঙবেরঙএর পোষাক পরে ছুটোছুটি করছে। দূরে পালতোলা নৌকোগুলি, আরো দূরে জাহাজের আবছায়া, আর সমুদ্রের সীমান্তরালে অস্তমান লাল সূর্য্য। ভারতের তটভূমি এখানে শেষ। ওপারে না-দেখা-যায় আরব ও আফ্রিকা।

শেষদিন বোম্বাই থেকে মাইল ১২ দূরে আমরা 'জুহু'র সমুদ্রতীর দেখতে গেলাম। লোকাল ইলেকট্রিক ট্রেনে 'মেরিন লাইন' ষ্টেশনে উঠে 'স্যাণ্টা ক্রস্'এ নেমে মাইল খানিক হেঁটে (বাসও আসা যাওয়া করে) 'জুহু' পোঁছান যায়। দেখলাম, অত সুন্দর বোম্বাইর সমুদ্রতীর কিন্তু তার চেয়েও অনেক সুন্দর এই জুহুর সমুদ্রতীর। নারকেল গাছ ঘেরা সবুজ পাড়-দেওয়া প্রশস্ত বালুবেলা। পুরীর সমুদ্রতীরের মত রুক্ষ নয়, স্নিগ্ধ। পুরীর সমুদ্রের সে উত্তাল তরঙ্গমালা নেই, শান্ত। নদীর মত ছল্‌ছলে। কিন্তু দুষ্টু ছেলেমেয়ের মত খুসীতে উপছে উঠে আমরা ক'জন খুব ছুটোছুটি করলাম।

সে রাত্রে বাম্বাইর কাছে তখনকার মত বিদায় নিয়ে আমরা বোম্বাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে বি, বি, সি, আই'র গাড়ী ধরতে এলাম। ওঃ কোথায় যাবো তা বুঝি বলিনি? দেখেছো কি ভূল! যাবো বরোদা ও আমেদাবাদ, এ দুটি যায়গায় না গেলেই নয়। প্রথম যাবো বরোদা, কিন্তু ষ্টেশনে এসে শুনলাম গুজরাট মেল্এ আমাদের জায়গা হবে না! তার ১ ঘণ্টা পরে দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়বে,—তাইতে যেতে হবে। তাই সই বাপু, একটাতে গেলেই হল।

পরের দিন ভোর রাত্রে আমরা বরোদা রাজ্যে পৌঁছলাম।

যে দিন পৌঁছলাম সেদিন বরোদায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসবে। এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করে তার আলাপ আলোচনায় ভাগ নেওয়া আমার একটা সঙ্কল্প ছিল। কলকাতায় শুনেছিলাম আমাদের এক নিকটাত্মীয় কাকা বরোদায় থাকেন—কিন্তু বরোদার কোন্ জায়গায় থাকেন তা জানা ছিল না। অবশ্য কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার আগে থেকে আমাদের থাকবার এক জায়গা ঠিক করে রেখে ছিল এবং সেখানে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ীও প্রস্তুত, এসে খবর দিলে। কিন্তু কাকার বাড়ী থাকা ও অন্যত্র বাস করা—এ-দু'য়ের তো অনেক তফাৎ আছে। কাকার বাড়ী খুঁজে বের করতেই হবে স্থির করলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না—একজন ভলাণ্টিয়ারই বলে দিলে ঠিকানাটা। কিন্তু মাইল পাঁচেক দূরে শুনে আবার আমরা একটু ঘাবড়ে গেলাম। নাঃ যাওয়াই ঠিক করলাম ও একটা টাঙ্গাতে জিনিষপত্র উঠিয়ে চড়ে বসলাম। সিক্স-সিটার টাঙ্গা ছুটল।

কাকার ঘুম আচমকা ভাঙ্গিয়ে আমাদের পরিচয় দিলাম। সেও ভারী মজার। কত বছর কাকা আমাদের দেখেননি, আমরাও কাকাকে দেখিনি। ঘুম ভাঙ্গিয়ে গোলমালে পরিচয়টা ঠিকমত তাঁর কাণে পৌঁছল না। কিন্তু বাঙ্গালী—ও নিশ্চয় আমরা কেউ আত্মীয়ই হবো, নইলে এমন করে আর কেউ আসে! চেনায় আর তাই দরকার কি! কাকা খুসী হয়ে

একেবারে হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন।—কেন আমাকে লেখনি, আমি গাড়ি নিয়ে ষ্টেশনে যেতাম—তোমাদের কষ্ট হল—ইত্যাদি ইত্যাদি। কাকার বাংলোটি চমৎকার, শোবার ও বসবার ঘরগুলির নিখুঁৎ সাজান গোছান আদব কায়দায় মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি—এই ছবিগুলি নিয়ে একটা আর্ট প্রদর্শনী খোলা যেতে পারে। আরো এমনি অনেক আর্টিষ্টিক জিনিষপত্র। না, কাকাকে এবং কাকার বাংলোটি আমরা না ভালবেসে পারলুম না। আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি। কাকার নিজের জীবনও খুব রোম্যান্টিক ও এ্যাড্‌ভেঞ্চারময়। ছোট্ট বয়সে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে পালিয়েছিলেন। নানা দেশ নানা জায়গায় নানা বৈচিত্রের মধ্যে অনেক বছর সেখানে কাটিয়েছেন। দিনের বেলা খেটে উপার্জ্জন করে সেই অর্থে পড়াশুনা করেছেন। একবার সিকাগো থেকে হেঁটে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলেন। ইউরোপ ছাড়াও এসিয়ারও নানা দেশে ঘুরে এসেছেন। কাকার এই এ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী তোমাদের জন্য রংমশালে লিখতে তাঁকে বললাম।

যা হোক, নিজের বাড়ীর মতই আনন্দে ও আরামে থেকে ও কাকার সঙ্গে গল্প করতে করতে আর এদিকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলাপ আলোচনার মধ্যে বরোদা আমাদের কাছে বেশ ভালই লাগল। বরোদা জায়গাটিও বেশ পরিপাটি। এখানকার বাগানগুলি দেখবার। তাছাড়া কলাভবন, মিউজিয়াম, কীর্ত্তিমন্দির, সুরসাগর, রাজপ্রাসাদ, ন্যায়মন্দির, সরকারী দপ্তরগুলি ও সায়েন্স ইনষ্টিটিউট ও বরোদা কলেজের বিভিন্ন বিভাগগুলি প্রভৃতি বিশেষ দ্রষ্টব্য। এদিককার অর্থাৎ বোম্বাই, পুণা ও বরোদার কলেজগুলি দেখলে কলিকাতার অলি-গলির কলেজগুলিতে আর পড়তে ইচ্ছে হয় না।

বরোদায় থাকতে থাকতে একদিন রাত্রে কাকিমা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা দিল্লী থেকে এসে পড়লেন। সেও এক ভারী মজার ব্যাপার। প্রণামাদির বৃহৎ ব্যাপার চুকল, কাকিমা আমাকে জিগেস করলেন, 'তুমি কি...অমুক?' (সেটি আমার দাদার নাম!) 'তুমি কি... পড়ছ?' (ও কাজটি আর করি না!) শেষে কাকা এসে এই কমেডি অফ এরারস্ থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু তারপর থেকে কাকা আর নয়, কাকিমা একাই আসর জমালেন। ভারী আমোদে লোক কাকিমা ও খুব মজার গল্প, শুধু গল্প নয়. চমৎকার টিপ্পনী (ইংরাজিতে ধরো কমেণ্টারি) দিয়ে গল্প করতে পারেন। কাকিমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও আলাপ হল। সুনীল, মণিকা ও তিলোত্তমা। বড় ছেলের সঙ্গে কেবল দেখা হল না, তিনি জামসেদপুরে আছেন। আর একজন ছোট্ট মানুষের সঙ্গে আলাপ হল—তার নামটিও মিষ্টি—শিশু। বেশ হৈ চৈ করে সকলের সঙ্গে চারদিন কাটিয়ে ৫ই রাত্রে আমরা বরোদা থেকে আমেদা-বাদের গাড়ীতে উঠলাম।

পরের দিন ভোর রাতে আমেদাবাদে পৌঁছলাম। সহর ছেড়ে সবরমতী নদী পার হয়ে 'এলিস ব্রিজে' বন্ধুর বাড়ী গিয়ে বন্ধু ও মা'কে ঘুম থেকে তুললুম। ও বলিনি বুঝি—এ বন্ধুটি কে? ইনি শুধু আমাদেরই বন্ধু নয়, তোমাদেরও বন্ধু। এঁকে তোমরা নিশ্চয় চেনো—ইনি রংমশালের সেই 'শামুক'। শামুকের বাড়ী অর্থাৎ আমাদেরই বাড়ী! তোমরাও যদি কেউ আমেদাবাদে যাও, সোজা শামুকের বাড়ী, এলিস ব্রিজ বললেই হবে। যাক পৌঁছেই আমি তো বিছানায় ঢুকে এক চোট ঘুম। বিছানা সুন্দর করে করা ছিল। একটু বাদেই বিছানার পাশে তার চেয়ে সুন্দর চা এল।

বিকেলে সব বেড়াতে বেরুন গেল। গান্ধীজির বিখ্যাত সবরমতী আশ্রম দেখে এসে পুণ্য সঞ্চয় করা গেল। একদিকে হরিজন ছেলেমেয়েরা থাকে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্যদিকে গোশালা। এদিক ওদিক আরো বেড়ান হল। তারপর বাড়ীতে এসে মা'র সঙ্গে গোলবৈঠক—চেঁচামেচি, হিহি, আর হৈ চৈ। আর মা'র মিষ্টি হাতের রান্না খাওয়া। আলাপীদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল—মিঃ ও মিসেস দত্ত ও তাঁদের চট্‌পটে ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে। মিঃ দত্তর সৌজন্যে ক্যালিকো মিল দেখা হল আর মিসেস দত্ত নিমন্ত্রণ করে চা খাওয়ালেন। খুব চমৎকার লোক তাঁরা। আমেদাবাদে একদিকে যেমন শান্তিময় সবরমতী আশ্রম আর একদিকে তেমনি কর্ম্মময় ক্যালিকো মিল—আমেদাবাদের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মত—এ দুটি বিশেষ দেখা উচিৎ। বর্ত্তমান ভারতের দুটি বিভিন্ন আদর্শ-ধারার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় হল। আমেদাবাদ সহরটি খুব প্রাচীন এবং এই প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন এখানে ও আশে পাশে আছে। একটি গুজরাটি পরিবারের সঙ্গেও আমাদের আলাপ হল। তাঁদের ছোট্ট ছোট্ট দু'টি মেয়ে গরবা নাচ দেখালে—একটি ছেলে গান গেয়ে শোনাল। আমেদাবাদে তিন দিন এমনি করে যেন তিন মূহূর্ত্তে কেটে গেল, জানতে পারলাম না। নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে আমেদাবাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরের দিন গুজরাট মেলে বোম্বাই এসে পৌঁছলাম। সেদিন সন্ধ্যাতেই আমাদের কলকাতা যাত্রা। হাতে আর সময় নেই। শেষ দিনের মত বোম্বাইর সমুদ্রের ধার বেড়িয়ে এলাম ও প্রবাসী বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। বম্বে মেলে আর ভীড় ছিল না। বেশ আরামে ও নিরাপদে দুরাত্রির পর কলিকাতা পৌঁছলাম। হাওড়া ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে দেখি অপর দিকে একটি হস্‌পিটাল ট্রেন অপেক্ষা করছে ও নার্সরা নিঃশব্দে ছুটোছুটি করছে। কুলিদের মুখে শুনলাম, রেঙ্গুন থেকে বোমায় হতাহত যাত্রীদের কলকাতার বাইরে নানা হাঁসপাতালে পাঠান হচ্ছে। এতদিন যেন আমরা কল্পনা রাজ্যে বাস করছিলাম, আজ এই নিষ্ঠুর বাস্তব জগতে পৌঁছে মন দুঃখে ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হলে ১২ ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর হুঙ্কার

দু-দিক থেকে শত্রুরা আসছে দলে দলে, হয়তো পালাবার সব পথই বন্ধ ক'রে—আমাদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

জানি, আমাদের পাঁচজনের কাছে আছে পাঁচটা স্বয়ংবহ বন্দুক বা 'অটোমেটিক রাইফেল'—তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে গুলিবৃষ্টি করতে পারে পঁয়ত্রিশবার! সুতরাং শত্রুরা যে সহজে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি অপরিচিত শত্রুদের স্বদেশে; গুম্‌লীর বাড়ীখানা এখানে আমাদের পক্ষে মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতন বটে, কিন্তু সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধে আমরা পাঁচজনে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারব? আর আমাদের আশ্রয় দিয়ে গুম্‌লীই বা বিপদে পড়বে কেন? শত্রুরাও নিশ্চয় নিরস্ত্র নয় এবং ওদের দলে যদি সয়তান ছুন্-ছিউ থাকে তা'হলে ওদের সঙ্গেও যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, এটাও অনুমান করতে পারি। অতএব আমাদের আশ্রয়দাত্রী এই বিদেশিনী নারীর বাড়ীর অঙ্গনকে যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা বোধ হর সঙ্গত নয়।

বেশীক্ষণ ভাববার সময় নেই—প্রতি মুহূর্ত্তেই শত্রুরা আরো কাছে এসে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, "মাল্কান, আমাদের পালাবার কোন পথই কি খোলা নেই?"

মাল্কান যা বললে বিনয়বাবু তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন।—"একটা পথ আছে বাবুসাহেব!"

—"কোথায়?"

—"বাড়ীর খিড়্‌কী দিয়ে বেরুলে উত্তরদিকে একটা সরু পাহাড়ে-পথ পাওয়া যাবে।"

—"উত্তরদিকে?.........মাল্কান, আমরা কি দেখবার জন্যে এদেশে এসেছি সে-কথা তুমি বোধ হয় জানো না?"

—"জানি বাবুসাহেব! গুম্‌লী-বিবির মুখে আমি সব শুনেছি—কারণ আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমারই ওপরে। আপনারা তো সেকালের সেই ভাঙা মঠ দেখতে যেতে চান?"

—"হ্যাঁ। সে মঠও তো উত্তরদিকে?"

—"হ্যাঁ বাবুসাহেব।"

—"এখান থেকে সে মঠ কত দূরে?"

—"তা প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল হবে।"

—"তুমি এখনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?"

—"এখনি?"

—"হ্যাঁ মাল্কান। যদি রাজি হও, একশো টাকা বখ্‌সিস পাবে।"

মাল্কান ইতস্তত করছিল, কিন্তু এই দরিদ্র কাফিরিস্থানে একশো টাকা হচ্ছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য! সে মহা উৎসাহে ব'লে উঠল, "বাবুসাহেব, আমি যেতে রাজি!"

আসছে কাল সকালেই আমাদের এখান থেকে বেরুবার কথা ব'লে আমরা আগে থাকতেই মোটমাট বেঁধে রেখেছিলুম।

হুট্ বলতে ছুট দেওয়ার অভ্যাস আমাদের বরাবরই। এ হপ্তায় আমরা কলকাতার সৌখীন নাগরিক, আসছে হপ্তায় আফ্রিকার বিপুল অরণ্যে বনবাসী! এমনি ভবঘুরের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে একটা ভালো শিক্ষা আমরা পেয়েছি। প্রবাসে যেতে হ'লে বাঙালীরা মস্ত-বড় গৃহস্থালী ঘাড়ে ক'রে বেরোয়—বড় বড় ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানা, পোটলা-পুটলী! কিন্তু কত কম জিনিষ সঙ্গে নিয়ে পথে-বিপথে অনায়াসেই দৈনিক জীবন যাপন করা যায়, সে সমস্যা আমরা সমাধান করতে পেরেছি। যা দরকার সে সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে, অথচ আমাদের মালের সংখ্যা এত কম যে, কুলী ডাকবার দরকার হয় না—নিজেদের মাল নিজেরাই ব'য়ে নিয়ে যেতে পারি।

তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা মোটমাট গুছিয়ে নিয়ে অজানার অন্ধকারে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম!

গুম্‌লী এসে ম্লান মুখে বললে, "বাবুজী, আমি এখন বুঝতে পারছি, বামুকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভালো কাজ করিনি। আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ ক'রে আনলুম আমিই! এ দুঃখ আমার কখনই যাবে না!"

কুমার বললে, "না গুম্‌লী-বিবি, মিথ্যে অনুতাপ কোরো না। শত্রুরা নিশ্চয়ই আজ আমাদের আক্রমণ করত। তবে ওরা কেবল একবার চেষ্টা ক'রে দেখেছিল যে, তোমার সাহায্যে চুপি চুপি নিরাপদে কাজ সারা যায় কিনা! আর সময় নেই—সেলাম!"

—"সেলাম বাবুজী, সেলাম! একটা সেকেলে ভাঙা মঠে বেড়াতে যাবার জন্যে এত বিপদ মাথায় নিয়েছেন কেন, সে কথা আমি জানি না বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখবেন বাবুজী, গুম্‌লীর দৃষ্টি রইল আপনাদেরই ওপরে!"

বাড়ীর খিড়্‌কা দিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হলুম, গুম্‌লীর শেষ কথাগুলোর অর্থ কি?

চাঁদ তখনো অস্ত যায়নি বটে, কিন্তু একটা উঁচু পাহাড়ের পিছনে নেমে গিয়েছে চারিদিকে রাত্রির বুকের উপরে দুলছে ঘন ছায়ার রহস্যময় যবনিকা।

শত্রুরা এখন আর চোরের মতন আসছিল না, পাহাড়ে-পথের উপরে বহু পাদুকার কঠিন ধ্বনি শুনে নিশীথিনী তার মৌনব্রত ভঙ্গ ক'রে যেন সচমকে জেগে উঠল। বুঝলুম

কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হ'ল না দেখে শত্রুরা এমন মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে দস্যুর মত।

ছুন্-ছিউর বাহাদুরি দেখে মনে মনে তারিফ না ক'রে পারলুম না। যে লোক এরই মধ্যে এই অপরিচিত দূর-বিদেশে এসে এমন বৃহৎ এক দল গড়তে পারে, নিশ্চয়ই সে অসাধারণ ব্যক্তি।

কিন্তু বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না বিমল, আমি ছুন্-ছিউর অসাধারণতা স্বীকার করি না। পৃথিবীতে সঙ্গীর অভাব হয় ভালো কাজেই, কারণ জগতে সাধুর সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু কুকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে তুমি যদি একবার ডাক দাও, চারিদিক থেকে সঙ্গী এসে জুটবে পঙ্গপালের মত। পৃথিবীর হিতসাধন করবার জন্যে বুদ্ধদেবকে পথে বেরুতে হয়েছিল একাকীই, কিন্তু জেঙ্গীজ খাঁ, তৈমুর লং আর নাদির সা যখন পৃথিবীর উপরে অমঙ্গলের অভিশাপ বর্ষণ করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁদের লক্ষ লক্ষ পাপ-সঙ্গীর অভাব হয় নি।"

আলোর ছায়া পড়েনা জানি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল চারিদিককে মায়াময় ক'রে তুলেছে যেন অচঞ্চল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ছায়া! কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে না, অথচ সামনে পিছনে, এপাশে ওপাশে যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই পাহাড় বা জঙ্গল বা ঝোপ-ঝাপের আব্ছা অস্তিত্ব জাগে চোখে।

সব-আগে চলেছে মাঙ্কান, তারপর আমরা। এমন এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে, দুজনের পাশাপাশি চলবার উপায় নেই।

কুমার বাঘার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, "বাঘা, তুমি এখন কারুকে ধমক-টমক দেবার চেষ্টা কোরো না। একেবারে চুপ ক'রে থাকো—বুঝেছ?"

বাঘা নিশ্চয়ই বুঝলে। আমরা নিজেদের মনুষ্যত্বের গর্ব্বে কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে পশু ব'লে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। কিন্তু পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, মানুষের সংসারে যে-সব জীব বা পশু পালিত হয়, তাদের অনেকেই আমাদের মুখের ভাষা বা মনের ভাব বুঝতে পারে। বাঘাও কুমারের বক্তব্য বুঝে একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করলে না।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে শত্রুদের পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। কিন্তু আরো মিনিট-কয়েক পরে বহু কণ্ঠের একটা উচ্চ কোলাহল জেগে উঠে রাতের নীরবতা ভেদ ক'রে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

মাঙ্কান বললে, "বাবুসাহেব, ওরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে শিকার হাতছাড়া হয়েছে। যদিও ওরা জানে না আমরা কোন্‌দিকে গিয়েছি, তবু সাবধানের মার নেই—তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলুন।"

আমরা দৌড়তে আরম্ভ করলুম। সেই পাহাড়ে-পথ কোথাও বনের অন্ধকার, কোথাও চাঁদের আলো মেখে এবং কোথাও উঁচু দিকে উঠে ও কোথাও নীচু দিকে নেমে এঁকেবেঁকে সমান চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখি দু-পাশেই গভীর খাদ, সেখানে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথে ছুটতে গিয়ে একবার যদি হোঁচট্ খাই তা'হলে এ-জীবনে আর শা-লো-কা মঠ, কুবের মূর্ত্তি ও গুপ্ত গুহার গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনই দরকার হবে না।......

এতক্ষণে পথটা চওড়া হয়ে এল। এখন চার-পাঁচ জন লোক অনায়াসেই পাশাপাশি

চলতে পারে। চাঁদের আলোও আর পাহাড়ের আড়ালে নেই। সুতরাং পথ চলবার কষ্ট আর হঠাৎ বিপদে পড়বার ভয় থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

মাঙ্কান একবার পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর অভিভূত স্বরে বললে, "দেখুন বাবুসাহেব, দেখুন!"

পিছন ফিরে দেখলুম, অনেক দূরে—প্রায় হাজার ফুট নীচে এক জায়গায় দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে এবং আরক্ত অগ্নির ক্রুদ্ধ শিখায় শূন্যের অনেকখানি লাল হয়ে উঠেছে।

কুমার বললে, "ওখানে অমন আগুন জ্বলবার কারণ কি?"

মাঙ্কান বললে, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, আগুনে পুড়ছে গুম্‌লী-বিবির বাড়ী! সয়তানরা আমাদের ধরতে না পেরে রেগে পাগল হয়ে গুম্‌লী-বিবির বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে।"

রামহরি দরদ ভরা গলায় বললে, "আহা, আমাদের আশ্রয় দিয়েই গুম্‌লী আজ পথে বসল!"

মাঙ্কান মাথা নেড়ে বললে, "একখানা বাড়ী পুড়ে গেলেই গুম্‌লী-বিবি পথে বসবে না। তার কেবল টাকাই নেই, যে-সব কাফির এখনো বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ছাড়ে নি, তাদের কাছে গুম্‌লী-বিবির মানমর্য্যাদাও যথেষ্ট, তার জন্যে তারা প্রাণ দিতেও নারাজ নয়। তারা যখন খবর পাবে তখন বিধর্ম্মী বামুককে প্রাণ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু বাবুসাহেব, আমার কি ভাবনা হচ্ছে জানেন? আজ গুম্‌লী-বিবিকে হাতে পেয়ে দুষমনরা যদি তার ওপরে অত্যাচার করে, তা'হলে কে তাদের বাধা দেবে?"

মাঙ্কানের কথা শুনতে শুনতে নীচে আর এক দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। সেখানটায় চাঁদের আলো নেই, অন্ধকারের মধ্যে নাচছে কতকগুলো ছোট ছোট চলন্ত আলোক-শিখা

মাঙ্কানও দেখতে পেলে। ত্রস্ত স্বরে বললে, "বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! শত্রুরা আবার আমাদের ধরতে আসছে!"

বাঘা পর্য্যন্ত বুঝতে পারলে। চাপা গলায় গর্‌র্ গর্‌র্ ক'রে গজ্‌রাতে লাগল।

আমি বললুম, "এগিয়ে চল—এগিয়ে চল! যতক্ষণ পার এগিয়ে তো চলি, তারপর দরকার হ'লে যুদ্ধ করতেও আপত্তি নেই!"

কুমার বললে "হুঁ, ছুন্-ছিউ এখনো আমাদের ভালো ক'রে চিনতে পারে নি! ভেবেছে দলে ভারি হয়ে আমাদের ওপরে সে টেক্কা মারবে!"

কমল বললে, "দেখা যাক্ ছুন্-ছিউ কত বড় গুলিখোর—আমাদের অটোমেটিক রাইফেলের ক'টা গুলি সে হজম করতে পারে!"

বিনয়বাবু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "থামো ছোক্‌রা, থামো—অত আর বাক্য-বন্দুক ছুঁড়তে হবে না! কথায় কথায় যুদ্ধ অমনি করলেই হ'ল, না? বিনা যুদ্ধে যাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, আগে সেই চেষ্টাই দেখ!"

রামহরিও বিনয়বাবুর কথায় সায় দিয়ে কমলের দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বললে, "যা বলেছেন বাবু! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!"

আমি হাসছি দেখে বিনয়বাবু বললেন, "না বিমল, এ-সব হাসির কথা নয়! আমার

বিশ্বাস, শত্রুদের দলে চাল্লশ-পঞ্চাশ জনের কম লোক নেই, আর ওরাও হয়তো বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে। যুদ্ধে ওদের দশ-পনেরো জন মারা পড়লেও দলে ওরা ভারি থাকবে। কিন্তু গুন্‌তিতে আমরা তো মোটে ছয় জন লোক, এর মধ্যে তিন-চার জন যদি মারা পড়ে বা জখম হয় তখন কি উপায় হবে?”

আমি বললুম, “ঠিক কথা বিনয়বাবু! নিতান্ত নিরুপায় না হ’লে আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব না। চল, চল, তাড়াতাড়ি পা চালাও!”

আরো মিনিট পনেরো ধ’রে নীরবে দ্রুতবেগে আমরা অগ্রসর হ’তে লাগলুম। কিন্তু শত্রুরা এগিয়ে আসছিল আমাদেরও চেয়ে বেশী বেগে! কারণ খানিকক্ষণ পরেই তাদের চাৎকার শুনতে পেলুম।

চলতে চলতে কেটে গেল আরো মিনিট দশ-বারো। পথ সেখানে সিধে নেমে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, মশালের আলোগুলো আমাদের কাছ থেকে বড়-জোর সিকি মাইল তফাতে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে প’ড়ে বললুম, “বিনয়বাবু, আর এগুবার চেষ্টা করা নিরাপদ নয়। তাহ’লে প্রস্তুত হবার সময় পাব না।”

বিনয়বাবু হতাশভাবে বললেন, “বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।”

—“হ্যাঁ, করতেই হবে। কুমার, তোমরা প্রত্যেকেই ব্যাগগুলো সামনের দিকে রেখে মাটির ওপরে শুয়ে পড়। ওরা যদি বন্দুক ছোঁড়ে, তা’হলে ব্যাগগুলো সামনে থাকলে আত্মরক্ষার খানিকটা সুবিধা হবে।”

মাস্কান বললে, “বাবুসাহেব, আমাদের বাঁ পাশেই পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা রয়েছে। আমরা এর মধ্যে আশ্রয় নিলে কি ভালো হয় না?”

—“এ গুহার ভিতর দিয়ে কি অন্যদিকে বেরুবার পথ আছে?”

—“না বাবুসাহেব।”

—“তাহলে ও-গুহা হবে আমাদের পক্ষে ইঁদূর-কলের মতন। ওর মধ্যে বন্দী হ’তে চাই না।”

ঠিক সেই সময়ে নীচের দিক থেকে চার-পাঁচটা বন্দূকের আওয়াজ হ’ল—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মাটির উপরে সটান হয়ে শুয়ে প’ড়ে নিজের নিজের বন্দুক বাগিয়ে ধরলুম।

আচম্বিতে আর একটা ভয়াবহ গম্ভীর ধ্বনি জেগে উঠে সেই পর্ব্বত-রাজ্যকে শব্দময় ক’রে তুললে। সে ধ্বনি অপূর্ব্ব, বিস্ময়কর, বজ্রাধিক ভীষণ—শুনলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এদেশে এসে এ-রকম ধ্বনি আগেও শুনেছি—এ হচ্ছে পাহাড় ধ্ব’সে পড়ার শব্দ—কাফ্রিস্থানের এক সাধারণ বিশেষত্ব!

কিন্তু আমাদের এত কাছে এমন শব্দ-বিভীষিকা আর কোনদিন জাগ্রত হয় নি! দলবদ্ধ বজ্র যেন গড়্ গড়্ ক’রে ভৈরব নাদে ধেয়ে আসছে আমাদের মাথার উপর-দিক থেকেই।

মাস্কান এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মতন চীৎকার ক’রে বললে, “বাবুসাহেব, পাহাড় ধ্ব’সে প’ড়ে নেমে আসছে এই পথ দিয়েই!”

ক্রমশঃ

লালফৌজের রণসঙ্গীত

(অনুবাদ)

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়

কম্‌রেড্‌গণ! শোনো বিউগ্‌ল্ বাজছে,
কাঁধে নাও যুদ্ধের অস্ত্র;
স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্ভীক লড়বো,
নির্ভয়ে নবপথ গড়বো।

শ্রমিক শ্রেণীতে হল আমাদের জন্ম,
স্বল্প মজুরী চাই বৃদ্ধি।
স্বাধীনতা! একতা! সখ্য!
আমাদের সংগ্রাম লক্ষ্য।

ভাগ্যেতে ছিল শুধু ক্ষুধা আর শৃঙ্খল
রাস্তার ভিখারীর অন্ন;
এখন্ আঁধার চিরে নবারুন জাগ্‌ছে,
সোনালী মুক্তি ঊষা আস্‌ছে!

গান গেয়ে দ্রুতগতি ছুটে যাই যুদ্ধে
উল্কার মত ছুটি আমরা;
মুক্তির সেনাদল—করিনাকো পরোয়া,
রাজাদের শক্তির ফতোয়া!

শাসকের দল যা’রা বসে’ থাকে উচ্চে,
কী তাদের ক্ষমতার উৎস?
বিমান, কামান আর বন্দুক, কার্ত্তুজ
আমাদেরি হাতে সব প্রস্তুত!

দুর্জয় বিশ্বাসে আমরা হবোই জয়ী,
দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্‌বো
মরণ বরণ করে’ উল্লাসে নির্ভীক
স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক!

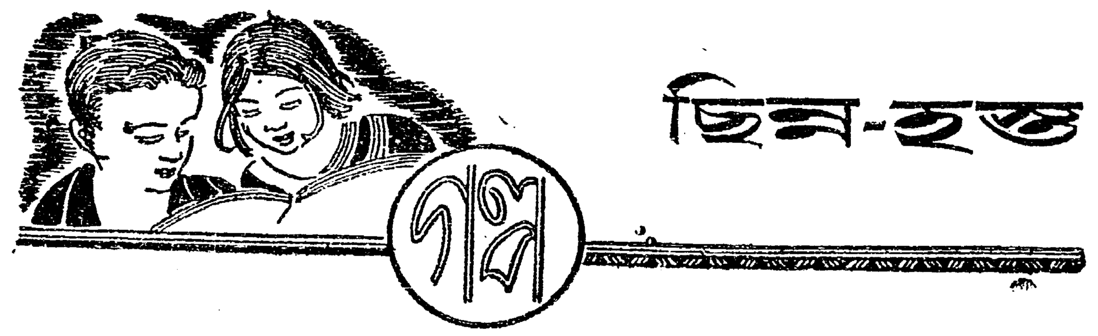

ছিন্ন-হস্ত

শ্রীকিরণচন্দ্র সেন

ভার্ডের নিকটে রাইব সহরে যাইবার পথে দুইটি অর্দ্ধভগ্ন সমাধিস্তূপ দৃষ্ট হয়। অনেকের ধারণা, সেটা নাকি ডাকাতের আস্তানা। কোন পথিক সেই দস্যু দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইয়া সেই পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই গুপ্তস্থান হইতে দস্যুদলকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিসের পক্ষেও কষ্টকর ব্যাপার হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যায় ভার্ড সহরের নিকটস্থ এণ্ড্রুফল্‌ম নামক সহরে জমিদারের বাসভবনে একটি যুবক দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছে বলিয়া,......আশ্রয় প্রার্থনা করিল।

জমিদার এবং স্বীয় কন্যা সাদরে আগন্তুককে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং দস্যুদের

আক্রমণের ফলে যুবকের মনে যে অপ্রীতিকর স্মৃতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিলেন। নানা কথাবার্ত্তায়, যুবকের মার্জ্জিত রুচি ও ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ জমিদার যুবকটিকে সুনজরে দেখিতে লাগিলেন। যুবক নিজেকে কলডিং সহরের কিল্‌ড নামক একজন ভদ্রলোকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিল। ক্রমশঃ যুবক সেখানে থাকিয়া গেল এবং জমিদারের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। তাঁহার কন্যাও সর্ব্বদাই যুবকের নিকট নানাপ্রকার গল্প শুনিতে ভালবাসিত। ছেলেটি যখন তাহার কানে কানে নানাভাবে তাহার রূপের প্রশংসা করিত, তখন সে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিত।

এইভাবে যুবক কিল্‌ডের সেখানে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। অতঃপর মেয়েটির সহিত বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, শীঘ্রই ফিরিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একদিন কিল্‌ড চলিয়া গেল। যাইবার কালে যুবক বলিয়া গেল যে, সে তাহার পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিবে এবং সম্ভব হইলে তাহার পিতাকে লইয়া আসিবে।

দিন যায়। কিল্‌ডের অনুপস্থিতি জমিদার এবং তাঁহার কন্যার নিকট অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল।......অবশেষে কিছুদিন পর যুবক ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আমি এই বিবাহে শুধু পিতার অনুমতি লইয়া আসি নাই; আমার সমস্ত আত্মীয় বর্গের শুভেচ্ছা লইয়া আসিয়াছি। পিতা অসুস্থতা বশতঃ আসিতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।"

তাহাদের বিবাহের দিন স্থির হইল। কিল্‌ড সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সে জমিদার পরিবারের অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। জমিদার কিন্তু কিল্‌ডকে জামাতা অপেক্ষা শিকারী রূপেই বেশী পছন্দ করিতেন।

একদিন কিল্‌ড রোজকার মত শিকারে বাহির হইয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু কিল্‌ডের প্রত্যাবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জমিদা রর মেয়ে কিল্‌ডের জন্য ক্রমশঃ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে সে তাহার পিতাকে কিল্‌ডের সন্ধান লইতে অনুরোধ করিল।

বৃদ্ধ জমিদার অবশেষে বহির্গত হইলেন। কিন্তু বনের ভিতরে অধিককাল খোঁজ করিয়াও তাহার সন্ধান পাইলেন না। সহসা বৃদ্ধ অনতিদূরে মনুষ্যের মিলিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তাঁহারই নাম লইয়া কথোপকথন চলিতেছে। বৃদ্ধ তাহাদের কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন যে দস্যুদের আস্তানা নিকটেই আছে। ঘটনার শেষ ফলাফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাহারা বিরক্ত হইয়া দুই দিকে যাইতে যাইতে একজন একটি মাটির ঢিপির আড়ালে চলিয়া গেল। অপর ব্যক্তি একটি ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। অস্পষ্ট আলোকে তাহাকে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হইল। অতঃপর সেই বৃদ্ধা একটা মৃত্তিকা স্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া, মৃত্তিকা স্তূপের নিম্নভাগে যে বড় পাথরখানা ছিল তাহা সরাইয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ জমিদার মূহূর্ত্তে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি তাঁহার তরবারি বাহির করিলেন এবং পাথরখানা সরাইয়া বৃদ্ধকে অনুসরণ করিলেন। গুহাটি ক্রমশঃ ভিতরের দিকে বড় হইতে চলিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধ একটি বড় কোঠার মধ্যে আসিলেন।

সেখানে দুইটি মশাল জ্বলিতেছিল। গুহার চারিদিকে বিস্তর কাপড়-চোপড় এবং অস্ত্র-শস্ত্র ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত ছিল। ঘরের ভিতরে একটা ঘণ্টা এমন ভাবে ঝুলান ছিল যে, কেহ সেই বনের পথ দিয়া যাতায়াত করিলে উহা বাজিয়া উঠিত। জমিদারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। কারণ তখন সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটা ব্যতীত ভিতরে আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা গুহার অভ্যন্তরে এমন ব্যস্ততার সহিত চলা ফেরা করিতেছিল যে জমিদারের আগমন বার্ত্তা ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণে পৌঁছাইয়া দিতে পারে নাই। বৃদ্ধার কার্য্য-কলাপে তাহাকে অন্ধ বলিয়া মনে হইল।

হঠাৎ বৃদ্ধা ভয়ে কৌতুহলে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ ঘণ্টাটি তখন বাজিতেছিল। বৃদ্ধা হাসিয়া বিড়-বিড় করিয়া আপনা আপনিই বলিতে লাগিল, "তাহারা ত' আসিল কিন্তু আজ কি আনিবে?"

বৃদ্ধ গুহার এক কোণে একটি শয্যার আড়ালে আত্ম গোপন করিলেন। ইতিমধ্যে আট দশ জন লোক গুহার ভিতরে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে একব্যক্তি একটি মৃতদেহ আনিয়াছিল। সে বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই যে বুড়ামা, আজ বড় ভাল জিনিষ আনিয়াছি।" তখন কয়েকজন সেই মৃতদেহের অলঙ্কার খুলিতে আরম্ভ করিল। তাহারা সমুদয়ই উন্মোচন করিল কিন্তু হাতের ভারী আংটিটা কোন প্রকারেই খুলিতে পারিল না। অবশেষে একব্যক্তি একখানা ছোট কুঠার আনিয়া মেয়েটির আঙ্গুলে এমন জোরে আঘাত করিল যে আঙ্গুলটি ছিটকাইয়া দূরে বৃদ্ধ জমিদারের নিকটে পড়িল। ইহাতে বৃদ্ধ জমিদারের ধরা পড়িবার পথ প্রশস্ত হইল। কিন্তু একব্যক্তির প্রস্তাবে সকলে আংটির জন্য আর বিশেষ চিন্তা না করিয়া মেয়েটিকে কবর দিতে লইয়া গেল।

তারপর দস্যুদল টেবিলটাকে ঘিরিয়া আহারে বসিয়া গেল। বৃদ্ধ জমিদার লুকাইয়া সমস্তই দেখিতে লাগিলেন। অধিক রাত্রিতে আহার সমাপনান্তে দস্যুদল অবশেষে টেবিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহারা গুহার মধ্যস্থ সকল আলোক নিবাইয়া দিল, তখন বৃদ্ধ সুযোগ বুঝিয়া সাবধানে হামাগুড়ি দিয়া গুহার মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।...হঠাৎ অন্ধকারে তিনি পা' পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহাতে ঘুমন্ত দস্যুদের মধ্যে একব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কে?" উত্তর না পাইয়া সে নিজেই উঠিয়া বসিল এবং সবিস্ময়ে বৃদ্ধটিকে পাথর সরাইয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে দেখিল।

মুহূর্ত্তে দস্যুদল সচকিত হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। এদিকে রাত্রির অন্ধকারে দিক ঠিক করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ সম্মুখের দিকে দৌড় দিলেন। জমিদারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। পথের মাঝে একটি ঘোড়া দেখিতে পাইয়া উহার উপর চড়িয়া বসিলেন। এবং খুব বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

দস্যুগণ তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ঘোড়ার পিঠে আর দস্যুরা তাহার পিছনে দৌড়াইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেই জনহীন প্রান্তরের আঁকাবাঁকা রাস্তা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়া দস্যুদের মধ্যে একজন অনায়াসে সোজা পথে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ঘোড়ার লেজটা তাহার হাতে শক্ত করিয়া জড়াইয়া অপর দস্যুদের ডাকিতে লাগিল। বৃদ্ধ তরবারি বাহির করিয়া অন্ধকারের মধ্যেই পশ্চাতে আঘাত করিলেন এবং শুনিতে পাইলেন বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার অনুসরণকারী ভূপতিত

হইল। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া তিনি বহুদূরে চলিয়া গেলেন। অবশেষে পথে একটি বাতায়ন দ্বারে আলো দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। একটি যুবতী ও একটি বালক বৃদ্ধকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিল। যখন তাহারা আস্তাবলে ঘোড়া রাখিতে যাইতেছিল তখন বালকটি বলিল, "দেখ, দেখ, ঘোড়ার লেজের মধ্যে একটা হাত ঝুলিতেছে।" সে বলিতে লাগিল "দেখ জেন, ইহা নিশ্চয়ই আমার দাদার হাত, কারণ আঙ্গুলে কাটার দাগ ও অঙ্গুরী রহিয়াছে।" যুবতী বালকটির প্রতি ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিবার জন্য চোখ টিপিল। ইহা বৃদ্ধের দৃষ্টির গোচর হইল। তখন তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি কোথায় আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ঘোড়া লইয়া পলাইলেন।

গৃহে ফিরিবার কালে প্রভাত বেলায় পথে কিল্‌ডের সহিত বৃদ্ধের দেখা হইল। কিল্‌ড বৃদ্ধ জমিদারকে দেখিয়া বলিল যে গতকল্য শিকার করিতে গিয়া সে সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। অবশেষে কয়েকজন কৃষক তাহাকে ডাক্তারের কাছে নিয়া হাতে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেয়। ইহা বলিয়া সে তাহার হাতখানা বৃদ্ধকে দেখাইল। বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "আমিও গত রাত্রিতে তোমাকে খুঁজিতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলাম, অবশেষে হয়রাণ হইয়া আমার এক বন্ধুর গৃহে রাত্রির জন্য অতিথি হইয়াছিলাম, এখন ফিরিতেছি।

পরদিন ছিল জমিদার-কন্যার জন্মদিন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই—অতিথিরা সব জমিদারের গৃহে আসিয়া সমবেত হইল। জমিদার-বাটি আনন্দে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু কিল্‌ডের ব্যবহার অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল।

প্রত্যেকের হাসি এবং তামাসার খোরাক যখন ফুরাইয়া গেল, তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি গত রাত্রে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। উহা আজ আপনাদের নিকট নিকট নিবেদন করিব।" তিনি পূর্ব্ব রাত্রির ব্যাপার আনুপূর্ব্ব বলিতে বলিতে বলিলেন,......... "তারপর যখন দস্যুগণ মৃত দেহটির আঙ্গুলে কুঠারাঘাত করিল তখন উহা ছিটকাইয়া আমার নিকট আসিয়া পড়িল। যদি এই ঘটনা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, তথাপি আপনারা চাহিয়া দেখুন, এই সেই ছিন্ন আঙ্গুল।" ইহা বলিয়া তিনি আঙ্গুলটি টেবিলের উপর রাখিলেন। আঙ্গুলটি দেখিয়া কিল্‌ডের মুখমণ্ডল মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার আসন ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। বৃদ্ধ জমিদার ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "ওহে, জামাতা মশাই, তোমাকে এখন এখানেই থাকিতে হইবে। আমার গল্পের শেষের মজার অংশটুকু এখনও যে বলা হয় নাই, সেটুকু শুনিয়া যাও।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "—বালকটি বলিয়াছিল, 'দেখ জেন, ইহা নিশ্চই আমার দাদার হাত।' আমি যখন সেইস্থান হইতে চলিয়া আসি, তখন আমার মনে হইল যেন ছিন্ন হাতটি আমি সঙ্গেই আনিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি একখানি মানুষের হাত টেবিলের উপর রাখিলেন।

"এতক্ষণে আপনারা আমার স্বপ্নের নমুনাটা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন।" বলিয়া বৃদ্ধ শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অতিথিগণ সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া

চাওয়ি করিতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয়, এই হাতটি আমারই কোন পরিচিত লোকের।" এই বলিয়া তিনি ছিন্ন হাতটি কিল্‌ডের দিকে ছুড়িয়া দিলেন।

ভয়ে কিল্‌ড ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিলেন "চেষ্টা করিয়া দেখ, হাতখানা তোমার হাতের সঙ্গে জোড়া দিতে পার কিনা।" অতিথিরা উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলের দৃষ্টি কিল্‌ডের প্রতি নিপতিত হইল।

বৃদ্ধ কিল্‌ডের হাতের ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়া ফেলিলেন। তখন সকলের নিকট জমিদারের স্বপ্নের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "কিল্‌ড, তোমার গুহাখানা এখন ভার্ডের পুলিসবাহিনী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তোমার সঙ্গীরা সকলেই বন্দি এবং তোমাকেও বন্দি করিতে পুলিস এখানে আসিবে।"........ ..

কিল্‌ড ছিল সেই দস্যুদলের সর্দ্দার। জমিদারের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার জন্য সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ আসিবার পূর্ব্বেই, তাহাদেরই গুপ্ত স্থানের উপর তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। *

—— —*— ——

শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী

পূর্ব্বানুবৃত্তি ঃ

এই বিপদের মধ্যেও লিলির মুখে হাসি খেলে যায়। সে বলে ঃ "ঠিক দাদা!" এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হায়, হায়, সাম্‌নে একটা আয়না নেই যে এক ফাঁকে নিজেকে দেখে নেয় একটু!

কিন্তু ভারী দুর্লক্ষণ! দেখছিস্ না মুখ শোঁকাশুঁকি করে ওরা একটা বোঝা-পড়ায় আস্‌তে চাইছে! এধারে জান্‌লা টপ্‌কে এই বেলা এখান থেকে পালাই চ।" শিশির বলে,—ওর মুখে কোনো হাসি নেই।

—বারো—

গন্ধ থেকে গন্ধমাদন

পেছনের জান্‌লাটা আবার বহুদিনের অব্যবহারে এমন জং ধরা যে সহজে খুলতে চায় না! ছিটকিনিটাকে হটাতেই শিশির কাবু হয়ে পড়ল। কিন্তু হাতে ধরে' সাধাসাধি করলে অটলকেও টল্‌তে হয়, খানিক পরে সেটা খটাৎ করে' সরে' গেল হঠাৎ।

* বেঞ্জামিন থর্প এর 'ইয়ং কিল্ড' গল্পের অনুবাদ।

শিশির টপ্‌কালো আগে। তারপর লিলির পালা। লিলি যদি বা কোন রকমে জানলার ওপরে নিজেকে খাড়া করতে পারল, নামতে আর পারে না।

"আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়্!" শিশির আবাহন করে "পড়্ না!"

লিলি খুব ভরসা পায় না। তার পতন বেগে, বীরোচিত তার ছোট্ট দাদাটি দাঁড়াতে পারবে কিনা তার সন্দেহ হয়।

"ভয় কি? আমি ধরব তোকে।" শিশিরের নিরুদ্বেগ আবাহন।

লিলি একটা পা বাড়িয়ে ছায়। কিন্তু আরেকটা পাকে আর কিছুতেই নামাতে পারে না। মূল্যবান্ মুহূর্ত্ত সব অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, লিলির পায়ের পাশ দিয়ে কালস্রোত কল কল রবে বয়ে যাচ্ছে, শিশিরের আর তর্ সয় না, সে পা ধরে হ্যাঁচকা টান্ লাগায়।

লিলি নেমে আসে, সেই বিপাকে নির্ব্বিঘ্নে পদচ্যুত হয়. নিরাপদেই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তার ফ্রকের পেছনের খানিকটা ছিন্ন হয়ে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছিট্‌কিনিতে আট্‌কে থেকে যায়।

"থাক্ গে!" শিশির ফ্রকের পরিশিষ্টটার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে: "আমাদের জয়-পতাকার মতো উড়তে থাক্!"

"পরাজয় নিশান্ বলো বরং!" লিলি বল্‌তে চায়, কেবল অসত্য বলেই জয় ঘোষণায় তার দ্বিধা নয়, ফ্রকের অশিষ্টতায়ও সে চটে গেছে। "পরাজয় কিসের? কেন, আমরা কি অ্যাকর্ডিং টু দি প্ল্যান্ পালাচ্ছি নে?" ঠিক যেমন করে' পালানো উচিত, পালাতে পারছিনে কি?" শিশির গর্ব্বিত না হয়ে পারে না।

"তা পালাচ্ছি বটে! কুকুরের সাম্‌নে শেয়ালের মতো পালাচ্ছি বটে।" লিলি বলে।

"উঁহু। মোটেই তা নয়। পালানোটা সিংহের মত কাজ। পলায়নের শেষের দিকেই লায়ন্। লায়নে আর পলায়নে একেবারে জড়াজড়ি।"

এই বলে, উদাহরণ স্বরূপই যেন সে আবার দৌড়তে সুরু ক'রে ছায়। লিলি আর প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে দাদার পিছু নিতে হয়।

"বন্দুকগুলো সব মানুষ ছিল! এই ডালকুত্তারা মোটেই তা নয়।" দৌড়তে দৌড়তে শিশির বলে।

লিলি শুধু বলে—উঃ! এতদ্বারা আপত্তি বা সম্মতি কি জানায় বলা কঠিন।

"গুলিগুলিও ভদ্রলোক! ওদের কর্ত্তব্য ওরা করেছে। ওদের আর কাজ কি? কানের আশ পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যাওয়া।"

লিলি কোনো সাড়া দেয় না।

"আমরাও আমাদের কর্ত্তব্য করেছি। বন্দুকের সাম্‌নে অম্লানবদনে বুক পেতে দিয়ে। বুক অথবা পিঠ। আমরা অন্যথা করেছি কি?

লিলি জবাব দিতে পারে না, শিশির যেমন পা আর মুখ, এক সাথে, খরতর বেগে চালাতে পারে ওর পক্ষে তা অসাধ্য। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর শুধু কান চলে। ও কেবল শুনে যায়।

"গুলির সাম্‌নে কবু পাততে আর কি? কী আর এমন? কান পাত্‌লেই হয়

সোঁ সোঁ করে চলে যাবে তাই কেবল শোনা! ভয়ের কিছু নেই।" শিশির নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞপ্তি ছায়: "কিন্তু এই ডালকুত্তারা! বাব্বা! একবার এরা হাতে পেলে আর রক্ষে নেই! সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বসাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাৎ—!"

ডালকুত্তারা এধারে আয়নায় মুখ শোঁকা-শুঁকি করতে গিয়ে মুখ ঠোকাঠুকি করে', পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে, হতাশ হয়ে পুনরায় যখন নিজেদের পরামর্শ বৈঠকে ফিরে এসেছে, তখন ওদের মধ্যে একজনের, অপেক্ষাকৃত ভূয়োদর্শী জনেকের মনে সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল—সমস্ত জিনিষটাই ভুয়ো নয় ত? ভুয়োদর্শন নয়তো স্রেফ্?

ঘাড় বেঁকিয়ে তথাকথিত শক্রদের দিকে সে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করল। তারপর নাথা নেড়ে আপন মনেই বল্ল,: "হুঁ! সব মায়া। সমস্তই অসার! একেবারে কিস্‌সু নয়! তাহলে—তাহলে আর বৃথা মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?"

হঠাৎ তার মনে হোলো, ওধারে খট্ করে' একটু আগে একটা আওয়াজ হয়েছিল না? তার মনে খট্‌কা লাগল কেমন!

এটাকে যেমন চোখের ভ্রম বলে' বোধ হচ্ছে সেও কি তেমনি তবে কানের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়?

যদি তাইই হয়, তাহলেও সেই ভ্রমকে অনুসরণ করে'—ঈষৎ লম্বা করে'—পায়ের দিকে বাড়িয়ে—একটু ভ্রমণ করে' দেখ্‌তে ক্ষতি কি? কিঞ্চিৎ ঘুরে ফিরেই দেখা যাক্ না!

সেই ভূয়োদর্শী'ই সবার আগে, এক্‌লা আবিষ্কার-যাত্রী হয়ে বেরিয়ে খোলা জানলার পাশে পতপত রবে উড্ডীয়মান সেই জয়পতাকা দেখ্‌তে পেল!

এবং সেই জয়পতাকার সঙ্গে জড়ানো পলাতকদের গন্ধ!

আবিষ্কারের মতন একখানা আবিষ্কার। অমনি সে বাঙ্ময় হয়ে উঠে প্রত্যাদেশের মত একটা আদেশ ছাড়ে। হৈ চৈ করে হাঁক্ ডাক ছেড়ে সবাইকে একজোট্ করে ফ্যালে। ডাল্‌কুত্তাদের এম্‌নি, একবার একটু গন্ধ পেলেই হোলো। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অম্‌নি সেই গন্ধকে তাড়া করে তারা দৌড় লাগাবে।

এক্ষেত্রেও শিশির-লিলির পশ্চাদ্ধাবনে তাদের বিলম্ব হয় না!

শিশিররা লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ খানিকটা আগিয়ে গেছ্‌ল, কুকুরে আর মুকুরে জড়াজড়ি করে' একত্র হয়ে বেশ জব্দ হয়ে রয়েছে ভেবে খানিকটা নির্ভাবনাও যে না হয়েছিল তা নয়, এমন সময়ে আবার সেই চতুষ্পদী পয়ারে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ' শুনে, পেছনে না তাকিয়েই কারা পেছু নিয়েছে অনুমান করতে তাদের দেরী হয় না।

কিন্তু এবার? এবার কি? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, একটা খোলার বাড়ীও চোখে পড়ে না। চার ধারেই খোলা মাঠ ধূধূ! কদ্দূর দৌড়িয়ে কোথায় গিয়ে তারা রক্ষা পাবে?

আর কি পরিত্রাণ নেই তাহলে? এইখানেই দি এণ্ড? কোনো অ্যাডভেঞ্চারে যা ঘটেনা, কদাচ ঘটেনি, অন্ততঃ তাঁদের মনে পড়ে না, মৌলমীনের এই নির্জ্জন প্রান্তরে সেই অঘটন—সেই অঘটনীয় দুর্ঘটনা—সেই মৌলিক এবং অত্যন্ত মীন্ ব্যাপার—একান্তই ঘটে যাবে?

বন্দুকের হাতে বেঁচে—গুলিদের থেকে পদে পদে খুলি বাঁচিয়ে—ডালকুত্তাদের হাতেই খাল্ হতে হবে শেষটায়?

শিশির আর লিলি প্রাণপণে দৌড়তে থাকে। ডালকুত্তারাও ছেড়ে কথা বলেনা—তারাও দৌড়ায়। অচিরেই তারা কাছাকাছি এসে পড়ে।

ভৌ ভৌ ক্রমশই ভয়াল হয়ে এগিয়ে আসে, কানের তালিতে এসে লাগে।

এমন সময়ে—

এমন সময়ে সেই ছাগলের পাল—

অনেকক্ষণ আগে যারা ওধারে গেছল, তারা ওধারের চর্ব্বণ সেরে, এধারে বিচরণ করতে ফিরছে—ওধারের ভোজনপর্ব্ব নিকেশ করে' এধারের চর্ব্বচোষ্য চড়াও হওয়ার মৎলবেই তারা আস্‌ছিল।

"লিলি! লিলি!! চটপট্! ঐ ছাগলদের আসবার আগেই! খুব ছোট্! যেমন করে' হোক ছাগলদের ওধারে গিয়ে পড়তে হবে।" রুদ্ধ নিশ্বাসে শিশির চীৎকার ছাড়ে।

লিলি পারে না, তবু সে শেষবার মরীয়া হবার চেষ্টা করে। এম্‌নিতেই সে দাদার থেকে তের হাত পিছিয়ে পড়েছিল, কুকুরদের সাড়ে ছ গজ কাছিয়ে ছিল—কিন্তু তার পা আর উঠ্‌তে চায় না। শিশির নিজের গতি মন্দ করে' লিলিকে আগিয়ে নিয়ে আসে, তারপরে তার হাত ধরে টান্ লাগিয়ে দৌড় লাগায়।

একটু আগে যে পাথরখানার উপরে তটস্থ হয়ে তারা ছাগস্রোত নিবারণ করেছিল, একটু পরে সেই পাথরখানার ওপরেই তারা হুম্‌ড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে।

আর তার পরমুহূর্ত্তেই সেই ছাগলের পাল উল্কাবেগে ব্যা ব্যা কর্‌তে কর্‌তে এসে পড়ে। সেই বিরাট শোভাযাত্রা অফুরন্ত উৎসাহে রাস্তা পারাপার করতে থাকে।

ডালকুত্তারা সেই ছাগলাদ্য সমারোহের সাম্‌নে এসে হক্‌চকিয়ে থেমে যায়। কি করবে ভেবে পায় না, ওদের ভেদ করে' এগোবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

শিশির-লিলি সেই পাথরের ওপরে দণ্ডায়মান হয়ে ত্যাখে—ছাগলদের—ছাগলদের পরপারে কুকুরদের—

কুকুররাও যে তাদের দেখতে পায়না তা নয়।

লিলি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে: "কতক্ষণ আর! ছাগলরাও চলে, যাবে ওরাও এসে আমাদের ছিঁড়ে খাবে।"

"হ্যাঁ, খেলেই হোলো!" শিশির বলে, তার নির্ভিকতা ফিরে এসেছে! "হোলো আর কি!"

"কেন, খাবে না কেন? আমি আর দৌড়তে পারব না দাদা! পা তুলতেই পারচিনে!

"দরকার নেই আর পা তোলার। কুকুররা আমাদের টের পেলেতো!"

"কেন, টের পাবেনা কেন? জলজ্যান্ত আমাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে!" দাদার কথায় লিলি অবাক্ হয়ে যায়।

"দেখ্‌লেই বা! দেখে ওরা কিচ্ছু বুঝতে পারে না, গন্ধ থেকেই টের পায়। আমাদের গন্ধ পেলে তো আর? এই বোকা পাঁঠারা যা গন্ধ ছাড়িয়ে গেল!—" শিশির নাক সিঁট্‌কোয়। "এ গন্ধ এখন এক শতাব্দী থাকবে।"

যমালয়ের দরজার প্রায় সাম্‌নে এসে প্রানান্তকর প্রান্ত পর্য্যন্ত তারা এগিয়ে পড়েছে

এতক্ষণ এই লিলির ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দাদার কথায়, গন্ধর্ব্বলোক ঘুরে, সে আবার এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। দারুণ দুর্গন্ধ নাক ভরে' পান করে' সে পুনঃ পুনঃ আরামের নিশ্বাস ছাড়ে—আঃ! বাস্তবিক্, এমন মিষ্টি গন্ধ, এহেন সৌরভ, কোনো মূল্যবান এসেন্সের মধ্যেও এতদিন সে পায়নি।

শিশিরের আন্দাজই ঠিক! পাঁঠারা চলে যাবার পর ডালকুত্তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল! কোন্ দিকে যে যাবে, কার গন্ধের ছুতো ধরবে—সে এক ভারী সমস্যায় পড়ে গেল তারা। শিশিরদের কাছেও এল, সন্দিগ্ধভাবে দৃক্‌পাত্ করল খানিক, শুঁকেও দেখ্‌ল কয়েকবার, কিন্তু নাসিকার সাহায্য নিয়েও, পাঁঠাদের সগোত্র ছাড়া আর কিছুই তাদের ভাবতে পারা গেল না।

"উহু, যা ভাব্‌ছ তা নয়! আমরা তারা নই, সেই পলাতক পাজিরা নই।" লিলি বলে, নিজের মনে মনেই বলে—উচ্চারণ করে বলার তার সাহস হয় না।

"হে পাঁঠারা! তোমরাই ধন্য! নিজের মহিমায় কেবল আমাদের মহিমান্বিত করেই তোমরা যাওনি, এই দুর্দ্দান্ত ডালকুত্তাদেরও পাঁঠা বানিয়ে গেছ!" শিশিরের সমস্ত অভ্যন্তর পাঁঠাদের লীলা প্রশস্তিতে উন্মুখর হয়ে উঠে।

"ভৌ ভৌ? এরা কারা? এই দুটো উদ্‌বেড়াল যারা দাঁড়িয়ে আছে এরা তারা কি? তাদের মতই বটে কিন্তু তারা নয়। কারা এরা? ভৌ—উ—ও-ও-ঔ?"

ডালকুত্তারা নিজেদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চালায়।

"এই! এই! পাঁঠার ডাক ছাড়্!" শিশির ফিস্ ফিস্ করে: "দেখ্‌ছিস্ কি?"

"ব্যা—ব্যা—ব্যা—!" লিলি ডাক ছ্যায়।

শিশির বলে: "অর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌......"

গন্ধে না মিল্‌লেও, শিশিরদের আকার প্রকারে যাওবা ওদের সন্দেহোদ্রেক হয়েছিল, এখন লিলির ব্যাকরণে আর শিশিরের সংস্কৃত ভাষায়, ভাষার সাথে ব্যাকরণের নিখুঁৎ মিলন দেখে তা তীরবেগে তিরোহিত হয়ে গেল। মানুষের হাবভাবে ওরা যে পাঁঠাদের নামান্তর অন্য পাঁঠান্তর মাত্র; পাঁঠা ছাড়া আর কিছু না, এবিষয়ে একমত হতে ওদের আর কিছুমাত্র দ্বিধা রইল না।

এবং তার পরেই নিজেদের ভোট শিশিরদের বিপক্ষে দিয়ে একে একে তারা লাঙ্গুল প্রদর্শন করতে লাগ্‌ল। কুরুক্ষেত্র থেকে, কিছু না করেই, পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে ফিরে চল্ল।

এখন আর ওদের সে লম্ফ-ঝম্প নেই! সে উৎসাহ যেন কোথায় উপে গেছে! টুঁ শব্দটি নেই কারো! ধীর পদক্ষেপে নীরবে অধোবদনে ওরা ফিরে চলেছে!

"সবাই মুখটি বুজে চুপ্‌টি করে চলেছে! দেখেছ দাদা, ডালকুত্তাদের কারো মুখে কোন রা নেই!" লিলি বলে।

"কর্ত্তার কাছে কী কৈফিয়ৎ—কী জবাবদিহি দেবো—সেই কথাই ওরা ভাব্‌ছে—মনে মনে তাই ভাঁজ্‌ছে এখন। আজ ব্যাটাদের ডাল রুটি বন্ধ।"

এবার শিশির হাসে। এতক্ষণে ওর হাসি পায়।

ক্রমশঃ

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

তোমরা Talmud নামে ইহুদীদের ধর্ম্মসংহিতার কথা জানো ? নানাদেশী পুরাতন ধর্ম্মসংহিতার মতন এর মধ্যেও বেশ মজার মজার গল্প আছে। আজ তারই একটি নমুনা দিচ্ছি।

এক ধনী ও বুড়ো ইহুদী বুঝতে পারলে যে, তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তার একমাত্র ছেলে তখন দূর বিদেশে। শিয়রে মরণ, ছেলেকে খবর পাঠাবার সময় নেই।

বাংলা প্রবাদে বলে, 'আসন্ন কালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়'। ঐ ধনী ইহুদীর অন্তিম কালের আচরণ দেখে তোমরাও হয়তো প্রবাদ-বাক্যটিকে সত্য ব'লে মনে করবে। কারণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে তার গোলাম বা ক্রীতদাসকে ডেকে বললে, "ওহে বাপু, তোমার কাজ-কর্ম্ম দেখে আমি ভারি খুসি হয়েছি। আমি আর বাঁচব না। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করলুম।"

ক্রীতদাস আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহন ক'রে বললে, "হুজুরের জয় হোক্!"

—"কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে।"

—"কি সর্ত্ত হুজুর?"

—"এই সম্পত্তির ভিতর থেকে আমার ছেলে যে-কোন একটিমাত্র জিনিষ চাইবে, তোমাকে তা দিতে হবে।" এই ব'লে বুড়ো মারা পড়ল।

নিজের সৌভাগ্যে ক্রীতদাসের প্রাণ যেন নাচতে লাগল। তার প্রভুর সম্পত্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। প্রভু-পুত্র এর ভিতর থেকে বড়-জোর একটিমাত্র জিনিষ চাইতে পারবে,—এ তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! বাকি অধিকাংশ যা থাকবে তাই নিয়েই সে জীবন কাটাতে পারবে রাজার হালে! অতএব ক্রীতদাস প্রভু-পুত্রের হাঙ্গামটা চটপট্ মিটিয়ে ফেলবার জন্যে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

প্রভুর ছেলে যে-বিদেশে আছেন সেইখানে গিয়ে সে হাজির হ'ল।

ক্রীতদাসের মুখে সমস্ত শুনে ধনীর ছেলে বাপের আক্কেল দেখে বিষম ক্ষাপ্পা হয়ে উঠল। কোন বাপ যে নিজের একমাত্র ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে এমন অদ্ভুত উইল করতে পারে, এটা ছিল তার কল্পনারও অতীত। সে তাড়াতাড়ি এক ইহুদী পণ্ডিতের কাছে গিয়ে স্বর্গীয় পিতার এই অন্যায় উইলের কথা উল্লেখ করলে।

পণ্ডিত প্রশংসায় অভিভূত হয়ে বললেন, "কী জ্ঞানী লোক তোমার পিতা! কী আশ্চর্য্য তাঁর বুদ্ধি! কী চমৎকার তাঁর দূরদৃষ্টি!"

ছেলে হতভম্বের মতন বললে, "কি বলছেন আপনি?"

পণ্ডিত বললেন, "ভাগ্যে তোমার বাবা এমন উইল ক'রে গিয়েছেন, তাই তোমার সম্পত্তি থেকে কেউ আর তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। দেশ থেকে তুমি এত

দূরে প'ড়ে আছ, তোমার বাবা এ-রকম উইল না করলে ঐ ক্রীতদাস সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে যেত, কেউ জানতেও পারত না।"

ছেলে বললে, "কিন্তু ক্রীতদাসই তো এখন আমার বাবার সমস্ত সম্পত্তির মালিক!"

পণ্ডিত হাসতে হাসতে বললেন, "না হে বাবাজী, না! তুমি কি জানো না, আইন অনুসারে ক্রীতদাসের সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী হচ্ছেন তার প্রভু? তোমার তো একটিমাত্র জিনিষ পাবার কথা? বেশ, তুমি ঐ ক্রীতদাসকেই প্রার্থনা কর। তা'হ'লেই ওর সম্পত্তি হবে তোমারই সম্পত্তি।"

পিতার দূরদর্শিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে পুত্র চেয়ে নিলে সেই ক্রীতদাসকেই। ইতি

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চলন্তিকা

তোমরা শুনে সকলে দুঃখিত হবে যে বাংলার সর্ব্বজন প্রিয় সুগায়িকা কুমারী উমা বসু (হাসি) আর ইহজগতে নেই। গত ২২শে জানুয়ারী রাঁচিতে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। রেকর্ডে রেডিয়োতে সভায় আসরে তোমরা তাঁর মিষ্টি কণ্ঠের গান শুনেছ। বাংলায় এমন কেউ নেই যে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়নি। মহাত্মা গান্ধী তঁকে 'নাইটিঙ্গেল' আখ্যা দিয়েছিলেন। গায়ক শ্রীদিলীপ কুমার, হরেন্দ্রকুমার ও বিখ্যাত ওস্তাদ ভীষ্মদেবের তিনি প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ উমার গান শুনে খুসী হয়ে উমাকে তাঁর একটি প্রিয় বই উপহার দেন। আজ উমা আমাদের সকলের কাছে রেকর্ডে তার মধু কণ্ঠের অপরূপ গানগুলি দান করে নিজেকে অমর করে গেলেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ছাত্র শিক্ষক ও দেশনেতা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের এক অপূর্ব্ব সম্মেলন হয়েছিল। উৎসব মঞ্চে পঁচিশ সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মালব্য, রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জহরলাল স্যার রাধা কৃষ্ণান, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরগণ, রাজা মহারাজা, পণ্ডিত সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁর অভিভাষণে ছাত্র ও শিক্ষকদের ভাবধারাকে রূপ দেওয়ার ইংরাজিকে প্রকাশের বাহন করা হয় বলে তার তীব্র সমালোচনা করেন। যদি হিন্দী, হিন্দুস্থানী উর্দ্দ কিম্বা অপর কোন ভারতীয় ভাষাকে ব্যবহার করা হত তা'হলে তিনি

আনন্দিত হতেন। তিনি বলেন, জাপান দাস জাতির অনুকরণ না করে নিজ ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্যের উত্তম সম্পদ গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন যে ইংরাজি শিক্ষা করার এই যে কসরৎ করতে হয় এতে জাতির যুব শক্তির অপব্যবহার হয়। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজীর প্রাধান্য দেখে গান্ধীজী নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। মালব্যজী বলেন, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় পাঠ্য পুস্তক হিন্দিতে লেখা হচ্ছে—তা শেষ হলে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহণ ইংরাজির পরিবর্ত্তন করা হবে। অতঃপর মালব্যজী ছাত্র ও শিক্ষকদের সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শ গ্রহণ করতে আবেদন জানান।

শীতকাল খেলাধূলা ও স্পোর্টস্‌এর প্রশস্ত সময়। কয়েকদিন আগে 'সিটি এ্যাথ্‌লেটিক স্পোর্টস্‌'এ দু'টি প্রতিযোগিতার ফলাফল নিখিল ভারত রেকর্ড এর সমান সমান হয়েছে। একটি ১০,০০০ মিটার 'সাইকেল রেস'এ আর. কে মেহ্‌না ১৮মিঃ ২সেঃ এ সমাপ্ত করেছেন, আর একটি ৮০ মিটার 'হার্ড্‌ল্‌ রেসে' মিস্‌ মেগান রাওরকি ১৩মিঃ ⅖সেঃ এ দৌড়েছেন। এ দুটিই ভারত-রেকর্ড। ১৫০০ মিটার দৌড়ে ৪মিঃ ২৩⅘সেঃ নতুন বেঙ্গল রেকর্ড করেছেন নর্থ ষ্টাফড্‌স্‌ এর মিঃ জেভন্‌স্‌। কিন্তু এই নতুন বেঙ্গল রেকর্ডটি ছাড়িয়ে গিয়েছেন পাতিয়ালার হরদেব সিং, ইনি লাহোরের পাঞ্জাব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ১৫০০ মিটার ৪মিঃ ১৮·৫সেঃ এ দৌড়েছেন। এই পাঞ্জাব অলিম্পিকে দু'টি নতুন পাঞ্জাব রেকর্ড হয়েছে। একটি মেয়েদের discus throw তে মিস্‌ এ ক্যান্‌ ৭৯ ফিট ৫·৮ ইঞ্চি—পাঞ্জাব রেকড, আর একটি long jumpএ মহম্মদ সিদ্‌ ২২ফিট ৭½ ইঞ্চি রেকড করেছেন। এধারের ভারতীয় স্পোর্টস্‌এ লক্ষ্য করবার বিষয় যে মেয়েরা দৌড় ঝাঁপ ও অন্যান্য খেলা ধূলায় প্রশংসনীয় রেকর্ড করেছেন।

যুদ্ধের দরুন কলকাতার কয়েকটি স্কুল কিছুদিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। সম্প্রতি কয়েকটি স্কুল উপযুক্তভাবে তাদের স্কুল-বাড়ীতে 'এয়ার-রেড্‌-প্রিকসান্‌' নিয়ে আবার খুলেছে। মেয়েদের স্কুলে ক্লাস VI থেকে X পর্য্যন্ত খোলা হচ্ছে, নীচের ক্লাসগুলি আপাততঃ বন্ধ রাখা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতার সমস্ত মেয়েদের স্কুলই যে বর্ত্তমানে খোলা থাকবে তা নয়। প্রাইমারি ও অন্যান্য ছোট স্কুলগুলি ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ। কলকাতায় ৩৯টি মেয়েদের হাই-স্কুল আছে। ঠিক হয়েছে সেগুলি যোগাযোগ করে মাত্র কয়েকটি, সম্ভবতঃ সর্বশুদ্ধ, ৭টি স্কুল খোলা থাকবে। এই স্কুলগুলিতে যথাসম্ভব 'এয়ার-রেড্‌-প্রিকসান্‌' নেওয়া হচ্ছে। কলকাতার কলেজগুলিও এয়ার-রেড থেকে রক্ষার যোগ্য ব্যবস্থা করে খোলা হচ্ছে। আগামী ইউনিভার্সিটি পরীক্ষাগুলি—ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট ইত্যাদি সব কিছুদিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কলিকাতার বাইরে ও বাঙ্গলার বাইরেও অনেকগুলি নতুন পরীকা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর দ্বারা যা'র যেখান থেকে সুবিধে সে সেখান থেকেই পরীক্ষা দিতে পারবে।

কিছুদিন আগের খবর, জাপানী সৈন্যরা সিঙ্গাপুর থেকে মাত্র ১৮ মাইল দূরে আছে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ যে 'সিঙ্গাপুর-যুদ্ধ' সুরু হয়েছে। তোমরা যখন এ খবর পড়বে তখন হয়ত আরো অনেক নতুন ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সিঙ্গাপুরের ওপর জাপানী বোমা বর্ষণ

করছে, ফলে সিঙ্গাপুরের অনেক অংশ থেকে স্থানীয় লোকজন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরে দুটি বাণিজ্য জাহাজ শত্রুদ্বারা নাকি জলমগ্ন হয়েছে। এমনি করে স্থল-যুদ্ধ, জল-যুদ্ধ ও আকাশ-যুদ্ধ ক্রমশঃ নিদারুণ ও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। আর যুদ্ধ ক্রমশঃ পূর্ব্ব-ভারতের সদরগুলির নিকট আগুয়ান হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায়, মালয়ে ও বর্ম্মায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। মালয়ের অধিকাংশই এখন জাপানের হাতে। অনেক স্থানে 'হাতাহাতি' যুদ্ধও হয়ে গেছে। আমরা জানি না এ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে। একদিকে জাপান একা—অন্যদিকে ইংরেজ-চীন-ভারত-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া একত্র হয়ে লড়াই করছে। একদিকে বর্ত্তমান যুদ্ধের সমস্ত উপকরণে সজ্জিত এক দুর্দ্দান্ত মৃত্যুপণ জাতি, অন্যদিকে দলভারী মুক্তি-কামী জাতি-বৃন্দ। একদিকে 'এক'—অন্যদিকে 'বহু'। চিরদিন বহুরাই জয়ী হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার এই 'বহু' দল যুদ্ধের উপযুক্ত মাল-মসলার অভাবে বিশেষ করে উড়ো-জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজের অভাবে কেবল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা এই অভাব এখনই পূর্ণ না করলে জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চত নয়। আশার কথা—এই অভাব পূর্ণ করতে ইংলণ্ড-আমেরিকা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

এগজামিন

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষাল, গ্রাঃ নং ১৭৭৮

(আগে)

উঃ, আর মোটে ১১ দিন। আচ্ছা, এখন কটা বাজে, নটা। ঠিক এগারোটা পর্য্যন্ত পড়ব। তারপর ঠিক পনের মিনিট নাওয়া, পনের মিনিট খাওয়া, পনের মিনিট ঘুম। তারপর সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত পড়ব। হাঁ পড়বই পড়ব, না হলে পাশ হব কি করে? একটা রুটিন করে ফেলা যাক্‌। সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত্রি।......আরে দশটা বেজে গেল না? ভুল দেখছি নাতো। হাঁ দশটাই বটে। ওই কে ডাকে! রমে-এ-এ-ন্‌। এইরে প্রতুলটা! দুর ছাই, এগারোটা বলেছি বলেই কি এগারোটা পর্য্যন্ত পড়ব? মানুষের শরীর তো।

—আয়রে প্রতুল। কিরে খেলবি নাকি?—আরে খেলব বলেইত এলুম। নীলে গেম

দেব। আজ নিজের ষ্ট্রাইকার।.........রমেন, খাওয়া দাওয়া করে উদ্ধার করবে কখন—এইরে, মাও পেছনে লেগেছে। আরে যাচ্ছি, দেখছনা একটা রিবাউণ্ডের কেস্...... যাঃ ফাইন হয়ে গেল। একটা পয়েন্টে গেম খেতে হল। আরে একটা বাজে—সর্ব্বনাশ।

ভূগোলটা নিয়ে বসা যাক। যদি কখনো ভাইস্‌চ্যান্সেলার হই, ভূগোলের ভিটেয় ঘুঘু......। বাবু চিঠ্‌ঠি। দেখি কি চিঠি এল। আরে—এযে রংমশাল! দেখা যাক ভেতরে কি আছে। ......আরে, ঘড়ি না ঘোড়া—চারটে বেজে গেল, আর পড়ব না। মানুষের শরীর তো। নেট টাঙ্গানো যাক। কাল নতুন বল এসেছে। এস প্রতুল এক গেম খেলে যাও। আরে নাও, এক গেম বলেছি বলে কি এক গেমই খেলব। পড়া ত আছেই, কিন্তু শরীরটা ত আগে......মেজদা তুমি এখনো খেলা করছ, ৭টা বাজে। চুপ কর, বেঙ্গল টাইম। সামলাও প্রতুল—হোপ বল ......গেম্ আপ্। একি কানে টান পড়ে কেন? (আরে বড়দা কোত্থেকে এল!)

(মাঝে)

ওঃ, আজ ইংরেজী ......হে জগন্নাথ, হে মাণিক পীর, ওলাইচণ্ডী, যিশু, আর যে যে আছ, পাশ করিয়ে দাও বাবা। না হয় আগাম কিছু দেব। না হয় আজকের দিনটার জন্যে ইংরেজ করে দাও। ওঃ তাহলে কি ভালই না হয়, সেই সঙ্গে অঙ্কর দিন নিউটন্, বাঙ্‌লার দিন রবীন্দ্রনাথ। ওঃ কি মজাই না হয় তা হলে।

(পরে)

রমেন, এদিকে এস। (আরে বাপস্, এত বড় সুবিধের নয়) যাই বড়দা। ...... আজ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। খুব ঠ্যাং তুলে বেরিয়েছ, যা চেয়েছ, তাই পেয়েছ, কিন্তু কি জন্যে পাশ করবে বল ত? (সেত নিশ্চয়)—কিন্তু এ কি? অঙ্কে গোল্লা (নিউটন), বাঙ্‌লায় পাঁচ (রবীন্দ্রনাথ), ইংরেজী সতেরো (ইংরেজ)— তোমাকে কি করা উচিৎ?

...নাঃ, এ হতে পারে না। নিশ্চয় নামের গোলমাল হয়েছে। আমার পেছনে একটা ষড়যন্ত্র। একটা সাম্‌থিং কিছু হয়েছে। উঃ, মাথাটা এখনো ঝন্‌ঝন্ করছে। আচ্ছা দেখে নেব—ঘুষখোর জগন্নাথ, মানিকপির, যিশু, যাকে যা দিয়েছিলুম, সব কেড়ে নেব। আর সেই উড়েটা, বেটা হাত গুনে একটা টাকা খসিয়েছে, তার গায়েও বাতাস লাগা দরকার।

No fear, failure is the piller of success.

———

● গত পৌষের 'রবীন্দ্র-স্মৃতি রৌপ্য-পদক' প্রতিযোগিতার (বিষয়ঃ শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান) ফলাফল আগামী চৈত্র মাসের রংমশালে প্রকাশিত হবে। আশ্বিন ও পৌষ এর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রাহকগ্রাহিকাদের পুরস্কারগুলি নূতন বছরে বৈশাখের প্রারম্ভে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রংমশালের-প্রিয় ভাই বোনেরা আমার,

একদিন ছিল যখন মানুষ কাঁচামাংস খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতো, শিকার যুদ্ধ বিগ্রহ করতো, তখন মানুষ ছিল প্রায়-পশু। তারপর মানুষ নিজেকে বুঝতে শিখলে, নিজের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর কথা ভাবলে। ক্রমশঃ তার মনের গহন আঁধারে প্রবেশ করলো সূর্য্যের একটি রশ্মিকণা, চিত্তে এলো চমক—আপনাকে সে যেন খুঁজে পেলো অনেক অন্বেষণের পর। তার গৃহে, তার জীবন যাত্রায়, তার চিন্তায়, তার প্রতিদিনকার জীবনে সুন্দরের শুভস্পর্শ লাগলো।

প্রকৃতির অজস্রতার ভিতর মানুষ বর্দ্ধিত হয়েছিল। তাই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মধু মিলন স্থাপন করে তার বাসভূমিকে, তার জীবন যাত্রাকে, তার ধ্যান ধারণাকে সুন্দর ও সহজ করে তুললো। মানুষ মানুষের কাছে এসে দাঁড়াল। ধ্যান ধারণায়, চিন্তাধারায় শৌর্য্যে, ব্যক্তিত্বে, সৌন্দর্য্যে মহীয়ান মানুষ, পরিপূর্ণ মানুষ আপনার সৃষ্ট জগতের দিকে স্মিত মুখে তাকিয়ে রইল। প্রায়-পশু মানুষ হলো প্রায়-দেবতা।

......কিন্তু আজ? মানুষের সৃষ্টিতে আজ সুরু হয়েছে ধ্বংসলীলা। রক্তে পৃথিবীর বুক হয়েছে কলঙ্কিত। মানুষের মাঝে যেন এক ভীষণ বর্ব্বর দৈত্য ছিল ঘুমিয়ে, সে আজ জেগে দুর্দ্দান্তভাবে ধ্বংসের কাজে এগিয়েছে—তাই চারিদিকে হাহাকার আর হানাহানি।

আদিম যুগ কি আবার ফিরে এলো?

কিন্তু প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখ—শীতের নিষ্ঠুর ছোঁয়া লেগে যে সব অরণ্য যে সব বৃক্ষ শাখা যে সব বনভূমি ছিল শূণ্য, বসন্তের স্পর্শ লেগে তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই অরণ্যের বৃক্ষ শাখায়, বনভুমিতে প্রাণস্পন্দন জেগেছে। জাগবে নতুন পাতা, ফুটবে নতুন ফুল, দেখা দেবে নতুন কিশলয়।

তাই ভাবি—পৃথিবীর জীবনে কি লাগবে সুন্দরের ছোঁয়া, ফাল্গুন দিনের বসন্ত সম্ভার দেখা দেবে কি মানুষের জীবনে? এই হানাহানির পর পৃথিবীতে আসবে নতুন দিন—জাগবে নতুন সূর্য্য? সব মানুষের সমান অধিকার নিয়ে মানুষ আবার অগ্রসর হবে—পরিপূর্ণতার দিকে।

সেদিনের কি দেরী আছে?

বাসন্তী মুখার্জ্জী (১৭২৪) বারাসত। তুমি কমলাকে কি জানাতে বলেছ—আমি কিছু বুঝলাম না। ব্যায়াম করতে সুরু করেছ, না করোনি? ধাঁধার ব্যাপার বা প্রতি-যোগিতার বিচার আমার নয়—আমি কেবল পৌঁছে দিতে পারি যথাস্থানে। নানা অসুবিধায় রংমশাল প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে পারে নি। মৌচাকের চাঁদা বা ঠিকানা আমি জানি না—অন্য কোথা থেকে জেনে নিও। প্রথম গ্রাহক প্রদীপ সেন আর গ্রাহিকাদ্বয় জয়শ্রী ও মঞ্জুশ্রী। **গণেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৭২২) পাটাভোগ। বিদেশী টিকিট তোমার যদি মাত্র একটী করে থাকে তাহলে তা তো আর Change করা যাবে না, তবে আর জানিয়ে কি হবে? এখন যা পৃথিবীর অবস্থা তাতে পুরস্কার চাইলে তিরস্কার লাভ হয় ভাই

জানো ? **সত্যব্রত বসু** (১৬১৩) আখউড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল এখনও জানা যায়নি--বিচারকের দল এখন বিচার করেছেন। লেখা অফিসে সম্পাদক মশাইকে পাঠাবে। **রণজিৎকুমার মৈত্র** (১৫১৮) কৃষ্ণনগর। তোমার ছু'টি চিঠি ও লেখাগুলি এসেচে।—তুমি যা লিখেছ তার উত্তরে একথা বলি যে লেখাপড়ার ক্ষতি করে এই সমস্ত এখন না করাই ভাল—সময় মত বা ছুটীর সময় এসব করতে হয়। আর এক কথা, কখনও লেখার কপি না রেখে লেখা পাঠিওনা। ১৩৪৭ সালের রংমশাল আষাঢ় মাস ছাড়া অন্য সব মাসের রংমশাল কার্য্যালয়ে পাওয়া যাবে—দাম প্রতি সংখ্যা সডাক চার আনা লাগবে। যে সংখ্যাগুলি দরকার মনি-অডার কুপনে সেগুলি উল্লেখ করে মনি-অডার যোগে টাকা পাঠালে সুবিধা হবে ও শীঘ্র পেয়ে যাবে।

তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহ জেনো।

ইতি তোমাদের

দিদিভাই

নূতন ধাঁধা

(১) ধাঁধাঙ্ক

২ এবং ৯ সংখ্যা দুটির মধ্যে যতগুলি সংখ্যা আছে তার প্রত্যেক সংখ্যার সঙ্গে কোন্ একটি সংখ্যা গুণ করে, তার গুণফল যোগ করলে প্রতি বারই ৯ ফলটি পাওয়া যাবে ?

(২) পড়ে-লেখ

ইভা যা-মরে-না-কখনও,
মারতো নকো নকে সং
ইনে বাদ ? কলে মিছে যাশ
স্নেহেতু ! ওকে দিন চিম্‌টি
আখ ছলি।
তই যা-পুইয়ে-যায়।

(৩) জবাব-দাও

(ক) কোন্ নদীতে কোন্ স্থলজন্তু নামলে জলজন্তুতে পরিণত হয় ? (খ) কোন্ দেশ খুলতে মানা ? (গ) কোন্ পাখি জটে প্রাণ ধরে ? (ঘ) কোন্ জন্তুর গায়ে বল্ আছে ?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। হোটেল। ২। শোল মাছ। ৩। টাঙ্গাইল। ৪। ভূটান। ৫। সিকিম। ৬। শোন নদী। ৭। বৈকালি নদী।

নির্ভুল উত্তর কেহ দিতে পারে নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই মাস হইতে রংমশাল সম্পর্কীয় সকল চিঠি পত্র ও টাকা-কড়ি ৯।১।১-এ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর

কানামাছি

রংমশাল

ষষ্ঠ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

চৈত্র
১৩৪৮

বসন্ত

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

আসে বসন্ত,
পুরণো পাতারা খস্ খসন্ত,
কচি কচি পাতাগুলি ছুঁচলো মুখ তুলি'
হাসে যেন
সবুজ হসন্ত !

এল বসন্ত,
পাতারা দল বাঁধে গুচ্ছে গুচ্ছে, ফুলেরা চোক মেলে, যেখানে ঘুমুচ্ছে
মৌমাছিদের গুঞ্জন বাজে রৌদ্রে, রঙে, নীলের মাঝে,
"—অশান্ত দেশের গান শোন্ ত !—"
পাখীদের কণ্ঠ ও পাখা থামিয়ে যায় না ত রাখা !
বাঁশীতে সুরে সুরে ডেকে ছোটে কোন্ দূরে
হাওয়া শ্বসন্ত !

BLEED THROUGH.

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

"বানরে কাড়ে টোপর, ক্রোধিত দশমুখ ;
সশঙ্কিত রাক্ষসেরা, ইন্দ্রজিত অধোমুখ।
হেনকালে রাবণের মা-টা অতি বুড়ি
রাবণের কাছে এলো চলে গুড়ি গুড়ি।
কহিতে লাগিল বুড়ি হয়ে আগুয়ান—
সকল হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।"

—এই বলে পুঁথি ঝেড়ে চাঁইবুড়ো পাঠ সুরু করলেন। রাবণের গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিকষা বুড়ি বলছে—

"বাপা, রাক্ষস হয়ে কেন মানুষেতে সাধ,
এখন যে তোর দোষে সবার প্রমাদ।
আমার কথা রাখ বাপা স্বর্ণলঙ্কেশ্বর,
সীতা ফিরে দাও গিয়া রামের গোচর
মানুষ খুসি থাক মানুষী পেয়ে—
রাক্ষুসী লয়ে তুই ঘর কর !"

তখন কুড়ি-চক্ষু রাঙা করে মা'কে বলছে রাবণ—

"মা বলে আজ তোমার কথা সই ;
আন জন বলে যদি তার প্রাণ লই।"

ইন্দ্রজিত বল্লেন—

"দাদুমা পালান—
বলে কেন হবে অপমান।"

বুড়ি নড়ি ভর দিয়ে গুড়ি গুড়ি প্রস্থান করলেন। তখন নিকষার বাবা বলছেন এগিয়ে—

"শোন নাতি—
নর-বানরের সঙ্গে কোরোনা হাতাহাতি।

সাগর তরিয়ে যেন গোষ্পদের পানি ;
পোড়ানো লঙ্কা, ওড়ানো টোপর, আরো কি করে জানি !
ঘরে আছে মন্দোদরী মন্দই বা কি—
একটা সীতার লাগি প্রাণ কেন দিবি !
আপনি মরলে বাপা সব অকারণ
কালনেমী কেড়ে নেবে, কিম্বা বিভীষণ—
এ সব সম্পত্তি, হস্তি, অশ্ব, পুষ্পরথ, রাজ-আভরণ।
হাতের কাটারি বাপ মেরোনা আপন পায়—
অহঙ্কার করি ডিঙ্গা ডুবায়োনা দরিয়ায়।
অরুণ নয়, বরুণ নয়, রামের সঙ্গে বাদ,
সীতা ফিরে দাও, যদি বাঁচতে থাকে সাধ।
শিরে করলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধবে তাগা,
রামের বাণে চক্ষু মুদলে আর নাই জাগা !
কুম্ভকর্ণ জাগে একদিন ছ'মাসে,
তুমি ঘুমাবে কাল-ঘুমে রাম যদি আসে।
কুক্ষণে আনিলে তুমি রামের সীতায়,
আপনি মজিবে আর মজাবে লঙ্কায়।"
কুড়ি চক্ষু রাঙা করি চাহিল রাবণ ;
মাতামহ নিরুত্তর, মহা-ভীত মন !
মায়ের বচন দুষ্ট না শুনিল কাণে—
মাতামহের ইষ্ট কথা, সে কখনো মানে ?

—"বিনা যুদ্ধে উদ্ধার—নাহিক সীতার।" এই হাঁক দিলে রাবণ। লঙ্কার চূড়ো থেকে ভিত্ পর্য্যন্ত থর থর কেঁপে উঠল। 'যঃ পলায়তি'—করে বুড়ো আধবুড়ো আইবুড়ো তিন জনে পলায়ন ; সব সুপরামর্শ গেল ভেসে। তখন রাবণ কোপ করে গোঁফ মুচড়ে বলছেন—

"স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ত্রিভুবন, দেবতা-গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষ-কিন্নর-বিদ্যাধর
কম্পিত আমার ভরে, কি ভয় নরে বানরে, কি বলিস রে মহোদর।"

মন্দোদরীর ভাই মহোদর তখন নিজের পেটে হাত বুলিয়ে বলছেন—

"কপি যত লক্ষ লক্ষ
রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য
তারে ভয় কর কি কারণে—ধর, আর গালে ভর।"

মহোদরের স্ত্রী মহোদরী বল্লেন—

"ওগো, ধরা যায় কি প্রকারে, তার উপায় কয়।
লাফ দিয়ে পড়ে চালে ঘর জ্বালায়ে যায়,
চাপড় দিয়ে গালে টোপর উড়ায়।
তু'টা গোটা বানরে এত কাণ্ড করলে—
সামলায় কে সব-ক'টা পড়লে !"

—"লঙ্কা গাছ একটি থাকবে না লঙ্কায়, ঝালে ঝোলে দিতে।"

—"আরে ঝাল ঝোল নাই হল, কাঁচা-কাঁচাই গিলে ফেলা যাবে।"

তখন কুম্ভকর্ণের তুই ছেলে কুম্ভ-নিকুম্ভ—"জেঠা-মশাই, আমরা বানর মাংস খাব" বলে মুখব্যাদান করতে, "এই তো কথার কথা" বলে রাবণ আদেশ করলেন—"যাও বৎস রণক্ষেত্রে, যত পার খেয়ে এসো বানর।"

মহোদর বলছেন—

"কুপিলে কুমার ভাগ কে আর যুঝিবে—
দেখ গিয়ে আগে সেই ঘর-পোড়াকে খাবে।
—তারপর অঙ্গদটাকে। বাকি আমাদের হাত।"

এই বলে মহোদর কুম্ভ-নিকুম্ভকে দেলাসা দিয়ে প্রথম যুদ্ধে পাঠালেন। তাঁরা বীরদাপে রণক্ষেত্রে এসে বলছেন—

"কুম্ভ-নিকুম্ভ যমজ ভাই—
কপির আনাজ কুটে খাই।
রাবণ মোদের জ্যাঠামশাই, কুম্ভকর্ণ পিতে—
তাই তাই তাই আয় সবাই লড়াই দিতে।
হলে চিংড়িতে কপিতে বড় সুখ খেয়ে শীতে
নোলায় জল আসছে মনে করিতে।"

এই বলে তুই ভাই আকাশ পাতাল হাঁ করে মর্কট দলে প্রবেশ করতেই মর্কটগণ ছর্‌কট্‌ হয়ে পলায় সট্‌পট্‌—"ওরে খেলেরে খেলে",—বলে বানর বিঘৎ ! কটা খেলে, কারে খেলে, দেখবার অবসর নেই—সোজা অঙ্গদের শিবিরে বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়া। বিঘৎ বানর কিষ্কিন্ধ্যার রাজ-জামাতা, অঙ্গদের ভগ্নিপতি। অঙ্গদ বল্লেন—"কি ব্যাপার !"

—"আরে ভাই ভইয়ানক বিয়াপার ! তোর ভগ্নী বিধবা হতে হতে রয়ে গেছে।" বলেই খাটিয়াতে তোষক মুড়ি ! সেখান থেকে কাঁপছেন আর বলছেন বিঘৎ—"কুম্ভকর্ণের তুটো ছেলে বেরিয়েছে বদন মেলে ; গিলে খেলে কপি দেদার। এতক্ষণ বোধ করি রাম লক্ষ্মণ হনুমান জাম্বুবান কেউ নেই—কে জানে শ্বশুর মশায় !"

—"আরে চলহে ভয় কিসের, বেরিয়ে দেখি।"

বিঘৎ বলছেন তখন ভয়ে কিচ্‌মিচ্‌ করে—"ভাই শ্রম বড় হোঁচি, ধুপ বড় কড়া, ক্ষুধা বড় পাঁউচি। তু যা, মু খাই তুটা কাঁকুড়া মাকুড়া !"

অঙ্গদ বার হবেন এমন সময় হনুমান কুম্ভ-নিকুম্ভ তুটোকে তোবড়ানো সোনার কলসীর মতো কানা ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে উপস্থিত।

—"কি হে হনু, ব্যাপার কি, ঘেমে গেছ যে !"

—"কুম্ভকর্ণের ছেলে তুটো বড় ভুগিয়েছে। শক্তি নাই আর রিঙ্গনে, গামছা নিংড়ে দেহে আলিঙ্গনে।" বলে হনুমান মরা ছেলে তুটোকে ফেলে বল্লেন—

"এমন বিপদে আর পড়ে নাই কেহ,
গিলে ফেলে আর কি আপাদ-মস্তক-দেহ।

—রাজ-জামাতার যে কি হল ভাবছি ; বোধ হয় ওদের একটার পেটে চলে গেছে !"

—"না হে না আমি খোস-মেজাজে বাহাল তবিয়তে আছি। শ্বশুর মশায় আছেন তো ?"

হনুমান 'জয় রাম' বলে গা ঝেড়ে প্রস্থান। ওদিকে ভগ্নদূত লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে খবর দিলে—

"কুম্ভ-নিকুম্ভ হল নিপাত
করে বহু কপি উদরসাৎ।"

রাবণ তুই ভাই-পোর শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মন্দোদরী বল্লেন—"ও মহোদরী—

সেতাবি গোলাপ জল মাথায় ছিটাও,
বেদ্‌ মুষ্ক লয়ে দশ নাকেতে শুঙাও ;
মন্তর পড়ি ঝাড় ফুঁক দাও সর্ব্ব গায়,
জল পটি আনি বান্ধ বাজুর তলায়,
মাথা হইতে পাঁও-তক মলো দাসী গণে,
মূর্চ্ছা যে ভাঙেনা, হিং পাই ক'নে ?"

—"যাই আমার মহোদরের কি হল দেখি গা।" বলে মহোদরী চটপট প্রস্থান।

"কুম্ভ-নিকুম্ভের লীলা হল সমাধান—
রামচন্দ্রকে বিভীষণ খোস খবর জানান।"

এই বলে চাঁই-বুড়ো কথা রাখলে সেদিনের মতো।

শিল্পীচূড়ামণি অনিক
কাহিনী

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একটি কৃতী ভারতীয় শিল্পীর নাম চীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাঁর নাম অনিক ; তাঁর জন্ম হয়েছিল ১২৪৩ খৃষ্টাব্দীতে নেপালে। খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল, সহপাঠীদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় রেখাশিল্পী, চিত্রকর, কারিকর ও প্রসাধক ছিলেন।

মূর্ত্তির মাপ-যোক (প্রতিমা-মান) সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে নিজের দেশ থেকে যে পুঁথিখানি তিব্বত ও চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি তিব্বতীয় ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে এখনও সংরক্ষিত আছে।

১২৬০ খৃষ্টাব্দে চীন ও তিব্বতের অধীশ্বর কুব্‌লাই খাঁর গুরুর আদেশে তিব্বতের রাজধানী লাশাতে স্বর্ণময় বৌদ্ধবিহার (প্যাগোডা) নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। নেপাল থেকে একশত শিল্পী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানের পর মাত্র ৮০ জন শিল্পী পাওয়া গেল। এই সকল শিল্পীদের নেতা হয়ে যাবার অত লোকের অভাবে সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছিলেন।

অনিকের বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর ; তিনি এগিয়ে এসে বললেন যে শিল্পীদের দলপতি হয়ে যেতে তিনি প্রস্তুত আছেন। সকলে প্রবল আপত্তি করে উঠলেন যে তাঁর বয়স অত্যন্ত অল্প, উত্তরে একটু হেসে অনিক বললেন, "আমার বয়স কম হলেও আমি বুদ্ধিতে ত কারো চেয়ে কম নই।" অবশেষে তাঁকেই দলপাত করে পাঠান স্থির হল।

নেপালী শিল্পীদের নিয়ে অনিক তিব্বতে যান ; সেখানে ১ বছরের মধ্যেই তিনি বিহার-নির্ম্মাণ শেষ করলেন।

দেশে ফিরবার অনুমতি প্রার্থনা করায় রাজগুরু অনিককে চীনদেশে কুবলাই খাঁর সভায় যেতে অনুরোধ করলেন—অনিক চীন যাত্রা করলেন।

রাজসভায় সম্রাট্‌ অনিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি প্রকাণ্ড একটা দেশে এসেছ—তোমার ভয় করছে না ত ?"

উত্তরে অনিক বললেন, "সম্রাট আপনি বহুদেশের শত শত প্রজা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, আমি আপনার পুত্রতুল্য ; পিতার সমক্ষে পুত্রের কি ভয় থাক্‌তে পারে ?

সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি আমার সভায় এসেছ কিসের জন্য ?"

অনিক উত্তর দিলেন, "সম্রাটের আদেশে তিব্বতে বিহার নির্ম্মাণ করেছি এবং সমস্ত নির্ম্মাণ কার্য্য দু'বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেছি এবং বুঝেছি যে তিব্বতের জাতিরা নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ। আমার বিনীত প্রার্থনা যে আপনি সে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনা করুন, যেন লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে।"

আবার সম্রাট প্রশ্ন করলেন, "শিল্পী, তুমি কি কি কাজ জানো ?"

অনিক বললেন যে সম্পূর্ণ নিজের রীতিতে তিনি রেখা-চিত্র, মূর্ত্তি-গঠন ও ঢালাই করে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে পারেন। সম্রাট রাজপ্রাসাদ থেকে বহু পুরাতন একটি তামার মূর্ত্তি এনে জিজ্ঞাসা করলেন যে সেই মূর্ত্তিটি অনিক রিপু-কর্ম্ম করে রং করতে পারবেন কি না। তিনি বললেন, "এই মূর্ত্তিটি কয়েক শত বছর পূর্ব্বে এ দেশের সম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। এদেশে এমন কোনও শিল্পী নাই যে এটি সংস্কার করতে পারে, তুমি কি এটি নূতন করে দিতে পারবে ?"

উত্তরে অনিক বললেন, "একাজে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই তবে আপনি অনুমতি করলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে মূর্ত্তিটির সংস্কার কাজ শেষ হল ; সংস্কার শেষে মূর্ত্তিটীকে আর পুরাণ বলে মনেই হল না ; অনিকের অলৌকিক শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পেয়ে কুবলাই খাঁ প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলেন ; সমবেত চীন-শিল্পীরা লজ্জায় অধোবদন হলেন।

চীনের উত্তর ও দক্ষিণ রাজধানী ও অন্যান্য নানাস্থানের বিহারের অধিকাংশ মূর্ত্তিই অনিকের কীর্ত্তি বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

১২৭৪ খৃষ্টাব্দে অনিককে বহু সম্মান প্রদর্শন করে চীন সম্রাট তাঁকে উপাধি দান করলেন। তিনি ধাতুময়ী প্রতিমাকারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে গণ্য হলেন ; তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে বাঘের ছবি আঁকা একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হল।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে অনিককে রাজশিল্পী সমাজের সচিব উপাধিদানে বিভূষিত করা হল।

অনিকের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতিকে চিরজাজ্বল্যময়ী করে রাখবার জন্য তাঁকে লিয়াং রাজ্যের অধীশ্বর উপাধি দান করা হয়েছিল।

— —*— —

কিশোর কিশোরীর গান

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের এই পাঠশালা কি প্রাচীন
কালের, ভাই,
বিশ্ববিহীন ধর্মচর্চা চল্‌বে যে সদাই ?
(আমরা) সংস্কারের বেড়ি পরে'
অন্ধ আচার আঁকড়ে ধরে'
থাক্‌বো না আর পঙ্গু হ'য়ে পুরান গান গেয়ে
আমরা নতুন যুগের ছেলে, নতুন যুগের মেয়ে !

তোমরা সনাতনী, ওগো, সামনে চলার বাধা,
থাকো ছোট্ট ঘরের কোনে শাস্ত্র দিয়ে বাঁধা।
(আমরা) ভগবানের দোহাই দিয়ে
লাভের কড়ি গুছিয়ে নিয়ে
বাঁচবো না আর ক্ষুদ্র মনে দেশকে অবহেলে ঃ
আমরা নতুন যুগের মেয়ে, নতুন যুগের ছেলে।

আজকে কেন সোনার দেশে উঠ্‌ছে হাহাকার,
কান্না কেন চারদিকে—জীবন পাষাণ ভার ?
অন্নহীনের অন্তরালে
অশিক্ষার এই অন্ধকারে
বুঝ্‌ছি কেন আকাশ আলো গেল যে সব ছেয়ে
আমরা নতুন যুগের ছেলে, নতুন যুগের মেয়ে !

সর্বনাশের মূল যে কোথায় আমরা জেনেছি,
শাদা কালো শোষন চলে বুঝ্‌তে পেরেছি।
গরীব কিষান, শ্রমিক যারা,
রক্তে তাদের বাঁচছে ওরা,
তাদের শ্রমেই ওদের বিলাস চল্‌ছে ছলে বলে ঃ
আমরা নতুন যুগের মেয়ে, নতুন যুগের ছেলে।

ছদ্মবেশী বর্বরতা দিনের পর দিন,
মানুষকে কি এম্‌নি করে' ক'রবে দীন, ক্ষীণ ?
আমরা নেবো নতুন পাঠ,
ঘুচিয়ে দেবো এ সজ্ঞাত—
মানবতার উদার আলো আনবো নিখিল বেয়ে ঃ
আমরা নতুন যুগের ছেলে, নতুন যুগের মেয়ে !

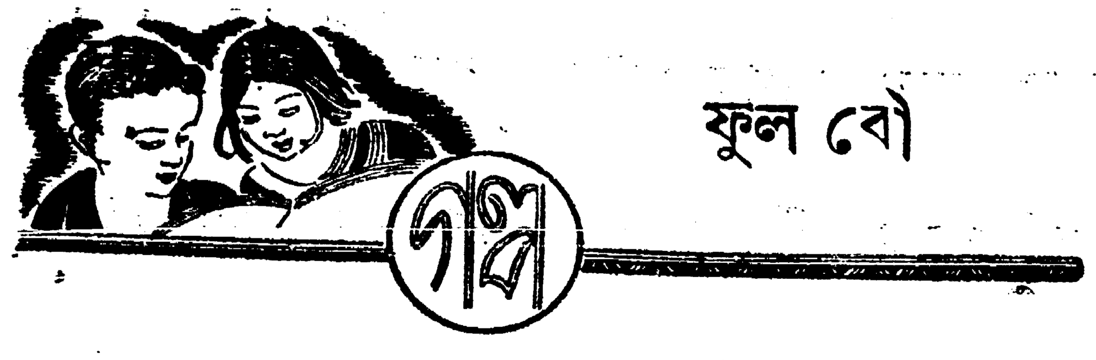

ফুল বৌ

শ্রীশামুক

মেয়েদের হোষ্টেল। স্কুলের লাগাও এক কম্পাউণ্ডের মধ্যে—কলকাতা শহরের ঘিঞ্জির ভিতর।

এ পাশের ইটবার করা হলদে বাড়ির বড় বৌ, গোপালের মা, ছাদে চুল শুকোতে এসে পাঁচিলে উঠে ঝুঁকে দেখেন,—মেয়েদের পড়া, খেলা, নাচগান, হাসি,—কতক্ষণ। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে যায়, কাজের দেরী হয়ে যায়। ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে ডেকে নিয়ে যায়।

ও পাসের তিনতলা সাদা বাড়ি থেকে আরেকটি মানুষ সারাক্ষণই এদিকে চেয়ে থাকে। মনে প্রাণে সে এই মেয়েদের সঙ্গী। মাথায় সিঁদুর দেওয়া এতটুকু ছোট মেয়ে। ফুলের মত সুন্দর দেখতে, তাই আদর করে সকলে ডাকে, ফুল বৌ। পাড়ার সেরা কৃপন টেকো বুড়োর ছেলের বৌ। ছেলে বিদেশে চাকরী করে।

সারাক্ষণই চেয়ে থাকে

ও হেড্‌ মিষ্ট্রেস্‌ সুমিত্রাদি একদিন রাগ করে হোষ্টেলের একটি মেয়েকে বলেন,—পালের গোদা তুমি ! সব জিনিষে এত বাড়াবাড়ি কেন তোমার ? নেপোলিয়ন নাকি ?

সুমিত্রাদি এমন কিছু ভেবে চিন্তে বলেন নি, হঠাৎ বলে ফেলে ছিলেন। কিন্তু সেদিন থেকে তার নাম স্কুলে প্রচার হয়ে গেল,—নেপোলিয়ন ! ছোট করে ডাকা হয় নেপু !

হোষ্টেলের মেয়েদের সঙ্গে ফুল বৌ এর ভারী 'ভাব'। জানালা দিয়ে সময় পেলেই কথাবার্ত্তা হয়, হাসি গল্প চলে। ফুল বৌ নিজের জানলাটি প্রায় ছাড়ে না-ই বলা যায়। সারাদিন মনে মনে এদের সঙ্গে থাকে, পড়া, গল্প খাওয়া, শোওয়া, সব কিছুর মধ্যে। বিকেলে যখন মেয়েরা 'ভলি বল' খেলে, ওর উৎসাহ

কিছু কম হয় না। এক জানলা থেকে অন্য জানলায় ছুটোছুটি করে হারজিতের সমান অংশ নেয়।

কতবার মেয়েরা বলেছে,—তুমিও স্কুলে ভর্ত্তি হও না ভাই ফুল বৌ। বেশ মজা হয়, একসঙ্গে পড়া খেলা যায়।

বার বার সেই একই উত্তর শুনেছে যে বুড়ো রাজী নয় কিছুতে। বাড়ির বৌ আবার স্কুলে পড়বে কি! আসল কথা, কৃপণ বুড়ো খরচ করতে নয় রাজী একটি পয়সাও।

ফুল বৌ মনের দুঃখে এক কার্পেটের হরিণ বুনে বাঁধিয়ে ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। তার নীচে লেখা—

কত যে স্বাধীন তুমি
বনের হরিণ।
বাঙ্গালীর বধূ চির পরাধীন॥

নেপুর মাথায় বুদ্ধি অনেক। এক উপায় বাতলালো। এরা এদিকের জানালায় বসে পালা করে চেঁচিয়ে গল্পের বই থেকে গল্প পড়ে, ফুল বৌ ওদিকের জানালায় কাণ পেতে শোনে। এরা এদিক থেকে শ্লেটে এ, বি, সি, লিখে দেয় ফুল বৌ দেখে কপি করে নেয়। এবার ফুল বৌ শ্লেটের উপর বড় বড় করে লেখে সি-এ-টি। ইসারায় জিজ্ঞাসা করে মানে কি? নেপু মুখ ছুচালো করে আওয়াজ করে উঠে—মিয়াও! ফুল বৌ লেখে ডি-ও-জি। মেয়েরা ভৌ ভৌ করে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়! ফুল বৌ হেসে গড়িয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

সময় কাটছিল মন্দ নয় হঠাৎ এল কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত দুঃসময় শহরের মাথার উপর। বোমা পড়বে সাবধান! বাগবাজারের লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে বৌবাজার বাসা বাঁধলো, আর বৌবাজারের লোকেরা এক ছুটে বাগবাজারে গিয়ে উঠলো! কিন্তু এতেও শেষ হল না। আবার! বোমা পড়লো বলে হুশিয়ার! এবার আর কলকাতায় থাকা নয়। সোজা হ্যারিসন রোড ধরে গঙ্গার পুল পেরিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে গিয়ে সকলে উঠে বসে। যেদিকে হোক যাবে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ,—না দক্ষিণে নয় পূবে ত' নয়ই—শুধু উত্তর ও পশ্চিমে!

স্কুলে মেয়ে কমে গেল। আশপাশের বাড়ি খালি হয়ে গেল।

সকালে এ পাশের হলদে বাড়ি থেকে শোনা গেল গোপালের মা বড় বৌ চেঁচাচ্ছেন,—ও ঝি ঝি বলি কাণের মাথা খেয়েছিস নাকি? ওরে বোমা পড়বে, বলছেরে, বোমা পড়বে! যা যা ছাতে একছাত কাপড় শুখোচ্ছে চট্ করে তুলে নিয়ে আয়। সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবেরে, এক ফালি ন্যাকড়াও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

সন্ধ্যায় জানা গেল বড় বৌ তাঁর গোপালকে নিয়ে বর্দ্ধমানে অন্তর্ধান করেছেন!

কত লোক চলে গেল। বাকী রইলো হোষ্টেলের মেয়েরা আর ফুলবৌ আর টেকো বুড়ো। কৃপণ বুড়ো প্রাণ থাকতে লোহার সিন্দুক ছেড়ে যেতে পারলো না। হোষ্টেলের মেয়েরা কি করবে বিবেচনার জন্য এক জরুরী মিটিং ডাকলো।

সুমিত্রাদি এলো-খোঁপার চুড়ো মাথায় নিয়ে গম্ভীর ভাবে এসে বসলেন। বড় রাণীদির গলায় ব্যথা আসতে পারলেন না। ছোট রাণীদি হিল ঠুকে খট্ খট্ আওয়াজ করে, ভ্যানিটি কেস একবার এ' হাতে একবার ও' হাতে নিতে নিতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

রমলাদি হোষ্টেলের উপরে তিনতলায় থাকেন। ইনিই মেয়েদের খবরদারি করেন। রমলাদি ছুটির পর নিজের ঘরে গিয়ে মুখে একটু পাউডার লাগিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিটিং এ হাজির হয়ে গেলেন। জুতো পরলেই পায়ে ফোস্‌কা হয় অথচ জুতো না পরে ত' আর কাজ চলে না। অবশ্য রাস্তায় চলবার সময় খুব সাবধানে খোঁড়ান যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

দিদিমণিরা নিজেদের মধ্যে খাটো গলায় খানিকটা আলোচনা করে নিলেন। মেয়েরা চুপ করে বসে রইল।

পরে সুমিত্রাদি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন,—তোমাদের কি বক্তব্য বল শুনি। নেপু তুমিই বল তোমাদের কি ইচ্ছে?

নেপোলিয়ন অন্য মেয়েদের মাথা বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—আমরা ঠিক করেছি, কলকাতা ছেড়ে যাবো না। এমনিতেই সকলে বলে, আমরা বড় ভীতু, একটু কিছু হলে ঘাবড়ে অস্থির হয়ে যাই। এর উপরে যদি পালাই তাহলে আরো মুখ খুলে যাবে—যদিও বীরের দলের অনেকেই অনেক আগে সোজা দৌড়েছেন। মেয়েদের ভীতু বদনাম আমরা ভাঙ্গবো এবারে।

বীরেদের কথা শুনে মেয়েরা চাপা হাসি হাসলো। রমলাদি মুখে রুমাল চাপা দিলেন। ছোট রাণীদি অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। সুমিত্রাদি হাসলেন না। তাঁর স্থির চোখের চাহনীতে মেয়েদের হাসি উবে গেল।

সুমিত্রাদি তাঁর এলো খোঁপার চুড়ো একবার বা' দিকে হেলিয়ে বসলেন, আবার ডানদিকে হেলিয়ে বসলেন। তারপর হাতের পেন্সিল কপালের উপর তিনবার ও নাকের উপর দুবার ঠুকে বললেন,—বেশ তাই হোক। তোমাদের যখন ইচ্ছে উপস্থিত থাকা যাক। ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।

মেয়েরা থেকে গেল। ফুলবৌ মিটিং এর খবর শুনে হাততালি দিয়ে ঘুরে একটু নেচে নিল।

কয়েকটা দিন শান্ত ভাবে কাটলো। কিন্তু বড় একঘেয়েমী লাগে। যুদ্ধের গল্পে

অরুচি হয়ে গেছে। গল্পের বইই বা কত পড়া যায়? নেপু বলে অনেকদিন কোন দুষ্টুমী করা হয় নি। একটা কিছু প্ল্যান করে করা যাক।

মেয়েরদল ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ফুল বৌএর সঙ্গে অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে সাবধানে বেতার বার্ত্তা আদান প্রদান হয়। ঠিক হয়ে যায় প্ল্যান। আগামী পরশু রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের নিশুথি ব্ল্যাক আউটের রাত্রে—চুপি চুপি—নাঃ কাউকে বলা হবে না। সব চেয়ে বাচ্চা মেয়ে মিনতি পর্য্যন্ত মুখে চাবি দিয়ে রাখলো—উঁহুঃ কারুকে বলা নয়।

জোগাড়যন্ত্র শেষ হল। সেদিন সন্ধ্যার সময় সকলে গোল হয়ে বসে জল্পনা কল্পনা করছে, পাকাপাকি ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় রমলাদি এসে ঢুকলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ওদিকের জানলা থেকে ফুলবৌ কি একটা ইসারা করছিল, সকলে চুপ করে গেল।

রমলাদি নেপুর বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে বলেন,—দেখছো কত বড় ফোস্‌কা ও মাগো। ভাবলুম নতুন জুতোটা অনেক দিন পরিনি যাই একটু বেড়িয়ে নিউমার্কেট থেকে কিছু চকলেট কিনে আনি! এ এখন কত দিনে সারবে!

নেপুকে উদ্দেশ্য করে আবার বললেন,—কিগো তোমরা যে ভারী লক্ষী মেয়ের মত শান্ত হয়ে গল্প করছো—ব্যাপার কি? কোনো দুষ্টু মতলব টতলব এঁটে আমায় জ্বালিও না বাপু। ভাল লাগে না।

রমলাদি উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে 'আঃ মাগো' বলে এক হাই তুললেন। চোখে জল এসে পড়লো। ছোট রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে পরে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সেই রাত্রে। কৃষ্ণপক্ষের ঘুমন্ত রাত্রে। ব্ল্যাক-আউটের নিশুতি কলকাতা। এমন অন্ধকার যে নিজের হাত নাকের সামনে আনলে একটা অক্‌টোপাসের মত ভয়ানক দেখায়!

মেয়ের দল হোষ্টেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলবার জায়গায় পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়ালো। অপূর্ব্ব বেশ ভূষা! অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না শুধু ভয়ঙ্কর মনে হয়! নীচু পাঁচিল। এক একজন টপকে ওপাশে তিনতলা সাদা বাড়ির খিড়কির সামনে এসে জমা হয়। যাদুবলে খিড়কির দরজা খুলে গেল। দেখা গেল ফুলবৌ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির আওয়াজ আটকাচ্ছে।

লাইন বেঁধে সকলে উপরে তিনতলায় চলে, অবশ্য নেপোলিয়ন সবার আগে।

বুড়োর শোবার ঘর ছাদের কোনে। ঘরের দরজা কি কৌশলে খুললো দেখা গেল না। আগে থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি হিসাব করে এসেছে বলতেই হবে।

জানলা সব বন্ধ। একটা পিদিমে মিটমিটে আলো জ্বালা। বুড়ো এক মস্ত খাটে শুয়ে। খাটের তলায় সেই লোহার সিন্দুক খাটের পায়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা।

ফুলবৌ ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েরা একে একে ঘরে ঢুকে পড়ে। এতক্ষণ বেশ চলেছিল। এতটুকু শব্দ কিছু হয় নি। কিন্তু মিনতি ঢুকতে গিয়ে চৌকাটে পা জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে—দড়াম্। পরচুলার গোঁফদাড়ি খুলে গিয়ে ছিটকে খাটের তলায় লুকোলো।

মেয়েদের দৌড়ে বেরিয়ে আসতে হয় হাসবার জন্য। সে কি হাসি! চেপে রাখা যায় না! মুখে চাপা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কুই কুই খিল-খিল খাউ খোঁউ নানারকম শব্দ বেরিয়ে আসে! ফুলবৌ সমস্ত ছাদে রোলারের মত গড়াতে থাকে।

বুড়োর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। কে—কে—ভয়ের কাঁপা গলার আওয়াজ। নেপোলিয়ানের পিছনে মেয়েরা আবার গিয়ে ঢোকে, মিনতি বাদে।

ও বাবা তোমরা এসেছ? মাথায় বোমা ফেলতে এসেছে? দাঁড়াও দাঁড়াও মাটিতে গিয়ে বসি, এ দামী খাটটা কেন নষ্ট হয়। এর অনেক দাম!

নেপু যথাসম্ভব মোটা গলায় বলে,—যেখানে আছেন চুপ করে থাকুন, নড়বেন না।

—নড়বো না বাবা, আচ্ছা নড়বো না। কিন্তু তোমরা কে বাবা? মাথায় পাগড়ী, গালপাট্টা দাড়িগোঁফ, পা পর্য্যন্ত ওভারকোট, এদিকে আবার মেয়েলী গলা! তোমরা জাপানী না জার্ম্মাণ? ডাকাত না ভূত?—

—আমার সবই। আপনাকে খুন করে সমস্ত টাকা কড়ি লুটে নিয়ে যাবো!

—তা খুন করতে হয় করো বাবারা কিন্তু টাকা কড়ি লুটে নিও না!

—একটি সর্ত্তে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি যদি আপনার ফুল বৌকে ঐ সামনের স্কুলে পড়তে পাঠান!

কথাটা বলে ফেলেই নেপুর মনে হ'ল তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, বড্ড স্পষ্ট শোনালো।

বুড়োর ঘুম মেশানো ভয় এতক্ষণে চোখ থেকে ছুটে গেল। সোজা হয়ে বসে বলে,—ও বুঝেছি এবার, তোমরা সব ঐ স্কুলের দস্যি মেয়ের দল আমায় ভয় দেখাতে এসেছ! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! তাহলে ফুলবৌমাও এর মধ্যে আছে। ফুলবৌমা, বৌমা—!

বুড়ো বাজখাঁই গলায় ডাক দেয়।

ফুলবৌ এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়, ভয়ে মুখ এতটুকু। মিনতি পিছনে পিছনে এসে ঘরে ঢুকেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে,—হোষ্টেল থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। বাবা জানতে পারলে বাড়ী থেকেও তাড়াবেন।

কি যেন একটা হয়ে গেল সব লণ্ডভণ্ড। মেয়েরা খাটে উপুড় হয়ে বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে। সে গোলমালে কে কাঁদলো আর কে কাঁদলো না, কে কি বললো কিছুই বুঝতে পারা গেল না।

শুধু বুড়োর গলা শোনা গেল,—আহা ছাড়ো ছাড়ো, পা ছাড়ো মা লক্ষ্মীরা! কি বিপদেই পড়লাম গা! আচ্ছা আচ্ছা বলবো না কারুকে—সত্যি বলছি বলবো না! হ্যাঁ হ্যাঁ ফুলবৌ তোমাদের সঙ্গে গিয়ে পড়বে। বলছি ত স্কুলে পাঠাবো।

কি বিপদেই পড়লাম গা

মেয়েরা উঠে দাঁড়ায়। নিজের নিজের পরচুলার দাড়ি গোঁফ খুলে হাতে মুঠো করে নেয়। বুড়ো খাট থেকে নেমে বালিশের তলা থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে নেপুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে,—আর এই নাও কাল একটা ফিষ্টি কোরো। লজ্জা কি মা—তোমরা আমার মেয়ের মতন, নাও নাও!

বুড়ো নিজে নেমে এসে পাঁচিল অবধি এগিয়ে দিল। মেয়েরা নিঃশব্দে নিজেদের ঘরে ঢুকে টুপ্‌টাপ্‌ বিছানায় শুয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে কারুরই চোখে ঘুম এল না কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে হাসি তামাসা, গল্প পর্য্যন্ত করলো না।

পরের দিন দেখা গেল ফুলবৌ এসে স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে।

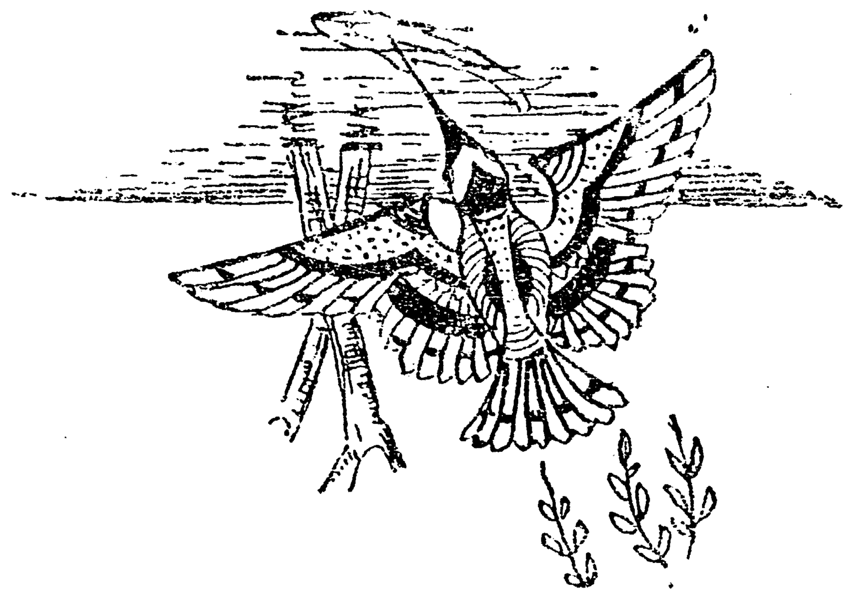

কাণামাছি ভোঁ ভোঁ

(প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

কাণামাছি ভোঁ ভোঁ—
যারে পাবি তারে ছোঁ—

ওরে ভুলো স'রে যা'
বুঝি ছুঁলো তোর গা',
চোর হ'লে মর্‌বি,
(তুই) ধর্‌তে কি পার্‌বি?

ওকি দাদা দেখ্‌ছ'?
মাথা উঁচু কর্‌ছ!
আল্‌গা কি বাঁধুনীটা?
বুঝে গেছি চালাকিটা!

ওরে মেনী বোকাটা,
পালা ওরে খোকাটা,
দাদ্বা বুঝি ধর্‌লো -
মেনি বুঝি মর্‌লো!

খেলা থামা থামারে—
ভুলো মেনি খোকারে—
ভালো ক'রে বাঁধ চোখ
খেলা পরে সুরু হোক্—

খোকা ভুলো মেনিরে—
ওরে বাবা গেছি রে—
বড় জোর বাঁধা রে
লাগে চোখে ধাঁধা রে
খুলে দে'রে মেনি রে
কোথা সব গেলি রে॥

'আঁধার রাতে একা পাগল ও কে যায়—'

শ্রীমতী তিলোত্তমা মজুমদার

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী।

মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস যেখানে শোনা যায়, মানুষকে ছায়া বলে যেখানে ভুল হয়, বাতাস যেখানে গুমরে গুমরে মরে আর যেখানে মানুষের প্রাণ করে হাহাকার—

এমনি একদিনে সেই শ্মশান ধারের বড় নদীটার চর ধরে সাধনা একাকী চলেছে, পাগলিনী প্রায়। দূরে জ্বলে যায় শ্মশানের চিতা, কুকুর একটানা বিষাদের সুরে কাঁদে, চাঁড়ালদের হাসি হুল্লোড় ভেসে আসে।·········

সাধনা আজ ঘর ছাড়া, দুর্ব্বার মনের সঙ্গে তাই বুঝি তাল মিলিয়ে সে চলেছে, এই মৃত্যুময় মহা শ্মশানের কোল দিয়ে।······

মানুষ কতদিন মনের মধ্যে গুমরে থাকতে পারে? কতদিন সে সহ্য করতে পারে অনাচার, অত্যাচার? এমনি করেই মানুষের মনের বাঁধন বুঝি সীমা লঙ্ঘন করে। মায়া মমতা, স্নেহ, ভালবাসা সব কিছু তখন সে বিসর্জ্জন দেয় গৃহের অন্তরালে। রিক্ত হয়ে সে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেয়। মানুষের বেছে দেওয়া পথ থেকে সে দূরে সরে যায়।

তখন সে হয় পৃথিবীতে একেবারে একা।

শৈশবেই সাধনা তার মাকে হারায়। তারপর সংসারে আসেন তার বিমাতা। বিমাতার শাসনে সাধনা বড় হয়। সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোটবেলা থেকেই আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা সে ভুলে গেছে। সংসারে তার একমাত্র নিজের বলতে তার পিতা। ছোট থেকেই পিতার প্রতি তার অগাধ ভক্তি ভালবাসা। বছরের পর বছর কেটে ছিল তার পিতার স্নেহের সুবাদে। কিন্তু হায় ক্রমশঃ বিমাতার ক্রূর দৃষ্টি সাধনার ওপর, পিতার স্নেহ নীড় থেকে সাধনা নির্ম্মমভাবে বঞ্চিত হল।

তার পরের বছরগুলো সাধনা আর ভাবতে পারে না।

বাহ্যিক ব্যবহার বাইরের পৃথিবীকে বিমুগ্ধ করে। সাধনা হাসিমুখে লোকের কাছে দেখা দেয়। কিন্তু হায়, তার অন্তরের ব্যথা কে অনুভব করে? যদি কোন কৌশল সে

জানতো, তার ব্যথাতুর হৃদয় মানুষের কাছে নিবেদন করতো! কিন্তু পর্দ্দার অন্তরালে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, চাপা দেয় তার গোপন ব্যথাকে।

ছোট্টবেলায় ঠাকুরমার কোলে শুয়ে সে শুনেছিল, সেকালে সীতাদেবী হৃদয়ের ব্যথা সহ্য করতে না পারে ধরণীর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "ধরণী, দ্বিধা হও!" ধরণী তাঁর কোমল বুকে সীতাকে টেনে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সীতা ছিলেন দেবী, কিন্তু হায় সে যে মানবী, কে তার আকুল প্রার্থনা পুরণ করবে? পীড়ন করে মানুষ মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারে কিন্তু তার দীর্ঘশ্বাস কি চাপা রাখতে পারে? তার এক একটি দীর্ঘশ্বাস এক একটি অভিশাপের মত।

প্রকৃতির নিয়ম, দিন কেটে যায়।

সাধনার পার্থক্যের প্রাচীর আরও কঠিন হয়। সংসারে তার যেন সব দাবী চুকে গিয়েছে, সংসার থেকে সে যেন একেবারে নিরালা। শুধু যন্ত্রচালিতের মত নির্দ্দয়া বিমাতার অধীনে তাকে একঘেয়ে জীবন যাপন করতে হয়। কত যুগ সে বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখেনি তার ঠিকানা নেই। যাক্—সেজন্য সে মোটেই কাতর নয় কিন্তু এই যে তার মানসিক যন্ত্রণা আর সে সহ্য করতে পারে না। সাধনার জীবনের চাবিকাঠি তার বিমাতার হাতে, কাউকে ভালবাসার তার অধিকার নেই।

সাধনা ভালবাসা বড় কম পেয়েছে তাই সে ভালবাসার কাঙাল। সে ভাবে, স্নেহ ভালবাসা কি মানুষের হাতে বাঁধা ধরা? অপরের ইচ্ছামত কি মানুষ ভালবাসতে পারে? ভালবাসা আপনা হতে মানুষের মনকে ছেয়ে ফেলে, সে ভালবাসা কেউ নির্ম্মূল করতে পারে না। আন্তরিক ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে হবে, হায় একি মানুষের নির্ম্মম বিচার? না সাধনা যে অমানুষ বিমাতার হাতের পুতুল মাত্র।

আজ সাধনার সহ্যের বাঁধ সত্যিই ভেঙ্গেছে!
সে চায় মুক্তি! মুক্তির সাড়া সে বুঝি পেয়েছে······

সাধনা গৃহহারা হয়।
সারা পৃথিবীর কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হয়—

"ওরে গৃহহারা—"

ক্রমে সাধনার দেহ ছায়া হয়ে গভীর তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে হারিয়ে যায়।

উড়ন্ত জীবজন্তু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সরকার

উড়ন্ত জীবজন্তু? তোমাদের মধ্যে সকলে না হ'লেও যারা ছোট—তারা নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত কথাটা শুনে একটু অবাক হ'য়ে গেছ। সত্যি—জানোয়ারেরা উড়তে পারে শুন্‌লে অবাক হ'তে হয় বৈকি। তবে সব জানোয়ার উড়তে পারে না। এমন কতকগুলি জীবজন্তু এই পৃথিবীতে সৃষ্ট হ'য়েছে—যাদের পাখীদের মত উড়বার ক্ষমতা আছে।

যে সব জানোয়ার উড়তে পারে—তাদের ঘরবাড়ী সাধারণতঃ গাছেতেই হয়। প্রথমে যাদের কথা বল্‌ব—তাদের বাড়ী হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়াতে। এদের নাম হচ্ছে Opossum. আমেরিকায় একরকম গেছো Opossum আছে—এরা তাদেরই জাত ভাই। তবে উড়ন্ত Opossumদের গঠন অন্য ধরণের! এরা একরকম ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জীব। স্ত্রীজাতীয় Opossumদের দেহের সঙ্গে একটী করে থলি থাকে। এই থলির মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চা গুলি থাকে। এদের লেজ এমনভাবে তৈরী যে এর সাহায্যে এরা গাছের ডালপালা বেশ আঁকড়ে ধরে চলাফেরা করে। এরা সাধারণতঃ এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যায়।

এদের পরেই Phalangerদের নাম করা যেতে পারে। এরা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে উড়ন্ত Phalangerই সবচেয়ে বিস্ময়ের জিনিষ। এদের—"প্রাণী জগতের উড়োজাহাজ" বলা হয়। এরাও স্তন্যপায়ী জন্তু। আকারেও ছোট। তবে এদের সামনের দুপা ও পিছনের দুপা—পাতলা চাম্‌ড়া দিয়ে জোড়া। এর সাহায্যে এরা খুব বেশী লাফ দিতে পারে। একবার একটা Phalanger প্রায় ২৫০ ফিট লম্বা লাফ দিয়েছিল। ছোট আকারের Phalanger অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া নিউগিনিতেও পাওয়া যায়। খুব ছোট আকারের Phalangerদের চার পায়ে জোড়া চাম্‌ড়ার একটা থলি থাকে। এটা ঠিক প্যারাসুটের মত। উড়বার দরকার হ'লে সেই থলিটীকে প্যারাসুটের মত খুলে দেয়। নিউসাউথ ওয়েলস্ এ একরকম এই শ্রেণীর জন্তু আছে—যারা ফুলের কুঁড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে! তাছাড়া ছোট ছোট পোকামাক্‌ড়, ফুলের মধু, নানরকম ফল মূল হচ্ছে এদের প্রিয়খাদ্য। রাত্রেই এরা ভ্রমণে বের হয়। দরকার না হ'লে মাটীতে নাম্‌তে চায় না! একশ্রেণীর খুব

ছোট Phalanger আছে। এরা লম্বায় কত জান? বল তো? তিন ইঞ্চির বেশী হবে না। এজন্য এদের বলা হয় Pygmy flying Phalangers.

এই অষ্ট্রেলিয়াতেই একরকম উড়ন্ত ভাল্লুক আছে। এদের নাম Koala. এদের গা ঘনলোমে ভরা। লম্বা কানও আছে। এদের কোন লেজ নেই। তবে এদের পাগুলি জড়িয়ে থাক্‌বার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এরা বড় কুড়ে। একগাছে থাকতে পেলে—সেখান থেকে আর নড়তে চায় না। এরা 'ইউক্যালিপটাস্' গাছের পাতা খেতে খুব ভাল বাসে।

সাইবেরিয়াতে একরকম উড়ন্ত কাঠবিড়ালী দেখতে পাওয়া যায়। এরা অনেকটা আমাদের দেশের কাঠবিড়ালীর মত দেখতে। এদের পাগুলিও এক সঙ্গে পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। ভারতবর্ষ ও মালয়ে দু'তিন রকম উড়ন্ত কাঠবিড়ালী দেখা যায়। কাশ্মীরে যে উড়ন্ত কাঠবিড়ালী দেখা যায়, তাদের লেজ তাদের দেহের দ্বিগুণ লম্বা।

এদের প্যারাসুটের মত দুপাশে থলি থাকে যার দ্বারা গাছ থেকে গাছে তারা উড়ে লাফ দিতে পারে। আফ্রিকাতেও উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর মত একরকম প্রাণী দেখা যায়।

মালয়ে ও ফিলিপাইন দ্বীপে বানর জাতীয় একরকম জানোয়ারকে উড়তে দেখা যায়। এরা অবশ্য বানরের চেয়েও আকারে ছোট। এদের পাগুলি ও লেজ একটী চাম্‌ড়া দিয়ে একসঙ্গে জোড়া। এর সাহায্যে এরা একসঙ্গে প্রায় ২০০ ফিট গাছে গাছে যেতে পারে। তবে যত উড়ে যেত থাকে—তত মাটীর কাছে নামতে থাকে। এরা ছোট ছোট পাখী, পোকামাক্‌ড় খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের নাম Lemur.

এছাড়া মালয়ে নীল ও কম্‌লালেবু রংএর একরকম গিরগিটি দেখতে পাওয়া যায়। এদের Flying Dragon বলে। এদের লম্বা লেজ উড়ার সময় 'হালে'র কাজ করে।

অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ায় বাদুড় জাতীয় একরকম জন্তু দেখতে পাওয়া যায়। এরা বেশ উড়তে পারে। এদের flying fox বা fox-bat বলা হয়। সাধারণতঃ ফলমূলই এদের প্রধানখাদ্য।

পৃথিবীর নানাদেশে কত বিচিত্র রকমের উড়ন্ত জীবজন্তু বাস করছে—তার সব খবর আমরা জানিনা।

শঙ্করের অসাধ্য নেই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সন্ধ্যের মুখে শঙ্করকে ডেকে মা বল্লেন, "আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি। সুষমা মাসীমার ওখানে রাত্রে খেয়ো। ও-বাড়ীর দিদিকে আমি বলে গেলাম।"

"আমার দায় পড়েছে পরের বাড়ী খেতে যেতে।" শঙ্করের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে।

"কেন, পরের বাড়ী কেন? ওদের বত্তুল কি আমাদের এখানে খায় না? ওঁরা কর্ত্তা-গিন্নী যেদিন থিয়েটার দেখতে যান?" ছেলের আত্মপর ভেদ জ্ঞানে মা বিস্মিত নন, বিচলিতও হন্ কিঞ্চিৎ।

"আমাকে কি তুমি বত্তু পেয়েছ? আমি কি ওদের বাড়ীর বত্তু নাকি?" শঙ্কর প্রতিবাদ করে ওঠে। ওর আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগে।

"তাহলে বেশ, বালিশের তলায় টাকা রইল। তোমার যেখানে খুসী, রেস্তরাঁ টেস্তরাঁয় সাঁটিয়ে এসে লক্ষ্মী ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে থেকো।" মা অবাধ ভ্রমণের ছাড়্পত্র লিখে দিলেন, যদিচ খুব অম্লানবদনে নয়। "বাইরে যেখানে সেখানে যা তা খেয়ে অসুখবিসুখ বাধাবে, সেইজন্যই বলা। ভুগ্‌তে তো হবে আমাকেই।"

তুই রাঁধবি!

"হ্যাঁ, আমি রেস্তরাঁয় খাবার জন্যেই ছট্‌ফট্ করে মর্‌ছি কিনা!" শঙ্করের স্বরে অক্ষুণ্ণ আপত্তির সুর, "কেন, আমি কি নিজে নিজে রেঁধে খেতে পারিনে নাকি?"

এবার মা সত্যি সত্যিই আকাশ থেকে আছাড় খান্: "তুই রাঁধ্‌বি! রেঁধে বেড়ে খাবি তুই! তবেই হয়েছে! যে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে পারেনা, জামার বোতাম পরাবারই জন্যে যার মাকে ডাকতে হয়—মাকে একদণ্ড না খাটিয়ে যার স্বস্তি নেই—"

ফিরিস্তি আরো বেড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু শঙ্কর নিজের অপটুতার মা'র দীর্ঘ ছন্দ নিজের কাণে শুনতে একেবারে প্রস্তুত নয়—

"হ্যাঁ, পারিনে বলে না কি? তাই নাকি? কে বল্লে? তোমার হাত দিয়ে আমার সব হলে আমার কেমন ভালো লাগে। তাই-ই তো! জল কেমর্ন মিষ্টি হয়ে যায়, জামা পরে কেমন আরাম পাই। সেই জন্যই তো! নইলে কে তোমায় সাধতে গেছে?"

মার প্রতি ওর পক্ষপাতিত্বের নিগূঢ় কারণ ঢালের অপর দিকটা, অকপট চিত্তে শঙ্কর উন্মুক্ত করে দ্যায়—

"নইলে আমি সব পারি! রাঁধতেও পারি, বাড়তেও পারি, খেতেও জানি। বলোনা কেন, তোমাকে বাবাকে—পাড়াশুদ্ধ সবাইকেই রেঁধে বেড়ে আমি খাইয়ে দিচ্ছি। খাবে বলো? কি কি রাধিতে হবে বলে দাও? পোলাও, কালিয়া রাঁধতে হলেও শঙ্কর কক্ষণো পেছপা নয়। শঙ্করের অসাধ্য নেই! যা খেতে চাইবে—যা খুসি—সব রকম রান্নাই আমার আসে।"

মা কিছু বলেন না, খালি হাসেন। শঙ্করের অতো উপরোধেও ওরূপ লোভনীয় খাদ্য তালিকা তাঁর চোখের সামনে নাচতে থাকলেও, সে সবের প্রতি তাঁর তেমন প্রলুব্ধতা দেখা যায় না।

"বেশ, নিজেই রেধে বেড়ে খাস তাহলে! তোর নিজের মনের মতো—যা খুসি। রান্না ঘরে সমস্তই রয়েছে। আর যা যা দরকার ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কিনে আনাস্। কেমন?"

"সে বল্‌তে হবে না। সব আমি বুঝে নেব।" শঙ্কর মুরুব্বি চালে ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়।

"তাহলে এক কাজ কর না কেন? ও-বাড়ীর বত্তুলকেও তোর সঙ্গে চাট্টি খাইয়ে দিস্ তাহলে। আর ও-বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নীরও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে থিয়েটার যাওয়া হয়। তাহলে সুষমাদিকে তাই বলিগে, আমাদের শঙ্কর বত্তুর খাওয়ানোর ভার নিচ্ছে—বলে দিইগে এই কথা?

"বত্তু! বত্তুকেও খাওয়াতে হবে?" শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করে। "তা বেশ, বত্তুকে খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দেব। তার কি হয়েছে? এই ত কথা? দুজনের রান্না! এই তো। তা, শঙ্কর তোমাদের সব পারে।"

একটা উদার আত্মপ্রসাদ শঙ্করের মুখের দুধার ছাপিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

বাবা-মা, বত্তুলের মা-বাবার সঙ্গে থিয়েটারের দিকে রওনা দিতেই, শঙ্কর ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একখানা হাঁক্ ছাড়লে—"বত্তু! ও বত্তু! ওহে এক নম্বরের! একবারটি দয়া করে এবাড়ীতে আসবে এখন?'

বত্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, কি উত্তর দিল ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, বত্তু তার হৃষ্টপুষ্ট বপুটিকে মন্থর গতিকে টেনে নিয়ে, শঙ্করের বাড়ীর একটা সোফার ওপরে এনে গচ্ছিত করেছে।

ছেলেবেলাতেই স্বনামধন্য হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম ব্যক্তির বরাতেই ঘটে থাকে, কিন্তু বল্‌তে হবে, আমাদের বত্তুলের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। সে নামেও যা, আচারেও তাই, এবং চেহারাতেও অবিকল,— এই ধরণের বত্তুলাকার বালক, শঙ্করের ধারণায় সচরাচর দুষ্প্রাপ্য। বত্তুল কেবল মাত্র স্থুল নয়,— হুলুস্থুল!

সোফায় বত্তুল বলে' "ওঠেঃ বাবা মার যেমন! কেন, আমাদের থিয়েটারে নিয়ে গেলে কী হয়? আমরা কি থিয়েটার দেখতে পারিনে?"

"তোমাকে কেন নিয়ে যায় না বল্‌তে পারি আমি। ডবল্ টিকিট লাগবে বলে। তাছাড়া, তোমার মাপসই জোড়া-সীট থিয়েটারে মিল্‌লে হয়!"

শঙ্করের বলার মধ্যে ঠাট্টার লেস মাত্র নেই।

"আর তোমাকে কেন নেয় না?" বত্তুল বিশ্রিরকম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

"আমাকে—আমাকে?" শঙ্করকে আম্‌তা—আমতা করতে হয়। কেন যে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় না তা ওর অজানা নেই, কিন্তু সে কারণ ব্যক্ত করতে শঙ্করের সঙ্কোচ লাগে। বাবা মার মতে, শঙ্কর নাকি এখনো নিতান্তই ছেলেমানুষ। শঙ্কর বাবা মা'র মতটা, বুদ্ধিমান ছেলের মতো, ঢাকা দেবার চেষ্টা করে: "কেন আমাকে নিয়ে যাবে না? আমি তো গেলেই পারি! আমারই ভালো লাগে না থিয়েটার দেখতে। আমি বায়স্কোপ দেখি। তিনটের শোয়ে—টেরও পায় না কেউ।"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছে আর কি! বল্‌লেই হোলো?" বত্তুলের দারুণ অবিশ্বাস।

"কেন, আমি কি খুব মোটা? মোটা তো নই, যে আমাকে নেবে না। বরঞ্চ আমি যা রোগা, চেয়ে দ্যাখো না, আমি তো হাফ্ টিকিটেও দেখতে পারি!"

"টিকিটই লাগবে না তোমার! তুমি তো ইচ্ছে করলে পাশের সীটের লোকের কোলে বসেও দেখতে পারো।" বত্তুলের মোটা গলার ভেতর থেকে ছুঁচলো আওয়াজ—শঙ্করের মনে হয়, ছুঁচেন আওয়াজ বেরিয়ে আসে: "কচি খোকাটি আর কি!"

কর্ত্তব্যপরায়ণ শঙ্কর ওসব সরু মোটা কথায় কান দ্যায় না—নিজের গালে চড় খেয়েও সরাসরি কাজের কথায় নেমে আসে।

"ওসব কথা থাক্। মা বলে' গেছেন তোমাকে খাওয়ানোর জন্যে। এখন কী খাবে বলো দিকি? তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো, উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়ে দিতে হবে, তারপরে আবার বাজার করা আছে! কী খেতে চাও? লজ্জা করো না, বলে' ফ্যালো। যা চাও

তাই হবে—পোলাও—না কালিয়া—না রোস্‌ট—না কারি—না কোপ্তা—না কোর্ম্মা—না কাবাব?"

"না হাতী—না ঘোড়া!" বত্তুল হো—হো করে' হেসে উঠল।

"হ্যাঁঃ, তোমাকে আর এসব রেঁধে খাওয়াতে হয় না! যাও!"

"আরে বাপু, খেতে পেলেই তো হোলো! আমি রাধতে জানি কি না জানি তখনই তো তা টের পাবে। এখন চট্‌পট্ বলো তো কী খেতে চাও? ঝি উনুন্ ধরাবার জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌ছ না? দেরি করার সময় নেই! কি কি রাঁধবো, উঁ?"

শঙ্করের তাড়ায় বত্তুল একটু ভড়কেই যায়: "তা বেশতো! কি রাঁধবে? কি কি বল্‌লে? পোলাও আর মটন্ রোস্‌ট—তাই রাঁধো। মাংস খেতে আমার খুব ভালো লাগে।"

"পোলাও আর মটন্ রোস্‌ট? বেশ তাই হবে। এ আর এমন বেশী কি?"

এই বলে শঙ্কর ঝিকে ডেকে চট্‌পট উনুন্ ধরাতে হেঁকে দিল: "আমি বাজারে চল্লুম। ভালো দেখে মাটন্ কিনে আনিগে। আর পোলাওয়ের চালও তো কিন্‌তে হবে। খুব সরু চাল! সব চালে তো পোলাও হয় না। আমি বাজার করতে গেলাম বত্তু! তোমাকে একলা রেখে যেতে হচ্ছে, কিন্তু কি করব?" শঙ্কর ভয়ানক মায়ায় অমায়িক হয়ে ওঠে: "তোমার নিজের বাড়ীর মত মনে কোরো। যেন নিজের বাড়ীতেই রয়েছ, কেমন?"

এই বলে কর্ত্তব্য নিষ্ঠ শঙ্কর বাড়ী থেকে বেরিয়ে সটান চলে গেল জগুবাবুর বাজারে। কিন্তু বাজারের মধ্যে না সেঁধিয়ে সোজা সোজা সে উঠে গেল বাজারের দোতলায়। একেবারে তৃপ্তি রেস্তরাঁর ভেতরে। কতবারই তো সে এখানে এসে পরিপাটি করে খেয়ে গেছে। রেস্তরাঁর কর্ত্তার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল—গোটাকয়েক টাকা ফেলে, কানে কানে কী সব ফর্‌মাস দিয়ে শঙ্কর বিশেষ করে তাকে বাৎলে দিল: "দেখবেন কিন্তু আপনার লোক যেন আমাদের বাড়ীর সদরের দিকে না যায়। বাড়ীর পেছন ধারে একটা দরজা আছে। আমি তার কাছাকাছিই থাকব, কান পেতেই থাকব এখন, আস্তে একটা টোকা মারলেই শুন্‌তে পাবো আমি। ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন, বুঝলেন?"

শঙ্কর ফির্‌ল। একটা থলের মধ্যে কী সব ভর্ত্তি, হাতে করে পোলাওয়ের জন্য সরু চাল আর রোস্‌টের মাটন্—তাছাড়া আর কি? ফিরে এসে দেখ্‌ল, বত্তুল কোথ্‌থেকে একটা কাঁচি যোগাড় করে, তারই টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে বার করা, বলা বাহুল্য, রাজ্যের কাগজ কুঁচিয়ে ঘরময় ছড়িয়েছে—ঘরের শোভাবর্দ্ধনের জন্যেই খুব সম্ভব। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পেল, তার প্রিয় লেখক শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত, সদ্য-ক্রীত একখানি বই আর অবিকৃত নেই।

শঙ্করের চোখ কপাল ঠেলে উঠল : "এ কি ?"

"বাঃ, তুমি তো বলে গেলে আমাকে নিজের বাড়ীর মতো ভাব্‌তে ? তাই না ?" বত্তুলের মুখে কোনো বিকার নেই ?" "বাড়ীতে আমি এইরকম ভাবি ।"

শঙ্কর অতি কষ্টে রাগ সাম্‌লালো । মা অতিথি সৎকারের ভার দিয়ে গেছেন, দায়িত্ব চাপিয়ে গেছেন, নতুবা অতিথি সৎকার করতে—এ হেন অতিথির সৎকার করতে শঙ্কর যে না জানে, তা নয় । একে এখন ধরে, পিঠের দিকে ঘা কতক খাইয়ে ছেড়ে দিলে, উপযুক্ত রূপই অতিথি সৎকার করা হয়েছে, মা কি সেটা ভাব্‌তে পারবেন ?

ম্লান হেসে শঙ্কর বলল : "তা— তা—তাতে আর কি হয়েছে ? বাড়ীর মতোই তো ! নিজের বাড়ীর মতোই ভাব্‌বে বই কি !"

"তা আর বল্‌তে ! তোমরা কি আমাদের পর ? তোমাকে কি আবার বলে দিতে হবে ?—" বল্‌তে না বল্‌তে বত্তুল, কাঁচি দিয়ে সোফার এক কোণ কেটে, ফাঁক করে এক হ্যাঁচকা টানে পর্ পর্ করে ছিঁড়ে ভেতরের ছোব্‌রা বার করে ফেল্‌ল ।

এ দৃশ্য দেখা শঙ্করের পক্ষে অসহ্য । এ দৃশ্য দেখ্‌লে রাগ গিস্‌গিস্ করে, হাত নিস্‌পিস্ করে' ওঠে—অতিথি বলে জ্ঞান গম্যি থাকে না । সে তাড়াতাড়ি বল্ল : "তুমি ততক্ষণ এধারে দ্যাখো, এই সব সামলাও কেমন ? আমি রান্নার যোগাড় দেখিগে ।" বলে' এক ছুটে সে রান্নাঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল ।

ঝি এতক্ষণে উনুন ধরিয়ে রেখেছিল । জ্বলন্ত উনুন দেখেই শঙ্কর খুসিতে উজ্জ্বল ! এক্ষুনি ঝিকে দু'আনা বক্‌সিস্ দিয়ে বলে ফেল্ল : "বাঃ, আসল কাজই করে রেখেচ ! আর কি আর রান্নার বাকি কি, তোমার ছুটি, তুমি বাড়ী চলে যাও ।" তক্ষুণি সে ঝিকে ছুটিয়ে দিতে চায় !

ঝি কিন্তু তক্ষুণি তক্ষুণি যেতে রাজি নয় । তার মতে তখনো নাকি কাজের অনেক কিছু বাকী রয়েছে । কর্ত্তব্যের লম্বা একটা তালিকাও নাকি সুরে সে দাখিল করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তক্ষুণি আরো দুআনা ফেলে শঙ্কর তার নাক বন্ধ করল : "আর যা যা করতে হবে সে আমি নিজেই করে নিতে পারব ।" বাধা দিয়ে বল্ল সে—"তোমায় সেজন্য ভাবতে হবে না । আমি একাই পারব ।"

এই বলে' আরো দু আনা বক্‌সিস্ খসিয়ে, প্রায় সর্ব্বহারা হয়ে একরকম তাড়া দিয়ে দিয়ে ঝিকে তাড়াল, বল্‌তে গেলে ।

শঙ্করের বিবেচনায়, পরকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়া যেমন অনুচিত, খেতে যেমন চক্ষুলজ্জা বাধে কেমন, তেমনি পরের চোখের সাম্নে রান্না করাটাও রুচি বিরুদ্ধ । রান্নাঘরের খিল লাগিয়ে ঢং ঢং ঘটর্ ঘটর্ ঠনাঠটন্ করে অনেকক্ষণ ধরে অনেক ঘন ঘটা করে শঙ্করের রান্না চল্‌তে লাগ্‌লো । বড় দরের এক রাঁধুনি এসে ভারী জোর রান্না লাগিয়েছে, চোখে না দেখতে পেলেও পাড়ার কারুর জান্‌তে বাকী রইল না !

সশব্দ কড়া নাড়ার সাথে সাথে এক গাদা লঙ্কা ফোড়ন্ দিয়ে, গোলমাল লাগিয়ে, এমন উৎসাহে শঙ্কর সাঁৎলাতে সুরু করে দিল যে পাড়াশুদ্ধ সবাই হেঁচে কেসে হেঁচ্‌কি উঠে যায় আর কি ! শঙ্কর নিজেও অস্থির । নাকের জলে চোখের জলে মুখে রুমাল চাপা দিয়েও রেহাই নেই । কিন্তু কি করবে, পোলাও রাঁধ্‌তে গিয়ে পালাও বল্লে তো আর চলে না ?

কিন্তু রান্নার দিকে মন থাক্‌লেও, তার কাণ পড়ে ছিল খিড়্‌কির পানে । যেম্‌নি না একটু কড়া নড়েছে অম্‌নি শঙ্করের উনুনের কড়া ফেলে, এক ছুট্ ! খিড়কির দরজা খুলে দিতেই তৃপ্তির উর্দ্দী আঁটা বেয়ারাকে দেখা গেল, এক ট্রে-ভর্ত্তি প্লেট্-চাপা প্যালেটেবল্ সমভিব্যাহারে ।

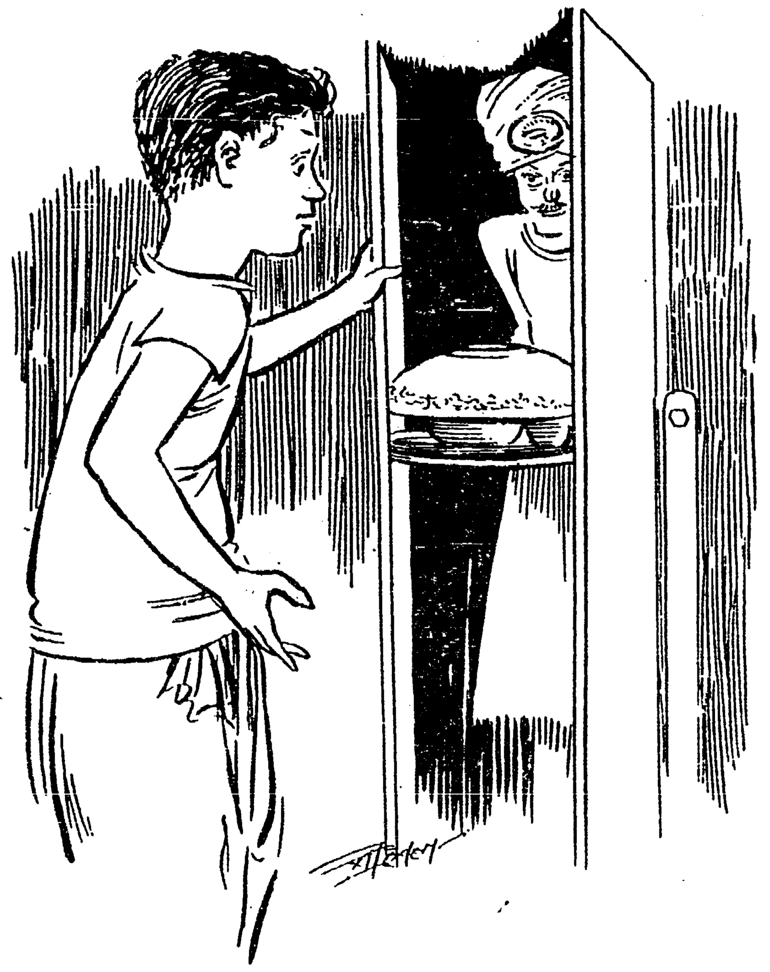

প্লেট্ চাপা প্যালেটেব্‌ল্

"এই যে, এসে পড়েচ দেখ্‌চি !" শঙ্কর বেয়ারাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে আন্‌ল : "অনেকক্ষণ হাঁ করে তোমার পথ চেয়ে রয়েচি ! এক কাজ করো, ট্রে-টা নিয়ে আমাদের খাবার ঘরে এসো । ওগুলো আমাদের থালায় বাটিতে আজাড় করে' রেখে তোমাদের ট্রে প্লেট্ ইত্যাদি নিয়ে চলে যাও । তোমাদের তৃপ্তির মার্কা মারা ওসব এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না যেন ! আর এই নাও –তোমার বক্‌শিস্ ! (শঙ্কর তার শেষ দু'আনাও দিয়ে ফেল্ল !) আমি ততক্ষণ বাথরুমে গিয়ে চান্ টান্ সেরে নিই । রান্না করতে গেলে এমন শরীর ঘেমে যায়—ছ্যা ! সোজা কাজ কি রান্না করা ! ভারী বিচ্ছিরি কাজ, ভদ্রলোকের কাজ নয় ! মা যে কি ক'রে রোজ রোজ রান্না করে—আমি ভেবে পাই না ! একদিনেই আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে ! হ্যাঁ হ্যাঁ এই ঘরে—ওই খানটায় সাজিয়ে রেখে চাপা দিয়ে, ফের ওই খিড়্‌কির দিক দিয়েই তুমি বেরিয়ে যেয়ো ।"

বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে পোষাক বদ্‌লে, বত্তুলকে খাবার জন্যে আবাহন করতে গিয়ে শঙ্কর দেখ্‌ল, বত্তুল এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে তাদের ড্রইং রুম্‌কে সার্থক করে' তোলবার সাধনা করেছে। টেবিলের ওপরে বাবার এবং তার যে-ক'টা ফাউণ্টেন্‌পেন্‌ ছিল, তাদের সহায়তায়, চারটে দেয়ালের একটাতেও ড্রইংএর অভাব নেই। হাতী ঘোড়া উট আর ভূত প্রেতে ভর্ত্তি—চারধারেই কিম্ভুত কিমাকার! বাবার দেওয়া, জন্মদিনে-পাওয়া, তার অত সাধের বেহালাটিকে দুম্‌ড়ে বাঁকিয়ে নিজের আকার দান করতে বত্তুল কার্পণ্য করেনি।

শঙ্করের চোখ ফেটে জল আস্‌বার মতো হোলো। কিন্তু এবারও সে সাম্‌লে নিল। মার অতিথি, মা বুঝবে, তার কি? দেয়ালও তার নিজের নয়—তার বাবার। নিজের বল্‌তে, তার বেহালা আর ফাউণ্টেন পেন্‌টি ছিল কিন্তু তাদের তো দফা রফা,—আর কেঁদে লাভ? যাক্‌গে! তার আকেটা জন্মদিনও তো এসে পড়ল বলে! এই ক'টা মাস যদি সে কষ্টে সৃষ্টে বেঁচে বর্ত্তে থাক্‌তে পারে তাহলে বত্তুকে তার থোড়াই কেয়ার—

এমনি করে সান্ত্বনা লাভ করে শঙ্কর ডাকলে: "খাবে এসো।"

বত্তুল তখন ছিন্ন বেহালার তার একটা আঙ্গুলে পরিপাটি করে জড়ানোর তালে ছিল, বাধা পেয়ে চম্‌কে উঠল: "য়্যাঁ, এর মধ্যেই—এর মধ্যেই হয়ে গেল? পোলাও, মাট্‌ন্‌ রোস্‌ট্‌—সমস্ত! য়্যাঁ?"

"কেন, রাত কিছু কম হয়েছে নাকি? নিজের আত্মীয় স্বজনের ছবি আঁকায় ব্যতিব্যস্ত ছিলে বলে টের পাওনি।"

"ওঃ, এই ছবিগুলো? খুব চমৎকার হয়েছে,—না? আমার শোবার ঘরে যেয়ো, এর চেয়েও ঢের ভালো ভালো ছবি তোমায় দেখাবো, ঢের ঢের ভালোছবি! আমার কোলের ভাইটা পর্য্যন্ত হাঁ করে তাকিয়ে দ্যাখে।"

তারা খাবার ঘরে গিয়ে বস্‌তে না বস্‌তেই মা বাবা ফিরে এলেন।

"য়্যাঁ, দেয়ালময় এসব কী হয়েছে?"—বক্‌তে বক্‌তে মা ঢুক্‌লেন, "য়্যা, এখনো তোরা খাস্‌নি? য়্যাঁ, বলে কিগো শঙ্কর আমাদের রেঁধেছে দেখছি—সত্যিই! কী রাঁধলি দেখি?" মার বিস্ময় টইটুম্বুর, বিরক্তিকেও ছাপিয়ে ওঠে।

"বেশী কিছু না, কি আর রাধব? কেবল মাট্‌ন্‌ রোস্‌ট্‌ আর পোলাও! এই রাঁধলাম। বত্তু তো বেশী কিছু খেতে চাইল না, কি করি?"

"পোলাও আর মাটন্‌ রোস্‌ট্‌? য়্যাঁ, বলিস্‌ কি? অনেক রকমে কাজ নেই—দুরকমেই চক্ষুস্থির! তাহলে তো সত্যি বল্‌তে হবে, শঙ্কর আমাদের সব পারে।" কিন্তু বিস্ময়ের সুর হঠাৎ যেন তাঁর বদ্‌লে আসে: "রেঁধেছিস্‌ তো বটে, কিন্তু মুখে তোলা কি যাচ্ছে?"

"চেখেই দ্যাখোনা কেন? এখনো তো হাতই দিইনি আমরা।" শঙ্কর আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌ হয়ে মাকে নিমন্ত্রণ করে বসে: "কেমন রেঁধেছি একটু চেখেই ছাখো না। আমার ভাগ থেকেই একটু চাখ্‌তে পারো। বল্‌তে হবে, হুঁ!"

মা একটার ঢাক্‌নি তুল্‌লেন, তুল্‌তেই সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে এল। থালার এক ধারে একটা চিরকুট, তাতে লেখা, "পোলাও আর মাটন্‌ রোস্‌ট্‌ ফুরাইয়া যাওয়ায় দুজনের মত মাখন রুটি আর মাংসের কারি পাঠাইলাম।" চির্‌কুট্‌টাও শঙ্করের মা'ই টেনে তুল্‌লেন।

কবিতা

মৌমাছিদের ঘুম টুট্‌লো

শ্রীনীহার কান্তি ঘোষ দস্তিদার

ফাল্গুনে আল্‌গোছে চোখ খুলে ফুলগুলি
বনে বনে জেগে আজ উঠ্‌লো
মৌমাছিদের ঘুম টুট্‌লো।
গম্ভীর কলিসব যেন সব বীর আজ
বসন্তে নব সাড়া পেয়েছে,
আনন্দে উৎসব লেগেছে।
অলসতা ভীরুতার গুরুভার নাইরে,
দুরু দুরু বক্ষের নৃত্য—
ফাল্গুনে নাচে নব চিত্ত!
আগুনের মতো যেন ফাল্গুন এসেছে
কুসুমের বনে বনে আজিরে,
দলে দলে হাসে মৌমাছিরে!
চঞ্চল মন আজ হ'ল মোর হ'ল রে—
সাধ যায় ছুটে যাই সেখানে।
অলিসনে ফুল হাসে যেখানে।
কুসুমের সুবাসিত ছোট এক খেলাঘর
ধরণীর কোলে জেগে উঠেছে,
শত শত মৌমাছি জুটেছে।
কর্ম্মের দোলা আজ দিয়ে গেছে ফাল্গুন
ঘুমন্ত কুসুমিত কাননে
চুপে চুপে সমীরণ ভাষণে।
মোরা সব মানুষেরা লব তাই শিক্ষা
ফাল্গুনী ফুল বন হ'তে আজ
মন হ'তে দূর করি' ভয় লাজ!!

শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী

—তের—

হাতের স্বর্গ না বিসর্গ ?

"এই নাও।" শিশির গিয়ে তার মামার হাতে প্ল্যান্‌টা ছাড়ল।

মামা বিস্মিত হয়ে উঠ্‌লেন, আর মুহূর্ত্তেই তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেল। কিন্তু তাঁর মনোভাবের আভাস ভাষায় প্রকাশ করার জন্যে এক মুহূর্ত্তও না নষ্ট করে, একটুও না দাঁড়িয়ে, প্ল্যান্‌টি পাবামাত্রই বিদ্যুৎ-গতিতে তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন।

যেমন তড়িৎ-বেগে তিনি গেলেন, খানিক পরে, তার চেয়েও, এমন কি, ততোধিক ত্বরিত বেগে ফিরে এলেন তিনি।

"কিছু নেই, কিছু নেই !" তাঁর মেঘলা বদনমণ্ডল থেকে যেন দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বয়ে গেল !

"কিছু নেই, সে কি মামা ?" লিলিরও খুব তাক্ লাগে।

"নাঃ, সব সেই হতভাগাটা নিয়ে সট্‌কেছে এর আগেই। সেই কালনিমে অপয়াটা।"

"তা কি করে হবে ?" শিশির বিশ্বাস করতে পারে না ঃ "এর মধ্যেই নিয়ে পালাবে কেমন করে ? আমি তো গ্র্যাণ্ড্ মামাকে কাল রাত্রে কিছু নিতে দিই নি। চুইংগাম্ চালিয়েই তো তাকে জাগালুম !"

বাস্তবিক্, কি করে' তা সম্ভব হতে পারে ? কালকের রাত্রে, ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট সেই সব নিক্ষিপ্তদের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে—চুইংগাম্‌দের চাটুকারিতায় চটে গিয়ে, চট্‌চটে হয়ে গিয়ে সেই যে তিনি তীর বেগে প্রস্থান করেচেন তার পরে কখন আবার এলেন ? তার পরে সে-ই তো—এই শিশিরই তো—কত না বীরত্ব দেখিয়ে উক্ত প্ল্যান্ উদ্ধার করে' এইমাত্র ফিরছে !

"দাও তো দেখি প্ল্যান্‌টা আমায় !" শিশির বল্লে ঃ "দেখি আমি চেষ্টা করে। খুঁজে পেতে দেখা যাক্ একবার।"

ব্রজেশ্বর বড়ুয়া অম্লান বদনে—কিম্বা অতিশয় ম্লান বদনেই, প্ল্যানটি শিশিরের হাতে পরিত্যাগ করেন। যে-প্ল্যানের পেছনে কোনো গুপ্তধনের কিনারা নেই তা রেখে লাভ ? যার সমস্তটাই ফাঁকা —বেবাক ফাঁক্—তা আর রাখা কেন ?

নক্সাটার সর্ব্বসত্ব লাভ করে' উল্লসিত হয়ে শিশির সেই গুপ্তকক্ষে গিয়ে হাজির হয় পার্চ্চমেণ্টের ছক্‌টাকে অনুসরণ করে', এগিয়ে পেছিয়ে, ডান ধারে বাঁধারে এঁকে বেঁকে, দুবার লেফ্ট

আর চার বার রাইট্ টার্ণ করে'—রাইট্ কিম্বা রংটার্ণ্ তা কেবল সেই ছক্কেশ্বরই জানেন্—অবশেষে নক্সার উপদেশমত, তিন পাক্ ঘুরে, চিহ্নিত একস্থানে গিয়ে সে উপস্থিত হয়।

এবং উপস্থিত হয়েই সে লাফাতে আরম্ভ করে (যদিও লাফাবার কোনো নির্দ্দেশ সেই নক্সার মধ্যে ছিল না)!—কিন্তু না লাফিয়ে সে করে কি,—একেবারে হুবহু সেই চিহ্ন ইযে! নক্সার নিশানার সঙ্গে অবিকল একেবারে ! একটা শক্ত আঁক এমন ভাবে মিলে গেলে না লাফিয়ে কি থাকা যায় ?

দুয়ে দুয়ে যেমন চার হয়, (দুধও হয় নাকি, অনেকে বলে থাকেন,) তেম্‌নি অবলীলাক্রমে কত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল !

তারপর নক্সার আদেশমত তিকটি টোকা—চারিটি নয়, দুটিও না—গুণে গুণে তিনটি টোকা—সেই চিহ্নটির পৃষ্ঠদেশে ! আর তিনবার ঠোক্‌বার পরেই—

ঠিক যেমনটি শিশিরের আশঙ্কা ছিল—

চকিতের মধ্যে, কোথথেকে কী সরে' গিয়ে, উন্মুক্ত আধারে, চক্‌চকে কত কী সব বেরিয়ে পড়ল !

হাঁসের ডিমের মতো—কিন্তু আকারে কিছু বৃহত্তর—তেমনি সাদা আর তেমনি সুচারু—থরে বিথরে সাজানো কতকগুলি—

কী ওগুলি ? হীরে না জহরৎ ? মণি না মাণিক্য ? মুক্তা না গজোমতি ? চুনী পান্না প্রবাল মরকত—কী ওরা ? রত্ন-তত্ত্বে শিশির খুব ওয়াকিবহাল্ ছিল না—ও-বিষয়ে ওকে প্রায় বিশেষজ্ঞই বলা চলে—তবু, বিশেষ অজ্ঞতা থাক্‌লেও, যাই হোক্, ওগুলো যে খুব দামী চীজ্ সে সম্বন্ধে তার তিলমাত্র সন্দেহ হোলো না।

একেকটি করে' গুণে গুণে দেখল শিশির—তেরটি।

সাত রাজার ধন এক মাণিক—একমাত্র মাণিকে সাত সাতটা রাজা কেনা যায়। কিন্তু এর একটায়—এহেন এক রাম-মাণিক্য দিয়ে কটা সম্রাটের কখানা সাম্রাজ্য কেনা যায় কে জানে !

বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে এই সব কথা শিশির ভাবছে—এমন সময়ে পেছন থেকে হেঁড়ে গলার এক আওয়াজ এল ঃ "হাত তোলো !"

"য়্যাঁ ?" চমকে গিয়ে শিশির পেছন ফিরল। পিস্তল হাতে, তার গ্র্যাণ্ড মামা।

"তুলে ফ্যালো ! দেখছ কি আর ?" বক্কেশ্বর আইচ বজ্রনির্ঘোষে বল্লেন।

"কেন, হাত তুল্‌ব কেন ? কী হয়েছে ?" শিশির বলে।

"হাত তুল্‌বে কেন, বল্‌ছ বেশ।" বক্কেশ্বর কাষ্ঠহাসি হাসেন ঃ "আমার হাতে এটা কী, দেখ্‌চ না ?"

"দেখেচি। পিস্তল।" তাচ্ছীল্যভরে শিশির জানায়।

"হ্যাঁ, গুলিভরা ছ-নল দেখেচ ত ?" গ্র্যাণ্ডমামা আরো বিশদ করে' দ্যান্ ঃ "এরকম একখানা দেখ্‌লেই লক্ষ্মী ছেলের মত হাত তুল্‌তে হয়। গুলি করে' দেবো তা বলে রাখ্‌চি। হাত না তুল্‌লেই গুলি করার নিয়ম।"

অগত্যা, শিশিরকে, অনিচ্ছাসত্বেই নিয়মরক্ষা করতে হয়।

"হুঁ, যে-বিয়েতে যে-মন্ত্র! যে কাজের যা-দস্তুর!" শিশিরকে উর্দ্ধবাহু দেখে প্রশন্ন হয়ে বক্কেশ্বর বিবৃতি দ্যান্ঃ 'তুমিও যদি এম্‌নি একখানা রিভলভার নিয়ে পেছন থেকে আস্‌তে আর আমি তোমার অবস্থায় পড়তুম—আমিও হাত তুলে ফেল্‌তুম।"

"আমার, আমার রিভলভার কই?" শিশির ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলে।

"সেই তো, নেইই তো! সেই জন্যেই তো আমি সুবিধে ক'রে নিচ্ছি। এসব কাজে এগুতে হলে রিভলভার নিয়ে এগুতে হয়। তাও জানোনা?"

এই বলে' বক্কেশ্বর আইচ্ রিভলভার হাতে রত্ন সম্ভারের দিকে গুটি গুটি অগ্রসর হন্। ধীরে ধীরে এগুতে থাকেন। এগুতে এগুতে একেবারে শিশিরের নাকে ঠেকাঠেকি হয়।

"একি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? পিছনে হট্‌ছনা কেন?—পিছিয়ে যাও। পিছনে হটে পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসো। যাতে দরকার হলে তোমাকে আমি গুলি করতে পারি। নাকের ওপরে নল রেখে গুলি করা যায় না—তাতে পিস্তলের অপমান হয়!"

শিশির তথাপি নড়েনা। পিস্তলের নলে আর তার গালে মোলাকাৎ হাতে থাকে।

"ছি ছি! ছবির মতো অমন দাঁড়িয়ে থেকোনা, দোহাই তোমার! আমার কাজের বাধা হচ্ছে। অমন করলে, গুলি না দেগে এর ডাঁট্ দিয়েই এক ঘা সাঁটিয়ে দেব। নাক ফেটে রক্ত পড়লে আমার দোষ নেই তখন।" বক্কেশ্বর আইচের সাবধান বাণী শোনা যায়। "পিছিয়ে যাও, ভালো কথাই বল্‌ছি!"

গুলিকে শিশির গ্রাহ্য করেনা, কিন্তু নলাঘাতে তার ভয় আছে। অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়েই, কয়েক পা তাকে পশ্চাৎপদ হতে হয়।

বক্কেশ্বর রত্ন ডিম্বগুলি নিরীক্ষণ করেন। সকৌতূহলে পর্য্যবেক্ষণ করেন সব। তারপরে, রুমালে বেঁধে ওগুলিকে করায়ত্ত্ব করার তাঁর চেষ্টা হয়। কিন্তু এক হাতে পাকড়ানো যায় না কিছুতেই।

"ইস্! ভারী মুস্কিল হোলো দেখ্‌চি! এই পিস্তলটাকে নিয়েই মুস্কিল হোলো! কোথায় রাখি!" তিনি জনান্তিকে জানান্। আপন মনেই দুঃখ করেন তিনি।

"আমি ধর্‌ব?" শিশির প্রস্তাব কর্‌ল। একটু সাগ্রহেই। "পিস্তলটা আমি ধরব ততক্ষণ?"

"তুমি! তুমি ধরবে! তুমি ধরবে পিস্তল!" বক্কেশ্বরের দু চোখ বিস্ময়ে কপালে গিয়েই ঠ্যাকে: "তুমি যদি পিস্তল ধরো তাহলে এই ডিমগুলো কি আর আমি ধারণ করতে পারব? পিস্তল যার, এগুলোও তার। বুঝেছ?"

আর অধিক বাক্যব্যয় না করে তিনি ডিমগুলোকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হন্।

"হাত তুলে থাকৃতে পারছি না! ব্যথা করছে।" শিশির কাতরোক্তি করে।

"তাহলে এক কাজ করো। এগুলো—এই ডিমগুলো আমার রুমালে বেঁদে ছেঁদে আমার পকেটে ভরে দাও।"

গ্র্যাণ্ড্ মামার অনুজ্ঞায়, রিভলভারের তাঁবে, সেই গ্র্যাণ্ড রত্নগুলি শিশির, রুমালের অন্তর্গত করে' তা'র পকেটস্থ করে দ্যায়।

"নাও, এইবার এই প্ল্যান্‌টা নিতে পারো। নিয়ে যাও, খেলা করগে। আমার আর এতে দরকার নেই। ইচ্ছা করলে তোমার মামাকেও দিতে পারো এটা—আমার সেই হতভাগা ভাগ্নেটাকে। তবু এখানা দেখলে, শোক সামলাতে পারবে খানিকটা। অনেকে যেমন কুটুম্বরত্ন খোয়া গেলে তার ফোটো দেখে সুখ পায়।"

এই বলে গ্র্যাণ্ড মামা, শ্রীযুক্ত বক্কেশ্বর আইচ, মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে মৃদুমন্থর গতি মিলিয়ে একেবারে গদ্য কবিতার মত মিলিয়ে দিয়ে, গদ্‌গদ্ ভাবে হেল্‌তে দুল্‌তে চলে যান্।

—চোদ্দ—

বিসর্গ থেকে অনুস্বর!

শিশির এক ছুটে সেই গুপ্ত কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মামা ব্রজেশ্বর বড়ুয়া পেছন থেকে ডাক ছাড়েন, "কিরে পেলি কিছু?"—কিন্তু শিশির আর ক্ষণমাত্র দাঁড়ায় না।

কাছেই একটা সাইকেলের দোকান সে দেখেছিল, সেখানে গিয়ে, পয়সা ফেলে, সাইকেল ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ ছুট্ লাগায়। তার অযথা কালক্ষেপ করার সময় নেই।

বক্কেশ্বর আইচের সেই আড্ডাখানার উদ্দেশ্যে সে উধাও হয়। যেমন করেই হোক্, গ্র্যাণ্ড মামার আগে গিয়ে, সেখানে পৌছতে হবে। যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে নষ্ট রত্নদের—না করে তার উদ্ধার নেই। বড় বড় মহাত্মারা যেমন পাপীতাপীদের সমুদ্ধার করে', সমুচিত ভাবে উদ্ধৃত করে' পরিশেষে নিজেরা উর্দ্ধলোকে যান্, তেমনি ছোটখাট একটা অবতার স্বরূপ নিজেকে গণ্য করে শিশির। এবং এই নতুন অবতারণায় সে যখন সাইকেলে আর তার গ্র্যাণ্ডমামা পদব্রজে' তখন উদ্ধারের পথে পরিষ্কাররূপে সে যে অনেকখানি এগিয়েই রয়েছে, এই বিষয়ে তার ধারণা বলবৎ হয়।

মামাত আড্ডাখানায় পৌচ্ছে, সাইকেলটাকে এক কোণে ঠেসান দিয়ে, যতটা সম্ভব লুক্কায়িত রেখেই না সে, নিজেকে অ্যাব্‌স্কণ্ড্ করেচে, সেই উঁচু করা বাক্সগুলের অন্তরালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে গ্র্যাণ্ডমামাও এসে হাজির হন্। বক্কেশ্বরের সাড়া পেতেই তাঁর দলবলরা হৈ হৈ করে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। "কী হোলো কর্ত্তা? কদ্দুর এগুলো? উদ্ধার হোলো কাজ?" এই ধরণের প্রশ্ন পত্র মুখে করে' সবাই এগিয়ে আসে।

"এই রে! ব্যাটারা সব বখ্‌রা নিতে আস্‌ছে কম্মের যত ঢেঁকি, কেবল বখ্‌রা নেবার বেলায় রয়েছেন! দাঁড়া, দিচ্ছি বখ্‌রা। ভালো করেই দিচ্ছি।"

এই বলে'—নিজের কানে কানে এই কথা না বলে'—বক্কেশ্বর আইচ্ ঝটিতি তাঁর পকেট থেকে রত্নগর্ভ রুমালটা বের করে' খাড়া করা বাক্সগুলোর আড়ালে ফেলে দ্যান্!

মেঘ না চাইতেই জল! শিশির ওরই নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, ওৎ পেতে, ছিল বটে সে, কিন্তু এতখানির জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল না! গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি, এইভাবে আপ্‌না থেকেই,

আকাশ ফুঁড়ে তার হাতে এসে পড়বে—কে ভাব্‌তে পেরেছিল ? যেমনি না রুমালের ঝুপ্‌ করে পড়া অম্‌নি ওর নিঃশব্দে টুপ করে' লুফে নেয়া ! ব্র্যাডম্যান্ বল হাঁক্‌ড়ালে কার্ত্তিক বোস যেমন করে' ক্যাচ ধরে থাকে আর কি !

দলবলরা এসে পড়তেই বক্কেশ্বর আইচ মুখ কাচু-মাচু করে' জানিয়ে দ্যান্ ঃ নাঃ, হোলো না, ভাগনের খর্পরে গিয়ে যখন পড়েছে তখন আর রক্ষে আছে—ভাগনেরা কি কম বিচ্ছু ? এতো আবার ভাগনের ভাগনে ! একেবারে জলবিচ্ছুটি !"

"কী ! প্ল্যান্‌টা উদ্ধার করতে পারা গেল না ?" দলবলরা বক্কেশ্বরের চেয়েও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

"আর প্ল্যান্ !—" বক্কেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন ঃ "প্ল্যান্‌ও উদ্ধার করেছিলাম, গুপ্তধনের কিনারা করতেও বাকি ছিল না, কিন্তু হলে কি হবে ? ভাগনের ভাগনে যেখানে পিছু নিয়েছে—পেছনে লেগেছে যে ক্ষেত্রে—সেখানে উদ্ধার করলেই বা কি ! আবার তার হাতে চলে গেছে সে সব।"

"য়্যাঁ ? উর্দ্ধার করার পর—আবার চলে গেল ?" সকলে একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করে' ওঠে।

"গেলই তো ! মিথ্যে বল্‌ছি না, আমার যথা সর্ব্বস্ব সমস্তই আবার সেই মহাভাগনের হাতে গিয়ে পড়েছে। তার কবলেই সব এখন।"

মিথ্যে বল্‌তে গিয়ে কত বড় একটা মহসত্য, নিজের অজ্ঞাতসারেই, গ্র্যাণ্ড মামা উচ্চারণ করেছেন, ভেবে শিশিরের হাসি পায়। রুমাল আর রুমালের ভেতরের মাল সে মুঠোর মধ্যে চাপে—আদর করে' নিজের গালে বুলোয়—আর অতি বড় মিথ্যেবাদীরাও কেমন করে' সময়ে সময়ে সত্য কথার ফাঁপড়ে পড়ে যায় ভেবে মনে মনে বিচলিত হতে থাকে।

দলবলরা সমবেত হয়ে হায় হায় করে। হাহুতাশ শেষ করে' অতঃপর কিংকর্ত্তব্য জান্‌বার লালসা জানায়।

"কী আর করা ? এবার চাটি বাটি গুটোতে হবে এখান থেকে। থানায় আমার ফোটো লটকানো আছে সেই বদ্‌ছেলেটা তা জানে। এবার আলবৎ গিয়ে সে বলে' দেবে। পুলিসে খবর পাবার আগেই এখান থেকে সরে' পড়া, এই এখন কাজ আমাদের।"

"গুপ্তরত্ন উদ্ধার না করেই সরে পড়ব ?" ওদের ভেতরে একজন বলে' ওঠে।

"আমরাই বা এক‌েকটা কি এমন কম রত্ন ? আগে নিজেদের তো গুপ্ত রাখি ! নিজেরা উদ্ধার পেলে, প্রাণে বাঁচলে, অনেক গুপ্ত রত্ন উদ্ধারের সুযোগ জীবনে আস্‌বে।"

একথার পরে আর কথা নেই—সকলেই একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়। ঠিক হয়, বক্কেশ্বর আইচ্ সিঙ্গাপুরের দিকে পাড়ি দেবেন, আর দলবল সব রেঙ্গুন হয়ে অ্যাকীয়াবের দিকে রওনা হবে। পুলিসের সন্দেহ এড়ানোর জন্যই এই ভাবে কর্ত্তা একদিকে, কর্ম্মর অন্য মুখো উধাও হবার ব্যবস্থা, আপাতত কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে অচিরে, পরে আবার মন্দালয়ে গিয়ে নতুন ক্রিয়ায় সম্মিলিত হলেই হবে। মৌলমীনের বন্দর থেকে পরশুদিন ভুধারের জাহাজই ছাড়ছে—তাতেই টিকিট্ কাট্‌বার জন্য দলবলকে তিনি তক্ষুনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ার হুকুম করলেন।

দলবলরা কেটে পড়তেই, বক্কেশ্বর আইচ্ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগ্রেট ধরালেন ঃ "উঃ, এতক্ষণে একটু দম দিতে পারা গেল ! বাপ্ !"

শিশির যে মুহূর্ত্তে, প্যাকিং বাক্সের আব্‌ডালে আনন্দে বেদম, প্রায় তার কানের গোড়াতেই যেন আওয়াজটা এসে লাগে—কে যেন ছুড়ে দ্যায় পেছন থেকে—

"কই হে ! দাও তো দেখি এবার !"

কে বল্‌ছে ? কী বল্‌ছে ?—কাকে বল্‌ছে ? শিশিরের চমক্ লাগে। এতো তার গ্র্যাণ্ড মামার পেটেণ্ট গলা—কিন্তু তার কানের গোড়ায় কেন ?

"কী ! ফল ধরে·রে লক্ষ্মণ করে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে ? হাতের সুখ তো যথেষ্ট হোলো, এখন দাও ওগুলো।"

য়্যাঁ ! তাকেই ডেকে বলা হচ্ছে না কি ? শিশিরের কেমন যেন সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে যে ওখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে এতো গ্র্যাণ্ড মামার জানার কথা নয় ! কাণের ভ্রম নাকি তাহলে ?

সন্দেহ দূর হতে দেরী হয় না। ঠক্ ক'রে পিস্তলের বাঁটটা তার মাথায় এসে ঠোক্কর লাগায় !

"ইস্ ! তুমি ত খুব বেকুব দেখ্‌ছি হে ! ভারী বোকা তো !" কাষ্ঠ ঘোমটা ফাঁক্ ক'রে গ্র্যাণ্ড-মামা ওর মুখদর্শন করেন।

শিশির শুধু বলে ঃ "ঈস্ !"

এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাল মায় রুমাল সমেত গ্র্যাণ্ডমামার হাতে তুলে দ্যায়—নিজের অস্থাবর যা কিছু অপরের হস্তান্তর করে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে, সম্পত্তিহারা শিশির, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচে।

পনের

গ্র্যাণ্ড মামার গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি

"তোমার আগমন বার্ত্তা কি করে' টের পেলুম ভেবে তোমার তাক্ লাগ্‌ছে। তাই না ? ঠিক নিউটনের নিয়মে—মাধ্যাকর্ষণের জোরেই জান্‌তে পারলুম। রুমালটা বাক্সগুলোর ওধারে চালান করার সময়েই সব জান্‌তে পেরেছি। রুমালগুলোর নিঃশব্দ চালচলনেই সমস্ত পরিষ্কার হয়েছে। ওদের নিঃশব্দে গিয়ে পড়বার কথা তো নয়। মাধ্যাকর্ষণের জোরে মাটিতে গিয়ে পড়বে আর সশব্দে গিয়ে পড়বে। তাল পড়িয়া টিপ্ করে জানো তো ? পড়ে আর আওয়াজ ছাড়ে নিউটনের নিয়মেই। কিন্তু আমার তাল টিপ্ না করতেই কে যে ওখানে কোন তালে রয়েছে বুঝতে আমার দেরি হয় নি। জিনিষটা যেন আশ্চর্য্য ভাবে আল্‌গোছে শূন্য মার্গে থেকে গেল—ভারী জিনিষের এ রকম ভূতুড়ে ব্যবহার ভাল নয় তো ! তারপর এধারে ওধারে তাকাতেই গাছের আড়ালে সাইকেলটা নজরে পড়ল ! ব্যস্—তোমার কায়দা কানুন জানতে বাকী রইল না ! কেমন, এখন তো বুঝতে পারছ ?—"

বুঝ্‌তে শিশির অনেকক্ষণই পেরেছে, অনেক আগেই,—মাথায় পিস্তলের ঠোক্কর খাবার সাথে সাথেই—তবে যেটুকু বুঝতে তবুও ওর বাকী ছিল এতক্ষণে বিশদ হোলো। মাথায় হাত হাত বুলোতে হাঁ করে ও বক্কেশ্বরের বকুনি হজম করে।

"এখন তুমি বন্দী আমার! বুঝেচ তো! সুড়সুড় করে লক্ষ্মী ছেলের মতো চলে আসবে—না না? নইলে—নইলে—দেখচ ত! পিস্তলের এই বাঁট দেখেচ? তোমার মাথায় এটা ভাঙতে হলে বিস্তর ক্ষতি হবে আমার। ও পিস্তল তো আর এখানে সারান যাবে না।"

ক্ষতির কথা আর বেশী করে খতিয়ে দেখাতে হয় না। বল্‌তে না বল্‌তেই শিশির বক্কেশ্বরের পেছনে পেছনে যায়। ছায়ার মত অনুসরণ করে দোতলায় গিয়ে ওঠে।

"এই ঘরে তুমি বন্দী, বুঝেচ ভায়া?" বক্কেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন: বন্দীশালার পক্ষে ঘরখানি তেমন খারাপ নয়। দেখে শুনে কি রকম বুঝচ?"

শিশির ঘুরে ফিরে ঘরখানাকে লক্ষ্য করে।

"তাকিয়ে দেখচ কি? তেমন অসুবিধা জনক ঘর নয়। পালাবার পক্ষে প্রশস্তই। চম্পট দেবার সুবিধা করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারো।"

গ্র্যাণ্ড মামা ঠিক তার মনের কথাটি আন্দাজ করতে পেরেচেন। তাঁর কথার আঁচে সেই কথার আঁচ পেয়ে শিশির লজ্জিত হয়ে পড়ে।

"পালানো আর এমন কঠিন কি? এই জানলায় শক্ত করে একটা দড়ি বাঁধবে—বেঁধে লট্‌কে পড়বে, ব্যাস! তা বলে ভুল করে নিজের গলায় যেন বেঁধে বসো না—তাই বেঁধে ঝুলো না যেন, সেটা কিন্তু ভারী খারাপ হবে আগেই বলে রাখচি।"

"সেই খারাপ একদিন তোমার বরাতে আছে!" শিশির রাগ করে মনে মনে বলে: "নির্ঘাৎ ফাঁসি রয়েছে তোমার অদৃষ্টে।"

"ওঃ, তাই তো! দড়ি কই? দড়ি তো নেই এ ঘরে। দড়ি একটা চাই যে!"

এই বলে বক্কেশ্বর তাকে দাঁড় করিয়ে দড়ির খোঁজে অন্য ঘরে যান্। খোঁজা খুঁজি করে ফিরে আস্‌তে তার একটু দেরিই হয়।

"এর মধ্যে পালাবার চেষ্টা করোনি যে, তাই ভালো! খোলা দরজা দিয়ে সোজা পিটটান্ দেওয়া একদম বন্দীদশার দস্তুর নয়। যা দস্তুর—যে ভাবো পালানো নিয়ম—যাদৃশ পলায়ন বন্দীদের পক্ষে গৌরবজনক তার পরাকাষ্ঠা হচ্চে এই।" এই বলে সপাৎ করে দড়াগাছটা শিশিরের ওপরে উনি ফেলে দ্যান্।

"কি করে আমি পালাবো সে তোমায় বলতে হবে না।" এতক্ষণে শিশির একটা জবাব দেয়। "বলে দিতে হবে না তোমায়।"

"না না, আমি কেন বল্‌ব। আমি বল্‌বার কে? এসব তো পুঁথিপত্রে বিস্তারিত করে সব বলাই আছে। বলা নেই?"

"আছে কি না আছে আমি বুঝবো।"

"দড়িটা শক্ত করে জানালার গোড়া বেঁধে দিয়ে যাই। কি জানি বাঁধনের দোষে, যদি দড়ি সমেত ঝুল্‌তে গিয়ে খুলে পড়ে হাত পা ভেঙে ফ্যালো! হাত পা ভাঙলেই তো হয়েছে! একটা পিস্তল সারানোই আমার পক্ষে কঠিন, তার উপরে তোমাকে সারতে হলেই গেছি!"

জানলার পাল্লায় তিনি দড়িটা মজবুৎ করে বেঁধে দ্যান্।

"এইবার সমস্ত কাজই সহজ হয়ে রইলো। আগিয়ে রইলো বহুৎ। এখন তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, আমি চলে গেলে—আমার সাম্‌নে সটকানো ঠিক উচিৎ হবে না—সুরুচি সঙ্গত হবে না—আমার তিরোধানের পরে ধীরে সুস্থে, ঐ জানলা ধরে দড়ি বেয়ে সটাং নীচে নেমে যাওয়া। আর নীচে পৌছতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! পৌছলে কি পালালে! কিন্তু সাবধান আগাগোড়া আমার নজর বাঁচিয়ে, এই চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না—তক্ষুনি গুলি ছুড়ব। নিয়ম ত সব মানতে হবে। মেনে চল্‌তে হবে নিয়ম-কানুন।"

"কি করে পালাতে হয় আমি জানি।" এক কথায় শিশির জানিয়ে দ্যায়।

জান্‌বে বই কি! কার ভাগনের ভাগনে, সেটা তো বুঝতে হবে। সত্যিই যদি বেমালুম পালাতে পারো তাহলে সেটা খুব সুখের কথাই! তাহলে তেমন বাহাদুর ছেলেকে এক আধটা দামী রত্ন উপঢৌকন দিতে আমার দ্বিধা নেই। এই দ্যাখো এই দুটো রত্ন-ডিম্ব এখানে রইলো, সযত্নে রেখে দিয়ে গেলুম। একটা তোমার, আর একটা তোমার বোনের—পালিয়ে যাবার সময় নিয়ে যেতে ভুলো না।"

"আমার মামার জন্যে আরেকটা দাও।" শিশিরের আবেদন হয়।

"সেই আদেখলা ভাগনেটার জন্যে? অপদার্থটাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে না, তবে তুমি বল্‌ছ, তার জন্যেও একটা থাকল। তিন তিনটে গেল, যাক্, দশটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"একেশ্বর হয়েই আমরা খুসী" শিশির হাসিমুখে জানায়।

"বেশ, ভালো কথাই। এইবার আমি বাইরে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা চাবি বন্ধ করে চলে যাই—খাওয়া দাওয়া করি গে। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা সারতে হবে অনেক—পরশুই এখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্‌চি তো! হ্যাঁ, একটা কথা, ভুলে গেছি বল্‌তে—" যেতে যেতে, থম্‌কে দাঁড়িয়ে পিছন ফেরে তিনি বলে যান্: "আসল কথাই বল্‌তে ভুলে গেছি।"

"কিছু বলার দরকার নেই। সব আমি জানি।" শিশির নিজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে গ্রাণ্ড-মামার অধিক উপদেশ নেবার অপেক্ষা রাখেনা।

"সেই ডালকুত্তাগুলোর কথা তোমার মনে আছে কি? তোমাদের যারা কাল্‌কে তাড়া করে' গেছল? বেচারাদের বেজায় শাস্তি হয়েচে। তাড়া করবার জন্য নয়, তাড়া করে' তোমাদের ধরে' আন্‌তে পারেনি সেই কারণেই কাল থেকে ওদের খাওয়া বন্দ।"

"উচিৎ শাস্তি দিয়েচেন।" শিশির অতিশয় উল্লাসিত হয়।

"হ্যাঁ, আর তারা রয়েচে সব এই জানালার নীচেটাতেই—ঠিক যেখানে এই দড়িটা গিয়ে শেষ হয়েচে সেইখানে। কাল থেকে কিছুটি খায়নি বেচারীরা যদিও নিতান্ত অনাহারী কাজ তবু তোমাকে যদি ব্রেক্ ফাস্ট্ করতে পায়—না কি, তোমার তাতে খুব আপত্তি আছে? তোমার টেস্ট্ তেমন সুবিধের হবেনা বল্‌তে চাও?"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সলিল-সমাধি

সেই কল্পনাতীত, গতিশীল শব্দ-বিভীষিকার তলায় থেকে মনে হ'ল, সৃষ্টির শেষ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত এবং দুর্দ্দান্ত প্রলয় উৎকট আনন্দে নেমে আসছে আমাদের মাথার উপরে!

প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি—হঠাৎ মাস্কান্ প্রাণপণে চীৎকার ক'রে প্রচণ্ড এক লাফ মেরে আমাদের বাঁ-পাশের গুহাটার ভিতরে গিয়ে পড়ল।

চোখের পলক পড়তে না-পড়তেই আমরাও প্রায় এক সঙ্গেই সেই গুহার ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হলুম—এমন কি বাঘা পর্য্যন্ত! আত্মরক্ষার চেষ্টা এমনি স্বাভাবিক যে, মানুষ আর পশু চরম বিপদের সময়ে ব্যবহার করে ঠিক একই রকম!

ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুহার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল এবং পথের উপর দিয়ে চ'লে যেতে লাগল যেন কাণ-ফাটানো প্রাণ-দমানো মহাশব্দের অদ্ভুত এক ঝটিকা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ—চারিদিকে নুড়ির 'পর নুড়ি ছড়াতে ছড়াতে! একটা নুড়ি এসে লাগল কমলের কাঁধের উপরে, সে আর্ত্তনাদ করে বসে পড়ল!

মিনিট দুই ধরে গুরুভার পাথরের স্তূপগুলো ঠিক জীবন্ত ও হিংস্র প্রাণীর মতন গড়াতে গড়াতে ও লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে নামতে লাগল - সেই দুই মিনিট যেন দুই ঘণ্টারও চেয়ে বেশী! গুহার ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন ভূমিকম্পে! গুহার ছাদটাও যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে চায়!

ভয়ানক মৃত্যুর বন্যা যখন গুহামুখ ছেড়ে নীচের দিকে নেমে গেল, তখনো আমরা স্তম্ভিতের মতন নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম!

সর্ব্বপ্রথমে কথা কইলেন বিনয়বাবু। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "বিমল, নীচের দিক থেকে বিষম এক হাহাকার শুনতে পেয়েছ?"

আমি বললুম, "পেয়েছি। যে মৃত্যুকে আমরা ফাঁকি দিলুম, শত্রুরা বোধহয় তাঁকে এড়াতে পারেনি! অনেক লোকের কান্না শুনেছি, বোধ হয় তারা সদলবলে মারা পড়েছে!"

কমল আর্ত্তস্বরে বললে, "বিমলদা, নুড়ি লেগে বোধ হয় আমার কাঁধের হাড় ভেঙে বা সরে গেছে। আমি ডানহাত নাড়তে পারছি না।"

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি কমলের কাছে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন।

কুমার ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠল, "সর্ব্বনাশ! আমার বন্দুকটা যে বাইরে ফেলে এসেছি!"

আমারও বন্দুক বাইরে পড়ে আছে—প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বন্দুকের কথা ভাববার সময় পাইনি।

বিনয়বাবু আর কমল বন্দুকহীন—বন্দুক নিয়ে ভিতরে ঢুকতে পেরেছে কেবল রামহরি।

ছুটে গুহার বাইরে গেলুম। সেখানেও বন্দুকগুলোর কোন চিহ্ন নেই—ছুটন্ত পাথরের বিষম ধাক্কায় ঝাঁটার মুখে তুচ্ছ ধূলোর মত বন্দুকগুলো যে কোথায় গিয়ে পড়েছে তা কে জানে! পাথরের চাপে হয়তো সেগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে!

কুমার বললে, "শত্রুদের অবস্থাও যদি বন্দুকগুলোর মতন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। রামহরির একটা বন্দুক আর আমাদের চারটে রিভলভারই যথেষ্ট।"

পাহাড়ের গা দিয়ে যে ঢালু পথ বয়ে আমরা উপরে উঠেছি তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। যতদূর নজর চলে কেবল দেখা যায়, পথের উপরে ছড়ানো রয়েছে নুড়ি আর নুড়ির রাশি,—বড় বড় পাথরগুলো গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নেমে হারিয়ে গিয়েছে দৃষ্টির অন্তরালে। শত্রুরাও অদৃশ্য। হয়তো তাদের দেহগুলো এখন পাহাড়ের পদতলে পড়ে আছে নির্জ্জীব ও রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের মত।

আশ্বস্ত হলুম বটে, কিন্তু দুঃখিতও হলুম যথেষ্ট। এতগুলো মানুষের এমন শোচনীয় পরিণাম!

তখন রঙিন উষার রহস্যময় আলো সেই শৈলরাজ্যকে করে তুলেছে নূতন এক স্বপ্নলোকের মত। ভোরের পাখীদের সভায় জাগল ঘুম-ভাঙানি গান এবং পলাতক অন্ধকারের পরিত্যক্ত আসর জুড়ে বিরাজ করছে স্নিগ্ধসবুজ লতা পাতা বনস্পতি।

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, আমাদের মোট মাটগুলোও রসাতলে গিয়েছে!"

আমি বললুম, "তাহলে উপায়? শত্রু নিপাতের পর বন্দুকের দরকার নেই বটে, কিন্তু রসদ না থাকলে পেট চলবে কেমন করে?"

মাঙ্কান্ বললে, "ভয় নেই বাবু সাহেব, আমাদের আর বেশীদূর যেতে হবে না। এই পাহাড়ের নীচেই আছে একটা নদী। তারপর নদীপার হয়ে ঘণ্টাখানেক পথ চললেই আমরা সেই মঠে গিয়ে হাজির হব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "নদীটা কত বড়?"

—"চওড়া খুব বেশী নয় বটে, কিন্তু জল খুব গভীর। তবে আপনাদের ভাবনা নেই, নদীর ওপরে একটা কাঠের সাঁকো আছে।"

—"বেশ, তাহলে আবার যাত্রা করা যাক" এই বলে আমি অগ্রসর হলুম। সঙ্গীরাও আমার পিছনে পিছনে চলল। পিছন থেকে মাঝে মাঝে কমলের "আঃ! উঃ!" বলে আর্ত্তনাদ কাণে আসতে লাগল—বোধ হয় তার আঘাতটা হয়েছে গুরুতর।

মিনিট পঁচিশ পরেই আমরা পাহাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনেই প্রভাত সূর্য্যকরে জ্বলন্ত সুদীর্ঘ এক বাঁকা তরোয়ালের মতন একটী বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে কলনাদে উচ্ছসিত হয়ে। চওড়ায় সে ষাট সত্তর ফুটের বেশী হবে না, কিন্তু তার স্রোতের টান এমন বিষম যে দেখলেই মনে হয়, জল যেন টগবগ করে ফুটছে!

কুমার সুধোলে; "মাঙ্কান, তুমি যে সাঁকোর কথা বললে সেটা কোথায়?"

মাঙ্কান মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "সাঁকোটাতো এইখানেই ছিল।"

—"এইখানেই ছিল তো গেল কোথায়? সাঁকোর তো আর পা নেই যে 'মর্ণিং ওয়াক্' করতে বেরুবে?"

মাঙ্কান্ বললে, "আমি আজ এক বছর এদিকে আসিনি। গেল বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকোটা নিশ্চয় ভেসে গিয়েছে। এদেশে এমন ব্যাপার হামেসাই হয়।"

আমি হতাশ ভাবে বললুম "তাহলে আমরা কি করব? এ নদীটা তো দেখছি দুই পাহাড়ের মাঝখানকার ঢালু জমি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, সাঁতার কেটে এর প্রখর স্রোত এড়িয়ে ওপারে যাওয়া সোজা নয়।"

কমল বললে, "সোজাই হোক আর কঠিনই হোক, আমার পক্ষে সাঁতার কাটা অসম্ভব। আমি ডান হাত নাড়তেই পারব না।"

কুমার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে ইংরেজী ভাষায় কর্কশ স্বরে কে বললে, "এখনি সবাই মাথার ওপরে হাত তোলো!"

চমকে ফিরে দেখি ঠিক আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছুন্-ছিউ, আরো দুজন চীনেম্যান এবং চারজন কাফির! ছুন্ছিউ ও তার চীনে সঙ্গীদের হাতে বন্দুক!

ছুন্ছিউ আবার শাসিয়ে বললে, "এখনো হাত তুললে না?"

বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, কাঠের মূর্ত্তির মত।

ছুন্ছিউ ইঙ্গিত করতেই কাফিররা ছুটে এসে ধাক্কা মেরে আমাদের মাটির উপরে শুইয়ে দিয়ে হাত পা বেধে ফেললে।

আমার সামনে এগিয়ে এসে ছুন্ছিউ প্রথমে করলে বিকট অট্টহাস্য! তারপর বললে, "বাবু এইবারে তোমাদের আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছি! কিন্তু আমি বেশী কথা বলতে চাই না। প্রাণ বাচাতে চাও তো লকেটখানা ফিরিয়ে দাও।"

আমি বললুম, "তুমি যা চাইছ আমার কাছে তা নেই।"

আবার হা হা করে হেসে উঠে ছুন্ছিউ বললে, "নেই? তাহলে কি তোমরা এতদূরে এসেছ ছেলেখেলা করতে? ওহে দেখতো এদের জামা কাপড়গুলো খুজে!"

তারা আমাদের প্রত্যেকের জামা কাপড় তন্ন তন্ন করে খুজে দেখলে—এমন কি আমাদের মুখ বিবর পর্য্যন্ত দেখতে ছাড়লে না।

লকেট আছে কলকাতায়, কিন্তু তার লিখন আছে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে। ছুন্ছিউকে সে কথা বলা উচিত মনে করলুম না।

ছুন্-ছিউ রাগে যেন পাগলের মতন হয়ে উঠল। চীৎকার ক'রে বললে, "ওরে বাঙালী কুত্তার দল! তোদের জন্যে আমার দুর্গতির সীমা নেই! চীন থেকে এলুম বাংলাদেশে, সেখানে বিপদের পর বিপদ এড়িয়ে এসেছি এই কাফ্রিস্থানে। এখানে এসে আমার দলের আটাশজন লোকের প্রাণ গিয়েছে, তবু আমি তোদের সঙ্গ ছাড়ি নি। এত ক'রেও শেষটা কি আমাকে ফাঁকে পড়তে হবে?"

আমি বললুম, "হাঁ বন্ধু ঠিক আন্দাজ করেছ! এখন দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও।"

ছুন্-ছিউ চোখ পাকিয়ে বললে, "তাই নাকি? আমাকে যদি ফিরে যেতে হয়, তাহ'লে তোদেরও এই পৃথিবীতে রেখে যাব না!"

—"বেশ, তাহ'লে আমাদের খুন কর! মরতে হবে সকলকেই—মরতে আমরা ভয় পাই না।"

—"আচ্ছা, দেখা যাক্। ওরে, তোরা এই লোকগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে ফ্যাল্। তারপর ওদের ঐ নদীতে ভাসিয়ে দে!"

প্রতিবাদ করলুম না—কারণ এই উন্মত্ত সয়তানদের কাছে প্রতিবাদ বা দয়া প্রার্থনা ক'রে কোনই লাভ নেই।

তারা আমার ও কুমারের উপরে রাখলে বিনয়বাবু ও কমলের দেহ এবং তার উপরে শোয়ালে মাঙ্কান্ ও রামহরিকে। তারপর লোকে যেমন ক'রে চ্যালা-কাঠের বোঝা বাঁধে,

সেইভাবে দড়ী দিয়ে আমাদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে ফেললে। আমাদের হাত-পা আগেই বাঁধা ছিল—এটা হ'ল বাঁধনের উপর বাঁধন।

ভেবেছিলুম মাঙ্কান্ তো আমাদের মতন বিপদের পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করে নি, প্রাণের ভয়ে কাবু হয়ে সে হয়তো কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। কিন্তু এখন দেখছি তার সাড়ে ছয়ফুট উচুঁ দেহটির সবটাই হচ্ছে দুর্জ্জয় সাহসে পরিপূর্ণ। তার মুখ ভাবহীন, কণ্ঠে টুঁ শব্দ নেই।

ওরা সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে আমাদের নদীর ধারে নিয়ে গেল।

ছুন্‌ছিউ বললে, "এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—বল, লকেট কোথায় রেখেছ?"

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, "আমাকে বার বার জ্বালাতন কোরোনা ছুন্-ছিউ! লকেট আমার কাছে নেই।"

ছুন্‌ছিউ বিস্ময় মাখা ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "এই বাঙালীটা আমাকে আশ্চর্য্য করলে যে! এ মরবে, তবু মিছে কথা বলতে ছাড়বে না!"

আমি বললুম, "আমি সত্যকথাই বলছি।"

—"সত্যকথা? তুমি কি বলতে চাও, লকেট তোমার কাছে ছিল না?"

—"নিশ্চয়ই ছিল!"

—"তবে?"

—"লকেট এখন আমার কাছে নেই।"

—"মানে?"

—"মানে আমি জানি না।"

—"এই তোমার শেষ কথা?"

"হুঁ।"

—"বেশ। তাহ'লে আমরাও আমাদের শেষ কাজ করি। ওদের জলে ফেলে দাও।"

তারা সকলে মিলে আমাদের শূন্যে তুলে ধরলে।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, "হে বাবা বিশ্বনাথ, চরণে ঠাঁই দিও!"

পর-মুহূর্ত্তে আমরা ঝপাং ক'রে পড়লুম নদীর গর্ভে এবং সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলুম পাতালের শীতল অন্ধকারে।

ক্রমশঃ

চলন্তিকা

ভারতবর্ষে এবছরের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা—মাদাম ও মার্শাল চ্যাং-কাই-সেকের ভারতে আগমন। এই দুই মহামানুষ যেন নব চীনের অগ্রদূত, নূতন আলোর প্রতীক। বহু প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম্মে কর্ম্মে কৃষ্টিতে ও নানাভাবে নানাদিকে ভারতের সঙ্গে চীনের মিল। মহাচীনের এক নির্ভীক সেনাপতি ও তাঁর স্ত্রী ভারত-ভূমি স্পর্শ করে ভারত-চীনের বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করে গেলেন।

এঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেন নি। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকল্পে এঁরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে ভারত ও চীনকে গৌরবান্বিত করেছেন। শান্তিনিকেতনের চীনাভবনের জন্যও তাঁরা ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। গত কয়েক দিন ধরে ভারতে চীন-দিবস ও চীনে ভারত-দিবস অনুষ্ঠিত করে স্বাধীনতা কামী এই দুই মহাদেশের মহামিলন সুদৃঢ় করা হয়েছে। চীন ও ভারত লোকসংখ্যায় পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী, তাই চীন ও ভারত যদি স্বাধীন না হ'তে পারে, পৃথিবীর স্বাধীনতার কোন মূল্য কোন কল্যাণ কোন সার্থকতা থাকবে না। এই শুভ মিলন চীন ও ভারতকে সেই পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরবময় পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করুক, এই সকলের প্রার্থনা।

ভীষণ যুদ্ধের পর এক রকম কোন ঠেসা হয়ে সিঙ্গাপুর জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করল। স্থলে জলে শূন্যে চারদিক থেকেই দলভারী হয়ে জাপান দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ চালিয়েছিল। সিঙ্গাপুরে যুদ্ধের উপকরণ মালমসলা ইংরাজদের যথেষ্ট ছিল না, সংখ্যাতেও ছিল তারা কম, তাই বেশী দিন তারা টিকতে পারল না। ইংরাজ ইতিহাসের একটি অধ্যায় করুণ করে সিঙ্গাপুরের পতন হ'ল। জাপানের উদীয়মান-সূর্য্য পতাকার নীচে রক্তাক্ত সিঙ্গাপুরের নূতন নামকরণ হ'ল—সো-নান্ বা দক্ষিণের আলো! সিঙ্গাপুর ছিল ইংরাজদের একটি সুদৃঢ় নৌঘাঁটি, শুধু তাই নয় এত চমৎকার নৌঘাঁটি প্রশান্ত মহাসাগরে আর নেই। ফলে আজ প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দিকে দিকে জাপানীরা আরো তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সুবিধা পেয়েছে। রেঙ্গুনের যুদ্ধও শেষ; স্থানীয় লোকেরা ও মিলিটারী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করার পর গত ১০ই মার্চ্চ জাপানী সৈন্য রেঙ্গুন সহর অধিকার করেছে। কিন্তু বর্ম্মার যুদ্ধ এখনও চলেছে এবং ইংরেজ-চীন-ভারত জাপানের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ সুরু করেছে। কিন্তু ওদিকে সুমাত্রা, বালি ও জাভার রাজধানীগুলি জাপান অধিকার করেছে এবং শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়ার ওপর জাপানের এক বিরাট আক্রমণ সুরু হবে বলে অনেকের বিশ্বাস।

এই সব আশেপাশে যুদ্ধের ফলাফলে আজ ভারতবর্ষও বিশেষ করে পূর্ব্বভারত ও বাংলাদেশ শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করছে। আমরা প্রার্থনা করি ভারতবর্ষ এ নিষ্ঠুর যুদ্ধ থেকে যেন রেহাই পায়।

ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—রঞ্জি-ট্রফির খেলাগুলি শেষ হয়ে গেল। ফ্যাইনালে বোম্বাই ক্রিকেট দল মহীশূর দলকে এক ইনিংস ও ২৮১ দৌড়ে পরাজিত করে রোহিনটন বারিয়া ও রঞ্জি-ট্রফিগুলি লাভ করেছেন। এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে বোম্বাই দল ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় একটি শ্রেষ্ঠ দল। পাঁচ বৎসর পরে আবার বোম্বাই রঞ্জি-ট্রফি লাভ করলেন। গত দু বছর মহারাষ্ট্র দল রঞ্জি-ট্রফি পেয়েছিলেন, আর তার আগের বছর পেয়েছিলেন বাংলা ক্রিকেট দল।

বর্ত্তমান ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় কে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় তা নিয়ে নানামুনির নানামত আছে। সম্প্রতি হিন্দু জিমখানা সি টি সারাওয়াতেকে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু খেলোয়াড়' অভিহিত করে একটি স্বর্ণপদক উপহার দিয়েছেন। এই খেলোয়াড়টিকে best bowling average এর জন্য রাজাধ্যক্ষ চ্যালেঞ্জ কাপটি দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে বলা হয়েছে Cricketeer of the year। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটিংএর জন্য সম্মান পেয়েছেন বিজয় মার্চ্চেণ্ট। এই খেলোয়াড়টিকে best batting averageএর জন্য রাজাধ্যক্ষ চ্যালেঞ্জ কাপটি দেওয়া হয়েছে। এঁরা দুজনেই যে এক নম্বর খেলোয়াড় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতীয় ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট ফ্যাইনাল খেলায় বম্বে ইউনিভার্সিটি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিকে এক ইনিংস ও ২৯৮ দৌড় পরাজিত করে ইণ্টার ইউনিভার্সিটি ট্রফি জয়লাভ করেছেন।

চলন্তিকায় এবার দু'টি বিশেষ সুখবর দেবার আছে। একটি সুখবর—বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী উদয়শঙ্কর ও তাঁর উপযুক্ত প্রিয় শিষ্যা শ্রীমতী অমলা নন্দীর শুভবিবাহ। সম্প্রতি আলমোড়াতে এঁদের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই দুই নৃত্যশিল্পীর শুভমিলন কল্যাণের হোক আমরা কামনা করি। আর একটি সুখবর—পণ্ডিত জহওরলালের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা ও শ্রীমান ফিরোজ গান্ধীর শুভ পরিণয়। এলাহাবাদে আনন্দ-ভবনে শীঘ্রই এঁদের বিবাহ সুসম্পন্ন হবে। আমরা এঁদের বিবাহেও শুভকামনা করি।

আগামী বছরের নূতন রংমশালে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

একটী অভিনব উপন্যাস লিখিবেন

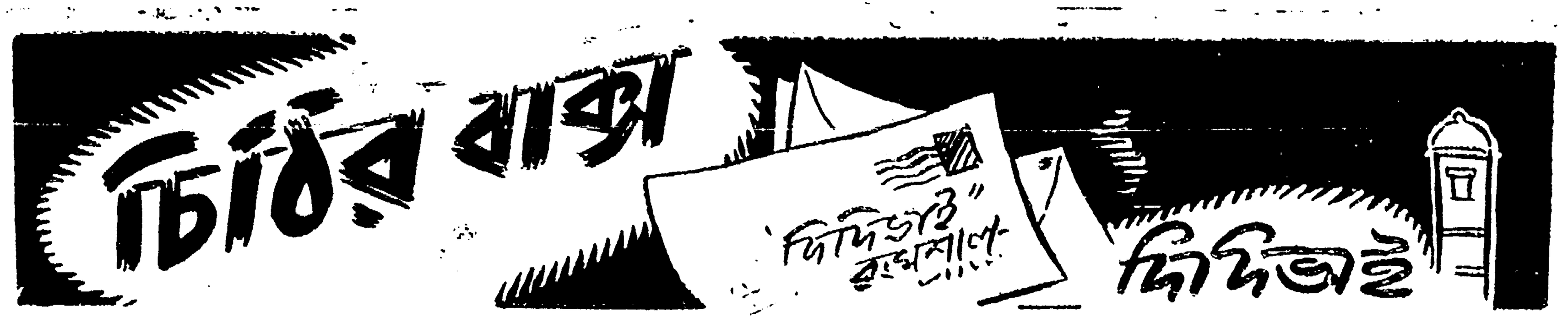

রংমশালের ভাই বোনেরা আমার!

বছরের শেষ দিকে এসে আমরা পড়লাম। বছর শেষ হয়ে এলো, কিন্তু মানুষে মানুষে হানাহানি আজও শেষ হলো না, শেষ হলোনা স্বার্থের সংঘাত। যে দিকে তাকাই দেখি আঘাত আর প্রতিঘাত। সমস্ত পৃথিবী আজ বিপন্ন হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে। এতদিন ভারতবর্ষ যুদ্ধের আগুন থেকে ছিল দূরে, ভারতবর্ষ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে চাইলেও যুদ্ধ তা চায়নি, সমস্ত ভারতের ওপর দুর্য্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মানুষ সহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীতে নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই। আজ বছরের শেষে একটা কথা তোমাদের বলে যাই—আজকে মানুষের যে এই পশুরূপ দেখছো তা মানুষের আসল রূপ নয়—মানুষের মাঝে যে দেবতা আছেন তাঁর ধ্বংস মুখর চেহারা নয়। তিনি আজ অসুরের ভয়ে স্বর্গের নন্দন কানন ছেড়ে পাতালের কোন অন্ধকার গুহায় আত্ম গোপন করে আছেন—তিনি আবার মানুষের ভিতর জাগবেন।

নতুন যুগের নতুন মানুষদের ভিতর তিনি আবার নতুন করে জাগবেন। তোমরা তো জানো একদিন সমুদ্র মন্থন হয়েছিল। সে সমুদ্র মন্থনে পৃথিবীর যা কাম্য তার উদ্ভব হয়েছিল। বর্ত্তমান যুগে আবার সেই সমুদ্র মন্থন সুরু হয়েছে, আগামী যুগের মানুষেরা সে সমুদ্র মন্থনের ফলভোগ করবে, সে অমৃত পান করে অমর হবে—তারই সম্ভাবনা বর্ত্তমানের দুর্য্যোগভরা অন্ধকারে মানুষের বুকে এনেছে সাহস, শক্তি, আনুরক্তি।

বর্ত্তমান যুগে আমরা জন্মেছি বলে আমরা গর্ব্ববোধ করতে পারি। এই গর্ব্বের জন্য আমাদের দুঃখ বোধ করতে হচ্ছে। পৃথিবীর জীবনে এমন সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত বুঝি কখনও আসেনি—শুধু মানুষের কথা ভেবে দেশে দেশে জন সাধারণের ভিতর এমন আত্মবোধ কখনও জাগেনি। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জহরলালকে জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আমাদের ঘরের ছেলেদের—আর বাইরের পৃথিবীতে, দূরের পৃথিবীতে দেখেছি এক বিপুল পরিবর্ত্তন, দেখেছি কামারের ছেলে হয়ে উঠল হিট্‌লার, মুচীর ছেলে হয়েছে—মুসোলিনী, আর চাষার ছেলে হয়েছে ষ্টালিন। সুরু হতে দেখলাম সমুদ্র মন্থন। এই আমাদের গর্ব্ব! আমাদের পরে যারা আসবে আমরা তাদের ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবো, পৃথিবীর নবজন্মের সন্ধিক্ষণে আমরা ছিলাম বলে।

প্রার্থনা করি বর্ষশেষের সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্টের শেষ হোক। নতুন বছরে আমরা যেন নতুন চোখে দেখতে পাই।

বটকৃষ্ণ মিত্র, হাওড়া। তোমাদের রচনা ছাপাবার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খুল্‌তে বলেছ। সে কথা পরিচালক মশাইকে জানিয়েছি। তোমাদের লেখা তো মাঝে মাঝে রংমশাল বৈঠকে ছাপা হয়। দুর্য্যোগ কাটলে হয় তো রংমশালকে নতুন রূপে দেখ্‌তে পাবে।

উৎপল গুপ্ত, পূর্ব্ব শিমুলিয়া। তুমি যা বলেছ তা তো সম্ভব নয় ভাই। প্রত্যেক ব্যাপারে একটা নিয়ম মেনে চলা ভালো এবং সেটার প্রয়োজন আছে আরো একটু বড় হলে বুঝ্‌তে পারবে। হ্যাঁ, আমি তো তোমাদের বন্ধু। যারা সহর থেকে গ্রামে এসেছে তাদের সঙ্গে তুমি মিশ্‌তে পারছো না বলে অনুযোগ করেছ। সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠো,—ওরা যদি তোমাদের আপন করতে না পারে, তোমরা তোমাদের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তাদের কাছে টেনে নাও, আপন ক'রে নাও। কেমন? দূর থেকে কাউকে বিচার করা ঠিক নয়।

গোপেশ্বর লহরি, শান্তিপুর। আমার উত্তর তোমার মনঃপুত হয়নি মুসকিল তাহলে—এবার তাহলে উত্তর দিচ্ছি—আমি জানি না। মনঃপুত হবে তো? তোমার যদি জানা থাকে আমায় জানাও।

গিরিন্দ্রনাথ রায়, নৈহাটি। খুব রাগ করেছ?—লেখনিবন্ধু পাওনি বলে। বর্ত্তমানে আমি একটু ব্যস্ত আছি আর কটাদিন্‌ পরে বন্ধু তোমার দোরের কড়া নাড়বে তৈরী হ'য়ে থেকো কিন্তু, কেমন?

অমিয়া, পুরুলিয়া। তোমাদের সকলের সংবাদে আমি আনন্দ পেয়েছি খুব। আমার আশীর্ব্বাদ সব সময় তোমাদের ঘিরে আছে। তোমরাই তো রংমশালের আলো আপন অন্তরের আলোতে অধিকতরো উজ্জ্বল করবে। সম্পাদক মশাইর গল্প শুনবে—তিনি তো গল্প বল্‌ছেন রংমশালের পাতায় আর রেডিওতে ছোটদের আসরে, শোননি?

নন্দিতা চৌধুরী, শ্রীহট্ট। তোমার পাঠান ছোট ভাই দিলীপের (৯ বছর) আঁকা ছবি পেয়েছি, আমার ভালো লেগেছে। যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওটা এখন ছাপা সম্ভব নয় কারণ ব্লকে অনেক খরচ পড়বে। ব্লক পেলে হয়তো ছাপা যেতো।

দেবী প্রসাদ বসু চৌধুরী, গুরু প্রসাদ বসু চৌধুরী, বর্দ্ধমান। কলিকাতা থেকে গ্রামে ফিরেছ? খুব ভাল। ইন্দিরাদিকে তোমাদের দিদির ব্লাউজের হাতের ডিজাইনের কথা জানিয়েছি—হয়তো তিনি ভাবী গিন্নীদের বৈঠকে আগামী বছরে উপস্থিত করবেন।

ইন্দিরা ঘোষ, কালিঘাট। এতদিন দূরে সরেছিলে কেন? তবু ভালো বছর শেষ হবার আগে এলে আমাদের কাছে। তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালাম। ড্রয়িং আমিও ভালবাসি যদিও ড্রয়িং করতে মোটেই পারিনা—হাস্‌ছ শুনে? রংমশালের যারা গ্রাহক

তারাই রংমশালদলের। ইন্দিরাদিকে তোমার কথা বলেছি। তিনি জানিয়েছেন আগামী বছর হয়তো তিনি আস্‌বেন উলের ও সূচিশিল্পের প্যাটার্ন নিয়ে, দেখা দেবেন ভাবী গিন্নীদের বৈঠকে।

শিবানী ঘোষ, সুগোলী। তোমার অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন স্থগিত রইল শেষ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। সব এক—জল, পানি, water একই জিনিসের বিভিন্ন নাম করণ কিন্তু মধুদিকে তো আমি জানিনা—তাই জানাতে পারলাম না।

বিনীতা ঘোষ, রাঁচি। লেখনি বন্ধু পেতে গেলে নাম, বয়স, কোনোও হবি ইত্যাদি পাঠিয়ে দিও এবং কি রকম লেখনি বন্ধু চাও লিখো কেমন?

লালমোহন ভট্টাচার্য্য, কালিঘাট। তোমার দুখানা চিঠি পেয়েছি। ব্যস্ত থাকার দরুণ তোমার লেখনি বন্ধু পাঠাতে পারিনি—রাগ করোনা—শিগ্‌গিরিই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অতুল দে, নোয়াখালি। তোমার লেখনী বন্ধু পাঠাবো—তোমার সব কথা লিখে পাঠিও এবং কেমন লেখনী বন্ধু চাও তাও—রংমশাল না পেলে ১৫ তারিখের মধ্যে ডাক টিকিট দিয়ে পরিচালক মশাইকে জানাবে। গ্রাহকরাই রংমশাল দলের সভ্য। তোমাদের "অভিনব" হাতে লেখা পত্রিকার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেছ। কী আশীর্ব্বাদ জানাবো?

তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা জেনো।

তোমাদের
দিদিভাই

রবীন্দ্র-স্মৃতি রৌপ্য-পদক

প্রতিযোগিতার ফলাফল

বিষয়ঃ শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান

প্রথম—শ্রীমণিমালা দেবী (গ্রাঃ নং ৭৭৭)

বিশেষ প্রশংসনীয়—রহিমা খাতুন (গ্রাঃ নং ৫৭৭)

অমিয়কুমার ঘোষাল (গ্রাঃ নং ১৭৭৮)

সত্যব্রত বসু (গ্রাঃ নং ১৬১৩)

মণিমালা রবীন্দ্র-স্মৃতি রৌপ্য-পদকটি পুরস্কার পাবেন

আবার

— ছোট গল্প প্রতিযোগিতা—

নববর্ষে বৈশাখে নূতন রংমশালে এই নতুন প্রতিযোগিতাটির বিষয় বলা হবে।

কেবলমাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীঅলকা ঘোষের সৌজন্যে)

এক ভদ্রলোকের একটি হীরকের ক্রশ ছিল। একদিন সেটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি এক স্যাকরাকে সারাইতে দেন। তিনি মোট হীরক না গুণিয়া, এইরূপ করিয়া গুণিয়া দেন ঃ—

একেবারে নীচের হীরক হইতে মাঝের বড় হীরকটি পর্য্যন্ত গুণিয়া, একবার উপর দিকে একবার বাঁ দিকে ও একবার ডানদিকে যথাক্রমে গুণিয়া প্রতিবারেই ২৩টি করিয়া গুণিয়া দিলেন।

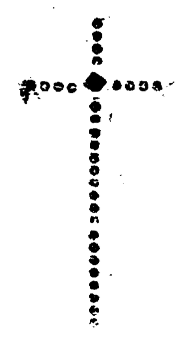

চতুর স্যাকরা বাড়ী গিয়া ২টি হীরক খুলিয়া লয়। কিন্তু সে ফিরাইয়া দেবার সময় ঠিক পুর্ব্ব নিয়মেই ফিরাইয়া দেয়। স্যাকরা কোন্ দুইটি হীরক সরাইয়া ছিল? এবং কিরূপে ২৩টি গুণিয়া দিল? (আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও)

—গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

(১) ৯ সংখ্যা

(২) ভাই অমর

তোমার কোন সংবাদ নেই কেন? তুমি বেশ ছেলে হে, যাক, চিঠি দিও। কেমন আছ লিখ। ইতি—রজনী (বা যামিনী বা নিশীথ)

(৩) ক। সিন্ধু ঘোটক; খ। খুলনা; গ। জটায়ু; ঘ। বলগা হরিণ।

—যাদের নির্ভুল উত্তর হয়েছে—

রেখা বসু, কিশানগঞ্জ; উৎপল গুপ্ত, পূর্ব্বশিমুলিয়া; কল্যান, অমিতা ও দেবপ্রসাদ সুরাল, পুরুলিয়া।

বেশীর ভাগ গ্রাহকগ্রাহিকাদের দু'টি ভুল হয়েছে।

তোমরা সকলেই যাঁদের গল্প উপন্যাস কাহিনী রূপকথা পড়তে ভালবাস, তাঁদের লেখা রংমশালে দেখতে পাবে!